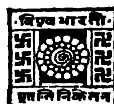
টাকার বাজার

শ্রী অতুল সুর



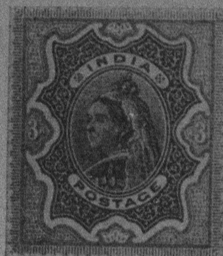
বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা



সিন্ধু ডাকটিকিট
১৮৫২



১৮৫৪



১৮৯৫



১৯০২-১১



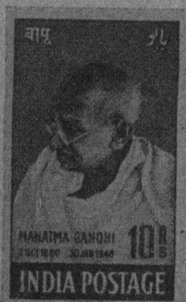
১৯১১-৩৩



১৯৩৭



১৯৪৭



১৯৪৮



১৯৫০

চৈত্র ১৩৫৪

মূল্য আট আনা

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা

মুদ্রাকর শ্রীসূর্যনারায়ণ ভট্টাচার্য
তাপসী প্রেস, ৩০ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা

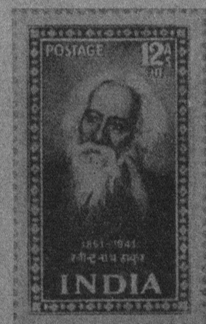










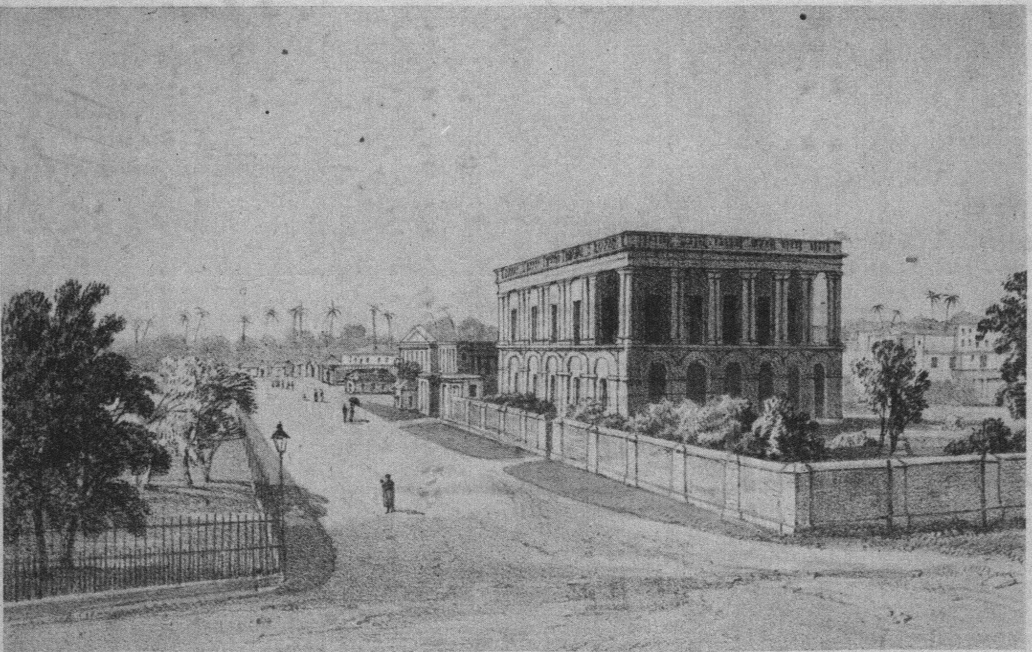


মহাপুরুষ-সিরিজ । ১৯৫২

জ্যেষ্ঠ পুত্র

লক্ষ্মীনারায়ণ সুরের স্মরণে

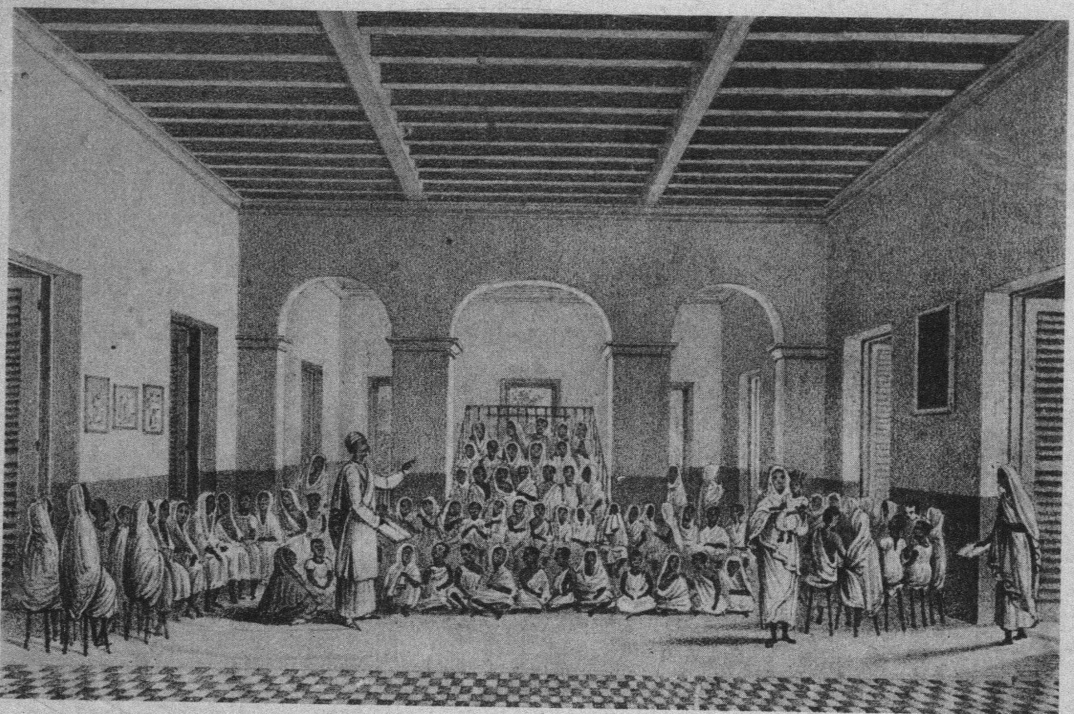
জন্ম ১৯২৪ : মৃত্যু ১৯৪৮



সেণ্ট্রাল স্কুল

Priscilla Chapman লিখিত Hindoo Female Education (1839) গ্রন্থ হইতে

বিষয়



সেণ্ট্রাল স্কুলের অভ্যন্তর

Priscilla Chapman লিখিত Hindoo Female Education (1839) গ্রন্থ হইতে

প্রথম অধ্যায়

টাকার বাজারের স্বরূপ

বাজার বলিতে আমরা সাধারণত এমন এক নির্দিষ্ট স্থান বুঝি, যেখানে পণ্যদ্রব্যসমূহ বিক্রয়ের জন্য প্রদর্শিত হয় এবং ক্রেতা-বিক্রেতার দল একত্রিত হইয়া কেনাবেচা সম্পন্ন করিয়া থাকে। কিন্তু টাকার বাজার বলিতে আমরা এরূপ কোন নির্দিষ্ট স্থান বুঝি না। টাকার বাজার কোন বিশেষ ভবনে অবস্থিত নহে। শহরের ব্যবসাপাড়ার নানা ভবনে বিক্ষিপ্তভাবে টাকার বাজার অবস্থিত। টাকার বাজারের এমন কোন কেন্দ্রীয় মিলনস্থান নাই, যেখানে ক্রেতা-বিক্রেতার দল পরস্পর মিলিত হইয়া তাহাদের কার্য সমাধা করিতে পারে। বস্তুত টাকার বাজারের সমস্ত কাজকর্ম সম্পন্ন হয় শহরের ব্যাঙ্ক ও দালালগণের অফিসসমূহে, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সংলগ্ন অঞ্চলে ও ক্লাইভ ষ্ট্রীটের মত ব্যবসাপাড়ার পথেঘাটে। যদিও ব্যাঙ্ক ও দালালগণের অফিস-সমূহ বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থিত, তথাপি তাহাদের মধ্যে একটা একাত্মভাব আছে—কেননা, টাকার বাজারের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত তথা সমগ্র বাজারের চৌহদ্দীর মধ্যে "মূল্য" পরিবর্তনের সমতা অতি দ্রুততার সহিত ঘটিয়া থাকে, এবং প্রতি ঘণ্টায় টাকার যোগান ও চাহিদার পরিবর্তনের সহিত তাহার প্রভাব বাজারের সর্বত্র অতি চরম তৎপরতার সহিত প্রতিফলিত হয়।

মোট কথা, টাকার বাজার সংগঠিত হয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্ক, এক্সচেঞ্জ ও জয়েণ্ট স্টক ব্যাঙ্কসমূহ, দেশীয় ব্যাঙ্কার, প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্ক, হুণ্ডীর দালাল প্রভৃতিকে লইয়া, এবং যে জিনিসের এখানে "কেনাবেচা" হইয়া থাকে, তাহা ঠিক টাকাপয়সা বলিতে আমরা সাধারণত যাহা বুঝি তাহা নহে। সেগুলি ক্রেডিট্ ইনস্ট্রুমেণ্টস্ বা অর্থপত্র মাত্র। টাকার বাজারের কাজ মোটামুটি দুই ধরনের—

(ক) দেশীয় অর্থের সহিত বৈদেশিক অর্থের বিনিময়; ও

(খ) বর্তমান অর্থের সহিত ভবিষ্যৎ অর্থের বিনিময়।

প্রথমোক্ত ধরনের কাজ হয় টাকার বাজারের সেই অংশে, যাহাকে বৈদেশিক বা বিলাতী হুণ্ডীর বাজার বলা হয়। বিভিন্ন এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কসমূহ ও বিলাতী



সৌদামিনী দেবী

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃত পেনসিল স্কেচ

তাঁহার Twentyfive Collotypes গ্রন্থ হইতে

হুণ্ডীর দালালগণ এই বাজারের প্রধান ব্যাপারী, এবং বৈদেশিক অর্থপত্রের বা হুণ্ডীর কেনাবেচা করাই ইহাদের প্রধান কাজ। সংবাদ-পত্রের বাজার-দর-পৃষ্ঠায় "ফরেন এক্সচেঞ্জ" শীর্ষক স্তবকে সব সময় সেই মূল্য দেখিতে পাওয়া যায়। প্রতি দেশের প্রতি একশত মুদ্রার টাকাগত দাম কত, তাহা সেখানে দেখানো হয়। কেবল পাউণ্ডের বেলায় টাকাপ্রতি শিলিং পেন্স হিসাবে দর প্রদর্শিত হয়। বৈদেশিক বাণিজ্যের নিমিত্ত যাহাদের বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হয় তাহারাই এই বাজারের প্রধান খরিদ্দার এবং এই বাজারের দর নির্ধারণে তাহারাই সাহায্য করে। বলা বাহুল্য, অর্থনীতির "যোগান-চাহিদা বিধি" (Law of Supply and Demand) অন্যান্য বাজারের ন্যায় টাকার বাজারেও কার্যকরী থাকে।

দ্বিতীয় ধরনের কাজ টাকার বাজারের নানা অংশে সম্পন্ন হয়। সেগুলি :

(ক) মূলধনের বাজার।

(খ) স্বল্পমেয়াদী কর্জের বাজার।

(গ) দেশী বিল বা হুণ্ডীর বাজার।

(ঘ) "তলবী" (Call money) ঋণের বাজার।

মূলধনের বাজারে সরকারী নূতন ঋণপত্র, নূতন কোম্পানির শেয়ার প্রভৃতির কাজ হয়। পুরাতন ঋণপত্র বা পুরাতন কোম্পানির শেয়ার প্রভৃতির যেখানে কাজ হয়, তাহাকে স্টক্ এক্সচেঞ্জ বা শেয়ার বাজার বলা হয়। মূলধনের বাজারে অর্থসরবরাহ করে তাহারা, যাহারা উদ্বৃত্ত অর্থ দ্বারা বর্তমানের জন্য পণ্যদ্রব্য না কিনিয়া সেই টাকা ভবিষ্যতে অধিক অর্থলাভের আশায় বিনিয়োগ করিতে চাহে। ভবিষ্যতে যে তাহারা ঠিক অধিক অর্থ পায় তাহা নহে, তাহার পরিবর্তে তাহারা সুদ পায়। সুদ আর কিছুই নহে, ভবিষ্যৎ অর্থের মূল্যের তুলনায় বর্তমান অর্থের মূল্যের পার্থক্য মাত্র।

স্বল্পমেয়াদী মূলধনের বাজার হইতে শিল্পপতি বা ব্যবসাদাররা তাহাদের কারবারের চলতি খরচ সংকুলানের নিমিত্ত অল্পদিনের মেয়াদে টাকা ধার করে। অধিকাংশ ব্যাঙ্কই এই ধরনের ব্যবসা করিয়া থাকে।

দেশী হুণ্ডীর বাজারে মাত্র এদেশীয় টাকার হুণ্ডীসমূহের কেনাবেচা হইয়া থাকে। এগুলি বৈদেশিক বাণিজ্য বা আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যসম্পর্কিত বিল



কুন্দমালা

বেথুন বিদ্যালয় শতবার্ষিকী সমিতির সৌজন্যে

বা ট্রেজারী বিলও হইতে পারে। যৌথ মূলধনী ব্যাঙ্কগুলি ও হুণ্ডীর দালালগণই প্রধানত এই বাজারের ব্যাপারী। হুণ্ডীগুলি সাধারণত মুদ্দতী প্রকৃতির (Payable after date) হইয়া থাকে— অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ না হইলে সেগুলির টাকা পাওয়া যায় না। সুতরাং দেখা যাইতেছে, এখানেও ভবিষ্যৎ অর্থের পরিবর্তে বর্তমান অর্থ প্রদত্ত হইতেছে, এবং ভবিষ্যৎ অর্থ ও বর্তমান অর্থের মধ্যে যে মূল্যের পার্থক্য তাহাকে "বাট্টা" (Discount) বলা হয়।

ট্রেজারী বিলসমূহ সরকারী "ভাসমান" (Floating debt) ঋণ মাত্র। প্রায় প্রতি সপ্তাহেই সরকার বাহাদুরের পক্ষ হইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ট্রেজারী বিল সাহায্যে বাজার হইতে কর্জগ্রহণ করে, এবং যাহাদের টেণ্ডার সর্বাপেক্ষা আকর্ষক হয়, মাত্র সেইগুলিই গৃহীত হয়। বলা বাহুল্য নানারূপ দরে এই সমস্ত ট্রেজারী বিল বিলিকৃত হয়, এবং ইহাদের গড় দরই সংবাদপত্রে Average Rate নামে প্রকাশিত হয়।

"তলবী" ঋণের (Call money) বাজারে "রাতারাতি"র (Over night) বা আট-দশ দিনের (Weekly fixtures) শর্তে কর্জ দেওয়া হয়। ইহার অন্তর্গত তপশীলভুক্ত ও অ-তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহ, আর কখনও কখনও খোদ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া। টাকার চাহিদার চাপের সময় ব্যাঙ্কসমূহ ও শেয়ার বাজারের কারবারী লোকেরা সাধারণত এই বাজার হইতে টাকা ধার লয়।

উপরে যে বিভিন্ন বাজারের কথা বলা হইল, প্রকৃতপক্ষে সেগুলি স্বতন্ত্র "বাজার" নহে। সেগুলি মূল টাকার বাজারেরই অংশবিশেষ মাত্র, এবং পরস্পর পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। এমন কি অনেক সময় একই প্রতিষ্ঠান টাকার বাজারের সব রকমই কাজ করিয়া থাকে।

এ কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, অর্থনীতির যোগান-চাহিদা বিধি (Law of Supply and Demand) অন্যান্য বাজারের ন্যায় টাকার বাজারেও কার্যকরী থাকে। যখন টাকার চাহিদা থাকে বেশি, তখন টাকার বাজারের "দর"ও থাকে বেশি; আর যখন যোগান অপেক্ষা চাহিদা থাকে কম, তখন টাকার বাজারের দর পায় হ্রাস।

ভারতবর্ষের টাকার বাজারের নিয়ামক হিসাবে কাজ করিতেছে রিজার্ভ

ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া। টাকার বাজারে অর্থের যোগান ও চাহিদার অসামঞ্জস্য হেতু যাহাতে কোনরূপ বিসদৃশ বা অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতির উদ্ভব না হয়, তাহার প্রতি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সর্বদা অবহিত হইয়া আছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

টাকার বাজারের সংগঠন

আগের অধ্যায়ে এ কথা বলা হইয়াছে যে, টাকার বাজার গঠিত হয় নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে লইয়া—(ক) রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, (খ) এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক, (গ) দেশীয় যৌথ ব্যাঙ্ক, (ঘ) দেশীয় ব্যাঙ্কার, ও (ঙ) প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্ক। এই সকল প্রতিষ্ঠানের একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে দেওয়া প্রয়োজন।

(ক) রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ভারতের কেন্দ্রীয় (Central) ব্যাঙ্ক। টাকার বাজারকে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুব্যবস্থিত রাখিবার নিমিত্তই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে। ইহা কোন সরকারী প্রতিষ্ঠান নহে। কিন্তু সরকারী প্রতিষ্ঠান না হইলেও, ইহা মানসম্ভ্রমে যে কোন সরকারী প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা হীন নহে। ইহা শেয়ার-হোলডার্‌স্ বা অংশীদারদের ব্যাঙ্ক। কিন্তু সাধারণ কোম্পানি-আইন অনুযায়ী ইহা গঠিত নহে। ইহা গঠিত হইয়াছে ১৯৩৪ সালের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া আইন (Act) অনুযায়ী।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মোট মূলধনের পরিমাণ পাঁচ কোটি টাকা। ইহা জনসাধারণই সরবরাহ করিয়াছে। সূত্রপাতে অংশীদারের মোট সংখ্যা ছিল ৯২,০৪৭ জন, কিন্তু ১৯৪৭ সালে অংশীদারদের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৪৫,০৩১ জন। অংশীদারদের ব্যাঙ্ক হইলেও ইহা সাধারণ যৌথমূলধনী কোম্পানির সামিল নহে। কেননা ইহার অংশীদাররা এক নির্দিষ্ট (শতকরা ৫ টাকার অনধিক; বর্তমানে ৪ টাকা ও পূর্বে ছিল ৩৷০ টাকা) লভ্যাংশ (Dividend) মাত্র পায়—মুনাফার বাকি উদ্‌বৃত্তাংশ কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রদত্ত হয়। (এই হিসাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আজ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারকে ৩০,৬২,৩৭,১[illegible] টাকা প্রদান করিয়াছে।) সুতরাং মুনাফার উদ্‌বৃত্তাংশ হইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পক্ষে রিজার্ভ ফণ্ড বা সংরক্ষিত ভাণ্ডার গঠন করা সম্ভবপর

নহে। এই নিমিত্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইবার সময় কেন্দ্রীয় সরকার সংরক্ষিত ভাণ্ডার গঠনের নিমিত্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে পাঁচ কোটি টাকা প্রদান করিয়াছিল। পাঁচ কোটি টাকা মূলধন ও পাঁচ কোটি টাকা সংরক্ষিত ভাণ্ডার—মোট এই দশ কোটি টাকা লইয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১৯৩৫ সালের ১লা এপ্রিল কাজ শুরু করিয়াছিল।

অন্যান্য দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের (যেমন বিলাতে ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড বা "থ্রেড্‌নীড্‌ল্ স্ট্রীটের বৃদ্ধা রমণী", আমেরিকায় ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, অস্ট্রেলিয়ায় কমন্‌ওয়েলথ্ ব্যাঙ্ক প্রভৃতি) মত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রধান কাজ হইতেছে কাগজী মুদ্রা প্রচার করা, ও ক্রেডিট প্রচলন ও নিয়ন্ত্রণ দ্বারা টাকার বাজারে সুশৃঙ্খলা ও সুস্থিতি রক্ষা করা। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া স্থাপনের পূর্বে কাগজী মুদ্রা প্রচলনের কর্তৃত্ব ছিল খোদ কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে, এবং ক্রেডিট প্রচলন ও নিয়ন্ত্রণের ভার ছিল ব্যাঙ্কসমূহের প্রতিভূস্বরূপ ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্কের উপর। তাহার অর্থ, নোট ছাপিয়া শিল্পবাণিজ্যের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী দেশের মধ্যে উহা প্রচার করিত সরকার বাহাদুর, এবং শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীগণকে কর্জপ্রদানের জন্য যে টাকার প্রয়োজন হইত তাহার প্রচলন ও নিয়ন্ত্রণ করিত ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া। এই দুইটি ব্যাপারই পরস্পর পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। কিন্তু এই দুইয়ের প্রচলন ও নিয়ন্ত্রণের উপর দ্বৈত কর্তৃত্ব থাকার দরুন টাকার বাজারের পরিস্থিতির মধ্যে অনেক সময়ই বৈসাদৃশ্য লক্ষিত হইত। এখন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া স্থাপনের ফলে টাকার বাজারের ঐ বৈসাদৃশ্য দূরীভূত হইয়াছে।

মোটামুটি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাজ হইতেছে—

(১) নোট প্রচলন ও নিয়ন্ত্রণ দ্বারা কারেন্সী-নীতি গঠন করা। এই সম্বন্ধে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককেই একচেটিয়া অধিকার দেওয়া হইয়াছে।

(২) তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের নিকট হইতে টাকা জমা রাখিয়া দেশের ক্রেডিট নীতি নিয়ন্ত্রণ করা।

(৩) সরকারের ব্যাঙ্কার হিসাবে কাজ করা (যথা, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারসমূহের হিসাবে টাকা গ্রহণ ও প্রদান করা; সরকারের প্রয়োজনীয় বিলাতী হুণ্ডী কেনা; সরকারী ঋণের তত্ত্বাবধান করা, প্রভৃতি)।

(৪) দেশের মধ্যে এক স্থান হইতে অপর স্থানে টাকা প্রেরণ (Remittance facilities) ও প্রাপ্তির ব্যবস্থা করা।

(৫) নোটের পরিবর্তে "টাকা" ও "ভাঙ্গানি" সরবরাহ করা।

(৬) চেক ক্লিয়ারিং-এর ব্যবস্থা করা (এখনও পর্যন্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এ কাজ গ্রহণ করে নাই)।

(৭) সরকারকে ও জনসাধারণকে আর্থিক তথ্য সরবরাহ করা।

(৮) পূর্বে নির্দিষ্ট দরের গণ্ডীর মধ্যে বিলাতী হুণ্ডী কেনাবেচা করিয়া বিনিময়ের সমতা রক্ষা করাও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাজ ছিল। কিন্তু সম্প্রতি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন সংশোধন করিয়া বাধ্যতামূলক ভাবে এক টাকা = ১৮ পেন্স হারে স্টার্লিং ক্রয়-বিক্রয় করিবার দায় হইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে।

(খ) আভিজাত্যে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক এ দেশের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ন্যায় ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কও সাধারণ কোম্পানি-আইন অনুযায়ী গঠিত নহে। ইহা গঠিত হইয়াছে ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গল (১৮০৬ খৃস্টাব্দে স্থাপিত), ব্যাঙ্ক অব বোম্বে (১৮৪০ খৃস্টাব্দে স্থাপিত ও ১৮৬৮ খৃস্টাব্দে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত) ও ব্যাঙ্ক অব মাদ্রাজ (১৮৪৩ খৃস্টাব্দে স্থাপিত)—এই তিনটি প্রেসিডেন্সী ব্যাঙ্কের সম্মিলনে ১৯২১ খৃস্টাব্দের ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া আইন (Act) অনুযায়ী। স্বতন্ত্রভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকাকালীন তিনটি প্রেসিডেন্সী ব্যাঙ্কের মোট আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ ছিল তিন কোটি পঁচাত্তর লক্ষ টাকা। কিন্তু ১৯২১ খৃস্টাব্দে মিলিত হইবার সময় ইহা বৃদ্ধি করা হয় পাঁচ কোটি বাষট্টি লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকায়।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইবার পূর্বে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অনেক কাজ করিত। যে সকল স্থানে নিজ অফিস আছে, সেই সকল স্থানে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক সরকারের ব্যাঙ্কার হিসাবে তহবিল রক্ষাকরণ, সরকারী ঋণ পরিচালনা, নূতন ঋণ গ্রহণের ব্যবস্থা প্রভৃতি কাজ সম্পন্ন করিত। এই কারণে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের পরিচালনায় সরকারী কর্তৃত্ব যথেষ্ট পরিমাণে বর্তমান ছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের মূল কাজ, যথা—নোট প্রচলন করার ক্ষমতা, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের ছিল না। তবে ক্রয়-বিক্রয়ের মরসুমের সময়

টাকার বাজারে অর্থ-প্রাচুর্য সৃষ্টির জন্য ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্ক সরকারী নোট-প্রচলন বিভাগ হইতে দেশীয় হুণ্ডীর বদলে বত্রিশ কোটি টাকা পর্যন্ত কর্জ পাইত। ইহা ব্যতীত ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্ক ছিল অন্যান্য ব্যাঙ্কসমূহের প্রতিভূ-স্বরূপ। আমানতী ও বিনিময় ব্যাঙ্কসমূহের নিকট হইতে উদ্‌বৃত্ত তহবিল জমা রাখিত, এবং প্রয়োজনের সময় নির্ভরযোগ্য জমানত (প্রধানত কোম্পানির কাগজ) রাখিয়া তাহাদিগকে টাকা ধার দিত। মনোনীত দেশীয় ব্যাঙ্কারের হুণ্ডী বাট্টা করিয়া ও ট্রেজারীর মধ্যস্থতায় এক স্থান হইতে অপর স্থানে টাকা প্রেরণের ব্যবস্থা করিয়া দেশের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের সহায়তা করিত। ক্লিয়ারিং হাউস পরিচালনার ভারও ইহার উপর ন্যস্ত ছিল (এখনও ন্যস্ত আছে)। সর্বোপরি, সুদের হার নিয়ন্ত্রণ দ্বারা ইহা টাকার বাজারকে সুস্থিত অবস্থায় রাখিত।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইবার পর ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্কের সহিত সরকারের সমস্ত সম্পর্ক মুখ্যভাবে প্রায় বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও টাকার বাজারে ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্ক এখনও একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। যে সকল স্থানে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিজস্ব কোন শাখা নাই, সেই সকল স্থানে ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্ক বর্তমানে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করিয়া থাকে। সরকারী তহবিল রক্ষার ভার, সরকারী ঋণ পরিচালনা প্রভৃতি কার্য হস্তচ্যুত হওয়ার ফলে, ১৯৩৫ খৃস্টাব্দে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইবার সময়, স্থানে স্থানে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তরফে কেন্দ্রীয় সরকারের কাজ করিবার জন্য ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্কের যে চুক্তি হইয়াছিল তাহার মেয়াদ ১৯৪৫ খৃস্টাব্দের ৩১ মার্চ তারিখে উত্তীর্ণ হয়। ১৯৪৫ খৃস্টাব্দের ১ এপ্রিল হইতে যে নূতন চুক্তি হইয়াছে, তাহাতে আগামী পাঁচ বৎসরের জন্য ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্কের পারিশ্রমিক সংশোধিত হইয়াছে। এই নূতন পরিবর্তিত চুক্তি অনুযায়ী গভর্মেণ্টের হিসাবে টাকার আদান-প্রদানের প্রথম ১৫০ কোটির উপর শতকরা এক আনা হারে, পরবর্তী ১৫০ কোটির উপর আধ আনা হারে, তৎপরবর্তী ৩০০ কোটির উপর এক পয়সা হারে ও অবশিষ্টাংশের উপর শতকরা আধ পয়সা হারে পারিশ্রমিক নির্দিষ্ট হইয়াছে।

সরকারী তহবিল রক্ষার ভার, সরকারী ঋণ পরিচালনা প্রভৃতি কার্য হস্তচ্যুত হওয়ার ফলে ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্কের পূর্বে যে সকল কাজ করিবার

ক্ষমতা ছিল না, সেই সকল কাজ করিবার স্বাধীনতা বর্তমানে (১৯৩৪ খৃস্টাব্দের "ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া সংশোধন আইন" অনুযায়ী) দেওয়া হইয়াছে। এখন ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্ক বিনিময়ের কাজ, বিদেশে ঋণ গ্রহণ ও অন্যান্য সাধারণ ব্যাঙ্কিং কাজ বহুলাংশে করিতে পাবে। (কিন্তু যে সকল বৈদেশিক হুণ্ডীর কাজ করে, তাহা নয় মাসের মুদ্দতী বা. কৃষিজাত মাল সম্পর্কিত হওয়া চাই।) মাল বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার দেওয়ার অধিকারও বর্তমানে ইহাকে দেওয়া হইয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শেয়ার, মিউনিসিপাল ঋণপত্র, সাধারণ যৌথমূলধনী কোম্পানির ঋণপত্র ও পূর্ণ-আদায়ীকৃত শেয়ার জমানত লইয়াও টাকা ধার দেওয়ার ক্ষমতা বর্তমানে ইহাকে দেওয়া হইয়াছে।

ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্ক বর্তমানে সরকারের ব্যাঙ্কার হিসাবে কাজ না করিলেও, বিপুল সংস্থানের অধিকারে টাকার বাজারের উপর ইহার প্রভাব এখনও অপ্রতিহতভাবে বজায় আছে। ইহা ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্কের আমানত, বিনিযুক্ত তহবিল, দাদন ও বিল সম্পত্তির পরিমাণ হইতে সহজে বুঝা যাইবে। ১৯৪৬ সালের ৩০শে জুন তারিখে ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্কের মূলধন ও সংরক্ষিত ভাণ্ডারের পরিমাণ ছিল ১১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা। ইহা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এই দুই হিসাবের মোট পরিমাণ অপেক্ষা ১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা বেশি। উক্ত তারিখে উহার আমানতের পরিমাণ ছিল ২৬৬,৭৭,১৬,২৬৯ টাকা বা ভারতের সবগুলি তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কের মোট আমানতের এক-চতুর্থাংশেরও অধিক (২৬'৬ শতাংশ), অর্থাৎ ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্ক বাদে অন্যান্য তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের মোট আমানতের এক-তৃতীয়াংশ। বিনিযুক্ত তহবিলের পরিমাণ ছিল ১৫৮,৬৪,০৪,৬২০ টাকা। দাদন ও বাট্টাকৃত বা ক্রীত বিলের পরিমাণ ছিল ৫৭,২২,৭২,৪৫৬ টাকা বা অন্যান্য তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের এক-ষষ্ঠাংশ। গৃহসম্পত্তি ও আসবাবপত্র প্রভৃতি হিসাবের পরিমাণ ছিল ১৪৮,৭৯,৮২২ টাকা। রোক টাকার পরিমাণ ছিল ৬০,৪০,০০,৬১৭ টাকা। এক কথায় বলিতে গেলে, ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্ক টাকার বাজারে একাই একশ'।

(গ) সংখ্যায় অল্প হইলেও এক্সচেঞ্জ বা বিনিময় ব্যাঙ্কসমূহ টাকার বাজারে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। এগুলির প্রায় সমস্তই বিদেশে ও

বৈদেশিক মূলধনে প্রতিষ্ঠিত। বিনিময় পত্র বা এক্সচেঞ্জ বিলের কেনাবেচা দ্বারা বৈদেশিক বাণিজ্যের সহায়তা করাই ইহাদের প্রধান কাজ। সেই জন্যই এগুলিকে বিনিময় বা এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক বলা হয়। দেশীয় মূলধনে গঠিত যৌথ ব্যাঙ্কসমূহের অভ্যুত্থানের পূর্বে, প্রেসিডেন্সী ব্যাঙ্কসমূহ ব্যতীত টাকার বাজারের লেনদেনের প্রায় একচেটিয়া অধিকার উহাদেরই ছিল। দেশীয় যৌথ ব্যাঙ্কসমূহ প্রতিষ্ঠিত হইবার পরেও এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কসমূহ জনসাধারণের নিকট হইতে সর্বাপেক্ষা অধিক আমানত গ্রহণ করিত। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) পর হইতে এ বিষয়ে এক বিপরীতগামী পরিবর্তন ঘটিয়াছে। নিম্নলিখিত তালিকা হইতে ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে।—

(কোটি টাকায় মোট আমানতের পরিমাণ)

বৎসর	বিনিময় ব্যাঙ্ক	যৌথ ব্যাঙ্ক "এ" শ্রেণী	যৌথ ব্যাঙ্ক "বি" শ্রেণী
১৮৭০	০'৫২	০'১৪	...
১৮৯০	৭'৫৩	২'১০	...
১৯০০	১০'৫০	৮'০৭	...
১৯১০	২৮'১৬	২৫'৬২	...
১৯২০	৭৪'৮০	৭১'১৪	২'১৩
১৯৩০	৬৮'১১	৬৩'২৫	৪'৩৯
১৯৪০	৮৫'৫৭	১১৩'৯৪	১১'০৪
১৯৪১	১০৬'৭৩	১৩৭'৬৪	১১'৪৫
১৯৪২	১১৬'৮৫	২০২'৭৫	১৫'৬০
১৯৪৩	১৪০'১৯	৩৩৯'০০	২০'৯০

এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কসমূহের প্রধান কাজ হইতেছে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের নিমিত্ত টাকার যোগান দেওয়া। চলতি (Current), স্থির (Fixed) ও সঞ্চয়মূলক (Savings)—এই তিন হিসাবেরই আমানত ইহারা গ্রহণ করে। বাণিজ্য সম্পর্কে ও স্বর্ণরৌপ্য আমদানি ব্যাপারেই ইহারা প্রধানত টাকা নিযুক্ত রাখে। রপ্তানির পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত ও আমদানির পরবর্তী কালে দেশের মধ্যে মাল চলাচল ব্যাপারে টাকার যোগান দিয়া তাহারা দেশের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের সহায়তা করে। সাম্প্রতিক কালে তাহারা ব্যবসাদার ও শিল্প-

পতিগণকেও স্বল্পমেয়াদে টাকা ধার দিয়া সাহায্য করিতেছে। দেশের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে টাকার যোগান দিয়া তাহারা দেশীয় যৌথ ব্যাঙ্কসমূহের সহিত অন্যায় প্রতিযোগিতা করে—এই অনুযোগ তাহাদের বিরুদ্ধে প্রায়ই শোনা যায়। তাহাদের প্রধান অফিসসমূহ বিলাতে অবস্থিত থাকার দরুন বিলাতের টাকার বাজার হইতে টাকা আমদানি করা তাহাদের পক্ষে সহজ-সাধ্য হয়, এবং এই কারণে ভারতীয় টাকার বাজারে তাহাদের প্রভাব সন্তোষ-জনকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পক্ষে সব সময় সম্ভবপর হয় না।

এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কসমূহকে সাধারণত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়—(ক) যাহাদের কাজ প্রধানত ভারতেই নিবদ্ধ; এবং (খ) যাহাদের কাজ ভারতের বাহিরেই অধিক পরিমাণে নিবদ্ধ। ১৯৪৩ খৃস্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে ভারতে 'ক'-শ্রেণীর বিনিময় ব্যাঙ্ক ছিল পাঁচটি ও 'খ'-শ্রেণীর এগারটি। মোট এই ষোলটি ব্যাঙ্কের গৃহীত মূলধনের পরিমাণ ছিল ৬০,৪৬৭,০০০ পাউণ্ড, সংরক্ষিত ভাণ্ডার ৪৬,৩৪০,০০০ পাউণ্ড, ভারতের বাহিরে গৃহীত আমানত ১,৯০৯,৩২৫,০০০ পাউণ্ড, ভারতে গৃহীত আমানত ১৪০,১৯,১৩,০০০ টাকা, ভারতের বাহিরে রক্ষিত রোক টাকার পরিমাণ ৭৪৭,১৫৯,০০০ পাউণ্ড ও ভারতে রক্ষিত রোক টাকার পরিমাণ ১৭,২৪,৪৭,০০০ টাকা। প্রথমোক্ত শ্রেণীর ব্যাঙ্কসমূহের আমানতের ২৫ শতাংশের অধিকভাগ ভারতেই গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যাঙ্কসমূহের ভারতে গৃহীত আমানতের পরিমাণ ২৫ শতাংশের কম। চাটার্ড ব্যাঙ্ক, ইস্টার্ন ব্যাঙ্ক, মার্কেন্টাইল ব্যাঙ্ক, ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক প্রভৃতি প্রথমোক্ত শ্রেণীর ব্যাঙ্ক ও লয়েডস্ ব্যাঙ্ক, গ্রিণ্ডলে অ্যাণ্ড কোম্পানি, নেদারল্যাণ্ডস্ ট্রেডিং কোম্পানি, নেদারল্যাণ্ডস্ ইণ্ডিয়ান কমার্সিয়াল ব্যাঙ্ক, হংকং সাংহাই ব্যাঙ্কিং করপোরেশন, ন্যাশনাল সিটি ব্যাঙ্ক অব নিউ ইয়র্ক, আমেরিকান্ এক্সপ্রেস্ কোম্পানি প্রভৃতি দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ১৯৪৩ খৃস্টাব্দে এই সকল ব্যাঙ্কের ভারতে গৃহীত আমানতের পরিমাণ ছিল—

'ক'-শ্রেণীর ব্যাঙ্ক ... ... ৮৮·২৩ কোটি টাকা

'খ'-শ্রেণীর ব্যাঙ্ক ... ... ৫১·৯৬ কোটি টাকা

কিন্তু এই আমানতের কত অংশ টাকা এ দেশে বিনিযুক্ত, সে সম্বন্ধে কোন সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। বহির্বাণিজ্যের সহিতই ইহাদের সম্পর্ক বেশি বলিয়া, এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কসমূহের অফিসগুলি সাধারণত বন্দর-শহরে অবস্থিত—

দেশের অন্তবর্তী শহরসমূহে তাহাদের শাখা-অফিস খুব কম।

(ঘ) দেশীয় যৌথ ব্যাঙ্কসমূহ ভারতীয় কোম্পানি-আইন অনুযায়ী গঠিত। এ-যাবৎকাল এগুলি কোম্পানি-আইন অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু সম্প্রতি তাহাদের নিয়ন্ত্রণ নিমিত্ত একটি স্বতন্ত্র আইনের খসড়া কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করা হইয়াছে। এই সম্পর্কে স্বার্থসম্বলিত জনসাধারণ ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মতামত গ্রহণের নিমিত্ত একটি প্রস্তাব ১৯৪৪ খৃস্টাব্দের ২০ নভেম্বর তারিখে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় গৃহীত হয়। এই সকল মতামত ১৯৪৫ সালের মার্চ মাসের শেষভাগে পাওয়া যায়, ও ১১ এপ্রিল তারিখে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভা বিলটি সিলেক্ট কমিটির নিকট প্রেরণ করে। সম্প্রতি বিলটিকে আবার পরিবর্তিত আকারে ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করা হইয়াছে।

ইণ্ডিয়ান কোম্পানিজ্ অ্যাক্টের XA-ভাগে ব্যাঙ্কসম্পর্কিত যে সকল বিধান নিবদ্ধ ছিল, সেইগুলিই সামান্য পরিবর্তনের সহিত ও আমানতকারীদের স্বার্থ যাহাতে অব্যাহত থাকে ও এ দেশে ব্যাঙ্কিং ব্যবসায় যাহাতে সুষ্ঠুভাবে গঠিত হইতে পারে, এইরূপ কতকগুলি নূতন বিধান এই বিলে নিবদ্ধ করা হইয়াছে। ইহার মূল বৈশিষ্ট্য : (ক) আমানতের নিরাপত্তা ও আমানত-কারী চাহিবামাত্র উহা প্রত্যর্পণ করিবার ক্ষমতার দিক দিয়া ব্যাঙ্কিং-এর নূতন সংজ্ঞা নিরূপণ। (খ) নিম্নতম মূলধন নির্ণয়। (গ) ব্যাঙ্কসমূহ যাহাতে ব্যাঙ্কিং ভিন্ন অন্য কোন ব্যবসায়ের ঝুঁকি না লয় তজ্জন্য নিষেধমূলক বিধান। (ঘ) ব্রিটিশ ভারতের বাহিরে রেজেস্ট্রিকৃত ব্যাঙ্কসমূহকে আইনের মধ্যে আনা। (ঙ) ব্যাঙ্ক-গুটানো প্রণালী সম্পর্কে তৎপরতা। (চ) প্রয়োজনমত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক যে কোন ব্যাঙ্কের হিসাব-বহি প্রভৃতি পরীক্ষা ও পরিদর্শন। (ব্যাঙ্কিং আইন পাস হইতে দেরি হইবার সম্ভাবনা থাকায় ১৯৪৬ সালের জানুয়ারি মাসে একটি অর্ডিন্যান্স প্রণয়ন করিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে যে কোন ব্যাঙ্কের হিসাব পরিদর্শনের অধিকার দেওয়া হইয়াছে।) (ছ) আমানত-কারীদের স্বার্থবিরোধী কার্যকলাপের নিমিত্ত কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা। (জ) নূতন ধরনের ব্যালান্স্ সীট্ প্রস্তুত ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট সাময়িক হিসাব-তালিকা প্রেরণ সম্বন্ধে নির্দেশ।

দেশীয় ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে যেগুলি বৃহৎ সেগুলি সাধারণত সকল রকম

ব্যাঙ্কিং-এরই কাজ করে। তাহারা আমানত গ্রহণ করে, টাকা ধার দেয়, হুণ্ডী বাট্টা করে, গ্রাম হইতে বন্দর পর্যন্ত ও বন্দর হইতে পরিবেশক শহর পর্যন্ত মাল চলাচলে টাকার যোগান দেয়। যদিও ব্যবসাদার ও শিল্পপতিদের তাহারা চলতি খরচের জন্ত সব সময়ই টাকা ধার দেয়, কৃষকদের তাহারা বড় একটা টাকা ধার দেয় না। কৃষিসম্পর্কিত ব্যাপারে টাকার যোগান দেওয়া তাহারা তাহাদের সাধারণ কাজের অঙ্গ বলিয়া মনে করে না। গৌণভাবে তাহারা অবশ্য কৃষির সাহায্য করে। যেমন, ব্যাপারীদের তাহারা টাকা ধার দেয়, এবং ব্যাপারীরা সেই টাকা গ্রাম্য ব্যবসায়ীদের দাদন দেয়। কোন কোন ব্যাঙ্ক অবশ্য মুখ্যভাবেও কৃষিজাত মাল, গহনাপত্র ও জমিজমা বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার দেয়।

যৌথ ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে "বৃহত্তম পঞ্চ"-এর নাম যথাক্রমে—(১) সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, (২) ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, (৩) এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক, (৪) পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, ও (৫) ব্যাঙ্ক অব বরোদা। ইহাদের মধ্যে এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক নামত "দেশীয়" ব্যাঙ্ক হইলেও চাটার্ড ব্যাঙ্কের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত থাকার দরুন কার্যত বিদেশীয়গণের কর্তৃত্বে পরিচালিত হইয়া থাকে।

যৌথ ব্যাঙ্কসমূহের অভ্যুত্থান খুব ধীরে ধীরে ঘটিয়াছে। গত শতাব্দীর সপ্তম দশকে এ দেশে প্রথম যৌথ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। বর্তমান শতাব্দীর সূচনা পর্যন্ত তাহাদের সংখ্যা ছিল মাত্র চৌদ্দ-পনেরোটি। স্বদেশীযুগের অনুপ্রেরণায় গত মহাযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) পর হইতেই তাহাদের প্রভাব বিশেষভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহা নিম্নলিখিত তালিকাগুলি হইতে পরিষ্কার বুঝা যাইবে :

মূলধন ও সংরক্ষণ ভাণ্ডার (হাজারে লিখিত)

বৎসর	এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক (পাউণ্ড)	ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্ক (টাকা)	যৌথ ব্যাঙ্ক (টাকা)
১৯১৮	৩৯,৪৪৮	৭,১৯,৫৮*	৬,৬৫,১২
১৯৪৩	১০৬,৮০৭	১১,৪৮,০০	৩০,৮৫,০০

আমানত (হাজার টাকায় লিখিত)

বৎসর	এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক	ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্ক	যৌথ ব্যাঙ্ক
১৯১৮	৬১,২৬,৩৩	৫৯ ৬২,০৩*	৪২,১৪,৮৩
১৯৪১	১৪০,১৯,১৩	২,১৪,৫৩,০০	৩৬৬,৮৯,০০

* বেঙ্গল ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্ক অব বোম্বে ও মাদ্রাজ ব্যাঙ্কের সম্মিলিত হিসাব।

রোক তহবিল (হাজার টাকায় লিখিত)

১৯১৮	২২,২৯,০৮	১৭,০৭,৬২*	৯,৫৮,৪৮
১৯৪৩	১৭,২৪,৪৭	৫৩,৩৬,০০	৯১,৭২,০০

আমানতের অনুপাতে রোক টাকা (শতাংশ)

	১৯১৮	১৯৪৩
ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্ক	২৮'৬*	২৪'৯
এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক	৩৬'৩	১২'৩
যৌথ ব্যাঙ্ক	২২'৭	২৫'০

১৯১৮ হইতে ১৯৪৩ খৃস্টাব্দের ভিতর এই সকল ব্যাঙ্কের প্রধান ও শাখা অফিসসমূহের সংখ্যাবৃদ্ধিও এ সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোকপাত করে।

ব্যাঙ্কের প্রধান ও শাখা-অফিস বৃদ্ধি

	১৯১৮		১৯৪৩	
	প্রধান অফিস	শাখা অফিস	প্রধান অফিস	শাখা অফিস
ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্ক	৩	৬৮	৩	৩৯৮
এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক	০	৪৮	০	৮৪
যৌথ ব্যাঙ্ক	৪৭	১৯৭	৫১৮	২৫৬১

যৌথ ব্যাঙ্কসমূহের উন্নতি নানা কারণে ঘটিয়াছে। তন্মধ্যে প্রধান—ভারতের শিল্পোন্নতি, ভারতীয়দের সঞ্চয়-অভ্যাসবৃদ্ধি, জমিদারী ব্যবসায়ের মন্দা প্রভৃতি।

"ভারতে ব্যাঙ্কসমূহের সংখ্যাঙ্ক তালিকা" নামক পুস্তকে ভারতের যৌথ ব্যাঙ্কসমূহকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়—(ক) যাহাদের মূলধন ও সংরক্ষণ-ভাণ্ডারের পরিমাণ পাঁচ লক্ষ টাকার অধিক ; (খ) যাহাদের মূলধন ও সংরক্ষণ-ভাণ্ডারের পরিমাণ এক লক্ষ টাকার অধিক ; কিন্তু পাঁচ লক্ষ টাকার অনধিক ; (গ) যাহাদের মূলধন ও সংরক্ষণ-ভাণ্ডারের পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার টাকার অধিক, কিন্তু এক লক্ষ টাকার অনধিক ; ও (ঘ) যাহাদের মূলধন পঞ্চাশ হাজার টাকার অনধিক। এই চারি শ্রেণীর ব্যাঙ্কের বিভিন্ন হিসাবের সংখ্যাঙ্ক পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল :

* বেঙ্গল ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্ক অব বোম্বে ও মাদ্রাজ ব্যাঙ্কের সম্মিলিত হিসাব।

'ক'-শ্রেণীর ব্যাঙ্ক (হাজার টাকায় লিখিত)

বৎসর	সংখ্যা	মূলধন	সংরক্ষণ ভাণ্ডার	আমানত	রোক টাকা
১৮৭০	... ২	৯,৮৩	১,৮২	১৩,৯৫	৫,০৭
১৯০০	... ৯	৮২,১২	৪৫,৬০	৮,০৭,৫২	১,১৯,০৪
১৯১০	... ১৬	২,৭৫,৬৬	১,০০,৫৫	২৫,৬৫.৮৫	২,৮০,২৫
১৯২০	... ২৫	৮,৩৭,০২	২,৫৫,৪৬	৭১,১৪,৬৪	১৬,৩০,৭০
১৯৩০	... ৩১	৭,৪৭,৩১	৪,৪২,৮৫	৬৩,২৫,৫১	৭,৬৭,৯১
১৯৪৩	... ৯২	১৮,৬৭,১১	৭,৮০,৫৯	৩,৩৮,৯৯,০১	৮২,৯২,৭৭
'খ'-শ্রেণীর ব্যাঙ্ক (হাজার টাকায় লিখিত)					
১৯২০	... ৩৩	৬১,৪২	১৯,৯৫	২,৩৩,৪৬	৪১,৯১
১৯৩০	... ৫৭	৯০,৫৭	৫০,২৮	৪,৩৯,১৮	৫২,১৯
১৯৪৩	...১৫২	২,৪৪,৫৮	৭২,০২	২০,৮৯,৭৭	৬,৬৯,০১
'গ'-শ্রেণীর ব্যাঙ্ক (হাজার টাকায় লিখিত)					
১৯৩৯	...১১২	৬০,৯৬	১৬,১৯	২৯৮,১৭	৫১,৯৮
১৯৪৩	...১৪১	৭৮,০৪	২০,২২	৬২৫,৯৬	১৯৭,২২
'ঘ'-শ্রেণীর ব্যাঙ্ক (হাজার টাকায় লিখিত)					
১৯৩৯	...৪০০	৬১,৫২	১৪,২৭	২,৬৩,২৩	৩৮,০৩
১৯৪২	...১৩৩	১৮,২১	৪,২৯	৭৪,৮৬	১৩,২০

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কিন্তু ব্যাঙ্কসমূহকে অন্যভাবে মাত্র দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করে—(ক) তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক, ও (খ) অ-তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক। তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে দেশীয় যৌথ ব্যাঙ্ক ও এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক এই উভয় শ্রেণীরই ব্যাঙ্ক আছে। কোন ব্যাঙ্কের মূলধন ও সংরক্ষণ-ভাণ্ডারের পরিমাণ পাঁচ লক্ষ টাকার অধিক না হইলে সেই ব্যাঙ্ক তপশীলভুক্ত হয় না। গত ৪ঠা জুলাই ১৯৪৭ তারিখে তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের আমানত, রোক টাকা, দাদন প্রভৃতির পরিমাণ নিম্নোক্ত সংখ্যাঙ্ক তালিকায় বিবৃত হইয়াছে (হাজার টাকায় লিখিত):

(ক)	চলতি হিসাবের আমানত	...	৬৬৮,১৮,৭১
(খ)	স্থির হিসাবের আমানত	...	৩৪৩,৭১,১৬
(গ)	ভারতে রক্ষিত রোক টাকা	...	৩,১৭,১৪

(ঘ)	রিজার্ভ ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকা	...	৯১,১৭,৮৭
(ঙ)	ভারতে দাদন	...	৪১৩,৮৬,৬১
(চ)	ভারতে বাট্টাকৃত বিল	...	১৫,৯৮,২৯

১৯৪৫ খৃস্টাব্দের ১৫ই ফেব্রুয়ারি হইতে অ-তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলিকেও কতকগুলি শর্তে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির ন্যায় আমানত রাখিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। এইরূপ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে আমানত গ্রহণ করা অবশ্য সম্পূর্ণভাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিজ বিচারের উপর নির্ভর করে, এবং যে সকল শর্তে এইরূপ আমানত গ্রহণ করা হয়, সেইগুলি যথাক্রমে—

(ক) অ-তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহ তাহাদের কর্মের অনুপাতে নিম্নতম ব্যালান্স্ রাখিবে, কিন্তু কোন ক্ষেত্রে ইহার পরিমাণ দশ হাজার টাকার কম হইবে না। এইরূপ আমানত রক্ষণের জন্য যে স্থলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে বেশি পরিমাণ শ্রম করিতে হইবে, সে ক্ষেত্রে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই নিম্নতম পরিমাণ বাড়াইতে পারিবে, এবং সেই পরিমাণ টাকা যদি ঐ ব্যাঙ্ক রাখিতে না পারে, তাহা হইলে তাহার আমানতী হিসাব বন্ধ করিয়া দিবে। (খ) এইরূপ আমানত সাধারণ চলতি হিসাব বলিয়া গণ্য করা হইবে না, এবং তৃতীয় ব্যক্তির নামে কোন চেক্ কাটা চলিবে না। এক ব্যাঙ্ক ও অন্য কোন ব্যাঙ্কের মধ্যে লেন-দেন এবং দেশান্তরে অর্থ প্রেরণের জন্যই এইরূপ টাকা ব্যবহৃত হইবে। গত ৩০ জুন ১৯৪৭ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক মোট ১৩টি অ-তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ককে আমানত রাখিবার সুযোগ দিয়াছে। এই বৎসরে ৭৮টি অ-তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক ও ৫টি দেশীয় ব্যাঙ্কারকে কনসেশন রেটে বা সুবিধাজনক হারে স্থানান্তরে অর্থ প্রেরণের সুবিধা দেওয়া হইয়াছে।

নিম্নলিখিত তালিকায় অ-তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের সংখ্যা, আমানত ও রোক টাকার পরিমাণ দেখানো হইয়াছে (তারিখ ৩১ ডিসেম্বর ১৯৪৬)—

ব্যাঙ্কের সংখ্যা···৬৫৯

চলতি ও স্থির হিসাবের আমানত···৭৮৪৪'১৩১ কোটি

রোক টাকার অনুপাত (শতকরা)···৮'৪ ভাগ

(ঙ) দেশীয় টাকার বাজারের প্রধান ব্যাপারী দেশীয় ব্যাঙ্কার। ইহাদের সংগঠন ও কর্মপ্রণালী সম্বন্ধে বিশেষ তথ্য পাওয়া যায় না। ঐ সকল দেশীয়

ব্যাঙ্কার জনসাধারণের নিকট হইতে আমানত গ্রহণ করিয়া ঐ টাকা হুণ্ডীর কারবারে ও কর্জপ্রদানে নিযুক্ত করে। যৌথ ব্যাঙ্কসমূহের অভ্যুত্থানের পূর্বে এ দেশে ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের একচেটিয়া অধিকার এই সকল দেশীয় ব্যাঙ্কারদেরই হাতে ছিল। সে সময় তাহাদের প্রধান কাজ ছিল হুণ্ডীর সাহায্যে এক স্থান হইতে অপর স্থানে টাকা পাঠানো ও তাহাদের উপর কাটা হুণ্ডীর টাকা আদাতাকে দেওয়া। যৌথ ব্যাঙ্কসমূহ প্রতিষ্ঠার পর তাহাদের ব্যবসায়ের যথেষ্ট অবনতি ঘটিয়াছে বটে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত তাহারা টাকার বাজারের কাজ যথেষ্ট পরিমাণে করে। যৌথ ব্যাঙ্কসমূহেব মত দেশীয় ব্যাঙ্কারগণ বৈদেশিক বাণিজ্যের বিশেষ সহায়তা করে না। কিন্তু দেশের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে টাকার যোগান দিয়া ও দেশীয় শিল্পসমূহকে চলতি মূলধন সরবরাহ করিয়া তাহারা যথেষ্ট সাহায্য করে। কৃষিসম্পর্কিত ব্যাপারে তাহারা মুখ্যভাবে সাহায্য না করিলেও, গৌণভাবে গ্রাম্য শাহুকারের মধ্যস্থতায় টাকা সরবরাহ করে। কখনও কখনও তাহারা শিল্পসমূহকে দীর্ঘ মেয়াদী মূলধন দিয়াও সাহায্য করে। অনেক সময় তাহারা যৌথ কোম্পানিসমূহের ঋণপত্র (Debentures) ও অংশপত্র (Shares) জমানত রাখিয়াও টাকা ধার দেয়।

কলিকাতার দেশীয় ব্যাঙ্কারগণকে চারি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়—(ক) মারোয়াড়ী, (খ) মুলতানী, (গ) বাঙ্গালী, ও (ঘ) গুজরাটী। আগেকার দিনে ইহারা সকলে মিলিয়া কলিকাতার টাকার বাজারে আনুমানিক প্রায় ২ কোটি টাকা খাটাইত। কিন্তু বর্তমানে ইহাদের ব্যবসায়ে মন্দা লাগার জন্য তাহাদের মোট বিনিযুক্ত টাকার পরিমাণ ৬০।৭০ লক্ষে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

ভারতীয় দেশীয় ব্যাঙ্কারগণের মধ্যে যাহারা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে সুবিধামূলক হারে এক স্থান হইতে অপর স্থানে টাকা প্রেরণ করিতে পারে, তাহাদের নাম নিম্নে দেওয়া গেল :

(১) বালকরাম দ্বারকাদাস, সিমলা।

(২) ভাওলাল ব্যাঙ্কারস্, সাজাহানপুর।

(৩) দুর্গাশাহ মোহনলালশাহ, রানিখেত।

(৪) রাণছোড় ভাই ভাইচাঁদ ভাই সুরা, বোম্বাই।

(৫) ইউনিয়ান ব্যাঙ্কিং সারভিস্, চিপলুন।

(চ) গ্রামের টাকার বাজারের প্রধান ব্যবসায়ী মহাজন। ব্যাঙ্ক যেমন অপরের টাকা খাটায়, মহাজন খাটায় নিজের টাকা। (মহাজনী কারবার সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ "গ্রামের টাকার বাজার" শীর্ষক অধ্যায়ে দেখুন।)

(ছ) যদিও টাকার বাজারের উপর প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্কের প্রভাব খুব বেশি নহে, তথাপি এ স্থলে এই ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। ইহা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কসমূহকে লইয়া গঠিত এবং ইহার কোন ব্যক্তিবিশেষ অংশীদার নাই। ইহার প্রধান কাজ সভ্য ব্যাঙ্কসমূহের উদ্‌বৃত্ত তহবিল গচ্ছিত রাখা, এবং কৃচ্ছ্রতার সময় তাহাদের টাকা ধার দিয়া সাহায্য করা। যদিও প্রয়োজনের সময় সভ্য ব্যাঙ্কসমূহের প্রাদেশিক ব্যাঙ্কের নিকট হইতেই টাকা ধার লইবার কথা, তথাপি কার্যত তাহারা পরস্পর পরস্পরের নিকটও সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকে।

তৃতীয় অধ্যায়

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া

দেশের মধ্যে কারেন্সী প্রচলন ও ক্রেডিট নিয়ন্ত্রণের জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে দুইটি স্বতন্ত্র বিভাগ রাখিতে হইয়াছে। প্রচলন-বিভাগ হইতে নোট বা কাগজী মুদ্রা প্রচার করা হয় ও ব্যাঙ্কিং-বিভাগের সাহায্যে দেশের মধ্যে ক্রেডিট নিয়ন্ত্রণ করা হইয়া থাকে। এই সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতি শুক্রবার বিভিন্ন বিভাগের হিসাব-তালিকা প্রকাশ করে। গত ১১ জুলাই ১৯৪৭ সালে যে হিসাব-তালিকা প্রকাশ করা হইয়াছিল তাহা পর-পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করা হইল :

প্রচলন-বিভাগ (Issue Department)

দায়	হাজার টাকা	সম্পত্তি	হাজার টাকা
প্রচারিত নোট—		(ক) স্বর্ণমুদ্রা ও স্বর্ণপিণ্ড—	
ব্যাঙ্কিং বিভাগে রক্ষিত	৪৭,৯৫,৬৩	ভারতে রক্ষিত	৪৪,৪১,৪৫
প্রচলিত নোট	১২১৭,৫৩,৩৯	বিদেশে রক্ষিত	– ——
		স্টার্লিং সম্পত্তি	১১৩৫,৩২,৮৯
		(খ) রৌপ্যমুদ্রা	২৭,৯০,৫৫
		কোম্পানির কাগজ	৫৭,৮৪,১৩
		দেশী হুণ্ডী	———
মোট দায়	১২৬৫,৪৯,০২	মোট সম্পত্তি	১২৬৫,৪৯,০২

ব্যাঙ্কিং-বিভাগ (Banking Department)

দায়	হাজার টাকা	সম্পত্তি	হাজার টাকা
গৃহীত মূলধন	৫,০০,০০	নোট	৪৭,৯৫,৬৩
রিজার্ভ ফণ্ড	৫,০০,০০	রৌপ্যমুদ্রা*	৮,৭৪
আমানত—		অন্যান্য মুদ্রা	১,৫৩
(ক) সরকারী		ট্রেজারী বিল	৩,৪১,২৪
(১) কেন্দ্রীয় সরকারের	৩৮২,৬৩,৫১	বিদেশে রক্ষিত	৪১২,৪৪,৮১
(২) অন্যান্য সরকারের	১৩,৩০,২৬	সরকারকে কর্জ	৫,৯৪,০০
(খ) ব্যাঙ্কসমূহের	৮৯,২৮,০৬	অপরকে কর্জ	২৩,৩৫
(গ) অপরের	৩৬,৮১,৪৬	বিনিযুক্ত তহবিল	৬৯,৩১,৪২
আদায়ের জন্য বিল	৩,০৮,৭৭	অন্যান্য সম্পত্তি	৫,৪৩,৭৫
অন্যান্য দায়	৯,৭২,৪১		
মোট দায়	৫৪৪,৮৪,৪৭	মোট সম্পত্তি	৫৪৪,৮৪,৪৭

* এক টাকার নোট (এগুলি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রচারিত হয় না; সরকার বাহাদুর কর্তৃক প্রচারিত) আইন অনুসারে রৌপ্যমুদ্রা বলিয়া পরিগণিত।

উপরে প্রচলন-বিভাগের হিসাব-তালিকায় দায়ের দিকে দেখানো হইয়াছে দেশের বাণিজ্য, ব্যবসায় প্রভৃতির প্রয়োজনানুযায়ী কি পরিমাণ নোট প্রচারিত হইয়াছে। যেহেতু কাগজী মুদ্রা ছাপিয়া দেশ প্লাবিত করা বাঞ্ছনীয় নহে, সেই হেতু সম্পত্তির দিকে ইহার পিছনে জমানতস্বরূপ সমপরিমাণ সম্পত্তি রাখিতে হইয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনে এইরূপ নির্দেশ আছে যে, এই সম্পত্তির অন্তত শতকরা ৪০ ভাগ স্বর্ণমুদ্রা, স্বর্ণপিণ্ড ও স্টার্লিং সম্পত্তি স্টার্লিং সম্পত্তি বলিতে (ক) রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডে রক্ষিত। উদ্বৃত্ত (খ) ৯০ দিনের অনধিক মেয়াদী ও যুক্তরাষ্ট্রের কোন স্থানে প্রদেয় এমন বিলাতী হুণ্ডী যাহার উপর প্রেরক (drawer), গ্রাহক (drawee) ও সহিদাতার (indorser) মধ্যে অন্তত দুইজনের সহি আছে, এবং (গ) পাঁচ অপেক্ষা অনধিক বৎসরের মেয়াদী যুক্তরাজ্যের ঋণপত্র বুঝায়—থাকা চাই। ইহার মধ্যে আবার স্বর্ণমুদ্রা ও স্বর্ণপিণ্ডের মোট মূল্য কখনও ৪০ কোটি টাকার কম হইবে না। (এই হিসাবে সোনার দাম তোলা-প্রতি ২১৶১০ পাই হারে ধরা হয়।) অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি লইয়া স্বল্পকালের নিমিত্ত এইরূপ সম্পত্তির অনুপাত শতকরা ৪০ ভাগেরও কম রাখিতে পারা যায়, কিন্তু তজ্জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে নির্দিষ্ট হারে শুল্ক প্রদান করিতে হয়। এ কথা এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, এই অনুপাত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বরাবর রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। ১৯৩৫ খৃস্টাব্দের এপ্রিল মাসে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যখন এই বিভাগের ভার গ্রহণ করে তখন এই অনুপাত ছিল ৫০·০২, এবং ১৯৩৫ খৃস্টাব্দের জুলাই মাসে যখন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নিয়মিতভাবে কার্য আরম্ভ করে তখন অনুপাত ছিল ৫৭·৭৫। প্রথম বৎসরের গড় অনুপাত ছিল ৫৫·৫৮ শতাংশ। উপরে ১৯৪৭ খৃস্টাব্দের ১১ জুলাই তারিখের যে হিসাব-তালিকা উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহাতে অনুপাত দেখানো হইয়াছে ৯৩·২২ শতাংশ। বলা বাহুল্য যে প্রচলন-বিভাগের সম্পত্তির মূল্যনিরূপণের নিমিত্ত স্বর্ণের মূল্য ধার্য করা হয় প্রতি টাকায় ৮·৪৭৫৯২ গ্রেন করিয়া বা তোলা প্রতি ২১৶১০ পাই। সুতরাং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব-তালিকায় স্বর্ণের যে মূল্য দেখানো হইয়াছে তাহা অপেক্ষা তাহার বাজারমূল্য অনেক বেশি।

এইবার দেখা যাউক রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কি ভাবে কারেন্সী নিয়ন্ত্রণ করে। আমরা দেখিয়াছি যে প্রচলন-বিভাগের সম্পত্তি মোটামুটি চারি প্রকার।

যথা—(১) স্বর্ণমুদ্রা ও স্বর্ণপিণ্ড, (২) স্টার্লিং সম্পত্তি, (৩) এক টাকার মুদ্রা ও নোট, ও (৪) সরকারী ঋণপত্র ও ট্রেজারী বিল। এই সম্পত্তি চতুষ্টয়ের যে কোন এক প্রকারের পরিমাণ বৃদ্ধি ও তৎপরিমাণ নোট প্রচলন দ্বারা কারেন্সীর প্রসার করা যাইতে পারে। ঠিক সেইভাবে নোট প্রচলন কমাইয়া দিয়া ও তৎপরিমাণ সম্পত্তি হ্রাস করিয়া কারেন্সীর সংকোচসাধন করা যায়। সাধারণত কারেন্সী প্রসারের সময় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নিজ ব্যাঙ্কিং বিভাগ হইতে সম্পত্তি প্রচলন-বিভাগে স্থানান্তরিত করিয়া বা নূতন (ad hoc) ট্রেজারী বিল সৃষ্টি করিয়া, তৎপরিমাণ নোটপ্রচলন বাড়াইয়া দেয়। কারেন্সী সংকোচের সময় ঠিক ঐভাবে প্রচলন-বিভাগের সম্পত্তি ব্যাঙ্কিং-বিভাগে স্থানান্তরিত করিয়া বা নূতন (ad hoc) ট্রেজারী বিলসমূহ বাতিল করিয়া, তৎপরিমাণ নোটপ্রচলন কমাইয়া দেয়। বলা বাহুল্য, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ীই কারেন্সীর প্রসার বা সংকোচ সাধন করা হয়। কিন্তু কখনও কখনও প্রচলন-বিভাগে রক্ষিত কোম্পানির কাগজের (এগুলি বাজার-মূল্যেই প্রদর্শিত হয়) মূল্য-পুনর্নিরূপণের (revaluation) সময়ও কারেন্সীর প্রসার বা সংকোচ সাধন করা হয়। ১৯৪০ সালে কারেন্সী প্রসার হেতু সম্পত্তির দিকে রাখা হইয়াছিল (সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত) এক টাকার মুদ্রা ও নোট, এবং ১৯৪৩ সালের পর হইতে রাখা হইয়াছে (বিলাতে প্রাপ্ত) স্টার্লিং সম্পত্তি। অনেক সময় মাত্র "নীতির" দিক দিয়াই কারেন্সী প্রসারিত বা সংকুচিত করা হয়। যেমন, যখন ব্যাঙ্কিং-বিভাগে রোক টাকার প্রাচুর্য সৃষ্টি করিবার প্রয়োজন হয়, তখন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রচলন-বিভাগে নোট বৃদ্ধি করিয়া তাহা ব্যাঙ্কিং-বিভাগে স্থানান্তরিত করে। এইরূপে, সরকার যখন নিজেদের জমা টাকা প্রয়োজনাতিরিক্ত রহিয়াছে দেখেন, তখন প্রচলন-বিভাগে রক্ষিত নূতন (ad hoc) সৃষ্ট ট্রেজারী বিলগুলি বাতিল করিয়া দিয়া নিজেদের ঋণ কমাইয়া দেন, এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কও ঠিক তৎপরিমাণ কারেন্সী হ্রাস করে।

দেখা যাউক, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কি ভাবে দেশের ক্রেডিট-নীতি নিয়ন্ত্রণ করে। উপরি-উক্ত হিসাব-তালিকা আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, ব্যাঙ্কিং-বিভাগের দায়ের দিকে "ব্যাঙ্কসমূহের নিকট হইতে গৃহীত আমানত" বাবদে একটি অঙ্ক দেখানো হইয়াছে। ব্যাঙ্কসমূহের নিকট হইতে গৃহীত আমানত বলিতে প্রধানত তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহেরই আমানত বুঝায়।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দেশের ক্রেডিট-নীতিকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য কতকগুলি প্রধান প্রধান ব্যাঙ্ককে তপশীলভুক্ত করিয়া লইয়াছেন। কোন ব্যাঙ্ককে তপশীলভুক্ত করিবার নিয়ম এই যে--(ক) সেই ব্যাঙ্ককে ব্রিটিশ ভারতে ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকিতে হইবে, (খ) তাহার গৃহীত মূলধন ও সংরক্ষিত ভাণ্ডারের পরিমাণ ন্যূনকল্পে পাঁচ লক্ষ টাকা হওয়া চাই, এবং (গ) ভারতীয় কোম্পানি-আইনের ২(২) সংখ্যক নিবন্ধে বর্ণিত সংজ্ঞা (বা ভারতের বাহিরে কোন আইন) অনুযায়ী তাহার "কোম্পানি" বলিয়া পরিগণিত হওয়া চাই। তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের উপর এই দায় চাপানো হইয়াছে যে, তাহাদের চলতি হিসাবের আমানতের (demand liabilities) শতকরা অন্তত ৫৲ টাকা ও স্থির হিসাবের আমানতের (time liabilities) শতকরা অন্তত ২৲ টাকা রিজার্ভ ব্যাঙ্কে জমা রাখিতে হইবে। তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের জমার টাকা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে পুঞ্জীভূত হওয়ার দরুন, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সব সময়ই যে কোন তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ককে তাহার প্রয়োজনের সময় টাকা কর্জ দিয়া সাহায্য করিতে সক্ষম হয়। ইহা ব্যতীত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের রোক টাকার সংকোচ ও প্রসার সাধন দ্বারা তাহাদের ক্রেডিট-নীতির উপর প্রয়োজনানুযায়ী প্রভাব বিস্তার করে। এই কার্যসাধনের জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এক বিশেষ প্রণালী অবলম্বন করিতে পারে। যখন তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের হাতে অধিক পরিমাণ রোক টাকা থাকার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তখন "খোলা বাজার" (open market) হইতে কোম্পানির কাগজ ও হুণ্ডী কিনিতে পারে, এবং যখন মনে করে যে উপস্থিত তাহাদের হাতে অধিক পরিমাণ রোক টাকা থাকিবার কোন প্রয়োজন নাই, তখন "খোলা বাজারে" কোম্পানির কাগজ ও হুণ্ডী বেচিতে পারে। (অবশ্য এই পন্থা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এযাবৎ কাল খুব কম বারই অবলম্বন করিয়াছে।) ইহার ফলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সব সময়ই বাজারকে সুস্থিত ও সুনিয়ন্ত্রিত অবস্থায় রাখিতে পারে। ইহা ব্যতীত বাট্টাহার বা Bank Rate নিয়ন্ত্রণ দ্বারাও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক টাকার দর বা মূল্যগতির উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার অল্পকাল পরে (১৯৩৫ খৃস্টাব্দের নভেম্বর মাসে) ব্যাঙ্ক রেট শতকরা ৩॥০ হইতে ৩ টাকায় নামানো হয়। তাহার পর হইতে আজ পর্যন্ত ইহার কোন পরিবর্তন হয় নাই।

ব্যাঙ্ক রেট বলিতে নামতঃ সেই হারকে বুঝায়, যে হারে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক উৎকৃষ্ট শ্রেণীর তিন মাসের মেয়াদী বিল বাট্টা করিবে। ইহা টাকার বাজারের সাধারণ অবস্থার অন্যতম সূচক মাত্র। সরকারীভাবে ইহাই "নিম্নতম দর"—যে দর অনুযায়ী দেশের মধ্যে বিভিন্ন কর্জ-দর নিয়ন্ত্রিত হয়। এক কথায় বলিতে গেলে ব্যাঙ্ক রেট কমানো মানে দেশের মধ্যে টাকার অন্যান্য দর কমানো, ও ব্যাঙ্ক রেট বাড়ানো মানে দেশের মধ্যে টাকার অন্যান্য দর বাড়ানো। (বিলাতের টাকার বাজারে দেখা যায় যে ব্যাঙ্ক রেট যখন বাড়ানো হয়, তখন অন্য দেশে যেখানে ব্যাঙ্ক রেট কম থাকে সেখান হইতে অর্থ আমদানি হইতে থাকে।) কিন্তু ব্যাঙ্ক রেট ইচ্ছামত বাড়ানো বা কমানো যায় না। ইহা যাহাতে কার্যকরী হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়। যেমন, দেশের মধ্যে যদি টাকার যথেষ্ট সচ্ছলতা থাকে, সে ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক রেট বাড়াইয়া টাকার দর বাড়ানো ব্যর্থতায় পরিণত হইবে। এইরূপ ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক রেটকে কার্যকরী করিবার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাজার হইতে টাকা ধার করিয়া সচ্ছলতা কমাইয়া দেয়। ইহা হইতে এই ধারণা জন্মিতে পারে যে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ইচ্ছা করিলেই ব্যাঙ্ক রেট বাড়াইয়া দেশের মধ্যে টাকার দর বাধ্যতামূলকভাবে বাড়াইয়া দিতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারটা ঠিক তাহা নহে। তিন মাসের মেয়াদী বিল যে হারে বাজারে বাট্টা করিতে পারা যায় তাহার দ্বারাই টাকার বাজারের অন্যান্য দর সূচিত হয়, এবং ব্যাঙ্ক রেটও ঠিক তাহার অনুগামী হইয়া থাকে।

যদি বৈদেশিক মুদ্রার সহিত টাকার মূল্যের কোনরূপ অসামঞ্জস্য ঘটে, তাহা হইলে টাকার বাজারকে সুশৃঙ্খলিত ও সুস্থিত অবস্থায় রাখা প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়ে। এইজন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক সব সময় বিনিময়ের (exchange) সমতা রক্ষা করিবার নিমিত্ত পূর্বে বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা ছিল। তখন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের একটি প্রধান কাজ ছিল টাকাকে ১ শিলিং ৫—৪৯।৬৪ পেন্স হইতে ১ শিলিং ৬—৩।১৬ পেন্স দরের মধ্যে বাঁধিয়া রাখা। এই জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উপর এক নির্দেশ ছিল যে, টাকার দর যদি ১ শিলিং ৫—৪৯।৬৪ পেন্সের নিকটবর্তী হয়, তাহা হইলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ক্রমাগত স্টার্লিং বেচিয়া যাইবে। এবং ঐ হার যদি ১ শিলিং ৬—৩।১৬ পেন্সের কাছে যায়, তাহা হইলে ক্রমাগত স্টার্লিং কিনিয়া যাইবে। কিন্তু ভারত আন্তর্জাতিক

অর্থ-ভাণ্ডারের (International Monetary Fund) সদস্যভুক্ত হইবার পর টাকার মূল্য ৩·৩০৮৫৪ই গ্রেন সোনার সমান নির্দিষ্ট হওয়ায় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বিনিময় সম্পর্কিত কর্মপদ্ধতির পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ১৯৪৭ খৃস্টাব্দের এপ্রিল মাসের সংশোধিত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন দ্বারা রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে বাধ্যতামূলকভাবে স্টার্লিং বেচাকেনার দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে। কার্যত কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এখনও ১৮ পেন্স বা তাহার নিকটবর্তী দরে স্টার্লিং বেচাকেনা করিয়া যাইতেছে।

চতুর্থ অধ্যায়

বিনিময়ের বাজার

বিনিময়ের বাজার বলিতে আমরা সেই বাজার বুঝি, যে বাজারে টাকার পরিবর্তে বৈদেশিক মুদ্রা (যেমন পাউণ্ড, ডলার প্রভৃতি) কিনিতে পাওয়া যায়, বা অপর পক্ষে বৈদেশিক মুদ্রা টাকাতে পরিবর্তিত করা যায়। এক কথায়, যে বাজারে বৈদেশিক মুদ্রার কেনাবেচা হয়, তাহাকেই বিনিময়ের বাজার বা এক্সচেঞ্জ বাজার বলা হয়। ইহা টাকার বাজারের একটি অংশ বিশেষ, এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য টাকার যোগান দেওয়াই এই বাজারের কাজ। মূলত, এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কসমূহ (যাহাদের প্রধান অফিস বিদেশে অবস্থিত, যেমন চার্টার্ড ব্যাঙ্ক, মার্কেণ্টাইল ব্যাঙ্ক, ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, লয়েড্‌স্ ব্যাঙ্ক, ইস্টার্ন ব্যাঙ্ক প্রভৃতি) ও হুণ্ডীর দালালগণকে লইয়াই এই বাজার গঠিত। কিন্তু বর্তমানে ভারতীয় যৌথ ব্যাঙ্কসমূহও তাহাদের লণ্ডনস্থ এজেণ্টগণের মধ্যস্থতায় এই কাজ করিতেছে।

এখন দেখা যাউক, টাকার পরিবর্তে বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হয় কেন? মনে করুন, রামরতন রামকিষণলাল নামে কলিকাতার একজন ব্যবসায়ী দশ হাজার গজ বিলাতী কাপড় আমদানি করিতে চান। ম্যাঞ্চেস্টারের নিউ স্টার কটন মিল উক্ত ব্যবসায়ীকে জানাইলেন যে, ইহার মূল্য পড়িবে এক হাজার পাউণ্ড। অপর পক্ষে, মনে করুন, বিলাতের ডাণ্ডী শহরের একজন পাটকলের মালিক কলিকাতার পাটব্যবসায়ী শিউরতন বিষেণপ্রসাদকে জানাইলেন যে, তিনি ১০০ গাঁট পাট কিনিতে চাহেন। শিউরতন বিষেণ-

প্রসাদ ডাণ্ডীর উক্ত চটকলের মালিককে জানাইলেন যে, ইহার দাম পড়িবে সাড়ে তিন হাজার টাকা। এখন মুশকিলের কথা এই যে, ম্যাঞ্চেস্টারের নিউ স্টার কটন মিল পাউণ্ডে ছাড়া দাম লইবে না; এদিকে আবার শিউরতন বিষেণপ্রসাদ টাকায় ছাড়া দাম লইবে না। তাহা হইলে ব্যাপারটা দাঁড়াইল এই যে, রামরতন রামকিষেণলালকে পাউণ্ড কিনিয়া ম্যাঞ্চেস্টারে পাঠাইতে হইবে, এবং ডাণ্ডীর উক্ত চটকলের মালিককে টাকা কিনিয়া কলিকাতায় পাঠাইতে হইবে। উভয়কেই নিজ নিজ দেশের বিনিময়ের বাজার হইতে পাউণ্ড এবং টাকা কিনিতে হইবে। এখন জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে— উভয়ে নিজ নিজ দেশের বিনিময়-বাজার হইতে যে পাউণ্ড এবং টাকা খরিদ করিবেন, তাহা কাঁচা টাকা, না, কাঁচা পাউণ্ড? কাঁচা টাকা কখনই নহে, তাহার কারণ, তাহা হইলে কলিকাতার ব্যাঙ্ককে নিজেদের সিন্দুকে হাজার হাজার পাউণ্ডের কাঁচা পাউণ্ড রাখিতে হইবে, এবং ম্যাঞ্চেস্টারের ব্যাঙ্ককেও নিজেদের সিন্দুকে হাজার হাজার টাকার কাঁচা টাকা রাখিতে হইবে। তারপর, ডাণ্ডীর এই চটকলের মালিক বা কলিকাতার রামরতন রামকিষেণলাল এই কাঁচা টাকা বা কাঁচা পাউণ্ড পাঠাইবে কি করিয়া? পথিমধ্যে জাহাজডুবি হইয়া খোয়া যাইতে পারে, বা অনেক কিছু বিপদ ঘটিতে পারে, এবং যদিও বীমা করিয়া পাঠানো সম্ভবপর হয় তো পাঠাইবার খরচ প্রভৃতি অনেক কিছু দায় আছে। এই কারণে কাঁচা পাউণ্ড বা কাঁচা টাকা কখনও পাঠানো হয় না, তাহার পরিবর্তে ঐ টাকা বা পাউণ্ড তারে (telegram) বা ড্রাফটে (draft) বা হুণ্ডীর (bill) সাহায্যে পাঠানো হয়। এবং এইরূপে টাকা পাঠানোতে সাহায্য করাই হইতেছে বিনিময়ের বাজারের কাজ।

তারে পাউণ্ড পাঠানো অনেকটা তারে মনি অর্ডার করার মত। মনে করুন, রামরতন রামকিষেণলাল ১০০ গাঁট কাপড়ের মূল্য বাবদ এক হাজার পাউণ্ড তারে পাঠাইতে চাহেন। তিনি তাঁহার ব্যাঙ্ককে এই কথা জানাইলেন। তাঁহার ব্যাঙ্ক সেই দিনকার তারে পাউণ্ড পাঠাইবার যে দর (T. T. বা Telegraphic Transfer) আছে, সেই দরে হিসাব করিয়া ঐ টাকাটা ব্যাঙ্কের সহিত তাহার হিসাবের খরচের অঙ্কে ফেলিলেন। তারপর ব্যাঙ্ক-ম্যানেজার তারযোগে (এইরূপ তারের জন্য নিজস্ব সাংকেতিক শব্দসমূহ

ব্যবহৃত হয়) তাঁহাদের লণ্ডনস্থ অফিসের ম্যানেজারকে জানাইলেন যে, তাঁহারা যেন ঐ এক হাজার পাউণ্ড ম্যাঞ্চেস্টারের নিউ স্টার কটন মিলকে দেন। লণ্ডনের ম্যানেজার ঐ তার পাইবামাত্র নিউ স্টার কটন মিলের ব্যাঙ্কের নিকট ঐ টাকাটা পাঠাইয়া দিবেন এবং তাঁহারা নিউ স্টার কটন মিলের যে হিসাব আছে সেই হিসাবের জমার অঙ্কে ঐ টাকাটা লিখিয়া লইবেন।

এবার দেখা যাউক, রামরতন রামকিষেণলাল ঐ হাজার পাউণ্ড তারে না পাঠাইয়া যদি ড্রাফ্‌টে (draft) পাঠাইত, তাহা হইলে সে কি করিত? তাহাকে তখন কোন এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কে যাইয়া (সাধারণত তাহার নিজ ব্যাঙ্কই এই কাজ করিয়া থাকে) ঐ দিন ড্রাফ্‌টে পাউণ্ড পাঠাইবার যে দর ছিল, সেই দরে হাজার পাউণ্ডের একখানা ড্রাফ্‌ট কিনিতে হইত। এগুলি অনেকটা পোস্টাল অর্ডারের (Postal Order) মত। কিন্তু প্রভেদ এই যে, ড্রাফ্‌টগুলি সংখ্যায় একাধিক (সাধারণত তিনখানি হয়; তাহার কারণ এই যে যদি একখানা খোয়া যায় তাহা হইলে অপরখানি ব্যবহার করা যাইতে পারে। এখন রামরতন রামকিষেণলালকে উক্ত ড্রাফ্‌টখানি ডাকযোগে ম্যাঞ্চেস্টারে নিউ স্টার কটন মিলের নিকট পাঠাইতে হইবে। তাঁহারা উহা পাইবামাত্র নিজেদের ব্যাঙ্কে জমা দিয়া দিবেন। ঐ ব্যাঙ্ক তখন ঐ ড্রাফ্‌টখানি কলিকাতার যে ব্যাঙ্ক কর্তৃক উহা বিক্রীত হইয়াছে, তাহাদের বিলাতের অফিসে বা প্রতিনিধির নিকট পাঠাইয়া দিবেন (সাধারণত এই কাজটি ক্লিয়ারিং হাউসের মধ্যস্থতায় হইয়া থাকে।) ড্রাফ্‌টি যখন ভাঙ্গানো হইয়া যাইবে, তখনই নিউ স্টার কটন মিলের মালিক ড্রাফ্‌টে লিখিত টাকা নিজ ব্যাঙ্ক হইতে উঠাইয়া লইতে পারিবেন।

এইবার দেখা যাউক, হুণ্ডীর (bill) সাহায্যে এই টাকাটার আদান-প্রদান কি ভাবে হইয়া থাকে। প্রথম কথা এই যে হুণ্ডী পদার্থটা কি? এটি আর কিছুই নহে, একখানি আদেশপত্র মাত্র যাহা দ্বারা প্রেরক (drawer) গ্রাহকের (drawee) উপর আদেশ দেন যে, সে যেন তৃতীয় কোন ব্যক্তিকে বা তাহার আদেশমত অপর কোন ব্যক্তিকে উক্ত আদেশপত্র পাইবামাত্র বা কোন নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হইলে বা কোন নির্দিষ্ট তারিখে (সাধারণত ৯০ দিন) এক নির্দিষ্ট পরিমাণ মুদ্রা প্রদান করে। গ্রাহককে বা তাহার প্রতিনিধিকে উক্ত পত্রের উপর নিজের নাম সহি করিয়া উহার দায় স্বীকার

করিয়া লইতে হয় এবং এইরূপভাবে স্বীকার করিবার পর তাহাকে স্বীকারকারী (acceptor) বলা হয়।

T. T. এবং ড্রাফটের বেলায় আমরা যেমন দেখিয়াছি যে, আমদানিকারকই টাকাটা রপ্তানিকারকের নিকট পাঠাইয়াছিল, হুণ্ডীর বেলায় কিন্তু ঠিক তাহা ঘটে না। হুণ্ডীটি কাটেন রপ্তানিকারক আমদানিকারকের উপর। সুতরাং এক্ষেত্রে পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে যে, রপ্তানিকারক মাল পাঠাইবার সঙ্গে সঙ্গেই মূল্য বাবদ টাকাটা পাইতেছেন না,— টাকাটা পাইতেছেন হুণ্ডীর মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে। অথচ, রপ্তানিকারক চাহেন যে তাহার টাকাটা সে যেন মাল পাঠাইবার সঙ্গে সঙ্গেই পায়। আবার এদিকে আমদানিকারকও চাহেন যে মাল হাতে না পাইলে টাকা দিবেন না,— মাল না বেচিলে তাহার পক্ষে টাকা দেওয়া সম্ভবপর নহে। ইহাদের পরস্পরের এই সকল অন্তরায় দূর করিয়াছে এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক ও হুণ্ডীর দালালগণ। রপ্তানিকারকের কথাই প্রথম ধরা যাউক। আমদানিকারক যদি তাহার জানা খরিদ্দার হন, তাহা হইলে তিনি কিছু না ভাবিয়া তাহাকে এমনি মাল পাঠাইয়া দিবেন, এবং তাহার উপর সাধারণ উপায়ে হুণ্ডী কাটিয়া, সেখানি তাঁহার ব্যাঙ্কের নিকট "সংগ্রহের জন্য" (B. C. বা Bills for Collection) পাঠাইবেন। তাঁহার ব্যাঙ্ক তখন সেখানা আমদানিকারকের দেশে তাহাদের যে শাখা বা এজেণ্ট বা প্রতিনিধি আছে তাহাদের নিকট আমদানিকারকের দ্বারা "স্বীকার" (Acceptance) করাইয়া লইবার জন্য পাঠাইবেন। অনেক সময় রপ্তানিকারক হুণ্ডীখানি সরাসরি তাঁহার ব্যাঙ্কের নিকট বেচিয়া (discounting) দিয়া থাকেন। কিন্তু রপ্তানিকারক যদি আমদানিকারকের আর্থিক মর্যাদা সম্বন্ধে অতিমাত্রায় নিশ্চিন্ত না হন, তাহা হইলে সাধারণত আমদানিকারকের উপর "দায়স্বীকার দলিল" (D/A বা Documents against Acceptance) হুণ্ডী কাটিয়া থাকেন। এ ক্ষেত্রে জাহাজ হইতে মাল খালাস করিবার রসিদ (Bill of Lading), বীমাপত্র (Insurance policy), চালান (Invoice), শুল্ক বিভাগের কাগজপত্র (Customs certificate) প্রভৃতি যে সকল কাগজপত্র হস্তগত না হইলে আমদানিকারক মাল খালাস করিতে পারিবে না, সে সকল কাগজপত্র সরাসরি আমদানিকারকের নিকট না পাঠাইয়া হুণ্ডীর সহিত গাঁথিয়া দেওয়া হয়। কাগজপত্র

গাঁথা হুণ্ডীকে মিশ্র বিল (Documentary Bill) বলা হয়, এবং যাহার সহিত কাগজপত্র গাঁথা থাকে না তাহাকে শুদ্ধ বিল (বা Clean Bill) বলা হয়। তাহার ফলে, আমদানিকারক ঐ হুণ্ডী "স্বীকার" না করা পর্যন্ত ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঐ কাগজপত্রগুলি হস্তগত করিতে পারে না।

আবার যদি রপ্তানিকারক আমদানিকারক সম্বন্ধে একেবারেই নিশ্চিন্ত না হন, তাহা হইলে তিনি "আদায়-সাপেক্ষ দলিল" (D/P বা Documents against Payment) হুণ্ডী কাটেন। এ ক্ষেত্রে আমদানিকারক হুণ্ডীর টাকা না দেওয়া পর্যন্ত ব্যাঙ্কের নিকট হইতে উক্ত কাগজপত্রগুলি হস্তগত করিতে পারেন না। ইহা আর কিছুই নহে—'ফেল কড়ি মাখ তেল' ধরনের ব্যাপার মাত্র।

এরূপও হইতে পারে যে আমদানিকারকের অর্থমর্যাদা সম্বন্ধে রপ্তানিকারক কিছুই জানেন না। এরূপ ক্ষেত্রে তিনি দাবি করিবেন যে, আমদানিকারক যেন কোন ব্যাঙ্কে "ক্রেডিট" খুলেন। তাহার অর্থ, কোন নামজাদা ব্যাঙ্ক আমদানিকারকের পক্ষ হইয়া হুণ্ডীর দায় নিজেদের ঘাড়ে লইবে। এ ক্ষেত্রে আমদানিকারককে নিজের ব্যাঙ্কেরই শরণাপন্ন হইতে হয়, এবং তাহাদের কাছে যথেষ্ট পরিমাণ জামীন (Security) ও স্বীকৃত কমিশন দিয়া নিজের নামে "ক্রেডিট" খুলিতে হয়। এই "ক্রেডিট" আবার নানা ধরনের হইতে পারে। ইহা কোনো একটি বিশেষ আমদানি সম্পর্কিত হইতে পারে, বা "ঘূর্ণ্যমান" (Revolving credit) ধরনের হইতে পারে। শেষোক্ত ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের সহিত এইরূপ চুক্তি থাকে যে, এই "ক্রেডিট" অনিশ্চিত কালের জন্য চলিতে থাকিবে, এবং এই সময়ের মধ্যে সে কখনও নির্দিষ্ট পরিমাণ অপেক্ষা অধিক মূল্যের মাল আমদানি করিতে পারিবে না, এবং যেমন এক-একটি আমদানির মাল বিক্রয় হইয়া যাইবে, সঙ্গে সঙ্গে সে ব্যাঙ্কের নিকট তাহার দেনা চুকাইয়া দিবে। ব্যাঙ্ক তখন তাহার হইয়া আবার নূতন হুণ্ডী "স্বীকার" করিয়া লইবে।

"ক্রেডিট" সম্বন্ধে আরও বেশি কিছু বলা উচিত। "ক্রেডিট" খোলাটা আর কিছুই নহে, আমদানিকারকের নিজের দেশের কোন নামজাদা ব্যাঙ্কের নিকট হইতে একখানা Letter of Credit সংগ্রহ করা। Letter of Credit সাধারণত দুই শ্রেণীর হইয়া থাকে—পরিত্যাজ্য (revocable বা unconfirmed) এবং অপরিত্যাজ্য (irrevocable বা confirmed)। রপ্তানিকারক সব সময়ই অপরিত্যাজ্য ধরনের Letter of Credit চাহেন, কেননা ইহাতে

আমদানিকারকের পলাইবার (back out) সম্ভাবনা থাকে না। Letter of Credit বস্তুটা বস্তুত আর কিছুই নহে—ইহা কোন ব্যাঙ্ক কর্তৃক দেওয়া প্রতিশ্রুতিপত্র, যাহা দ্বারা ব্যাঙ্ক এইরূপ অঙ্গীকার করে যে আমদানিকারকের পরিবর্তে ব্যাঙ্ক নিজেই আমদানিকারকের উপর কাটা বিল "স্বীকার" করিয়া লইবে। যখন কোন বৈদেশিক বিনিময়-পত্রের সহিত Letter of Credit গাঁথা থাকে, তখন এখানকার এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক এইরূপ বিল পাওয়ামাত্র উহা উক্ত ব্যাঙ্কের দ্বারা "স্বীকার" করাইয়া লয়। এইরূপ বিলকে সাধারণত Bank Paper বলা হয়।

Letter of Credit যে কেবলমাত্র বহির্বাণিজ্য সম্পর্কেই ব্যবহৃত হয়, তাহা নহে। দেশের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য সম্পর্কেও ইহা ব্যবহৃত হয়। ইহা পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে যে, এক দেশ হইতে অপর দেশে ভ্রমণের সময় নিজের দেশের চলিত মুদ্রা (legal tender) কোন কাজেই লাগে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না উহা ঐ দেশের মুদ্রায় পরিবর্তিত করা যাইতেছে। সেইজন্য অনেকেই ভ্রমণের সময় নিজের ব্যাঙ্কের নিকট হইতে একখানা "মর্যাদা-পত্র" বা Letter of Credit লইয়া যান। সেখানা বিদেশের ব্যাঙ্কে দেখাইবামাত্র তাহারা উহার উপর প্রদর্শিত সহির সহিত তাঁহার কাটা হুণ্ডীর উপরের সহি মিলাইয়া তাঁহাকে তাঁহার প্রয়োজনীয় টাকা সেই দেশের মুদ্রায় দিয়া দেয়। পরে তাহারা ঐ টাকা ভ্রমণকারীর ব্যাঙ্কের নিকট হইতে আদায় করিয়া লয়। এই সম্পর্কে Traveller's Chequeও প্রভূত পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। ইহা টমাস কুক্ (বর্তমানে গ্রিণ্ড্লে কোম্পানির সহিত মিলিত হইয়াছে), আমেরিকান এক্সপ্রেস্ কোম্পানি ও অন্যান্য ব্যাঙ্ক কর্তৃক বিক্রীত হয়। ইহা সঙ্গে থাকিলে বিদেশে উহার পরিবর্তে উক্ত কোম্পানিসমূহের শাখা-অফিসসমূহে বা যে কোন নামজাদা ব্যাঙ্কে টাকা পাওয়া যায়।

এইবার আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্য প্রসঙ্গে আবার ফিরিয়া আসা যাউক। অনেক সময় এইরূপ ঘটনা ঘটে যে যদিও রপ্তানিকারক আমদানিকারকের অর্থমর্যাদা সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত নহেন, তথাপি বিনা Letter of Credit-এও মাল পাঠাইয়া থাকেন। এইরূপ অবস্থায় বিলের উপর সাধারণত একজন guarantor-এর নাম উল্লেখ থাকে। এইরূপ guarantor সাধারণত কোন হুণ্ডীর দালাল বা নামজাদা ব্যবসাদার হন। এইরূপ বিল পাওয়ামাত্র

ব্যাঙ্ক উহা "স্বীকার" করাইয়া লইবার নিমিত্ত guarantor-এর নিকট পাঠাইয়া দেন। ইহাকে case in need বলা হয়। আমদানিকারকের পশ্চাদপসরণের মতলব থাকিলে, guarantor-কে প্রায়ই তাহার পিছনে পিছনে ঘুরিতে হয়। যদি এরূপ ক্ষেত্রে তিনি এরূপ বিল আমদানিকারককে দিয়া স্বীকার করাইয়া লইতে পারেন তো তাঁহার বরাত জোর। কিন্তু যদি না পারেন তাহা হইলে ঐ বিল তাঁহাকেই "স্বীকার" করিয়া দিয়া ব্যাঙ্ককে ফেরত দিতে হয়। তাহার ফলে উক্ত বিল সম্পর্কিত মাল guarantor এর স্কন্ধেই চাপিয়া পড়ে। যে কোন রকমেরই মুদ্দতী বিল হউক না কেন, উহা "স্বীকৃত" হইবার পর এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক উহা নিজেদের সিন্দুকে রাখে। ক্বচিৎ কদাচিৎ তাহারা অন্য কোন ব্যাঙ্কের নিকট উহা পুনর্বিক্রয় (rediscount) করে। তারপর মুদ্দত উত্তীর্ণ হইলে ঐ বিল স্বীকারকারীর নিকট প্রেরণ করিয়া টাকা আদায় করিয়া লয়।

অনেক সময় এইরূপ হয় যে, মাল উৎপন্ন হইবার অনেক পূর্বেই ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি হইয়া যায়। এ ক্ষেত্রে মাল পাঠাইবার পূর্বে যদি এক্সচেঞ্জ হারের কোন পরিবর্তন ঘটে, তাহা হইলে উভয় পক্ষের কাহাকেও না কাহাকেও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। সেইজন্য এরূপ ক্ষেত্রে রপ্তানিকারক তাহার ব্যাঙ্কের সহিত ঐ রপ্তানি সম্পর্কিত হুণ্ডী সম্বন্ধে একটি "আগাম চুক্তি" (Forward Exchange) করেন। এইরূপ চুক্তি অনুযায়ী রপ্তানিকারক ছয় বা আট মাস পরে যখন মাল পাঠাইবেন, তখন এখনকার চুক্তির দরেই হুণ্ডীখানা বেচিতে পারিবেন। ইহাতে ভবিষ্যতে এক্সচেঞ্জ হারের পরিবর্তন হেতু তাহার ক্ষতিগ্রস্ত হইবার কোনরূপ সম্ভাবনা থাকে না।

আগেই বলা হইয়াছে যে, বিলাতী হুণ্ডী রপ্তানিকারকের নিজের দেশের মুদ্রাতেই (currency) লিখিত হয়। যথা, ইংলণ্ডের কোন রপ্তানিকারক ভারতীয় আমদানিকারকের উপর যে বিল কাটেন তাহা পাউণ্ডেই লিখিত হয়। ইহার ব্যতিক্রম যে ঘটে না, তাহা নহে। কখনও কখনও এইরূপ বিল আমদানিকারকের দেশের মুদ্রাতেও লিখিত হয়। কিন্তু ইংলণ্ডের রপ্তানি-কারক কর্তৃক এইরূপ বিল-কাটা ব্যাপার খুবই বিরল। ইহা অধিক মাত্রায় প্রচলিত আছে চীন, জাপান প্রভৃতি প্রাচ্যদেশের রপ্তানিকারকদের মধ্যে।

বিলাতী হুণ্ডীর কেনাবেচার কাজ সাধারণত হুণ্ডীর দালালগণের মধ্যস্থতাতেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। কলিকাতার প্রধান হুণ্ডীর দালালগণের অন্যতম হইতেছে পিগট চ্যাপম্যান্ অ্যাণ্ড কোম্পানি, টমাস্ সেট্ আপকার অ্যাণ্ড কোম্পানি, নরম্যানস্ রস্ অ্যাণ্ড কোম্পানি, এস্ সি দত্ত অ্যাণ্ড কোম্পানি, আচরাজ লাখোতিয়া অ্যাণ্ড কোম্পানি, বি. বি. শীল, এস্. এন্. চাটার্জী, ভেনামল অ্যাণ্ড কোম্পানি, প্রভৃতি।

এতক্ষণ ব্যাপারটা আমরা অবশ্য একতরফাই আলোচনা করিয়াছি, যথা বিলাতের রপ্তানিকারকের কাটা বিলটা (এইরূপ বিলকে Inward Bill বলা হয়) কি ভাবে ভাঙ্গানো হয়। এইবার ব্যাপারটা এ দেশের রপ্তানিকারকের দিক হইতে আলোচনা করা যাউক। পূর্বানুবৃত্তি হইতে ইহা পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে যে, ভারতীয় রপ্তানিকারক তাঁহার প্রাপ্য টাকার বিল বিলাতী আমদানিকারকের নামে এদেশীয় মুদ্রাতেই (Rupee Currency) কাটেন। বিল কাটা হইলে তিনি তখন সেই বিল (ইহাকে Outward Bill বলা হয়) কোন ভারতীয় যৌথ ব্যাঙ্ক বা এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক বা কোন ভারতীয় "দেশীয়" ব্যাঙ্কারের (indigenous bankers; ইহারা শ্রফশ্রেণীর লোক, বহুকাল হইতে এই কারবারে নিযুক্ত আছেন) নিকট বেচিয়া (discounting) দেন। এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কসমূহের বেলায় এইরূপ বিল কিনিলে কোন গোলমালই নাই, কারণ তাঁহাদের মূল অফিস বিলাতে অবস্থিত এবং তাঁহারা এইরূপ ক্রীত বিল বিলাতে পাঠাইয়া দেন। তাঁহাদের বিলাতের অফিস তখন উহা সেখানকার আমদানিকারক বা তাহার ব্যাঙ্ক বা guarantor-এর দ্বারা সহি বা "স্বীকার" করাইয়া লইয়া নিজেদের সিন্দুকে রাখিয়া দেন এবং পরে মুদ্দত উত্তীর্ণ হইলে টাকা স্বীকারকারীর নিকট হইতে আদায় করিয়া লন। কিন্তু ভারতীয় যৌথ ব্যাঙ্ক বা দেশীয় কোন ব্যাঙ্কার যখন এইরূপ বিল ক্রয় করেন তখন তাঁহারা কি করেন? এদেশীয় ব্যাঙ্কাররা অনেক সময়ই এইরূপ বিল ব্যাঙ্কসমূহের নিকট বেচিয়া দেন। কিংবা যে ব্যাঙ্কের সহিত তাঁহাদের হিসাব আছে তাঁহাদের নিকট উহা আদায়ের জন্য পাঠাইয়া দেন। অনেক দেশীয় ব্যাঙ্কারের ও যৌথ ব্যাঙ্কের বিলাতে এজেণ্ট বা প্রতিনিধি (ইহারা সাধারণত ব্যাঙ্ক) আছে, এবং তাঁহারা সেইরূপ বিল বিলাতে তাঁহাদের এজেণ্ট বা প্রতিনিধির নিকট পাঠাইয়া দেন। কিন্তু যাহাদের বিলাতে এজেণ্ট বা প্রতিনিধি নাই,

তাহারা কি করে? তাহাদের সাধারণত এ দেশের কোন-না-কোন এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কের সহিত হিসাব থাকে, এবং তাহারা এইরূপ ক্রীত বিলের অর্থ আদায়ের জন্য সেগুলি নিজেদের ব্যাঙ্কের নিকট প্রেরণ করে। এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কসমূহ তখন সেগুলি তাহাদের বিলাতের অফিসে প্রেরণ করেন।

এইবার বিনিময়ের বাজারের দর সম্বন্ধে দুই-এক কথা বলিয়া এই অধ্যায় শেষ করিব। এই দর নানা রকমের—যেমন, টেলি ট্রান্সফার, দর্শনী, ডি. এ. তিন মাস, ডি. এ. চার মাস, ডি. এ. ছয় মাস ইত্যাদি। আবার পাউণ্ডের দর বলা হয় প্রতি টাকায় এত শিলিং হিসাবে, আর অন্যান্য দেশের মুদ্রার দাম বলা হয় ঐ ঐ দেশের প্রতি এক শত মুদ্রায় এত টাকা হিসাবে। তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে যে, পাউণ্ডের বেলায় দর যত চড়া হইবে টাকা লাগিবে তত কম, আর অন্যান্য দেশের বেলায় দর যত চড়া হইবে টাকা লাগিবে তত বেশি। আবার দর্শনী হুণ্ডী অপেক্ষা মুদ্দতী হুণ্ডীর দর (পাউণ্ড হিসাবে) বেশি। মুদ্দত যত বেশি দিনের হইবে বিনিময়ের হার তত চড়া হইবে, তাহার মানে ব্যাঙ্ক তত কম টাকা দিবে। টেলি ট্রান্সফার সম্বন্ধে এ কথা বলা দরকার যে অল্প টাকা এইরূপ উপায়ে পাঠানো সুবিধাজনক নহে। তাহার কারণ, টেলিগ্রামের খরচ ব্যাঙ্ক দেয় না, প্রেরককেই দিতে হয়।

পঞ্চম অধ্যায়

দেশী বিলের বাজার

হুণ্ডী যে কেবল মাত্র বৈদেশিক বাণিজ্যের নিমিত্তই ব্যবহৃত হয় তাহা নহে। দেশের অন্তর্বাণিজ্যও হুণ্ডীর সাহায্যে পরিচালিত হয়। যদিও এ দেশে অতি প্রাচীনকাল হইতে হুণ্ডীর সাহায্যে স্থান হইতে স্থানান্তরে টাকা প্রেরণের প্রথা চলিয়া আসিয়াছে, তথাপি এ কথা বলা প্রয়োজন যে দেশের অন্তর্বাণিজ্যে হুণ্ডীর ব্যবহার এখনও খুব সীমাবদ্ধ। ইহার নানা কারণ আছে, তন্মধ্যে প্রধান কারণ এই যে ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ এবং কৃষিজ পদার্থ সম্পর্কে হুণ্ডীর ব্যবহার খুব উপযোগী নহে।

দেশের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য সম্পর্কে যে হুণ্ডী ব্যবহৃত হয়, তাহা ঠিক বিলাতী হুণ্ডীর ন্যায়ই কাটা হয়। যখন সেগুলির সহিত রেল বা জাহাজের

রসিদ (R/R, B/L বা Railway Receipt, Bill of Lading), বীমাপত্র প্রভৃতি কাগজপত্র গাঁথা থাকে সেগুলি তখন D/A, D/P আকার ধারণ করে। এ কথা অবশ্য বলা বাহুল্যমাত্র যে, দেশীয় হুণ্ডী আমদানি সম্পর্কিতই হউক বা রপ্তানি সম্পর্কিতই হউক তাহা টাকাতেই (Rupee Currency) কাটা হয়। দেশী হুণ্ডীগুলি মুদ্দতী অপেক্ষা দর্শনী (O/D বা On Demand) ধরনেরই অধিক পরিমাণে হয়। সুতরাং মালক্রেতাকে হুণ্ডীটি পাইবামাত্রই টাকা দিয়া দিতে হয়। (অবশ্য, সেই সময় যদি তাহার হাতে মালের মূল্য-পরিমাণ টাকা না থাকে, তাহা হইলে সে ব্যাঙ্কের নিকট হইতে Overdraft লইতে পারে।) অনেক সময় আবার এই শ্রেণীর হুণ্ডীগুলি মালের সহিতই (যেমন শেয়ার ক্রয়ের সময়) গাঁথা থাকে। এই হুণ্ডীগুলি যে কোন এক্সচেঞ্জ বা যৌথ ব্যাঙ্ক বা দেশীয় ব্যাঙ্কারের নিকট ভাঙ্গানো যায়। বন্দর-শহর অপেক্ষা মফস্বল অঞ্চলেই দেশীয় ব্যাঙ্কারদের কাজ বেশি পরিমাণে চলে (কলিকাতার বড়বাজার অঞ্চলে বিস্তর দেশীয় ব্যাঙ্কার আছে)।

দেশীয় ব্যাঙ্কারদের সহিত টাকার বাজারের সম্বন্ধ খুব সাক্ষাৎ ধরনের নহে। কেননা, তাঁহারা যতক্ষণ পর্যন্ত না হুণ্ডীটি কোন এক্সচেঞ্জ বা যৌথ ব্যাঙ্কে ভাঙ্গাইতেছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁহাদের সহিত টাকার বাজারের কোন সাক্ষাৎ যোগাযোগ ঘটে না। অবশ্য ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই আজকাল যৌথ ব্যাঙ্কে আমানত রাখিয়া ও তাহাদের নিকট হইতে ক্রীত ড্রাফ্‌টের দ্বারা এক স্থান হইতে অপর স্থানে টাকা পাঠাইতে শুরু করিয়া টাকার বাজারের সহিত সংযোগসূত্র স্থাপন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সুশৃঙ্খলিত টাকার বাজারের সহিত তাঁহাদের অঙ্গাঙ্গী যোগাযোগ খুবই কম। এই কারণে সুশৃঙ্খলিত টাকার বাজারে হুণ্ডীর বাট্টাদর অপেক্ষা দেশীয় ব্যাঙ্কারদের হুণ্ডীর বাট্টাদর অনেক বেশি।

উপরে বর্ণিত বিলসমূহ ছাড়া আর এক রকমের সরকারী বিলও বাজারে নিয়মিতভাবে বিক্রীত হয়। এইগুলিকে ট্রেজারী বিল বলা হয়। অনেক রকম দৈনন্দিন খরচের জন্য সরকার রাজস্ব আদায়ের সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারে না। এইরূপ খরচ সম্পর্কিত অর্থ সংকুলানের নিমিত্ত সরকার স্বল্পমেয়াদী (সাধারণত তিন মাসের মেয়াদী) ঋণপত্র বাজারে বিক্রয় করেন। এই স্বল্পমেয়াদী ঋণপত্রগুলিকেই ট্রেজারী বিল বলা হয়। এইরূপ বিলের

সাহায্যে সরকার প্রায় প্রতি সপ্তাহেই বাজার হইতে টাকা তুলিয়া থাকেন। প্রতি সপ্তাহেই যেমন এক-একটি পর্যায়ের বিলের মেয়াদ শেষ হইয়া শোধ হইতেছে, অমনি অপর এক পর্যায়ের বিল দ্বারা নূতন করিয়া টাকা ধার করা হইতেছে। এইভাবে "উত্তোলিত" ঋণ সব সময়ই বাজারে বর্তমান থাকায় এগুলিকে সরকারী "ভাসমান ঋণ" (Floating Debt) বলা হয়।

প্রতি সপ্তাহেই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সরকারের পক্ষ হইতে টেণ্ডার আহ্বান দ্বারা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দিল্লী ব্যতীত সমস্ত শাখা ও মূল অফিস হইতে ট্রেজারী বিল বিক্রয় করে। স্বল্পমেয়াদী বলিয়া এবং ইহাদের পিছনে সরকারের "মর্যাদা" (credit) থাকার দরুন, ব্যাঙ্কসমূহের উদ্বৃত্ত অর্থভাণ্ডার বিনিয়োগের পক্ষে এগুলি আদর্শ দাদন বলিয়া বিবেচিত হয়। ভারতে ট্রেজারী বিল কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার উভয়েই বিলি (issue) করিয়া থাকেন। অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক বিলিকৃত ট্রেজারী বিলের পরিমাণই সর্বাপেক্ষা অধিক। প্রাদেশিক সরকারের ট্রেজারী বিলসমূহ সাধারণত কেন্দ্রীয় সরকারের ট্রেজারী বিল অপেক্ষা অধিক দিনের মেয়াদী হয়। ১৯৩৯-৪০ সালে বাংলা সরকার ছয় মাসের ও মধ্যপ্রদেশ ও বেরার সরকার আট মাসের মুদ্দতী ট্রেজারী বিল বিলি করিয়াছিলেন। ইহা অপেক্ষা স্বল্পতর মেয়াদী ট্রেজারী বিল যে তাঁহারা বিলি করেন না তাহা নহে। যেমন ১৯৪৭ খৃস্টাব্দে বাংলা ও আসাম সরকার তিন মাসের মেয়াদী ট্রেজারী বিলও বিলি করিয়াছেন। এ কথা এখানে বলা প্রয়োজন যে, প্রাদেশিক সরকারের ট্রেজারী বিলের সুদহার সাধারণত কেন্দ্রীয় সরকারের ট্রেজারী বিলের সুদহার অপেক্ষা কিছু বেশি হয়।

ট্রেজারী বিল বিক্রয়ের প্রণালীটা অনেকটা এইরূপ—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যখন টেণ্ডার আহ্বানের সিদ্ধান্ত করে, তখন সংবাদপত্রে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দ্বারা জানাইয়া দেয়, কবে, কত টাকার এবং কত দিনের মুদ্দতী বিল বিক্রীত হইবে, এবং গৃহীত টেণ্ডারের টাকা কবে দিতে হইবে। এই খবর বড় বড় ব্যাঙ্ক, দালাল ও ব্যবসায়ীগণের নিকটও প্রেরিত হয়। টেণ্ডার-প্রদানকারীদের পরিষ্কার ভাবে তাহাদের টেণ্ডারের আবেদন-পত্রে লিখিয়া জানাইতে হয়, তাহারা কোন্ বিলের সম্পর্কে, কত টাকার এবং কি দরে টেণ্ডার দিতেছেন। দর শতকরা হিসাবে টাকা আনা ও পয়সায় লিখিত হয়। যত টাকার বিল

বিক্রীত হইবে, তাহা অপেক্ষা যদি বেশি টাকার টেণ্ডার পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহার একটি আনুপাতিক পরিবেশন করা হয়। ট্রেজারী বিলগুলি ২৫ হাজার, ৫০ হাজার, ১ লক্ষ, ৫ লক্ষ, ১০ লক্ষ, ও ৫০ লক্ষ টাকার হয়—কখনও ২৫ হাজারের ন্যূন হয় না। দুই টেণ্ডারের মধ্যবর্তী কালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কখনও কখনও টেণ্ডার আহ্বান না করিয়া এক নির্ধারিত দরেও ট্রেজারী বিল বিক্রয় করে। এইরূপ বিলকে Intermediate Bills বলা হয়, এবং ইহার দরকে Tap Rate বলা হয়। Intermediate ট্রেজারী বিলসমূহ যে কেবলমাত্র সরকারের সাময়িক অর্থ-প্রয়োজন মিটাইবার নিমিত্তই বিক্রয় করা হয়, তাহা নহে। টাকার বাজারে অর্থের যোগান-চাহিদার সমতা রক্ষার নিমিত্ত নিয়ন্ত্রণমূলক উপায় হিসাবেও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক সেগুলি বিক্রীত হয়। ইহা দ্বারা ব্যাঙ্কের হাতে যে উদ্‌বৃত্ত অর্থভাণ্ডার অনিযুক্ত অবস্থায় পড়িয়া থাকে, সেগুলিকে বাজার হইতে টানিয়া লওয়া হয়।

এখানে বিলাতের টাকার বাজারের এক প্রথার কথা বলা উচিত। লণ্ডনে ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার প্রদানের নিমিত্ত বাজারের লোকদের এক সংঘ (Market Syndicate) আছে, এবং তাহাদের প্রদত্ত দরকে Union Rate বলা হয়। কলিকাতার কিংবা বোম্বাইয়ের টাকার বাজারে কিন্তু এরূপ কোন সংঘ নাই, যদিও কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের টাকার বাজারে যাহারা টেণ্ডার দেয়, তাহারা সকলেই বড় বড় ব্যাঙ্ক এবং তাহাদের পক্ষে এরূপ সংঘ সংগঠন করা সম্পূর্ণ সম্ভবপর। ভারতের ট্রেজারী-বিল-বাজারের এক প্রধান গলদ এই যে, ব্যাঙ্ক ব্যতীত বাহিরের লোক বড়-একটা ট্রেজারী বিলের জন্য অধিক পরিমাণে টেণ্ডার দেয় না। লণ্ডনের ট্রেজারী বিলের বাজারে কিন্তু বাহিরের লোক যথেষ্ট পরিমাণে ট্রেজারী বিল ক্রয় করে। ইহার ফলে সেখানে সরকারের পক্ষে সুবিধাজনক দর পাওয়া সম্ভবপর হয়। ভারতের ট্রেজারী বিলের বাজারে বাহিরের লোক টেণ্ডার না দেওয়ার ফলে সরকারকে টেণ্ডারের জন্য একমাত্র ব্যাঙ্কসমূহের উপরই নির্ভর করিতে হয়। এই নিমিত্ত ট্রেজারী বিল বিক্রয়ের সাফল্যের জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে মধ্যে মধ্যে নিজেকেই (কখনও কখনও অন্য ব্যাঙ্কের মধ্যস্থতায়) ট্রেজারী বিল ক্রয় করিতে হয়। ট্রেজারী বিল বিক্রয়ের জন্য মোট যে টেণ্ডার গৃহীত হয় তাহার শতকরা ৯০ হইতে ৯৫ ভাগ ব্যাঙ্কসমূহ দেয়, এবং তাহার অর্ধেক ভাগ একা ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কই

দেয়। বাকি ৫ হইতে ১০ ভাগ ব্যক্তিবিশেষ বা প্রতিষ্ঠানবিশেষ কর্তৃক প্রদত্ত হয়।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ভারতে ট্রেজারী বিলের বাজার সুপ্রসারিত করিবার চেষ্টা করিতেছে, এবং এ বিষয়ে কিছু সাফল্যও লাভ করিয়াছে। সুপ্রসারিত ট্রেজারী বিলের বাজার দুই প্রকার সুফল প্রদান করে। প্রথমত, অধিকতর "ভাসমান ঋণ" বহন করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়া সরকারের দীর্ঘমেয়াদী ঋণ গ্রহণের খরচ কমাইয়া দেয়। এবং দ্বিতীয়ত, সুপ্রসারিত ও সুসংগঠিত ট্রেজারী বিলের বাজার দ্বারা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পক্ষে টাকার বাজারকে নিয়ন্ত্রিত করা সহজসাধ্য হয়। যেহেতু রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ট্রেজারী বিলগুলির মেয়াদ পূর্ণ হইবার আগে পুনরায় ক্রয় (rediscount) বা বিক্রয় করিতে পারে, সেই হেতু টাকার বাজারের সহিত তাহার যোগাযোগ সর্বদা অব্যাহত থাকে।

মুদ্দত উত্তীর্ণ হইলে ট্রেজারী বিলগুলি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের যে অফিস হইতে বিক্রীত হইয়াছিল, সেই অফিসে দাখিল করিলে উহার টাকা ফেরত পাওয়া যায়।

ট্রেজারী বিলের দর (খবরের কাগজে সব সময় "গড়" দরই প্রকাশিত হয়) টাকার বাজারে অর্থের যোগানের উপর নির্ভর করে। যখন টাকার বাজারে যথেষ্ট পরিমাণ সচ্ছলতা থাকে, তখন ট্রেজারী বিলের দর খুব কম হয়, এবং যখন বাজারে টাকার টান থাকে তখন ট্রেজারী বিলের দর খুব উঁচু থাকে। বলা বাহুল্য, ট্রেজারী বিলে টাকা খাটাইতে না পারিলে ব্যাঙ্কসমূহের অনেক টাকা অনেক সময়ই অনিযুক্ত থাকিয়া যাইত। ইহাতে ব্যাঙ্কসমূহের টাকা কর্জ দিবার দর, বাটার দর প্রভৃতি হ্রাস পাইত। সুতরাং ট্রেজারী বিলগুলির প্রচলন থাকা হেতু ব্যাঙ্কসমূহ টাকার বাজারের অন্যান্য বিভাগে অধিক দরে টাকা খাটাইবার সুযোগ পায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

"তলবী" ও স্বল্পমেয়াদী ঋণের বাজার

এ কথা আগেই বলা হইয়াছে যে, টাকার বাজার বলিতে আমরা সেই বাজারকে বুঝি যে-বাজারে টাকা বা "ক্রেডিট" অল্পদিনের মেয়াদে "কিনিতে" (ধার) পাওয়া যায়। "অল্পদিন" বলিতে এখানে ছয় মাসের অনধিক কাল বুঝায়। সাধারণত টাকার বাজারে যে কর্জ দাদন করা হয়, তাহার মুদ্দত ছয় মাসের অধিক কালের হয় না। এইখানেই মূল টাকার বাজারের সহিত মূলধনের বাজারের পার্থক্য। মূলধনের বাজার হইতে কর্জ গ্রহণ করে সাধারণত শিল্পপতিরা। গৃহীত কর্জের টাকা তাহারা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই খরচ করিয়া ফেলে— কারখানার জন্য ঘরবাড়ি নির্মাণ ও যন্ত্রপাতি কলকব্জা প্রভৃতি ক্রয় করিয়া। সুতরাং সে টাকার সহজে পুনরুদ্ধারের কোন সম্ভাবনা থাকে না। এক কথায় বলিতে গেলে সেইরূপ "ক্রেডিট" বা কর্জের মেয়াদ দীর্ঘ। সেইরূপ টাকা ধার দিতে পারে একমাত্র শিল্পসম্পর্কিত ব্যাঙ্কসমূহ (**Industrial Banks**)। সাধারণ বাণিজ্য সংক্রান্ত বা যৌথ মূলধনী (**Commercial or Joint Stock Banks**) আমানতী ব্যাঙ্কের পক্ষে সেরূপ টাকা ধার দেওয়া মুশকিল। সাধারণত বাণিজ্য সংক্রান্ত ব্যাঙ্কের অর্থভাণ্ডার আসে দেশের আমানতকারীদের কাছ হইতে। অসংখ্য লোকের খণ্ড খণ্ড অর্থভাণ্ডার আমানত হিসাবে তাহারা গ্রহণ করে এই শর্তে যে, যে কোন সময় চেক্ কাটিয়া আমানতকারীরা এই অর্থভাণ্ডার তুলিয়া লইতে পারে। সুতরাং নিমেষের আহ্বানে প্রদেয়— এই শর্তে গৃহীত আমানত যদি বাণিজ্য সংক্রান্ত ব্যাঙ্কসমূহ শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহের চিরস্থায়ী মূলধন যোগানের জন্য নিযুক্ত করে, তাহা হইলে সত্যই ইহা তাহাদের পক্ষে বিপদের কথা হইয়া দাঁড়ায়।

স্বল্পমেয়াদী কর্জদাদনই সেই কারণে টাকার বাজারের যথাযথ কাজ। টাকার বাজারে স্বল্পমেয়াদী কর্জদাদন সাধারণত দুই প্রকার—(১) "তলবী" বা আহ্বানে প্রদেয় (**Call Money**) ঋণ, ও (২) ছয় মাসের ন্যূনাধিক মেয়াদের

ব্যবসাবাণিজ্য সম্পর্কিত কর্জদাদন। "রাতারাতি"র (overnight) বা আট-দশ দিনের (weekly fixtures) শর্তে টাকার বাজারে যে কর্জদাদন করা হয়, তাহাকে "তলবী" বা "আহ্বানে প্রদেয়" (Call money) ঋণ বলা হয়। এইরূপ ধরনের ঋণগ্রহণ ও কর্জদাদন প্রধানত ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যেই নিবদ্ধ। সাময়িক চাহিদা মিটাইবার জন্য যখন কোন ব্যাঙ্কের টাকার অভাব ঘটে, তখন সেই ব্যাঙ্ক অপর কোন ব্যাঙ্কের নিকট হইতে "তলবী" ঋণ গ্রহণ করে। কখনও কখনও টাকার বাজারের উপর টান থাকিলে, কলিকাতার কোন কোন ব্যাঙ্ক হাটখোলার বণিক সম্প্রদায়ের (যেমন রায়-পরিবার প্রভৃতি) নিকট হইতেও এই শ্রেণীর ঋণ গ্রহণ করে। ভারতীয় ব্যাঙ্কসমূহ সাধারণত এই শ্রেণীর ঋণ গ্রহণ করে না, তাহারা এই শ্রেণীর কর্জ দেয়। বিনিময় ব্যাঙ্কসমূহই এই ধরনের কর্জ গ্রহণ করে। ইহার কারণ সহজেই অনুমেয়। বিনিময় ব্যাঙ্কসমূহ প্রধানত বিলাতী হুণ্ডীর কাজেই নিজেদের টাকা নিযুক্ত রাখে, এবং যেহেতু এই শ্রেণীর হুণ্ডী মুহূর্তের মধ্যে অপর ব্যাঙ্কের নিকট বেচিয়া ফেলা যায়, সেজন্য তাহারা নিজেদের তহবিলে খুব কম রোক টাকা রাখে। এই সকল ব্যাঙ্কের দৈনন্দিন কর্মের ইতিহাসে এমন অনেক মুহূর্ত আসে যখন যে পরিমাণ হুণ্ডীর মুদ্দত উত্তীর্ণ হইতেছে, তাহা অপেক্ষা অনেক বেশি পরিমাণ হুণ্ডী বাট্টাকরণের নিমিত্ত উপস্থিত হয়। তখনই তাহাদের নূতন রোক টাকার প্রয়োজন হয়, এবং সেই প্রয়োজন মিটাইবার জন্য তাহারা অপর ব্যাঙ্কের নিকট হইতে "তলবী" ঋণ গ্রহণ করে। তবে ভারতীয় ব্যাঙ্কসমূহ যে "তলবী" ঋণ গ্রহণ করে না, তাহা নহে। প্রয়োজন হইলে তাহারাও "তলবী" ঋণ গ্রহণ করে, এবং বিশেষ করিয়া তাহাদের সেই প্রয়োজন হয় বৎসরান্তে হিসাবের "শোভাবর্ধনের" (window dressing) জন্য, যখন তাহাদের রোক টাকার পরিমাণ বেশি করিয়া দেখাইতে হয়। এ কথা এখানে বলা প্রয়োজন যে, "তলবী" ঋণের কাজ কলিকাতার টাকার বাজার অপেক্ষা বোম্বাইয়ের টাকার বাজারেই অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে।

"তলবী" ঋণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বিশেষ করিয়া বৃদ্ধি পাইয়াছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া স্থাপিত হইবার পর। বর্তমানে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সহিত সংযুক্ত তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহকে আইন-নির্দিষ্ট শতকরা এক ন্যূনতম পরিমাণ রোক টাকা রাখিতে হয়, এবং যখনই কোন ব্যাঙ্কের এই ন্যূনতম

পরিমাণ হ্রাস পায়, তখনই সেই ব্যাঙ্ক টাকার বাজার হইতে "তলবী" ঋণ গ্রহণ করিয়া সেই অভাব পূরণ করে। এখন কথা হইতেছে এই যে—"তলবী" ঋণ গ্রহণ করিয়াই যখন অভাব মিটাইতে হয়, তখন রোক টাকার পরিমাণ তাহারা হ্রাস প্রাপ্ত হইতে দেয় কেন? তাহার কারণ এই যে, ব্যাঙ্কসমূহ বাণিজ্য বা শিল্পসংক্রান্ত ব্যাপারে যে সুদহারে রোক টাকা ধার দেয়, তাহা অপেক্ষা অনেক কম সুদহারে "তলবী" ঋণ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। সুতরাং উচ্চ সুদহারে নিজেদের তহবিলের রোক টাকা অপরকে ধার দেওয়া, ও সেই অভাব কম সুদহারের "তলবী" ঋণের দ্বারা পূরণ করা, সব সময়ই তাহাদের পক্ষে লাভজনক ব্যাপার।

যদিও বড় বড় ব্যাঙ্কসমূহ (প্রধানত বিনিময় ব্যাঙ্কসমূহ) বিনা বন্ধকেই "তলবী" ঋণ পায়, ছোটোখাটো ব্যাঙ্কসমূহকে কোম্পানির কাগজ, ট্রেজারী বিল প্রভৃতি জমা রাখিয়া তবে "তলবী" ঋণ গ্রহণ করিতে হয়।

"তলবী" ঋণের সুদহার টাকার বাজারে যোগান-চাহিদার অবস্থার উপর নির্ভর করে। বলা বাহুল্য, যখন ব্যবসাবাণিজ্য চলে ভালো, তখন "তলবী" ঋণের সুদহার থাকে উঁচু, আর মন্দার সময় সুদহার থাকে নিচু। সাধারণত নভেম্বর-ডিসেম্বর মাস হইতে সুদহার উঠিতে থাকে, এবং মে-জুন মাস হইতে সুদহার পড়িতে থাকে। ব্যতিক্রম যে ইহার কখনও ঘটে না, তাহা নহে। অসময়ে যখন অধিক পরিমাণ ট্রেজারী বিলের মুদ্দত উত্তীর্ণ হইয়া টাকার বাজারে অর্থস্বচ্ছলতার সৃষ্টি করে, তখন "তলবী" ঋণের সুদহার পড়িয়া যায়, এবং শেয়ার-বাজার প্রভৃতিতে অধিক পরিমাণ ফাট্কার দরুন বা বহির্বাণিজ্য সম্পর্কিত হুণ্ডী কেনার দরুন যখন বাজারে অর্থকৃচ্ছ্রতা ঘটে, তখন "তলবী" ঋণের সুদহার বৃদ্ধি পায়। "তলবী" ঋণের সাধারণ সুদহার আজকাল প্রতি শত টাকায় চার আনা হইতে এক টাকা পর্যন্ত।

এইবার "স্বল্পমেয়াদী" কর্জদাদনের কথা কিছু বলা যাইতেছে। আজকাল এ দেশের ব্যাঙ্কসমূহের আমানতের প্রায় ২৫ হইতে ৪০ শতাংশ এইরূপ কাজে নিযুক্ত থাকে। এই শ্রেণীর লেনদেন সাধারণত দুই প্রকার—(১) কর্জদাদন ও (২) ক্যাশক্রেডিট্। কর্জদাদনের সময় ব্যাঙ্ক খাতকের নিকট হইতে একখানা হ্যাণ্ডনোট লিখাইয়া লয়, এবং শেয়ার, কোম্পানির কাগজ, জীবন-বীমাপত্র বা ঐ রকম কোন কিছু বন্ধক রাখে। হ্যাণ্ডনোটে যত টাকা লেখা

থাকে, তত টাকার উপরই খাতককে মাসে মাসে সুদ দিয়া যাইতে হয়। এবং যে 'সময় ঋণ পরিশোধ করিবার শর্ত থাকে, সেই সময় খাতক টাকাটা প্রত্যর্পণ করিলেই কর্জ হিসাব বন্ধ হইয়া যায়।

. "ক্যাশক্রেডিট"-এ টাকা ধার লওয়া কিন্তু অন্য রকম। আমানতকারী ব্যাঙ্কের নিকট যত টাকা আমানত রাখেন, এই হিসাবে তিনি তাহা অপেক্ষা অনেক বেশি টাকা চেক্ কাটিয়া বাহির করিয়া লইতে পারেন। আমানত অপেক্ষা যে পরিমাণ অধিক টাকা এই হিসাবে লওয়া হয়, সেই পরিমাণ "ঘাটতি" তাঁহার হিসাবে দেখানো হয়। যে মাসে যেরূপ "ঘাটতি" হয়, ব্যাঙ্ক সেই পরিমাণের (Overdraft) উপরই সুদ লয়। ইহাতে খাতকের যে পরিমাণ টাকার প্রয়োজন হয়, মাত্র তাহারই উপর সুদ দিতে হয়। ক্যাশ-ক্রেডিটের সুদহার কিন্তু সাধারণ কর্জদাদনের সুদহার অপেক্ষা বেশি। অবশ্য সাধারণ কর্জদাদনের কোন নির্দিষ্ট সুদহার নাই। যে জিনিস বন্ধক রাখা হইতেছে তাহার উপর ইহা নির্ভর করে। কোম্পানির কাগজ বা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শেয়ার বাঁধা রাখিয়া টাকা লইলে যদি তিন টাকা সুদ দিতে হয়, তাহা হইলে চটকল বা কাপড়ের কলের শেয়ার বাঁধা রাখিয়া টাকা লইলে পাঁচ টাকা সুদ দিতে হয়। আবার, জীবনবীমাপত্র বাঁধা রাখিয়া টাকা লইলে ছয় টাকা সুদ দিতে হইবে। এবং এইরূপ কর্জদাদনে যদিও ব্যাঙ্ক জমিজমা, ঘরবাড়ি ও কলকজা বাঁধা রাখে না, তথাপি যদি বা রাজী হয়, তাহা হইলে অন্তত সাত টাকা সুদ চাহিবে।

সপ্তম অধ্যায়

বন্ধকী কর্জ

আমরা আগের অধ্যায়ে দেখিয়াছি যে, খাতকের নিকট হইতে একখানা হ্যাণ্ডনোট লিখাইয়া লইয়া কোন মাল বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার দিবার রীতি •ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে প্রচলিত আছে। এই ভাবে মাল বন্ধক রাখিবার ইংরেজীতে নানা রকম নাম আছে। যথা, **Assignment, Mortgage, Lien, Pledge** ও **Hypothecation**। এই সকল শব্দের অর্থসম্বন্ধে এখানে কিছু

বলা প্রসঙ্গসঙ্গত। Assignment বা "হস্তান্তর"-এ মালের স্বত্ব সম্পূর্ণভাবে ব্যাঙ্কের হাতে বর্তাইয়া থাকে। কিন্তু কখনও কখনও ঋণ পরিশোধ করিয়া মাল ফেরত পাইবার অধিকারও খাতকের থাকে। যেমন, যদি কোন বীমাপত্র ব্যাঙ্কের নামে হস্তান্তরিত করা হয়, তাহা হইলে তাহার স্বত্ব সম্পূর্ণরূপে ব্যাঙ্কেরই অর্শাইয়া থাকে, কিন্তু ব্যাঙ্কের পক্ষে এরূপ বাধ্যবাধকতা থাকিতে পারে যে খাতক যখন ঋণ পরিশোধ করিবেন ব্যাঙ্ক তখন উক্ত বীমাপত্র আবার তাঁহার নামে পুনঃহস্তান্তর (re-assign) করিয়া দিবে। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত উহা ব্যাঙ্কের নামে হস্তান্তরিত হইয়া থাকিবে, ততদিন উহার উপর খাতকের কোন অধিকার, দাবি বা স্বত্ব থাকিবে না। Mortgage-ও অনেকটা Assignment-এর মত, শুধু প্রভেদ এই যে Mortgage-এর সহিত সব সময়ই ঋণ পরিশোধ করিয়া মাল পুনঃপ্রাপ্তির অধিকার (equity of redemption) খাতকের থাকে. কিন্তু Assignment-এর বেলায় এরূপ কোন অধিকার না থাকিতেও পারে।

Lien বলিতে সেই অধিকার বুঝায় যে-অধিকারে কোন লোক অপরের স্বত্ববিশিষ্ট মাল নিজের অধিকারে ততদিন রাখিতে পারে যতদিন না অধিকৃত মালের উপর তাহার দাবি শেষোক্ত ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে ও সন্তোষজনকভাবে মিটাইয়া দেয়।* মনে করুন, আপনি জামা তৈয়ারি করিবার জন্য দর্জিকে কাপড় দিয়াছেন। এখানে জামা তৈয়ারির মজুরি বাবদ আপনার কাপড়ের উপর দর্জির Lien আছে। ব্যাঙ্ক যখন শেয়ারপত্র, কোম্পানির কাগজ প্রভৃতি জমানত রাখিয়া টাকা ধার দেয়, তখন উক্ত কাগজপত্রের উপর ব্যাঙ্কের সব সময়ই Lien থাকে।

Pledge বলিতে সেইরূপ ধরনের বন্ধক বুঝায়, যাহার মূলগত শর্ত হয় এই যে, বন্ধকী মাল সব সময়ই উত্তমর্ণের দখলে থাকিবে, এবং খাতক যদি নিয়মিত সুদ দিতে বা শর্ত অনুযায়ী ঋণ পরিশোধ করিতে অক্ষম হয়, তাহা হইলে উত্তমর্ণ তাহার নামে নালিশ করিতে পারে বা খাতককে যথাযথ নোটিশ দিয়া

* Lien is the right which a person has to retain that which is in his possession belonging to another until certain demands on the latter by the person in possession are satisfied (Hammond *vs.* Barclay 2 East 227).

ঐ মাল বিক্রয় করিয়া দিতে পারে। Hypothecation-এর বেলায় কিন্তু উত্তমর্ণ কোন আদালতের আদেশ ব্যতিরেকে মাল বিক্রয় করিতে পারে না।

কাঁচা মাল বা প্রস্তুত মালের উপর টাকা ধার দেওয়ার প্রথা, সকল দেশেরই ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে প্রচলিত আছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন রকম নিয়ম আছে, এবং এই নিয়ম নির্ভর করে অনেকটা দেশের অর্থনীতির উপর। ইংলণ্ড শিল্পপ্রধান দেশ; কাঁচা মাল ইংলণ্ডে উৎপন্ন হয় না, আমদানি হয় মাত্র। সুতরাং আমদানি সম্পর্কিত দলিলসমূহ সব সময়ই কাঁচা মালের সহিত সংযুক্ত থাকে। সেইজন্য এই সকল দলিল বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার দেওয়া সেখানকার ব্যাঙ্কসমূহের পক্ষে সহজ ব্যাপার।

কৃষিজাত পদার্থ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে প্রধান স্থান অধিকার করে। কিন্তু সেখানে অনুমোদিত গুদাম প্রভৃতি বর্তমান থাকায় এই সকল গুদামে রক্ষিত মাল সম্পর্কিত সার্টিফিকেট, দলিল ও কাগজপত্রের বন্ধকীতে টাকা ধার দেওয়া সেখানেও সহজ।

আমাদের ভারতবর্ষও কৃষিপ্রধান দেশ। কিন্তু এখানে অনুমোদিত গুদাম বা মালরক্ষণের স্থান না থাকার দরুন, এখানে কৃষিজাত কাঁচামাল সম্পর্কিত দলিল বা কাগজপত্রের বিশেষ অভাব অনুভূত হয়। এই কারণে কৃষিজাত মালের পরিবর্তে টাকা ধার দেওয়ার রেওয়াজ খুব কম।

বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার দেওয়ার সময় ব্যাঙ্ক মাত্র এইরূপ জিনিসই বন্ধক রাখে, যাহা ইচ্ছামত সহজে বেচিয়া ফেলিয়া পাওনা পরিষ্কার করিয়া লইতে পারে। সেইজন্য দেখা যায় যে, ব্যাঙ্ক কোন যৌথ প্রতিষ্ঠানের জমিজমা, ঘরবাড়ি, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি বন্ধক রাখিয়া কর্জদাদন করিতে নারাজ, কিন্তু ঐ প্রতিষ্ঠানের শেয়ার বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার দিতে সব সময়ই প্রস্তুত। কেননা, ব্যাঙ্ক জানে যে, ঐ জমিজমা, ঘরবাড়ি, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি সহজে বিক্রয় করা চলে না, কিন্তু শেয়ার যখন ইচ্ছা তখনই বিক্রয় করিয়া ফেলা চলে।

যৌথ কোম্পানির শেয়ার বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার দেওয়া ব্যাঙ্কের সাধারণ কাজের অন্যতম। কিন্তু লোকে শেয়ার বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার লয় কেন? যখন শেয়ার-বাজার তেজী থাকে, তখন বহু লোক শেয়ার-বাজারের স্পেকুলেশনে মাতিয়া যায়। ইহাদের মধ্যে অনেকেরই নগদ টাকা দিয়া শেয়ার "ডেলিভারী" লইবার ক্ষমতা থাকে না। তাঁহারা ব্যাঙ্কের সহিত একটি

"ওভারড্রাফ্‌ট্‌" হিসাব খুলেন। ঐ হিসাবে তাঁহারা ব্যাঙ্কের নিকট শেয়ার-গুলি জমানত রাখিয়া তাহার বিপক্ষে টাকা ধার লয়েন। তাঁহাদের আশা এই যে, ঐ শেয়ারের দাম আর কিছু চড়িলেই উহা বিক্রয় করিয়া দিয়া ব্যাঙ্কের টাকা শোধ করিয়া দেওয়া যাইবে। অবশ্য শেয়ারের দাম চড়িলে ব্যাঙ্কের কোন লোক্‌সান নাই। কিন্তু দাম যদি হঠাৎ পড়িয়া যায়, তাহা হইলে ঐ শেয়ার ব্যাঙ্কের ঘাড়েই চাপিয়া বসে। এই কারণে ব্যাঙ্ক শেয়ার বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার দেওয়ার সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করে। প্রথমত, ব্যাঙ্ক কখনও এক শ্রেণীর শেয়ার একই সময়ে বন্ধক রাখিয়া বহু টাকা ধার দেয় না, এইরূপ কর্জদাদন তাহারা নানা শ্রেণীর শেয়ারের (যেমন চটকলের শেয়ার, কয়লাখনির শেয়ার, কাপড়কলের শেয়ার প্রভৃতি) মধ্যে বিস্তার করিয়া দেয়। মতলব এই যে, সকল শ্রেণীর শেয়ারেরই একই সময় অবস্থা-বিপর্যয় ঘটে না। ইহাতে ব্যাঙ্কের মার খাইবার সম্ভাবনা থাকে না। দ্বিতীয়ত, ব্যাঙ্ক সব সময়ই উপযুক্ত "মার্জিন" রাখিয়া টাকা ধার দেয়। তাহার মানে এই যে, শেয়ারের পুরা বাজারদাম পর্যন্ত কর্জ না দিয়া, কিছু হাতে রাখিয়া টাকা ধার দেয়। সাধারণ ব্যাঙ্ক প্রথম শ্রেণীর (যেমন কোম্পানির কাগজ, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বা ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্কের শেয়ার প্রভৃতি) শেয়ারের বাজারদামের শতকরা ৮০।৯০ টাকা পর্যন্ত ধার দেয়; কিন্তু চটকল, কাপড়ের কল, চিনির কল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের অর্ডিনারী শেয়ার রাখিয়া শতকরা মাত্র ৫০।৬০ পর্যন্ত টাকা ধার দেয়। আবার খনিজ শেয়ারের বেলায় আরও কম টাকা ধার দেয়। জীবন-বীমাপত্র বন্ধক রাখিয়াও ব্যাঙ্ক টাকা ধার দেয়। কিন্তু এরূপভাবে টাকা ধার দিবার সময় তাহারা বীমার "প্রত্যর্পণ-মূল্যের" (Surrender value) মাত্র শতকরা ৯০ টাকা পর্যন্ত ধার দেয়।

এ কথা এখানে বলা প্রয়োজন যে, কোম্পানির কাগজ বন্ধক আর যৌথ কোম্পানির শেয়ার বন্ধক একই রকমভাবে ঘটে না। তাহার কারণ, কোম্পানির কাগজ যেরূপ ধরনের "সম্প্রদেয়" (Negotiable) সাধারণ যৌথ কোম্পানির শেয়ার সেরূপ ধরনের নহে। কোম্পানির কাগজের পিছনে খাতক সহি করিয়া দিলেই ঐ কাগজের সমস্ত স্বত্ব সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাঙ্কের উপর বর্তায়, কিন্তু শেয়ারের বেলায় এরূপ করা চলে না। খাতককে একখানা "বয়নামা"তে (Transfer Deed) বিক্রেতা হিসাবে নাম সহি করিয়া স্ট্যাম্প লাগাইয়া

ব্যাঙ্ককে দিতে হয়। ইহা ব্যতীত ব্যাঙ্ক খাতকের নিকট হইতে একখানা বন্ধকী তমসুক লিখাইয়া লয়। জীবনবীমাপত্র বন্ধক রাখিবার সময়ও অনুরূপ প্রণালী অনেকটা অবলম্বিত হয়। এক কথায়, যেরূপ ধরনেরই বন্ধক হউক না কেন, খাতককে ব্যাঙ্কের নিকট একখানা বন্ধকী খত লিখিয়া দিতে হয়। বন্ধকী খতের ওয়াদার তারিখের পরও এক বৎসর কাল উহা কার্যকরী থাকে। সেইজন্য ঐ সময়ের মধ্যে টাকা আদায়ের চেষ্টা না করিলে বন্ধকী খত বাতিল হইয়া যায়। অবশ্য বলা বাহুল্য যে, বিল বা হুণ্ডীর বেলায় কিন্তু এরূপ কোন খতের প্রয়োজন হয় না। প্রাপ্তা উহার পিছনে সহি করিয়া দিলেই কাজ মিটিয়া যায়। তখন সকল স্বত্ব ব্যাঙ্কে অর্শায়। তবে বিল যদি "শুদ্ধ" (Clean) না হয়, তাহা হইলে একখানা বন্ধকী তমসুকের প্রয়োজন হয়।

শেয়ারের ন্যায় সোনা রূপা বন্ধক রাখিয়াও ব্যাঙ্ক টাকা ধার দেয়। সোনা-রূপার বাজারেও যথেষ্ট "স্পেকুলেশন" বা ফাটকা হইয়া থাকে। প্রতিদিন হাজার হাজার তোলা সোনারূপার কেনাবেচার কাজ ফাটকাওয়ালারা করিয়া থাকে, এবং ইহার দরুন তাহাদের যে টাকার প্রয়োজন হয় তাহার জন্য তাহা-দিগকে ব্যাঙ্কের শরণাপন্ন হইতে হয়। ইহা ব্যতীত সাধারণ লোকও সোনা রূপা ও জড়োয়ার গহনা ইত্যাদি বন্ধক রাখিয়া ব্যাঙ্কের নিকট হইতে টাকা ধার লয়। সোনারূপার বন্ধকীতে ব্যাঙ্ক বাজারদামের শতকরা ৮০৲ টাকা পর্যন্ত ধার দেয়।

যদিও ব্যাঙ্ক নানারকম জিনিস বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার দেয়, তথাপি সকল রকম বন্ধকী কর্জের সুদ এক রকম নহে। সহজ কথায় বলিতে গেলে, যে জিনিস যত শীঘ্র বেচিয়া ফেলা যায় এবং যাহাতে লোকসানের ঝুঁকি থাকে কম তাহার উপর সুদের হার হয় তত কম। আর যাহা বেচিতে বেগ পাইতে হয়, এবং যাহাতে মার খাইবার সম্ভাবনাও বেশি থাকে, তাহার উপর সুদের হারও তত বেশি। সাধারণত জমিজমা বন্ধকী কর্জের উপর সুদের হার সর্বাপেক্ষা বেশি, কেননা এগুলি বিক্রয় করা ব্যাঙ্কের পক্ষে বড়ই অসুবিধাকর। (প্রথম মহাযুদ্ধের পর ব্যাঙ্কসমূহ জমিজমা বন্ধক রাখিয়া পরবর্তী কালে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল বলিয়া অধুনা এইরূপ ধরনের কাজ তাহারা বড় একটা করে না।)

মোট কথা, ব্যাঙ্ক এমন কোন মাল বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার দেয় না,

যাহার বাজার খুব সংকীর্ণ, অথবা যাহা খুব সহজে নষ্ট হইয়া যায়। জিনিসটা চলতি মার্কামারা জিনিস হওয়া চাই, তাহা না হইলে ব্যাঙ্কের পক্ষে তাহার মূল্য নিরূপণ করাও কঠিন, এবং প্রয়োজন হইলে বেচিয়া ফেলাও মুশকিল।

অষ্টম অধ্যায়

ক্লিয়ারিং হাউস

বর্তমান জগতের দেনাপাওনা অধিকাংশ স্থলেই চেকের সাহায্যে মিটানো হইয়া থাকে। আমানতকারীরা ব্যাঙ্কের নিকট যে টাকা গচ্ছিত রাখে, সেই টাকাই প্রয়োজনানুযায়ী তাহারা চেকের সাহায্যে তুলিয়া লয়। চেকও হুণ্ডী-বিশেষ।* চেক কিন্তু "Legal tender" নহে—তাহার মানে, ঋণ পরিশোধের জন্য আমরা কাহাকেও চেক গ্রহণ করিতে আইনত বাধ্য করাইতে পারি না। অথচ, আমরা প্রত্যহ চোখের সামনে দেখিতে পাইতেছি যে, লক্ষ লক্ষ টাকার দেনাপাওনা চেকের সাহায্যেই মিটানো হইতেছে এবং লোকে তাহা স্বচ্ছন্দ-মনে গ্রহণ করিতেছে। তাহার কারণ কি? তাহার কারণ, লোকে জানে যে ঐ চেক প্রদানকারীর ব্যাঙ্কারের নিকট প্রদান করা মাত্র উহার টাকা পাওয়া যাইবে।

চেক সাধারণত দুই শ্রেণীর হইয়া থাকে—এক শ্রেণীর চেক ব্যাঙ্কে প্রদান করা মাত্র টাকা পাওয়া যায়, ও আর এক শ্রেণীর চেক কাহারও হিসাবে জমা না দিলে টাকা পাওয়া যায় না। প্রথম শ্রেণীর চেককে Bearer চেক ও দ্বিতীয় শ্রেণীর চেককে Crossed চেক বলা হয়। শেষোক্ত শ্রেণীর চেক ব্যাঙ্কে লইয়া গেলে টাকা পাওয়া যায় না। তাহা গ্রহীতার হিসাবে জমা দিতে হয়। মনে করুন, আমি রামকিষণ হরবিলাসলালের নিকট হইতে এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের উপর কাটা একখানা ৫০০্ টাকার Crossed চেক পাইয়াছি। এই চেকখানি এলাহাবাদ ব্যাঙ্কে লইয়া গেলে তাহারা আমাকে উহার দরুন টাকা দিবে না। এখন আমার (বা আমার পরিচিত অন্য কাহার) যদি লয়েড্স্

* "A bill of exchange drawn on a banker payable on demand".

(বা অন্য যে কোন) ব্যাঙ্কের সহিত হিসাব থাকে, তাহা হইলে আমাকে উহা লয়েড্‌স্ (বা সেই) ব্যাঙ্কে জমা দিতে হইবে। তাঁহারা পাওয়ামাত্রই আমার হিসাবে উহা তৎক্ষণাৎ জমা করিয়া লইবেন। এখন কথা হইতেছে এই যে, লয়েড্‌স্ ব্যাঙ্ক কি ভাবে এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঐ টাকা আদায় করিয়া লইবে! যে প্রতিষ্ঠানের ভিতর দিয়া লয়েড্‌স্ ব্যাঙ্ক এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঐ টাকা আদায় করিয়া লইবে তাহাকে "ক্লিয়ারিং হাউস" (বা নিকাশ-ঘর) বলা হয়।

কয়েক বৎসর আগে পর্যন্ত কলিকাতায় মাত্র এক রকম ক্লিয়ারিং-এর ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু বর্তমানে একাধিক ব্যবস্থা আছে। যথাক্রমে তাহা—(১) কলিকাতা ক্লিয়ারিং হাউস, (২) সাব-ক্লিয়ারিং, (৩) পাইওনিয়ার ক্লিয়ারিং, ও (৪) মেট্রোপলিটান ক্লিয়ারিং।

এই চারি প্রকার ক্লিয়ারিং-এর মধ্যে প্রথম তিন প্রকার পরস্পর পরস্পরের সহিত সংযুক্ত ও সংশ্লিষ্ট, কিন্তু চতুর্থটি সম্পূর্ণ পৃথক ও প্রথম তিনটির সহিত একেবারে সংযোগবিহীন। কলিকাতা ক্লিয়ারিং হাউসই কলিকাতার প্রাচীনতম ক্লিয়ারিং প্রতিষ্ঠান, এবং সাব-ক্লিয়ারিং ও পাইওনিয়ার ক্লিয়ারিং ইহারই অন্তর্গত। যদিও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনে এইরূপ নির্দেশ আছে যে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে চেক-ক্লিয়ারিং-এর ব্যবস্থা করিতে হইবে, তথাপি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এ যাবৎকাল উহার কোন ব্যবস্থা করে নাই। সেইজন্য কলিকাতা ক্লিয়ারিং হাউসের ভিতর দিয়া চেক-ক্লিয়ারিং-এর প্রাচীন পদ্ধতি এখনও চলিয়া আসিতেছে। কলিকাতা ক্লিয়ারিং হাউসের কার্যালয় হইতেছে ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্কের অফিসে। ইহার নিজ সভ্যবৃন্দের সংখ্যা ৪২টি ব্যাঙ্ক। ইহা ব্যতীত, পাঁচটি সাব-ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্ক ও ১৫টি পাইওনিয়ার ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্ক ইহার সভ্যবৃন্দের মধ্যস্থতার ভিতর দিয়া সংযুক্ত।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে কলিকাতা ক্লিয়ারিং হাউসের কার্যালয় হইতেছে ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্কের অফিসে। এখানে একটি বিরাট হলে ৪২টি সভ্য-ব্যাঙ্কের জন্য পর পর ৪২টি টেবিল আছে। প্রতি টেবিল অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন, প্রতি সভ্য-ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিস্বরূপ এক-একজন কর্মচারী—তাঁহাদিগকে সাধারণত ক্লিয়ারিং-বাবু বলা হয়। ইহা ব্যতীত ক্লিয়ারিং হাউসের কর্ম তদারকের নিমিত্ত একজন ক্লিয়ারিং-হাউস-অফিসার

ও তাঁহার সহকারী কর্মচারীগণ আছেন—ইহাদের কাজ হইতেছে ক্লিয়ারিং হাউসের সমস্ত কার্য পরিদর্শন করা ও হিসাব নিষ্পত্তি করা।

ক্লিয়ারিং হাউসের কাজ আরম্ভ হয় ১০টার সময়। প্রতিদিন বেলা ১১টার সময় সভ্য-ব্যাঙ্কের অফিস হইতে এক-একজন ক্লিয়ারিং-বাবু ক্লিয়ারিং চেকসমূহের প্রথম দফা সঙ্গে লইয়া গিয়া ক্লিয়ারিং হাউসে নিজ নিজ টেবিল অধিকার করেন। ক্লিয়ারিং-এর বাকি চেকসমূহ ব্যাঙ্কের দুই-একজন কর্মচারী মারফৎ পরে ১২টার সময় ক্লিয়ারিং হাউসে পৌঁছাইয়া দেওয়া হয়।

এখন দেখা যাউক, চেকগুলি কি ভাবে ক্লিয়ারিং হাউসে পৌঁছাইয়া দেওয়া হয়। প্রতি সভ্য-ব্যাঙ্ক অপর সভ্য-ব্যাঙ্কের উপর কাটা যে চেকসমূহ নিজ আমানতকারীদের নিকট হইতে পায়, সেগুলি লইয়া এক-একটি স্বতন্ত্র বাণ্ডিল তৈয়ারি করে। (তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে উপরি-উক্ত দৃষ্টান্তে লয়েড্‌স্ ব্যাঙ্ক আমার নিকট হইতে প্রাপ্ত চেকখানি এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের বাণ্ডিলে রাখিবে।) তারপর প্রতি বাণ্ডিলের জন্য এক-একটি পৃথক হিসাব-তালিকা প্রস্তুত হয়। এগুলিকে চার্জেস্ (charges) বলা হয়। প্রতি ব্যাঙ্কের কর্মচারীগণ প্রতি সভ্য-ব্যাঙ্কের নামে প্রস্তুত এইরূপ স্বতন্ত্র চেকের বাণ্ডিল ও হিসাব-তালিকা ক্লিয়ারিং হাউসে লইয়া যায়।

ক্লিয়ারিং হাউসের দুইটি বিভাগ আছে—Out-clearing ও In-clearing। যে চেকগুলি অপর সভ্য-ব্যাঙ্ককে দেওয়া হয় (তাহার মানে উপরি-উক্ত দৃষ্টান্তে যেগুলি লয়েড্‌স্ ব্যাঙ্ক এলাহাবাদ ব্যাঙ্ককে দিতেছে) তাহাকে Out-clearing বলা হয়। আর যে চেকগুলি এক ব্যাঙ্ক (তাহার মানে যেগুলি লয়েড্‌স্ ব্যাঙ্কের উপর কাটা এবং যাহা লয়েড্‌স্ ব্যাঙ্ক এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে লইতেছে) অপর সভ্য-ব্যাঙ্কের নিকট হইতে গ্রহণ করে তাহাকে In-clearing বলা হয়। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে ইহা দুইটি স্বতন্ত্র বিভাগ নহে,—এক ব্যাঙ্কের Out-clearing অপর ব্যাঙ্কের In-clearing-এ রূপান্তরিত হয় মাত্র।

ক্লিয়ারিং হাউসের কাজ আরম্ভ হওয়ামাত্র লয়েড্‌স্ ব্যাঙ্কের কর্মচারী Out-clearing চেকের বাণ্ডিল হিসাব-তালিকা সমেত এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের প্রতিনিধির টেবিলে পৌঁছাইয়া দিবে। এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের কর্মচারী আবার লয়েড্‌স্ ব্যাঙ্কের উপর কাটা Out-clearing চেকের বাণ্ডিল হিসাব-তালিকা

সমেত লয়েড্‌স্‌ ব্যাঙ্কের প্রতিনিধির টেবিলে পৌঁছাইয়া দিবে। উভয় ব্যাঙ্কই তারপর প্রাপ্ত চেকগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষার জন্য নিজ নিজ ব্যাঙ্কের নিকট প্রেরণ করিবে। ইহার পর হিসাবনিকাশ চলিবে। পরস্পরের Out-clearing ও In-clearing চেকের মধ্যে যে অঙ্কের ব্যবধান থাকিবে, তাহা Imperial Bank-এর উপর একখানি চেক কাটিয়া পরিশোধ করা হইবে। এই নিমিত্ত প্রতি সভ্য-ব্যাঙ্ককেই Imperial Bank-এ নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা জমা রাখিতে হয়।

এইবার দেখা যাউক, সাব-ক্লিয়ারিং ও পাইওনিয়ার ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্কসমূহ কি ভাবে তাহাদের চেক নিকাশ (clear) করে। এই দুইটির চেক-নিকাশপ্রথা সম্পূর্ণ পৃথক, যদিও উভয়েই কোন-না-কোন সভ্য-ব্যাঙ্কের মধ্যস্থতায় এই কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। উভয়কেই কোন-না-কোন সভ্য-ব্যাঙ্কের সহিত এই নিমিত্ত হিসাব রাখিতে হয়। কিন্তু সাব-ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্কসমূহকে ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্কেও টাকা জমা রাখিতে হয়, 'পাইওনিয়ার'কে রাখিতে হয় না। সাব-ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিগণ সরাসরি ক্লিয়ারিং হাউসে যাইয়া চেক নিকাশ করে, কিন্তু পাইওনিয়ার ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্কসমূহ তাহা পারে না। সাব-ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিগণ ক্লিয়ারিং হাউসে নিজেদের Principal সভ্য-ব্যাঙ্কের টেবিলের কাছে হাজির থাকে। তাহারা In-clearing চেকসমূহ অপর সভ্য-ব্যাঙ্কসমূহের নিকট হইতে নিজেরাই সরাসরি গ্রহণ করে, কিন্তু তাহাদের Out-clearing চেকসমূহ নিজ Principal সভ্য-ব্যাঙ্কের মধ্যস্থতায় প্রদান করে। একটা দৃষ্টান্ত দিলে বোধ হয় জিনিসটা একটু পরিষ্কার বুঝা যাইবে। ধরুন, বেঙ্গল ব্যাঙ্ক সাব-ক্লিয়ারিং-এর অন্তর্গত এবং ঈস্টার্ন ব্যাঙ্কের সহিত তাহাদের ক্লিয়ারিং ব্যবস্থা আছে। চেক নিকাশের নিমিত্ত বেঙ্গল ব্যাঙ্কের প্রতিনিধি ক্লিয়ারিং হাউসে ঈস্টার্ন ব্যাঙ্কের টেবিলের ধারে হাজির থাকে। ক্লিয়ারিং হাউসের অন্যান্য সভ্য-ব্যাঙ্কসমূহ বেঙ্গল ব্যাঙ্কের উপর কাটা চেকসমূহ Out-clearing-এর সময় তাহাদের কর্মচারী মারফৎ বেঙ্গল ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিকে সরাসরি প্রদান করে। কিন্তু বেঙ্গল ব্যাঙ্ক অন্যান্য সভ্য-ব্যাঙ্কের উপর কাটা যে চেকসমূহ নিজে পায়, তাহা ঈস্টার্ন ব্যাঙ্কের মধ্যস্থতায় অপরকে প্রদান করে। এক কথায় বলিতে গেলে, সাব-ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্কসমূহ ক্লিয়ারিং হাউসে সরাসরি In-clearing করিতে পারে, কিন্তু Out-clearing করিতে পারে না।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে পাইওনিয়ার ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্কসমূহ কলিকাতা ক্লিয়ারিং হাউসের সদস্য নহে। কিন্তু সদস্য না হইলেও ক্লিয়ারিং হাউসের কোন-না-কোন সভ্য-ব্যাঙ্কের মধ্যস্থতায় তাহাদের চেক নিকাশ করিবার ব্যবস্থা আছে। এই জন্য পাইওনিয়ার ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্কসমূহকে উক্ত সভ্য-ব্যাঙ্কের সহিত হিসাব রাখিতে হয়। এই ধরুন, ব্যাঙ্ক অব আসাম। পাইওনিয়ার ক্লিয়ারিং-এর ইহা অন্তর্গত ও কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের সহিত ইহার চেক নিকাশের ব্যবস্থা আছে। ব্যাঙ্ক অব আসামের কোন প্রতিনিধি ক্লিয়ারিং হাউসে যাইতে পারে না। কিন্তু তাহাদের In-clearing ও Out-clearing এই উভয় প্রকারের কাজই তাহাদের তরফ হইতে কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ক্লিয়ারিং হাউসে সম্পাদন করিয়া থাকে।

পূর্বে কলিকাতায় চেক নিকাশ দুইবার হইত—একবার সাড়ে এগারোটার সময় ও আর একবার দেড়টার সময় (ও তৎপূর্বে ছিল ১২টা ও ২টার সময়), এখন কিন্তু চেক নিকাশ একবারই হইয়া থাকে। চেক ফেরত দিবারও পূর্বে দুইটা সময় ছিল,—একবার ২টার মধ্যে ও আর একবার ৪॥০টার মধ্যে। পরে চেক ফেরত দিবার একটিই সময় নির্দিষ্ট ছিল—বেলা ৩।০টার মধ্যে। বর্তমানে চেক ফেরত দেওয়া হয় অন্যান্য বারে বেলা ২॥০টার মধ্যে এবং শনিবার ১টা ৪৫ মিনিটের মধ্যে।

চেক ফেরত ব্যাপারটি কি, তাহা এখানে বলা প্রয়োজন। আমরা দেখিয়াছি যে ক্লিয়ারিং হাউসে পরস্পর পরস্পরকে চেকের বাণ্ডিল প্রদান করে, এবং ঐ সকল চেকে লিখিত টাকার হিসাবনিকাশও হইয়া যায়। এখন ইহার মধ্যে এমন অনেক চেক থাকে, যাহাতে কোন-না-কোনরূপ গলদ থাকার দরুন গ্রহীতা-ব্যাঙ্ক টাকা দেওয়া সম্ভবপর বলিয়া মনে করে না। এইরূপ চেকগুলি তখন প্রদানকারী-ব্যাঙ্কের নিকট ফেরত দেওয়া হয়। প্রাক্‌যুদ্ধকালে প্রথম নিকাশের (clearing) এইরূপ চেকগুলি প্রদানকারী-ব্যাঙ্কের নিকট ২টার মধ্যে সরাসরি পৌছাইয়া দেওয়া হইত। কেবলমাত্র দ্বিতীয় নিকাশের (clearing) চেকগুলিই ক্লিয়ারিং হাউসের ভিতর দিয়া যাইত। তারপর, যুদ্ধের প্রথম দিকে যে কোন নিকাশেরই চেক হউক না কেন, সমস্ত গলতি (irregular) চেকই ক্লিয়ারিং হাউসের ভিতর দিয়া ৩-৩০ মিনিটের মধ্যে ফেরত দেওয়া হইত। বর্তমানে ২-৩০ মিনিটের মধ্যে এগুলি ফেরত দেওয়া

হয়। ক্লিয়ারিং হাউসের ভিতর দিয়া যখন চেক ফেরত দেওয়া হয়, তখন সভ্য-ব্যাঙ্কসমূহ নিজেদের চেক ছাড়া পাইওনিয়ারের চেকসমূহও গ্রহণ করে, কিন্তু সাব-ক্লিয়ারিং চেকসমূহ সাব-ক্লিয়ারিং হাউসে সরাসরি নিজেরা গ্রহণ করে।

নিকাশের (clearing) নিমিত্ত চেকের বাণ্ডিল তৈয়ারি করিবার সময় তাড়াতাড়িতে যে ভুলচুক হয় না, তাহা নহে। অনেক সময় এক ব্যাঙ্কের চেক অন্য ব্যাঙ্কের বাণ্ডেলে চলিয়া যায়, বা হিসাব-তালিকা (charges) প্রস্তুতের সময় "৮৯" স্থানে "৯৮" লিখিত হওয়াও খুব স্বাভাবিক। এইরূপ ভুল অপর ব্যাঙ্কে চেকের বাণ্ডিল পৌঁছিবার পর যখন ধরা পড়ে, তখন তাহারা টেলিফোন সাহায্যে উহা সেই ব্যাঙ্ককে জানাইয়া দেয় এবং পরিমাণ ভুল হইলে তাহা সংশোধন করিয়া লওয়া হয়। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি যে ঐ চেকের দরুন টাকা পূর্বেই ক্লিয়ারিং হাউসে চুকাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং সেই টাকা কি ভাবে আদায় করা হয়? যে ব্যাঙ্ক বেশী টাকা পাইয়াছে সেই ব্যাঙ্ক নিজেদের উপর একখানা Debit Note কাটিয়া অপর ব্যাঙ্ককে দেয়। এইরূপ পাওনা মিটাইবার নিমিত্ত কখনও Credit Note কাটা হয় না। Debit Noteগুলি ক্লিয়ারিং হাউসে "ফেরতের সময়" (Return Time) নিকাশ করা হয়। ফেরতের সময়কে Special Clearing Time বলা হয়।

ব্যাঙ্কের আর একটি ব্যাপারেও Debit Note কাটা হয়। মনে করুন, লয়েড্‌স্ ব্যাঙ্কের কোন খরিদ্দার এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের উপর কাটা একখানা চেক লইয়া তাহার নিজ ব্যাঙ্কে যাইয়া বলিল যে সে সেই চেকের টাকা তৎক্ষণাৎ চাহে, ক্লিয়ারিং পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারিবে না। এইরূপ স্থলে ঐ চেকখানি এলাহাবাদ ব্যাঙ্কে সরাসরি পাঠাইয়া দেওয়া হয় এবং এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক উহার পরিবর্তে লয়েড্‌স্ ব্যাঙ্ককে একখানা Debit Note প্রদান করে। ঐ Debit Note তখন ক্লিয়ারিং হাউসের মধ্যস্থতায় ভাঙ্গানো হয়।

এইবার মেট্রোপলিটান ক্লিয়ারিং-এর কথা কিছু বলিব। মেট্রোপলিটান ক্লিয়ারিং-এর সভ্যবৃন্দের নিজেদের একটি কেন্দ্রীয় মিলনস্থল আছে, এবং তাহাদের প্রতিনিধিরা তথায় মিলিত হইয়া পরস্পরের উপর কাটা চেক গ্রহণ করিয়া তাহার টাকা নগদ প্রদান করিয়া থাকে। কলিকাতা ক্লিয়ারিং হাউসের

কোন সভ্য যদি মেট্রোপলিটান ক্লিয়ারিং-এর কোন সভ্য-ব্যাঙ্কের চেক পায়, তাহা হইলে তাহারা মেট্রোপলিটান ক্লিয়ারিং-এর মিলনস্থলে নিজেদের প্রতিনিধি পাঠাইয়া ঐ চেকের দরুন প্রাপ্য টাকা আদায় করিয়া লয়। কিন্তু মেট্রোপলিটান ক্লিয়ারিং-এর সভ্যবৃন্দ যদি কলিকাতা ক্লিয়ারিং বা পাইওনিয়ারের কোন চেক পাইয়া থাকে তাহা হইলে তাহাদিগকে, হয় সরাসরি সেই ব্যাঙ্কে যাইয়া, আর তাহা না হইলে কলিকাতা ক্লিয়ারিং হাউসের কোন সভ্য-ব্যাঙ্কের মধ্যস্থতায় ভাঙাইতে হয়। বলা বাহুল্য Non-clearing ব্যাঙ্কসমূহকে সরাসরি অন্য ব্যাঙ্কে যাইয়া চেক ভাঙাইয়া লইয়া আসিতে হয়, এবং অন্য ব্যাঙ্কসমূহও Non-clearing ব্যাঙ্কসমূহের উপর কাটা চেকের টাকা লোক পাঠাইয়া সরাসরি আদায় করে।

নবম অধ্যায়

শেয়ার বাজার

টাকার বাজারে যে অর্থভাণ্ডার খাটিতেছে, তাহার একটি অংশ শেয়ার বাজারের দৈনন্দিন কেনা-বেচার কাজে নিযুক্ত হয়। সুতরাং শেয়ার বাজার সম্বন্ধে এখানে কিছু বলা প্রয়োজন।

শেয়ার বাজার সম্বন্ধে জনসাধারণের ভুল ধারণা আছে। জনসাধারণের নিকট শেয়ার বাজার অতি ভয়ঙ্কর স্থান। যাঁহারা ইহার সংস্পর্শে আসেন নাই অথবা শেয়ার বাজার সম্বন্ধে যাঁহাদের কিছুমাত্র সত্যকার জ্ঞান নাই তাঁহাদের মুখ হইতেই শেয়ার বাজার সম্বন্ধে উপরোক্ত ও অনুরূপ মন্তব্য প্রকাশ পাইতে দেখা যায়। তাঁহারা বলেন শেয়ার বাজার জুয়াচোর-দালালগণের আড্ডা— তাহারা সর্বদাই সচেষ্ট থাকে লোকের সর্বনাশ ও অর্থনাশ ঘটাইতে। প্রকৃতপক্ষে শেয়ার বাজার এইরূপ কোন ভয়ঙ্কর স্থান নহে।

এখনকার দিনে সুনিয়ন্ত্রিত শেয়ার বাজার সর্বদাই সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করে। অর্থনীতিজ্ঞ পণ্ডিতগণ শেয়ার বাজারকে ব্যবসাজগতের স্নায়ু-কেন্দ্ররূপে বর্ণনা করেন, এবং এই বর্ণনার মধ্যে বিন্দুমাত্র অতিরঞ্জন নাই।

বর্তমান জগৎ ধনতন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। যৌথ মূলধনে গঠিত প্রতিষ্ঠান-সমূহ ধনতান্ত্রিক জগতের অঙ্গস্বরূপ। এই যৌথ মূলধনে গঠিত প্রতিষ্ঠান-সমূহের মূলধনের অংশ বা শেয়ারের কেনা-বেচাই শেয়ার বাজারে হইয়া থাকে। সুতরাং শেয়ার বাজারকে একরকম ধনতান্ত্রিক জগতের অন্যতম স্তম্ভস্বরূপ বলা যায়।

কিন্তু শেয়ার বাজারে যে কেবল যৌথ মূলধনে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের শেয়ারেরই কেনা-বেচা হয় তাহা নহে। বহু সরকারী ও বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের ঋণপত্রসমূহের কেনা-বেচাও এই শেয়ার বাজারেই হইয়া থাকে। বস্তুতঃ যৌথ মূলধনে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের উদ্ভবের বহু পূর্বে শেয়ার বাজারে একমাত্র সরকারী ও বে-সরকারী ঋণপত্রসমূহেরই কেনা-বেচা হইত। এইরূপ সরকারী ও বে-সরকারী ঋণপত্রসমূহের কেনা-বেচা লইয়াই জগতের প্রথম শেয়ার বাজারের গোড়াপত্তন হয়। তখনকার দিনে শেয়ার বাজার বলিতে এখনকার মত কোন সুনিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানকে বুঝাইত না। কতকগুলি লোক একত্রিত হইয়া কাফিখানায় (যেমন বিলাতে) বা মুক্ত স্থানে বা রাজপথে বা বৃক্ষতলে (যেমন বোম্বাই, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে) কেনা-বেচা করিত। এখন কিন্তু সর্বত্রই সুনিয়ন্ত্রিত শেয়ার বাজার স্থাপিত হইয়াছে।

শেয়ার বাজারে সভ্য ব্যতীত অন্য কাহারও প্রবেশ করিবার উপায় নাই। এখন কথা হইতেছে এই যে শেয়ার বাজারের ভিতর সভ্যগণ ব্যতীত অন্য কেহ যখন প্রবেশ করিতে পারে না, তখন সাধারণ লোক কি করিয়া শেয়ারের কেনা-বেচা করে? ইহা খুব সোজা। বাজারের বাহিরে স্টক্-এক্সচেঞ্জ-বিল্ডিং-এ বা নিকটস্থ কোন স্থানে অধিকাংশ দালালেরই অফিস আছে। ঐ অফিসে যাইয়া কিনিবার বা বেচিবার "আদেশ" (Order) দিলেই সমস্ত কাজ মিটিয়া যায়। ইহা ছাড়া বাজারের ভিতর স্টক্-এক্সচেঞ্জের নিজের টেলিফোন-এক্সচেঞ্জ আছে, এই টেলিফোনে ডাকিলে সকল সময়েই বাজারে অবস্থিত যে কোন দালালকে পাওয়া যাইবে। ইহা ছাড়া স্টক্-এক্সচেঞ্জ-বিল্ডিং-এর উত্তর দিকে একটি বেষ্টিত প্রাঙ্গণ আছে। ইহার নাম Nothern Enclosure। এই প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিবার জন্য সাধারণকে ৩৲ টাকায় ছয় মাসের মেয়াদী টিকিট দেওয়া হয়। এই Enclosure-এ প্রবেশ করিয়া যে কোন লোক তাহার দালালের সহিত কথোপকথন করিতে পারে।

ঠিক কি ভাবে শেয়ারের কেনা-বেচা হয় তাহার কথা এইবার বলা যাইতেছে। মনে করুন, আপনি ১০০ (সাধারণত এক শতের কম সংখ্যক শেয়ারের কাজ বাজারে হয় না) বর্মা করপোরেশন কোম্পানির শেয়ার কিনিবেন। আপনি দালালের অফিসে যাইয়া তাঁহাকে ১০০ বর্মা করপোরেশনের শেয়ার কিনিতে বলিলেন। আপনার দালাল বাজারে যাইয়া "বর্মা করপোরেশন" "বর্মা করপোরেশন" বলিয়া চীৎকার করিতে থাকিবে। এই চীৎকার শুনিয়া আর পাঁচজন দালাল তাহার নিকট সমবেত হইবে। তাহারা উহার দাম বলিতে থাকিবে। দুই রকমের দাম বলিবে— কিনিবার ও বেচিবার। আপনার দালাল কিনিবে, কি বেচিবে, তাহা এখনও পর্যন্ত গোপন রাখিয়াছে। তাহার মনোমত দর পাইলেই সে আপনার জন্য ১০০ শেয়ার কিনিয়া লইবে। উভয়েই পরস্পরের খাতায় ঐ কেনা-বেচার কথা লিখিয়া লইবে। বিকালে বা তাহার পরদিন সকালবেলায় আপনার দালাল আপনার নিকট "চুক্তিপত্র" (Contract) পাঠাইবে ও উহা গ্রহণ করিয়া আপনাকে একটি রসিদ দিতে হইবে। আপনার ১০০ বর্মা করপোরেশন শেয়ার কিনিবার ইহাই প্রথম চুক্তি হইল।

যেদিন আপনি শেয়ার কিনিলেন, তাহার তৃতীয় বা পরবর্তী কোনদিনে আপনাকে ঐ ১০০ বর্মা করপোরেশন শেয়ারের ডেলিভারি লইতে হইবে। দালাল ঐ দিন আপনাকে ১০০ শেয়ারের "অংশপত্র" (Scrip) দিবে, ও আপনাকে নগদ টাকা দিয়া উহা গ্রহণ করিতে হইবে। তৃতীয় দিবসে শেয়ার ডেলিভারির যে নিয়ম কলিকাতা শেয়ার বাজারে প্রচালিত আছে, তাহা বোম্বাই বা লণ্ডন শেয়ার বাজার হইতে ভিন্ন; কিন্তু নিউইয়র্ক শেয়ার বাজার হইতে অভিন্ন। বোম্বাই বা লণ্ডন শেয়ার বাজারে প্রতি পনরো দিন অন্তর কেনা-বেচার একটা "হিসাব-নিকাশ" ও নিষ্পত্তি (Settlement) হয়। ঐ দিনকে "নিষ্পত্তি দিবস" (Settlement Day) বলা হয়। দুইজন দালালের মধ্যে এক "নিষ্পত্তি দিবস" হইতে পরবর্তী "নিষ্পত্তি দিবস" পর্যন্ত যত কেনা-বেচা হয়, তাহার হিসাবের নিষ্পত্তি ঐ দিন হয়, ও যাহার যাহা বকেয়া প্রাপ্য থাকে তাহা তাহাকে ঐ দিন দেওয়া হয়।

শেয়ার বাজারের "ফাট্‌কা" (Speculation) সাধারণত দুই প্রকারের— Bull ও Bear। বাজার অচিরভবিষ্যতে চড়িবে এবং চড়িলে বেশি দামে

বেচিবে—এই আশায় যখন কেহ শেয়ার কেনে, তাহাকে Bull বা তেজীওয়ালা বলা হয়, এবং বাজার অচিরভবিষ্যতে পড়িবে এবং পড়িলে কম মূল্যে কিনিয়া ডেলিভারি দিবে— এই আশায় যখন কেহ শেয়ার (কিনিবার আগেই) বেচে, তাহাকে Bear বা মন্দীওয়ালা বলা হয়। বাজারের উঠানামা কোম্পানির মুনাফা বা লোকসান, চলতি সুদের হার, আভ্যন্তরীণ অবস্থা, আন্তর্জাতিক নানারূপ ঘটনা ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই সকলের উপর নজর রাখিয়াই শেয়ার বাজারে "ফাট্‌কা" হয়। যখন বাজারে কোন খারাপ খবর আসে, তখন মন্দীওয়ালা (Bear) ভাবে যে অচিরে শেয়ারের দাম পড়িয়া যাইবে। তখন সে ক্রমাগত শেয়ার বেচিয়া যাইতে থাকে। কিন্তু যে শেয়ার সে বেচে সে শেয়ার তাহার হাতে থাকে না। তাহার আশা যে, বাজারে ঐ শেয়ারের দাম আরও খানিকটা পড়িয়া গেলে, সে ঐ শেয়ার কম দামে কিনিয়া লইয়া উঁচুদামে যাহাদের আগে বেচিয়াছে, তাহাদের ডেলিভারি দিবে। বাজার যখন সত্যই পড়িয়া যায়, তখন সে লাভবান হয়। কিন্তু বাজার যদি না পড়ে তখন সে আটকাইয়া যায়। তখন বলা হয় যে সে বাজারে "মাথা" করিয়াছে। তেজীওয়ালারা তখন তাহাকে চাপিয়া ধরে। সে মাল কিনিবার জন্য যতই উদগ্রীব হয়, তেজীওয়ালারা ততই ঐ শেয়ারের দাম বাড়াইতে থাকে। এইরূপে তাহাকে পরিশেষে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। তেজীওয়ালার (Bull) কারবার কিন্তু অন্যরূপ। বাজারের ভাল খবর থাকিলে, তেজীওয়ালারা ক্রমাগত মাল কিনিতে থাকে। তাহার আশা, বাজার আর খানিকটা উঠিয়া গেলে সে উঁচুদামে ক্রীত মাল বেচিয়া লাভ করিবে। যখন সে হাতের মাল খালাস করিতে পারে না, তখন বলা হয় যে সে বাজারে "পোতা" করিয়াছে। যদি বাজারে চাহিদা না থাকে, এবং কেহ এইরূপ ভাবে "পোতা" করে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে ঐ শেয়ারের দাম তাহার বেচার সঙ্গে সঙ্গেই পড়িতে থাকিবে।

সাধারণ লোক সাধারণত তেজী বাজারেই কেনা-বেচা করিয়া থাকে। আজ কিনিয়া কাল উঁচুদামে বেচিয়া লাভ করিব—এই আশাতেই তাহারা শেয়ার বাজারের খেলায় মাতিয়া যায়। যদি বাজার হঠাৎ পড়িয়া যায়, তাহা হইলে এই সম্প্রদায়ের লোকই সর্বস্বান্ত হয়। সঙ্গে সঙ্গে তাহারা দেশের ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানসমূহেরও অশেষ ক্ষতি সাধন করে। শেয়ার কিনিবার

জন্য তাহারা ব্যাঙ্ক হইতে যে টাকা (Overdraft) ধার লয়, তাহা তাহারা শোধ করিতে পারে না। ইহার ফলে ব্যাঙ্কসমূহ বিপদাপন্ন হয়, এবং ছোটখাটো ব্যাঙ্কগুলিকে অনেক সময় লালবাতিও জ্বালিতে হয়।

দশম অধ্যায়

গ্রামের টাকার বাজার

অবশ্য "টাকার বাজার" বলিতে যাহা বুঝায় গ্রামে সেরূপ কিছু নাই। সংগঠন বলিতে সেখানে কিছুই নাই, মাত্র কতকগুলি ব্যক্তিবিশেষ বা প্রতিষ্ঠান অসংলগ্নভাবে সেখানে "টাকার বাজার" গঠন করে। মুখ্যভাবে তাহাদের সহিত দেশের সুসংযত ও সংগঠিত টাকার বাজারের সম্পর্ক খুব কম। এই সকল ব্যক্তিবিশেষ বা প্রতিষ্ঠান যথাক্রমে— (১) মহাজন বা সাহুকার, (২) শ্রফ্, (৩) লোন অফিস্, (৪) কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক, (৫) জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক ও (৬) পোস্টাল সেভিংস্ ব্যাঙ্ক। মহাজন ও শ্রফ্ দুইজনেরই ব্যবসা টাকা খাটানো,— দুইয়ের মধ্যে কিন্তু প্রভেদ এই যে, মহাজন খাটায় নিজের টাকা, আর শ্রফ্ খাটায় প্রধানত অপরের টাকা। গ্রামের চাষীর যখন টাকার প্রয়োজন হয়, তাহার যোগান দেয় মহাজন। কি উদ্দেশ্যে ও কেন চাষী টাকা ধার লইতেছে, তাহার তোয়াক্কা মহাজন রাখে না। টাকার সুদ পাইলেই সে সন্তুষ্ট। বস্তুতঃ মহাজনের নিকট হইতে গৃহীত ঋণ চাষী কৃষি-উৎপাদনেও ব্যবহার করিতে পারে, বা অন্য উদ্দেশেও (যেমন পিতৃশ্রাদ্ধ, কন্যার বিবাহ বা স্ত্রীর অলঙ্কার তৈয়ারি ইত্যাদি) ব্যবহার করিতে পারে। ইহার ফলে মহাজনের দেওয়া কর্জ অনেক ক্ষেত্রেই আদায় হয় না ও "জমিয়া" (frozen) যায়। এক কথায়, মহাজনের দেওয়া টাকা সহজে ফিরিয়া আসে না— আসে কেবল টাকার সুদ। মহাজনের ধার দেওয়া টাকার সুদহারের কোন সমতা নাই। খাতকের সম্ভ্রম ও সঙ্গতির উপর ইহা অনেকটা নির্ভর করে। আগেকার দিনে এই সুদহার শতকরা ১২ হইতে ১০০ টাকা পর্যন্ত হইতে পারিত। বর্তমানে কিন্তু "মহাজনী আইন" (Bengal Money Lenders Act) দ্বারা ইহা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। এই আইন অনুযায়ী কর্জদাতা বর্তমানে মাল-কর্জের

উপর মাত্র শতকরা ১৫ হইতে ২৫ টাকা ও অন্য কর্জের উপর শতকরা ৮ হইতে ১০ টাকা সুদ গ্রহণ করিতে পারে। চক্রবৃদ্ধিহারে সুদগ্রহণও এই আইন দ্বারা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে। এই আইনে ইহাও নিবদ্ধ হইয়াছে যে মহাজন কখনও সুদ ও মূলধন মিলাইয়া মোট মূলধনের দ্বিগুণের অধিক আদায় করিতে পারিবে না।

শ্রফ্ বা দেশীয় ব্যাঙ্কারও কৃষককে টাকা ধার দেয়। কিন্তু শ্রফ্ সম্প্রদায় আরও অনেক রকম কাজ করে। শ্রফেরা অপরের নিকট হইতে আমানত গ্রহণ করে, ও হুণ্ডীর কাজও করিয়া থাকে। মহাজনেরা কিন্তু তাহা করে না। এই প্রসঙ্গে ইহা বলা উচিত যে শ্রফ্ বা দেশীয় ব্যাঙ্কারদের হুণ্ডীর বাট্টার হার শহরের টাকার বাজারের হুণ্ডীর বাট্টাহার অপেক্ষা অনেক বেশি। সাধারণত এই বাট্টাহার শতকরা ৫৲ হইতে ৮৲ টাকা পর্যন্ত হইয়া থাকে।

লোন-অফিসসমূহের সংখ্যাধিক্য বাংলাদেশেই পরিদৃষ্ট হয়। এগুলি সাধারণ কোম্পানি-আইন অনুযায়ী গঠিত ও ইহাদের প্রধান কাজ কর্জদাদন। ইহারা যে কেবল জমিজমা বা গহনা প্রভৃতি বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার দেয় তাহা নহে। অনেক সময় সম্পত্তিপন্ন লোকের জামিনের দায়িত্বেও তাহারা টাকা ধার দেয়। অনেক সময় জমিদারী পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি কাজও তাহারা করে।

সমবায়-ঋণদান সমিতিগুলি কোম্পানি-আইন অনুযায়ী গঠিত হয় না। এগুলির জন্য স্বতন্ত্র আইন আছে ও এগুলি সমবায় নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। সমবায় নীতি বলিতে বুঝায় যে— কতগুলি লোক এমনভাবে স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া সংঘবদ্ধ হয় যে প্রত্যেকেরই স্বার্থ সমানভাবে সংরক্ষিত হয়। সমবায়-ঋণদান সমিতির অংশীদারগণ সাধারণত পরস্পর পরস্পরের পরিচিত। গ্রাম্য সমিতিগুলি অংশীদার ব্যতীত অপর কাহারও নিকট হইতে আমানত গ্রহণ করে না বা অপরকে টাকা ধার দেয় না। কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কসমূহ কিন্তু সভ্য ব্যতীত অপরের নিকট হইতেও আমানত গ্রহণ করে। ঋণগ্রহণের সময় সভ্যগণকে পরস্পর পরস্পরের জামিন হইতে হয়। দ্বিতীয়, সকল অংশীদারেরই সমান ভোটাধিকার থাকে। তৃতীয়, সমবায়-ঋণদান সমিতির লভ্যাংশ সীমাবদ্ধ, এবং তাহার উপর আয়কর লাগে না। অবশ্য, কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের লভ্যাংশ মাত্র জমা-খরচের ব্যাপার। এক্ষেত্রে

অংশীদাররাই আমানতকারী এবং তাহারাই আবার খাতক। সুতরাং সুদ হিসাবে তাহারা যাহা দিতেছে, লভ্যাংশ হিসাবে তাহাই আবার তাহাদের নিকট ঘুরিয়া আসিতেছে।

যে কোন গ্রামের ন্যূনকল্পে দশজন চাষী মিলিয়া এইরূপ সমবায়-সমিতি স্থাপন করিতে পারে। মাত্র সেই গ্রামের চাষীরাই এই সমিতির সভ্য হইতে পারে, অন্য কোন গ্রামের চাষীরা নহে। তবে ঐ গ্রামের মহাজন, জোতদার ও জমিদাররা ইহার সভ্য হইতে পারে। মাত্র সভ্যরাই এই সকল সমবায়-সমিতিতে টাকা আমানত রাখিতে পারে, অপর কেহ নহে। টাকা ধারও পায় মাত্র তাহারাই, অপর কেহ নহে।

গ্রামের এইরূপ সমবায়-সংঘগুলিকে প্রাথমিক গ্রাম্য সোসাইটি বলা হয়। এইরূপ কতকগুলি গ্রাম্য সোসাইটি বা ব্যাঙ্ককে অংশীদার লইয়া আবার কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক গঠিত হয়। এইরূপ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলিকে অবিমিশ্র বা খাঁটি (Pure) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বলা হয়। কিন্তু অবিমিশ্র কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের পরিচালনার জন্য প্রাথমিক সোসাইটিগুলি হইতে যথেষ্ট সংখ্যক উপযুক্ত-যোগ্যতা-বিশিষ্ট, শিক্ষিত ও ব্যবসা ব্যাপারে অভিজ্ঞ লোক পাওয়া যায় না বলিয়া অধিকাংশ স্থলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলি "মিশ্র" (Mixed) আকার ধারণ করে। "মিশ্র" ব্যাঙ্কগুলির সাধারণ বা অর্ডিনারী অংশীদার হিসাবে লওয়া হয় প্রাথমিক সোসাইটিগুলিকে ও প্রেফারেন্স অংশীদার হিসাবে লওয়া হয় স্থানীয় প্রভাবসম্পন্ন সঙ্গতিশালী ব্যক্তিগণকে—এক কথায় বলিতে গেলে, মিশ্র কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক গঠিত হয় ভিতরের ও বাহিরের উভয় প্রকারেরই লোক লইয়া। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলি সীমাবদ্ধ দায়িত্বের (Limited Liability) ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, এবং তাহাদের অর্থভাণ্ডার আসে তাহাদের নিজ মূলধন, সংরক্ষিত ভাণ্ডার, প্রেফারেন্স অংশীদার ও বাহিরের লোকের (non-members) নিকট হইতে গৃহীত আমানত ও প্রাদেশিক ব্যাঙ্কের কর্জদাদন হইতে। জনসাধারণের নিকট হইতে চলতি হিসাবে আমানত গ্রহণ করিয়া তাহারা গ্রামে মিতব্যয়িতা ও চেক্-ব্যবহার অভ্যাস প্রসারের যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলি স্থানান্তরে টাকা প্রেরণ (remittance); "বিল সংগ্রহ" (collecting bills) ও ড্রাফ্‌ট্ বিক্রয় প্রভৃতি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত কাজও করিয়া থাকে। কতকগুলি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে লইয়া

এক-একটি প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্ক গঠিত হয়। প্রাদেশিক কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক সাধারণত প্রাদেশিক রাজধানীতেই স্থাপিত হয়, এবং মূল টাকার বাজারের সহিত তাহার সংযোগ থাকে।

অবস্থা অনুযায়ী প্রাথমিক সোসাইটিগুলিকে পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। (ক) নিয়মিত ভাবে যেগুলির কর্জ আদায় হয়, ও সভ্যেরা সমবায় নীতি বুঝিয়া সুষ্ঠুভাবে কার্য সম্পন্ন করে। (খ) যেগুলির কর্জ আদায় মোটামুটি মন্দ নয় এবং ক্রমশ উন্নতির লক্ষণ প্রকাশ করিতেছে। (গ) যেগুলির সাধারণ অবস্থা আশাপ্রদ, কিন্তু সভ্যদের নিকট হইতে টাকা অনাদায় রহিয়া গিয়াছে এবং কর্মপরিচালনা সন্তোষজনক না হওয়া হেতু তদারক প্রয়োজন। (ঘ) যেগুলির অবস্থা খারাপ, কিন্তু পুনর্গঠিত হইলে উন্নতি হইতে পারে। ও (ঙ) যেগুলির অবস্থা একেবারে আশাহীন, তুলিয়া দেওয়া উচিত।

বাংলাদেশের সমবায়-ব্যাঙ্কসমূহের অবস্থা ক্রমশ খারাপ হইয়াছে। এক কথায়, বাংলাদেশের সমবায়-ব্যাঙ্কসমূহের সদস্যবৃন্দ অধিকাংশক্ষেত্রেই তাঁহাদের কর্জের টাকা বাকি ফেলিয়াছেন। ইহার জন্য দেশের আর্থিক দুর্গতি যে সম্পূর্ণভাবে দায়ী তাহা নহে। কেননা দেশের আর্থিক দুর্গতিই যদি ইহার জন্য সম্পূর্ণ ভাবে দায়ী হয়, তাহা হইলে সকল প্রদেশেই একই অবস্থা প্রকাশ পাইত। কিন্তু তাহা ঘটে নাই।

বকেয়া ঋণ পরিশোধের জন্য গত দশ বারো বৎসর সরকারও যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। ১৯৩৩-৩৪ খৃস্টাব্দে কতকগুলি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের আমানতের সুদের হার শতকরা প্রায় তিন টাকা কমানো হইয়াছে। সেই সঙ্গে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রাথমিক গ্রাম্য সমিতিগুলির প্রদত্ত কর্জের সুদহারও ২॥০ টাকা হইতে ৪৲ টাকা পর্যন্ত কমানো হইয়াছে। ইহা ব্যতীত কৃষিজীবীদের বেশিদিনের মেয়াদে টাকা ধার দিবার জন্য (১৯৩৪ খৃস্টাব্দে) বাংলাদেশে পাঁচটি জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্কও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সরকার এই ব্যাঙ্কগুলিকে ৩০ বৎসরের অনধিক মেয়াদী ১২॥ লক্ষ টাকার ডিবেঞ্চারের সুদ দেওয়ার জন্য দায় স্বীকার করিয়াছেন। এই সকল ব্যাঙ্ক কৃষিজীবীদের বিশ বৎসরের মেয়াদে টাকা কর্জ দিয়া তাহাদের বকেয়া ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করে। জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক যে কেবল বাংলাদেশেই আছে তাহা নহে, মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়েও জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক আছে।

পোস্টাল সেভিংস ব্যাঙ্কেও গ্রামের চাষী টাকা গচ্ছিত রাখে। ইহাতে তাহাদের সঞ্চয় অভ্যাস বৃদ্ধি পায় ও প্রয়োজনের সময় তাহারা টাকা তুলিয়া নিজেদের অভাব মিটাইতে পারে। ইহার ফলে গ্রামের টাকার বাজারের উপর টাকার চাপ কিছুটা কমিয়া যায়।

একাদশ অধ্যায়

মূলধনের বাজার

উপসংহারে মূলধনের বাজার সম্বন্ধে কিছু বলিয়া "টাকার বাজার" শীর্ষক এই আলোচনা শেষ করিব। মূলধনের বাজারে সরকারী ঋণপত্র, নূতন কোম্পানির শেয়ার প্রভৃতির কাজ হয়। দেশের জনসাধারণের সঞ্চয়মূলক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অর্থভাণ্ডারসমূহকে একত্রিত করিয়া পরে শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহকে ঐ টাকা দীর্ঘ মেয়াদে ধার দেওয়াই মূলধনের বাজারের কাজ। মূলধনের বাজারের সহিত মূল বা খাঁটি টাকার বাজারের পার্থক্য এই স্থলে বিশেষভাবে উল্লেখ করা উচিত। টাকার বাজারও দেশের জনসাধারণের সঞ্চয়মূলক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অর্থ ভাণ্ডার একত্রিত করিয়া পরে সেই টাকা দেশের ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্পের চলতি খরচের প্রয়োজন মিটাইতে ধার দেয়। কিন্তু টাকার বাজার প্রধানত দেশের আমানতী যৌথ ব্যাঙ্কসমূহ লইয়া গঠিত হয়, এবং আমানতকারীদের সহিত ব্যাঙ্কের এই শর্ত থাকে যে তাহারা যে কোন মুহূর্তে চেক কাটিয়া তাহাদের আমানতী অর্থভাণ্ডার তুলিয়া লইতে পারিবে, সেই জন্য আমানতী ব্যাঙ্কসমূহ দীর্ঘ মেয়াদে টাকা ধার দিতে সাহস পায় না। এইখানেই টাকার বাজারের সহিত মূলধনের বাজারের পার্থক্য। এক কথায় "টাকার বাজার" স্বল্পমেয়াদী কর্জের বাজার, এবং "মূলধনের বাজার" দীর্ঘমেয়াদী কর্জের বাজার।

যে দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুনিয়ন্ত্রিত মূলধনের বাজার আছে, সে দেশে শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহকে মূলধনের অভাবে কষ্ট পাইতে হয় না। শিল্পপ্রতিষ্ঠান-সমূহের মূলধনের প্রয়োজন সাধারণত দুই প্রকার—চলতি খরচের জন্য সাময়িক মূলধন, ও যন্ত্রপাতি প্রভৃতি ক্রয়ের জন্য দীর্ঘমেয়াদী স্থায়ী মূলধন। চলতি মূলধন

শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহের পক্ষে মূল "টাকার বাজার" হইতে সংগ্রহ করা সম্ভবপর হইলেও স্থায়ী বা দীর্ঘমেয়াদী মূলধন তাহাদের পক্ষে টাকার বাজারের অন্তর্ভুক্ত আমানতী ব্যাঙ্কসমূহের নিকট হইতে ধার পাওয়া সহজসাধ্য হয় না। অবশ্য আমানতী ব্যাঙ্কসমূহের নিরাপত্তার দিক হইতে তাহাদের নিকট হইতে দীর্ঘ-মেয়াদী মূলধন ধার পাওয়ার আশা পোষণ করাও অন্যায়। এ সম্পর্কে বহুদিন পূর্বে বিলাতের "প্রথম পঞ্চম" ব্যাঙ্কসমূহের অন্যতম বারক্লেস্ ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান মিঃ ডব্লিউ. ফেভিল টিউক বলিয়াছিলেন যে "আমানতী ব্যাঙ্কের পক্ষে শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহকে দীর্ঘমেয়াদে টাকা ধার দেওয়া ন্যায়সংগত ব্যবসানীতির বহির্ভূত ব্যাপার এবং ইহার দ্বারা ব্যাঙ্কের ভিত্তি বিশেষভাবে শিথিল হয়।"

ভারতের অধিকাংশ শিল্পই এখনও শৈশবাবস্থা অতিক্রম করে নাই। তাহাদের ভবিষ্যৎ এখনও অনিশ্চিত। সেইজন্য তাহাদের পক্ষে আমানতী ব্যাঙ্কের নিকট হইতে চলতি মূলধন সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক তো বরাবর এ সম্বন্ধে বিশেষ কাড়কড়ি নিয়ম প্রয়োগ করিয়া আসিয়াছে এবং অল্পসংখ্যক নির্দিষ্ট "খরিদ্দার" ব্যতীত অপর কোন শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে টাকা ধার দেয় না। যৌথ ব্যাঙ্কসমূহও ঋণপ্রার্থীর "মানসম্ভ্রম" যাচাই করিয়া টাকা ধার দেয়। উপরন্তু এইরূপ দাদন দিবার সময় তাহারা বিক্রয়যোগ্য জামীন, যথা—মজুত কাঁচামাল, প্রস্তুত মাল প্রভৃতি হাতে না রাখিয়াও কখনও টাকা ধার দেয় না। বস্তুত, আমানতী ব্যাঙ্কসমূহের সহিত এদেশের শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহের সম্পর্ক খুব আন্তরিকতার সহিত গড়িয়া উঠে নাই।

চলতি মূলধন সম্পর্কে তো এদেশের শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহের এই অবস্থা, স্থায়ী মূলধনের তো কথাই নাই। স্থায়ী মূলধন সাধারণত পরিমিত দায়যুক্ত যৌথ কারবার গঠন করিয়া তাহার অংশপত্র বা "শেয়ার" বিক্রয় করিয়া তোলা হয়। যৌথ কারবারের অংশপত্র নানা রূপ ধারণ করিতে পারে, যথা—(১) প্রেফারেন্স শেয়ার (এগুলি সকলশ্রেণীর শেয়ারের অগ্রণী, এবং ইহারা লভ্যাংশ বা ডিভিডেণ্ড্ না পাইলে অন্য কোন শ্রেণীর অংশীদার ডিভিডেণ্ড্ পায় না। গুটানোর সময় কোম্পানির সম্পত্তি বিভাগ সম্পর্কেও ইহাদের অধিকার সকলের পূর্ববর্তী। প্রেফারেন্স্ শেয়ারের উপর ডিভিডেণ্ড্ সাধারণত এক নির্দিষ্ট হারে প্রদত্ত হয়। তবে কোনো কোনো স্থলে নির্দিষ্ট হারের

উপরেও অর্ডিনারী শেয়ারের সহিত আনুপাতিক ভাবে প্রেফারেন্স্ শেয়ারকে বর্ধিত লভ্যাংশ দেওয়া হয়। সেরূপ প্রেফারেন্স্ শেয়ারকে Participating Preference Share বলা হয়। প্রেফারেন্স্ শেয়ারের ডিভিডেণ্ড্ Cumulative বা Non-cumulative হইতে পারে। পূর্বোক্ত শ্রেণীর শেয়ারের উপর ডিভিডেণ্ড্ কোনো বৎসর বাকি পড়িয়া যাইলে পরবর্তী মুনাফার বৎসরে তাহা পরিশোধ করিবার বাধ্যবাধকতা থাকে ; শেষোক্ত শ্রেণীতে কিন্তু এরূপ কোনো বাধ্যবাধকতা নাই)। (২) অর্ডিনারী শেয়ার (অধিকাংশ কোম্পানির মূলধনই মাত্র এইরূপ শেয়ার লইয়া গঠিত হয়। ডিভিডেণ্ড্ প্রদানে ও গুটানোর সময়ে কোম্পানির সম্পত্তি বিভাগে ইহার অধিকার প্রেফারেন্স্ শেয়ারের পরবর্তী। বলা বাহুল্য, অর্ডিনারী শেয়ারের উপর ডিভিডেণ্ড্ প্রদানের কোন সীমা-হার নাই)। (৩) ডেফার্ড্, ফাউণ্ডার্স্ বা ভেণ্ডর্স্ শেয়ার (এগুলি সাধারণত কোম্পানির প্রবর্তকদের নামে বিলি করা হয়। ইহাদের অধিকার অর্ডিনারী শেয়ারের পরবর্তী। অর্ডিনারী শেয়ারকে এক নির্দিষ্ট হার পর্যন্ত ডিভিডেণ্ড প্রদানের পর বকেয়া মুনাফা এক নির্দিষ্ট অনুপাতে (সাধারণত আধা-আধি) অর্ডিনারী ও ডেফার্ড্ শেয়ারের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। অর্ডিনারী মূলধনের তুলনায় ডেফার্ড্ মূলধনের পরিমাণ নগণ্য অনুপাত হওয়ার দরুন, ডেফার্ড্ শেয়ারের উপর প্রদত্ত ডিভিডেণ্ড্ হার অর্ডিনারী ডিভিডেণ্ড্ হার অপেক্ষা অনেক বেশি হইয়া থাকে)। অংশ বিক্রয় ছাড়াও যৌথ কারবারের মূলধন আর এক প্রকারে তোলা হয়। ইহা ডিবেঞ্চার বা ঋণপত্র বিলি করিয়া। ঋণপত্রগ্রহণকারীরা কোম্পানির অংশীদার বা মালিক নহে ; তাহারা উত্তমর্ণ মাত্র। সেই হেতু কোম্পানি গুটানোর সময় তাহাদের দাবি সর্বাগ্রে মিটাইতে হয়। প্রেফারেন্স্ শেয়ারের ন্যায় ডিবেঞ্চারের সুদও নির্দিষ্ট পরিমিত হারে প্রদত্ত হয়।

বলা বাহুল্য, অংশ-বিক্রয় করিয়া যৌথ কারবারের মূলধন তোলার সফলতা নির্ভর করে প্রবর্তকদের (Promoters) "নামযশ" ও প্রস্তাবিত ব্যবসায়ের "ভালমন্দর" উপর। যৌথ প্রতিষ্ঠানের অংশপত্র বিক্রয় বা বিলি করিবার জন্য পাশ্চাত্যের উন্নত দেশসমূহে নানারূপ প্রতিষ্ঠান আছে। সেই সকল প্রতিষ্ঠান যথাক্রমে ইস্যু হাউস্, আণ্ডাররাইটিং ফার্ম, ইনভেস্টমেণ্ট ব্যাঙ্ক। ইস্যু হাউসের প্রচলন বিলাতেই অধিক ভাবে আছে। জনসাধারণের মধ্যে

যৌথ-কারবারের শেয়ার বিলি করাই ইহাদের কাজ। যখন কোন কোম্পানি মূলধনের অংশ বেচিতে চায়, তখন তাহারা ইস্যু হাউসের শরণাপন্ন হয়। ইস্যু হাউস সেই কোম্পানির ব্যবসা সম্পর্কিত পরিকল্পনা পরীক্ষা করিয়া যদি সন্তুষ্ট হয়, তাহা হইলে উহা সেই কোম্পানির শেয়ার বিক্রয় করিতে প্রবৃত্ত হইবে। সাধারণত তাহারা শেয়ারগুলি নিজেদের তালিকাভুক্ত "খরিদ্দার"দের মধ্যেই বিলি করিয়া থাকে। এইরূপ কাজের জন্য তাহারা কোম্পানির নিকট হইতে একটা কমিশন পায়। ইহাই তাহাদের লাভ। অণ্ডাররাইটিং ফার্মসমূহ কোন কোম্পানির মূলধনের সমগ্র শেয়ার বা তাহার অংশবিশেষ নামমূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে খরিদ করে, এবং সেগুলিকে নামমূল্যে জনসাধারণের নিকট বেচে। দুই মূল্যের মধ্যে যে পার্থক্য তাহাই তাহাদের মুনাফা। যদি তাহারা শেয়ারগুলি বেচিতে না পারে, তাহা হইলে অবিক্রীত শেয়ারগুলি তাহাদের ঘাড়েই চাপিয়া যায়। ইনভেস্টমেণ্ট ট্রাস্টসমূহ সামান্যপুঁজিবিশিষ্ট সাধারণ দাদনকারীদের অশেষ কল্যাণ সাধন করে। সামান্যপুঁজিবিশিষ্ট সাধারণ দাদনকারীর পক্ষে সকল প্রকার কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। কেননা, ইহার জন্য যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তাহা তাহার নাই। এইরূপ প্রায়ই ঘটিতে পারে যে সে যে-কোম্পানিব শেয়ার ক্রয় করিয়াছে, অচিরভবিষ্যতে তাহার অবস্থা খারাপ হইল। তখন তাহাকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। ইনভেস্টমেণ্ট ট্রাস্টসমূহ তাহাদের মূলধন নানা শ্রেণীর কোম্পানির শেয়ারে নিয়োজিত করে, এবং তাহার "অংশ" স্বল্পপুঁজিবিশিষ্ট দাদনকারীদের বেচে। ইহার ফলে, এক কোম্পানির অবস্থা খারাপ হইলেও আর পাঁচটা কোম্পানির অবস্থা ভাল থাকার দরুন, একুনে দাদনকারীকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় না।

এই সকল প্রতিষ্ঠান লইয়াই বিদেশে মূলধনের বাজার গঠিত হয়। দুঃখের বিষয়, মাত্র মুষ্টিমেয় ইনভেস্টমেণ্ট ট্রাস্ট ব্যতীত, অপর প্রতিষ্ঠানসমূহ এদেশে এখনও অঙ্কুরিত হইয়া উঠিতে পারে নাই। এই সকল প্রতিষ্ঠানের অভাবেই এদেশে গোড়া হইতে "ম্যানেজিং এজেণ্ট" সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। ভারতের শিল্পগঠনে ইহাদের কৃতিত্ব যথেষ্ট। কোন প্রতিষ্ঠান গঠন করিবার সময় যে মূলধনের প্রয়োজন হয় তাহা সংগ্রহ করিবার দায়িত্ব এ যাবৎকাল তাঁহারাই নিজস্কন্ধে লইয়া আসিয়াছেন। এ সম্পর্কে তাঁহাদের কর্মপ্রণালী অনেকটা

ইয়োরোপের "মিশ্র ব্যাঙ্ক"সমূহের মত। তাহারা একাধারে ইস্যু হাউস্, প্রমোটার ও ইনভেস্টমেণ্ট ব্যাঙ্কের কাজ করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু তাহাদের মধ্যে নানা গলদ বর্তমান। এই হেতু তাহাদের পরিচালনায় এদেশের শিল্পোন্নতি সর্বাঙ্গীণ সম্পূর্ণতা ও দ্রুততা লাভ করিতে পারে নাই।

বর্তমানে প্রণালীর পরিবর্তন হইয়াছে। কিন্তু পূর্বে যে প্রণালী অনুযায়ী ম্যানেজিং এজেণ্টরা শিল্পগঠনের জন্য টাকা সংগ্রহ করিতেন তাহার একটা উদাহারণ এখানে দেওয়া যাইতেছে। এই প্রণালী বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল আহমেদাবাদের কাপড় কলের ম্যানেজিং-এজেণ্টসমূহের মধ্যে। যদি কোন কলের যন্ত্রপাতি ইত্যাদি কিনিবার জন্য ২০ লক্ষ টাকার প্রয়োজন হইত, তাহা হইলে পাঁচ লক্ষ টাকা তোলা হইত অংশীদারদের শেয়ার বিক্রয় করিয়া, আর বাকি টাকাটা তোলা হইত আমানতকারীদের নিকট হইতে। আমানতকারীরা প্রায় সকলেই স্থানীয় (এবং অধিকাংশই ম্যানেজিং এজেণ্টদের পরিচিত) ব্যক্তি হইতেন। তাঁহাদের প্রত্যেককে ম্যানেজিং এজেন্সী ফার্মের একখানি "অংশ" দিয়া সাত বৎসরের মেয়াদে আমানত গ্রহণ করা হইত। প্রতি ম্যানেজিং এজেন্সী ফার্মের মূলধন সাধারণত এক টাকার হাজার শেয়ারে বিভক্ত হইয়া মোট ১০০০৲ টাকা হইত। যদি কোন লোক মূল কোম্পানির ৩,০০০৲ টাকার অংশ ক্রয় করিত ও সাত বৎসরের মেয়াদে ২,০০০৲ টাকা আমানত রাখিত, তাহা হইলে তাহাকে ম্যানেজিং এজেন্সী ফার্মের ১ টাকা মূল্যের একখানি শেয়ার দেওয়া হইত। এক কথায়, প্রত্যেক আমানত-কারীই এইরূপে ম্যানেজিং এজেন্সী ফার্মের এক-সহস্রাংশের মালিক হইতেন। কাপড়ের কল যদি ভাল ভাবে চলিত, তাহা হইলে এই এক টাকা নামমূল্যের শেয়ার বাজারে ৭০০।৮০০ টাকায় বিক্রয় হইত।

এদেশের শিল্পসমূহকে দীর্ঘমেয়াদী মূলধন সরবরাহ করিবার নিমিত্ত "ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ফিনান্স্ করপোরেশন" নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করিবার জন্য সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় একটি বিল পেশ করা হইয়াছে। করপোরেশনের মূলধন হইবে পাঁচ কোটি টাকা। প্রত্যেকটি পঁচিশ হাজার টাকা মূল্যের দুই হাজার শেয়ার বিক্রয় করিয়া এই মূলধন সংগৃহীত হইবে। কেন্দ্রীয় সরকার, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহ, বীমা কোম্পানি, ইনভেস্টমেণ্ট ট্রাস্ট বা তদনুরূপ প্রতিষ্ঠানসমূহ ব্যতীত অপর কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি-

বিশেষ এই করপোরেশনের শেয়ার ক্রয় করিতে পারিবে না। ২৫ বৎসরের মধ্যে পরিশোধনীয় শর্তে, করপোরেশন যথোপযুক্ত জামিন লইয়া শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহকে দীর্ঘমেয়াদী কর্জ দাদন করিবে। ইহা ব্যতীত জনসাধারণের নিকট হইতে শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহ যে ঋণ গ্রহণ করিবে, তাহা পরিশোধ করা সম্পর্কিত দায়িত্বও করপোরেশন গ্রহণ করিতে পারিবে। শিল্পপ্রতিষ্ঠান-সমূহের শেয়ার, বণ্ড বা ডিবেঞ্চার বিক্রয় করিবার জন্য করপোরেশন আণ্ডাররাইটিং-এর কাজও করিতে পারিবে। তবে, কোন এক শিল্পপ্রতিষ্ঠান সম্পর্কে করপোরেশন ৫০ লক্ষ টাকার অধিক আণ্ডাররাইটিং দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারিবে না।

কিন্তু মাত্র একটি ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ফিনান্স করপোরেশন দ্বারা দেশের শিল্প-সমূহের মূলধনের সমস্যার সমাধান হইবে না। আজ আমরা যুদ্ধোত্তরকালে শিল্পপ্রতিষ্ঠান পরিকল্পনা লইয়া বিশেষ ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যদি মূলধনের বাজার প্রতিষ্ঠা করিতে না পারি, তাহা হইলে এই সকল শিল্পের জন্য সহজে টাকা আসিবে কোথা হইতে? যদি এ বিষয়ে আমরা বিশেষভাবে অবহিত না হইয়া মামুলী প্রথা ও পরিস্থিতির উপর নির্ভর করি, তাহা হইলে এই সকল শিল্পের ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল হইবে না। যে সকল প্রতিষ্ঠান লইয়া বিদেশে মূলধনের বাজার গঠিত হয়, সেই সকল প্রতিষ্ঠান আজ গড়িয়া তুলিতে হইবে দেশের সর্বত্র—জনসাধারণের সঞ্চয়লব্ধ অর্থ যাহাতে সাফল্যের সহিত বিনিযুক্ত হইতে পারে দেশের শিল্পগঠনে। সে সম্বন্ধে বিশেষভাবে সহায়তা করিতেছে বিদেশের মূলধনের বাজারে ইনভেস্ট-মেণ্ট ট্রাস্টসমূহ। এই শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানসমূহ বিশেষভাবে সহায়তা করে স্বল্প-পুঁজিবিশিষ্ট ব্যক্তিদের শিল্পপ্রতিষ্ঠানে অর্থ নিয়োগ করিতে। ভালভাবে চিন্তা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে সামান্যপুঁজিবিশিষ্ট ব্যক্তিদের পক্ষে সাফল্যের সহিত শিল্পে অর্থবিনিয়োগ করাই বর্তমান যুগের ইনভেস্টমেণ্ট ক্ষেত্রের প্রধান সমস্যা। সাধারণের পক্ষে নির্ভরযোগ্য শেয়ার নির্বাচন করা অনেক সময়েই কঠিন হইয়া পড়ে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও বিশ্লেষণ অবশ্য অনেককে এ বিষয়ে সাহায্য করে। কিন্তু বর্তমানের কর্মময় জীবনে কয়জন লোকের এ সম্বন্ধে সুযোগ ও সুবিধা আছে? এইরূপ স্বল্পপুঁজির মালিকদের অর্থসম্পদ একত্রিত করিয়া বিশেষভাবে বিশ্লেষণপূর্বক নানা শ্রেণীর শেয়ারে

বিনিয়োগ দ্বারা ঝুঁকির পরিমাণ হ্রাস করিয়া সাফল্যের সহিত অর্থবিনিয়োগ করিতে বিশেষভাবে সাহায্য করে ইনভেস্টমেণ্ট ট্রাস্টসমূহ। সেইজন্য স্বল্প-পুঁজিবিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাফল্যের সহিত অর্থবিনিয়োগ করিতে সহায়তা করিবার জন্য দেশের সর্বত্র অসংখ্য ইনভেস্টমেণ্ট ট্রাস্ট গড়িয়া উঠা উচিত।

আর চাই ইনভেস্টমেণ্ট ব্যাঙ্ক। ইনভেস্টমেণ্ট ব্যাঙ্ক ব্যতীত কোন দেশে মূলধনের বাজার গড়িয়া উঠিতে পারে না। এক কথায় বলিতে গেলে, ইনভেস্টমেণ্ট বা দাদনী ব্যাঙ্কই সুসংযত মূলধনের বাজারের প্রধান উপাদান। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে আজ পর্যন্ত একটিও দাদনী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই।

পূর্বেই বলা হইয়াছে আমানতী ব্যাঙ্কের সহিত দাদনী ব্যাঙ্কের পার্থক্য টাকা দাদনের মেয়াদ লইয়া। পূর্বোক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ স্বল্প মেয়াদে টাকা ধার দেয়, আর দাদনী ব্যাঙ্ক দীর্ঘ মেয়াদে টাকা ধার দেয়। কিন্তু উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কেবল টাকা দাদনের মেয়াদেই নিবদ্ধ নহে। ইহাদের সাধারণ কর্ম-প্রণালীও স্বতন্ত্র। মোটামুটি দাদনী ব্যাঙ্কের প্রধান কাজ শিল্পসমূহের সহিত দাদনকারীদের আন্তরিক সংযোগ ও সম্পর্ক স্থাপন করা। এইজন্য ইহারা দেশের যে সকল লোক দীর্ঘমেয়াদে টাকা খাটাইতে সমর্থ ও ইচ্ছুক, এইরূপ লোকের অর্থসম্পদ একত্রিত করে। তাহারা যে কেবলমাত্র শিল্পপ্রতিষ্ঠান-সমূহকে টাকা ধার দিয়াই তাহাদের মূলধনের প্রয়োজনীয়তা মিটায় তাহা নহে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি পাশ্চাত্যের উন্নত দেশসমূহের দাদনী ব্যাঙ্কের আরও কাজ হইতেছে— শেয়ার কেনাবেচায় সাধারণকে সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া, দাদনকারীদের বিশ্লেষণপূর্ণ তথ্যপ্রদান করা ও নূতন প্রতিষ্ঠানের শেয়ার সাধারণের মধ্যে বিলি করা। শেষোক্ত কাজের জন্য তাহারা নূতন প্রতিষ্ঠানের সমগ্র শেয়ার নামমূল্য হইতে কিছু কম দামে একত্র কিনিয়া লয়। এবং পরে দাদনকারীদের নিকট উহা শেয়ারে উল্লিখিত দামে বিক্রয় করে। দুই দামের মধ্যে যে পার্থক্য থাকে, তাহাই দাদনী ব্যাঙ্কের লাভ। অনেক সময় নূতন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের শেয়ার এইভাবে ক্রয় করিবার জন্য এত অর্থের প্রয়োজন হয় যে, অনেকগুলি ইনভেস্টমেণ্ট ব্যাঙ্ক এই কার্য সমাধার জন্য সাময়িকভাবে "আণ্ডাররাইটিং সিণ্ডিকেট্" গঠন করে, এবং তাহার মধ্যস্থতায় জনসাধারণের নিকট ঐ প্রতিষ্ঠানের শেয়ার বিলি করে। এই নিমিত্ত

বিদেশের ইনভেস্টমেণ্ট ব্যাঙ্কসমূহকে স্টক এক্সচেঞ্জের সভ্য হইতে হয়। (আমাদের দেশের স্টক-এক্সচেঞ্জের নিয়ম অনুযায়ী কোন ব্যাঙ্ক স্টক-এক্সচেঞ্জের সভ্য হইতে পারে না)।

.মোট কথা, পূর্ণাঙ্গভাবে মূলধনের বাজার গঠন করিতে হইলে লোকের সঞ্চয়লব্ধ অর্থ বাজারে ছড়াইয়া ফেলিতে হইবে। একথা এখানে বলা প্রয়োজন যে ভারতীয়দের সঞ্চয়ের পরিমাণ সম্পর্কে এযাবৎ এদেশে ভ্রান্ত ধারণা বর্তমান ছিল। মাত্র ত্রিশ পঁয়ত্রিশ কোটি টাকার বার্ষিক নব-বিনিযুক্ত সঞ্চয়ের হিসাব-তালিকা প্রকাশ করিয়া ভারতীয়দের সঞ্চয়ের পরিমাণ ১০০ কোটি টাকা অনুমিত হইত। কিন্তু বর্তমান লেখক তাঁহার প্রণীত "সেভিংস্ অ্যাণ্ড ইনভেস্টমেণ্টস ইন্ ইণ্ডিয়া" নামক পুস্তকে হিসাব-তালিকা প্রকাশ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বার্ষিক নব-বিনিযুক্ত সঞ্চয়ের পরিমাণ ২০০ কোটি টাকা এবং ভারতীয়দের মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ ২৫০ হইতে ৩০০ কোটি টাকা হইবে। কিন্তু ভারতীয়দের এই মোট সঞ্চয়ের সামান্য পরিমাণ মাত্র শিল্পসমূহের পুষ্টি সাধনের নিমিত্ত বিনিযুক্ত হয়। সেজন্য আজ বিশেষভাবে প্রয়োজন দেশের জনসাধারণের মধ্যে এমন এক মনোভাব সৃষ্টি করা যে, তাহাদের সঞ্চিত অর্থ তাহারা দেশের শিল্পগঠনে নিয়োগ করিতে আগ্রহান্বিত হইবে। আগামীকালে যে সকল ইনভেস্টমেণ্ট ট্রাস্ট ও ইনভেস্টমেণ্ট ব্যাঙ্ক এদেশে প্রতিষ্ঠিত হইবে তাহাদের সকলকেই এই দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। মূল টাকার বাজারের ভিন্ন ভিন্ন অংশের সংস্কারের সহিত মূলধনের বাজারকেও এইভাবে সুগঠিত করিতে হইবে, এবং ইহারই উপর নির্ভর করিতেছে জাতীয় জীবনের অর্থনৈতিক উন্নতি।

পরিশিষ্ট

দেশীয় হুণ্ডীর নমুনা

নং

৺জগবন্ধু সেন পোদ্দার

সমাচার এই অস্ত রোজ মোং টাকা······

শ্রীযুক্ত·····································

মং·······································

মোং কলিকাতা পৌছমাত্র উক্ত টাকা··· ·····

শ্রীযুক্ত···········অথবা বরাত বাহক্কে বুঝাইয়া দিবা।

ইতি সন ১৩৩৬ সাল তারিখ।

(পশ্চাদদেশে) শ্রীমান প্রসন্নকুমার সেন পোদ্দার কল্যাণবরেষু

মোং কলিকাতা বড়বাজার শিবতলা ষ্ট্রীট ১৪ নং বাড়ী।

দেশীয় হুণ্ডীর দ্বিতীয় নমুনা

শ্রীশ্রীদুর্গা শরণং

সেবক শ্রীহরিচরণ দাস

প্রণামা বহবনিবেদনঞ্চ বিশেষ :—

আপনাদের উপর এখান হইতে দেনী হুণ্ডি এককেতা ১,০০০৲ এক হাজার টাকা, পাঁচশত টাকার ডবল হাজার টাকা লিখি। এখানে রাখেন শ্রীঅমরনাথ বসু বাঁদী মুদ্দৎ ২৫ রোজ গ্রেস্ ৩ রোজ একুনে ২৮ রোজ পিছে ধনীযোগে তথায় হুণ্ডি পৌছিলে সাকরাইয়া দিয়া মুদ্দৎবাদ ডিউ তারিখে টাকা দিয়া হুণ্ডির পৃষ্ঠে রসিদ লেখাইয়া লইবেন, ইহা শ্রীচরণে নিবেদন করিলাম। ইতি ১০ আষাঢ়, সন ১৩৩৫ সাল, সোমবার।

পরম পূজনীয় শ্রীযুক্তবাবু জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস,

মহাশয় শ্রীচরণেষু

১৫ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

শ্রীযুক্তবাবু জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাসের নিকট এই হুণ্ডির টাকা সমস্ত বুঝিয়া পাইলাম।

শ্রীরামলাল হীরালাল

৯ই শ্রাবণ সন ১৩৩৫ সাল

ভারতীয় ট্রেজারী বিলের নমুনা

S. 456789 S. 456789

INDIAN TREASURY BILL

Rs. 5,00,000

Due 21st November 1942 Issued 21st August 1942

This Treasury Bill entitles*........................or order to payment of Rupees Five lacs at the Office/Branch of Reserve Bank of India at........................out of the revenues of the Government of India on twentyfirst day of November 1942.

Sd.................. Sd..................

Accountant Governor

Public Accounts Dept., Reserve Bank of India

Reserve Bank of India. For and on behalf of

The Governor-General in Council.

*If this blank be not filled in, the Bill will be paid to bearer.

Rs.................. Date..................

বিলাতী হুণ্ডীর নমুনা

£ 27-3-10 Glasgow 21st January 1947

Sixty days after sight of this First of exchange (Second of same tenor and date being unpaid) pay to the order of ourselves the sum of Twenty seven pounds, three shillings and ten pence sterling at the drawing rate of The....................Bank Ltd for T. T. or demand drafts on London at such usance as the drawee may elect with interest at 3½ per cent per annum added thereto from date hereof to approximate due date of arrival of the remittance in London.

Value received in shipment per s. s. Markhor

Documents against payment.

To Messrs. S. M. Idris & Co.,

Calcutta. W. M. Samholtz & Co. Ltd.

Case in need : K. S. Parekh, Director.

Calcutta.

এদেশীয় ড্রাফ্‌টের নমুনা

No. 36252 Rawalpindi 29th January 1947.

THE PUNJAB & KASHMIR BANK LTD.

Rs 10-0-0

On Demand please pay to Calcutta Stock Exchange Association Limited or order the sum of Rupees ten only for value received.

To for the Punjab & Kashmir Bank Ltd.

The Punjab National Bank Ltd., ...Manager

Calcutta. .... Accountant

এদেশীয় হুণ্ডীর নমুনা

HUNDI : Rs.................. Date..................

.... : :

: Govt : : After one month from date pay...............

: : : ....a sum of Rupees............

: of India : : ....for value received accepted.

: Rs 2/- ; :

: .... : : ....

: (Seal & Signature) Signature

:

ভারতীয় ব্যাঙ্কিংএর ১৯৪৬ সালের সংখ্যাঙ্ক

শ্রেণী	সংখ্যা	মূলধন ও সংরক্ষিত ভাণ্ডার	গৃহীত আমানত	বিনিযুক্ত তহবিল
			(লক্ষ টাকায় লিখিত)	
তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক ·····	৮০	৪৪,১৬	৬২৪,২৩	২৭৯,২৮
অ-তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক *	৭৫১	৭,৯৪	৭৩,১০	২৫,১৭
অ-তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক * *	২১৪	৪,৬৩	৪২,৬৬	১১,৩৫

* যাহাদের মূলধন ৫ লক্ষ টাকার অধিক।

* * যাহাদের মূলধন ১ হইতে ৫ লক্ষ টাকা।

শাখা সংখ্যা :—১৯৪৬ সালে এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কসমূহের শাখাসংখ্যা ছিল ৭৭, তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কের ৩,৩৯২, অ-তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কের (যাহাদেব মূলধন ও সংরক্ষিত ভাণ্ডারের পরিমাণ ৫০ হাজার টাকার অধিক) ২,৬৮৮ ও সমবায় ব্যাঙ্কসমূহের (যাহাদের মূলধন এক লক্ষ টাকার অধিক) ৫৭৯।

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৩	৬	সম্পত্তি	সম্পত্তি।
২৩	৭	রক্ষিত।	রক্ষিত
২৩	৮	যুক্তরাষ্ট্রের	যুক্তরাজ্যের

পশ্চিমবঙ্গের জনবিন্যাস

শ্রীনির্মলচন্দ্র সিংহ



বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা

প্রকাশ ১৩৬২ আশ্বিন

মূল্য আট আনা

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী। ৬৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা

মুদ্রক শ্রীগোপালচন্দ্র রায়
নাভানা প্রিণ্টিং ওআর্ক্‌স্‌ লিমিটেড। ৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ। কলিকাত

সূচী

পূর্বকালের কথা

বাংলার জনবিন্যাসবৈচিত্র্য জানতে হলে তার আগে কিছু পুরোনো কথা জানা দরকার। বিস্তৃত ইতিহাস লিখবার ক্ষেত্র এ নয়, সংক্ষেপে দুই-একটা কথার উল্লেখ করছি। বাংলা, অর্থাৎ পশ্চিমবাংলা তো অবিভক্ত বাংলার এক-তৃতীয়াংশ। কিন্তু র‍্যাডক্লিফ-বিভাগের আগেও যে বাংলা ছিল তা-ও আগেকার বাংলার চেয়ে অনেক ছোট। আইন-ই-আকবরিতে দেখা যায়, আকবরের সময় সুবে বাংলা কুড়িটি সরকারে বিভক্ত ছিল, যথা, উদম্বর বা ট্যাণ্ডা (রাজমহল, উত্তর-পশ্চিম মুর্শিদাবাদ ও উত্তরবীরভূম), জন্নতাবাদ ও লক্ষণাবতী (প্রধানতঃ মালদা), ফতেহাবাদ (ফরিদপুর, দক্ষিণবাখরগঞ্জ ও দ্বীপসমূহ), মামুদাবাদ (উত্তরনদীয়া, উত্তরযশোর, পশ্চিমফরিদপুর), খলিফতাবাদ (দক্ষিণ যশোর ও পূর্ববাখরগঞ্জ), বাকলা (উত্তর ও পূর্ব বাখরগঞ্জ ও দক্ষিণ-পশ্চিম ঢাকা) পূর্ণিয়া, তাজপুর (পূর্বপূর্ণিয়া এবং পশ্চিমদিনাজপুর), ঘোড়াঘাট (দক্ষিণরংপুর, দক্ষিণপূর্ব দিনাজপুর ও রাজশাহী), পিঞ্জরা (দিনাজপুর এবং রাজশাহী ও রংপুরের বিভিন্ন অংশ), বরবকাবাদ (প্রধানতঃ রাজশাহী, দক্ষিণ-পশ্চিম বগুড়া ও দক্ষিণ-পূর্ব মালদা), বাজুহা (অংশতঃ রাজশাহী, বগুড়া, পাবনা ও ঢাকা), সোনারগাঁও (পশ্চিম ত্রিপুরা ও নোয়াখালী), সিলেট, চট্টগ্রাম, শরিফাবাদ (প্রায়শঃ বর্ধমান) সুলেমানাবাদ (উত্তর হুগলী ও তৎসংলগ্ন নদীয়া ও পূর্ব বর্ধমানের অংশ), সাতগাঁও (২৪ পরগণা, পশ্চিম নদীয়া, হাওড়া), মন্দারণ (বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ-পূর্ব বর্ধমান ও পশ্চিমহুগলি)। এছাড়া সরকার জলেশ্বরও তখন সুবে বাংলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। তার মধ্যে মেদিনীপুর

ও উড়িষ্যা-অন্তর্গত জলেশ্বরের কিছু অংশ ছিল। এই বৃহৎ বিশাল বাংলার সকল অংশ উন্নতির সমান পর্যায়ে ছিল না। কোন্ অংশ কতখানি উন্নত ছিল এ নিয়ে গবেষণা করতে গেলে বহু গবেষণা করতে হয়। মোটের উপর বলা যায়, পশ্চিমবাংলায় বনজঙ্গল কেটে চাষবাসের যে রকম প্রসার হয়েছিল এবং তার ফলে যতখানি ঘনবসতি হয়েছিল, পূর্ববাংলায় তা হয় নি। তবু মোগল আমলেও যে চাষবাসের প্রসারের জন্য অনেক জায়গাতেই আরও লোকসংখ্যাবৃদ্ধির প্রয়োজন ছিল তার অনেক প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে। যেমন একটা অপ্রত্যক্ষ প্রমাণের কথা বলি। সেকালে খাজনা আদায়ের যে মূল হার ছিল তার নাম ছিল পরগণা রেট। মোগল আমলে কয়েকবার খুব বড় সেটেলমেণ্ট হয়, তার মধ্যে ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে টোডরমলের সেটেলমেণ্ট প্রথম, তারপর ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে স্থজা খান্-ই বন্দোবস্ত, তারপর ১৭২২ খৃষ্টাব্দে জাফর খান-ই বা মুর্শিদকুলিখাঁর বন্দোবস্ত। এই সবগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে পরগণা রেট বা মূল খাজনার হার বাড়ানো হত না। তাছাড়া গোড়ায় নিয়ম ছিল কোন জমি থেকেই জমিদার প্রজা উচ্ছেদ করতে পারবে না, যদি না সে জমি চাষের অন্য প্রজা পাওয়া যায়। এই সব হতে মনে হয়, সে সময় জনসংখ্যার চাপ এত বেশি হয়নি যাতে জমি নেবার জন্য প্রজাদের মধ্যেই কাড়াকাড়ি আছে, প্রজার জন্য জমিদারদের কোনও মাথাব্যথা নেই। তবু প্রথম যুগের তুলনায় শেষের দিকে যে জমির আয় ও চাহিদা বেড়েছিল— সম্ভবতঃ লোকবৃদ্ধির ফলে— তার একটা অপ্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়, শেষের যুগে পরগণা রেটের উপর আবওয়াব চাপিয়ে দেওয়ায়। আবওয়াব হল একালের সেস্-এর মত, বাড়তি খাজনা। শেষের দিকে মূল খাজনা যথাপূর্ব রেখে তার উপর এরকম আবওয়াব অনেক চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।

তা চাপানো সম্ভব হত না, যদি না অন্ততঃ কিছু পরিমাণে চাষবাস বাড়ত এবং আয় কিছু বাড়ত। আর সে যুগে লোকসংখ্যা না বাড়লে চাষবাস বাড়ার অন্য কোনও কারণ ছিল না, যেমন একালে আছে।

পূর্বেই বলেছি, এই লোকসংখ্যা বৃদ্ধি যে সর্বত্র সমানভাবে হচ্ছিল তা মনে করার কোনও কারণ নেই। বিশেষতঃ কিছুকাল থেকেই কতকগুলি খুব বড় ভৌগোলিক পরিবর্তন হচ্ছিল। তার মধ্যে সব চেয়ে বড় কথা হল নদীপথের গতিপরিবর্তন এবং তার ফলে বাংলার প্রাকৃতিক বদল[১] এবং ব্যবসা বাণিজ্যের বদল হচ্ছিল। এই প্রাকৃতিক বদলের মধ্যে সব চেয়ে বড় বদল হল নদীপথের গতি পরিবর্তন। প্রাচীন কালে গঙ্গার প্রধান খাত ছিল ভাগীরথী। তারপর পঞ্চদশ খৃষ্টাব্দ হতে (ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের মতে ষোড়শ শতাব্দী হতে) গঙ্গা ক্রমশঃ পূর্বাভিমুখী হতে থাকে। ক্রমান্বয়ে ভৈরব ইছামতী জলঙ্গী মাথাভাঙ্গা প্রভৃতি নদী গঙ্গার জল বহন করতে করতে শেষে শাখার বর্তমান খাত হয়। দক্ষিণে একসময় আড়িয়ল খাঁ-ও কিছুদিন পদ্মার জল বহন করেছে। ওধারে ব্রহ্মপুত্রও কালে কালে গতিবদল করে শেষে গোয়ালন্দের কাছে পদ্মায় পড়তে শুরু করেছে। এদিকে গঙ্গা ক্রমেই পূর্বগামিনী হবার ফলে পশ্চিমবঙ্গের অনেক নদী ক্ষীণকায়া হতে শুরু করে। এই ভাবেই মধ্য-দক্ষিণ বাংলার পতন হতে শুরু হয়। ভৈরব, ইছামতী, মাথাভাঙ্গা প্রভৃতি নদীর সে পূর্বগৌরব নেই; অধিকাংশই মরণোন্মুখ। সরস্বতী এককালে প্রকাণ্ড নদী ছিল, এখন তার চিহ্নও প্রায় নেই।

---

১ এবিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানতে হলে ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় *Changing face of Bengal*. এস্. সি. মজুমদারের *Rivers of the Bengal Delta*, ডাঃ নীহার রঞ্জন রায়ের "বাঙালীর ইতিহাস" তৃতীয় অধ্যায় এবং *West Bengal Census Report 1951*, Part I-A, *pp*. 15-18 পড়া উচিত।

দক্ষিণে আদিগঙ্গার খাত এককালে বড় ছিল। মহাভারতের বর্ণনা হতেও তার অনুমান বোধ হয় করা চলে। কিন্তু প্রাক্-ইতিহাসের কথা ছেড়ে দিয়ে একালের বর্ণনা[২] পড়লেও দেখা যায় বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলে (১৫০০ খৃঃ আনুমানিক) কামারহাটি, আড়িয়াদহ, ঘুষুড়ি, চিত্রপুর, কলিকাতা, বেতড়, কালিঘাট, বারুইপুর হয়ে চৌমুখী শতমুখী পার হয়ে চাঁদ সদাগর সাগর-সঙ্গমতীর্থে এসে পৌছলেন। পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ সমূহেও অনুরূপ বর্ণনা আছে। তা হতে বোঝা যায়, নদীপথ এই দিকেই ছিল এবং সেই নদীর কূলে কূলে সমৃদ্ধ বন্দর নগর ও গঞ্জ ছিল। সুন্দরবনে প্রাপ্ত নানা মূর্তি, মাটির তলায় পাওয়া সুন্দরী কাঠ ইত্যাদি নানা প্রমাণ হতে বোঝা যায়, একসময় সেখানেও সমৃদ্ধ জনপদ ছিল। সম্ভবতঃ মধ্যযুগে কোনও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে এই স্থান জনবসতি-হীন হয় এবং ক্রমে গভীর অরণ্যে পরিব্যাপ্ত হয়।

এই পরিবর্তনের ফলে বাংলার জনবসতি জনবৈচিত্র্য এবং জনপদের অনেক পরিবর্তন ঘটে। ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় প্রমাণিত করেছেন, আর্যদের দেশবিজয় ঘটত নদীপথ ধরে ধরে— অনার্যেরা থাকত নদীর প্রধান গতিপথ হতে দূরে, বনে জঙ্গলে পাহাড়ে পর্বতে। সেখান হতে আর্য আগন্তুকেরা মাটির সন্তানদের বিতাড়িত করতে পারেন নি। জনগণনার পাতা ওলটালে দেখা যাবে, একথা আজও সত্য। ব্রাহ্মণ কায়স্থের বসবাস বড় নদীর ধারে ধারে যতটা, অন্যত্র তত নয়। পক্ষান্তরে তফশীলী জাতের বেশি বসতি সমুদ্র বা জঙ্গলের ধারে, পাহাড়ের উপরে। ১৯৫১ সালের জনগণনায় পশ্চিমবাংলায় তফশীলী জাতির জনসংখ্যা মোট ৪৬,৯৬,২০৫ ; তফশীলী ট্রাইবের জনসংখ্যা মোট ১১ লক্ষ ৬৫ হাজার। তার মধ্যে ২৪-পরগণাতেই ১০ লক্ষ ৫২ হাজার,

২ বাঙালীর ইতিহাস, পৃ. ৯৩।

তফশীলী জাতি, বর্ধমানে প্রায় ছয়লক্ষ, মেদিনীপুরে প্রায় পাঁচলক্ষ, বাঁকুড়ায় চারলক্ষ, হুগলীতে সওয়া তিন লক্ষ। অথচ গঙ্গাতীরবর্তী জেলা, যেমন মুর্শিদাবাদে প্রায় ২ লক্ষ মাত্র, নদীয়ায় ১ লক্ষ ৯১ হাজার। তফশীলী জাতিরও সেই কথা। সর্বাধিক বেশি মেদিনীপুরে (২ লক্ষ ১২ হাজার), তারপর জলপাইগুড়ি (১ লক্ষ ৮৯ হাজার), তারপর বাঁকুড়া (১ লক্ষ ৩৮ হাজার) ইত্যাদি। অথচ গঙ্গাতীরবর্তী জেলার মধ্যে মুর্শিদাবাদে মাত্র ২৩ হাজার, নদীয়ায় প্রায় ১১ হাজার। গাঙ্গেয় সভ্যতা ও স্থানীয় সভ্যতার সংঘর্ষের চিহ্ন এখনও তার ছাপ বজায় রেখেছে। পক্ষান্তরে, তথাকথিত উঁচু জাতের কথা বলি। ১৯৫১ সালের এ হিসেব নেই, সুতরাং ১৯৩১ সালের হিসেব দিচ্ছি। সে সময় অবিভক্ত বাংলায় কায়স্থের মোট সংখ্যা ছিল মোটামুটি সাড়ে পনের লক্ষ। তার মধ্যে কলকাতায় কায়স্থের সংখ্যা খুব বেশি (১ লক্ষ ৬০ হাজার), কিন্তু ঢাকা ও ময়মনসিংহেও (যথাক্রমে দেড়লক্ষ ও ১ লক্ষ ৪৪ হাজার) কায়স্থের খুব ঘন বসতি। এ দুটি পদ্মা যমুনার দেশ সে কথা ভুলবার নয়। পক্ষান্তরে, অবিভক্ত বাংলায় নমশূদ্রের মোট সংখ্যা ছিল ২০.৯৪ লাখ, তার মধ্যে ফরিদপুরেই ৪.২৭ লাখ, বাখরগঞ্জে ৩.৫৫ লক্ষ, অথচ মুর্শিদাবাদে মাত্র ১১ হাজার। তেমনি পৌণ্ড্রদের মোট সংখ্যা ছিল ৬.৩৭ লক্ষ, তার মধ্যে শুধু চব্বিশপরগণাতেই ৩.৯৯ লক্ষ। অবশ্য এ কথা ঠিক যে সব জায়গাতেই প্যাটার্নমাফিক বসতি খুঁজে পাওয়া যাবে না। যুগে যুগে বহু কারণ ঘটেছে, তার জন্য বসতি উলটোপালটা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও সেই প্রাচীন সংঘর্ষের কিছু কিছু চিহ্ন এখনও ছড়িয়ে রয়েছে।

•• এ ছাড়াও উপরে উল্লিখিত প্রাকৃতিক অদলবদলের আরও কতকগুলি ফল ফলেছিল। সংক্ষেপে বলা যায়, তার প্রধানতম ফল হল, প্রথমে

পশ্চিমবাংলার উন্নতি ও ঘনবসতি, পরে তার অবনতি ও পূর্ববাংলার বিকাশ ও জনবৃদ্ধি। মহাভারত বা অনুরূপ প্রাচীন গ্রন্থে পশ্চিম ও উত্তর বাংলার উল্লেখ সময় সময় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু পূর্ববাংলার বিশেষ উল্লেখ নেই। পরেকার যুগে বঙ্গ বা 'বাঙ্গাল' দেশের উল্লেখ যথেষ্ট আছে, ভাটি দেশেরও উল্লেখ আছে। কিন্তু তখন নদীপথ পূর্বগামী হবার সময় প্রায় এগিয়ে এসেছে অথবা পূর্বগামিতা আরম্ভ হয়েছে। আকবরের সময় ইশা খাঁ আফ্গান ভাটি অঞ্চলের সামন্ত প্রভু ছিলেন। এই সময় আইন-ই-আকবরি গ্রন্থে এবং অন্যান্য গ্রন্থেও দেখা যায় পদ্মার নাম তখন পদ্মা রয়েছে, সেইটেই পুণ্যতোয়া গঙ্গা না হলেও বড়গঙ্গা। একটি কৃত্তিবাস-রামায়ণে কৃত্তিবাস নিজের পরিচয় প্রসঙ্গে বলছেন "ছোট গঙ্গা বড় গঙ্গা বড় বলিন্দা (বারেন্দ্রী) পার। যথাতথা কর্‍্যা বেড়ায় বিদ্যার উদ্ধার।" কিন্তু তা সত্ত্বেও— এমন কি বিক্রমপুরীর বৃহৎ বৌদ্ধকেন্দ্র সত্ত্বেও— ও অঞ্চলে তখন তত বেশি শহর বন্দর গঞ্জের নাম পাওয়া যায় না, যত এদিকে পাওয়া যায়। গৌড় হতে শুরু করে তাম্রলিপ্ত পর্যন্ত নদীর ধারে ধারে আশে পাশে অজস্র বন্দর শহর। য়ুয়ান্ চোয়াঙ্-এর বর্ণনা হতে শুরু করে বিভিন্ন মঙ্গল-কাব্যে, চৈতন্যদেবের দেশভ্রমণের বর্ণনায়, এমন কি প্রথম ম্যাপ-আঁকিয়েদের ছবিতেও বঙ্গের পরিচয় নবদ্বীপ, সপ্তগ্রাম, তাম্রলিপ্ত, হুগলী বরাহনগর বেতড়া। আরও আগে গঙ্গাময়ূরাক্ষীর জলোচ্ছ্বাস-উচ্ছল কর্ণসুবর্ণও (মুর্শিদাবাদের রাঙামাটি)। এমন কি ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে আঁকা ফান্ডেন ব্রোকের নকশায় হুগলী খুব বড় শহর, ত্রিবেণী ও সপ্তগ্রাম তখনও বিদ্যমান। বারোস্-এর নকশায় আগড়পাড়া বরানগরের সগৌরব উল্লেখ আছে। আসলে তখন এই দিক্‌টারই খুব উন্নতি হয়েছিল।

তারপর এই অঞ্চলের অবনতি ঘটতে শুরু হল। তার প্রধান কারণ নদীবিপর্যয়। গৌড় সপ্তগ্রাম তাম্রলিপ্তির অবনতি ঘটার মূলে এ একটা মস্ত কারণ। আর একটা মস্ত কারণ নদীবিপর্যয়ের ফলে জলা এলাকার বৃদ্ধি ও অসুখ-বিসুখের প্রকোপ। শোনা যায় নাকি, প্রচণ্ড এক মহামারীর ফলেই গৌড় হতে রাজধানী টাণ্ডায় স্থানান্তরিত হয়েছিল। কিন্তু অতদিনের কথা ছেড়ে দিচ্ছি। মধ্যবাংলার নদী-বিপর্যয়ের ফলে মধ্যবাংলায় স্বাস্থ্যের অবনতি এবং ম্যালেরিয়ার প্রকোপবৃদ্ধি সর্বজনবিদিত। এর ফলে এই সব অঞ্চল ক্ষয়িষ্ণু হতে শুরু করল এবং পূর্ববঙ্গ সমৃদ্ধ হতে শুরু করল। এই পরিবর্তন সব চেয়ে বেশি ঘটেছে সপ্তদশ হতে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে, এমন কি উনিশ শতকেও। ১৯৩১ সালের সেন্‌সাস রিপোর্টে দেখা যায়, ঢাকা ফরিদপুর বাখরগঞ্জ ত্রিপুরা এবং নোয়াখালীর কতকগুলি থানায় ঘনবসতি ভয়ানক বেশি—বোধ হয় জগতের মধ্যে সর্বোচ্চ। যেমন ঢাকার কেরানিগঞ্জ থানায় বর্গমাইলে ১৯৭৪ জন, দোহার থানায় ২০৪৯ জন, মুন্সীগঞ্জ থানায় ২৩২৯ জন, টাঙ্গিবাড়ি থানায় ৩০৩৪ জন, লোহাজং থানায় ৩২২৮ জন; ফরিদপুরের ভাঙ্গা থানায় ১৫০২ জন, পালং থানায় ১৬৪০ জন। বরিশালের ঝালকাটিতে ১৫৬২ জন, বানরিপাড়ায় ১৬৯৮ জন। উদাহরণ বৃদ্ধির প্রয়োজন নেই। অথচ এই সংখ্যাবৃদ্ধি অল্পকালের মধ্যেই খুব দ্রুতগতিতে হয়েছে। মোগল আমলের কথা তো ছেড়েই দিচ্ছি। সে সময়, র‍্যালফ্ ফিচ (১৫৮৩-৯১ খৃঃ), ফন্‌সেকা (১৫৯৯ খৃঃ) ইত্যাদির বর্ণনায় পাওয়া যায় পূর্ববাংলার অনেক অনেক অংশই শ্বাপদসংকুল বনভূমি। রেনেলের নকশায় লেখা আছে বাখরগঞ্জের সমস্ত অঞ্চল মগদের অত্যাচারে পরিত্যক্ত জনমানবহীন। কিন্তু তার পরের যুগের কথাই ধরছি। ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় প্রমাণ করেছেন—

(১) যে অঞ্চলে আমন ধান হয় সেসব অঞ্চলে ঘন বসতি দেখা যায়। তার উপর পাট হলে তো কথাই নেই।

(২) নতুন পলিমাটিপূর্ণ জমিতে আমন ধান ও পাট চাষের সুবিধা।

(৩) তার উপর সুপারি নারিকেল বাগান থাকলে আরও ঘনবসতি হয়।

পূর্ববঙ্গে এ তিনটিই আছে। তার উপর অজস্র সক্রিয় নদী ও খাল থাকায় স্বাস্থ্যের অবনতিও হয় নি। এই সব কারণে স্বতঃই জনসংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে।

ইংরেজ আমলের ইতিহাস

ইংরেজ আমলের কয়েকটি কথা বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার আছে।

প্রসিদ্ধ জনসংখ্যাবিৎ কিংসলে ডেভিস ভারতবর্ষের জনসংখ্যার তত্ত্ব আলোচনা করে বলেছেন, বর্তমান শতাব্দীর আগে ভারতীয় জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটা বিশেষ ধারা ছিল। জনসংখ্যা একবার বেড়েছে, একবার কমেছে। গত শতাব্দীর গোটাটাই মোটামুটি এইরকমভাবে চলেছে। এইরকম ঢেউ-এর ওঠাপড়ায় চলতে চলতে এই শতাব্দীতে পৌঁছে গত প্রথম মহাযুদ্ধের পর কিছু একটা ব্যাপার ঘটল যার ফলে জনসংখ্যা আর কমতির দিকে গেলই না— কেবলই বাড়তে লাগল। সেইসঙ্গে লক্ষ্য করবার কথা, সেই বাড়া অপেক্ষাকৃত দ্রুতগতিতে হতে লাগল। মোগল আমলে যেটুকু সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায় তা হতে অনুমান করা বোধহয় অন্যায় নয় যে সে সময় জনসংখ্যা বাড়ছিল বটে, কিন্তু খুব ধীরগতিতে বাড়ছিল। কিন্তু একালে জনসংখ্যা বাড়বার গতি সে তুলনায় অনেক দ্রুত।

কিংসলে ডেভিস ভারতবর্ষের জনসংখ্যাবৃদ্ধির এই বিশেষ প্যাটার্নটির দিকে যে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সেকথা বাংলাদেশের পক্ষে এক হিসেবে খাটে, এক হিসেবে খাটে না। তার কারণ পশ্চিম বাংলা ও পূর্ব বাংলায় একধরনের বিকাশ হয় নি। প্রথম পূর্ববাংলার কথাই বলি। আগেই বলেছি, পূর্ববাংলার বিকাশ হতে আরম্ভ হয় অনেক দেরিতে, কিন্তু যখন হতে আরম্ভ হল তখন তা অব্যাহতভাবে জোরের সঙ্গেই হতে আরম্ভ হল। বিশেষতঃ, ছিয়াত্তরের (১৭৭০ খৃঃ) মন্বন্তরের ধাক্কা প্রধানতঃ সীমাবদ্ধ ছিল পশ্চিমবাংলাতেই এবং পশ্চিমবাংলার বাইরে পূর্ণিয়া ইত্যাদি জেলায়। পূর্ববাংলায় তার ধাক্কা তেমন পৌছয় নি।

বর্ধমান ফীভার বা ম্যালেরিয়ার মহামারী (১৮৬৪ সাল) পশ্চিম ও মধ্যবাংলাকে যেমন ধ্বংস করেছিল পূর্ববাংলাকে তেমন নয়।[৩] যখন অন্যত্র লোক বাড়ছে সে সময়ও যশোর জেলায় ১৮৮১ সাল হতে ১৯২১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত লোক কেবলই কমে এসেছে। এরকম ঘটনা পূর্ববঙ্গে ঘটেনি। সেইজন্য সেখানে জনবৃদ্ধি অনেক বেশি অব্যাহত। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দেও দেখা যায়, পূর্ববঙ্গ বিকাশের পথে অনেকখানি পিছিয়ে আছে। প্রথম সেস্ ভ্যালুয়েশনের কাগজপত্রে তার একটা ইঙ্গিত ছড়ানো আছে। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে প্রথম সেস বসে; তারপর কয়েকবছর ধরে সেস্ ভ্যালুয়েশন হয়। তাতে পরপৃষ্ঠায় লিখিত হিসেব পাওয়া যায়[৪]—

এ হতে অনেকগুলি কৌতূহলকর তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। প্রথমতঃ ছোট আকারের জমিদারী পূবে অনেক বেশি (এক লক্ষ তিন হাজার) পশ্চিমে অনেক কম (তের হাজার পাঁচশ মাত্র)। এ হতে বোঝা যায় বড় জমিদারীর উদ্ভব পূর্ব বাংলায় তখনও হয় নি। তখনও সেখানে বড় চাষীই বেশি। উপস্বত্বভোগী পশ্চিমবঙ্গের মত বেশি হয় নি। কাজেই বড় চাষীদের সঙ্গে সরকারী বন্দোবস্ত হবার ফলেই একশ' টাকা বা তার চেয়ে কম রেভিনিউ দেয় এমন জমিদারীর সংখ্যা পূর্ববঙ্গে অনেক

৩ ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের *The Changing Face of Bengal* বইটির ৮১ পৃষ্ঠায় কতকগুলি Spleen-index দেওয়া আছে। তা হতে দেখা যায়, যেসব জায়গায় প্লীহা-index বেশি সেখানেই কৃষি ও জনসংখ্যার ক্ষয় ঘটেছে। পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই Spleen-index খুব নীচু:—কালনা, ৮৮; রাণাঘাট ৭৫; কৃষ্ণনগর ৭৩; বনগাঁ ৭১; মেহেরপুর ৭০; বর্ধমান ৭০; চুয়াডাঙ্গা ৫৭; ঝিনাইদহ ৫৭; নাটোর ৫৩; পাবনা ৬৫; রাজশাহী ৫৭; মাগুরা ৫১; মুর্শিদাবাদ ৫০। পক্ষান্তরে, ফরিদপুর ২০; সিরাজগঞ্জ ১৮: ঢাকা ১৩; গোপালগঞ্জ ৮; মৈমনসিংহ ৭; মাদারিপুর ২; মুন্সীগঞ্জ ১; নারায়ণগঞ্জ ১; নোয়াখালি ১।

৪ *Zemindari Settlement of Bengal,* (1879), Vol. 1. p 288 দ্রষ্টব্য।

১৮৭৬-৭৭ সাল পর্যন্ত সমস্ত জমিদারী স্বত্ব মধ্যস্বত্ব ও উপস্বত্বের ভ্যালুয়েশন (প্রজাই স্বত্ব বাদে)।

	ভ্যালুয়েশন-কৃত এস্টেটের সংখ্যা		ভ্যালুয়েশন-কৃত মধ্যস্বত্বের সংখ্যা		মোট সংখ্যা		ভ্যালুয়েশন		জেলার রেভিনিউ
	রেভিনিউ দেয়		খাজনা দেয়		এস্টেট	মধ্যস্বত্ব	এস্টেটের	মধ্যস্বত্বের	
	১০০ টাকার উপর	১০০ টাকা ও তার কম	১০০ টাকার উপর	১০০ টাকা ও তার কম			টাকা	টাকা	টাকা
বাংলা—									
১। পূবের জেলাগুলি (কেবল ঢাকা বিভাগ)	৪,৮৭০	১,০৩,২৫৯	২১,৯২৬	৫,৩১,৫৭৩	১,০৮,১২৯	৫,৫৩,৫০৪	২,৫৫,৪৮,৭৫০	২,০৯,৪৬,১৩১	৫১,০২,৯১৬
২। পশ্চিমের জেলাগুলি	৪,৫৭৩	১৩,৫৯৬	১০,০৫৯	১,৪৩,২০১	১৮,১৬৯	১,৫৩,২৬০	১,৮৪,৯০,৬২৫	১,২০,৮৪,৯০১	৭৭,৩৩,৫১৭
৩। মধ্যবাংলার জেলাগুলি	৬,১৮৭	১৭,৪০৩	২০,৪৭৬	১,৭০,৯১০	২৩,৫৯০	১,৯১,৩৮৬	২,৯৬,৩৫,৩৫৩	১,৭৭,০৩,৫৮১	৯৮,৯৬,৮৪০
মোট	১৫,৬৩০	১,৩৪,২৫৮	৫২,৪৬১	৮,৪৫,৬৮৯	১,৪৯,৮৮৮	৮,৯৮,১৫০	৭,৩৬,৭৪,৭২৮	৫,০৭,৩৪,৬১৩	২,২৭,৩৩,২৭৩

বেশি। প্রজা স্বত্বের বেলাতেও সেই কথা। অবশ্য এ হতে হঠাৎ মনে হতে পারে, পূর্ববঙ্গে ছোট মধ্যস্বত্বের সংখ্যা পাঁচলাখ একত্রিশ হাজার আর পশ্চিমবঙ্গে তো মোটে একলাখ তেতাল্লিশ হাজার, তাহলে তো পূর্ব বাংলাতেই ঘনতা বেশি। কিন্তু বস্তুতঃ তা নয়। তার দুটি প্রমাণ আছে। ছোট মধ্যস্বত্বের সংখ্যা দিয়ে ছোট মধ্যস্বত্বের ভ্যালুয়েশনকে ভাগ করলে দেখা যাবে, পূর্ববাংলায় প্রতি ছোট মধ্যস্বত্বের গড়পড়তা ভ্যালুয়েশন, ৩৯'৪ টাকা— মোটামুটি ৪০ টাকা। আর সে-ক্ষেত্রে পশ্চিম বাংলায় অনুরূপ ভ্যালুয়েশন ৮২ টাকা— ডবলেরও বেশি। পূর্ববাংলায় মোট ১,০৮,১২৯টি জমিদারীর তলায় ৫,৫০৪টি মধ্যস্বত্ব ছিল, অর্থাৎ গড়ে প্রতি জমিদারীতে মোটামুটি ৫টি মধ্যস্বত্ব। পশ্চিমবঙ্গের অনুরূপ হিসেব হচ্ছে প্রতিটি জমিদারীতে ৮'৮ টি মধ্যস্বত্ব। অনেক বেশি। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে মধ্যস্বত্বের মূল্যও অনেক বেশি, জমিদারী-প্রতি মধ্যস্বত্বের সংখ্যাও অনেক বেশি। জমির চাপ হতে হতে চাপ বেড়ে বেড়ে প্রান্তিক সীমানায় পৌছবার লক্ষণ এইগুলি, জনাধিক্যেরও। এই হতে পশ্চিমবাংলা ও পূর্ববাংলার একটা তফাতের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তা ছাড়া মনে রাখতে হবে সুন্দরবনে, বিশেষতঃ পশ্চিম সুন্দরবনে, (বাখরগঞ্জে জঙ্গল এখনও ঢের বেশি) জঙ্গল কেটে আবাদ করাবার চেষ্টা এই সময়ই সরকার হতে শুরু হয়েছিল। বাখরগঞ্জ খুলনার তুলনায় সম্ভবতঃ চব্বিশ পরগণাতেই সুন্দরবন সব চেয়ে সংকুচিত। এর মধ্যেও জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটা পরোক্ষ ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

কিন্তু তার পরের অবস্থাটা দেখা যাক। ১৯৩১ সালের অবিভক্ত বাংলার সেন্সাস রিপোর্ট (৬৬ পৃষ্ঠা) হতে একটি হিসাব তুলে দিচ্ছি—

ডিভিসন বা বিভাগ	প্রতি বর্গমাইলে জনসংখ্যা							ঐ সময় জনসংখ্যার শতকরা হ্রাস বৃদ্ধি (বৃদ্ধি+, হ্রাস—)						
	১৯৩১	১৯২১	১৯১১	১৯০১	১৮৯১	১৮৮১	১৮৭২	১৯২১-৩১	১৯১১-২১	১৯০১-১১	১৮৯১-১৯০১	১৮৮১-৯১	১৮৭২-৮১	১৮৭২-১৯৩১
অবিভক্ত বাংলা	৬১৬	৫৭৮	৫৬৩	৫২১	৪৮৪	৪৫০	৪২২	+৭·৩	+২·৮	+৮·০	—৭·৭	—৭·৫	+৬·৭	+৪৭·২৫
তার মধ্যে—														
বর্ধমান বিভাগ	৬১৮	৫৮১	৬১১	৫৯৫	৫৫৫	৫৩৪	৫৪৫	+৭·৪	—৪·৯	+২·৮	+৭·২	+৪·০	—২·৮	+১৩·৭১
প্রেসিডেন্সী বিভাগ	৫৬৬	৫৪৩	৫৪১	৫১৫	৪৮৯	৪৭০	৪২৫	+৭·০	+০·৪	—৫·১	—৫·৪	+৩·৯	+১০·৫	+৩৬·৪
রাজশাহী বিভাগ	৫৫৭	৫৪৩	৫৩৩	৪৯৩	৪৬৪	৪৪৩	৪২৩	+২·৭	+২·০	+৮·২	+৬·২	+৪·৭	+৪·৮	+৩২·৪
ঢাকা বিভাগ	৯৩৫	৮৬৬	৮০৯	৭২৬	৬৬২	৫৮৬	৫১১	+৮·২	+৭·১	+১১·৪	+৯·৬	+১৩·০	+১৪·৬	+৮৩·৩
চট্টগ্রাম বিভাগ	৫৩৪	৫১২	৪৬৭	৪১০	৩৬৩	৩০৯	২৯৮	—১৩৭	+৯·৮	+১৩·৮	—১৩·০	+১৭·৪	+৩·৮	+৯৫·৮

বর্ধমান বিভাগের সঙ্গে ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের তুলনা করলেই তফাৎটা খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বর্ধমান বিভাগে ১৮৭২-১৯৩১ এই ঊনষাট বছরে জনসংখ্যা অন্ততঃ দুবার কমেছে, বাকী সময় বেড়েছে বটে, কিন্তু তা-ও অপেক্ষাকৃত শ্লথ গতিতে। এই সময় মোট শতকরা বৃদ্ধি হয়েছে মাত্র ১৩.৭১ ভাগ, বসতি বেড়েছে প্রতি বর্গমাইলে ৫৪৫ হতে ৬১৮। ১৯২১ সালে তো মাত্র ৫৮১, অর্থাৎ পঞ্চাশ বছরে বর্গমাইলে মাত্র ৩৬ জন। তার সঙ্গে ঢাকা বা চট্টগ্রাম বিভাগ তুলনা করুন। ঊনষাট বছরে জনসংখ্যা বেড়েছে যথাক্রমে শতকরা ৮৬·৩ ভাগ এবং ৯৫·৮ ভাগ। অর্থাৎ প্রায় ডবল হয়ে গিয়েছে। বসতিও বেড়েছে, ঢাকায় ৫১১ হতে ৯৩৫! চট্টগ্রামে বসতি এখনও তত হয়নি বটে, কিন্তু কি দ্রুত বৃদ্ধি! ২৯৮ হতে একেবারে ৫৩৪!

এবার পশ্চিম বাংলার কথায় আসা যাক। পূর্বের আলোচনা হতেই আভাস পাওয়া যায় পশ্চিমবাংলায় জনবৃদ্ধির ধারা কি। সংক্ষেপে দু একটি কথার পুনরুল্লেখ করা যেতে পারে। হাণ্টার সাহেবের মতে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ফলে (১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দ) বাংলার মোট জনসংখ্যার একতৃতীয়াংশ মারা গিয়েছিল, বাংলার কৃষিজীবীদের অর্ধেক। অবশ্য মনে রাখতে হবে এ বাংলা আর প্রাক্-র‍্যাডক্লিফ-রোয়েদাদ বাংলার এলাকা এক নয়। সে সময় বাংলা আরও বড় ছিল। তার কয়েক বছর পর কোলব্রুক সাহেব জনসংখ্যার একটা আন্দাজ করেন। তখন বাংলা ও বিহারের মোট এলাকা ছিল ১৪৯, ২১৭ বর্গ মাইল; বেনারেস সমেত ১৬২, ৫০০ বর্গমাইল। তখন ভূমির ব্যবহার সম্বন্ধে কোলব্রুক নিম্নলিখিত হিসেব দিয়েছেন —

	অনুপাত
নদী, খাল, বিল, (১/৮ মাংশ) :—	৩
গ্রাম ও শহরের বাস্তু, রাস্তা,	
পুকুর ইত্যাদি (১/২৪ অংশ) :—	১
চাষের অযোগ্য (১/৬ অংশ) :—	৪
নিষ্কর জমি (১/৮) :—	৩
স-কর জমি	
চাষে ব্যবহৃত (৩/৮) :—	৯
পতিত (১/৬) :—	৪
	২৪ = ১০০%

কোলব্রুক বলছেন দেওয়ানি বাংলায় তখন প্রতি বর্গমাইলে ২০৩ জন লোক ছিল, মোট জনসংখ্যা ৩,০২,৯১,০৫১ অর্থাৎ মোটামুটি ৩ কোটি। কোলব্রুক আরও বলছেন সব চেয়ে সমৃদ্ধ জেলা হল বর্ধমান, ২৪ পরগনা ও নদীয়া, আর সব চেয়ে পশ্চাৎপদ জেলা হল সিলেট, কুচবিহার, ত্রিপুরা এবং রামগড়।

তারপর আর একজন পর্যবেক্ষকের সাক্ষ্য উদ্ধৃত করি। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় ডাঃ বুকানন-হ্যামিল্‌টন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আদেশে দক্ষিণভারত ও উত্তরভারতের বহু জায়গার তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। তার মধ্যে ১৮০৮ সালের দিনাজপুরের বর্ণনা আছে। তিনি যে সমস্ত হিসেব দিয়েছিলেন তা হতে তখনকার অবস্থার আভাস পাওয়া যায়। যেমন সে সময় দিনাজপুর জেলায় বাড়ী ও বাগান বাদ দিয়ে ৭,১৯,৪০০ বিঘা জমি ছিল। তার মধ্যে মোটামুটি ১৯৪০০ বিঘা ছিল জমিদারের খাস। বাকি ৭ লক্ষ বিঘার মধ্যে প্রায় ৪০,০০০ বিঘা ছিল ব্যবসায়ীদের হাতে। বাকী ৬,৬০,০০০ বিঘার হিসেব এই রকম :—

গড়পড়তা মাথা পিছু চাষের জমি ১৬৫ বিঘা, এরকম ৬৬০০ চাষী; মাথা পিছু ৭৫ বিঘা জমি এরকম ৮৮০০ চাষী; ৬০ বিঘা মাথা পিছু জমি এরকম ১১০০০ চাষী; ৪৫ বিঘা মাথা পিছু জমি এরকম ১৯৮০০ চাষী; ৩০ বিঘা মাথা পিছু জমি এরকম ৫৫ হাজার চাষী; ১৫ বিঘা মাথা পিছু জমি এরকম ১,১০,০০০ চাষী।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে তখন কতকগুলি জায়গায় যথেষ্ট ঘন বসতি (কোলব্রুকের মতে), অথচ কতকগুলি জায়গায় তত নয় (যেমন দিনাজপুরে)। ২০৩ জন গড়পড়তা লোক প্রতি বর্গ মাইলে, এ বড় কম ঘনতা নয়। তার উপর কতকগুলি জায়গায় যদি তার মধ্যেই হাল্কা বসতি থাকে, তার অর্থই হল অন্য জায়গাগুলিতে আরও ঘন বসতি। খাস পশ্চিম বাংলায় ঘনবসতি ছিল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। বিশেষতঃ যখন ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পরেই এই অবস্থা।

ভারতবর্ষে প্রথম জনগণনা হয় ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে। সুতরাং উনিশ শতকের ত্রি-চতুর্থ অংশেরই জনসংখ্যার মাথাগুনতি হিসাব পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু এই সময়ের জনসমুদ্রের জোয়ারভাটার কিছুটা ইঙ্গিত পাওয়া যায় সেকালের ভূমিব্যবস্থার অদলবদল হতে। তা হতে বেশ একটা ছবি পাওয়া যায়। বস্তুত সেকালের ভূমি-আইনের অর্থনৈতিক কারণ সম্বন্ধে কোনও গবেষণাই সাধারণতঃ হয় না, তা হলে বাংলার সে সময়কার অজানা কথা অনেক উদ্‌ঘাটিত হতে পারে। তার পূর্ণাঙ্গ আলোচনার ক্ষেত্র এ নয়, কিন্তু সংক্ষেপে দু একটা কথার উল্লেখ করা প্রয়োজন। এই যুগে ভূমিব্যবস্থার কয়েকটি বড় যুগ দেখতে পাওয়া যায়। প্রথম ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত; তারপর ১৮৫৯ সালের রেণ্ট অ্যাক্ট, সেই সঙ্গে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের গ্রেট রেণ্ট কেস; তারপর ১৮৮৫ সালে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন। এই প্রায় একশ বছরে চাকা সম্পূর্ণ ঘুরে

এল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমির মালিকানা সম্পূর্ণ দেওয়া হয়েছিল জমিদারদের হাতে এই আশায় যে তাঁরা চাষের বিস্তার (কথাটি লক্ষণীয়) ও চাষীর উন্নতি করবেন। একশ বছরে দেখা গেল তাঁরা তা করেন নি, কেবলই অনুপার্জিত আয় আত্মসাৎ করেছেন। সুতরাং বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনে অধিকার দেওয়া হল প্রজাদের হাতে। এখন দেখা যাচ্ছে তারাও তা করে নি। সেইজন্য কিছুকাল হতেই লক্ষণ দেখা যাচ্ছে প্রজাদের তলায় যে সব ছোট প্রজা বা বর্গাদার আছে তাদের হাতে ক্ষমতা এবং অধিকার দেবার। কিন্তু সে কথা যাক্। বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন অবধি ঘটনাবলী লক্ষ্য করলে একটি জিনিস খুব স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে। সেটি হল, প্রথম যুগে চাষ বেশি ছিল না; সেইজন্য জমিদারদেরই দরকার হত প্রজার। কালক্রমে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হবার সঙ্গে সঙ্গে অবস্থা উল্‌টে গেল। তখন প্রজারাই জমির জন্য কাড়াকাড়ি করতে লাগল। জমিসংক্রান্ত আইনে তারই ছাপ পড়েছে। দু একটা প্রমাণ দিচ্ছি।

আইন-ই-আকবরিতে নির্দেশ দেওয়া ছিল যে আমলগুজার বা রেভিনিউ কালেক্টরেরা প্রতি বছরে চাষীদের টাকা দিয়ে সাহায্য করবেন এবং দীর্ঘ কিস্তিতে আস্তে আস্তে তার শোধ নেবেন। তার উপরে মোগল আমলের পরগণা রেট এবং অন্য চাষী না পেলে কোনও জমি হতে চাষী উচ্ছেদের নিষেধ— এ সমস্ত হতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে চাষের লোকের অভাব ছিল, অন্ততঃ সংখ্যাধিক্য ছিল না। তার উপর খোদকস্ত প্রজাদের মর্যাদাও লক্ষণীয়। শেষের দিকে এ অবস্থার বদল ঘটেছিল তারও কিছু কিছু পরোক্ষ ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যেমন আবওয়াবের ক্রমিক বৃদ্ধি। সবসময় প্রজাদের দেবার ক্ষমতা দেখে কর ধার্য হত এমন নয়। কিন্তু এ কথা ঠিক যে মোটের উপর কিছুটা সঞ্চয় বৃদ্ধি না হলে ঐ রকম পর পর আবওয়াব বসানো সম্ভব ছিল না। কৃষির প্রসারই ছিল

সে যুগের সঞ্চয়বৃদ্ধির প্রধান উপায়। আর মোগল আমলের শেষের দিকে জনবসতিও যে পশ্চিমবাংলায় অনেকখানি ঘন ছিল তার প্রমাণও আছে। কোলব্রুকই তো বলেছেন, মন্বন্তরের পরও বর্গমাইলে ঘনতা ছিল ২০৩ জন। কিন্তু এসবই বদলে গেল ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পর। তখনকার কর্তৃপক্ষের মতে মোট জনসংখ্যার একতৃতীয়াংশ লোক মারা যায় (প্রায় এক কোটি) অর্থাৎ মোট কৃষিজীবীদের অর্ধেক। চাষের জমিও অর্ধেক অনাবাদি হয়ে পড়ে। বস্তুতঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অন্যতম কারণও এই। হেস্টিংস ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময়ও খাজনা বাড়াতে ইতস্ততঃ করেন নি, কিন্তু পরে তাঁর মত লোককেও থমকে দাঁড়াতে হল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রথম ইঙ্গিত আসে হেস্টিংসের কাছ থেকেই[৫]; ফ্রান্সিসও তাই বলেন। কর্নওয়ালিশ এসে দেখলেন, বাংলার এক তৃতীয়াংশ জমি জঙ্গল ও অনাবাদি হয়ে রয়েছে। ততদিনে শিল্পও ধ্বংসপ্রায়, কাজেই জমি হতে আয় না বাড়লে কোম্পানীরও চলে না, লোকদের তো নয়ই। কর্ণওয়ালিশ এক ঢিলে অনেক পাখি মারবার চেষ্টা করলেন। তাঁর মনে হল, বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী করে দিলে কোম্পানীরও একটা বাঁধা আয় রইল (সে সময় আয়ের তুলনায় রাজস্ব খুব চড়া হারেই স্থির করেছিলেন কর্ণওয়ালিশ), জমিদারেরা চাষের বিস্তার করে লাভবান হবারও চেষ্টা করবে, কোম্পানীকে আর প্রজাশোষণের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব নিতে হবে না, উপরন্তু ইংরেজের সহায়ক একটা রাজনৈতিক শ্রেণীত্ব গড়ে উঠবে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে লোকের অভাব এবং অনাবাদি জমির প্রাচুর্যের উপর ঝোঁকটা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু তার চেয়েও বেশি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হল হফতম পঞ্চম রেগুলেশন। উনিশ শতকের প্রথমপাদে এই দুইটি রেগুলেশন পাশ হয়েছিল। ও দুটির মোদ্দা কথা,

৫ রমেশচন্দ্র দত্তের *Economic History of India*, Vol I দ্রষ্টব্য।

হল, জমিদারের অনুমতি ব্যতীত কোনও প্রজা অন্য কোনও জমিদারের জমি চাষ করতে যেতে পারবে না, প্রজাদের জোর করে কাজ করাতেও জমিদারেরা পারবেন, দরকার হলে প্রজাদের আটকে রেখেও দিতে পারবেন। সে সময়কার কাগজপত্রে আরও দেখা যায় এক জমিদার অন্য জমিদারের প্রজা ভাঙিয়ে নিয়ে আসার চেষ্টা করছেন এবং তাই নিয়ে মামলা মোকর্দমা নালিশ ফরিয়াদ চলছে। এই সব হতে বোঝা যায় তখন প্রয়োজনের তুলনায় লোকসংখ্যা কম।

কিন্তু গত শতকের মাঝামাঝি দেখা যায় এ অবস্থা সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছে। ২৭শে সেপ্টেম্বর ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শম্ভুনাথ পণ্ডিত এবং আরও কয়েকজন বলছেন[৬]

> There is an almost universal absence of good feeling between landlord and tenant...the new sale law (Act I of 1845) grants to landlords the powers of enhancing withoutlimit the rents of all tenants except the khoodkast and some others of a rare description, situated in estates purchased at a sale for arrears of revenue due to them. The removal of a khookast tenant is therefore a great advantage to the landlord whenever the holding, as it must often be, is more highly bid for by a new-comer.

এ হতেই বোঝা যায়, অবস্থা সম্পূর্ণ বদলেছে। আগে লোকাভাবের জন্য জমিদারদেরই প্রজা খুঁজে বেড়াতে হত; এখন লোকের আধিক্য হেতু প্রজারাই জমি খুঁজে বেড়ায়। আগে জমিদারদের চেষ্টা ছিল প্রজা যেন না পালায়, কেন না তাহলে জমি পড়ে থাকবে; এখন

৬ Zemindari Settlement of Bengal, Vol I, p 59.

জমিদারদের চেষ্টাই হল প্রজা উচ্ছেদ করবার, কারণ তা হলেই আরও বেশি টাকা দিয়ে জমি নেবার লোক পাওয়া যাবে। বস্তুতঃ ১৮৫৯ সালের রেণ্টঅ্যাক্ট এবং ১৮৬৫ সালের গ্রেট রেণ্ট কেস্-এর অর্থ নৈতিক তাৎপর্যও এ ছাড়া আর কিছু নয়। যে উদ্বৃত্ত সঞ্চয় প্রজাদের হাতে এসেছে তার কতখানি কিভাবে জমিদারেরা নিয়ে নিতে পারে তাই নিয়েই ঐ সব আইন এবং মামলা। তার উপর রায়তি স্থিতিবান্ স্বত্বের প্রতিষ্ঠা সেই পুরোনো খোদকস্ত প্রজারই অধিকার পুনঃ-প্রতিষ্টার নামান্তর। তা ছাড়া আরও মনে রাখতে হবে, (১) হফতম পঞ্চম রেগুলেশন-এর বহুকাল আগেই উঠে গিয়েছে; (২) প্রজাদের হাতের উদ্বৃত্ত সঞ্চয় কেড়ে নেবার জন্যই আইন হচ্ছে (৩) বাঁকুড়া প্রভৃতি অনুর্বর জেলা থেকে এই সময়েই আসামে কুলি চালান শুরু হয়েছে বলে হাণ্টার লিখেছেন; (৪) এই সময় হুগলী প্রভৃতি কতকগুলি জেলায় প্রতি বর্গমাইলে একহাজার লোকের বাস ছিল; (৫) সুন্দরবনে আবাদ করবার চেষ্টা সরকার শুরু করেছেন। এইসব হতে দেখা যায় তখন ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের প্রভাব তো কেটে গিয়েছেই, উপরন্তু যথেষ্ট লোকবৃদ্ধি হয়েছে। আমার ধারণা, ১৮২৫-৩৫ খৃষ্টাব্দ নাগাদ ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের লোকক্ষয় কেটে গিয়ে পুরানো অবস্থা ফিরে আসে, তারপর আবার লোকবৃদ্ধি শুরু হয়।

এই প্রসঙ্গে ১৯৫১ সালের সেন্সাস কর্তৃপক্ষ লিখেছেন,[৭] ভারতবর্ষে বা বাংলায় এইযুগে লোকসমষ্টি হ্রাসবৃদ্ধির কোনও বাঁধাধরা নিয়ম ছিল না। তা একবার বেড়েছে আর একবার কমেছে। কিন্তু ১৯২০ সালের পর এরকম ওঠাপড়া বন্ধ হয়ে গেল, জনসংখ্যা কেবল বাড়তেই

---

৭ *Census of India, 1951, vol VI. Part IA, West Bengal, Sikkim and Chandernagar* p. 369.

লাগল। এ সম্বন্ধে সেন্‌সাস কর্তৃপক্ষ কতকগুলি কারণও নির্দেশ করেছেন। তাঁরা বলছেন, ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ঠিক একশ বছর পরেও প্রতি জেলায় অকর্ষিত ভূমি অনেক ছিল। আরও আশি বছর পরে, অর্থাৎ ১৯৫০ সালে, দেখা যাচ্ছে লোনা, পাথুরে বা বৃক্ষাচ্ছাদিত ভূমি ছাড়া আর প্রায় কিছুই পতিত জমি নেই। তার কারণ, আগে জনবৃদ্ধি ও হ্রাস পরপর চলছিল। এর কারণ খুঁজতে হয়, দুর্ভিক্ষে, ম্যালেরিয়ায়, রেলের বাঁধ হবার ফলে জলনিকাশ রোধ হয়ে স্বাস্থ্যের অবনতিতে, হৃতবল ক্ষীণশক্তি জনসাধারণের রোগ-আক্রমণ-প্রতিরোধের শক্তি হারিয়ে ফেলায়। কিন্তু গত ত্রিশ বৎসরে ক্রমান্বয়ে লোকবৃদ্ধিরও কতকগুলি কারণ আছে। সেন্‌সাস কর্তৃপক্ষের মতে এর অন্যতম কারণ হল, যাতায়াতের সুবিধা বিস্তারের জন্য এ পর্যন্ত দুরধিগম্য স্থানে যাওয়ার সুবিধা এবং সেইকারণে সংক্রামক ব্যধি ও খাদ্যভাব নিরোধের অধিকতর সুব্যবস্থা। দ্বিতীয় কারণ হল, কৃষিপণ্যের বাজার প্রসারিত হবার ফলে কৃষকের অধিক মূল্য প্রাপ্তি এবং আথিক উন্নতি। ভূমিহীন কৃষিশ্রমিকেরাও এখন দ্রুত অন্যত্র চলে যেতে পারছে এবং নূতন নূতন ক্ষেত্রে অর্থোপার্জনের সুবিধা গ্রহণ করতে পারছে। তা ছাড়া ১৯৪৩ সাল ছাড়া কোনও মহামারী বা দুর্ভিক্ষ ব্যাপক আকারে হয় নি। জনস্বাস্থ্যের ক্রমোন্নতির ফলে মৃত্যুহার কমছে। তার উপরও বাংলায় বহিরাগতের সংখ্যা যথেষ্ট। বহিরাগতের আগমনে বিশেষ বিশেষ সময়ে ও বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে লোকবৃদ্ধি হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। এই সব নানা কারণের ফলে জনসংখ্যা এখন অব্যাহত গতিতে বেড়েই চলেছে। আরও যত অবস্থার উন্নতি হবে, মৃত্যুহার দ্রুত কমতে থাকবে, জনস্বাস্থ্যের সুব্যবস্থা হবে— এবং বহিরাগতের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকবে— ততই আমাদের জনসমষ্টি বেড়ে চলবে।

পূর্বে অবিভক্ত বাংলার জনসংখ্যা ১৮৭২ সাল হতে কিরকম বেড়েছিল বা কমেছিল তার হিসেব দিয়েছি। এখন বর্তমান পশ্চিমবাংলার হিসেব ধরা যাক্। এ প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখতে হবে। পশ্চিমবাংলায় বাইরে থেকে লোক সমাগম সাধারণতঃ একটু বেশি। সেইজন্য জনসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি আলোচনা করবার সময় বহিরাগত ও বহির্গতদের হিসেব আলাদা না ধরলে পশ্চিমবাংলার সত্যকার "স্বাভাবিক" জনসংখ্যা কতখানি বাড়ল বা কমল তা ধরা যাবে না। সেইজন্য পশ্চিমবাংলার মোট জনসংখ্যা এবং স্বাভাবিক লোকসংখ্যা উভয়েরই হিসেব তুলে দিচ্ছি[৮] —

এর মধ্যে ১৯৪১ সালের কথা ছেড়ে দিচ্ছি। কিন্তু তা ছেড়ে দিলেও দেখা যায় পূর্বে এক এক সময় জনসংখ্যা বেড়েছে এক এক সময় কমেছে। কিন্তু ১৯২১ সালের পর তা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে।

বস্তুত পশ্চিমবাংলার জনসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধিকে কয়েকটা সুস্পষ্ট ভাগে ভাগ করা যায়। আমি অন্যত্র এই ভাগ দেখাবার চেষ্টা করেছি।[৯] তার মধ্যে প্রথম ভাগ হল ১৭৭০ হতে ১৮৭০। এর মধ্যে দুটি পর্ব আছে। প্রথম পর্ব ১৮২৫।৩০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। অর্থাৎ যতদিন ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ধাক্কা কাটে নি। তারপর দ্বিতীয় পর্ব, অর্থাৎ লোকবৃদ্ধির শুরু। দ্বিতীয় ভাগ হল মোটামুটি ১৮৭০ হতে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ। তার প্রধান লক্ষণ হল লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি, শিল্পের শুরু, জমিতে লোকাধিক্য, কৃষি-ব্যতিরিক্ত জীবিকার সন্ধান ইত্যাদি। আর তার সঙ্গে মধ্যে মধ্যে এক একবার লোকক্ষয়। তৃতীয় ভাগ হল ১৯১৪ হতে ১৯৪৬। এই যুগের

---

৮ পাদটীকা ৭ দ্রঃ, ৩৬৬ পৃষ্ঠা।

৯ *Census of India, 1951, vol vi part I C, West Bengal, Sikkim & Chandernagar, pp 297—304*

পশ্চিমবাংলার মোট ও "স্বাভাবিক" জনসংখ্যা, ১৮৯১-১৯৫১

(১৯৪১ সালের জনসংখ্যা সংশোধিত)

	১৯৫১	১৯৪১ (সংশোধিত)	১৯৩১	১৯২১	১৯১১	১৯০১	১৮৯১
১। মোট সংখ্যা	২,৪৮,১০,৩০৮	২,০৭,৫৬,৬৮২	১,৭৬,৬৩,৪২৭	১,৬৪,০০৮৩৭	১,৬৭,৯২,৮০০	১,৫৮,৩৪,০১০	১,৪৬,৪৯,৮৫০
২। বহিরাগত	৪৬,০০,৬৭২	১৭,২৯,৩২০	১৪,৭৭,৯০৫	১৪,৬০,০৫৪	১৩,২৮,০৭৫	১০,৪৫,৩১৪	৬,৮৭,৬৬২
৩। বহির্গত	৩,১১,১১৬	১,৮৫,৭৫৩	১,৫৫,৭৮১	১,৯১,২০০	২,৬২,০১০	৬৬,১২১	১,০১,৩০৫
৪। নীট্ বা "স্বাভাবিক" জনসংখ্যা	২,০৫,২০,৭৫২	১,৯২,১২,৬১৫	১,৬৩,৪১,৩০৩	১,৫১,৩১,৯৮৩	১,৫৬,২৬,৭৩৫	১,৪৮,৫৪,৮১৭	১,৪০,৬৩,৪৯৩
৫। শতকরা হ্রাসবৃদ্ধি	+৬·৮	+১৭·৬	+৮·০	-৩·২	+৫·২	+৫·৬	...

প্রধানতম লক্ষণ হল জনসংখ্যা বৃদ্ধি। অবশ্য এর মধ্যে ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারী হয়েছে, তার জন্য লোকক্ষয়ও হয়েছে। কিন্তু গোটা যুগটাকে সমগ্রভাবে দেখলে দেখা যাবে লোকসংখ্যা বেড়েছেই। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও মধ্যে মধ্যে সাময়িক উন্নতি হলেও মোটের উপর ক্ষয় হয়েছে। শেষ যুগ হল ১৯৪৬ হতে ১৯৫৫। লোকসংখ্যা ও ক্ষয়িষ্ণুতা উভয়েরই চরম বৃদ্ধি। এর অর্থনৈতিক তাৎপর্য যথাস্থানে আলোচনা করব। কিন্তু তার আগে পশ্চিমবাংলার বর্তমান জনসমষ্টির চেহারাটা জানা দরকার।

পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যার হিসাব

১৯৫১ সালের জনগণনায় বর্তমান পশ্চিমবাংলার মোট জনসংখ্যার হিসেব এবং তার সঙ্গে ভারতবর্ষের অন্যান্য কয়েকটি রাজ্যের অনুরূপ হিসেব তুলে দিচ্ছি :—

	এলাকা (বর্গমাইল)	মোট জনসংখ্যা	প্রতি বর্গমাইলে জনসংখ্যা
আসাম	৮৫,০১২	৯০,৪৩,৭০৭	১০৬
বিহার	৭০,৩৩০	৪,০২,২৫,৯৪৭	৫৭২
বোম্বাই	১,১১,৪৩৪	৩,৫৯,৫৬,১৫০	৩২৩
মাদ্রাজ (অবিভক্ত)	১,২৭,৭৯০	৫,৭০,১৬,০০২	৪৪৬
মধ্যপ্রদেশ	১,৩০,২৭২	২,১২,৬৭,৫৩৩	১৬৩
মহীশূর	২৯,৪৮৯	৯০,৭৪,৯৭২	৩০৮
পঞ্জাব	৩৭,৩৭৮	১,২৬,৪১,২০৫	৩৩৮
উড়িষ্যা	৬০,১৩৬	১,৪৬,৪৫,৯৪৬	২৪৪
উত্তরপ্রদেশ	১,১৩,৪০৯	৬,৩২,১৫,৭৪২	৫৫৭
পশ্চিমবাংলা	৩০,৭৭৫	২,৪৮,১০,৩০৮	৭৯৯

দেখা যাচ্ছে, আয়তনে 'ক' রাজ্যগুলির মধ্যে বর্তমান পশ্চিমবাংলাই সব চেয়ে ছোট— এমন কি দ্বিধাবিভক্ত পঞ্জাবের চেয়েও তার আয়তন কম। অথচ তার জনসংখ্যা খুব বেশি। সেইজন্য তার বর্গমাইলে জনবসতি 'ক' শ্রেণীর রাজ্যগুলির মধ্যে সর্বোচ্চ। বিহারে তা মাত্র ৫৭২, উত্তরপ্রদেশে ৫৫৭, বোম্বাইয়ে ৩২৩, কিন্তু পশ্চিমবাংলায় তা ৭৯৯। অন্যগুলির তুলনায় অনেক অনেক বেশি।

এই প্রসঙ্গে সেন্‌সাসে কতকগুলি কৌতুকাবহ তথ্য দেওয়া হয়েছে, সেগুলি তুলে দিচ্ছি :—[১০]

---

১০ "আমার দেশ", শ্রীঅশোক মিত্র প্রণীত, ৩২ পৃষ্ঠা।

(১) 'ক' শ্রেণীর রাজ্যের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ আয়তনে ক্ষুদ্রতম ও মধ্যপ্রদেশ বৃহত্তম।

(২) লোকসংখ্যায় উত্তরপ্রদেশের স্থান প্রথম, পশ্চিমবঙ্গের স্থান পঞ্চম ও আসামের স্থান নবম।

(৩) বসতির ঘনতা, ঐ শ্রেণীর রাজ্যে, পশ্চিমবঙ্গে সর্বাধিক, আসামে সর্বাপেক্ষা কম।

(৪) পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গে স্বল্পতম, উড়িষ্যায় বৃহত্তম।

(৫) এই রাজ্যের জনসমষ্টির শতকরা ৩'১ ভাগ লোক পারিবারিক জীবন যাপন করে না।

(৬) পশ্চিমবঙ্গে পরিবার পিছু লোকসংখ্যা গড়ে ৪'৯ জন।

(৭) পশ্চিমবাংলায় দশ বছরে স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার নিম্নতম।

(৮) জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশ শহরবাসী।

(৯) অকৃষিজীবীর হার এখানে সর্বোচ্চ।

(১০) রাজ্যের এক-চতুর্থাংশ লোক লিখতে পড়তে সক্ষম। এইটিই 'ক' শ্রেণীর রাজ্যের সর্বোচ্য হার।

(১১) পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুর চাপ সর্বাধিক। প্রতি ১২ জন লোকের মধ্যে একজন উদ্বাস্তু।

জনবসতির ধরন

ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন ছেড়ে দিলে পশ্চিমবাংলাই ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে ঘন বসতিপূর্ণ রাজ্য, একথা পূর্বের সারণী হতেই জানা যায়। বস্তুতঃ 'ক' শ্রেণীর রাজ্যের মধ্যে পশ্চিমবাংলাই সব চেয়ে ঘনবসতি পূর্ণ রাজ্য।• সেই জন্য এইখানে ঘনবসতির প্যাটার্নটি দুইভাবে জানা বিশেষ দরকার।

প্রথম জানা দরকার, এই জনতা এখন কোথায় কি ভাবে ছড়িয়ে আছে। দ্বিতীয়তঃ জানা দরকার এই জনতা ক্রমে ক্রমে কেমন বৃদ্ধি পেয়েছে। কারণ একটা কথা সব সময়েই মনে রাখা দরকার, দেড়শ বছর আগেও পশ্চিমবাংলায় জনতা প্রায় সর্বত্রই সমানভাবে বিস্তৃত ছিল। কিন্তু এখন তার পরিব্যাপ্তির অসমানতা খুব বেশি। কোথায়ও অসম্ভব ঘনবসতি, কোথাও কম। এর সঙ্গে পশ্চিমবাংলার উত্থান পতন এবং অর্থনৈতিক বিকাশের বিচিত্র ইতিহাস জড়িয়ে আছে। আর্থিক বিন্যাস সম্বন্ধে আলোচনার সময় সে কথা আলোচ্য।

স্থতরাং প্রথমে বর্তমান বিন্যাসের কথা আলোচনা করি। পূর্বেই বলেছি, এখানে জনসংখ্যার একচতুর্থাংশ শহরবাসী। অন্য রাজ্যের সঙ্গে তুলনা করে দেখা যেতে পারে —

	মোট জনসংখ্যার শতকরা কত অংশ শহরবাসী
সর্বভারত	১৭·৩
সমস্ত 'ক' শ্রেণীর রাজ্য	১৬·৫
উড়িষ্যা	৪·০৪
আসাম	৪·০
বিহার	৬·৭
মধ্যপ্রদেশ	১৩·৫
উত্তর প্রদেশ	১৩·৬
পঞ্জাব	১৮·৯
মাদ্রাজ (অবিভক্ত)	১৯·৬
পশ্চিমবাংলা	২৪·৮
বোম্বাই	৩১·০

এখানেও দেখা যাচ্ছে, বোম্বাই ছেড়ে দিলে পশ্চিমবাংলাতেই শহরবাসীর অনুপাত সর্বোচ্চ। পরে বিস্তৃত আলোচনায় দেখা যাবে এই শহরবাসীর উচ্চ অনুপাতের প্রকৃত তাৎপর্য কি। কিন্তু আপাততঃ যা দেখা যাচ্ছে তা হতে বোঝা যায়, পশ্চিমবাংলার চার আনা লোক শহরে, বার আনা লোক গ্রামে। সুতরাং শহরে ঘনতা কত আর শুধু গ্রামাঞ্চলে ঘনতা কত তার হিসাবটা এই প্রসঙ্গে দেখা যেতে পারে।

পশ্চিমবাংলায় প্রতি বর্গমাইলে ঘনত্ব

		১৯৫১	১৯৩১	১৯০১	১৮৭২
পশ্চিমবাংলা	মোট ঘনত্ব	৭৯৯	৫৬৯	৫১০	৪৩৮
	গ্রামাঞ্চল	৬১০	৪৮৫	৪৫২	৩৯৫
	শহরাঞ্চল	১৩,৬৩২	৬,২৬৬	৪,৪৬০	৩,৪১১
বর্ধমান বিভাগ	মোট	৭৮৬	৬১৩	৫৮৪	৫৩৯
	গ্রা	৬৮১	৫৬২	৫৫২	৫১৩
	শ	৯,০৩৭	৪,৫৮৩	৩,০৮৪	২,৫৪৮
বর্ধমান	মোট	৮১০	৫৮২	৫৬৫	৫৪৮
	গ্রা	৭০০	৫৪২	৫৪১	৫২১
	শ	৮,৩২৮	৩,৩৩৯	২,২৩০	২,৪৩৬
বীরভূম	মোট	৬১২	৫৪৪	৫২০	৪৯০
	গ্রা	৫৭৭	৫৩৬	৫২০	৪৮৯
	শ	৪,৭১৯	১,৪৫০	৬০৪	৬২৫
বাঁকুড়া	মোট	৪৯৮	৪২০	৪২২	৩৬৬
	গ্রা	৪৬৭	৩৯৮	৪০৫	৩৫২
	শ	৩,৮৭৮	২,৭৫৬	২,১৮৩	১,৮৮৪
মেদিনীপুর	মোট	৬৩৯	৫৩৩	৫৩১	৪৮৫
	গ্রা	৫৯৭	৫১১	৫১৭	৪৭১
	শ	৫,১০৯	২,৮০০	১,৮১৬	১,৮৮৬

		১৯৫১	১৯৩১	১৯০১	১৮৭২
হুগলী	মোট	১,২৮৬	৯২২	৮৬৮	৯৫৮
	গ্রা	১,০৩০	৭৭৫	৭৭৯	৮৯০
	শ	১,০১১৫	৫,৯৭০	৩,৯২৬	৩,২৯৭
হাওড়া	মোট	২,৮৭৭	১,৯৬২	১,৫১৯	১,০৬৪
	গ্রা	২,০০৪	১,৫৫২	১,২৪১	৯১৬
	শ	৩১,৪৬৫	১৫,৩৭৫	১০,৬১৮	৫,৮৯১
প্রেসিডেন্সী ডিভিসন	মোট	৮১০	৫৩৩	৪৪৯	৩৫৫
	গ্রা	৫৫০	৪২১	৩৬৮	২৯৫
	শ	১৬,৬২০	৭,১৬০	৬,৩২৫	৩,৯৭২
কলিকাতা	শ	৭৮,৮৫৮	৩৫,২৯৯	২৮,৪৯৪	২০,৭১২
নদীয়া	মোট	৭৫৯	৪৭৮	৫১২	৪৯৫
	গ্রা	৬৩৩	৪৩০	৪৬৯	৪৫০
	শ	৬,৯১৪	২,৮৫২	২,৬৪১	২,৭০২
মুর্শিদাবাদ	মোট	৮২৮	৬৬১	৬৩৮	৫৮৬
	গ্রা	৭৭৩	৬২৫	৬০৯	৫৪৬
	শ	৫,০৫৩	৩,৪৩৯	২,৮৪৩	৩,৬২১
মালদহ	মোট	৬৭৪	৫১৮	৪৩৪	৩২৩
	গ্রা	৬৫০	৫০৫	৪২২	৩১১
	শ	১১,৩৪২	৬,৩৫০	৫,৬১৬	৫,৮৪৫
পঃ দিনাজপুর	মোট	৫২০	৩৭৮	৩২৯	২৯০
	গ্রা	৪৯২	...	...	...
	শ	৫৫,৯২	...	...	...
জলপাইগুড়ি	মোট	৩৮৫	৩১১	২২৯	৮৫
	গ্রা	৩৫৯	৩০৪	২২৬	৮২
	শ	৭,৬০৩	২,১৮০	১,১৮৩	৭৫৮

		১৯৫১	১৯২১	১৯০১	১৮৭২
দার্জিলিং	মোট	৩৭১	২৬৬	২০৮	৭৯
	গ্রা	২৯৬	২৩৩	১৯২	৭৭
	শ	৭,৩৮১	৩,৫৯৭	১,৬৭১	২৪৭
কুচবিহার	মোট	৫০৭	৪৪৭	৪২৯	৪০৩
	গ্রা	৪৭১	৪৩৫	৪১৯	৩৯৯
	শ	১১,৬৭০	৪,১২৩	৩,২৭০	১,৫৬২
২৪ পরগণা	মোট	৮১৭	৫১২	৫৮২	৩০১
	গ্রা	৫৯১	৫১৮	৩৩৩	২৭২
	শ	৯,২৩০	৪,০১৭	২,১৯৬	১,৩৭৭

এই দীর্ঘ পরিসংখ্যান উদ্ধৃত করা আপাতদৃষ্টিতে অনাবশ্যক মনে হতে পারে, কিন্তু বস্তুত তা নয়। এমন কি এই একটি হিসেব হতেই বাংলার বহু তথ্য বুঝতে পারা যায়। দুচারটির উল্লেখ করি। প্রথমেই দেখা যাক্ বর্ধমান বিভাগের সঙ্গে (বর্তমান) প্রেসিডেন্সী বিভাগের তফাৎ। ১৮৭২ সালে দেখা যাচ্ছে বর্ধমান বিভাগের মোট ঘনতা ছিল প্রতি বর্গ মাইলে ৫৩৯, তার মধ্যে গ্রামাঞ্চলে ৫৩৯, শহরাঞ্চলে ২৫৪৮। প্রেসিডেন্সী বিভাগে তখন তার চেয়ে অনেক কম ঘনতা। সেখানে ১৮৭২ সালে মোট ঘনতা মাত্র ৩১৫, তার মধ্যে গ্রামাঞ্চলে ২৯৫, শহরাঞ্চলে ৩,৯৭২। শহরের কথা আপাততঃ ছেড়ে দিচ্ছি। (এ অঞ্চলে বহু শহর তার পর ক্ষয়িষ্ণু হয়েছে, শহরের চেহারাও বদলেছে)। গ্রামের কথাই ধরা যাক। বর্ধমান বিভাগে গ্রামাঞ্চলের ঘনতা সে যুগে প্রেসিডেন্সী বিভাগের ১·৭ গুণ, অর্থাৎ প্রায় দ্বিগুণের কাছাকাছি। পূর্বে বলেছি, পশ্চিমবাংলার মধ্যে বর্ধমান ও পশ্চিমদিকটাই বেশি সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল, উত্তরদিক ও পূর্বদিক ততটা নয়— এ হিসেব তারই প্রমাণ দিচ্ছে। বিশেষতঃ মধ্য বাংলায় তখন স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটছে, ক্ষয়িষ্ণুতা দেখা দিয়েছে। সেই

সঙ্গে আর একটা পার্থক্য বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করবার। ১৮৭২ হতে ১৯৫১ সালে বর্ধমানে গ্রামাঞ্চলের ঘনতা বেড়েছে ৫১৩ হতে মাত্র ৬৮১। সে তুলনায় প্রেসিডেন্সী বিভাগে বৃদ্ধি হয়েছে অনেক বেশি— ২৭২ হতে ৫৯১। এর অর্থ কি? এর একটা ইঙ্গিত হল, বর্ধমান বিভাগে এত ঘন বসতি আগেই ছিল যে গ্রামাঞ্চলে আর বেশি লোক থাকার উপায় ছিল না— কিন্তু উত্তরবঙ্গ-সম্বলিত প্রেসিডেন্সী বিভাগে তা হয় নি। বিশেষতঃ চা-শিল্প, পাট, তামাক প্রভৃতির চাষ এ অঞ্চলে থাকায় অপেক্ষাকৃত অল্প জমিতেও অন্য জায়গার চেয়ে বেশি লোকের জীবনধারণ সম্ভব হয়েছে। জেলাগুলির অবস্থা আলোচনা করলে এই কথা আরও ভালভাবে বোঝা যায়। দু-একটা উদাহরণ দিই। যেমন হুগলী জেলা। আশি বছর আগে ঘনতা গ্রামাঞ্চলে ছিল ৮৯০, এখন ১০৩০। খুব বেশি বাড়ে নি। আগেই তো খুব বেশি ছিল— তার উপর আর কত বাড়তে পারে? কাজেই অনেকে কলিকাতা এবং শিল্পাঞ্চলে চলে এসেছে, তাই শহর বেড়েছে অনেক। বর্ধমান, বীরভূম, এ সবেরই চেহারা মোটামুটি তাই। কিন্তু মালদহের চেহারা তা নয়। সেখানে এই সময়ে গ্রামাঞ্চলের ঘনতা দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছে, অথচ সেখানে শহরের ঘনতাও মাত্র দ্বিগুণ হয়েছে, অন্য জায়গার মত ত্রিগুণ বা চতুর্গুণ হয়নি। অথবা জলপাইগুড়ি। গ্রামাঞ্চলের ঘনতা হয়েছে ৮২ থেকে ৩৫৯, অর্থাৎ চারগুণেরও বেশি! শহরও বেড়েছে, কিন্তু গ্রামাঞ্চলের এরকম চাপবৃদ্ধি বর্ধমান বিভাগের উচ্চ চাপ জেলাগুলিতে সম্ভব ছিল না। এমন কি শিল্প-প্রধান চব্বিশ-পরগণার কথাই ধরা যাক। এখানে শহরের প্রচুর বৃদ্ধি সত্ত্বেও গ্রামাঞ্চলের চাপও প্রায় আড়াইগুণ বেড়ে গিয়েছে— যার ভগ্নাংশও বর্ধমান বা বীরভূমে সম্ভব হয়নি।

এই সব ঘটনা বস্তুত আকস্মিক নয়। আরও প্রমাণ আছে। সে কথা

অর্থনৈতিক অবস্থার আলোচনার সময় আলোচনীয়। এখন নানাকারণে এইভাবে হ্রাসবৃদ্ধি হয়ে অবস্থাটা দাঁড়িয়েছে এইরকম :

জেলার নাম	বর্গমাইল এলাকা	পঃ বঙ্গের মোট এলাকার %	জনসংখ্যা	পঃ বঙ্গের মোট জনসংখ্যার %
বর্ধমান	২৭১৫'৯	৮'৮২	২১,৯১,৬৬৭	৮'৮৩
বীরভূম	১৭৫৪'২	৫'৭০	১০,৬৬,৮৮৯	৪'৩০
বাঁকুড়া	২৬৫৭'৭	৮'৬৪	১৩,১৯,২৫৯	৫'৩২
মেদিনীপুর	৫২৫৮'৫	১৭'০৯	৩৩,৫৯,০০২	১৩'৫৪
হুগলী	১২০৯'২	৩'৯৩	১৫,৫৪,৩২০	৬'২৬
হাওড়া	৫৬৮'২	১'৮৫	১৬,১১,৩৭৩	৬'৫০
কলিকাতা	৩২'৩	...	২৫,৪৮,৬৭৭	১০'২৭
নদীয়া	১৫২৭'২	৪'৯৬	১১,৪৪,৯২৪	৪'৬১
মুর্শিদাবাদ	২০৯৪'৫	৬'৮১	১৭,১৫,৭৫৯	৬'৯২
মালদহ	১৪০৭'৯	৪'৫৭	৯,৩৭,৫৮০	৩'৭৮
পঃ দিনাজপুর	১৩৮৪'৮	৪'৫০	৭,২০,৫৭৩	২'৯০
জলপাইগুড়ি	২৩৭৮'৩	৭'৭৩	৯,১৪,৫৩৮	৩'৬৯
দার্জিলিং	১১৫৯'৭	৩'৭৭	৪,৪৫,২৬০	১'৭৯
কুচবিহার	১৩৩৪'১	৪'৩৩	৬,৭১,১৫৯	২'৭১
চব্বিশ পরগণা	৫২৯২'৮	১৭'২০	৪৬,০৯,৩০৯	১৮'৫৮

দেখা যাচ্ছে, শতকরা হিসেবে কতকগুলি জেলায় এলাকা ও জনবসতির মোটামুটি ভারসাম্য আছে। যেমন বর্ধমানের এলাকা ৮'৮২%, জনসংখ্যাও ৮'৮৩%। অথবা মুর্শিদাবাদ ৬'৮১/৬'৯২%। অনেক জেলায় এরকম ভারসাম্য নেই। যেমন কলিকাতা। এলাকা অতি সামান্য, জনসংখ্যা

অত্যন্ত বেশি। আবার উল্টো দিকও আছে। যেমন জলপাইগুড়ি এলাকায় ৭.৭৩% অথচ জনসংখ্যায় মাত্র ৩.৬৯%। এইভাবে জেলাগুলিকে তিনটি ভাগ করা যেতে পারে। (১) যেগুলিতে এলাকার তুলনায় জনসংখ্যার চাপ কম; (২) যেগুলিতে এলাকার তুলনায় জনসংখ্যার চাপ বেশি; (৩) যেগুলিতে উভয় দিকের মোটামুটি ভারসাম্য আছে। সে হিসেবে প্রথম তালিকায় পড়ে বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, কুচবিহার। দ্বিতীয় তালিকায় পড়ে হুগলী, হাওড়া, কলিকাতা নদীয়া, চব্বিশপরগণা। তৃতীয় তালিকায় পড়ে বর্ধমান আর মুর্শিদাবাদ। তা হলেই দেখা যাচ্ছে কতকগুলি অঞ্চলে লোকের বাস বেশি। পূর্বে যে পরিসংখ্যান উদ্ধৃত করেছি তার সঙ্গে এ হিসেব মিলে যাচ্ছে। দ্বিতীয় তালিকায় উল্লিখিত জেলাগুলির মোট ঘনতা প্রতি বর্গমাইলে (কলিকাতা বাদ দিয়েও) ২৮৭৭ হতে ৭৫৯। অত চাপ প্রথম তালিকার কোথায়ও নেই। সেখানে অনুরূপ সর্বোচ্চ চাপ ৬৭৪ (মালদহ)।

থানাতেও এইরকম ব্যাপার আছে। সেন্‌সাস রিপোর্টে এই আলোচনা প্রসঙ্গে জিলাগুলিকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে: (১) যে সব থানার জনসংখ্যার চাপ বর্গমাইলে ৭৫০ বা তদূর্ধ; (২) আর যে সব থানায় চাপ তার চেয়ে কম। যেমন দেখা যায়, বর্ধমানে বর্গমাইল প্রতি ৩০০০ বা তদূর্ধ লোকসংখ্যা আছে এরকম এলাকা পশ্চিমবঙ্গের মোট ঐ ধরনের এলাকার মাত্র ২.৩৪%, কিন্তু ঐস্থানে বাস করে ২.৩৭ লক্ষ লোক, যা পশ্চিমবাংলার ঐ ধরনের ঘণবসতির মোট লোকসংখ্যার ১০.৮৫%। পক্ষান্তরে মুর্শিদাবাদ জেলায় ঐরকম ঘনবসতির এলাকাই নেই। এইভাবে দেখা যায়, জনবসতি পশ্চিমবাংলায় অত্যন্ত অসমান। এই প্রসঙ্গে সেন্‌সাস রিপোর্ট মন্তব্য করেছেন (১৭৯ পৃষ্ঠা) যে

পশ্চিমবাংলার মোট ৩০৭৭৫ বর্গমাইল এলাকার মধ্যে ৪১২৬ বর্গমাইল বা মাত্র ১৩·৪% ভাগে (মাত্র ১০৪টি থানা) জনসংখ্যার চাপ প্রতি বর্গমাইলে ১০৫০ এর বেশি। এই এলাকাটুকুতে মোট জনসংখ্যার ৪২·৭% ভাগ লোক থাকে। পক্ষান্তরে বাকী ৮৬·৬% এলাকায় থাকে মোট জনসংখ্যার ৫৭·৩% লোক। অর্থাৎ শতকরা ৮৬·৬% জমিতে থাকে শতকরা ৫৭·৩% ভাগ লোক, অথচ কেবল বাকী শতকরা ১৩·৪% ভাগ জমিতে থাকে ৪২·৭% ভাগ লোক। এই হতেই জনবসতির অসমানতা স্পষ্ট হয়।

অসমান জনবসতির কারণ কি

জনবসতির ঘনতা বহু কারণের উপর নির্ভর করে। বসবাসের সুবিধা, স্বাস্থ্য, জীবিকার উপায়— ইত্যাদি বহুবিধ কারণ তার জন্য দায়ী। পশ্চিমবাংলায় এসবের মধ্যে জীবিকার সুবিধা-অসুবিধাই বোধ হয় সবচেয়ে বড় কারণ। সেন্সাস রিপোর্টে (১০৯ পৃষ্ঠায়) মন্তব্য করা হয়েছে —

> The general distribution of population has thus been far from uniform. But it has had one striking and uniform trend : wherever a new prospect of livelihood and sustenance has appeared that area has rapidly filled up, no matter whether the Sustenance has been from industry and agriculture. On the other hand, wherever no new industry has grown up or agriculture has attained a static stage and marginal land does not invite cultivation.

population has tended to stagnate, neither growing up naturally nor attracting immigrants.

এই দিক থেকে দেখা যায়, কতকগুলি জেলায় স্বভাবতঃই জনসংখ্যার চাপ খুব বেড়েছে। পূর্বেই উল্লেখ করেছি জলপাইগুড়ির ঘনতা ১৮৭২ হতে ১৯৫১ সালের মধ্যে ৮৫ থেকে ৩৮৭ হয়ে গিয়েছে— সাড়ে চারগুণেরও বেশি। তার কারণ চা-বাগানের বৃদ্ধি। বর্ধমানে জনসংখ্যার চাপ আগে থেকেই বেশি ছিল বলে চাপ ততটা বাড়েনি বটে, কিন্তু শুধু আসানসোল মহকুমা ধরলে দেখা যায় ১৮৭২ সালে সেখানে ঘনতা ছিল ৩৮২, আর এখন ১২৩৩! অর্থাৎ, চারগুণ!

পক্ষান্তরে দেখা যায়, অন্য এলাকাগুলিতে অবনতি ঘটছে। সেনসাস রিপোর্ট হতে জানা যায় যে পশ্চিমবাংলায় কালনা, সোণামুখী, পাত্রসায়র, খড়ার, রামজীবনপুর, চন্দ্রকোণা, ক্ষীরপাই, আরামবাগ, গোবরডাঙ্গা, বীরনগর, মুর্শিদাবাদ, জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ, পুরোনো মালদহ— এই তেরটি শহরের জনসংখ্যা ১৮৭২ সালের তুলনায় এখন কম। এ ছাড়া আরও ১২টি শহর আছে (যথা, কাটোয়া, দাঁইহাট, সিউড়ী, ঘাটাল, চুঁচড়া, বারাসত, কৃষ্ণনগর, রাণাঘাট, চাকদহ, শান্তিপুর, বহরমপুর, জঙ্গীপুর) যেখানে ১৮৭২ সাল হতে জনসংখ্যা কেবলই কমছিল, অতি সম্প্রতি (প্রধানতঃ গত যুদ্ধের সময় বা তার পর) কিছু বেড়েছে। এইরকম জনসংখ্যা হ্রাসের কারণ অবশ্যই নানাবিধ। যেমন, যতদিন নদীপথে মাল চলাচল হত ততদিন কাটোয়ার গুরুত্ব খুব বেশি ছিল— রেলপথ খোলার পর হতে সে গুরুত্ব কমে যায়। বীরনগরের ম্যালেরিয়া বিখ্যাত। কিন্তু মোটের উপর দেখা যায় এই সব শহর— আর এর মধ্যে অনেকগুলি প্রধান প্রধান জেলা শহরও আছে— ক্রমশঃ ক্ষয় পাওয়ার কারণ হল আর্থিক

অধোগতি। তাঁতশিল্পের অবনতি যে কৃষ্ণনগর শান্তিপুরের অবনতির প্রধানতম কারণ একথা সুবিদিত। তেমনি কাঁসার কাজের অবনতি হওয়ায় রামজীবনপুরের অবনতি হয়েছে। আরামবাগে ম্যালেরিয়া বৃদ্ধি এবং নদীর ক্রমাবনতির সঙ্গে শিল্পের অবনতিও যে তার অধোগতির অন্যতম কারণ, তা অস্বীকার করা যায় না। সেইজন্য সেন্‌সাস রিপোর্টে ঠিকই মন্তব্য করা হয়েছে these police stations of low density and residential towns are a truer index of the fortunes of the people of West Bengal.

আর এক দিক্ দিয়ে আলোচনা করলেও আমরা এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে বাধ্য হই। সেটা হল লোক-চলাচলের গতি প্রকৃতি। লোকে একজায়গা থেকে অন্যজায়গায় গিয়ে থাকে নানা কারণে। হয়তো দুদিনের জন্য বেড়াতে যায়, হয়তো দু'মাস আত্মীয়ের বাড়ী গিয়ে থাকে, হয়তো বা জীবিকার খোঁজে স্থায়ীভাবে গিয়ে অন্যত্র বসবাস করে। যদি দীর্ঘদিন ধরে লোক চলাচলের হিসেব নেওয়া যায় তাহলে সাময়িক কারণগুলোর উর্ধ্বে যে একটা স্থায়ী এবং গভীর লোকচলাচল হয় তার বেশ সুস্পষ্ট চেহারা ধরা পড়ে। সেই সুদূর ১৮৭২ সালে যখন বাংলার অর্থনৈতিক সংকট কিছুই এরকম দেখা যায়নি, সে সময়ও হাণ্টারের বিবরণী হতে দেখা যায় বাঁকুড়া হতে লোকে আসাম যেতে আরম্ভ করেছিল। কারণ আর কিছুই নয়, কারণ হল বাঁকুড়ার জমির অনুর্বরতা এবং সে কারণে জীবিকার সংকট। এবিষয়ে সেন্‌সাস রিপোর্টে একটি আশ্চর্য হিসাব আছে—

গ্রামাঞ্চলের প্রতি বর্গমাইলে ঘনতা এবং জনসংখ্যার প্রতি ১০০ লোকের শতকরা কত লোক কৃষিনির্ভর তার অনুপাত

	১৯৫১		১৯২১		১৯১১		১৯০১	
	ঘনতা	অনুপাত	ঘনতা	অনুপাত	ঘনতা	অনুপাত	ঘনতা	অনুপাত
পশ্চিম বাংলা	৬১০	৫৭২	৪৫৬	৬৮৩	৪৭৪	৬৭১	৪৫২	৬০৭
বর্ধমান বিভাগ	৬৮১	৬৭৪	৫২৯	৭১৮	৫৬৩	৭১৩	৫৫২	৬৩৪
বর্ধমান	৭০০	৬২৬	৫০২	৬৮০	৫৪০	৬৭১	৫৪১	৫৮৫
বীরভূম	৫৭৭	৮১৪	৪৭৯	৭৬৪	৫৩৯	৭৬২	৫২০	৬৮১
বাঁকুড়া	৪৬৭	৮১৮	৩৬৬	৭৭০	৪১২	৭৩৮	৪০৫	৬০২
মেদিনীপুর	৫৯৭	৮১৮	৪৯৪	৮৪০	[illegible]	[illegible]	৫১৭	৭৬৭
হুগলী	১০৩০	৫৬৮	৭৬৭	৬১৩	৭৯৯	৬৪১	৭৭৯	৫২৮
হাওড়া	২০০৪	৩১৪	১৪৩৩	৪৬৬	১৩৬৫	৪৯১	১২৪১	৪০৬
প্রেসিডেন্সী বিভাগ	৫৫০	৪৯০	৩৯৪	৬৫০	৩৯৯	৬২৯	৩৬৮	৫৭৭
২৪ পরগণা	৫৯১	৫৩৪	৩৮৮	৬৭৪	৩৭০	৬৯০	৩৩৩	৬৩৮
নদীয়া	৬৩৩	৫৩৪	৪২৭	৬৭২	৪৭১	৬৬০	৪৬৯	৫৫০
মুর্শিদাবাদ	৭৭৩	৬৯২	৫৫৬	৮২৪	৬১৭	৭০৭	৬০৯	৫৭০
মালদহ	৬৫০	৭১২	৪৮২	৭৬৫	৪৯০	৬৫৮	৪২২	৬৮১
পঃ দিনাজপুর	৪৯২	৮৫২	৩৫৪	৯১২	৩৬৮	৯১১	৩২৯	৮৭১
জলপাইগুড়ি	৩৫৯	৪৮৭	২৮৭	৭১৪	৭৭৫	২২০	২২৬	৭৪৭
দার্জিলিঙং	২৯৬	৩২১	২১৪	৪২৩	২০৩	৪৩৬	১৯২	৪১৮
কুচবিহার	৪৭১	৮৩৫	৪৩৬	৮৮৬	৪৩৮	৮৭৩	৪১৯	৮৬৪

এই হিসাবের তাৎপর্য কি? দেখা যাচ্ছে, যেমন বর্ধমান জেলায় প্রথম দিকে ঘনতাও বাড়ছে অনুপাতও বাড়ছে। যেমন ১৯০১ হতে ১৯২১ সাল পর্যন্ত। অর্থাৎ গ্রামাঞ্চলে জনসংখ্যার যে চাপ বাড়ছে তারা কৃষিতেই আশ্রয় খুঁজে পাচ্ছে, তাই কৃষিনির্ভরতার অনুপাতও বাড়ছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, যেই একটা সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে তারপর ঘনতা বাড়ছে বটে, কিন্তু কৃষিনির্ভরতার অনুপাত কমছে। অর্থাৎ বর্ধিত জনতা আর কৃষিতে আশ্রয় খুঁজে পাচ্ছে না। যেমন বর্ধমানে ১৯২১ সালে ঘনতা ছিল

৫০২ আর অনুপাত ছিল ৬৮০। ১৯২১ সালে দেখা গেল, ঘনতা হয়েছে ৭০০, অনুপাত কমে হয়েছে ৬২৬। মনে রাখতে হবে এ কেবল গ্রামাঞ্চলেরই ঘনতা। তেমনি, মেদিনীপুরে, নদীয়ায়, মুর্শিদাবাদে মালদহে, পশ্চিম দিনাজপুরে, জলপাইগুড়িতে এবং কুচবিহারে ১৯২১ সালের পর থেকেই অনুপাত কমছে। কতকগুলি জেলায় তো ১৯১১ সাল হতেই অনুপাত কমতে শুরু হয়েছে— যথা হুগলী, হাওড়া, চব্বিশ-পরগনা এবং দার্জিলিং। কেবল বীরভূম ও বাঁকুড়ায় এখনও কমে নি। বস্তুতঃ হুগলী হাওড়া এবং চব্বিশপরগনায় (সে হিসেবে বর্ধমানেও,কেননা ১৯১১ সাল ও ১৯২১ সালের অনুপাত খুব তফাৎ নয়) ১৯১১ সালেই জীবিকা হিসেবে কৃষিতে সঙ্কট দেখা দিয়েছে। অন্যান্য জেলাগুলিতে এই সংকট অবিসম্বাদিত ভাবে দেখা দিয়েছে ১৯২১ সালে। বীরভূম ও বাঁকুড়ায় এখনও অনুপাত বাড়ছে তার কারণ সেখানে জমির অনুর্বরতার জন্য মোট চাপ এমনিতেই কম আছে। যাইহোক, মোটের উপর বলা যায় যে ১৯২১ সাল হতেই বাংলায় এই সংকট দেখা দিয়েছে এবং তার ফলে লোকে জীবিকা পাক আর নাই পাক, গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসতে বাধ্য হচ্ছে। সেন্সাস্ রিপোর্টের ভাষায় The stage has already been reached when agriculture cannot entertain larger populations but must drive away some of the surplus. But the population driven away to towns by agricultural overcrowding leads a pillar to post existence and aggravates submarginal living.

এর ফলে লোক যাতায়াতেরও একটা সুস্পষ্ট রূপ খুঁজে পাওয়া যায়। তা হতে দুটি জিনিস নজরে পড়ে। প্রথম, পূর্বের তুলনায় লোকচলাচল কমেছে। অর্থাৎ অন্যত্র গেলেই যখন জীবিকা মেলে না তখন লোকে

যাবে কেন? দ্বিতীয়, এই রাষ্ট্রের মধ্যে যে চলাচল এখনও আছে তার গতি প্রধানতঃ হুগলী হাওড়া চব্বিশপরগণা এবং কলিকাতার অভিমুখে। বিশেষ করে হাওড়া চব্বিশপরগণা এবং কলিকাতার দিকে। এর কারণ খুঁজে পেতে দেরী হয় না। এইখানে জীবিকার তবু কিছুটা সম্ভাবনা আছে, তাই এই যাত্রা। কিন্তু তা-ও ক্রমশঃ কমে আসছে। হুগলী ও হাওড়ায় তা বেশ কমেছে। এ হতে বোঝা যায় এখানেও জীবিকার সম্ভাবনা সংকুচিত হয়ে আসছে!

পশ্চিমবাংলার অসমান জনবসতির কারণ এই পটভূমিকায় সহজেই বোঝা যায়।

পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক বিন্যাস

এ হতেই পশ্চিমবাংলার অর্থনৈতিক বিন্যাসের কথা স্বাভাবিকভাবে এসে পড়ে। বিভিন্ন জীবিকায় কত লোক আছে প্রথমেই তার একটা তুলনামূলক হিসেব নেওয়া যেতে পারে। সেন্‌সাসে জীবিকাগুলিকে প্রথম বড় দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে—কৃষি ও কৃষিব্যতিরিক্ত জীবিকা। কৃষির মধ্যে চারটি ভাগ—(১) যারা প্রধানতঃ নিজের জমি চাষ করে (২) যারা প্রধানতঃ অপরের জমি চাষ করে (৩) মজুর ও দিন শ্রমিক এবং (৪) মালিক এবং উপস্বত্বভোগী। তেমনি কৃষিব্যতিরিক্ত জীবিকার মধ্যেও চারটি ভাগ—(৫) কৃষি-ব্যতীত উৎপাদন অর্থাৎ শিল্প (৬) বাণিজ্য (৭) যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা (৮) চাকরী ও বিবিধ।

বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন জীবিকার গুরুত্ব বিভিন্ন রকম; তা অপর পৃষ্ঠার হিসেব হতে বোঝা যাবে।

বিভিন্ন প্রদেশের তুলনা হতে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত করা যায়—

(১) আপাততঃ মনে হয় কৃষি-নির্ভরতার পরিমাণ পশ্চিমবাংলায় সবচেয়ে কম, বোম্বায়ের চেয়েও কম। কারণ কৃষি নির্ভরতার অনুপাত পশ্চিমবাংলায় ৫৭·২১%, বোম্বায়ে ৬১·৪৬%

(২) আপাততঃ আরও মনে হয়, শিল্প নির্ভরতার অনুপাত পশ্চিমবাংলাতেই সবচেয়ে বেশি ১৫·৩৬%।

এ হতে মনে হতে পারে, পশ্চিমবাংলা সম্ভবতঃ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে খুব অগ্রসর। কিন্তু গভীরতর বিচারে দেখা যাবে তা মোটেই নয়, বরং ঠিক উল্টো।

জীবিকার প্যাটার্ন

মোট জনসংখ্যার শতকরা কত অংশ কোন্ জীবিকায় নিযুক্ত

	সমস্ত রকম কৃষি-জীবিকা	১	২	৩	৪	সমস্ত রকম কৃষি-ব্যতিরিক্ত জীবিকা	৫	৬	৭	৮
পশ্চিমবাংলা	৫৭·২১	৩২·৩৪	১২·০১	১২·২৬	০·৬০	৪২·৭৯	১৫·৩৬	৯·৩২	৩·০৫	১৫·০৬
আসাম	৭৩·৩৪	৫৭·৮৯	১২·৮১	১·৭৪	০·৯০	২৬·৬৬	১৪·৬৪	৩·৯০	১·২৮	৬·৮০
বিহার	৮৬·০৪	৫৫·২৯	৮·২৭	২১·৮৭	০·৬১	১৩·৯৬	৩·৯৪	৩·৪০	০·৭২	৫·৯০
বোম্বাই	৬১·৪৬	৪০·৭৪	৯·৬৯	৯·০৫	১·৯৮	৩৮·৫৪	১৩·৭৬	৭·৬১	২·২৩	১৪·৯৪
মধ্যপ্রদেশ	৭৬·০০	৪৯·৫০	৪·৪৭	২০·৪১	১·৬২	২৪·০০	১০·৬৯	৪·৩৯	১·৪৭	৭·৫৪
মাদ্রাজ	৬৪·৯৩	৩৪·৯৫	৯·৫৮	১৮·২৩	২·১৭	৩৫·০৭	১২·৩৫	৬·৬৯	১·৬৮	১৪·৩৫
উড়িষ্যা	৭৯·২৮	৫৯·৫৩	৫·৯৪	১২·৩১	১·৫০	২০·৭২	৬·৩৩	২·৯১	০·৫০	১০·৯৫
উত্তর প্রদেশ	৭৪·১৯	৬২·২৭	৫·১৫	৫·৭১	১·০৬	২৫·৮১	৮·৩৮	৫·০৩	১·৩৬	১১·০৪

কৃষি-সংক্রান্ত জীবিকা

পূর্বে যে পরিসংখ্যান দেওয়া হয়েছে তা হতে একটা জিনিস বিশেষভাবে চোখে পড়ে। মোট কৃষি-নির্ভরতা পশ্চিমবাংলায় কম বটে, কিন্তু তার মধ্যে নিজের জমি চাষ করে এমন লোকের অনুপাতও পশ্চিমবাংলায় কম। অন্য প্রদেশের তুলনায় অপরের জমি চাষ করে, বা দিনমজুরী করে এমন লোকের সংখ্যাই বেশি: ১নং জীবিকায় পশ্চিমবাংলায় মাত্র ৩২·৩৪%, অথচ উত্তরপ্রদেশে তা ৬২·২৭%। অন্যান্য প্রদেশেও বেশি। পক্ষান্তরে দিনমজুরের অনুপাত পশ্চিমবাংলায় ১২·২৬% অথচ উত্তরপ্রদেশে তা মোটে ৫·৭১%, আসামে ১·৭৪%, বোম্বায়ে ৯·০৫%। এ হতে বোঝা যায়, চাষ করলে কি হবে, চাষীর অবস্থা এখানে অনেক হীন; জমির মালিক চাষী বেশি নেই।

দ্বিতীয়তঃ দেখা যায়, এখানে উপার্জনকারীর অনুপাত ক্রমশঃই কমছে, পোষ্যবর্গের অনুপাত ক্রমেই বাড়ছে। কৃষির জীবিকাগুলিতে উপার্জনকারীর অনুপাত ছিল ১৯০১ সালে ১৯·৮%, ১৯১১ সালে ২৩·৪%, ১৯২১ সালে ২৩·৪%, ১৯৩১ সালে ১৮·৫%, ১৯৫১ সালে ১৪·৯%। দেখা যাচ্ছে ১৯২১ সালের পর হতেই অনুপাত কমছে, একজনের উপর ক্রমশঃই বেশি পরিমাণ লোকে নির্ভর করতে আরম্ভ করেছে। এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা যেতে পারে যে পূর্বে গ্রামাঞ্চলের ঘনতা এবং কৃষিনির্ভর লোকের অনুপাতের যে হিসাব দেওয়া হয়েছে তা হতে দেখা যায় ১৯২১ সাল থেকেই পশ্চিমবাংলার গ্রামাঞ্চলে দ্রুত অবক্ষয় দেখা দিয়েছে।

তৃতীয়তঃ দেখা যায়, এখানে ভূম্যধিকারী ও উপস্বত্বভোগীর অনুপাত কম— মাত্র ০·৬। আসামে তা ৩·৯, বোম্বায়ে তা ১·৯৮%, মাদ্রাজে তা ২·১৭%। এ হতে একটা জিনিস বোঝা যায়; অবশ্য তার আরও

প্রত্যক্ষ প্রমাণও আছে, কিন্তু এ হতেও বোঝা যায় যে এখানে ভূমির মালিকানা অন্য প্রদেশের তুলনায় বেশি পরিমাণে পুঞ্জীভূত। অল্প কয়েক-জনের হতেই তা এসে জড় হয়েছে।

এর সঙ্গে বহু অর্থনৈতিক প্রমাণ আছে যা হতে কৃষির নিদারুণ সংকটের কথা খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে তার আলোচনা অবান্তর বলে সে আলোচনা করলাম না। সংক্ষেপে বলা যায়, ক্রমেই চাষী জমির মালিকানা হারিয়ে ভাগচাষী বা দিনমজুরে পরিণত হচ্ছে, জমির আয়তন ক্রমেই ছোট হচ্ছে— এসব লক্ষণ স্পষ্টতঃই কৃষির অবক্ষয়ের লক্ষণ। তা ছাড়া গ্রামাঞ্চলে ঋণভার সম্বন্ধে সম্প্রতি যে তদন্ত হয়েছিল তা হতে জানা যায় যে অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন চাষীদেরও কেবল খাদ্যসংগ্রহের জন্যই প্রধানতঃ ঋণ করতে হয়েছে এবং অনেক সময় জমি একেবারে বেচে দিতে হয়েছে। তা ছাড়া গ্রামাঞ্চল থেকে শহর অঞ্চলে কিভাবে এবং কি কারণে লোক চলে আসছে সেকথাও পূর্বে উল্লেখ করেছি— তাও গ্রামাঞ্চলের অবক্ষয়ের এবং কৃষি সম্পর্কিত জীবিকায় সংকটের প্রকৃষ্ট চিহ্ন।

কৃষি-ব্যতিরিক্ত জীবিকা

কৃষি-ব্যতিরিক্ত জীবিকাতেও চিত্র উজ্জ্বল নয়। যদিচকৃষি-ব্যতিরিক্ত জীবিকার অগ্রগতি পশ্চিমবাংলাতেই মনে হয় খুব বেশি, কিন্তু ভাল করে বিশ্লেষণ করে দেখলে দেখা যাবে, এখানেও অবস্থা অত্যন্ত সংকটপূর্ণ। তার বহু প্রমাণ আছে। দু চারটি উল্লেখ করছি :—

(১) সেন্সাস রিপোর্টে দেখা যায়, বহুকাল ধরে অনেকগুলি শিল্পে অবনতি ঘটছে। যেমন, পশ্চিমবাংলায় Plantation Industries গুলিতে ১৯০১ সালে ৩ লক্ষ লোক নিযুক্ত ছিল, ১৯৫১ সালে ২·৫৬ লক্ষ লোক নিযুক্ত ছিল, মাছধরায় নিযুক্ত লোকের সংখ্যা ১৯০১ সালে ৮০২৫৯,

অথচ ১৯৫১ সালে মাত্র ৪৮,৩৭২। কতকগুলি খাদ্যসংক্রান্ত শিল্পের অনুরূপ সংখ্যা ৩৫৫৬৭ এর জায়গায় এখন ১৫৫০৬। Processing of grains and pulsesএ ১৯০১ সালে ছিল ২০২৭৮০, ১৯৫১ সালে তা মাত্র ১১১৪১৩। কার্পাস শিল্পে ১৯০১ সালে নিযুক্ত উপার্জনকারীর সংখ্যা ছিল ৮৮৪৮৪, তা ১৯৫১ সালে ৭৬৬০৫। এইরকম ভূরি ভূরি উদাহরণ দেওয়া চলতে পারে।

(২) কুটীরশিল্পের ক্ষেত্রেই এই অবনতি খুব বেশি প্রকট। কিন্তু তা বলে মনে করার হেতু নেই যে বৃহৎ শিল্পের খুব একটা অগ্রগতি হয়েছে। বৃহৎশিল্পে দৈনিক নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যা হতেই তা বোঝা যায়। ১৯৩৯ তার সংখ্যা ছিল ৫৩২৮৩০, ক্রমে ১৯৪৫ সালে তা হয় ৭০২৮২১। তারপর হতে ক্রমাগত কমতে কমতে ১৯৫১ সালে তা হয়ে দাঁড়িয়েছে ৬৪৮৩০৩। অথচ অন্যান্য প্রদেশ এদিকে খুব দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। নীচের পরিসংখ্যান থেকেই তা বোঝা যাবে—

বৃহৎ শিল্পে দৈনিক নিয়োজিত লোকের সংখ্যা

	১৯৩৯	১৯৪৫	১৯৪৯	১৯৫১
পশ্চিম বাংলা	৫৩২৮৩০	৭০২৮২১	৬৬৫০০৮	৬৪৮৩০৩
বোম্বাই	৪৬৬০৪০	৭৩৫৭৭৪	৭৮৯৪৬৩	৮০৮০৯৩
বিহার	৯৫৯৮৮	১৬৮৪০৮	১৫৫৩৩৪	১৭৫৫৫৮
আসাম	৫২০০৩	৫৮০৭০	৬১১৩২	৬৮৬১৪
মধ্যপ্রদেশ	৬৪৪৯৪	১১০২৬৩	৯৬২৭৩	১১৫৯৭৮
মাদ্রাজ	১৯৭২৬৬	২৭৯১৭৬	৩২৩৯৫০	৪২২২৯১
উত্তরপ্রদেশ	১৫৯৭৩৮	২৭৬৪৬৮	২৩৩৮৩৭	২২৪৫৫১

এর উপর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন

(৩) যে পরিমাণ লোক কৃষিব্যতিরিক্ত জীবিকায় জীবনধারণ করে তার মধ্যে উপার্জনকারীর অনুপাত ক্রমেই কমছে। অর্থাৎ একজন উপার্জনকারীকে আগে যতগুলি পোষ্য পুষতে হত এখন তার চেয়ে বেশি পুসতে হচ্ছে। সেন্‌সাস রিপোর্টে (পৃঃ ৫১৪) দেখা যায় ১৯০১ সালে প্রতি ১০০০০ লোকে কৃষিব্যতিরিক্ত জীবিকায় উপার্জনকারীর সংখ্যা ছিল ৭৭০, এখন তা কমতে কমতে ১৯৫১ সালে হয়ে দাড়িয়েছে ৬৭১। এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে, বিহারী শ্রমিকেরা প্রায় তাদের পোষ্য আনে না। সুতরাং শুধু যদি বাঙালী শ্রমিকদের কথা ধরা যায় তাহলে সহজেই বোঝা যায় পোষ্যবর্গের চাপ অনেক বেশি বেড়েছে।

(৪) সেন্‌সাসে অপ্রধান জীবিকা বলে একটা কথা আছে। যে লোক কারখানায় কাজ করে সেইটেই তার প্রধান জীবিকা হলেও সে হয়তো দেশের জমি থেকেও কিছু পায়। সে ক্ষেত্রে শিল্প তার প্রধান জীবিকা, কৃষি তার অপ্রধান জীবিকা। দেখা যাচ্ছে, বর্ধমান বিভাগে সমস্ত কৃষিব্যতিরিক্ত জীবিকায় উপার্জনকারীদের মধ্যে ১৯২১ সালে হাজারকরা মাত্র ৬ জন কৃষির উপর অপ্রধান জীবিকা হিসেবে অংশত নির্ভর করত। ১৯৫১ সালে তা বেড়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে হাজার করা ৮৩ জন! অর্থাৎ শিল্প যাদের প্রধান জীবিকা তাদেরও আজ আবার পিছন ফিরে কৃষির উপর এতখানি নির্ভরশীল হয়ে পড়তে হয়েছে। এই হতেই আমাদের পশ্চাদ্‌গতি বোঝা যায়।

(৫) তাছাড়া আর একটা কথা মনে রাখতে হবে। শিল্পের ক্ষেত্রে শ্রমিক বেশির ভাগই বাঙালী নয়— সাময়িক আগত অবাঙালীই বেশি। কাজেই শুধু বাংলাদেশবাসী ধরলে দেখা যাবে এক্ষেত্রেও জীবিকার সংকট ভয়াবহ। সম্প্রতি পশ্চিমবাংলা সরকার বেকারদের সম্বন্ধে যে অনুসন্ধান করিয়েছিলেন তা হতে দেখা গিয়েছে যে বাঙালীরা মোট জনসংখ্যার যত

অংশ, মোট জীবিকার ক্ষেত্রে তাদের অংশ জনসংখ্যার অনুপাতের চেয়ে শতকরা ২০ ভাগ কম, হিন্দীভাষীদের জনসংখ্যায় অনুপাতের তুলনায় জীবিকার অনুপাত ৩৫% বেশি, উড়িয়াবাসীদের ৭২% বেশি। সেইজন্য বেকার সমস্যা বাঙালীদের মধ্যেই সবচেয়ে বেশি।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, কি কৃষিসংক্রান্ত জীবিকা, কি কৃষিব্যতিরিক্ত জীবিকা— সব দিকেই সংকট খুব গভীর।

বয়স ও স্ত্রীপুরুষের অনুপাত

কোনও দেশের লোকবিন্যাসের আলোচনায় জনসাধারণের বয়স ও স্ত্রী পুরুষের অনুপাতের গুরুত্ব আছে। প্রথমে বয়সের হিসাব দেখা যাক্। নীচের হিসাব হতে পশ্চিমবাংলার জনসংখ্যার বয়সের বিন্যাস বোঝা যাবে—

কোন্ বয়সের লোক মোট জনসংখ্যার শতকরা কত অংশ—পশ্চিমবাংলা

	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১	১৯৪১	১৯৫১
০-১৫ বছর	৩৭˙৭	৩৭˙৬	৩৬˙৬	৩৭ ২	৩৬˙৪	৩৭˙৫
১৫-৫৫ বছর	৫৩˙১	৫৩˙৩	৫৪ ২	৫৫˙০	৫৪ ৬	৫৭˙৪
৫৫ বছর ও তদূর্ধ্ব	১০˙২	৯˙১	৯˙২	৯˙৮	৯˙০	৫˙১

দেখা যাচ্ছে ০-১৫ বছর পর্যন্ত বয়সের অনুপাত বিশেষ কোনও বদল হয় নি। কিন্তু ১৫-৫৫ বছরে আগের দিকে বিশেষ বদল না হলেও ১৯৫১ সালে তা বেড়েছে— তেমনি ৫৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের লোকের অনুপাত অনেক কমে গিয়েছে। এর কারণ কি? আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, শরণার্থী আগমনের জন্যই কি এরকম বদল ঘটল? কিন্তু তা নয়। কারণ, শরণার্থীদের মধ্যে সরকার যে অনুসন্ধান কিছুকাল আগে করেছিলেন তা হতে জানা যায়, তাদের মধ্যে ০-১৫ বছর শতকরা ৩৬˙৫%, ১৫-৫৫ বছর ৫৭˙৫ ভাগ এবং ৫৫ বছর ও তদূর্ধ্ব ৫˙৯%। কাজেই তাদের চেহারা মোটামুটি মোট জনসংখ্যারই মত, তাদের জন্য এতখানি বদল হয়েছে বলে মনে হয় না। তবে কি পঞ্চাশের মন্বন্তরে ছেলেরা এবং বুড়োরা মরে যাওয়ার ফলে এমন হয়েছে? সেন্সাস রিপোর্টের ৩৩১ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে পশ্চিমবাংলায় দুর্ভিক্ষে মৃত্যু ৪˙৮৭ লাখ লোকের— অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার মাত্র ২%। যদি ধরা

যায় সব মৃত্যুই ঘটেছে সর্বোচ্চ বয়সে তাহলেও অনুপাত কমে ৯% থেকে বড় জোর কমে ৭% হতে পারত, তার চেয়ে কমত না। এক্ষেত্রে বহু অন্য প্রদেশাগতদের অবস্থানই এই বদলের প্রধান কারণ বলে অনুমিত হয়, কেননা কেবল কর্মক্ষম বয়সের লোকই কাজ করতে আসে, বয়স হলে দেশে ফিরে যায়।

পশ্চিমবাংলায় এখন প্রতি ১০০০ পুরুষে মাত্র ৮৫৯ জন স্ত্রীলোক আছে। অন্য প্রদেশাগত লোকের জন্যই এরকম ঘটেছে, কারণ যারা কিছুকালের জন্য কাজ করতে আসে তারা ক্বচিৎ সপরিবারে আসে। সেইজন্য বহিরাগতদের বাদ দিয়ে যদি শুধু এই প্রদেশে যারা জন্মেছে তাদের হিসাব নেওয়া যায় তাহলে দেখা যাবে তাদের মধ্যে প্রতি ১০০০ পুরুষে ৯২০ জন স্ত্রীলোক আছে। (সেন্সাস রিপোর্ট ৩০৮ পৃষ্ঠা) আর শুধু বহিরাগতদের মধ্যে দেখা যায় প্রতি ১০০০ পুরুষে গ্রামাঞ্চলেও মাত্র ৪২৬ জন স্ত্রীলোক, শহরাঞ্চলে আরও কম, ৩৩৫ জন স্ত্রীলোক। পশ্চিম বাংলায় এখন ১.৩৩ কোটি পুরুষ এবং ১.১৪ কোটি স্ত্রীলোক।

জন্ম ও মৃত্যুর হার এবং লোকবৃদ্ধি

আমাদের লোকসংখ্যা খুব বৃদ্ধি পাচ্ছে এ অভিযোগ অহরহ শোনা যায়। কথাটা বিচার করে দেখা যেতে পারে। পশ্চিমবাংলায় যত জন্ম মৃত্যুর রেজিস্টারী হয় তাহতে দেখা যায় এখানে জন্মের হার প্রতি হাজার লোকে ২০.৫, আর মৃত্যুর হার ১৮.৯। তাহলে বাঁচার হার হাজার করা মাত্র ১.৬। অন্য দেশের তুলনায় তা মোটেই বেশি নয়। কিন্তু সেন্সাস রিপোর্টেই স্বীকার করা হয়েছে যে আমাদের জন্মরেজিস্টারী খুব নিখুঁত নয়, সব জন্ম রেজিস্টারী হয় না। সেন্সাস রিপোর্টে সেইজন্য অনুমান করা হয়েছে যে ১৯৪১-৫০ সালের মধ্যে হাজারকরা জন্মের হার

৪১ বা ৪২ এর কাছাকাছি হবে। তা হলে বাঁচার হার অনেক বেড়ে যায়, হাজারকরা ২২ বা ২৩ হয়ে দাঁড়ায়। সংখ্যাতাত্ত্বিক ও সমাজ শাস্ত্রীদের মতে $\frac{\text{জন্মহার}}{\text{মৃত্যুহার}} \times ১০০$ হতে যে ফল বার হয় তাকে জনসাধারণের biological health এর সূচী বলা যায়। এই সূচী বাড়লে বলা যায় জনসাধারণের biological health ভাল হচ্ছে, অর্থাৎ জন সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। এই সূচী সম্প্রতি বাড়ছে। ১৯০১-১০ সালে তা ছিল ১০১.৩, ১৯১১-২০ সালে ৯২.১, ১৯২১-৩০ সালে ১১১.২, ১৯৩১-৪০ সালে ১৩০.৭, ১৯৪১-৫০ সালে ১১৩.২। এ হতে অনুমান হয়, জনসংখ্যা বাড়বে।

বস্তুতঃ তা বাড়ছেও। পূর্বে উল্লেখ করেছি, আগে আমাদের জন সংখ্যার একটা চক্রবৎ আবর্তন ছিল— একবার কমত একবার বাড়ত। এই কমার কারণ ছিল নানাবিধ— বেশির ভাগই অবশ্য দুর্ভিক্ষ বা মহামারী। কিন্তু ১৯২১ সাল থেকে এই চক্রবৎ আবর্তন বন্ধ হয়ে গিয়ে লোকসংখ্যা কেবলই বাড়ছে। তার উপর জন্মমৃত্যুহারের উল্লিখিত সূচী থেকে মনে হয় জনসংখ্যা বাড়বেই। সহজবুদ্ধিতেও একথা বোঝা যায়। আমাদের দেশে জনস্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য প্রচুর চেষ্টা হচ্ছে তার ফলও ফলতে শুরু করছে। গত দশ বছরের মৃত্যুহার আলোচনা করলে দেখা যায় মৃত্যুহার ধীরে ধীরে কমছে। কিন্তু সেইসঙ্গে জন্মহার কমছে না। বাস্তবিক তা কোনও দেশেই কমে না। লোকসংখ্যাতত্ত্বের একটি সাধারণ সত্য হল এই যে জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হলে ক্রমে ক্রমে জন্মহার কমে। কিন্তু সে কমে অনেক দেরীতে, সদ্য সদ্য কমে না। সেইজন্য মাঝে একটা সময় আসে যখন মৃত্যুহার কমে অথচ জন্মহার কমে না, ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এ নিয়ে অবশ্য

অনেক তর্ক আছে, কিন্তু সে সব তর্ক ছেড়ে দিয়েও বলা যায় আমরা মোটামুটি এইরকম অবস্থাতেই পৌছেছি এবং এখন কিছুকাল জনসংখ্যা বাড়বে এই কথাই ধরে নেওয়া উচিত।

কিন্তু এত সত্ত্বেও একথা কি বলা যায় যে আমাদের জনসংখ্যা খুবই বেশি বাড়ছে? সব দিক্ বিবেচনা করলে তা বলা যায় না। পশ্চিম-বাংলায় গত আশি বছরে জনসাধারণের নীট হ্রাসবৃদ্ধি এইরকম— ১৮৭২ সাল হতে ১৯২১ সাল পর্যন্ত নীট বৃদ্ধি ২০·৫%, ১৯২১-৫১ সালের মধ্যে নীট বৃদ্ধি ৫১·৩%। যদি কেবল ১৯০১ সাল হতে ১৯৫১ সাল ধরা যায় তাহলে নীট বৃদ্ধি ৫৬·৭%। অর্থাৎ গত পঞ্চাশ বছরে গড়ে প্রতি বছর মাত্র ১·১%। কেবল গত ত্রিশ বছরের হিসাবে গড়পড়তা বাৎসরিক বৃদ্ধি ১·৭%। এ হার খুব বেশি নয়। ১৯৫১ সালে বহু শরণার্থীও আছে। তাদের বাদ দিলে দেখা যায় ১৯০১-৫১ সালের মোট বৃদ্ধি ৪৩·৪%, অর্থাৎ গড়পড়তা বাৎসরিক ১% এরও কম। শরণার্থীদের বাদ দিয়ে ১৯৩১-৫১ সালের নীট বৃদ্ধি ২৮·৬% অর্থাৎ বাৎসরিক গড়পড়তা বৃদ্ধি ০·৯৫% এর কাছাকাছি। কোনমতেই এ হার বেশি বলা যায় না। সেন্সাস রিপোর্টে উদ্ধৃত তথ্য থেকে জানা যায় ১৭৫০ হতে ১৯০০ এই দেড়শ বছরে জগতের লোকসংখ্যা বেড়েছে ১২১% অর্থাৎ গড়পড়তা বাৎসরিক প্রায় ০·৮%। বিভিন্ন দেশের অনুরূপ গড়পড়তা বাৎসরিক বৃদ্ধির হিসেব:— য়ুরোপ ১·২%, উত্তর আমেরিকা ৪০·৯। গ্রেট ব্রিটেনের হিসেব নিলে দেখা যায় ১৮০১ সাল হতে১৯৪১ সাল পর্যন্ত প্রত্যেক কুড়ি বছরে শতকরা মোট বৃদ্ধি পেয়েছে এই রকম— ১৮০১-২১ সালে ৩৪%, ১৮২১-৪১ সালে ৩২%, ১৮৪১ ৬১ সালে ২৫%, ১৮৬১-৮১ সালে ২৮%, ১৮৮১-১৯০১ সালে ২৫%, ১৯০১-২১ সালে ১৬%, ১৯২১-৪১ সালে ৯%। অনেক সময়ই তা গড়পড়তা বাৎসরিক ১% এর

বেশি, যদিচ ইদানীং তা কমে গিয়েছে। তা ছাড়া ফ্রান্স বাদ দিলে পশ্চিম য়ুরোপের অনেক দেশের জনবৃদ্ধির হারই এর চেয়ে বেশি। সুতরাং আমাদের দেশে বৃদ্ধিহার যে খুব বেশি এমন কথা মোটেই বলা যায় না। আসল কথা হচ্ছে আমাদের অর্থিক দুর্দশা এতই বেশি যে সামান্য বৃদ্ধিতেই আমাদের ত্রাহি ত্রাহি করতে হয় সেইজন্য ভোগ্‌ট (vogt) এর মতো নব-মালথুসীয়দের কথায় ভয় না পেয়ে আমাদের আসল নজর দিতে হবে আর্থিকসমস্যা সমাধানের। তার সঙ্গে পরিবার নিয়ন্ত্রণের যে দরকার নেই এমন কথা বলছি না— কিন্তু সেইটেই একমাত্র কথা নয়।

লোক-চলাচল ও বহিরাগত

পূর্বে আলোচনা-প্রসঙ্গে সামান্য উল্লেখ করেছি, পশ্চিমবাংলার মধ্যে লোকচলাচলের মোটামুটি চেহারা কি। তাতে দেখা গিয়েছে, সব চেয়ে বেশি লোক আসে শিল্পাঞ্চলে জীবিকার সন্ধানে। এখন লোক-চলাচলের কথাটা আর একটু বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করব, কেননা পশ্চিমবাংলায় বহিরাগতের সংখ্যা খুব বেশি। লোক-চলাচলকে তিনটি বড় ভাগে ভাগ করা যেতে পারে; প্রথমতঃ, এই প্রদেশের মধ্যেই একজায়গা থেকে অন্য জায়গায় লোকের যাওয়া-আসা। এরই উল্লেখ পূর্বে করেছি। সাধারণতঃ জীবিকার চেষ্টায় শিল্পাঞ্চল অভিমুখেই এর গতি। কিন্তু তা ছাড়াও লোকচলাচল আছে। তার মধ্যে প্রথম হল, ভারতবর্ষেরই অন্য প্রদেশ থেকে লোক পশ্চিমবাংলায় আসছে এবং পশ্চিমবাংলার লোক সেই সব প্রদেশে যাচ্ছে। দ্বিতীয়তঃ, ভারতবর্ষ ছাড়া অন্য রাষ্ট্রে অনুরূপ যাওয়া-আসা।

এর মধ্যে প্রথমে এই প্রদেশের ভিতরের লোক যাওয়া-আসার হিসেবটি উদ্ধৃত করছি। মনে রাখতে হবে, এ হিসেব সবই এই প্রদেশের লোকের, বাইরের লোকের নয়।

	জেলার মোট লোকসংখ্যার শতকরা কত অংশ অন্য জেলার		জেলার মোট লোকসংখ্যার শতকরা কত অংশ অন্য জেলায় গিয়েছে		জেলার মোট লোকসংখ্যার শতকরা কত অংশ নীট যাওয়া আসা— আসা (+), যাওয়া (−)	
	১৯৫১	১৯২১	১৯৫১	১৯২১	১৯৫১	১৯২১
বর্ধমান	৭˙০	৬˙৯	৫˙১	৪˙৯	+১˙৯	+২˙০
বীরভূম	৩˙১	৩˙০	১৩˙১	৪˙১	—১০˙০	—১˙১

	জেলার মোট লোকসংখ্যার শতকরা কত অংশ অন্য জেলার		জেলার মোট লোকসংখ্যার শতকরা কত অংশ অন্য জেলায় গিয়েছে		জেলার মোট লোকসংখ্যার শতকরা কত অংশ নীট যাওয়া আসা— আসা (+), যাওয়া (–)	
বাঁকুড়া	৩·৮	১·৭	৭·১	১১·৯	—৩·৩	—১০·২
মেদিনীপুর	৩·৪	০·৯	৬·০	৫·৩	—২·৬	—৪·৪
হুগলী	৮·১	১১·৬	৭·৯	৭·৭	+০·২	+৩·৯
হাওড়া	৭·৬	৫·৩	৯·৫	৫·৩	—১·৯	...
২৪-পরগণা	৫·৫	৬·২	২·৯	৪·৩	+২·৬	+১·৯
কলিকাতা	১২·৩	৩০·৩	৫·৭	৪·৬	+৬·৬	+২৫·৭
নদীয়া	৩·৮	৩·২	৫·৮	৭·০	—২·০	—৩·৮
মুর্শিদাবাদ	২·৭	২·৯	৪·০	৭·২	—১·৩	—৪·৩
মালদহ	১·৬	৩·৯	৩·৩	২·২	—১·৭	+১·৭
পঃ দিনাজপুর	২·০	২·৫	১·৬	১·১	+০·৪	+১·৪
জলপাইগুড়ি	২·৯	৫·২	১·১	১·৭	+১·৮	+৩·৫
দার্জিলিং	১·৫	৩·০	২·৮	১·৮	—১·৩	+১·২
কুচবিহার	০·৫	৬·৩	২·৩	৪·২	—১·৮	+২·১

দেখা যাবে, বাঁকুড়া বা বীরভূমের মত অনুর্বর জেলা থেকে যাওয়ার পরিমাণই বেশি, আর বর্ধমান হুগলী চব্বিশ-পরগণা কলকাতা জলপাইগুড়ি এবং পশ্চিম দিনাজপুর (অর্থাৎ শিল্পাঞ্চল এবং চা-বাগান এলাকায়) যাওয়ার চেয়ে আসার পরিমাণ বেশি।

এরপর ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশের সঙ্গে আমাদের যাওয়া-আসার হিসেব দিচ্ছি—

	(হাজারে) ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশ থেকে আসা	(হাজারে) ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশে যাওয়া	(হাজারে) আসা যাওয়ার নীট হিসাব, আসা (+), যাওয়া (-
পশ্চিমবাংলা	১৮৮১	৩১১	+১৫৭০
বর্ধমান	২৩৫	৩১	+ ২০৪
হুগলী	১০৯	২১	+ ৮৮
হাওড়া	১০৬	৬	+ ১০০
২৪ পরগণা	৩৫০	১৪	+ ৩৩৬
কলিকাতা	৬৭৭	৪৫	+ ৬৩২
জলপাইগুড়ি	১২২	৫	+ ১১৭

দেখা যাচ্ছে, ভারতবর্ষের অন্য অংশ থেকে পশ্চিমবাংলায় এসেছে ১৮·৮১ লক্ষ, গিয়েছে ৩·১১ লক্ষ, অর্থাৎ মোটের উপর ১৫·৭০ লক্ষ নীট এসেছে। তার মধ্যে মাত্র কয়েকটি জেলাতেই নীট এসেছে ১৪·৫৭ লক্ষ। এইটেই হল শিল্পাঞ্চল এবং জীবিকার প্রধানতম ক্ষেত্র।[১১] সেখানেই অন্য প্রদেশাগতের প্রাদুর্ভাব বেশি। পূর্বেই বলেছি এরা স্থায়ী বাসিন্দা নয়, হতেও চায় না— কারণ এদের মধ্যে প্রতি হাজার পুরুষে স্ত্রীলোকের সংখ্যা গ্রামাঞ্চলে ৫৩৭, শহরাঞ্চলে ৪৩৯, মোট ৪৫২ এর মধ্যে বিহার থেকে এসেছে ১১·০৯ লক্ষ, বিহারে গিয়েছে ১·৩৭ লক্ষ; উত্তরপ্রদেশ থেকে এসেছে ২·৯৫ লক্ষ, উত্তরপ্রদেশে গিয়েছে ০·৪৯ লক্ষ; উড়িষ্যা হতে এসেছে ২·০২ লক্ষ, উড়িষ্যায় গিয়েছে ০·৩৪ লক্ষ। এই তিনটি প্রদেশই প্রধান।

এইবার ভারতের বাইরের রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে লোক যাওয়া-আসার

১১ এই প্রসঙ্গে ২৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত 'স্বাভাবিক' ও 'প্রকৃত' জনসংখ্যার হিসেব স্মরণীয়।

কথা বলব। এর মধ্যে একটি খুব বড় অংশ হল পাকিস্থান হতে আগত শরণার্থীরা। ১৯৫১ সালে তাদের হিসাব ছিল এইরকম—পশ্চিম-বাংলায় মোট ২০·৯৯ লক্ষ, তার মধ্যে বর্ধমানে ২৬০০০, বীরভূমে ১২০০০, বাঁকুড়ায় ৯০০০, মেদিনীপুরে ৩৪০০০, হুগলীতে ৫১০০০, হাওড়ায় ৬১০০০, চব্বিশ-পরগণায় ৫ লক্ষ ২৭ হাজার, কলিকাতায় ৪ লক্ষ ৩৩ হাজার, নদীয়ায় ৪ লক্ষ ২৭ হাজার, মুর্শিদাবাদে ৫৯০০০, পশ্চিম দিনাজপুরে ১ লক্ষ ১৫ হাজার, জলপাইগুড়িতে ৯৯০০০, মালদহে ৬০০০০ দার্জিলিঙে ১৬০০০, কুচবিহারে ১ লক্ষ। দেখা যাবে চব্বিশ-পরগণা, কলিকাতা ও নদীয়াতেই উদ্বাস্তদের সবচেয়ে ঘন বসতি। এছাড়া শরণার্থী নয় এমন পাকিস্থানীর সংখ্যা পশ্চিমবাংলায় ৫,১৯,৮৬৭।

নেপাল ও সিকিম থেকেও অনেক লোক আসে। ১৯৫১ সালে পশ্চিমবাংলায় তাদের মোট সংখ্যা ছিল ৯৫,৫৮৬। তার মধ্যে কলিকাতায় ১০,৮৩১, জলপাইগুড়িতে ২৬৮৬৩, দার্জিলিঙে ৪০,৪০৬ এবং কুচবিহারে ৯,০৯৭। এ ছাড়া জগতের অন্যান্য দেশ থেকে যে লোক আসে তার সংখ্যা খুব বেশি নয়— পশ্চিমবাংলায় মোট ২৬,৭০৪। তার মধ্যে বিলেতের লোক হল মাত্র ৬,৮২৫।

সাক্ষরতা, ভাষা ও ধর্ম

এবারকার সেন্সাসে দেখা যায়, পশ্চিমবাংলায় মোট জনসংখ্যার শতকরা ২৪·৫% সাক্ষর। শুধু পুরুষদের মধ্যে সাক্ষর ৩৪·৭%, শুধু স্ত্রীলোকদের ১২·৭%। কেবল গ্রামাঞ্চলের জনসাধারণ নিলে সাক্ষর ১৭·৭%, তাদের মধ্যে শুধু পুরুষ ২৮·১%, শুধু স্ত্রীলোক ৬·৭%। আর শুধু শহরাঞ্চলে জনসংখ্যায় ৪৫·২% সাক্ষর, তার মধ্যে শুধু পুরুষ ৫১·৮% সাক্ষর শুধু স্ত্রীলোক ৩৫·১%। ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনের তুলনায় অবশ্য এ কিছুই

নয়, কারণ সেখানে অনুরূপ হিসেব হল মোট জনসংখ্যায় ৪৫.৮, শুধু পুরুষ ৫৪.৮%, শুধু স্ত্রীলোক ৩৭.০%, গ্রামাঞ্চলের মোট জনসংখ্যার মধ্যে সাক্ষর ৪৪.৪%, তার মধ্যে শুধু পুরুষ ধরলে ৫৩.৮%, শুধু স্ত্রীলোক ধরলে ৩৬.০%। আর শহরাঞ্চলের মোট জনসংখ্যায় ৫১.৩%, তার মধ্যে শুধু পুরুষ ৬০.০%, শুধু স্ত্রীলোক ৪২.৪%। তবে ভারতবর্ষের অন্যান্য 'ক' শ্রেণীর রাজ্যের মধ্যে পশ্চিমবাংলার কাছাকাছি কেবলমাত্র বোম্বাই। সেখানে মোট জনসংখ্যার ২৪.১% স্বাক্ষর, শুধু পুরুষদের মধ্যে ৩৪.৯% সাক্ষর, শুধু স্ত্রীলোকদের মধ্যে ১২.৬%। অন্যান্য রাজ্যে সাক্ষরতা অনেক কম। সবচেয়ে কম হল বিহারে, মাত্র ১১.৯%, তার মধ্যে শুধু পুরুষ ১৯.৯%, শুধু স্ত্রীলোক ৩.৮%। সেখানে গ্রামাঞ্চলের স্ত্রীলোকদের মধ্যে সাক্ষরতা তো মাত্র ১.৫%।

কিন্তু এতে পশ্চিমবঙ্গের উল্লসিত হবার কোনও কারণ নেই। বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, শুধু সাক্ষরতার কথা বাদ দিয়ে যারা আরও কিছু লেখাপড়া শিখেছে তাদের কথা ধরলে অবস্থা অন্য রকম দেখা যাবে। সকলেই জানেন এদেশে যারা একবার সাক্ষর হয় তাদের অনেকেও চর্চার অভাবে পরে নিরক্ষর হয়ে পড়ে— একথা বারবার শিক্ষাবিভাগের নানা রিপোর্টে স্বীকৃতও হয়েছে। তাছাড়া কোনরকমে কয়েকটা অক্ষর লিখতে পারলেই কাজ চালাবার মত ন্যূনতম বিদ্যা হয়েছে মনে করা অন্ততঃ আজকের দিনে জনায়ত্তরাষ্ট্রে ঠিক নয়। সেইজন্য যদি আর একটু লেখাপড়া জানাদের হিসেব ধরা যায় তাহলে দেখা যাবে, সারা পশ্চিমবাংলা অন্ধকার— কেবল যত আলো কলিকাতায়। যেমন মধ্য পরীক্ষা পাশ লোকের সংখ্যা পশ্চিমবাংলায় মোট ৪১ লক্ষ ৪৩ হাজার তার মধ্যে ১৮.৭% কলিকাতায়। সাড়ে তিন লক্ষ ম্যাট্রিকুলেশন পাশের ৩৭.৬% কলিকাতায়। ৫৯,৩৫৯ গ্রাজুয়েটের

মধ্যে কলিকাতায় ৫২.৫%। এম-এ বা এম-এস্‌ সি-পাশকরা লোকের মধ্যে ৫৯.৮% কলিকাতায়। ডাক্তারী ডিগ্রীপ্রাপ্ত ১৬,১৫৫ লোকের মধ্যে কলিকাতায় ৬,৫৮৮ (পুরুষ ৬,২৩৪ স্ত্রীলোক ৩৫৪) অর্থাৎ ৪০.৮%। বিলেতের ডিগ্রী বা ডিপ্লোমাধারীদের মধ্যে ৭৯.৫% কলিকাতায়। আর অধিক লেখার প্রয়োজন নেই। এ হতেই বোঝা যায় বিদ্যার আলো কলিকাতাতেই উজ্জ্বল, বাকী জায়গায় বড় বেশি অন্ধকার।

পরিশেষে ভাষার কথা উল্লেখ করে পরিসমাপ্তি করি। আমাদের দেশে ভাষার শেষ নেই, পশ্চিমবাংলাতেও ভাষাবৈচিত্র্য বড় কম নয়। ১৯৫১ সালের সেন্‌সাসে মোট ১১৬টি ভাষার হিসেব পাওয়া যায়। তার মধ্যে দেশবিদেশের নানা ভাষা আছে। তার মধ্যে ভারতের ভাষা মোট জনসংখ্যার ৯৮.৬২% লোকে বলে। পশ্চিমবাংলার মোট জনসংখ্যার মধ্যে বাংলা মাতৃভাষা শতকরা ৮৪.৬২%, হিন্দী মাতৃভাষা ৬.৩৫% সাঁওতালি ২.৬৭% উর্দ্দু ১.৮৪, নেপালি ০.৭%। ইংরেজী মাতৃভাষা ০.১৫%। কিন্তু দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে ইংরেজী ব্যবহার করে এমন লোকের সংখ্যা অনেক।

এই প্রসঙ্গে ধর্মের কথাটাও উল্লেখ করা যেতে পারে। পশ্চিমবাংলার মোট জনসংখ্যার ৭৮.৪৫% হিন্দু, ১৯.৮৫% মুসলমান, ০.৭০% খৃস্টান, ০.১২% শিখ। তা ছাড়া আরও ধর্ম আছে যা সংখ্যায় বেশি নয়।

কথাশেষ

সংক্ষিপ্ত পুস্তিকার পরিসরে পশ্চিমবাংলার জনবিন্যাসের প্রধান প্রধান কয়েকটি কথা মাত্র উল্লেখ করা সম্ভব হল। বস্তুতঃ এই আলোচনা অতি বিরাট এবং অতি বিচিত্র। বিশেষতঃ ১৯৫১ সালের পশ্চিমবাংলার সেন্সাস রিপোর্ট এক অসামান্য কীর্তি, তার মধ্যে পশ্চিমবাংলার সম্বন্ধে কত যে জিনিস কত যে আলোচনা একত্রিত আছে তার ইয়ত্তা নেই। তা ছাড়া ইতিহাসের দিক্ দিয়েও বাংলাদেশ বড় বিচিত্র। পূর্ব পশ্চিম ও উত্তরে পাহাড়ের মেখলার মধ্যে নদীমাতৃক এই সমতল শ্যামল বাংলাদেশ গড়ে উঠেছিল— তার মানুষের চেহারা, তার ভাষা, তার সমাজ, তার জীবনযাত্রা— সবই একটু আলাদা। তার মধ্যে ধীরে ধীরে কত পরিবর্তন হচ্ছে, কিভাবে গ্রাম বদলাচ্ছে শহর বদলাচ্ছে, পুরোনো যে সব শহর একদা পল্লীবাংলার সমৃদ্ধির প্রতীক ছিল সেসব কেমন করে ধীরে ধীরে ক্ষয় পাচ্ছে, নতুন চেহারার শহর গড়ে উঠছে অন্য জায়গায়, তার পিছনে জাগছে অন্য ধরণের প্রেরণা, কলকাতা ক্রমেই স্ফীত হচ্ছে, সারা দেশের বিদ্যার আলো সেখানেই, অথচ পল্লীবাংলা সে আলো হতে বহুলাংশে বঞ্চিত— এ সব তথ্য খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনুসন্ধান করলে বাংলার এক বিচিত্র ছবি ধরা পড়ে। তার উপর বঙ্গবিভাগ হওয়ায় তো বাংলার চেহারাই বদলে গিয়েছে। শিল্প ও কৃষি, শহর ও গ্রাম, রাঢ়ের রুক্ষতা ও 'বঙ্গে'র সরস শ্যামলতা— এই দুই মিলিয়েই তো বাংলাদেশ ছিল। এখন তার সে চেহারাই নেই। এ নিয়ে বিস্তৃত গবেষণা ও আলোচনা চলুক, কারণ পশ্চিমবাংলাকে প্রকৃতভাবে বোঝবার জন্য তার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

—

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

॥ ১৩৫০ বৈশাখ হইতে নিয়মিত প্রকাশিত হইতেছে ॥
প্রতি গ্রন্থ আট আনা

১। সাহিত্যের স্বরূপ ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। চতুর্থ মুদ্রণ
২। কুটিরশিল্প ॥ শ্রীরাজশেখর বসু। চতুর্থ মুদ্রণ
৩। ভারতের সংস্কৃতি ॥ শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী। চতুর্থ মুদ্রণ
*৪। বাংলার ব্রত ॥ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তৃতীয় মুদ্রণ
*৫। জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার ॥ শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য। তৃতীয় মুদ্রণ
৬। মায়াবাদ ॥ মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ। তৃতীয় মুদ্রণ
৭। ভারতের খনিজ ॥ শ্রীরাজশেখর বসু। তৃতীয় মুদ্রণ
*৮। বিশ্বের উপাদান ॥ শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য। তৃতীয় মুদ্রণ
৯। হিন্দু রসায়নী বিদ্যা ॥ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। দ্বিতীয় মুদ্রণ
*১০। নক্ষত্র-পরিচয় ॥ শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত। তৃতীয় মুদ্রণ
*১১। শারীরবৃত্ত ॥ ডক্টর রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল। তৃতীয় মুদ্রণ
১২। প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী ॥ ডক্টর সুকুমার সেন। দ্বিতীয় মুদ্রণ
*১৩। বিজ্ঞান ও বিশ্বজগৎ ॥ শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়। তৃতীয় মুদ্রণ
১৪। আয়ুর্বেদ-পরিচয় ॥ মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন। দ্বিতীয় মুদ্রণ
১৫। বঙ্গীয় নাট্যশালা ॥ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃতীয় মুদ্রণ
*১৬। রঞ্জনদ্রব্য ॥ ডক্টর দুঃখহরণ চক্রবর্তী। দ্বিতীয় মুদ্রণ
১৭। জমি ও চাষ ॥ ডক্টর সত্যপ্রসাদ রায়চৌধুরী। দ্বিতীয় মুদ্রণ
১৮। যুদ্ধোত্তর বাংলার কৃষি ও শিল্প ॥ ডক্টর কুদরত-এ-খুদা। দ্বিতীয় মুদ্রণ
১৯। রায়তের কথা ॥ প্রমথ চৌধুরী। দ্বিতীয় মুদ্রণ
২০। জমির মালিক ॥ শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত
২১। বাংলার চাষী ॥ শ্রীশান্তিপ্রিয় বসু। দ্বিতীয় মুদ্রণ
২২। বাংলার রায়ত ও জমিদার ॥ ডক্টর শচীন সেন। দ্বিতীয় মুদ্রণ
২৩। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ॥ শ্রীঅনাথনাথ বসু। তৃতীয় মুদ্রণ
২৪। দর্শনের রূপ ও অভিব্যক্তি ॥ শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য। দ্বিতীয় মুদ্রণ
২৫। বেদান্ত-দর্শন ॥ ডক্টর রমা চৌধুরী। দ্বিতীয় মুদ্রণ
২৬। যোগ-পরিচয় ॥ ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার। দ্বিতীয় মুদ্রণ

২৭। রসায়নের ব্যবহার ॥ ডক্টর সর্বাণীসহায় গুহসরকার। দ্বিতীয় মুদ্রণ
*২৮। রমনের আবিষ্কার ॥ ডক্টর জগন্নাথ গুপ্ত। দ্বিতীয় মুদ্রণ
*২৯। ভারতের বনজ ॥ শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু। দ্বিতীয় মুদ্রণ
৩০। ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাস ॥ রমেশচন্দ্র দত্ত
৩১। ধনবিজ্ঞান ॥ শ্রীভবতোষ দত্ত। দ্বিতীয় মুদ্রণ
*৩২। শিল্পকথা ॥ শ্রীনন্দলাল বসু। দ্বিতীয় মুদ্রণ
৩৩। বাংলা সাময়িক সাহিত্য ॥ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৪। মেগাস্থেনীসের ভারত-বিবরণ ॥ শ্রীরজনীকান্ত গুহ
*৩৫। বেতার ॥ ডক্টর সতীশরঞ্জন খাস্তগীর। দ্বিতীয় মুদ্রণ
৩৬। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ॥ শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ
৩৭। হিন্দু সংগীত ॥ প্রমথ চৌধুরী ও শ্রীইন্দিরা দেবী
৩৮। প্রাচীন ভারতের সংগীত-চিন্তা ॥ শ্রীঅমিয়নাথ সান্যাল
৩৯। কীর্তন ॥ অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র
*৪০। বিশ্বের ইতিকথা ॥ শ্রীসুশোভন দত্ত
৪১। ভারতীয় সাধনার ঐক্য ॥ ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত। দ্বিতীয় মুদ্রণ
৪২। বাংলার সাধনা ॥ শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী। দ্বিতীয় মুদ্রণ
৪৩। বাঙালী হিন্দুর বর্ণভেদ ॥ ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়
৪৪। মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী ॥ ডক্টর সুকুমার সেন
৪৫। নব্যবিজ্ঞানে অনির্দেশ্যবাদ ॥ শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত
*৪৬। প্রাচীন ভারতের নাট্যকলা ॥ ডক্টর মনোমোহন ঘোষ
৪৭। সংস্কৃত সাহিত্যের কথা ॥ শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী
৪৮। অভিব্যক্তি ॥ শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর
*৪৯। হিন্দু জ্যোতির্বিদ্যা ॥ ডক্টর সুকুমাররঞ্জন দাশ
৫০। ন্যায়দর্শন ॥ শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য সপ্ততীর্থ শাস্ত্রী
৫১। আমাদের অদৃশ্য শত্রু ॥ ডক্টর ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৫২। গ্রীক দর্শন ॥ শ্রীশুভব্রত রায় চৌধুরী
৫৩। আধুনিক চীন ॥ থান য়ুন শান
৫৪। প্রাচীন বাংলার গৌরব ॥ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
*৫৫। নভোরশ্মি ॥ ডক্টর সুকুমারচন্দ্র সরকার
৫৬। আধুনিক য়ুরোপীয় দর্শন ॥ শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
*৫৭। ভারতের বনৌষধি ॥ ডক্টর অসীমা চট্টোপাধ্যায়

৫৮। উপনিষদ্ ॥ মহামহোপাধ্যায় শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী
৫৯। শিশুর মন ॥ ডক্টর সুখেনলাল ব্রহ্মচারী। দ্বিতীয় মুদ্রণ
৬০। প্রাচীন ভারতে উদ্ভিদ্‌বিদ্যা ॥ ডক্টর গিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার
৬১। ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ ॥ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
*৬২। ভারতশিল্পে মূর্তি ॥ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
*৬৩। বাংলার নদনদী ॥ ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়
৬৪। ভারতের অধ্যাত্মবাদ ॥ ডক্টর নলিনীকান্ত ব্রহ্ম
৬৫। টাকার বাজার ॥ শ্রীঅতুল সুর
৬৬। হিন্দু সংস্কৃতির স্বরূপ ॥ শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী
৬৭। শিক্ষাপ্রকল্প ॥ শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি
৬৮। ভারতের রাসায়নিক শিল্প ॥ ডক্টর হরগোপাল বিশ্বাস
*৬৯। দামোদর পরিকল্পনা ॥ ডক্টর চন্দ্রশেখর ঘোষ
৭০। সাহিত্য-মীমাংসা ॥ শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য
*৭১। দূরেক্ষণ ॥ শ্রীজিতেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
৭২। তেল আর ঘি ॥ ডক্টর রামগোপাল চট্টোপাধ্যায়
৭৩। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান ॥ প্রমথ চৌধুরী
৭৪। ভারতে হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনা ॥ শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী
৭৫। বিভক্ত ভারত ॥ শ্রীবিনয়েন্দ্রমোহন চৌধুরী
৭৬। বাংলার জনশিক্ষা ॥ শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল
*৭৭। সৌরজগৎ ॥ ডক্টর নিখিলরঞ্জন সেন
*৭৮। প্রাচীন বাংলার দৈনন্দিন জীবন ॥ ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়
৭৯। ভারত ও মধ্য এশিয়া ॥ ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী
৮০। ভারত ও ইন্দোচীন ॥ ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী
৮১। ভারত ও চীন ॥ ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী
৮২। বৈদিক দেবতা ॥ শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য
*৮৩। বঙ্গসাহিত্যে নারী ॥ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
*৮৪। সাময়িকপত্র সম্পাদনে বঙ্গনারী ॥ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
*৮৫। বাংলার স্ত্রীশিক্ষা ॥ শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল
৮৬। গণিতের রাজ্য ॥ ডক্টর গগনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়
*৮৭। রসাঞ্জন ॥ ডক্টর রামগোপাল চট্টোপাধ্যায়
৮৮। নাথপন্থ ॥ ডক্টর কল্যাণী মল্লিক

৮৯। সরল ন্যায় ॥ শ্রীঅমরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য
৯০। খাদ্য-বিশ্লেষণ ॥ ডক্টর বীরেশচন্দ্র গুহ ও শ্রীকালীচরণ সাহা
৯১। ওড়িয়া সাহিত্য ॥ শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন
৯২। অসমীয়া সাহিত্য ॥ শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
৯৩। জৈনধর্ম ॥ শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন
৯৪। ভাইটামিন ॥ ডক্টর রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল
৯৫। মনস্তত্ত্বের গোড়ার কথা ॥ শ্রীসমীরণ চট্টোপাধ্যায়
৯৬। বাংলার পালপার্বণ ॥ শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী
*৯৭। জাভা ও বলির নৃত্যগীত ॥ শ্রীশান্তিদেব ঘোষ
৯৮। বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য ॥ ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী
৯৯। ধম্মপদ-পরিচয় ॥ শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন
১০০। সমবায়নীতি ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১০১। ধনুর্বেদ ॥ শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি
*১০২। সিংহলের শিল্প ও সভ্যতা ॥ শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত
১০৩। তন্ত্রকথা ॥ শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী
১০৪। বাংলার উচ্চশিক্ষা ॥ শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল
*১০৫। কুইনিন ॥ ডক্টর রামগোপাল চট্টোপাধ্যায়
১০৬। গ্রন্থাগার ॥ শ্রীবিমলকুমার দত্ত
১০৭। বৈশেষিক দর্শন ॥ শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য সপ্ততীর্থ শাস্ত্রী
১০৮। সৌন্দর্যদর্শন ॥ শ্রীপ্রবাসজীবন চৌধুরী
১০৯। পোর্সিলেন ॥ শ্রীহীরেন্দ্রনাথ বসু
১১০। কয়লা ॥ শ্রীগৌরগোপাল সরকার
*১১১। পেট্রোলিয়ম ॥ শ্রীমৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ
১১২। জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গনারী ॥ শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল
১১৩। বাংলা লিরিকের গোড়ার কথা ॥ শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়
*১১৪। ডাকের কাহিনী ॥ শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়
*১১৫। হীরকের কথা ॥ শ্রীঅমিয়কুমার দত্ত
১১৬। পশ্চিমবঙ্গের জনবিন্যাস ॥ শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

* সচিত্র

ধনুর্ব্বেদ

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়



বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ। সংখ্যা ১০১
প্রকাশ ১৩৬১ ফাল্গুন

মূল্য আট আনা

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী। ৬৷৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

মুদ্রাকর শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস লিমিটেড। ৫ চিন্তামণি দাস লেন। কলিকাতা ৯
৩'১

ভূমিকা

ধনুর্বেদ নামক নিবন্ধটি হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমালার অন্তর্গত ছিল। অধিকাংশ পাঠকের পক্ষে তাহা দুষ্প্রাপ্য হইয়াছিল। এ কারণ ইহা পৃথক পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। পাঠক শেষের পরিচ্ছেদটি পড়িলে বুঝিবেন, প্রাচীন ভারতে বন্দুক ছিল না। এ বিষয়ে আরও কিছু জানিতে ইচ্ছা হইলে মৎপ্রণীত *Ancient Indian Life* (Sen, Ray & Co., College Square, Calcutta) নামক পুস্তকে Fire-arms in Ancient India পড়িতে পারেন।

বাঁকুড়া

১৩৬১। কার্ত্তিক

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি

সূচীপত্র

১. প্রস্তাবনা

এখন আমাদিগকে যুদ্ধ করিতে হয় না। আমরা যুদ্ধের কিছুই জানি না। মধ্যে মধ্যে দুই শত্রুদলের সহিত দাঙ্গা হয়। দাঙ্গা যুদ্ধ বটে, কিন্তু অশিক্ষিতের যুদ্ধ, যুদ্ধকৌশল না শিখিয়া যুদ্ধ। কিন্তু ষাট-সত্তর বৎসর পূর্বেও গ্রামবাসীরা ডাকাতের সহিত যুদ্ধ করিত। আমি হুগলী জেলার আরামবাগের কথা বলিতেছি। দেশটি ডাকাতের, এই হেতু গ্রামের ভদ্র-ইতর অনেককেই যুদ্ধকৌশল শিখিতে হইত। শুধু লাঠি-খেলা নয়, গুলতই দিয়া বাঁটুল-ছোঁড়া, তীর-ধনুক, ঢাল-তরোয়াল শিক্ষাও করিতে হইত। ডাকাতের দলপতি সর্দার শিক্ষা দিত। সর্দার ডাকাতের দলপতি বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল না; প্রকাশ্যে বাড়ির দরোয়ান কিংবা গ্রামের দিগার (চৌকিদার) হইয়া থাকিত। বিবাহের সময়ে এইসকল খেলআড় ডাকা হইত, তাহারা বরযাত্রীর সঙ্গে যাইত, এবং বর-বিদায়ের সময়ে যুদ্ধবিদ্যা দেখাইত। এক এক সর্দার নিজের দেহের নানা স্থান চিরিয়া ঔষধ প্রবিষ্ট করাইয়া দিত। সেসকল স্থানে পরে লম্বা লম্বা অর্বুদ হইয়া রহিত। আমার মনে পড়ে, ধারাল তরোয়ালের চোটে তাহাদের দেহে নখের আঁচড়ের তুল্য দেখাইত। তাহারা বলিত, ঔষধের গুণে দেহ কাটে না। ইহাও মনে রাখা উচিত, প্রবল বেগে কোপ না মারিলে তরোয়ালে কাটে না।

কিন্তু ম্যালেরিয়ার আক্রমণের পরে দেশের সে শৌর্য-বীর্য চলিয়া গিয়াছে। সে ডাকাত নাই, পূর্বকালের যুদ্ধবিদ্যার স্মৃতিও নাই। দেড় শত বৎসর পূর্বে মানিক গাঙ্গুলী তাঁহার ধর্মমঙ্গলে মল্লক্রীড়ার যে পরিভাষা লিখিয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। ডাকাতদের মধ্যে ধর্মজ্ঞান ছিল। কালীপূজা করিয়া ডাকাতি-যাত্রা করিত। কোথায় ধন গুপ্ত আছে, তাহা না বলিলে নারীকে ভয় দেখাইত, কিন্তু কদাপি দেহ স্পর্শ করিত না। নারী যে কালীমায়ের জাতি। আমাদের অঞ্চলে ডাকাত ছিল, কিন্তু চোর ছিল না। এখনকার ডাকাতি, ডাকাতি নয়, অনেকে মিলিয়া চুরি। তখনকার ডাকাতি এক গ্রামে হইলে পাঁচখানা গ্রামের

লোক শুনিতে পাইত। যেখানে সে ভীমরবে ডাক নাই, কটিতে কিঙ্কিণী নাই, মালসাট নাই, সেখানে ডাকাতি নাই। আমার বোধ হয়, বর্গীর হাঙ্গামা হইতে কিছু রক্ষার আশায় লোকে যুদ্ধ শিখিত, এবং ডাকাতরূপ যোদ্ধা পালন করিত। ওড়িষ্যা হইতে মেদিনীপুর ও আরামবাগ হইয়া বর্গীরা বর্ধমান আসিত। এই পথে, কত লুটপাট, কত রক্তারক্তি হইয়াছে, ঠেঙ্গাড়া সে কাহিনী ভুলিতে দেয় নাই। ঠেঙ্গাড়া যুদ্ধ করে না, যদি-বা করে, কূটযুদ্ধ করে।

বীর হনুমানের যুদ্ধ ন্যায়-যুদ্ধ, দুই বীরে যুদ্ধ। এক বীর পঁচিশ-ত্রিশটি অনুচর-সহচর লইয়া এক গ্রামে বাস করে। আগন্তুক বীর অন্যের নিকট পরাজিত কিংবা দলভ্রষ্ট হইয়া গ্রাম-রাজ্য অধিকার করিতে আসে। যুদ্ধের সময়ের বিক্রম দেখিলে ভীত ও স্তম্ভিত হইতে হয়। কিন্তু আয়ুধের মধ্যে নখর ও দন্ত, কদাচিৎ করতল। শত্রুকে ধরিতে না পারিলে দন্ত দ্বারা দংশন করা চলে না। নখর-চালনাতেও শত্রুকে কোলের কাছে পাইতে হয়। যে দিন আদিম মানব বৃক্ষশাখা দ্বারা নিজের বাহু দীর্ঘ করিতে শিখিয়াছিল, সে দিন তাহার জয়ও হইয়াছিল। পরে নখর-পরিবর্তে শাণিত শিলার কিংবা তাম্রের শস্ত্র নির্মাণ করিয়া শত্রুর দেহ বিদারণ, ছেদন, কর্তনে সমর্থ হইল। কিন্তু শত্রু নিকটে না পাইলে শস্ত্র বৃথা। পাষাণ-নিক্ষেপ দ্বারা দূরস্থ শত্রুকে এবং উচ্চ স্থান হইতে বিনাশ করা সম্ভব। অস্ত্র-নিক্ষেপ দ্বারা বধ করিতে পারিলে আরও সুবিধা। কিন্তু বাহুবলে প্রহার, কিংবা বাহুবলে অস্ত্র-নিক্ষেপ অপেক্ষা যন্ত্র-দ্বারা অস্ত্র-নিক্ষেপ করিতে পারিলে দূরস্থ শত্রুকেও সহজে বিনাশ করিতে পারা যায়। কোন্ কালের কোন্ মানব ধনু উদ্ভাবনা করিয়াছিল, কে জানে। কিন্তু একবার এই বুদ্ধি ঘটিলে, ভেদন, ছেদন, কৃন্তন, প্রতিরোধন প্রভৃতি প্রয়োজন অনুসারে ধনুর্যন্ত্র দ্বারা নিক্ষেপ্য অস্ত্রের বিভিন্ন রূপ প্রদত্ত হইয়াছিল। লক্ষ্যভেদের পূর্বে দেহ স্থির এবং মন একাগ্র করিবার নিমিত্ত মন্ত্র আবৃত্তি করা হইত। এইরূপে মান্ত্রিক অস্ত্রের উৎপত্তি। এইসকল অস্ত্র দিব্য-অস্ত্র নামে খ্যাত ছিল। যাহারা শত্রু-পরাজয়ের নিমিত্ত যুদ্ধ করে, তাহারাই জানে, যুদ্ধ করা হাসি-খেলা নয়। তখন যে অভীষ্ট দেবতা ও গুরুর নাম স্মরণ করিয়া শুভক্ষণে যুদ্ধযাত্রা করিবে, তাহাও তো স্বাভাবিক।

ধনুর্যুদ্ধে শরফলের আকার নানাবিধ করা যাইতে পারে। কিন্তু অধিক ভারী করিতে পারা যায় না। ধনুতে গুণ আরোপণ এবং গুণ আকর্ষণ, যোদ্ধার বাহুবলের পরিমাণ হইয়া দাঁড়ায়। যাহার বাহুবল যত, এবং যাহার দেহ যত দীর্ঘ, তাহার ধনুর্বলও তত। যুদ্ধকালে যে যত ক্ষিপ্রগতিতে শর নিক্ষেপ করিতে পারে, সে তত জয়ী হয়। এই সময়ে যন্ত্র-দ্বারা ধনুগু'ণাকর্ষণ ও শর-নিক্ষেপ করা চলে না। কারণ, তাহাতে কালবিলম্ব ঘটে। শর ও পাষাণ নিক্ষেপের এরূপ যন্ত্র ছিল, তাহাকে ক্ষেপণী বলিত। সে যন্ত্র ভারী হইত বলিয়া স্ব-স্থানে স্থির করিয়া রাখা হইত। কদাচিৎ চক্রযুক্ত করিয়া সে যন্ত্র যুদ্ধক্ষেত্রেও আনা হইত। কিন্তু যে দিন বাহুবলের পরিবর্তে অগ্নিবল, বাস্তবিক অগ্নিচূর্ণযোগে উদ্ভূত বায়ুবল আবিষ্কৃত হইল, সে দিন হইতে ধনুঃশরের আদরও হ্রাস পাইতে লাগিল। বারুদ ও বন্দুক একদিনে আবিষ্কৃত হয় নাই, ইহার কর্ম-সামর্থ্যও ঘটে নাই। চারি পাঁচ শত বৎসর গিয়াছে, বন্দুক ও ধনু দুইই চলিয়াছে। জয়লাভের পক্ষে কোন্‌টা ভালো, তখন বুঝিবার সময় আসে নাই। কিন্তু, ক্রমে ক্রমে বন্দুক কামানের, বারুদ ও গুলিগোলার উন্নতির সঙ্গে ধনুর্বেদ চিরকালের তরে বৃথা হইয়া পড়িয়াছে। এখন আর তিন শত হাত দূরে শর-নিক্ষেপ নয়, বর্ম ও ঢালের কর্ম নয়, ইউরোপের ১৯১৪ সালের যুদ্ধে পনর মাইল, বিশ মাইল দূর হইতেও লক্ষ্যের প্রতি গোলা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। এখন অগ্নিবল ও বুদ্ধিবলের নিকট বাহুবল পরাস্ত। জল, স্থল, অন্তরিক্ষ, তিনই যুদ্ধক্ষেত্র হইয়াছে। এখন প্রাচীন ধনুর্বেদ পুরাবৃত্তের বিষয় হইয়াছে।

বহুকাল হইতে ধনুর্বেদের নাম শুনিয়া আসিতেছিলাম। কিন্তু অগ্নিপুরাণোক্ত সংক্ষিপ্ত ধনুর্বেদ ব্যতীত ধনুর্বেদ পুস্তকের অভাবে প্রাচীন যুদ্ধশিক্ষা সম্বন্ধে স্পষ্ট জ্ঞান ছিল না। শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র সিংহ এম্-এ মহাশয়ের এবং সাংখ্য-ন্যায়-দর্শনতীর্থ পণ্ডিত শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের যত্নে মহর্ষি বশিষ্ঠ-বিচরিত ধনুর্বেদ-সংহিতা বঙ্গানুবাদ সহ প্রকাশিত হইয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয় বিশ্বামিত্র-বিরচিত ধনুর্বেদ, শার্ঙ্গধর ও বৈশম্পায়ন-বিরচিত ধনুর্বেদের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ইহাঁদের গ্রন্থ অদ্যাপি অপ্রকাশিত আছে। কোথায় পুথী আছে, শাস্ত্রী মহাশয়

জানাইলে অনুসন্ধিৎসুর উপকার হইত। অন্যপ্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে, কামন্দকীয় নীতিসারে, শুক্রনীতিসারে, ভোজরাজ-কৃত যুক্তিকল্পতরুতে, বরাহের বৃহৎ-সংহিতায়, অস্ত্র-শস্ত্র সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আছে। রামায়ণ ও মহাভারতে, মৎস্য ও মার্কেণ্ডেয় পুরাণে যুদ্ধের বহু বর্ণনা আছে। কিন্তু সেসকলে ধনুর্বেদ শাস্ত্র পাওয়া যায় না। বশিষ্ঠ-ধনুর্বেদ-সংহিতার সম্পাদক শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন, "এই ধনুর্বেদ-সংহিতা-মুদ্রণকার্যে আদর্শস্বরূপ একখানি মাত্র প্রাচীন গ্রন্থের অনুলিপি পাওয়া গিয়াছে। অপর কোনো বিশুদ্ধ আদর্শ পুথীর সাহায্য পাওয়া যায় নাই। উক্ত অনুলিপিতে যেরূপ পাঠাদি আছে, সেরূপ এই মুদ্রিত পুস্তকেও পাঠাদি দেওয়া হইয়াছে। স্থানে স্থানে দুর্বোধ্য হেতু সকল স্থানের যথাযথ অনুবাদ প্রদত্ত হয় নাই।" দেখা যাইতেছে, স্থানে স্থানে পাঠেও ভুল আছে। অনুবাদেও যে ভুল হইবে, তাহাতে আশ্চর্য নাই। 'বঙ্গবাসী প্রেস' হইতে প্রকাশিত অগ্নিপুরাণেরও সেই দশা। কিন্তু মোটের উপর এই সংহিতা বুঝিতে কষ্ট নাই। শাস্ত্রী মহাশয় দুঃখ করিয়াছেন, তিনি আদর্শ পুথী পান নাই। কিন্তু পাঠকের দুঃখ, তিনি যে কোথায় অনুলিপি পাইয়াছিলেন, কি অক্ষরে অনুলিপি, কোন্ সময়ের অনুলিপি, সে সম্বন্ধে কিছুই প্রকাশ করেন নাই। এমন কি, কোন্ সালে সংহিতাখানি ছাপা হইয়াছে, তাহাও জানান নাই। টীকায় বৃদ্ধ শার্ঙ্গধর হইতে প্রমাণ তুলিয়াছেন। তাহাতে মনে হয়, ইনি সে গ্রন্থ পাইয়াছেন। অথচ, সে গ্রন্থ যে পাওয়া যাইতেছে না, ইহাও লিখিয়াছেন। বোধ হয়, তিনি এরূপ গ্রন্থের গুরুত্ব অনুভব করেন নাই। বুঝিতেছি, তাঁহারা অনুবাদে যথেষ্ট যত্ন করিয়াছেন, এবং যাহা দিয়াছেন, সেজন্যই তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞ হইতেছি। এই ধনুর্বেদ না পাইলে শাস্ত্রজ্ঞান হইত না।

২. অগ্নিপুরাণোক্ত ধনুর্বেদ

এখন প্রথমে অগ্নিপুরাণ দেখি। আমরা জানি, অগ্নিপুরাণের অধিকাংশ বিষয় পুরাতন গ্রন্থ হইতে সংক্ষেপে সঙ্কলিত হইয়াছে। ধনুর্বেদও সেইরূপ। ইহাতে

সমরনীতিও আছে। এই পুরাণ ('বঙ্গবাসী' প্রকাশিত সংস্করণ) হইতে কিছু কিছু সংক্ষেপ করিতেছি।

অগ্নি বলিলেন, (২৪৯—২৫২ অঃ), "ধনুর্বেদ চতুষ্পাদ। ইহাতে রথ, গজ, অশ্ব, পত্তি এবং যোধ, এই পঞ্চবিধ বল কীর্তিত হইয়াছে[১]। ধনুর্বেদের গুরু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের। যুদ্ধে শূদ্রের অধিকার আছে, কিন্তু স্বয়ং শিক্ষা করিবে। [কিন্তু ধনুর্বেদ পাইবে না। কারণ, ধনুর্বেদ যজুর্বেদের অন্তর্গত।] দেশস্থ সঙ্করবর্ণ যুদ্ধে রাজার সহায়তা করিবে। অস্ত্র ও শস্ত্র ভেদে আয়ুধ দ্বিবিধ। যুদ্ধও ঋজু ও মায়া ভেদে দ্বিবিধ। আয়ুধ পঞ্চবিধ। যথা,—(১) ক্ষেপণী ও চাপ যন্ত্র দ্বারা যে অস্ত্র নিক্ষিপ্ত হয়, তাহা যন্ত্রমুক্ত; যেমন, ক্ষেপণী দ্বারা পাষাণ, ও চাপ দ্বারা শর। (২) শিলাতোমরাদি (শূলবিশেষ) হস্তমুক্ত। (৩) প্রয়োগের পর যাহাকে প্রতিসংহার করিতে পারা যায়, তাহাকে মুক্ত-সন্ধারিত বা মুক্ত-অমুক্ত বলে; যেমন, কুন্ত (কোঁচ বা খোঁচ)। (৪) খড়্গাদি অমুক্ত। (৫) হস্তপদ। ধনুর্যুদ্ধ শ্রেষ্ঠ, [কারণ দূর হইতে শত্রুবিনাশ করিতে পারা যায়]। প্রাস (হ্রস্ব কুন্ত-বিশেষ)-যুদ্ধ মধ্যম, খড়্গ-যুদ্ধ অধম, এবং আয়ুধহীন বাহুযুদ্ধ ও নিযুদ্ধ (মল্ল-যুদ্ধ) জঘন্য[২]।

১ বল চতুরঙ্গ প্রসিদ্ধ। অগ্নিপুরাণে আয়ুধহীন যোদ্ধা, পঞ্চম বল ধরা হইয়াছে। মহাভারতে (শল্য পর্ব ৬ অঃ) ধনুর্বেদ চতুষ্পাদ এবং দশাঙ্গ। কি কি দশটি অঙ্গ, তাহার উল্লেখ নাই। ধনুর্বেদের চতুষ্পাদ বাশিষ্ঠ ধনুর্বেদে পাওয়া যাইবে।

২ আয়ুধের নানাবিধ শ্রেণী আছে। যথা, কৌটিল্যে—

(ক) জামদগ্ন্যাদি স্থিত (অচল) যন্ত্র; (খ) গদা, শতঘ্নী, ত্রিশূলাদি চল যন্ত্র; (গ) শক্তি, প্রাস, কুন্ত, ভিন্দিপাল, শূল, তোমারাদি হলমুখ; (ঘ) ধনুঃশর; (ঙ) খড়্গ; (চ) পরশু কুঠারাদি ক্ষুরকল্প; (ছ) পাষাণাদি। অর্থাৎ দ্রব্য, নির্মাণ, প্রয়োগ ও কর্মভেদে আয়ুধের ভাগ করা হইয়াছে। একটা প্রচলিত ভাগ এই, (১) যেমন, খড়্গ; (২) হস্তমুক্ত, যেমন চক্র; (৩) যন্ত্রমুক্ত, যেমন শর। অগ্নিপুরাণের অন্যত্র বাহুকে আয়ুধের মধ্যে ধরা হয় নাই। বাশিষ্ঠ ধনুর্বেদেও তাই; তদনুসারে আয়ুধ অমুক্ত, মুক্তামুক্ত, মুক্ত; মুক্ত—হস্তমুক্ত ও যন্ত্রমুক্ত। যুক্তিকল্পতরুতে অস্ত্র দ্বিবিধ। খড়্গাদি নির্মায় অস্ত্র, আর দাহনাদি (জল, কাষ্ঠ, লোষ্ট্র, শব্দাদি, তপ্ত তৈলাদি) মায়িক অস্ত্র, অর্থাৎ কৃত্রিম ও অকৃত্রিম। শুক্রনীতিসারে, মন্ত্র, যন্ত্র ও অগ্নিদ্বারা যাহা নিক্ষেপ করিতে পারা যায়, তাহা অস্ত্র; তদ্ভিন্ন খড়্গ, কুন্তাদি শস্ত্র। আর এক ভাগ—দিব্য, আসুর ও মানব।

ধনুর্বেদ-শিক্ষার প্রথমে অঙ্গুষ্ঠ, গুল্ফ, হস্ত, পদ দৃঢ় করিতে হইবে[৩]। [কখনো দাঁড়াইয়া, কখনো বসিয়া দেহের নানাবিধ ভঙ্গিতে যুদ্ধ করিতে হয়। এইসকল অবস্থানের পারিভাষিক নাম 'স্থান'।] যথা, জানুদ্বয় স্তব্ধ করিয়া এক বিতস্তি ভূমির মধ্যে দণ্ডায়মান হইলে 'সমপাদ স্থান'। তিন বিতস্তির মধ্যে (পা ফাঁক করিয়া) দণ্ডায়মান হইলে 'বৈশাখ'। এই স্থানে জানুদ্বয় তোরণাকার করিলে 'মণ্ডল'। এইরূপ, আলীঢ়, প্রত্যালীঢ়, বিকট, সম্পুট, স্বস্তিক, এই আট প্রকার[৪]। ইহার পর ধনুর্গ্রহণ, জ্যা-আরোপণ, শরযোজন, ইত্যাদি। "চতুর্হস্ত ধনু শ্রেষ্ঠ, সার্ধত্রয় মধ্যম, এবং ত্রি-হস্ত কনিষ্ঠ। এই ধনু পদাতির যোগ্য। ধনু নাভিদেশে এবং তূণ নিতম্বদেশে স্থাপন করিবে। দ্বাদশমুষ্টি (৩৬ইঞ্চি) দীর্ঘ শর শ্রেষ্ঠ, একাদশমুষ্টি মধ্যম ও দশমুষ্টি কনিষ্ঠ।" ইহার পর কেমন করিয়া শর অভ্যাস ও লক্ষ্যভেদ করিতে হয়, তাহার উপদেশ আছে। "জিত-হস্ত, জিত-মতি, এবং দৃষ্টি ও লক্ষ্যসাধন বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিয়া, পরে বাহনে আরোহণ করিয়া শর অভ্যাস করিবে।"

ধনুঃশর গেল। এখন অন্য অস্ত্র-শস্ত্রের কথা। "পাশের পরিমাণ দশ হাত। তাহার দুই মুখে গোল পিণ্ড বাঁধা থাকিবে। কার্পাস, মুঞ্জ, ভঙ্গ (ভাং গাছের অংশু), স্নায়ু, অর্ক (আকন্দ গাছের অংশু), কিংবা অন্য সুদৃঢ় রজ্জু দ্বারা পাশের গুণ নির্মাণ করিবে[৫]। পাশের স্থান কক্ষ দেশ। পাশ কুণ্ডলাকারে মস্তকের

অস্ত্রের আর ভাগ—মান্ত্রিক ও যান্ত্রিক। মান্ত্রিকাস্ত্র উত্তম, নালীকাস্ত্র মধ্যম ও শস্ত্র কনিষ্ঠ, বাহুযুদ্ধ ততোঽধম। শুক্রের নালীকাস্ত্র বন্দুক, অগ্নিদ্বারা অস্ত্র নিক্ষিপ্ত হয়।

৩ তু° মানিক গাঙ্গুলীর ধর্ম-মঙ্গলে—"প্রথমে করিল শিক্ষা সামীর হরণ"। সামীর—করতলের সংজ্ঞা লোপ করিতে শিখিল। করতলে আঘাত দ্বারা 'কড়া' পড়াইল।

৪ অমরকোষে 'স্থান' পাঁচ প্রকার—সমপাদ, বৈশাখ, মণ্ডল, আলীঢ়, প্রত্যালীঢ়। ইহাদের সহিত 'বৈষ্ণব' যোগ করিয়া 'স্থান' ষড়্‌বিধ। বাশিষ্ঠ ধনুর্বেদ মতে অষ্টবিধ—সমপাদ, বিশাখ, অসমপাদ, আলীঢ়, প্রত্যালীঢ়, দুর্দর-ক্রম, গরুড়-ক্রম, পদ্মাসন। অগ্নিপুরাণের কয়েকটির নামান্তর। বৈষ্ণব = গরুড়, পদ্মাসন = স্বস্তিক মনে করা হইয়াছে।

৫ "গুণকার্পাসমুঞ্জানাং ভঙ্গস্নায়্বর্কবর্মিণাম্"—ভঙ্গ, ভঙ্গা নামে প্রসিদ্ধ। 'বর্মিণাম্' পাঠ পরিবর্তে 'চর্মিণাম্' পাঠও আছে। এই পাঠই শুদ্ধ বোধ হয়। এই শ্লোকার্ধ বাশিষ্ঠ ধনুর্বেদ-

উপর একবার ঘুরাইয়া চর্মধারী পুরুষের প্রতি নিক্ষেপ করিবে। বল্গিত, প্লুত, কিংবা প্রব্রজিত, শত্রু যে ভাবেই চলুক, তাহার প্রতি তদনুরূপ বিধিতে পাশ প্রয়োগ করিবে। খড়্গ বাম কটিতে বিলম্বিত করিয়া বদ্ধ করিবে। শল্য সাত হাত দীর্ঘ। ইহার অয়োমুখ বিস্তারে ষড়ঙ্গুল। বর্ম নানাবিধ হইয়া থাকে। লগুড় গ্রহণপূর্বক সবলে লৌহবর্মোপরি আঘাত করিলে নাশ নিশ্চিত।"

এখন অস্ত্র-শস্ত্রের প্রয়োগ ও কর্ম। "খড়্গ ও চর্মধারণ বত্রিশ প্রকার, পাশধারণ এগার প্রকার, চক্রকর্ম সাত প্রকার, শূলকর্ম পাঁচ প্রকার, তোমরকর্ম ছয় প্রকার, গদাকর্ম বার প্রকার, পরশুকর্ম ছয় প্রকার, মুদ্গরকর্ম পাঁচ প্রকার, ভিন্দিপাল ও লগুড় -কর্ম চারি প্রকার, বজ্র ও পট্টিশ -কর্ম চারি প্রকার, কৃপাণকর্ম সাত প্রকার। ত্রাসন, রক্ষণ, ঘাত, বলোদ্ধরণ এবং আয়ত (?) এই কয়টি ক্ষেপণীকর্ম ও যন্ত্রকর্ম। গদাকর্ম ও নিযুদ্ধকর্ম বত্রিশ প্রকার। বাহুযুদ্ধ চৌত্রিশ প্রকার[৬]।" এক এক গজে দুই জন অঙ্কুশধারী, দুই জন ধনুর্ধারী ও দুই জন খড়্গধারী আরোহণ করিবে। রথ ও গজ রক্ষার নিমিত্ত তিন তিন অশ্ব, এবং অশ্বের রক্ষার নিমিত্ত তিন ধানুষ্ক, এবং ধানুষ্কের রক্ষার নিমিত্ত চর্মী নিযুক্ত

সংহিতায় অযথা স্থানে বসিয়াছে। শুক্রনীতিসারে পাশের বহির্মুখে ত্রিহস্ত ও ত্রিশিখ দণ্ড বদ্ধ, এবং রজ্জু, লৌহনির্মিত। পাশের মুখ সর্পাকৃতি হইলে নাগপাশ।

৬ এইসকল কর্মের পরিভাষা পাইতেছি, কিন্তু ব্যাখ্যার অভাবে বুঝিবার উপায় নাই। শুক্রনীতিসারে নিযুদ্ধ অষ্টপ্রকার, যথা—(১) বাম হস্ত দ্বারা কেশ উৎপীড়ন (সে কালের লোকেরা কেশ কর্তন করিত না), (২) বলপূর্বক ভূমিতে নিষ্পেষণ, (৩) মস্তকে পদাঘাত, (৪) জানু দ্বারা উদর পীড়ন, (৫) মুষ্টিকে শ্রীফলের আকার করিয়া কপোলে দৃঢ় তাড়ন, (৬) পুনঃ পুনঃ কফোণি দ্বারা ভূতলে পাতন, (৭) সর্বপ্রকারে করতল দ্বারা প্রহার, (৮) শত্রুর রন্ধ্র অন্বেষণ নিমিত্ত ছলপূর্বক ভ্রমণ। বাহুযুদ্ধে, সন্ধি ও মর্মস্থানে কর্ষণ, বন্ধন ও ঘাতন। মহাভারতে খড়্গসঞ্চারণ দ্রোণপর্বে (১৯১ অঃ) একুশ প্রকার, এবং কর্ণপর্বে (২৫ অঃ) চৌদ্দ প্রকার বর্ণিত আছে। রামায়ণে (লঙ্কা, ৪০) নিযুদ্ধ বর্ণিত আছে। হরিবংশেও কয়েকটি আছে। অসিযুদ্ধ ও নিযুদ্ধ শিক্ষার্থী দেখিতে পারেন।

করিবে[৭]। শস্ত্রকে স্ব স্ব মন্ত্রে, এবং ত্রৈলোক্যমোহন শাস্ত্র অর্চনা করিয়া যিনি যুদ্ধে গমন করেন, তিনি অরি জয় ও পৃথিবী পালন করিতে সমর্থ হন।"

অগ্নিপুরাণোক্ত ধনুর্বেদ এইখানেই শেষ। কিন্তু আর এক অধ্যায়ে (২৪৫) রাজচিহ্ন বর্ণনায় চামর, দণ্ড, ছত্র, সিংহাসন সহিত ধনুর্বাণ ও খড়্গ আসিয়াছে। অগ্নি বলিলেন, "ধনুর্দ্রব্য তিনটি—লোহ, শৃঙ্গ, এবং দারু। সুবর্ণ, রজত, তাম্র এবং কৃষ্ণায়স (ইস্পাত)-নির্মিত ধনু, লোহধনু। মহিষ, শরভ ও রোহিষ মৃগের শৃঙ্গ-নির্মিত ধনু, শার্ঙ্গধনু। চন্দন, বেতস, সাল, ধন্বন্ ও ককুভ-নির্মিত ধনু, দারুধনু। কিন্তু শরৎকালের গৃহীত বংশ-নির্মিত ধনু সর্বশ্রেষ্ঠ। শ্রেষ্ঠ দারুধনুর প্রমাণ চারি হাত।" এইসকল দ্রব্য বাশিষ্ঠ ধনুর্বেদে প্রায় অবিকল পাওয়া যাইবে। "জ্যা-দ্রব্য তিনটি, বংশ, ভঙ্গ ও ত্বক্ (চর্ম)। বাণের কাণ্ড লৌহের, বাঁশের, শরের, কিংবা অ-শরের। শর ঋজু, হেমবর্ণ, স্নায়ু-শ্লিষ্ট (ফাটা নয়), সু-পুঙ্খ-যুক্ত ও তৈলধৌত সুবাণযুক্ত হইবে[৮]। রাজা এক বৎসরের কর দ্বারা পতাকা ও অস্ত্র সংগ্রহ করিবেন[৯]।" ইহার পর খড়্গ-লক্ষণ।

---

৭ এখানে পদাতির দুই ভাগ, ধন্বী ও চর্মী; গজ অশ্ব রথ মিলিয়া পাঁচ। সেনাভাগের হ্রস্বতম ভাগ, পত্তি। এক পত্তিতে ১ গজ, ১ রথ, ৩ অশ্ব, ৫ পদাতি=১০। অশ্ব ও পদাতি, গজ ও রথের 'পাদরক্ষক'। অমরকোষে, ৩ পত্তি=১ সেনামুখ, ৩ সেনামুখ=১ গুল্ম, ৩ গুল্ম=১ গণ, ৩ গণ=১ বাহিনী, ৩ বাহিনী=১ পৃতনা, ৩ পৃতনা=১ চমূ, ৩ চমূ=১ অনীকিনী, ১০ অনীকিনী=১ অক্ষৌহিণী। এক অনীকিনীতে গজ ২১৮৭, রথ ২১৮৭, অশ্ব ৩×২১৮৭=৬৫৬১, পদাতি ৫×২১৮৭=১০৯৩৫। মহাভারতে রথের প্রাধান্য, পরে গজের প্রাধান্য হইয়াছিল, শেষে গজের হ্রাস পায়। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে এক গজ প্রতি শত রথ, এক রথ প্রতি শত অশ্ব, এক অশ্ব প্রতি দশ ধনুর্ধর, এক ধনুর্ধর প্রতি দশ চর্মী নির্দিষ্ট হইয়াছিল। বোধ হয়, উত্তরভারতে গজ সুলভ ছিল না বলিয়া এই বিধি করিতে হইয়াছিল।

৮ কাণ্ড, লৌহের হইলে নাম নারাচ। তৈলধৌত—তেল-মাখানা, নইলে মরিচা পড়িবে। পূর্বকালে যাবতীয় অস্ত্র-শস্ত্র তৈলধৌত করা হইত। রামায়ণে ও মৎস্যপুরাণে বহু স্থানে উল্লেখ আছে।

৯ শুক্রের মতে রাজস্বের চতুর্থাংশ সেনা বিভাগে ব্যয় হইবে। অগ্নিপুরাণের খড়্গ-লক্ষণে

৩. সমরনীতি

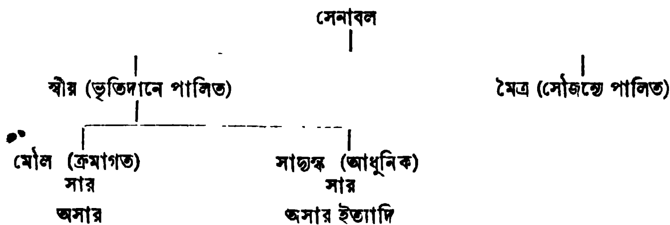
অগ্নিপুরাণোক্ত আয়ুধের কথা বলা হইল। এখন সমরনীতির অল্প স্বল্প দেখা যাউক। পুষ্কর বলিলেন (২২৮ অঃ), "শুভ শকুন (পশু পক্ষ্যাদির চেষ্টিত) ও শুভ নিমিত্ত দৃষ্ট হইলে রাজা শত্রুপুরে গমন করিবেন। বর্ষাকালে পদাতি ও হস্তিবহুল সেনা, হেমন্তে ও শিশিরে রথ ও অশ্ব সেনা, এবং বসন্তে ও শরৎমুখে চতুরঙ্গ সেনা নিয়োগ করিবেন। পদাতিবহুল সেনা সর্বদা শত্রুজয় করে[১০]।"

অন্যত্র (২৪২ অঃ), শ্রীরাম বলিলেন, "মৌল, ভৃত, শ্রেণী, সুহৃদ, দ্বিষৎ ও আটবিক, এই ষড়্‌বিধ বল ব্যূহিত করিয়া রাজা দেবতা-অর্চনাপূর্বক রিপুর উদ্দেশে যাত্রা করিবেন[১১]। নায়ক (বলাধ্যক্ষ) প্রবীরপুরুষগণে পরিবৃত হইয়া অগ্রে অগ্রে

লিখিত আছে, "বঙ্গের খড়্গ তীক্ষ্ণ ও ছেদসহ, অঙ্গদেশের তীক্ষ্ণ।" খড়্গ লক্ষণ বরাহের বৃহৎ-সংহিতায় আছে। ভোজরাজ যুক্তিকল্পতরুতে সবিস্তরে বর্ণনা করিয়াছেন।

১০ কৌটিল্যে গজ, অশ্ব, রথের যুদ্ধ-শিক্ষা বর্ণিত আছে। মনুর মতে অগ্রহায়ণ কিংবা ফাল্গুন বা চৈত্র মাসে যুদ্ধযাত্রা করিবেন। ইহার টীকায় কুল্লূক লিখিয়াছেন, পররাষ্ট্রে অগ্রহায়ণ মাসে হৈমন্তিক শস্য এবং ফাল্গুন ও চৈত্র মাসে বসন্ত শস্য পাওয়া যাইবে। কামন্দকের মতের সহিত অগ্নিপুরাণের ঐক্য আছে। রামায়ণের ও মহাভারতের যুদ্ধ অগ্রহায়ণ মাসে হইয়াছিল।

১১ মৌল--সদ্বংশজাত পুরুষানুক্রমে নিযুক্ত। ভৃত—বেতন-প্রাপ্ত। শ্রেণী—যুদ্ধকর্মপ্রিয়, কিন্তু স্বাধীন। সুহৃৎ—মিত্র রাজার। দ্বিষৎ—শত্রু রাজার সেনা হইতে পলায়িত। আটবিক—বন্য অশিক্ষিত। ইহারা পূর্ব পূর্ব বলবান্। বহুকাল হইতে এই ষড়্‌বিধ বল গণনা প্রসিদ্ধ ছিল। কৌটিল্যে ও কামন্দকে প্রয়োগ বর্ণিত আছে। মনুসংহিতায় (৭।৫৪, ১৮৫) এই ষড়্‌বল। শুক্রনীতিতে বল বিভাগ ভিন্ন। যথা—



গমন করিবেন। মধ্যে কোষ, স্বামী, কলত্র[১২] ও ফল্গুবল (অসার সৈন্য) গমন করিবেন। দুই পার্শ্বে অশ্ববল, অশ্বের পার্শ্বে রথ, রথের পার্শ্বে গজ, গজের পার্শ্বে আটবিক, পশ্চাৎ সেনাপতি[১৩]। সম্মুখে ভয় থাকিলে মকর ব্যূহ, পশ্চাতে ভয় থাকিলে শকট, পার্শ্বে ভয় থাকিলে বজ্র, এবং সর্বদিকে ভয় থাকিলে সর্বতোভদ্র রচনা করিবেন[১৪]। সুবিধা বুঝিলে প্রকাশ যুদ্ধ করিবেন, এবং বিপর্যয়ে কূট যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন[১৫]।" ইত্যাদি। এখানে হস্তিকর্ম, রথকর্ম, অশ্বকর্ম, পত্তিকর্ম

রাজার গুল্মীভূত সেনা ব্যতীত অগুল্ম সেনা থাকিত। ইহাদের নিজের সেনাপতি থাকিত। ইহারা উপরের 'শ্রেণী'। এতদ্ব্যতীত, কিরাতাদি স্বাধীন আরণ্যক। শেষে রিপু-সেনা হইতে উৎসৃষ্ট সেনা। ইহারা দ্বিষৎ সেনা। অতএব সেই ষড়্বল কেবল নামান্তর।

১২ শুক্রনীতিসারেও প্রায় এই শ্লোক (৪।৭)। যুদ্ধশিবিরে রাণীরা যাইতেন। মহাভারতের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে সেনাদিগের নিমিত্ত বেশ্যা গিয়াছিল। মদ্যের তো কথাই নাই। নারী, সেনাদিগের অন্ন পাক করিত।

১৩ কৌটিল্যে চতুরঙ্গ বলের প্রত্যেকের দশ সেনার উপরে এক পদিক, দশ পদিকের উপর এক সেনাপতি, দশ সেনাপতির উপরে এক নায়ক। অর্থাৎ শত সেনা সেনাপতির, সহস্র সেনা নায়কের অধীন থাকিত। সেনাপতি শতিক, নায়ক সাহস্রিক। ইহারা হাজারী, এখন উপাধি হাজরা। এখানে একটা কথা মনে পড়িতেছে। সৎরঞ্চ খেলা চতুরঙ্গ বলে যুদ্ধ। কিন্তু এই খেলার বর্তমান ব্যূহে রাজার পার্শ্বে উল্লিখিত বিন্যাস নয়। বোধ হয়, প্রাচীন খেলা পরিবর্তিত হইয়াছে। যেটা রথ, সেটা ফার্সীতে পড়া হইয়াছিল 'রোখ'। 'রোখ' ইংরেজীতে হইল 'রূক'। আশ্চর্য ভ্রম বটে, কোথায় রথ, আর কোথায় নৌকা! ইংরেজীতে 'কাসেল' বলিয়া বরং রথের সাদৃশ্য রাখিয়াছে। পরে কিন্তু সংস্কৃতেও রথ স্থানে নৌকা হইয়াছিল এবং বোধ হয়, নদীনালার দেশে যেমন পূর্ববঙ্গে ইহার উৎপত্তি। জিজ্ঞাসু পাঠক রঘুনন্দনের তিথিতত্ত্বে কিংবা শব্দকল্পদ্রুমে "চতুরঙ্গম্ অক্ষক্রীড়ায়াং ব্যাসযুধিষ্ঠিরসংবাদাং" দেখিতে পারেন।

১৪ এইরূপ মনু (৭।১৮৭), কামন্দক, ইত্যাদি। যে দিকে ভয়, সে দিকে সেনা বিস্তার করিবে, অগ্নিপুরাণের এই অংশ প্রায় অবিকল কামন্দকে আছে।

১৫ কূট যুদ্ধ—শত্রু যখন অসাবধান কিংবা অসমর্থ, তখন তাহাকে আক্রমণ। নিদ্রিত বা পরিশ্রান্ত শত্রুবধ ন্যায়যুদ্ধ নয়। মহাভারতে কূট যুদ্ধ নিন্দিত, এবং অল্প ঘটিয়াছিল। কৌটিল্য কূট যুদ্ধ-নীতির প্রদর্শক। অগ্নিপুরাণ ভাষাতেও কামন্দক অনুসরণ করিয়াছেন। মনুও শত্রু

ও ইহাদের ভূমি এবং বহুবিধ ব্যূহ বর্ণিত হইয়াছে। অন্য এক অধ্যায় (২৩৬) হইতে সংক্ষেপ করিতেছি। পুষ্কর বলিলেন, "যোধসংখ্যা অল্প হইলে তাহাদিগকে সংহত করিয়া যুদ্ধ করাইবেন, বহু হইলে যথেচ্ছ বিস্তার করিবেন। বহুর সহিত অল্পের যুদ্ধে সূচীমুখ অনীক (বল বিন্যাস) কল্পনা করিবেন। বূহ দ্বিবিধ—প্রাণীর অঙ্গরূপ ও দ্রব্যরূপ ; যথা, গরুড়, মকর, শ্যেন, চক্র, অর্ধচন্দ্র, বজ্র, শকট, মণ্ডল, সর্বতোভদ্র, সূচী। সকল প্রকার ব্যূহে পাঁচ স্থানে সৈন্য কল্পনা—দুই পক্ষ (বা পার্শ্ব), দুই অনুপক্ষ (বা কক্ষ), এবং পঞ্চম উরঃ[১৬]। যদি একের দ্বারা না হয়, দুই ভাগে যুদ্ধ করিবে। তাহাদের রক্ষার্থ তিন ভাগ স্থাপন করিবে। রাজা স্বয়ং ব্যূহ কল্পনা ও যুদ্ধ করিবেন না। সৈন্যের পশ্চাৎ এক ক্রোশ দূরে থাকিবেন। গজের পাদ রক্ষার্থ চারি রথ, রথ রক্ষার্থ চারি অশ্ব, অশ্ব রক্ষার্থ চারি ধন্বী, এবং ধন্বীরক্ষার্থ চর্মী নিয়োগ করিবেন। অগ্রে চর্মী, পশ্চাৎ ধন্বী, পশ্চাৎ অশ্ব, পশ্চাৎ রথ, পশ্চাৎ গজসৈন্য স্থাপন করিবেন। শূরদিগকে সম্মুখে স্থাপন করিবেন। ভীরুদিগকে পশ্চাতে। রণভূমি হইতে সংহত ও হতদিগের অপনয়ন, আয়ুধ আনয়ন ও গজের প্রতিযুদ্ধ ও জলদানাদি, পত্তিকর্ম। রিপুর ভেদ ও স্ব-সৈন্যের রক্ষা ও সংহতের ভেদন, চর্মিকর্ম। যুদ্ধে বিমুখীকরণ, এবং সংহত বলের দূরে অপসারণ ও গমন, ধন্বিকর্ম। রিপুসৈন্যের ত্রাসন, রথকর্ম। সংহতের ভেদন, এবং ভিন্নের সংহতি, এবং প্রাকার, তোরণ, অট্টাল (প্রাকারের উপরিস্থ উচ্চ গৃহ, এখানে সেনা লুক্কায়িত থাকিয়া শর নিক্ষেপ করিত) ও দ্রুমভঙ্গ, গজকর্ম। পত্তির ভূমি বিষম, রথ ও অশ্বের ভূমিসম, এবং গজের ভূমি সকর্দম। এইরূপে ব্যূহ রচনা করিয়া দিবাকরকে পশ্চাতে রাখিয়া অনুকূল শুক্র, শনি, দিকৃপাল ও মৃদু মারুতে নাম গোত্র (নাম ও সংজ্ঞা) ও অবদান নির্দেশপূর্বক যোধগণকে উত্তেজিত

নিপাত নিমিত্ত তাঁহার অন্নজলে বিষ মিশ্রিত করিতে বলিয়াছেন, কিন্তু বিষ-দিগ্ধ বাণ-প্রয়োগ নিষেধ করিয়াছেন। বোধ হয়, দুই কালের দুই মনু।

[১৬] এই পাঁচ প্রধান। উরসের সম্মুখে মূর্ধা, পশ্চাতে জঘন। রামচন্দ্র সপ্ত স্থানে বানর-সেনা সন্নিবেশ করিয়া রাবণের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন। এইরূপ কামন্দকে। বোধ হয় নরাকার সাদৃশ্যে সপ্ত কল্পনা।

করিবেন। যাতে শত্রুগণের মোহ জন্মে, এরূপ ধূপ ও পতাকা ও বাদিত্রের ভয়াবহ সম্ভার করিবেন [১৭]।"

বহু পূর্বকাল হইতে একাল পর্যন্ত সাম, দান, ভেদ, দণ্ড, এই চতুর্বিধ উপায়ের দ্বারা রাজা রাজ্যশাসন করিয়া আসিতেছেন। অন্তঃকোপ ও বাহ্যকোপ প্রশমনের এই চারি উপায়। সাধুজনের প্রতি সাম, সকলের প্রতি সপৌরুষে দান, পরস্পর ভীত ও সংহতের প্রতি ভেদ এবং উক্ত উপায়ত্রয়ে অদম্যকে দণ্ড প্রয়োগ, নীতিজ্ঞদিগের মত। বহিঃশত্রু শাসন করিতেও এই চারি উপায়। শেষ উপায় যুদ্ধরূপ দণ্ড। কালক্রমে কিন্তু 'মায়া,' 'উপেক্ষা' ও 'ইন্দ্রজাল' অন্য তিন উপায় গণ্য হইয়াছিল। শত্রু দুর্বল, অনিষ্ট করিতে পারিবে না, বুঝিলে উপেক্ষা। আর রণ-স্থলে শত্রুকে উদ্বেজিত করিবার নিমিত্ত মায়া ও ইন্দ্রজাল, যুদ্ধ-জয়ের আনুষঙ্গিক দুই উপায় হইয়াছিল। কৌটিল্য ও কামন্দক এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, অগ্নিপুরাণও ছাড়েন নাই। পুষ্কর বলিলেন (২৩৪ অঃ), "অধুনা মায়া উপায় বলিব। বিবিধ মিথ্যা উৎপাতের

---

১৭ চতুরঙ্গের যোগ্য যুদ্ধভূমি ও প্রত্যেকের কর্ম কৌটিল্যে ও কামন্দকে বিস্তারিত আছে। পদাতির মধ্যে 'বিষ্টি' বা বেঠি (বেগার) থাকিত। তাহারা পথ ঘাট বাঁধা, কূপ খনন, অশ্বাদির ঘাস সংগ্রহ করিত। মনুও (৭।১৯২) একটি শ্লোকে লিখিয়াছেন। ব্যূহ-কল্পনায় অগ্নিপুরাণ, মাকন্দক আশ্রয় করিয়াছেন। কিন্তু গজাশ্বাদির পৃথক পৃথক ব্যূহ ছাড়িয়া গিয়াছেন। সংগ্রামনীতিতে কামন্দক কৌটিল্যের শিষ্য। জীবানন্দ-বৃত কামন্দকের সংস্করণ অশুদ্ধ। এই হেতু কৌটিল্য হইতে লিখিতেছি। "পদাতির শ্রেণীতে পরস্পর ব্যবধান থাকিবে ১ 'শম' (১৪ আঙ্গুল বা ১০ ইঞ্চি), অশ্বের শ্রেণীতে ৩ শম (৩০ ইঞ্চি), রথশ্রেণীতে ৪ শম (৪০ ইঞ্চি), গজশ্রেণীতে ৮ বা ১২ শম। চতুরঙ্গ বলের যাহাতে প্রত্যেকের ঘোরা ফেরা করিতে সম্বাধ না হয়, তাহা অবশ্য দেখিতে হইবে। বলগুলি মিশাইয়া গেলে সঙ্কুলাবহ সঙ্কর ঘটিবে। এক ধন্বীর এক ধনু পশ্চাতে অপর ধন্বী, এক অশ্বের তিন ধনু পশ্চাতে অপর অশ্ব, এক রথ বা গজের পাঁচ ধনু পশ্চাতে অপর রথ বা গজ। পক্ষ কক্ষ ও উরঃ স্থানের অনীক (সেনাদল) পৃথক রাখিতে তাহাদের মধ্যে পাঁচ ধনু অন্তর থাকিবে। এক অশ্বের প্রতি-যোদ্ধা তিন পদাতি, এক রথ কিংবা এক গজের প্রতি-যোদ্ধা পাঁচ অশ্ব, কিংবা পনর পদাতি থাকিবে; এবং ইহাদের এত এত জন পাদরক্ষক থাকিবে। প্রতি অনীকে তিনটি রথ লইয়া নয়টি রথ ব্যূহের উরঃস্থানে ও প্রত্যেক পক্ষে ও কক্ষে থাকিবে। অতএব রথব্যূহে ৫ × ৯ = ৪৫

(প্রকৃতির বিপরীত ব্যাপার) দ্বারা শত্রুর উদ্বেগ উৎপাদন করিবে। বিপুল উল্কা করিয়া স্থূল পক্ষীর পুচ্ছে বাঁধিয়া রাত্রিকালে শত্রু-শিবিরে ছাড়িয়া দিবে। এইরূপে উল্কাপাত দেখাইবে। বিবিধ কুহক (ইন্দ্রজাল) দ্বারা শত্রুর উদ্বেজন করিবে। রাজা ইন্দ্রজাল দ্বারা দেখাইবেন যে, তাঁহার সাহায্যার্থ দেবতারা চতুরঙ্গ বলে আসিয়াছেন। প্রদর্শনান্তে রিপুর মস্তকে রক্ত-বৃষ্টি এবং প্রাসাদের অগ্রে রিপুর ছিন্ন মস্তক প্রদর্শন করিবেন।" কামন্দক লিখিয়াছেন, "সুষির দেবতা-প্রতিমা ও স্তম্ভ মধ্যে নর লুক্কায়িত হইয়া এবং রাত্রিকালে পুরুষ স্ত্রী-বস্ত্র পরিয়া অদ্ভুত দর্শন করাইবে। বেতাল, পিশাচ ও দেবতার রূপ ধারণ ইত্যাদি মানুষী মায়া; ইচ্ছানুসারে নানারূপ-ধারণ, অস্ত্র-শস্ত্র-পাষাণ-মেঘ-অন্ধকার-বৃষ্টি-অগ্নি-প্রদর্শন, ছিন্ন-পাটিত-ভিন্ন-সৈন্য-প্রদর্শন ইত্যাদি ইন্দ্রজাল দ্বারা শত্রুর ভয়ের নিমিত্ত উপকল্পনা করিবে।"

এইখানে অগ্নিপুরাণের ধনুর্বেদ ও সংগ্রাম-নীতি শেষ করি। ইহাতে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। (১) ধনুর্বেদে কেবল ধনুর্বিদ্যা থাকিত না। প্রাচীনকালের জ্ঞাত যাবতীয় অস্ত্র-শস্ত্রের প্রয়োগ শিক্ষা থাকিত। (২) এই

রথ, ৫ × ৪৫ = ২২৫ অশ্ব, ২২৫ × ৩ = ৬৭৫ পদাতি; এবং এত জন পাদরক্ষক থাকিবে। এইরূপ গজব্যূহ। অশ্ব, গজ, রথ একত্রে যে ব্যূহ, তাহা 'মিশ্র'। ব্যূহ বিকল্পের সংখ্যা ছিল না। মহাভারতে ক্রৌঞ্চ (কোঁচ বক), গরুড়, চক্র বা মণ্ডল, বজ্র, শকট, অর্ধচন্দ্র, মকর, সর্বতোভদ্র, প্রভৃতির উল্লেখ আছে। প্রথম দিন যুদ্ধের পূর্বে যুধিষ্ঠির অর্জুনকে বলিলেন, দেখ, আমাদের সৈন্য অল্প। বৃহস্পতি বলিয়াছেন, সৈন্য অল্প হইলে সূচী-ব্যূহ করিবে। অর্জুন কিন্তু অচল দুর্জয় বজ্র-ব্যূহ রচনা করিলেন। এই ব্যূহে ভয়ের লেশ নাই, কারণ চারিদিকেই মুখ ইত্যাদি। এইসকল নাম চিরদিন চলিয়া আসিয়াছে। মহাভারতে দেখিতেছি, বৃহস্পতি রাজনীতি ও সমরনীতি শাস্ত্র লিখিয়াছিলেন। কৌটিল্য ব্যূহের চারি প্রকৃতি (প্রকার) ধরিয়াছেন। যথা—দণ্ড, ভোগ (সর্প), মণ্ডল, ও অসংহত (পৃথক পৃথক)। দণ্ড-ব্যূহে সেনা পাশে পাশে দাঁড়াইবে; এই সেনা 'তির্যক্‌বৃত্তি' বাম কিংবা দক্ষিণে চলিতে পারিবে। ভোগ-ব্যূহে সেনা পশ্চাৎ পশ্চাৎ দাঁড়াইবে। এই সেনা 'অন্বাবৃত্তি' পশ্চাৎ হইতে অগ্রে সর্পাকারে চলিতে পারিবে। মণ্ডল-ব্যূহে চক্রাকারে দাঁড়াইবে, এবং চক্রাকারে চলিতে পারিবে। অসংহত ব্যূহে সেনা পৃথক পৃথক চলিতে পারিবে। এই চারির অমিশ্র ও মিশ্রভেদে সকল প্রকার ব্যূহের উৎপত্তি। শুক্রনীতিসারে আট প্রকার ব্যূহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে।

সকল অস্ত্র-শস্ত্রের মধ্যে অগ্নিপুরাণে বন্দুক, কামানের নামও নাই। সেকালে জানা থাকিলে এই সাংঘাতিক অস্ত্রের নাম অবশ্য থাকিত। ধূপ বা খ-ধূপ (হাউই) জানা ছিল। ভট্টিকাব্যেও (৩।৫) ইহার উল্লেখ আছে [১৮]। এই খ-ধূপ, বন্দুকের পূর্বজ।

অগ্নিপুরাণ সংহিতাগ্রন্থ। ইহাতে বর্ণিত পরা ও অপরা বিদ্যা, নানাকালে রচিত নানাশাস্ত্র হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। এই হেতু পুরাণের কাল নির্ণয়ের দ্বারা ধনুর্বেদের কাল নির্ণয় হইতে পারে না। সকল বিষয়ের কালের পূর্ব সীমা এক নয়, পর সীমা আরও অনির্দেশ্য। আরও এক অসুবিধা আছে। অগ্নিপুরাণে ভাগবতপুরাণ মতে ১৫৪০০, নারদপুরাণ মতে ১৫০০০, এবং বঙ্গবাসী-মুদ্রিত অগ্নিপুরাণের শেষ অধ্যায় মতে ১৫০০০ শ্লোক থাকিবার কথা। কিন্তু এই সংস্করণে বোধ হয় ১২০০০ শ্লোক আছে। এবং আশ্চর্য এই, এই সংস্করণের ২৭২ অধ্যায়েও অগ্নিপুরাণের এই শ্লোক-সংখ্যা লিখিত আছে। অতএব প্রাচীন পুরাণের ৩০০০ শ্লোক বহুকালপূর্বে লুপ্ত হইয়াছে।

সংগ্রাম-নীতি ও ধনুর্বেদ পৃথক করিলে দেখি, প্রথমটির বক্তা শ্রীরাম ও পুষ্কর। শ্রীরাম লক্ষ্মণকে কখন্ কোথায় সংগ্রাম-নীতি শিখাইয়াছিলেন, এবং পুষ্করই-বা কে, বলিতে পারি না। কিন্তু দেখিতেছি, শ্রীরাম কামন্দকের সংক্ষেপ করিয়াছেন। পুষ্করও মায়া ও ইন্দ্রজাল প্রদর্শনে কামন্দককে অনুসরণ করিয়াছেন। কামন্দক সংগ্রাম-নীতিতে কৌটিল্যের ভাষা পর্যন্ত গ্রহণ করিয়াছেন। কামন্দকের কাল প্রথম খ্রীস্ট-শতাব্দ ধরা যাইতে পারে। অতএব অগ্নিপুরাণের সংগ্রাম-নীতি ইহার পরে সঙ্কলিত হইয়াছিল।

ধনুর্বেদ অগ্নির উক্তি, কিন্তু অসম্পূর্ণ। ধনু, জ্যা, শরকাণ্ড যদি-বা কিছু আছে, শরের ফল সম্বন্ধে কিছুই নাই। বর্ম ও চর্ম ও তৎকালে প্রচলিত অস্ত্র-শস্ত্রের লক্ষণ নাই। আছে কেবল খড়্গের, এবং তাহা এক পৃথক অধ্যায়ে। যে তিন সহস্র শ্লোক লুপ্ত হইয়াছে, বোধ হয়, সেই লুপ্ত শ্লোকের কিয়দংশে এই

---

১৮ উল্কাং প্রচক্রুন গরস্ত মার্গান্ ধ্বজান্ ববন্ধুর্মুমুচুঃ খধূপান্—মুমুচুঃ খধূপান্ আকাশে ঘটিকাদিভির্ধূপান্ মুমুচুঃ প্রমুক্তবন্তঃ—জয়মঙ্গল টীকা। হাউইর নল-কে ঘটিকা বলা হইয়াছে।

সকল বিষয় ছিল। নানাকারণে মনে হয়, মূল অগ্নিপুরাণ পঞ্চম খ্রীস্ট-শতাব্দে রচিত হইয়াছিল।

কোন্ কালে বর্তমান অগ্নিপুরাণ সঙ্কলিত হইয়াছিল? দেখিতেছি সেকালে কুব্জিকা তন্ত্র, ত্বরিতা তন্ত্র, অন্যান্য তান্ত্রিক বিদ্যা, যুদ্ধ জয়ার্ণব (১২৪ অ:) ও পঞ্চস্বরা শাস্ত্রের প্রতি লোকের প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। যুদ্ধ-যাত্রার পূর্বে শ্মশানবাসিনী চামুণ্ডার পূজা, ডাকিনী ও চতুঃষষ্টি যোগিনী সন্তুষ্ট করা হইত। ত্রৈলোক্যবিজয় বিদ্যা, সংগ্রামবিজয় বিদ্যা প্রভৃতির ফলদাতৃত্বে এত বিশ্বাস ছিল যে, আশ্চর্য হইতে হয়। শাকুন ও সুনিমিত্ত-বিচার বহুপূর্বকাল হইতে চলিয়া আসিতেছিল। ইহার উৎপত্তি বুঝিতে পারি। জয় কি পরাজয়, কত অর্থ ও লোকক্ষয়, নিজের দুর্গতি ও প্রাণহানির সম্ভাবনা যেখানে থাকে, সেখানে চিন্তাকুলিত চিত্তে বাহিরের সুলক্ষণ, সিদ্ধির আশা জাগাইয়া উৎসাহ বৃদ্ধি করে। কিন্তু আত্মবলে ও পুরুষকারে প্রত্যয় না হারাইলে কেহ দৈববলকে সিদ্ধির সহায় মনে করে না। কোনো একটায় দৃঢ় বিশ্বাস ছিল না; এটা ওটা সেটা, যেটা পাওয়া গিয়াছে, সব আশ্রয় করিয়া দিগ্‌বিজয়ে যাত্রায় দৃঢ়সংকল্পের অভাব মনে হয়। এ যে বাংলা পাঁজির যাত্রিক দিন নিরূপণ! মহাভারত-রামায়ণের সময়ে কিন্তু জাতির এই শোচনীয় দুর্গতি ঘটে নাই। মৎস্যপুরাণেও পৌরুষের প্রশংসা। কৌটিল্য লিখিয়াছেন, "যে নির্বোধ সর্বদা নক্ষত্র দেখে, তাহার নিকট হইতে অর্থ দূরে চলিয়া যায়, অর্থই অর্থের নক্ষত্র, তারকা কি করিবে?" ভীরুর নিকট ব্যূহ-রচনায় বুদ্ধির তাৎপর্য প্রধান মনে হইয়াছিল। কিন্তু ফলে, সেনা সংহত হওয়াও অনিবার্য। তখন সংহতি ভাঙিবার প্রয়োজন হইত। গজের প্রতি অটল বিশ্বাস মহাভারতে ছিল না, কৌটিল্যেও নাই। কামন্দক তাঁহার নীতিসারের শেষ শ্লোকে লিখিয়াছেন, "মদসত্ত্বগুণযুক্ত একটি গজরাজ শত্রু-অনীককে বধ করিতে পারে। নৃপতির বিজয় গজের উপরই নিবদ্ধ, অতএব তিনি সর্বদা গজবল অধিক রাখিবেন।" বোধ হয়, কামন্দকের দেশ গজের দেশ ছিল। কিন্তু গজরাজ যত শিক্ষিত বা পদাতির দ্বারা রক্ষিত হউক, পশুমাত্র। সেনা-নায়ক গজারোহী উচ্চস্থ হইলে সহজে শত্রুর সাক্ষাৎ হইয়া পড়েন। গজে

গজে, রথে রথে, অশ্বে অশ্বে, যুদ্ধের নিয়ম ছিল। কিন্তু বিদেশীর সহিত যুদ্ধে সে নীতি নিষ্ফল। তা ছাড়া গজ-ভূমি সর্বত্র নাই, রথ-ভূমিও নাই। গজ ও রথে সুবিধা এই, যোদ্ধাকেই অস্ত্র বহিতে ও বাহন চালাইতে হয় না। পরে, রথযুদ্ধ হ্রাস পাইয়াছিল। রাজা হর্ষবর্ধনের (৭ম খ্রীস্ট শতাব্দ) অশ্ব, গজ ও পদাদি ছিল, বোধ হয়, তাঁহার রথ ছিল না। শুক্রনীতিসারে, সৈন্য পদাদি-বহুল, অশ্ব মধ্যম, গজ অল্প রাখিতে বলা হইয়াছে। চতুর্বল ব্যতীত নৌ-বল ছিল। নদী-বহুল স্থানে নৌসেনা আবশ্যক হইত। বঙ্গে (পূর্ববঙ্গে) রথ-ভূমি নাই। রথের পরিবর্তে নৌ-বল আবশ্যক হইত। কিন্তু যে বলই হউক, বলাধ্যক্ষের গুণেই জয়। কত রাজা যুদ্ধনীতি অগ্রাহ্য করিয়া স্বয়ং অগ্রণী হইয়া প্রাণ হারাইয়াছেন, ইতিহাসেও তাহার উল্লেখ আছে।

অগ্নিপুরাণের ফল-জ্যোতিষ দেখিলে ইহার সংগ্রহ-কাল ষষ্ঠ খ্রীস্ট-শতাব্দের পরে এবং অষ্টম শতাব্দের পূর্বে, মোটামুটি সপ্তম শতাব্দ মনে করা যাইতে পারে। দশাবতার প্রতিমা-বর্ণনা ও অলঙ্কার শাস্ত্র অগ্নিপুরাণে আছে। কিন্তু সপ্তম শতাব্দে এই এই আকারে ছিল না, বলিবার দৃঢ় প্রমাণ নাই।

৪. বাশিষ্ঠ ধনুর্বেদ

এখন বাশিষ্ঠ-ধনুর্বেদ-সংহিতা দেখি। এখানি শ্লোকে রচিত। ব্যাখ্যার নিমিত্ত দুই-এক স্থানে গদ্যও আছে। আরম্ভ গদ্যে, যথা—"অথ একদা বিজয়কামী রাজর্ষি বিশ্বামিত্র গুরু বশিষ্ঠ নিকটে গিয়া তাঁহাকে প্রণাম পূর্বক বলিলেন, 'হে ভগবন্, দুষ্ট শত্রু বিনাশের নিমিত্ত ধনুর্বেদ বলুন।' মহর্ষি-প্রবর বশিষ্ঠ বলিলেন, 'ভো রাজন্ বিশ্বামিত্র, শুনুন। ভগবান্ সদাশিব যে রহস্য-সহিত ধনুর্বিদ্যা পরশুরামকে বলিয়াছিলেন, গো-ব্রাহ্মণ-সাধু-বেদ-সংরক্ষণ ও তোমার হিতের নিমিত্ত বলিতেছি। ইহা যজুর্বেদ ও অথর্ববেদ-সম্মত সংহিতা'।"

এখানে একটা খট্‌কা আসিতেছে। গাধিসুত বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের নিকট ধনুর্বেদ শিখিতেছেন? রামায়ণে (আদি ৫৫।৫৬) দেখি, বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের

সহিত বৈরিতা করিয়াছিলেন, এবং তপস্যায় তুষ্ট করিয়া মহাদেবের নিকট নানাবিধ অস্ত্র-শস্ত্র পাইয়াছিলেন। বশিষ্ঠ, ধনুর্বেদ-শাস্ত্রজ্ঞের অগ্রগণ্য ছিলেন। ইহাও স্মর্তব্য, বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র, দুই গোত্রের নাম। কিন্তু এই সংহিতায় বশিষ্ঠের নাম আর পাই না। আরম্ভের এই গল্পটুকু পরে যোজিত বোধ হয়। এই সংহিতায় কেবল ধনুর্বিদ্যা লিখিত হইয়াছে, ধনুর্বাণ ব্যতীত অন্য আয়ুধের বর্ণনা কিংবা তদ্দ্বারা যুদ্ধ সম্বন্ধে কিছুই লিখিত নাই।

এখানে প্রথম কিয়দংশ অনুবাদ করি। "ধনুর্বেদের চারিটি পাদ। প্রথম পাদে দীক্ষা, দ্বিতীয়ে ধনুঃশর-সংগ্রহ, তৃতীয়ে অভ্যাস, চতুর্থে প্রয়োগ-বিধি। আয়ুধ চতুর্বিধ। হস্তমুক্ত, যেমন চক্র; হস্ত-অমুক্ত, যেমন খড়্গ; হস্ত মুক্ত-অমুক্ত, যেমন কুন্ত (কোঁচ); যন্ত্র-মুক্ত, যেমন শর। যুদ্ধ সাত প্রকার—ধনুর্যুদ্ধ, চক্রযুদ্ধ, কুন্তযুদ্ধ, খড়্গ-যুদ্ধ, ছুরিকা-যুদ্ধ, গদাযুদ্ধ, বাহুযুদ্ধ। [এখানে বন্দুক-যুদ্ধের নাম নাই।] ধনুর্বেদের গুরু ব্রাহ্মণ। ধনুর্বেদে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের অধিকার আছে। শূদ্রের যুদ্ধাধিকার আছে. কিন্তু নিজেরা শিখিয়া লইবে। [এই শ্লোকটি অবিকল অগ্নিপুরাণে আছে।] আচার্য ব্রাহ্মণকে ধনুঃ, ক্ষত্রিয়কে খড়্গ, বৈশ্যকে কুন্ত, এবং শূদ্রকে গদা দিবেন [১৯]। যে গুরু সপ্ত প্রকার যুদ্ধ জানেন, তিনি আচার্য; যিনি চারি প্রকার জানেন, তিনি ভার্গব; এবং যিনি এক প্রকার যুদ্ধ জানেন, তিনি গণক।" ইহার পর তিথি, নক্ষত্র, বার ও শিষ্যের জন্মরাশি দেখিয়া দীক্ষাকাল-নির্ণয়। দীক্ষার সময়, শঙ্কর কেশব ব্রহ্মা ও গণপতিকে তান্ত্রিক বীজে ধ্যান।

ধনু ও শর সম্বন্ধে উপদেশ কিছু কিছু উদ্ধৃত করিতেছি। 'চাপ দুই প্রকার—শিক্ষার নিমিত্ত যৌগিক চাপ; আর যুদ্ধের নিমিত্ত যুদ্ধ-চাপ'

১৯ যদি ধনুর্বেদে শূদ্রের অধিকার না থাকে, তাহা হইলে আচার্য শূদ্রকে গদাই বা দেন কোন্ বিধানে? ব্রাহ্মণকে ধনুঃ? ইহা সম্পূর্ণ নূতন! আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে পাই, সংগ্রামে যাত্রার পূর্বে পুরোহিত রাজাকে বর্ম পরিধান করাইয়া ধনুঃশর দিবেন। ক্ষত্রিয়ের মৃত্যুর পর তাহার শবের সহিত ধনুঃশর দেওয়া হইত। মনু প্রভৃতি স্মৃতিকার, ব্রাহ্মণকে যুদ্ধাধিকার দেন নাই। আপাৎকালের বিধি স্বতন্ত্র।

[চপ—বংশ নির্মিত বলিয়া চাপ।] কেমন বাঁশ? "অপক্ব, অতিজীর্ণ, জ্ঞাতি-ঘৃষ্ট (অন্য বাঁশ দ্বারা ঘৃষ্ট), দগ্ধ ছিদ্রযুক্ত, গলগ্রন্থি ও তলগ্রন্থি হইবে না। চাপের পরিমাণ এক ধনু=চারি হাত। শিবের ধনু সাড়ে পাঁচ হাত। বিষ্ণুর ধনু শৃঙ্গের, দীর্ঘে সাড়ে তিন হাত। গজারোহী, অশ্বারোহী শৃঙ্গের ধনু, এবং রথী ও পদাতি বাঁশের ধনু দ্বারা যুদ্ধ করিবে। লোহ, শৃঙ্গ ও কাষ্ঠ এই ত্রিবিধ দ্রব্যে ধনু নির্মিত হয়। স্বর্ণ, রজত, তাম্র এবং কৃষ্ণ-আয়স দ্বারা নির্মিত ধনু লোহ-ধনু। মহিষ, শরভ, ও রোহিত, ইহাদের শৃঙ্গে, শৃঙ্গ-ধনু। চন্দন, বেত্র, ধন্বন্, সাল, শাল্মলী, শাক, ককুভ. বংশ, অঞ্জন, এই কাষ্ঠ হইতে কাষ্ঠ-ধনু নির্মিত হয়।"

এই ধনুর্দ্রব্য অবিকল অগ্নিপুরাণে আছে। সোনা, রূপা, তামা দিয়া ধনু হইতে পারে না। ইস্পাতের ধনু হইতে পারে, এবং বোধ হয়, তাহা সোনা, রূপা, তামা দ্বারা অলঙ্কৃত হইত। এইরূপ বংশ ও দারুনির্মিত ধনু স্বর্ণাদি দ্বারা অলঙ্কৃত হইত। মহিষের শৃঙ্গ ৮।৯ ফুট দীর্ঘ পাওয়া যায়। সুতরাং সাড়ে তিন হাত শার্ঙ্গ ধনু হইতে পারে। রোহিত ও রোহিষ মৃগ এক। অগ্নিপুরাণে রোহিষ আছে। লোহিত বর্ণ বলিয়া এই নাম। ইহার শৃঙ্গ ৪।৫ ফুট লম্বা হয়। শরভ এক অদ্ভুত মৃগ। এই সংহিতায় লিখিত আছে, "ইহার পা আটটি। তাহার মধ্যে চারিটি ঊর্ধ্বদিকে। ইহার শিং লম্বা। জন্তুটিও উটের ন্যায় উঁচু। বনে থাকে, এবং কাশ্মীর দেশে প্রসিদ্ধ।" মৃগের অষ্টপাদ নিশ্চয়ই কল্পিত। শরভ নামে এক জন্তু পূর্বকালে প্রসিদ্ধ ছিল। ইহার উল্লেখ মহাভারতে আছে। ইহার মুখ নাকি সিংহের তুল্য ভীষণ, এবং ইহার নিকট সিংহও নাকি পরাজিত হয়। এটি যে কি জন্তু, তাহা নিশ্চয় করা কঠিন। ইংরেজী 'বাইসন' মনে হয়। বোধ হয়, কাশ্মীর দেশের দুর্গম বনাচ্ছন্ন পর্বতে এই মৃগ বাস করিত, এবং যাহারা ইহার শিং আনিয়া বিক্রয় করিত, তাহারা মূল্যবৃদ্ধির অভিপ্রায়ে মৃগ অষ্টপাদ বলিয়া গল্প করিত। অতিশয় দ্রুত ধাবিত হয় বলিয়াও অষ্টপাদ মনে হইয়া থাকিবে। অবশ্য মৃগ অর্থে হরিণ নয়। রোহিষ ও শরভ যে মৃগ হউক, তাহাদের শৃঙ্গ নিশ্চয় মহিষ-শৃঙ্গের ন্যায় সুষির। সুশ্রুতে শরভ মাংসের গুণ বর্ণিত আছে। কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতেও শরভ আছে। কালিকা-

পুরাণে বরাহ ও শরভ-যুদ্ধ বর্ণিত আছে, যদিও সেটা দক্ষযজ্ঞের ন্যায় আকাশে হইয়াছিল। রোহিষ ছাগবিশেষ মনে হয়। শিং চিরিয়া ছোট ছোট খণ্ড জুড়িয়াও শার্ঙ্গ ধনু করা হইত। কাষ্ঠের মধ্যে কেমন করিয়া চন্দনের ও সালের ধনু হইতে পারে, তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে না। বরং পাতল, শিমুল, সেগুন (শাক) ও অর্জুন (ককুভ) কাঠের ধনু হইতে পারে। কিন্তু অর্জুন-কাঠ ফাটিয়া যায়, চন্দন কাঠ ভঙ্গুর। চন্দন শব্দে শ্বেতচন্দন না হইতে পারে। বকম গাছকেও চন্দন ধরা হইত। বোধ হয়, এইসকল কাঠ দিয়া মহা-যন্ত্র বা ক্ষেপণী নির্মিত হইত। বেত ও বাঁশের ধনু প্রসিদ্ধ। ধন্বন্, বাংলা ও ওড়িয়াতে ধামন্। ইহার কাঠ স্থিতিস্থাপক এবং ইহাতে কাঁধে ভার বহিবার বাঁক বা বাঙ্গি হইয়া থাকে। অঞ্জন গাছ বুঝিতে পারিলাম না।[২০] যুদ্ধের ধনু যে বাঁশের হইত, তাহা উপরে দেখা গিয়াছে। কৌটিল্যে ধনুর্দ্রব্য দুই, কাষ্ঠ ও শৃঙ্গ। তাল কাঁড়ির ধনু কার্মুক, চপ-বাঁশের ধনু কোদণ্ড, দারু—টীকাকার মতে ধন্বন্—ধনুর নাম দ্রূণ, এবং শৃঙ্গ ধনুই ধনু। কার্মুক কোদণ্ড, দ্রূণ, ধনু, দ্রব্যানুসারে নাম কি না সন্দেহ।

এখন ধনুর্গুণের কথা। "ইহা পট্টসূত্রে কনিষ্ঠাঙ্গুলের তুল্য স্থূল করিবে। অভাবে হরিণ ও মহিষের স্নায়ুর দ্বারা কিংবা তৎকালহত ছাগের তন্তু দ্বারা করিবে। বিশেষতঃ পাকা বাঁশের চেয়াড়ির দুই মুখে পাটের সুতা দ্বারা ধনুতে বাঁধিবে। ইহা দৃঢ়, স্থায়ী ও সর্বকর্মসহ। এইসকল ব্যতীত আকন্দগাছের ছালের অংশু প্রশস্ত। ভাদ্র মাসে অংশু বাহির করিবে[২১]।

২০ বঙ্গানুবাদক শাস্ত্রী মহাশয় অঞ্জন শব্দে কুলগাছ বুঝিয়াছেন। কিন্তু কুল (বদরী) কাঠের ধনু টিকিবে না। অঞ্জন কুলঞ্জন হইতে পারে। এটি হরিদ্রাদিবর্গের গাছ, কিন্তু ইহার ডাঁটা হিন্তালের মতন মোটা হয়। ইদানী কেহ কেহ ফুলের বাগানে বসাইয়া থাকেন।

২১ শেষে এক শ্লোকার্ধে আছে। সেটা অগ্নিপুরাণের পাশ-অস্ত্রের গুণ। এখানে কেমন করিয়া আসিয়াছে, কে জানে। বোধ হয়, না বুঝিয়া সঙ্কলনের ফল। উপরের পট্টসূত্রের গুণ করিতে বলা হইয়াছে। ইহা খেলার ধনুর হইতে পারে। কৌটিল্যে আছে, মূর্বা, অর্ক (আকন্দ), শণ, গবেধু (গড়গড়া-ধান), বেণু (বাঁশ), স্নায়ু। বশিষ্ঠ-সংহিতায় তালের ধনু নাই, মূর্বার জ্যাও নাই। অগ্নিপুরাণেও নাই। ধনুর বৃক্ষগুলি দেখিলে বোধ হয়, অগ্নিপুরাণ ও এই সংহিতার দেশ মধ্যভারত ছিল।

এখন শর-লক্ষণ। "শরৎকালে সুপ্রদেশ-জ শরগাছ আহরণ করিবে। পূর্ণগ্রন্থি [যাহার গাঁঠ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে], সুপক্ব, পাণ্ডুর বর্ণ, কঠিন বর্তুল, ঋজু, কনিষ্ঠ অঙ্গুলির তুল্য স্থূল, দুই হাত কিংবা কিঞ্চিৎ ন্যূন হইবে। শরের পক্ষ ছয় অঙ্গুলি পরিমিত হইবে। কাক, হংস, শশাদ (শ্যেন), মৎস্যাদ (মাছরাঙা), ক্রৌঞ্চ (কোঁচবক), ময়ূর, গৃধ্র ও কুরব (কুরল), ইহাদের পক্ষ সুশোভন হয়। শার্ঙ্গধনুর পক্ষ দশাঙ্গুল পরিমিত। প্রত্যেক শরে চারিটি করিয়া পক্ষ স্নায়ু বা তন্তুর দ্বারা দৃঢ়রূপে বদ্ধ করিবে।"

এখন ফল-লক্ষণ। "দেশভেদে ফলের নানা রূপ হইয়া থাকে। আরামুখ [মুচীর চর্মবেধনী সূচ্যাকার 'আরা'] দ্বারা চর্মছেদন [? বেধন ?], ক্ষুরপ্র [খুরপা] দ্বারা শর কর্তন বা বাহু কর্তন, গোপুচ্ছ দ্বারা লক্ষ্য সাধন, অর্ধচন্দ্র দ্বারা গ্রীবা মস্তক ধনু প্রভৃতি ছেদন, সূচীমুখ দ্বারা কবচ ভেদন, ভল্ল দ্বারা ধনুর্গুণ চর্বণ. দ্বিভল্ল দ্বারা বাণ-অবরোধন, কর্ণিক দ্বারা লোহময় বাণ ছেদন, কাকতুণ্ড দ্বারা বেধ্য বস্তুর বেধ করিবে।"

"যে শর-গাছের ঝাড়ে স্বাতিনক্ষত্রের বৃষ্টি পড়ে, সে ঝাড় পীতবর্ণ হয়, এবং তাহার মূলে বিষ উৎপন্ন হয়। পবন-অভাবেও সে ঝাড় কাঁপিতে থাকে। এইরূপ ঝাড়ের মূল শরের ফলে লেপন করিলে, তদ্দ্বারা ক্ষতস্থানের চিহ্ন থাকিয়া যায়।" ফলের পায়ন [পাইন]। 'পিপ্পলী, সৈন্ধব, কুষ্ঠ (কুড়)—এই তিন দ্রব্য গোমূত্রে পেষণ-পূর্বক শস্ত্রে লেপন করিবে। পবে আগুনে প্রতপ্ত করিবে। যখন তপ্ত অবস্থায় পীতবর্ণ দেখাইবে, তখন নির্মল জল পান করাইবে' [২২]। ইহার পর নারাচ, নালীক, ও শতঘ্ন অস্ত্রের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে। এ বিষয় পরে দেখা যাইবে।

---

২২ শরগাছ হইতে শর সংগ্রহ করিতে বলা হইয়াছে। অগ্নিপুরাণে ও কৌটিল্যে বাঁশের শলাকা ও অন্য কাঠের শলাকার উল্লেখ আছে। শরবৃক্ষ হইতে ধনুর শর নাম। যেন বিধাতা এই উদ্দেশ্যে শরগাছ সৃষ্টি করিয়াছেন। শরগাছের মূলে বিষ জন্মে কি না, জানি না। বোধ হয়, ছত্রাক রোগ হেতু গাছ পীতবর্ণ হয় এবং সে রোগে বিষও জন্মিতে পারে। কদাচিৎ হইত বলিয়া স্বাতিনক্ষত্রে বৃষ্টি কল্পনা করা হইয়াছে। যেমন গজমুক্তা। ফলের নানাবিধ আকার অনুসারে শরের নাম হইত।

*এখন শরাভ্যাসের কথা। ইহার পূর্বে অষ্ট 'স্থান', ধনু ও জ্যা, মুষ্টি (ধারণ), জ্যা আকর্ষণ-বিধি বর্ণিত হইয়াছে। "লক্ষ্য চারি প্রকার—স্থির, চল, চলাচল, দ্বয়চল। চলাচল—যখন ধনুর্ধারী চলিতে চলিতে 'অচল' স্থির লক্ষ্য ভেদ করে। দ্বয়চল—যখন দুই-ই চলিতে থাকে। ৬০ ধনু বা ২৪০ হাত দূরস্থিত লক্ষ্যভেদ জ্যেষ্ঠ; ৪০ ধনু মধ্যম, ২০ ধনু কনিষ্ঠ। সূর্যোদয়ে ও সূর্যাস্ত সময়ে যিনি চারিশত শর নিক্ষেপ করিতে পারেন, তিনি জ্যেষ্ঠ ধনুর্ধারী।" এইরূপ শরাভ্যাসের যাবতীয় ক্রম বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তদনন্তর সাতটি দিব্যাস্ত্রের সন্ধান মন্ত্র। সাতটি নাম এই—ব্রহ্মাস্ত্র, ব্রহ্মদণ্ড, ব্রহ্মশির, পাশুপত, বায়ব্য, আগ্নেয়, নারসিংহ। দুঃখের বিষয় বাণের নির্মাণ ব্যক্ত করা হয় নাই।

তদনন্তর ওষধি-প্রয়োগ দ্বারা নিজের দেহকে শত্রুর অস্ত্র শস্ত্র হইতে অভেদ্য করিবার কথা আছে। একটা উদাহরণ তুলি। "রবি পুষ্যানক্ষত্রে থাকিবার সময় পাঠালতার [বৃদ্ধকর্ণি] মূল উৎপাটন করিবে। এই মূল মুখে রাখিলে তীক্ষ্ণ মণ্ডলাগ্র [যে খড়্গের অগ্র গোল] দ্বারা দেহ কাটা যাইবে না।"

ইহার পর সংগ্রাম-বিধি। এখানে রাহুযুক্ত যোগিনী এবং পঞ্চস্বরার পঞ্চতত্ত্ব দেখিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার কথা আছে। সর্বতোভয়ে দণ্ড-ব্যূহ, পশ্চাৎ-ভয়ে শকট, পার্শ্বভয়ে বরাহ কিংবা গরুড়-ব্যূহ রচনা করিবে। লিখিত আছে, প্রথমে

---

*কৌটিল্য ফলের কর্ম, ছেদন ভেদন তাড়ন বলিয়াছেন। দ্রব্য—লৌহ, অস্থি ও দারু। অস্থি ও দারুময় ফল পরে লুপ্ত হইয়াছিল। সংহিতায় কতকগুলি শরের নাম পাওয়া যাইতেছে। প্রকাশিত সংহিতায় কয়েকটি চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মাতৃকায় ছিল কি না বুঝিতে পারিতেছি না। কিন্তু সব ঠিক মনে হয় না। নামের অর্থ ও ফলের কর্মের সহিত মিলাইলেই ভ্রম ধরা পড়িবে। শরফল-পায়ন বিধিতে পিপ্পলী ও কুষ্ঠ লেপনের প্রয়োজন বুঝিতে পারা যায় না। সৈন্ধব লবণ না দিয়া কাদা লেপিয়া দিলেও একই ফল, এবং তাহাই করা হইয়া থাকে। তাপ সমান করা ও রক্ষা করা উদ্দেশ্য। খড়্গ-পায়ন সম্বন্ধে বহু শাস্ত্র ছিল। বরাহের বৃহৎ-সংহিতায় কিছু আছে। সেখানে শুক্রাচার্য-সম্মত পায়নবিধি প্রদত্ত হইয়াছে। ভোজরাজের যুক্তিকল্পতরুতে বাৎস্য, লৌহার্ণব, লৌহ-প্রদীপ, শার্ঙ্গধর হইতে খড়্গের গুণাগুণ উদ্ধৃত হইয়াছে।

'ক্ষাত্রকোষ', ব্যাকরণ সূত্র, মনুর সপ্তম অষ্টম অধ্যায়, মিতাক্ষরার ব্যবহার অধ্যায়, জয়ার্ণব তন্ত্র, বিষ্ণুযামল, বিজয়াখ্য তন্ত্র, স্বরশাস্ত্র পাঠ করিবে, পরে ধনুর্বেদ।

কোন্ কালে সংহিতাখানি রচিত? রাজাকে যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতির বিজ্ঞানেশ্বর-কৃত মিতাক্ষরা পড়িতে বলা হইয়াছে। এই টীকা দ্বাদশ খ্রীস্ট-শতাব্দে প্রণীত। অতএব এই বাশিষ্ঠ সংহিতার বর্তমান রূপ এই শতাব্দের পূর্বে নয়, পরের। কিন্তু কত পরের, তাহা বলা দুষ্কর। বোধ হয়, ত্রয়োদশ শতাব্দের পরের নয়। এই সংহিতার সময়ে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র অন্ত্যজ এই পাঁচ বর্ণের সৈন্য হইত। ইহাদের এক এক দেবতা কল্পিত হইয়াছিল। পঞ্চস্বরার পঞ্চতত্ত্ব ব্যতীত তখন পাঁজির দিক্‌শূলে প্রবল বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। সাতটি দিব্যাস্ত্র সত্য সত্য ছিল কি না, সন্দেহ। কারণ এক এক বাণ-সন্ধানের পূর্বে দুই তিন লক্ষ, এক নিযুত বার গায়ত্রী বিলোম-ক্রমে জপ করিবার কথা আছে। একবার জপ করিতে যদি এক সেকেণ্ড কাল লাগে, তাহা হইলে লক্ষ বার জপ করিতে সাতাস আটাশ ঘণ্টা লাগিয়া যাইবে। জপ করিয়া শত্রুর নাম করিয়া 'হন হন হুম্ ফট্' বলিতে হইত! বোধ হয়, এগুলি আভিচারিক বাণ। অথর্ববেদের কাল হইতে শত্রু-নিপাতের নিমিত্ত আভিচারিক 'বাণমারা' অদ্যাপি চলিয়া আসিতেছে। তাই, এই সংহিতা অথর্ববেদ-সম্মতও বটে। দ্বাদশ খ্রীস্ট-শতাব্দের 'নরপতি জয়চর্যা' নামক প্রসিদ্ধ পুস্তক আছে। তাহাতে যুদ্ধ জয়লাভের যে কত তান্ত্রিক যন্ত্র মন্ত্র ও চক্র আছে, তাহার সংখ্যা হয় না।

কোনো একখানি কিংবা দুইখানি প্রাচীন পুথী আধার করিয়া বাশিষ্ঠ-সংহিতা লেখা হইয়াছে। পূর্বে দেখা গিয়াছে যে, অগ্নি-পুরাণোক্ত ধনুর্বেদের কতক শ্লোক এই সংহিতায় আছে। হয়তো দুই-ই শিবোক্ত, অধুনা লুপ্ত, ধনুর্বেদ উভয়েরই মাতৃকা হইয়াছিল। সে সময়ে ক্ষত্রিয় রাজা সংস্কৃত জানেন না, অথচ ক্ষাত্রক্রোশ সংস্কৃত; সেনা-নয় ও সেনার প্রতি আজ্ঞা সংস্কৃতে বলিতে হইত। কাজেই তাঁহাকে সংস্কৃত ব্যাকরণের শব্দরূপ, বিশেষতঃ ধাতুর লট্ লোট্ মুখস্থ করিতে হইত। বীরভূম বোলপুরের এক ভদ্রলোক, বোধ হয়, তিনি বয়স্কাউট মাস্টার, আমায় প্রশ্ন করিয়াছিলেন, ইংরেজী না বাংলায় বালকদিগকে drill-এর

ভাষা ও command শেখানো উচিত, যদি বাংলায় মনে করি, তাহার প্রদত্ত command-গুলি বাংলায় কি হইবে? আমি বলিয়াছিলাম, বাংলায় শেখানো উচিত। কারণ তাহাতে শিক্ষা দেশীয় হইবে, বালকেরা শীঘ্র শিখিতে পারিবে, বড় হইলেও ভুলিবে না, এমন কি, অন্যেও বালকদের সহিত অক্লেশে যোগ দিতে পারিবে। চার-কোশ বাংলায় করিয়াছিলাম। এখন বলিতাম, সংস্কৃতেও দিতে পারেন, কারণ অনেক শব্দ পূর্বাবধি আছে, এবং অন্য প্রদেশের বালকেরাও একই কোশ শিখিতে পারিবে। লোটের পদগুলি হিন্দী করিলে আরও সুবিধা। সেকালের সেনা সংস্কৃত জানিত না, কিন্তু তাহারা বুঝিত। ইংরেজের আমলে দেশী রাজ্যে বোধ হয় ইংরেজী ঢুকিয়াছে। কিন্তু ইহার পূর্বে নিশ্চয় সংস্কৃত ছিল। মোগল আমলেও হিন্দু রাজ্যে ফার্সী কিংবা উর্দ্দু গ্রহণের কারণ ছিল না।

বাশিষ্ঠ ধনুর্বেদ-সংহিতায় নারাচ নালীক ও শতঘ্ন সম্বন্ধে তিনটি শ্লোক আছে। প্রথম শ্লোকে নারাচের নির্মাণ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্লোকে নালীক ও শতঘ্নের প্রয়োজন লিখিত হইয়াছে। নারাচ এই—"যে সকল বাণ সর্ব লোহময়, তাহাদের নাম নারাচ। নারাচে পাঁচটি বড় পক্ষ বদ্ধ থাকে। কদাচিৎ কেহ এই বাণে সিদ্ধ হয়।" নালীক ও শতঘ্নের দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি—

"নালীকালঘবো বাণা নল-যন্ত্রেণ নোদিতাঃ।
অত্যুচ্চ-দূরপাতেষু দুর্গযুদ্ধেষু তে মতাঃ॥
সিংহাসনস্থ রক্ষার্থং শতঘ্নং স্থাপয়েদ্ গড়ে।
রঞ্জকং বহুলং তত্র স্থাপ্যং বটয়ো ধীমতা॥

নালীকা লঘুবাণ, নলযন্ত্র দ্বারা প্রেরিত হয়। অত্যুচ্চে দূরস্থে পাতিত করিতে হইলে এবং দুর্গযুদ্ধে লাগে। সিংহাসন রক্ষার্থ ধীমান্ 'গড়ে' শতঘ্ন এবং বহুল রঞ্জক ও বটি (বটী) স্থাপন করিবেন।"

নারাচ নালীক ও শতঘ্ন, তিনই রামায়ণ-মহাভারতে আছে। নারাচ বাণ বটে, ধনু দ্বারা নিক্ষিপ্ত হইত। কৌটিল্য, অগ্নিপুরাণ, ভোজরাজ, ইহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। শরে লোহার ফলা আঁটিয়া সাধারণ বাণ হইয়া থাকে। কিন্তু শর, বিপক্ষের বাণে ছেদ্য। নারাচের সবটাই লোহার। চতুঃশিরাল কিংবা

পক্ষ-শিরাল (যেমন এখানে), নির্গর্ভ, শিবাগুলি ধারাল। ছোট করিলেও ভারী। এই হেতু দূর-লক্ষ্য বেধ করিতে পারা যায় না। কিন্তু নিকট-লক্ষ্য সাংঘাতিক। যাহাতে ভারী না হয়, অথচ বাঁকিয়া না যায়, এই কল্পনায় পূর্বকালের নালীকের উৎপত্তি। বোধ হয়, লোহার পাত গোল করিয়া মুড়িয়া সরুমুখ নালীকা করা হইত। মুখের কিছু নীচে প্রায়ই দুইটি কান থাকিত। তখন হইত কর্ণী নালীক। নিম্নমুখ কর্ণ থাকাতে এই বাণ দেহে প্রবিষ্ট হইলে সহজে বাহির করিতে পারা যাইত না। মহাভারতে নালীক-নারাচ, নারাচ-নালীক এইরূপ একত্র পাওয়া যায়। দুই-ই ধনু দ্বারা নিক্ষিপ্ত হইত। বাশিষ্ঠ-সংহিতায় নারাচের সহিত নালীক আসিয়াছে, কিন্তু প্রাচীন নালীক নয়। প্রাচীন 'বাণ' নামটি আসিয়াছে, কিন্তু নাল যন্ত্র দ্বারা প্রেরিত[২৩]। শুক্রনীতিসারে ইহার নাম ক্ষুদ্র বা লঘু নালীক। সেখানে বন্দুক এখানেও বন্দুক। এখানে নালীককে 'বাণ', শুক্রনীতিসারে 'অস্ত্র' বলা হইয়াছে। যে আয়ুধ নিক্ষেপ করিতে পারা যায়, তাহার নাম অস্ত্র, এই নির্বচন শুক্রনীতিসারে। বাণও অস্ত্র। আশ্চর্য এই, শুক্রনীতিসার বন্দুককে 'অস্ত্র', বশিষ্ঠ 'বাণ' বলিয়াছেন। পুরাতন নাম নূতন দ্রব্যে প্রয়োগ

---

২৩ বঙ্গানুবাদক শাস্ত্রী মহাশয়ও লঘুবাণ নালীককে বন্দুক মনে করিয়াছেন। কিন্তু শুক্রনীতিসারে নালীকাস্ত্র বন্দুক না হইলে এই লঘুবাণকে বন্দুক বলিতে পারা যাইত না। নারাচ ভারী, নালীক লঘু। এই হেতু একটির পর অপরটি যথাস্থানে আসিয়াছে। নালীক, নল যন্ত্রদ্বারা প্রেরিত হয়, নালীক নিশ্চয় নলাকার। বন্দুক উদ্ভাবনার কালে নলে বারুদ ঠাসিয়া তদুপরি ধাতুময় প্রাচীন নালীক বাণ স্থাপিত হইত? বটিকাস্থাপন তখন ছিল না কি? এ সম্বন্ধে ফুৎ-নল (blow-gun) স্মর্তব্য। আমেরিকা, বোর্নিও ও ফিলিপাইন দ্বীপের অসভ্য জাতিরা শরের, কদাচিৎ বাঁশের ও কাঠের সরু লম্বা নলে 'শর' রাখিয়া মুখের ফুৎকারে দূরে নিক্ষেপ করে। নল যন্ত্র ৪ ফুট হইতে ১৪ ফুট লম্বা। ভিতরের গর্ভ আধ ইঞ্চি। 'শর' খড়িকার মতন, ৩।৪ ইঞ্চি হইতে ১৮ ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা। মুখে হাড়ের ফল, বিষ-মাখানা। পক্ষ তুলার। এই নল-যন্ত্র দ্বারা একশত হাত দূরে 'শর' নিক্ষিপ্ত হয়। অসভ্যজাতিরা এতদ্দ্বারা যুদ্ধ ও মৃগয়া করে। সংস্কৃতের ইষিকা অস্ত্র নলদ্বারা প্রেরিত হইত কি না, কে জানে। ধনুর্দ্বারা হইত, তাহার উল্লেখ আছে।

করিতে গেলেই অসঙ্গতির সৃষ্টি হয়। বটিকা বা গুলিকাকে বরং বাণ বলিতে পারি, বন্দুককে বলিতে পারি না। পাত্র বলিলে যদি পাত্রস্থিত জলও বুঝায়, তাহা হইলে আপত্তি থাকে না। শতঘ্নী যন্ত্র পূর্বকালে দুর্গ-প্রাকারে স্থাপিত হইত। কিন্তু সে শতঘ্নী, কামান নয়। এখানে রঞ্জক ও বটী না থাকিলে সে শতঘ্নী মনে হইত। আমরা কামানের রঞ্জক-ঘর এখনও বলি। রঞ্জক শব্দ সংস্কৃত, যাহা রাগ জন্মায়, উদ্দীপ্ত করে। এই অর্থে বারুদ। আশ্চর্য এই, শুক্রনীতিসারের 'বৃহৎনালীক' এখানে 'শতঘ্ন', 'অগ্নিচূর্ণ' এখানে রঞ্জক, এবং 'গোল' এখানে 'বটী' নাম পাইয়াছে। শুক্রনীতিসারের দেশ ও কাল-বিচারে দেখিয়াছি, উহা একাদশ খ্রীস্ট-শতাব্দে গুজরাট অঞ্চলে লেখা। বাশিষ্ঠ-সংহিতা, দেশে ও কালে অধিক দূরে নয়। তথাপি এক শব্দ না হইয়া পৃথক পৃথক হইল কেন? বশিষ্ঠের এই তিন শ্লোক, বিশেষতঃ বন্দুক কামানের কথা, যথাস্থানে নাই। পূর্বে গিয়াছে ধনু জ্যা শরফল, পরে আসিয়াছে শরাভ্যাস। এই দুয়ের মাঝে তিনটি শ্লোক যেন অকস্মাৎ আসিয়া পড়িয়াছে। বন্দুক-কামান চালাইবার উপদেশ কোথাও নাই। কিন্তু সৈন্যেরা যে চালাইত, তাহা ধাতুরূপ উদাহরণে আছে। যথা "রঞ্জকাদবসিতং দহত" (বোধ হয়, পাঠ অশুদ্ধ), অবসিত সঞ্চিত রঞ্জক জ্বালাও ('ফায়ার' কর); "বটিকা আয়াস্তি নিপতত"—গুলী আসিতেছে শুইয়া পড়, "চর্মণা বটিকাং রুন্ধ"—ঢাল দিয়া গুলী রোধ কর। "রঞ্জকং দত্তং"—রঞ্জক দেওয়া হইয়াছে। শ্লোকের মধ্যেও একস্থানে রঞ্জক প্রয়োগ আছে। "হে বিশ্বামিত্র, বাণে রঞ্জক-নালীকা বদ্ধ করিয়া বায়ু-মুখে নিক্ষেপ করিলে সে বাণ ঘুরিয়া আসিবে। এই বাণের নাম খগ-বাণ।" রঞ্জক-নালীকা—বারুদ-পূর্ণ নালীকা, হাবুই তুল্য পশ্চাৎগামী হইবে। বিশেষতঃ সম্মুখ বাতাসের সাহায্য পাইলে।

আমাদের দেশে বন্দুক কামান প্রচলনের ইতিহাসের পক্ষে এই সংহিতার প্রমাণ মূল্যবান্। বন্দুকের বাণের নাম নালীক, ইহা নূতন। একাদশ খ্রীস্ট-শতাব্দে বন্দুকের নাম নালীকাস্ত্র। অতএব বশিষ্ঠের নালীক এক শতাব্দ পূর্ববর্তী বলা চলে।

বন্দুক আসিয়া ধর্মযুদ্ধ লোপ করিয়াছে। কিন্তু এখনও পশ্চিমবঙ্গের সাঁওতাল জাতি 'কাঁড় বাঁশ' (তীর ধনুক) ছাড়ে নাই। হাতে 'আহ্‌শার' (ধনুঃশর) থাকিলে বাঘকেও ডরায় না। তাহাদের ধনু বাঁশের, কিন্তু চারি হাত দীর্ঘ নয়। ধানকীর কান পর্যন্ত উচ্চ হয়। মোটামুটি পাঁচ ফুট পূর্বকালের মধ্যম পরিমাণ। পূর্বকালের কার্মুক চারি হাত বা ছয় ফুট লম্বা। সে ধনু ধারণ সোজা নয়। সে ধনুর নিম্ন কোটি মাটিতে টিপিয়া গুণ আকর্ষণ করিতে হয়। মাটি নরম হইলে সে ধনু অকর্মণ্য। ধনুর চড়া সরু কঞ্চির কিংবা বাঁশের চেয়াড়ীর দুই মাথা দোড়ী দিয়া ধনুতে বাঁধা থাকে। 'লাদনা' (সাঁওতালী, 'চিট লাড়') গাছের ছালের আঁশের দোড়ীও দৃঢ় ও স্থায়ী হয়। সাঁওতালী ভাষায় অনেক সংস্কৃত শব্দ আছে, উচ্চারণও প্রায় ঠিক আছে। এই ভাষায় শরকে বলে 'শার', ধনুর গুণকে বলে 'ঘুণা' (ণ উচ্চারণ চাই)। তাহাদের শর শরগাছের, কদাচিৎ বাঁশের শলার, পুঙ্খ ময়ূরের, ফলা কাঁচা ইস্পাতের। নরম পাইন দেওয়া হয়। কড়া পাইন ভঙ্গুর। সাধারণ ফলার আকার তিন প্রকার, (১) আরামুখ [আপ্‌ড়ি শার], (২) শিরাল, গো-পুচ্ছ (উগ্‌লি শার), (৩) ইহার নিম্নদিকে কর্ণ থাকিলে কর্ণী (গানারি শার)। এই ত্রিবিধ সামান্য শর ব্যতীত সমগ্র লৌহময় বাণ, সংস্কৃতের নারাচ আছে। ফাল্গুন মাসে পুষ্পোৎসবে ('বাহাপরব') দেবতার নিকট অস্ত্র-শস্ত্রের পূজায় এই নারাচ বসে, কুক্কুট ও ছাগ বলি হয়। এটি পূর্বকালের এবং একালেরও নীরাজনা। আশ্বিন শুক্লা নবমীতে অস্ত্র-নীরাজনার দিন। গজাশ্বের অন্য দিন ছিল। পণ্ডিতের যেমন সরস্বতী পূজা, যোদ্ধার তেমন নীরাজনা বহু প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। পশু বধ করিতে ফলায় কদাচিৎ বিষ মাখানা হয়, ভালুক মারিতে ফলা অগ্নি-তপ্ত করা হয়। মনু (৭।৯০) কর্ণী ও বিষদিগ্ধ ও অগ্নিদীপ্ত বাণ-নিক্ষেপ নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে কে কে অবধ্য, তাহা সকলেই একবাক্যে বলিয়া গিয়াছেন। সাঁওতাল ধানুক আলীঢ় ভাবে (দক্ষিণ জানু স্তব্ধ, বাম জানু হলাকারে বক্র ও অগ্রে স্থাপিত) দাঁড়াইয়া শর নিক্ষেপ করে। শিক্ষিত ধানুকী ২৪০ হাত দূরস্থিত লক্ষ্য অক্লেশে বিদ্ধ করিতে পারে। পূর্বকালেও

এই ছিল। অবশ্য, চল, চলাচল, দ্বয়চল, লক্ষ্যবেধ করিতে না পারিলে মৃগ পক্ষী মারিতে পারা যায় না। ওড়িষ্যার আটবিকেরা ব্যাঘ্র বধ করিতে যন্ত্র পাতে। সে যন্ত্র শরারোপিত বৃহৎ ধনুর্মাত্র (প্রাচীন নাম, মহাযন্ত্র)।

পরিশেষে ইতিহাস ছাড়িয়া একটু কাজের কথা লিখি। ইদানী দেশে ব্যায়াম, বাহুযুদ্ধ, যষ্টিযুদ্ধ, অসিযুদ্ধ, মুষ্টিযুদ্ধ শিখিবার উৎসাহ দেখা যাইতেছে। ইহাদের সহিত ধনুর্যুদ্ধ শিখিলে উত্তম হয়। বিশেষতঃ বালিকাদের পক্ষে অন্য যুদ্ধ সম্ভব নয়, কিন্তু ধনুর্যুদ্ধে আপত্তি দেখি না। লোহার ফলা না করিয়া দৃঢ় কাঠের কিংবা শিঙ্গের মুণ্ড করিলে ব্যায়ামের প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে। এ বিষয়ে পুস্তক রচনা করিতে হইলে বাশিষ্ঠ সংহিতা পথ প্রদর্শক হইবে।

৫. কয়েকটি প্রাচীন অস্ত্র

ধনুর্বেদ ও রামায়ণ-মহাভারতে বর্ণিত যুদ্ধ পড়িতে পড়িতে স্বভাবতঃ প্রশ্ন ওঠে, সেকালে বন্দুক কামান ছিল কি না। অনেকে আগ্নেয়াস্ত্র নামে ভুলিয়াছেন; ব্রহ্মাস্ত্র, নালীক, ভুশুণ্ডী, শতঘ্নী প্রভৃতি এক একটিকে বন্দুক কিংবা কামান মনে করিয়াছেন। প্রাচীন অধুনা-অজ্ঞাত দ্রব্যের স্বরূপ-নির্ণয় চিরকাল দুরূহ। কিন্তু সেটা কি, বলা অপেক্ষা, সেটা কি নয়, বলা তত কঠিন নয়। আমি এখানে 'নেতি নতি' বলিতে যাইতেছি।

ইহাতে কিন্তু মনস্তোষ হয় না, অন্ততঃ বর্গ জানিতে কৌতূহল হয়। অস্ত্রের নামের কেবল অর্থ ধরিয়া কদাচিৎ বর্গ নির্ণয় হইতে পারে। কিন্তু অস্ত্রের দ্রব্য. নির্মাণ, প্রয়োগ ও কর্ম, এই চারি না জানিলে গণ ও জাতি নির্ণয় হইতে পারে না। কৌটিল্য আয়ুধের জাতি রূপ লক্ষণ প্রমাণ আগম (নির্মাণ দেশ) মূল্য জানিতে বলিয়াছেন। ভোজরাজের যুক্তিকল্পতরুতে খড়্গের নানা জাতি ও লক্ষণ বর্ণিত আছে। রামায়ণ-মহাভারতাদিতে অস্ত্রের কর্ম, বিশেষ বিশেষ অস্ত্রের প্রয়োগও লিখিত আছে। কদাচিৎ বিশেষণ দ্বারা নির্মাণ জানিতে পারা যায়, এবং আসত্তি দ্বারা বর্গও অনুমিত হইতে পারে। যেখানে কেবল নামটি আছে, আর কিছুই নাই, সেখানে অস্ত্রটি অজ্ঞাত থাকিবে। বলা বাহুল্য, বন্দুক

ও কামানে নল চাই, অগ্নিচূর্ণ বা বারুদ চাই, আর চাই ধাতুময় বটিকা বা গুলিকা। যদি বারুদ না পাই, তাহা হইলে বন্দুক বা কামান হইতে পারে না। এখানে কয়েকটা বিচার করিতেছি।

১. সূর্মি, সূর্মী। নামটি মনুসংহিতায় (১১।১০৪) আছে। অর্থ ধাতুময় প্রতিমা। বোধ হয়, সুষির। গুরুপত্নীগামীকে জলন্ত সূর্মী আলিঙ্গন করাইয়া বধের ব্যবস্থা ছিল। বোধ হয়, প্রতিমার ভিতরে জলন্ত অঙ্গার রাখিয়া তাহা জ্বালাময়ী করা হইত। ঋগ্বেদে (৭।১।৩) সূর্মী অর্থে সায়ণ করিয়াছেন 'জ্বালা' (অগ্নি)। তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (১।৫।৭.৬) 'কর্ণকাবতী সূর্মী' অর্থে সায়ণ করিযাছেন "জ্বলন্তী লোহময়ী স্থূণা সূর্মী, সা চ কর্ণকাবতী ছিদ্রবতী অন্তরপি জ্বলন্তীত্যর্থঃ।" জ্বলন্তী লোহময়ী ছিদ্রবতী স্থূণা (স্তম্ভ)। ধাতু পুড়িতে পারে না, অতএব 'জ্বলন্তী' অগ্নি-দীপ্তা। তৈত্তিরীয়-সংহিতার (৫।৪।৭।৩) সূক্তেও সূর্মী শব্দের এই অর্থ। উক্ত সংহিতার (৪।৫।৯।২) সূক্তে সূর্মী শব্দের অর্থ সায়ণ বুঝিয়াছেন সু+ঊর্মী=শোভন ঊর্মীযুক্ত। অতএব বেদের সূর্মী, বন্দুক কামান কিছুই নয়। সায়ণ জ্বলন্তী সূর্মী অর্থে, মনুসংহিতার সূর্মী বুঝিয়াছেন। তিনি চতুর্দশ খ্রীস্ট-শতাব্দে ছিলেন। তখন বন্দুক কামান প্রচলিত হইয়াছিল। সূর্মী এরূপ কিছু হইলে তিনি সূর্মী অর্থে নালীকা করিতেন। পশ্চিম দেশের বৈদিক পণ্ডিতেরা সূর্মী শব্দে বুঝিয়াছেন নলবিশেষ, প্রদীপের কাজ করিত। অন্যত্র বুঝিয়াছেন জল যাইবার নল। ঋগ্বেদেও (৮।৬৯।১২) 'সূর্ম্য সুষির' আছে। অতএব এইটুকু পাইতেছি সূর্মী নলবিশেষ। কিন্তু নল এবং নলে কর্ণ থাকিলেই তাহাকে বন্দুক মনে করিতে পারা যায় না। যে কালে চকমকি না ঠুকিয়া, কাঠে কাঠে ঘষিয়া অগ্নিমন্থন করা হইত, সে কালে বারুদ কল্পনা অসম্ভব। এমনও হইতে পারে, সূর্মী কর্ণীও নলাকার অগ্নিপাত্র। পাত্রে জ্বলন্ত অঙ্গার থাকিলে তাহার উপরে এবং পাত্রের পার্শ্বে উত্তপ্ত বায়ুর ঊর্মী সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। এই ঊর্মী হেতু পাত্রের নাম সূর্মী।

২. সীস। অথর্ববেদে সীস দ্বারা শত্রুবিনাশের কথা আছে। ইহা দেখিয়া কেহ কেহ মনে করিয়াছেন, এই সীস বন্দুকের বটিকা বা গুলিকা। কিন্তু এই

বেদের সূক্তগুলি এবং সায়ণের ভাষ্য পড়িলে বন্দুকের গুলী কিছুতেই হইতে পারে না। যথা, অথর্ববেদে (১।১৬।১২) বরুণ সীসকে বলিতেছেন, "হে সীস, অগ্নি তোমায় রক্ষা করিতেছেন। ইন্দ্র রাক্ষসাদি বধের জন্য আমায় সীস দিয়াছেন।" এখানে সায়ণ সীস শব্দের অর্থ করিতেছেন নদীফেন। যদিও অগ্নি কেন নদীফেনকে রক্ষা করিবেন, তাহা বুঝা যাইতেছে না। অগ্নিকে দেব মনে করিলে বুঝিতে পারা যায়। উক্ত বেদে (১।১৬।৪) "যদি নো গাং হংসি যদ্যশ্বং যদি পুরুষং। তং ত্বা সীসেন বিধ্যামো যথা নো সো অবীরহা।" সায়ণ ইহার ভাষ্য করিয়াছেন—হে শত্রু, যদি তুমি আমার গো অশ্ব ভৃত্যাদি বধ কর, তাহা হইলে আমি তোমাকে সীস দ্বারা এরূপ প্রহার করিব যাহাতে তুমি আর কখনও এরূপ করিতে পারিবে না। উক্ত সূক্তের আরম্ভে সায়ণ লিখিয়াছেন, অমাবস্যার রাত্রিতে দ্বেষ্য মারণার্থ ঐ মন্ত্র আবৃত্তি করিয়া শত্রুকে সীসচূর্ণ-মিশ্রিত-অন্ন-প্রদান, শত্রুর গাত্রস্থ আভরণ-স্পর্শন ও তাহাকে বংশ-যষ্টি দ্বারা তাড়ন করিবে। এখানে সায়ণ কৌশিক সূত্র হইতে লিখিয়াছেন, সীস শব্দের অর্থ নদীফেন। অতএব দেখা যাইতেছে, সীস শব্দ দ্বারা সীস ধাতু নয়, নদীফেন বুঝিতে হইবে; এবং আভিচারিক মন্ত্র সহযোগে এই ফেন দ্বারা শত্রুবিনাশের কথা আছে। বোধ হয়, এই নদীফেন আয়ুর্বেদের সমুদ্র-ফেন। গ্রাম্যজনে এইরূপ 'বাণমারা'য় এখনও বিশ্বাস করে, এবং যাহার উদ্দেশে মারা হয়, সে শুনিতে পাইলে শুখাইয়া মরিয়া যায়। অর্থাৎ বন্দুক নিক্ষেপ্য সীস নয়।[২৪]

৩. আগ্নেয়াস্ত্র। অর্থ, অগ্নিময় অস্ত্র। অস্ত্র, যেটা নিক্ষিপ্ত হয়। বন্দুক নিক্ষিপ্ত হয় না, বন্দুক অস্ত্র বলিতে পারা যায় না। বন্দুক যন্ত্র, নিক্ষিপ্ত গুলী অস্ত্র বটে। আগ্নেয়াস্ত্র ধনু দ্বারা নিক্ষিপ্ত হইত; ইহা যে বাণ-বিশেষ, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। যথা, রামায়ণে (বঙ্গবাসীর সংস্করণ ল° ।১০০), শ্রীরাম ধনু দ্বারা আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন! তিনি ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা রাবণ বধ করিয়াছিলেন (ল° ।১২০)। এই ব্রহ্মাস্ত্র কেমন?

---

২৪ পণ্ডিত শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী আমায় বেদ হইতে সূর্মী ও সীসের উল্লেখ উদ্ধার করিয়া দিয়াছেন।

"দীপ্তং নিশ্বসন্তমিবোরগং জাজ্বল্যমানং সুপুঙ্খং সধূমং।" "স [রামঃ] রাবণায় সংক্রুদ্ধো ভৃশমায়ম্য কার্মুকং। চিক্ষেপ পরমায়ত্তঃ শরং মর্ম-বিদারণম্॥" রাম কার্মুক অত্যন্ত আকর্ষণ করিয়া মর্ম-বিদারণ শর নিক্ষেপ করিলেন। শরটি প্রজ্বলিত; জ্বলিবার সময় সাপের মত শোঁ শোঁ শব্দ করিতেছিল। মৎস্যপুরাণে (বঙ্গবাসীর, ১৫৩ অঃ), জম্ভাসুর-বধের নিমিত্ত ইন্দ্র কর্ণপ্রান্ত পর্যন্ত শরাসন আকর্ষণ করিয়া ব্রহ্মাস্ত্র বাণ ত্যাগ করিলেন। এইরূপ মহাভারতে আছে। ব্রহ্মশির, এবং রামায়ণের ঐশিকাস্ত্র, গারুড়াস্ত্র, সৌরাস্ত্র প্রভৃতি সব আগ্নেয়াস্ত্রের ভেদ।

কেবল বাণে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া নিক্ষিপ্ত হইত না। অন্য অগ্নিও শত্রুসেনার মধ্যে ফেলা হইত। রামায়ণে (ল° ।৭৩) ইন্দ্রজিৎ স্ফুলিঙ্গ ও অগ্নিকণা সম্বলিত শূল নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। এত ক্ষিপ্রহস্তে ও বেগে অগ্নিময় অস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইত যে, লক্ষ্য-শত্রু বাম কিংবা দক্ষিণে সরিয়া দাঁড়াইবার অবসর পাইত না। মনে রাখিতে হইবে, শত্রু মাত্র দুই শত কি আড়াই শত হাত দূরে থাকিত।

৪. শতঘ্নী। ইহা একদা অনেক লোককে হত করিতে পারে। কিন্তু একমাত্র কামানের গোলাই যে পারে, তাহা নয়। কৌটিল্যের শতঘ্নী অচল-যন্ত্রবর্গের মধ্যে। টীকাকার লিখিয়াছেন, বহু-লৌহকণ্টক সমাচ্ছন্ন বৃহৎ স্তম্ভ দুর্গপ্রাকারে স্থাপিত হয়। বৈজয়ন্তী-কোশে (১২শ খ্রীস্ট-শতাব্দের আদ্যে) শতঘ্নী "অয়ঃকণ্টকসংছন্না মহাশিলা"। শব্দকল্পদ্রুমে বিজয়-রক্ষিত "অয়ঃকণ্টক-সংছন্না শতঘ্নী মহতী শিলা"। অর্থাৎ শিলা-স্তম্ভের গায়ে লোহার কাঁটা পুতিয়া রাখা হইত। শত্রুসেনা প্রাকারে উঠিবার উপক্রম করিলে তাহাদের উপরে স্তম্ভটি ঠেলিয়া ফেলিয়া দেওয়া হইত, তাহারা কাঁটায় বিদ্ধ ও শিলার ভারে পিষ্ট হইয়া প্রাণত্যাগ করিত। যথা, রামায়ণে (ল° ।৩), "লঙ্কাপুরীর কবাটবদ্ধ চারি দ্বারে দৃঢ় ও বৃহৎ ইষু-উপল-যন্ত্র (শর ও পাষাণ নিক্ষেপের ক্ষেপণী) এবং শাণিত কৃষ্ণায়স-ময় শত শত শতঘ্নী আছে।" কৃষ্ণায়স-ময়—ইস্পাতের কণ্টকময়। কামান শাণিত হয় না। হনুমান লঙ্কায় গিয়া 'শতঘ্নী-মুষলায়ুধ', শতঘ্নী ও মুষল

নিক্ষেপের সেনা দেখিতে পাইল (সু° ।৪)। এই দুই আয়ুধ পিষিয়া মারে, এই কর্ম-সাদৃশ্য হেতু কবির পরে পরে মনে হইয়াছে। শতঘ্নী রণস্থলে লইয়া যাওয়াও হইত। রাম-রাবণের যুদ্ধে রাক্ষসেরা যুদ্ধস্থলে শতঘ্নী লইয়া গিয়াছিল (ল° ।৭৮)। মহাভারতেও (দ্রোণপর্ব) চাকার উপরে শতঘ্নী বাহিত হইয়াছিল। বহুকাল পরে বাশিষ্ঠ ধনুর্বেদে কামানের নাম শতঘ্ন হইয়াছে। প্রাচীন নামের অর্থ ধরিয়া অর্থান্তর প্রাপ্তির ভূরি ভূরি উদাহরণও আছে।

৫. ভুশুণ্ডী। শব্দটি, ভূ-শুণ্ডী, কি ভুশুণ্ডী, কি ভুষুণ্ডী, জানা নাই। অমরাদি কোশে নাই। বৈজয়ন্তী কোশে, ভুশুণ্ঠি। অর্থ, "দারুময়ী বৃত্তায়ঃ কীল-সঞ্চিতা" গদা বোধ হয়, গোল-লৌহ-পিণ্ডাগ্র গদাবিশেষ। প্রয়োগ দেখি। মৎস্যপুরাণে (১৫১ অঃ), হরি কৃতান্ত-তুল্য ভুশুণ্ডী গ্রহণ করিয়া শুম্ভের মেঘবাহন 'পিপেষ' পিষিয়া মারিলেন। রামায়ণে (ল° ।৬০) "নিদ্রিত কুম্ভকর্ণকে জাগাইবার নিমিত্ত রাক্ষসেরা ভুশুণ্ডী মুষল ও গদা দ্বারা তাহাকে আঘাত করিতে লাগিল।" তিনই গদা। মহাভারতে (দ্রোণ ১৭৭), "খড়্গ, গদা, ভুশুণ্ডী, মুষল, শূল, শরাসন ও হস্তীচর্ম-সদৃশ বর্ম।" এখানে গদা ও মুষলের মাঝে ভুশুণ্ডী থাকাতে মনে হয়, উহা তদ্বৎ কিছু হইবে।

কিন্তু মহাভারতের (আদি ২২৭) টীকাকার নীলকণ্ঠ (১৬ খ্রীস্ট-শতাব্দ) ভুশুণ্ডী অর্থে লিখিয়াছেন, 'পাষাণ-ক্ষেপণ চর্মরজ্জুময় যন্ত্র'। এই যন্ত্র অদ্যাপি আছে। এক টুকরা চর্মের দুই প্রান্তে হ্রস্ব ও দীর্ঘ দোড়ী বাঁধিয়া চর্মের উপরে পাষাণ রাখিয়া বেগে ঘুরাইয়া হ্রস্ব রজ্জু ছাড়িয়া দেওয়া হয়। পাষাণ-খণ্ড বেগে দূরে গিয়া পড়ে। হুগলী আরামবাগে বলে হেঁটেল-চণ্ডী অর্থাৎ ইটাল-চণ্ডী। ইটা-ল কি-না ইট-ভাঙা। অতএব শব্দটি ভূ-শুণ্ডী, যে শুণ্ডাকার যন্ত্র দ্বারা ভূ (মৃৎপিণ্ড) নিক্ষিপ্ত হয়। লক্ষ্য-বেধে অভ্যাস থাকিলে এই নিক্ষেপ সাংঘাতিক হয়। ছেলেরা তালপাতা কিংবা দু-ভাঁজ দোড়ীর করে। বাঁকুড়ায় বলে 'ডেলাস' (ডেলা-অস্ত্র)। কবিকঙ্কণ চণ্ডীর কালকেতু হাটে "ভূষণ্ডী ডাবুশ খরশাণ" ক্রয় করিয়াছিল। নীলকণ্ঠের ভুশুণ্ডী এইরূপ হইবে। বাশিষ্ঠ ধনুর্বেদেও এই অর্থ। সেখানে আছে পদাতি সেনা, ভুশুণ্ডী কিংবা ধনু ধরিয়া গাছের আড়ালে থাকিয়া কিংবা গাছে

চড়িয়া যুদ্ধ করিবে। অর্থাৎ ভূশুণ্ডী দ্বারা পাষাণ অথবা ধনুর দ্বারা শর নিক্ষেপ করিবে।

৬. ঔর্বাগ্নি। কেহ কেহ ঔর্বাগ্নি, বারুদ মনে করিয়াছেন। কিন্তু বারুদকে অগ্নি বলিতে পারা যায় না। রামায়ণ-মহাভারতে, ঔর্বাগ্নি, বড়বানল। রামায়ণে (কিষ্। ৪৪), সুগ্রীব সীতার অন্বেষণে চতুর্দিকে বানর (অনার্য-মানুষ) পাঠাইলেন। বলিলেন, "পূর্বদিকে সপ্ত রাজ্যোপশোভিত যবদ্বীপ অন্বেষণ করিবে। জলোদসাগরে ব্রহ্মা ঔর্ব ঋষির কোপজ তেজে সর্বভূত-ভয়াবহ এক বৃহৎ অশ্বীমুখ করিয়াছেন। সে অদ্ভুত তেজে চরাচর বিনষ্ট হইয়া থাকে। বড়বামুখে পতনের ভয়ে প্রাণিগণের নাদ শুনিতে পাওয়া যায়।" এই বর্ণনা আগ্নেয়গিরির উৎক্ষেপের। সুমাত্রার নিকটস্থ ক্রাকাতোয়া গিরির ভয়ঙ্কর উৎক্ষেপ প্রসিদ্ধ। বোধ হয়, পূর্বকালেও এইরূপ উৎক্ষেপ হইত, এবং তাহা দেখিয়া রামায়ণে লেখা। আগ্নেয়গিরিটি দেখিতে বড়বামুখ মনে হইতে পারে। উর্বী, পৃথিবীর ভূমি জাত অগ্নি ঔর্বাগ্নি। কালিদাসের শকুন্তলায়, "অদ্যাপি নূনং হরকোপবহ্নিস্ত্বয়ি জ্বলত্যৌর্ব ইবাম্বুরাশৌ।" ঔর্ব বড়বানল, ঔর্বাগ্নি বড়বাগ্নি।

৭. নালীক। পূর্বে নালীক দেখা গিয়াছে। নালীক ও নারাচ প্রায়ই একত্র উল্লিখিত হইয়াছে, যেন উভয়ের মধ্যে প্রয়োগ কিংবা সাদৃশ্য ছিল। নারাচ জানি, সমগ্র লৌহময় বাণ, নির্ভট ও শিরাল। ভারী বলিয়া এই বাণ যে-সে ছুঁড়িতে পারিত না। তখন সরু নলের কল্পনা আসিয়া থাকিবে। দৃঢ় ও লঘু করিতে গেলেই নলাকার চাই। বৈজয়ন্তী লিখিয়াছেন, নালিক বাণ। প্রয়োগ দেখি। রামায়ণে (অযোধ্যা, ২৫), "শ্রীরাম-নিক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণাগ্র নালীক ও নারাচ এবং বিকর্ণী দ্বারা ছিদ্যমান হইয়া নিশাচরেরা ভীম আর্তস্বর করিতে লাগিল।" এখানে স্পষ্ট লিখিত আছে, রামের "ধনুর্গুণচ্যুত বাণ"। নালীক, সুষির কিন্তু সূচ্যগ্র বাণ। কর্ণী, যে শরফলে কর্ণ আছে। বিকর্ণী বোধ হয় দ্বিকর্ণীর রূপান্তর। রামায়ণে (আরণ্য, ২৬), "রাম একশত কর্ণী দ্বারা একশত রাক্ষস বধ করিলেন।" মহাভারতে (ভীষ্ম, ৯৫, ৩১) "কর্ণী-নালীক-সায়কৈঃ", (ভীষ্ম, ১০৩, ১৩) "কর্ণী-নালীক-নারাচৈঃ", সায়ক অর্থে বাণ। বোধ হয়,

কর্ণী-নালীক এক পদ। নালীকের কর্ণ থাকিত, সুতরাং বাণটি আরও ভীষণ। সৌপ্তিক পর্বে (১০, ১৫), "কর্ণী-নালীক দংষ্ট্রস্য খড়্গাজিহ্বস্য সংযুগে।" যাহার দংষ্ট্রা কর্ণী-নালীক, জিহ্বা খড়্গ। অতএব নালীক সূচ্যগ্রই বটে। স্ত্রী পর্বে (২০), "মহাত্মা ভীষ্ম কর্ণী নালীক ও নারাচ প্রভৃতি শর-নিচয়-নির্মিত শয্যায় শয়ান আছেন।" এখানে নালীক স্পষ্ট শর। বন্দুক উদ্‌ভাবনার পর উহা নলাকার বলিয়া নালীক নাম পাইয়াছিল। হিন্দীতে নাল নাম হইয়াছিল।

৮. অয়ঃ কণপ। মহাভারতে (আদি, ২২৭, ২৫), কৃষ্ণ ও অর্জুন অগ্নির ভোজন-তৃপ্তির নিমিত্ত খাণ্ডব-বন রক্ষা করিতেছেন, "অয়ঃকণপচক্রাশ্ম ভুশুণ্ড্যুদ্যত বাহবঃ।" হাতে অয়ঃ-কণপ, চক্রাশ্ম, ও ভুশুণ্ডী লইয়া। নীলকণ্ঠ তিনটিই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার ভুশুণ্ডীর অর্থ পূর্বে দেখিয়াছি, পাষাণ-ক্ষেপণ চর্মরজ্জু। চক্রাশ্ম—'অতি দূরে বড় বড় পাষাণ-নিক্ষেপের কাষ্ঠময় যন্ত্র। ইহার ঘূর্ণন-বেগে পাষাণ নিক্ষিপ্ত হয়।' চক্রনাম হইতে বুঝিতেছি, এটি কাষ্ঠময় চক্র। সে যাহা হউক, পাষাণ-ক্ষেপণের দুইটি যন্ত্র পাইলাম। "অয়ঃ-কণপং—অয়ঃ-কণান্ লৌহগুলিকাঃ পিবতীতি তথাবিধমাগ্নেয়ৌষধিবলেন গর্ভস্থতা লোহগুলিকাস্তারকাইব বিকীর্যন্তে যেন তৎ যন্ত্রং লোহময়ং।" যে লৌহময় যন্ত্রের গর্ভস্থ লৌহগুলিকা আগ্নেয়ঔষধিবলে তারকার ন্যায় বিকীর্ণ হইয়া পড়ে। অবিকল বন্দুক। কিন্তু বন্দুক, লোহগুলিকা পান করে না, বমন করে। আর, হাতে বন্দুক থাকিতে কৃষ্ণার্জুন পাষাণ ছুঁড়িতে গেলেন কেন? চক্রাশ্ম নিশ্চয় গুরুভার, নইলে অতি দূরে মহান্ পাষাণ নিক্ষিপ্ত হইতে পারে না। 'চক্রাশ্ম' এক পদ কি না, কে জানে। সে যাহা হউক, নীলকণ্ঠের ব্যাখ্যায় সন্দেহ হইতেছে। অমরকোশে (লিঙ্গসংগ্রহবর্গ ২০) কণপ শব্দ আছে। ক্ষীরস্বামী অর্থ করিয়াছেন, প্রাস-বিশেষ। ভানুজি-দীক্ষিত লিখিয়াছেন, কণং পাতি পিবতি বা। অর্থ যাহাই হউক। অমরের কোনো কোনো সংস্করণে শব্দটি কণপ নয়, কণয়। সর্বানন্দ অর্থ করিয়াছেন, শর-ভেদে। কেশবকোশেও কণয় শর-ভেদে। ইহাতে কণ-প নাই। মহেশ্বর টীকায়, কুণ-প আছে, কণ-প, কণয় নাই। কণ-প শব্দের প্রচলিত অর্থ, শর। অমরে এই অর্থ। কিন্তু মহেশ্বর দিয়াছেন,

কুণপ শর-ভেদে। শব্দকল্পদ্রুমে, কুণপ শব্দের এক অর্থ বড়্শা ইতি ভাষা। অতএব দেখা যাইতেছে, কণ-প, কণ-য়, কুণ-প, একেরই তিন রূপ। নাগরী প য অক্ষরে ভ্রম হইয়া থাকিবে। য স্থানে প -এর উদাহরণ আরও আছে। সে যাহা হউক, অয়ঃ-কণপ লোহার বড়্শা পাইতেছি। ইহার দণ্ড কাঠের না হইয়া লোহার। পাষাণের তুল্য এটি নিক্ষেপ্যও বটে। মৎস্যপুরাণে (১৫০-৭৩), "চক্র কুণপ প্রাস ভুশুণ্ডী পট্টিশ", পরে পরে একত্র আছে। মহাভারতের শ্লোকটিতেও 'কণপ ভুশুণ্ডী' আছে। নীলকণ্ঠ খ্রীস্ট ষোড়শ শতাব্দে ছিলেন, এবং বন্দুক কামান দেখিয়াছিলেন। ইদানী আমরা যেমন বন্দুক কামান দেখিয়া প্রাচীন নানা অস্ত্রে বন্দুক কামান পাইতেছি, তিনিও তেমনই পাইয়া থাকিবেন।

৯. অয়োগুড। কোথাও লৌহগুলিকা দেখিলে, কিন্তু বারুদ না দেখিলে, বন্দুক কল্পনা মিথ্যা। মহাভারতে (বন-পর্বে, সৌভবধ বৃত্তান্তে) "দ্বারকাপুরী চক্র লগুড় তোমর অঙ্কুশ শতঘ্নী লাঙ্গল ভুশুণ্ডী অয়োগুডক খড়্গ চর্ম ও পরশু প্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিতা।" মৎস্যপুরাণে (১৫৩-১৩৩) "জম্ভাসুর দেব-সৈন্যের প্রতি প্রাস পরশ্বধ চক্র বাণ বজ্র মুদ্গর কুঠার খড়্গ ভিন্দিপাল এবং অয়োগুড বর্ষণ করিতে লাগিল।" অয়োগুড = অয়োগুল, লোহগুলিকা। কিন্তু কে জানে লোহার গুলী বাটুলের মতন ছোঁড়া হইত কি না।

সেকালে গুলতই বা গুলতি ও বাঁটুল অবশ্য ছিল। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র শাস্ত্রী তৎসম্পাদিত বাশিষ্ঠধনুর্বেদের ভূমিকায় অগ্নিপুরাণ হইতে উপেক্ষক নামক চাপের বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়াছেন। 'ইহা বাঁশের, দীর্ঘে তিন হাত, বিস্তারে দুই অঙ্গুলী। ইহাতে দুইটি রজ্জু থাকে'। (আমি বঙ্গবাসীর মুদ্রিত অগ্নিপুরাণে এই শ্লোক পাই নাই।) অয়োগুড শব্দের অয়স্ অর্থে লৌহ ব্যতীত অন্য ধাতুও বুঝায়।

১০. তুলা-গুড। মহাভারতের বনপর্বে (৪২ অঃ) অর্জুনের স্বর্গ-আগমনের নিমিত্ত ইন্দ্র স্বীয় রথ পাঠাইলেন। রথে অসি, শক্তি, ভীমগদা, দিব্যপ্রভব প্রাস, মহাপ্রভা বিদ্যুৎ, তথৈব অশনি, চক্রযুক্ত তুলা-গুড় ছিল। তুলা-গুড কেমন? বায়ুস্ফোট, অশনির্ঘাত, মহামেঘসান। রথে জ্বলিতানল ভীষণকায় নাগ, ও ধবল উপল ছিল।

ইন্দ্রের অস্ত্র বর্ণনায় কবি অত্যুক্তির অবসর পাইয়াছেন। তথাপি কবি অজ্ঞাত অস্ত্র কল্পনা করেন নাই। নাগ, নাগপাশের মুখস্বরূপ নাগ। ধবল উপল স্ফটিক পাষাণ। কিন্তু চক্রযুক্ত তুলা-গুডের বর্ণনা পড়িলে হঠাৎ কামান মনে হয়। নীলকণ্ঠ লিখিয়াছেন, "তুলাগুডাঃ ভাণ্ডগোলকাঃ ভাণ্ডানি তু নাল বন্দুখ্ ইত্যাদি ম্লেচ্ছভাষয়া প্রসিদ্ধানি। ... বায়ুস্ফোটাঃ বেগবশাদ্ বায়ুং জনয়ন্তঃ সনির্ঘাতা অশনিধ্বনিযুক্তাশ্চ মহামেঘস্বনাঃ।" কিন্তু নীলকণ্ঠের ব্যাখ্যায় সন্দেহ হইতেছে। রথে কামান থাকিতে পাথর কেন? নরলোকে নাই থাকে, ইন্দ্রের অস্ত্রের মধ্যে অন্য কোথাও কামান পাই নাই, তুলা-গুড অস্ত্রও পাই নাই। অতএব শব্দার্থ ধরিতে হইতেছে। গুড = গুল = গোল (গোলা)। এই গোলা কিসের দ্বারা বিক্ষিপ্ত হইত? তুলা দ্বারা। তুলা কি? শাশ্বতকোশ (৭ম খ্রীস্ট-শতাব্দ) তুলা শব্দের পাঁচ-ছয়টি অর্থ দিয়াছেন। তন্মধ্যে একটি অর্থ ভাণ্ড আছে বটে, কিন্তু সে ভাণ্ড পাত্র নয়, বণিক্‌ধন (দোকানের মাল), ও মূলধন (ইংরেজী 'ফাণ্ড')। তুলা যাহা দ্বারা তুলিতে পারা যায়। শাশ্বতকোশে এই অর্থে ঘরের চালের তুলা। বাংলায় বলি, তোড়া। তুলা-যন্ত্রের তুলাদণ্ড হইতে বাঙ্গালায় বলি তোড়া (ইংরেজীতে 'লীভার')। আমার বোধ হয়, তুলা-গুড যে-গোলা তুলা দ্বারা নিক্ষেপ্য। অয়োগুডও এই বোধ হয়। তুলা-গুডের বিশেষণ অগ্নি ও ধূমের নামগন্ধ নাই।

উপরে দশটি অস্ত্র দেখা গেল। একটাকেও বন্দুক কিংবা কামান মনে করিবার কোনো হেতু পাওয়া গেল না। অস্ত্রশস্ত্রের অসংখ্য নাম ছিল। যত নির্মাণ, যত আকৃতি, যত কর্ম, তত নাম। প্রথমে বর্গে ভাগ করিতে না পারিলে কেবল নাম ধরিয়া গেলে কিছুই বুঝিতে পারা যাইবে না। আরও মনে রাখিতে হইবে, মায়া-যুদ্ধ ছিল, ইহাতে রাক্ষস ও অসুরেরা দক্ষ ছিল। মায়া, সবই মিথ্যা। আমি অনেকের মুখে শুনিয়াছি, আমাদের গ্রামে মনসা-পূজার ঝাঁপানের দিন সর্পবিদ্যার গুণিন্ শত শত লোকের সম্মুখে নাগ-যুদ্ধ করিত। দুই পক্ষের গুণিন্ সর্প সৃষ্টি করিত। কেমনে করিত, কে জানে। যাঁহারা ভোজবিদ্যা ও ভানুমতী-বিদ্যার পরিচয় পাইয়াছেন, তাঁহারা জানেন

ভারতীয় ইন্দ্রজাল অদ্বিতীয়। ইন্দ্রজালে দ্রব্য সত্য, মায়াতে দ্রব্যও মিথ্যা।

মায়িক অস্ত্র ব্যতীত কতকগুলি দিব্যাস্ত্র ছিল। এসকলের কর্ম অদ্ভুত দেখিয়া 'দিব্য' এই নাম দেওয়া হইত। নির্মাণ ও সন্ধান গুপ্ত রাখা হইত। ইহাই স্বাভাবিক, কারণ গুপ্ত না রাখিলে উদ্দেশ্য ব্যর্থ। দিব্যাস্ত্র-লাভের নিমিত্ত তপস্যা করিতে হইত, নির্মাণ ও সন্ধান শিখিতে অধ্যবসায়ী হইতে হইত। এইসকল অস্ত্রের নামে দেবতার নাম যুক্ত থাকিত। প্রয়োগের পূর্বে সে দেব-গুরুকে প্রণাম করা অবশ্য স্বাভাবিক। প্রয়োগের মন্ত্র, অর্থাৎ প্রয়োগ-ক্রম-জ্ঞাপক শ্লোক অভ্যাস করা হইত। মন্ত্র ভুলিয়া গেলে অস্ত্র ব্যর্থ হইয়া পড়িত। দিব্যাস্ত্রের অপর নাম মান্ত্রিক হইবার কারণ এই। আসুর অস্ত্রের নাম মায়িক। এই দুই ভাগের অস্ত্র ব্যতীত যাবতীয় অস্ত্র মানুষাস্ত্র, অর্থাৎ সাধারণ।

রিপুসৈন্যের ব্যূহভেদ করাই সেনাপতির প্রধান লক্ষ্য থাকে। এ নিমিত্ত রিপুসৈন্যের প্রতি মদ-মত্ত-গজ চালনা করা হইত। এই কারণে কামন্দক মদ-মত্ত-মাতঙ্গের প্রশংসা করিয়াছেন। আর এক সাধারণ উপায়, রিপুব্যূহে অগ্নি-বাণ-নিক্ষেপ। সংহত সেনার উপরে প্রজ্বলিত অগ্নি-পিণ্ড পড়িতে থাকিলে সেনা অসংহত হইয়া পড়ে। অলাত-চক্রের সম্মুখীন করিয়া যুদ্ধগজকে ভয়হীন করা হইত। তথাপি পশুমাত্রেই আগুন যত ভয় করে, অস্ত্র শস্ত্র তত করে না। যুদ্ধযাত্রার পূর্বে তেল ধূনা জউ (যতু) তুষ দিয়া অগ্নি-পিণ্ড-নির্মাণ, এক কর্ম ছিল। বোধ হয়, পিণ্ড-নিক্ষেপের নিমিত্ত তাহাতে দোড়ী কিংবা বাঁশ বদ্ধ করা থাকিত। মহাযন্ত্র ক্ষেপণীও ছিল। রণক্ষেত্রে সেসকল পিণ্ড প্রজ্বলিত করিয়া রিপুসৈন্যে নিক্ষিপ্ত করা হইত। মুসলমানদের মহরমে যে বনেটি খেলা দেখি, একখণ্ড বাঁশের দুই প্রান্তে প্রজ্বলিত অগ্নিপিণ্ড, সেটা প্রাচীন কালের বাণ-যষ্টি। ভারতে ইহার উৎপত্তি হইয়াছিল। ধূনা-জউর অগ্নিতে জল ঢালিলেও শীঘ্র নিবে না। গ্রীক বীর আলেকসন্দারের সহিত যুদ্ধকালে পুরু-রাজার সেনার অগ্নিবর্ষণ দ্বারা যবন-সেনা ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধেও অগ্নিবাণ প্রচুর নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকিবে। এটি মানুষ-অস্ত্র। সকলেই জানিত, এবং অগ্নি-

নির্বাপণ নিমিত্ত রণক্ষেত্রে জল, বালি, ধূলি সংগৃহীত থাকিত। মহাভারতে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের উদ্‌যোগ পড়িলে এইসকল বৃত্তান্ত পাওয়া যাইবে। বনপর্বে (২৮২ অঃ) লঙ্কাপুরী-বর্ণনায় লিখিত আছে, এই পুরী অগাধজল-পরিপূর্ণ সাতটি পরিখায় পরিবেষ্টিত। প্রথম প্রাকারে খদির কাষ্ঠ-নির্মিত শঙ্কু (গুরুভার লাঠি); দ্বিতীয়ে কপাট-যন্ত্র (কৌটিল্যে ইহার নাম বিশ্বাসঘাতী, এমন নির্মিত যে, শত্রু সে কপাটপথে আসিলে কপাট পরিখার জলে নিমগ্ন হইত। ডাকাতের দেশে দুতলা বাড়ির উপরের সিঁড়িতে এইরূপ কপাট-যন্ত্র থাকিত, ডাকাত পরিখার জলে না পড়িয়া উপর হইতে নীচে প্রায় কুয়ার তলে পড়িয়া যাইত); তৃতীয় প্রাকারে লগুড় ও প্রস্তর গোলক; চতুর্থে সর্প ও যোদ্ধা; পঞ্চমে সর্জরস (ধুনা) ও ধূলিপটল; ষষ্ঠে মুসল আলাত নারাচ তোমর খড়্গ পরশু ও শতঘ্নী; সপ্তমে মোম ও মুদ্গর (এখানে মোম কেন, বুঝিতে পারিলাম না)।

ধনু দ্বারা যে অগ্নিবাণ নিক্ষিপ্ত হইত, সে বাণ আগ্নেয়াস্ত্র নামে আখ্যাত হইত। উপরে ব্রহ্মাস্ত্রের কর্ম দেখা গিয়াছে। আরও কয়েকটা দেখি। রামায়ণে (ল°। ১০০), রাম ধনু দ্বারা আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। কোনোটা অগ্নিদীপ্তমুখ, কোনোটা সূর্য-মুখ, গ্রহ-মুখ, নক্ষত্র-মুখ, মহোল্‌কামুখ। অগ্নিতে বাণের লৌহময় ফল উত্তপ্ত হইয়া এই এই রূপ দেখাইত। রামায়ণে (ল°। ১০১), রাবণের ধনু হইতে দীপ্তিমান চক্র (গোলাকার বলিয়া নাম 'সৌরাস্ত্র') নির্গত হইতে লাগিল। রাবণের অষ্টঘণ্টাযুক্ত ও সতেজ দীপ্যমান শক্তি জ্বলিয়া উঠিল এবং লক্ষ্মণের বক্ষঃস্থলে নিমগ্ন হইল। মৎস্যপুরাণে (১৫০ অঃ) কুবের কার্মুকে দিব্য গারুড়বাণ সন্ধান করিলেন। তাঁহার কার্মুক হইতে প্রথমে ধূমরাশি অনন্তর কোটি কোটি প্রজ্বলিত স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল। (১৫৩ অঃ), আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা শরীর রথ সারথি জ্বলিয়া উঠিল, ঐষিকাস্ত্র জ্বলিত হইয়া উঠিল ইত্যাদি।

কিন্তু আগ্নেয়াস্ত্র ব্যতীত অন্য বহুবিধ অস্ত্র ছিল। বারুণাস্ত্র দ্বারা জলধারা পড়িত, বায়ব্যাস্ত্র দ্বারা মেঘ (ধূম ?) নিরাকৃত হইত। এসকল অস্ত্রের নির্মাণ অজ্ঞাত; এই হেতু মনে হয় কবিকল্পনা। কিন্তু কৌটিল্য পড়িলে সে ভ্রম থাকে না। ইহাতে পর্জন্যক নামে এক যন্ত্রের উল্লেখ আছে। সেটি স্থির যন্ত্র,

এখানে ওখানে আনিতে পারা যাইত না। ইহাকে জলপূর্ণ করিয়া প্রাকারে রাখা হইত। বোধ হয়, শত্রু আসিলে নলপথে জল গিয়া তাহাকে প্লাবিত করিত। কবির অত্যুক্তি এইটুকু যে, ধনুর্দ্বারা এত জল প্রেরিত হইতে পারে না। এইরূপ বায়ব্যাস্ত্র নিশ্চয় ক্ষুদ্রাকার। কৌটিল্য পড়িলে সম্মোহন বাণেও অবিশ্বাস থাকে না। তৎকালে বম্‌ও ছিল, কিন্তু তাহাতে বারুদ থাকিত না। অত্যুক্তি থাকিতে পারে, কিন্তু সর্বৈব মিথ্যা নয়।

যে কালের কথা হইতেছে, মোটামুটি দ্বিতীয় খ্রীস্ট-শতাব্দ পর্যন্ত, বারুদের কোনো চিহ্ন পাই না। হরিবংশে না, মার্কণ্ডেয় পুরাণেও না। আমার বিশ্বাস, বারুদের উৎপত্তি এই দেশে, চীনে কদাপি নয়, পারস্যেও নয়। বন্দুক ও কামানের উদ্‌ভাবনাও এই দেশে হইয়াছিল, বোধ হয় সপ্তম খ্রীস্ট-শতাব্দের পূর্বে নয়। প্রাচীন ধনুর্বেদের অঙ্গ নয় বলিয়া এখানে এ বিষয় আলোচনায় বিরত হইলাম।

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

॥ ১৩৫০ বৈশাখ হইতে নিয়মিত প্রকাশিত হইতেছে ॥

প্রতি গ্রন্থ আট আনা

১। সাহিত্যের স্বরূপ ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। চতুর্থ মুদ্রণ
২। কুটিরশিল্প ॥ শ্রীরাজশেখর বসু। চতুর্থ মুদ্রণ
৩। ভারতের সংস্কৃতি ॥ শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী। চতুর্থ মুদ্রণ
*৪। বাংলার ব্রত ॥ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তৃতীয় মুদ্রণ
*৫। জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার ॥ শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য। তৃতীয় মুদ্রণ
৬। মায়াবাদ ॥ মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ। তৃতীয় মুদ্রণ
৭। ভারতের খনিজ ॥ শ্রীরাজশেখর বসু। তৃতীয় মুদ্রণ
*৮। বিশ্বের উপাদান ॥ শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য। তৃতীয় মুদ্রণ
৯। হিন্দু রসায়নী বিদ্যা ॥ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। দ্বিতীয় মুদ্রণ
*১০। নক্ষত্র-পরিচয় ॥ শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত। তৃতীয় মুদ্রণ
*১১। শারীরবৃত্ত ॥ ডক্টর রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল। তৃতীয় মুদ্রণ
১২। প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী ॥ ডক্টর সুকুমার সেন। দ্বিতীয় মুদ্রণ
*১৩। বিজ্ঞান ও বিশ্বজগৎ ॥ শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়। তৃতীয় মুদ্রণ
১৪। আয়ুর্বেদ-পরিচয় ॥ মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন। দ্বিতীয় মুদ্রণ
১৫। বঙ্গীয় নাট্যশালা ॥ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃতীয় মুদ্রণ
*১৬। রঞ্জনদ্রব্য ॥ ডক্টর দুঃখহরণ চক্রবর্তী। দ্বিতীয় মুদ্রণ
১৭। জমি ও চাষ ॥ ডক্টর সত্যপ্রসাদ রায়চৌধুরী। দ্বিতীয় মুদ্রণ
১৮। যুদ্ধোত্তর বাংলার কৃষি ও শিল্প ॥ ডক্টর কুদরত-এ-খুদা। দ্বিতীয় মুদ্রণ
১৯। রায়তের কথা ॥ প্রমথ চৌধুরী। দ্বিতীয় মুদ্রণ
২০। জমির মালিক ॥ শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত
২১। বাংলার চাষী ॥ শ্রীশান্তিপ্রিয় বসু। দ্বিতীয় মুদ্রণ
২২। বাংলার রায়ত ও জমিদার ॥ ডক্টর শচীন সেন। দ্বিতীয় মুদ্রণ
২৩। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ॥ শ্রীঅনাথনাথ বসু। তৃতীয় মুদ্রণ
২৪। দর্শনের রূপ ও অভিব্যক্তি ॥ শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য। দ্বিতীয় মুদ্রণ
২৫। বেদান্ত-দর্শন ॥ ডক্টর রমা চৌধুরী। দ্বিতীয় মুদ্রণ

* সচিত্র

২৬। যোগ-পরিচয় ॥ ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার। দ্বিতীয় মুদ্রণ
২৭। রসায়নের ব্যবহার ॥ ডক্টর সর্বাণীসহায় গুহসরকার। দ্বিতীয় মুদ্রণ
*২৮। রমনের আবিষ্কার ॥ ডক্টর জগন্নাথ গুপ্ত। দ্বিতীয় মুদ্রণ
*২৯। ভারতের বনজ ॥ শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু। দ্বিতীয় মুদ্রণ
৩০। ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাস ॥ রমেশচন্দ্র দত্ত
৩১। ধনবিজ্ঞান ॥ শ্রীভবতোষ দত্ত। দ্বিতীয় মুদ্রণ
*৩২। শিল্পকথা ॥ শ্রীনন্দলাল বসু। দ্বিতীয় মুদ্রণ
৩৩। বাংলা সাময়িক সাহিত্য ॥ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৪। মেগাস্থেনীসের ভারত-বিবরণ ॥ শ্রীরজনীকান্ত গুহ
*৩৫। বেতার ॥ ডক্টর সতীশরঞ্জন খাস্তগীর। দ্বিতীয় মুদ্রণ
৩৬। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ॥ শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ
৩৭। হিন্দু সংগীত ॥ প্রমথ চৌধুরী ও শ্রীইন্দিরা দেবী
৩৮। প্রাচীন ভারতের সংগীত-চিন্তা ॥ শ্রীঅমিয়নাথ সান্যাল
৩৯। কীর্তন ॥ অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র
*৪০। বিশ্বের ইতিকথা ॥ শ্রীসুশোভন দত্ত
৪১। ভারতীয় সাধনার ঐক্য ॥ ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত। দ্বিতীয় মুদ্রণ
৪২। বাংলার সাধনা ॥ শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী। দ্বিতীয় মুদ্রণ
৪৩। বাঙালী হিন্দুর বর্ণভেদ ॥ ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়
৪৪। মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী ॥ ডক্টর সুকুমার সেন
৪৫। নব্যবিজ্ঞানে অনির্দেশ্যবাদ ॥ শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত
*৪৬। প্রাচীন ভারতের নাট্যকলা ॥ ডক্টর মনোমোহন ঘোষ
৪৭। সংস্কৃত সাহিত্যের কথা ॥ শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী
৪৮। অভিব্যক্তি ॥ শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর
*৪৯। হিন্দু জ্যোতির্বিদ্যা ॥ ডক্টর সুকুমাররঞ্জন দাশ
৫০। ন্যায়দর্শন ॥ শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য সপ্ততীর্থ শাস্ত্রী
৫১। আমাদের অদৃশ্য শত্রু ॥ ডক্টর ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৫২। গ্রীক দর্শন ॥ শ্রীশুভব্রত রায় চৌধুরী
৫৩। আধুনিক চীন ॥ থান য়ুন শান
৫৪। প্রাচীন বাংলার গৌরব ॥ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
*৫৫। নভোরশ্মি ॥ ডক্টর সুকুমারচন্দ্র সরকার
৫৬। আধুনিক য়ুরোপীয় দর্শন ॥ শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

* সচিত্র

*৫৭। ভারতের বনৌষধি ॥ ডক্টর অসীমা চট্টোপাধ্যায়
৫৮। উপনিষদ্ ॥ মহামহোপাধ্যায় শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী
৫৯। শিশুর মন ॥ ডক্টর সুখেনলাল ব্রহ্মচারী। দ্বিতীয় মুদ্রণ
৬০। প্রাচীন ভারতে উদ্ভিদ্‌বিদ্যা ॥ ডক্টর গিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার
৬১। ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ ॥ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
*৬২। ভারতশিল্পে মূর্তি ॥ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
*৬৩। বাংলার নদনদী ॥ ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়
৬৪। ভারতের অধ্যাত্মবাদ ॥ ডক্টর নলিনীকান্ত ব্রহ্ম
৬৫। টাকার বাজার ॥ শ্রীঅতুল সুর
৬৬। হিন্দু সংস্কৃতির স্বরূপ ॥ শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী
৬৭। শিক্ষাপ্রকল্প ॥ শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি
৬৮। ভারতের রাসায়নিক শিল্প ॥ ডক্টর হরগোপাল বিশ্বাস
*৬৯। দামোদর পরিকল্পনা ॥ ডক্টর চন্দ্রশেখর ঘোষ
৭০। সাহিত্য-মীমাংসা ॥ শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য
*৭১। দূরেক্ষণ ॥ শ্রীজিতেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
৭২। তেল আর ঘি ॥ শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায়
৭৩। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান ॥ প্রমথ চৌধুরী
৭৪। ভারতে হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনা ॥ শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী
৭৫। বিভক্ত ভারত ॥ শ্রীবিনয়েন্দ্রমোহন চৌধুরী
৭৬। বাংলার জনশিক্ষা ॥ শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল
*৭৭। সৌরজগৎ ॥ ডক্টর নিখিলরঞ্জন সেন
*৭৮। প্রাচীন বাংলার দৈনন্দিন জীবন ॥ ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়
৭৯। ভারত ও মধ্য এশিয়া ॥ ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী
৮০। ভারত ও ইন্দোচীন ॥ ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী
৮১। ভারত ও চীন ॥ ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী
৮২। বৈদিক দেবতা ॥ শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য
*৮৩। বঙ্গসাহিত্যে নারী ॥ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
*৮৪। সাময়িকপত্র সম্পাদনে বঙ্গনারী ॥ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
*৮৫। বাংলার স্ত্রীশিক্ষা ॥ শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল
৮৬। গণিতের রাজ্য ॥ ডক্টর গগনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়
*৮৭। রসাঞ্জন ॥ শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায়

* সচিত্র

৮৮। আথপথ্য ॥ ডক্টর কল্যাণী মল্লিক
৮৯। সরল ন্যায় ॥ শ্রীঅমরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য
৯০। খাদ্য-বিশ্লেষণ ॥ ডক্টর বীরেশচন্দ্র গুহ ও শ্রীকালীচরণ সাহা
৯১। ওড়িয়া সাহিত্য ॥ শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন
৯২। অসমীয়া সাহিত্য ॥ শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
৯৩। জৈনধর্ম ॥ শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন
৯৪। ভাইটামিন ॥ ডক্টর রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল
৯৫। মনস্তত্ত্বের গোড়ার কথা ॥ শ্রীসমীরণ চট্টোপাধ্যায়
৯৬। বাংলার পালপার্বণ ॥ শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী
*৯৭। জাভা ও বলির নৃত্যগীত ॥ শ্রীশান্তিদেব ঘোষ
৯৮। বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য ॥ ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী
৯৯। ধম্মপদ-পরিচয় ॥ শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন
১০০। সমবায়নীতি ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১০১। ধনুর্বেদ ॥ শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি
*১০২। সিংহলের শিল্প ও সভ্যতা ॥ শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত
১০৩। তন্ত্রকথা ॥ শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী
১০৪। বাংলার উচ্চশিক্ষা ॥ শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল
*১০৫। কুইনিন ॥ শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায়
১০৬। গ্রন্থাগার ॥ শ্রীবিমলকুমার দত্ত
১০৭। বৈশেষিক দর্শন ॥ শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য সপ্ততীর্থ শাস্ত্রী
১০৮। সৌন্দর্যদর্শন ॥ শ্রীপ্রবাসজীবন চৌধুরী
১০৯। পোর্সিলেন ॥ শ্রীহীরেন্দ্রনাথ বসু
১১০। কয়লা ॥ শ্রীগৌরগোপাল সরকার
*১১১। পেট্রোলিয়ম ॥ শ্রীমৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ
১১২। জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গনারী ॥ শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

* সচিত্র

ডাকের কাহিনী

নরেন্দ্রনাথ রায়



বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ। সংখ্যা ১১৪

প্রকাশ ১৩৬২ শ্রাবণ

মূল্য আট আনা

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী। ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা

মুদ্রক শ্রীগোপালচন্দ্র রায়
নাভানা প্রিন্টিং ওআর্ক্‌স্‌ লিমিটেড। ৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ। কলিকাতা

৩.১

নিবেদন

ভারতের ডাকঘরের জন্ম ও কর্ম কাহিনী সাধারণ পাঠকের জন্য লিখিত হইয়াছে।

প্রাচীন সংবাদ ও সাময়িক পত্রাদি, প্রাচীন দলিল, Geoffrey Clarke প্রণীত *The Post Office of India and its Story*, L. L. R. Hausburg, C. Stewart Wilson এবং C. S. F. Crofton লিখিত *The Postage and Telegraph Stamps of British India, Annual Reports of the Posts and Telegraphs Department. Activities* (1953-54)— Indian Posts and Telegraphs Department, Col Wilks প্রণীত *Historical Sketches of the South of India* প্রভৃতি গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। ভারতীয় ডাকবিভাগের ভূতপূর্ব ডিরেক্টর জেনারেল জি ক্লার্কের সংগৃহীত তথ্যের উপর নির্ভর করিয়াছি সবচেয়ে বেশি। সকলেরই নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

কলিকাতা
১৯৫৫

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

ডাকের জন্মকাহিনী

অবতরণিকা

বর্ষায় বারিধারা যখন অঝোরে ঝরে, মাঠে-ঘাটে জল থৈথৈ করে, দূর প্রবাসী প্রিয়জনের জন্যে মন হয় চঞ্চল, তখন ডাকঘর প্রিয়জনের লিপি আনিয়া মনে শান্তি দেয়। দূর-দূরান্তর হইতে সন্তানের কুশলবাণী বহিয়া আনিয়া স্নেহবশে পাগলপ্রায় মাতাকে ডাকঘরই সান্ত্বনা দেয়। ধনী-গরিব ছোট-বড় সকল নরনারীর জীবনের সুখদুঃখের সহিত ডাকঘর জড়িত হইয়া পড়িয়াছে নাড়ীর যোগের মত। আজিকার যুগে ডাকঘরকে বাদ দিয়া ব্যক্তির জীবন অচল, ব্যষ্টি স্থাণু, রাষ্ট্র হয় পঙ্গু।

পূর্বে মানুষের চিঠি ছাড়া পূজার ফুলফল বহিবার জন্যও রাজপুতনায় উদয়পুর ও পুষ্করের মধ্যে ডাকের ব্যবস্থা হইয়াছিল। এ-যুগের ডাকে পূজার ফুলফল বহিবার প্রয়োজন হয় না বটে, কিন্তু মানবসেবার জন্য সবকিছুই যায় ডাকে।

আজ দেশময় যেরূপ ডাকঘর দেখিতেছি উহা ইংরেজের উদ্যোগে সাধিত। ইংরেজ ভারতে আসিবার পূর্বেও আমাদের দেশে ডাকের ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু তাহা রাষ্ট্রের প্রয়োজনে যতটুকু দরকার তাহাই।

ইবন্ বটুটার বর্ণনায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মহম্মদ বিন্ তুঘলঘের রাজত্বে ভারতে রাষ্ট্রের জন্য ডাকের ব্যবস্থা ছিল। তিনি তখন ভারতবর্ষে পায়ে-চলা ও ঘোড়ায়-চড়া এই দুই শ্রেণীর পত্রবাহক দেখিতে পাইয়াছিলেন। ঘোড়ায়-চড়া পত্রবাহক চার মাইল অন্তর এবং পায়ে-চলা বাহক এক মাইল অন্তর থাকিত।

১৬৭২ খ্রীস্টাব্দে রাজা চিকদেওরাজ মহীশূর রাজ্যের রাজা হন। তিনি তাঁহার রাজ্যে ডাকের সুব্যবস্থা করেন। তথায় ডাককর্মচারীদিগকে ডাকের কাজের সঙ্গেসঙ্গে মফস্বলের সংবাদ সংগ্রহ করিয়া গোপনে রাজদরবারে

জানাইতে হইত। হায়দার আলী রাজা হইয়া গোপন সংবাদ সংগ্রহের ব্যবস্থা আরও ভালোভাবে করিয়াছিলেন।

শের শাহের রাজত্বে (১৫৪১ - ১৫৪৫) বাংলা হইতে সিন্ধুর তীর পর্যন্ত, এই দুই হাজার মাইল পথে ঘোড়ার ডাক বসিয়াছিল। প্রতি দুই মাইলে দুইটি করিয়া ঘোড়সওয়ার থাকিত। মুঘল সম্রাটদিগের আমলে ডাকের ব্যবস্থার আরও উন্নতি হয়। সম্রাট আকবরের সময়ে দশ মাইল অন্তর ঘোড়ার ডাকের আড্ডা ছিল। আগ্রা হইতে সিকান্দ্রার পথে ঐরূপ একটি ডাকের আড্ডাঘর এখনো দেখিতে পাওয়া যায়।

কোম্পানির আমলে ডাকঘর

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরেজগণ যখন ভারতে সাম্রাজ্যবিস্তার আরম্ভ করিলেন তখন দূরদূরান্তরে চিঠি পাঠাইতে তাঁহারা অত্যন্ত অসুবিধা ভোগ করিতে লাগিলেন। ১৭৬৬ খ্রীস্টাব্দে লর্ড ক্লাইভ সুশৃঙ্খলভাবে ডাকের ব্যবস্থা করিতে চেষ্টা করিলেন। তখন জমিদারদিগকে স্ব স্ব জমিদারির মধ্যে ডাকহরকরা যোগাইতে হইত। তজ্জন্য তাঁহারা ডাকহরকরার সংখ্যা অনুসারে খাজনা মাফ পাইতেন।

এই পর্যন্ত যে-সকল ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহা মুখ্যত গভর্নমেণ্ট-ডাকের জন্যই। জনসাধারণ উহার সুযোগ ভোগ করিতে পারে নাই। ১৭৭৪ খ্রীস্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস-এর আমলে জনসাধারণকে ডাকের সুযোগ দিবার জন্য নূতন ব্যবস্থা হইল। বে-সরকারী মাশুল ধার্য হইল। একখানা চিঠির জন্য প্রতি একশত মাইলে দুই আনা মাশুল দিতে হইত। তখনও ডাকটিকিট হয় নাই। নগদ পয়সা জমা দিলে চিঠি বা পার্শেলের সহিত তামার পাতের নিদর্শন বাঁধিয়া দেওয়া হইত।

সেই সময়ে কলিকাতার ডাকঘর চিঠি বিলির জন্য খোলা থাকিত সকাল

১০টা হইতে ১টা পর্যন্ত; এবং সন্ধ্যা ৬টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত প্রেরণের জন্য চিঠি গ্রহণ করা হইত। কলিকাতায় পোস্টমাস্টার তাঁহার কেরানীসহ সন্ধ্যায় গভর্নমেণ্ট হাউসে যাইয়া চিঠি বাছাই করিয়া পুলিন্দা তৈরি করিতেন, এবং তথা হইতেই ডাকবাহকের মারফতে হাঁটাপথে ডাক রওনা করিয়া দিতেন।

বঙ্গদেশের ব্যবস্থার অনুসরণ করিয়া ক্রমশঃ মাদ্রাজ এবং বোম্বাইতেও ডাকের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

১৭৮৬ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতা হইতে বোম্বাইতে পাক্ষিক ডাকের ব্যবস্থাও শুরু হইয়াছিল।

ইহার পর প্রায় পঞ্চাশ বৎসর ইংরেজ ভারতে রাজ্য বিস্তৃতির উপরেই নজর দিয়াছিলেন বেশি। ১৮২৭ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ইংরেজের প্রভুত্ব ভারতের প্রায় সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

এই বিস্তৃত এলাকায় বিভিন্ন প্রদেশের বড় বড় শহরের মধ্যে শুধু সরকারী চিঠি ও পার্শেল চলাচলের ব্যবস্থা গভর্নমেণ্ট করিয়াছিলেন। বে-সরকারী লোককে খাতিরে এইসব ডাকে চিঠি পাঠাইতে দেওয়া হইত।

প্রেসিডেন্সী শহরের পোস্টমাস্টার এ ডাকের ব্যবস্থা তদারক করিতেন। প্রতি জেলার অভ্যন্তরে স্থানীয় ডাকের ব্যবস্থার ভার ছিল জমিদারদিগের উপর। এই বিষয়ে জমিদারদিগের কর্তব্যের তালিকা ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দের ২০নং বেঙ্গল রেগুলেশনে নির্ধারিত হইয়াছিল। জেলার থানাগুলির সহিত জেলা শহরের মুখ্যত সরকারী ডাকের ব্যবস্থা তাঁহারা করিতেন। জেলার কালেক্টর ও ম্যাজিস্ট্রেটগণ স্ব স্ব জেলার অভ্যন্তরীণ ডাকঘর ও ডাকলাইনের জন্য দায়ী থাকিতেন। বিভিন্ন স্থানের ডাকব্যবস্থায় সঙ্ঘবদ্ধতা ছিল না। ফলে সর্বত্র এক নীতি, ব্যবস্থার ঐক্য ও একরূপ মাশুলের উদ্ভব হয় নাই।

কোথাও কোথাও দেশবাসীর ব্যক্তিগত বা যৌথ ডাক-ব্যবস্থা তখন পর্যন্ত ছিল। ডাকবহনের জন্য সর্বত্রই ছিল হরকরা-লাইন।

১৮৩৭ খ্রীস্টাব্দে ডাকের নূতন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইল। এখন হইতে স্থির হইল যে, ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে সর্বত্র চিঠি বহনের ব্যবস্থা হইবে গবর্নমেণ্টের একচেটিয়া কাজ। এই সময়ে বে-সরকারী ডাক বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হইল। তাহার পর বে-সরকারী ডাকে চিঠি পাঠাইলে প্রতি চিঠির জন্য পঞ্চাশ টাকা জরিমানা হইত। ডাকঘরের প্রাপ্য টাকা আদায় না হইলে স্থাবর ও অস্থাবর দ্রব্যাদি ক্রোক করা চলিত। উহাও না থাকিলে প্রাপক ও বাহকের বাইশ মাস পর্যন্ত জেল হইতে পারিত। এই আইন পরিবর্তিত হইয়া বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রচলিত রহিয়াছে। এখন যদি কেহ চিঠি সংগ্রহ করিয়া বিলি করে, তাহা হইলে তাহার জেল হইতে পারে।

কোম্পানির এলাকায় কোনো কোনো ব্যক্তিগত বা যৌথ ডাক-ব্যবস্থা উঠাইয়া দেওয়া হইল। ঐসব স্থলে সর্বত্রই যে গভর্নমেণ্টের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছিল তাহা নহে, তজ্জন্য অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছিল।

এই নূতন ব্যবস্থায় বিভিন্ন প্রদেশের যোগাযোগ ও বড় বড় শহরে ডাকঘর ইম্পিরিয়াল ডাকবিভাগের অধীন রহিল। আর, প্রতি জেলায় পল্লীর সহিত জেলা শহরের যোগস্থাপন করিল জেলা-ডাক-বিভাগের ডাকঘরগুলি। এই ডাকঘরগুলিই পল্লী অঞ্চলে ডাকঘরের অগ্রদূত। জেলার অভ্যন্তরীণ ডাক-ব্যবস্থা এই দেশে ইংরেজ আসিবার আগেই ছিল। তখন সব ঝুঁকি জমিদারের উপর ছিল। এখন এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে চালাইয়া রাখিবার দায়িত্ব জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের উপর পড়িল। লোক ও আংশিক খরচ যোগাইতেন জমিদারগণ। তাঁহারা ম্যাজিস্ট্রেটকে টাকা দিয়াই দায়মুক্ত হইতে চাহিতেন। এই উদ্দেশ্যে প্রতি জেলায় ডাক-সেস্ ধার্যের ব্যবস্থাও হইয়াছিল। যেখানে সেস্ ধার্য হয় নাই, সেখানে জেলা সরকার অথবা ইম্পিরিয়াল গভর্নমেণ্টের তহবিল হইতে খরচ যোগানো হইত। এই ব্যবস্থায় মুখ্যত জেলা সরকারের সুবিধার দিকে নজর

রাখিয়াই ডাকঘর খোলা হইত। নূতন ব্যবস্থায় মাশুল যাহাতে সর্বত্র একপ্রকার হয় তাহাও করা হইয়াছিল।

তাহার পর ক্রমশ জেলার ডাকঘরগুলিও ইম্পিরিয়াল ডাকবিভাগের অধীনে আসিতে আরম্ভ করিল। অবশ্য কাজ চালাইবার ব্যবস্থাই হস্তান্তরিত হইল; আর্থিক ব্যবস্থা রহিল স্থানীয় সরকারের হাতের মুঠোয়। ইম্পিরিয়াল ডাক-বিভাগ পল্লী অঞ্চলের ডাকঘরগুলি হাতে লইবার পরে জনগণের বিশ্বাস দৃঢ় হইল এবং ডাকঘরের কাজ বাড়িয়া চলিল। স্থানীয় ডাকঘর সম্পর্কে যে সেস্ আদায় ও ব্যয়ের ভার ম্যাজিস্ট্রেটের উপর ছিল উহাও ক্রমশ উঠিয়া গেল। ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে বাংলা, মাদ্রাজ ও আসাম প্রদেশের সকল ডাকঘর ইম্পিরিয়াল ডাকবিভাগের অধীনে চলিয়া গেল। ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দের ১লা এপ্রিল ভারতের সব স্থানের জেলা-ডাকব্যবস্থা উঠাইয়া দিয়া ইম্পিরিয়াল ডাকবিভাগ, অর্থাৎ বর্তমান ডাকবিভাগ মাত্র রহিল। তখন হইতে ডাকঘরের সব খরচই কেন্দ্রীয় ডাকবিভাগ বহন করিতে আরম্ভ করিল। ডাক-ব্যবস্থার জন্য প্রাদেশিক সরকারের সর্বপ্রকার আয় ও খরচ বন্ধ হইয়া গেল। জমিদারদিগের ডাক-সেস্‌ও উঠিয়া গেল। তাহারাও হরকরা যোগাইবার দায়িত্ব হইতে মুক্ত হইলেন।

১৮৩৭ খ্রীস্টাব্দের ব্যবস্থায় দূরত্ব এবং ওজন হিসাবে চিঠির মাশুল নির্ধারিত হইত। যেমন, ১ তোলার অনধিক একখানা চিঠির জন্য ২০ মাইলের মাশুল ছিল এক আনা, ১০০ মাইলে তিন আনা, এবং ১৪০০ মাইলে এক টাকা।

সংবাদপত্রের জন্য কম মাশুল ধার্য হইয়াছিল, কিন্তু ভারতের সংবাদপত্রের চেয়ে বিদেশী সংবাদপত্রের ডাকমাশুল কম ছিল।

পার্শেল ৬০০ তোলার চেয়ে বেশি পাঠানো যাইত না। প্রতি ৫০ মাইলে ৫০ তোলার জন্য মাশুল ছিল ছয় আনা। তদতিরিক্ত প্রতি ৫০ তোলার জন্য ৩০০ মাইল পর্যন্ত প্রতি ৫০ মাইলে লাগিত তিন আনা।

ইংরেজ রাজত্বে ভারতের ডাকঘর

(১৮৫৪ - ১৯৪৭)

১৮৩৭ সনের বিধি অনুযায়ী ডাকের ব্যবস্থা করিতে যাইয়া যেসকল অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল তাহা দূর করিয়া ডাকের নূতন ব্যবস্থা হইয়াছিল ১৮৫৪ সনে। এই ব্যবস্থাই কতকটা পরিবর্তিত হইয়া বর্তমান সময়েও চলিতেছে।

পূর্বের ন্যায় এইবারও চিঠি বহন ও বিলি গবর্নমেণ্টের একচেটিয়া কাজ বলিয়া গণ্য হইল।

১৮৫৪ সনে সর্বভারতীয় ডাকটিকিটের প্রচলন হইয়াছিল। তখন হইতে শুধু ওজনের উপর চিঠির মাশুল ধার্য হইল। সিকি তোলার অনধিক ওজনের চিঠির জন্য দুই পয়সা দিতে হইত। সিকি তোলার অধিক, কিন্তু আধ তোলার অনধিক ওজনের চিঠির জন্য লাগিত এক আনা।

সেই সময়ে শতকরা একজনের বেশি লোক লিখিতে ও পড়িতে পারিত না। যে অতি অল্পসংখ্যক লোক লিখিতে ও পড়িতে পারিত তাহাদিগের সুবিধার জন্য এবং জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার দিকে নজর রাখিয়া চিঠির মাশুল তখন সস্তা রাখিবার ব্যবস্থা হয়। কম দামের ডাকটিকিটের প্রচলন হয়।

১৮৬৬ সনে চিঠির মাশুল নূতন করিয়া ধার্য হইল। অর্ধ তোলা পর্যন্ত ওজনের চিঠির জন্য পূর্ব হারের মাশুল রহিল। উহার অতিরিক্ত প্রতি অর্ধ তোলার জন্য এক আনা হারে ধার্য হইল। পূর্বে এরূপ সংক্ষেপ ব্যবস্থা ছিল না।

১৮৬৯ সনে চিঠির মাশুল আরও কমাইয়া দেওয়া হয়। ১৮৯৮, ১৯০৫ এবং ১৯০৭ সনে মাশুল ক্রমশ হ্রাস পায়। ১৯১৮ সনে যুদ্ধের জন্য চিঠির মাশুল বৃদ্ধি পায়।

সর্বভারতীয় ডাকটিকিটের প্রচলনের সঙ্গেসঙ্গেই চিঠি ডাকে দিবার সময়েই ডাকটিকিট লাগাইবার কড়া আদেশ হইল। উহা না করিলে জরিমানা হইত। চিঠির মাশুলস্বরূপ চিঠির উপর ডাকটিকিট লাগানো না থাকিলে ডবল মাশুল আদায় হইত। ন্যায্য মাশুলের চেয়ে কম টিকিট লাগাইলে যে পরিমাণ কম থাকিত উহার দ্বিগুণ আদায় হইত। ঐ নীতিই এখন পর্যন্ত বেয়ারিং চিঠির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইতেছে। সংবাদপত্র বা মুদ্রিত কাগজ, পুস্তিকা প্রভৃতির প্রতি এই আদেশ প্রযোজ্য হইত না।

এই সময়ে সংবাদপত্র ও বুকপোস্টের মাশুল কম ধার্য হইল; কিন্তু ভারতে মুদ্রিত ও বিদেশ হইতে প্রাপ্ত সংবাদপত্র ইত্যাদির মধ্যে পার্থক্য রহিয়াই গেল। ভারতীয় সংবাদপত্রের চেয়ে বিদেশী সংবাদপত্র সস্তা মাশুলে আনা যাইত। ইহাতে ইংলণ্ডের সংবাদপত্র ভারতে আনিবার সুবিধা হইল। কিন্তু অতিরিক্ত মাশুলের জন্যই ভারতীয় সংবাদপত্রের ভারতের অভ্যন্তরেই প্রচার ব্যাহত হইতে লাগিল। এই জন্য তখনকার ভারতীয় সংবাদপত্রে, বিশেষ করিয়া বাংলাদেশের খবরের কাগজে, তীব্র অসন্তোষের প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়।

১৮৬৬ সনে সংবাদপত্রের ও বুকপোস্টের মাশুল আরও কমাইয়া দেওয়া হইল। ১৮৫৪ সনে ভারতীয় সংবাদপত্রের মাশুল ছিল প্রতি ছয় তোলায় বা উহার অংশের জন্য দুই আনা। ১৮৬৬ সনে হইল ১০ তোলার অনধিক ওজনে এক আনা; এবং অতিরিক্ত প্রতি ১০ তোলায় এক আনা।

বিদেশী ও ভারতে মুদ্রিত সংবাদপত্রের মাশুলের মধ্যে যে বিভেদ ছিল উহা ১৮৬৬ সনে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

১৮৯৮ সনে সংবাদপত্র রেজেস্ট্রি করিবার আইন প্রণয়ন হইয়াছিল। সেই হইতে এখন পর্যন্ত একমাত্র রেজেস্ট্রি করা সংবাদপত্রই সুলভ মাশুলে পাঠানো চলে।

১৮৩৭ সনে দূরত্ব হিসাবে মাশুল ধার্য হওয়াতে এখন আমরা আশ্চর্যান্বিত

হইয়া যাই ; কিন্তু তখনকার পথের অবস্থা চিন্তা করিলে এইরূপ আশ্চর্য হইবার কারণ থাকে না। ১৮৩৩ সনেও কলিকাতা হইতে বারাণসী পর্যন্ত সড়ক অনুন্নত ছিল গোরুর গাড়ির পথের মত। একমাত্র কলিকাতা হইতে বারাকপুর পর্যন্ত সড়কের প্রশংসাই সেই যুগে শুনিতে পাই। ১৮৫৪ সনে মিলিটারী বোর্ড উঠিয়া যাইয়া পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্টের সৃষ্টি হইল। সেই সময় হইতেই পথের উন্নতিসাধন শুরু হইয়াছে। ১৮৫২ সনে রেলগাড়ি চলে। ইহার পর হইতেই হরকরা ছাড়াও রেলে এবং সড়কে হালকা গাড়িতে ডাক বহা চলিত। কাজেই ডাকের ওজন তখন বৃদ্ধি করা সম্ভব হইয়াছিল।

এই সময়ে বিলাতের ডাক মাসে এক দিন আসিত। বোম্বাই হইতে কলিকাতায় দৈনিক দুই মণ কুড়ি সেরের বেশি ডাক পাঠানো সম্ভবপর হইত না।

এক শত বৎসর হইল ডাকটিকিটের প্রচলন হইয়াছে, তবুও বেয়ারিং চিঠির সংখ্যা কমে নাই। এখনও বৎসরে গড়ে প্রায় ২,৪৫,৪৬,৩৬৮ খানি বেয়ারিং চিঠি বিলির জন্য পাওয়া যায়।

নিরক্ষর লোকেরা ডাকটিকিটের ধার ধারে না। তাহারা পাঠায় বেয়ারিং চিঠি। ইহাতে খরচ ডবল হইলেও তাহারা মনে করে এই প্রণালীই নিরাপদ। কথাটা মিথ্যা নহে। বেয়ারিং চিঠি অর্থ-তহবিলের অংশ বলিয়া গণ্য হয়।

পোস্টকার্ড বেয়ারিং হয় না, কারণ তাহা হইলে প্রাপক উহা পড়িয়া ফেরত দিতে পারে। ডাকঘরের লোকসান হইবে। সেইজন্য বেয়ারিং পোস্টকার্ড বিলি করিবার ব্যবস্থা ছিল না।

তখন চিঠির প্রাপক অন্যত্র গেলে চিঠির ঠিকানা পরিবর্তন করিয়া তথায় পাঠাইতে হইলে নূতন মাশুল দিতে হইত। ১৮৬৯ সনে এই মাশুল বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। বর্তমান সময়ে ঠিকানা পরিবর্তনের জন্য নূতন মাশুল দিতে হয় না।

তখনকার দিনে চিঠি রেজিস্ট্রি করিতে হইলে রেজিস্ট্রি খরচ ডাকটিকিটে

লাগাইতে হইত না। নগদ পয়সায় দিতে হইত। এই বাবদ ডাকটিকিট লাগাইবার আদেশ হইল ১৮৬৬ সনে।

১৮৩৭ সনের আইনে ব্যবস্থা হইয়াছিল, জাহাজের কাপ্তেনকে বন্দরের ডাকঘর হইতে চিঠি সংগ্রহ করিতে হইবে, এবং সংগৃহীত চিঠি অপর বন্দরের ডাকঘরে দিতে হইবে। জাহাজের কাপ্তেন প্রতি চিঠির জন্য এক আনা হিসাবে কমিশন পাইতেন। ১৮৫৪ সনের আইনেও এই ব্যবস্থা বলবৎ রহিল।

১৮৩৭ সনে সরকারী কাজে বিনামাশুলে চিঠি বা প্যাকেট পাঠাইবার অধিকার কোনো কোনো সরকারী কর্মচারীকে দেওয়া হইয়াছিল। ১৮৫৪ সনে বিনামাশুলে সরকারী চিঠি পাঠাইবার ব্যবস্থা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। তখন হইতে প্রতি সরকারী বিভাগের নিকট হইতেও চিঠিপত্রের জন্য অর্থ আদায় করা হইত। নানা কারণে এই ব্যবস্থাও অসুবিধাজনক বিবেচিত হওয়ায় ১৮৬৬ সনে 'সার্ভিস স্ট্যাম্পে'র প্রচলন হইল। সরকারী চিঠিপত্রে উহা লাগাইতে হইত। এখনও ঐ ব্যবস্থা চলিতেছে।

তখন গবর্নমেণ্ট স্থির করিয়াছিলেন যে, ভারতীয় ডাকবিভাগের আয় জনগণের সুবিধার জন্যই ব্যয় হইবে। মুনাফা রাখিয়া গবর্নমেণ্টের তহবিলে অর্থসঞ্চয় করা উদ্দেশ্য নহে। গবর্নমেণ্টের সুদিন ও দুর্দিনে এই নীতি অনুসরণ করা হইয়াছে।

১৮৫৪ সন হইতেই ভারতীয় ডাকঘর সুগঠিত হইয়া উঠে। উহার পূর্বে প্রেসিডেন্সী পোস্টমাস্টারই ছিলেন পোস্টমাস্টার জেনারেল এবং প্রতি প্রদেশের ডাকবিভাগের কর্তা। মফস্বলের ডাকঘরগুলি ছিল জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনে। ১৮৫৪ সনে প্রথম ভারতের ডাকবিভাগ একজন ডিরেক্টর জেনারেলের অধীনে আসে। পোস্টমাস্টার জেনারেলের পৃথক পদও সৃষ্টি হয়। তিনি হন প্রতি প্রদেশের ডাকঘরের কর্তা। ছোট ছোট প্রদেশ বা এলাকার

প্রধান হন এক একজন চীফ ইন্সপেক্টর। পরে এই পদের নামকরণ হয় ডেপুটি পোস্টমাস্টার জেনারেল। এখন হইয়াছে ডিরেক্টর।

প্রতি ডাকঘরকে উহার হিসাব অ্যাকাউন্টান্ট জেনারেলের অধীন 'অডিট আপিসে' পাঠাইতে হইত। ১৮৬১ সনে ডাকঘরের হিসাব পরীক্ষা করিবার জন্য একটি পৃথক পদের সৃষ্টি হয়। উহার নাম 'কম্‌পাইলার অব পোস্ট অফিস অ্যাকাউণ্টস্'। ১৮৬৬-৬৭ সনে দৈনিক হিসাব পরীক্ষার জন্য ডাকঘরকে প্রধান ও শাখা হিসাবে ভাগ করা হয়। নূতন ব্যবস্থায় ডাকঘরগুলি হেড, সাব ও ব্রাঞ্চ এই তিন ভাগে বিভক্ত হইল।

হেড-আপিসগুলি সাধারণত জেলাশহরেই থাকিত। ডাকের সকল প্রকার কাজ যে স্থলে বেশি তথায় সাব-আপিস খোলা হইত। ব্রাঞ্চ আপিসগুলি সাধারণত পল্লী অঞ্চলের জন্যই। হেড-আপিস কেন্দ্রীয় ডাকঘর। অন্যান্য ডাকঘরের দৈনিক আয়ব্যয় ইহাকে প্রত্যহ বুঝিয়া লইতে হয়। সাব-আপিস ব্রাঞ্চ-আপিসের হিসাবনিকাশ ও কাজকর্মের উপর নজর রাখে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতে বড় ডাকঘর ছিল মাত্র ২০১টি, এবং ছোট ডাকঘর ছিল ৪৫১টি। ১৯৫২ সনে হইয়াছে ২৯,৬৩৩টি ডাকঘর। ইহার মধ্যে পল্লী অঞ্চলেই ২৪,৬৩৮টি। ২৯,৬৩৩টি ডাকঘরের মধ্যে হেড-পোস্টাপিস ২২৩, সাব-আপিস ৬,১৩৮, এবং ব্রাঞ্চ-আপিসের সংখ্যা ২৩,২৭২।

ঐ বৎসর ভারতে প্রতি ২৮ বর্গমাইলে এবং ৮,৪৭৫ জনের জন্য একটি ডাকঘর হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে প্রতি ১১ বর্গমাইলে এবং ৮,৮৩২ জন নর-নারীর মাথাপিছু একটি ডাকঘর আছে।

১৮৫৪ সনে চিঠি সর্ট বা বণ্টন করিবার ব্যবস্থা ছিল না। এক লাইনে অবস্থিত এক ডাকঘরকে উহার অগ্রে স্থিত প্রতি ডাকঘরের জন্য একটি করিয়া পুলিন্দা তৈরি করিয়া পাঠাইতে হইত। তখনও ডাকের থলি বা ব্যাগের চলন হয় নাই। কাগজের বা কাপড়ের পুলিন্দা ব্যবহৃত হইত। ১৮৬০ সনে

এই অসুবিধাজনক ব্যবস্থা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। তখন হইতে ডাক লাইনে কোনো কোনো চিঠি সর্ট করিবার ব্যবস্থা করা হইল।

মাশুল দেওয়া চিঠিতে লাল কালিতে এবং বেয়ারিং চিঠিতে কালো কালিতে তারিখ মোহরের ছাপ দেওয়া হইত।

১৮৫৪ সনের ব্যবস্থায় ডাকঘরের এক কর্মচারী অপর কর্মচারীর ত্রুটিবিচ্যুতি ধরিতে পারিলে যিনি ভুল করিয়াছেন তাঁহার জরিমানা হইত। এই জরিমানার টাকার শতকরা দশ টাকা পাঠাইতে হইত পোস্টমাস্টার জেনারেলের আপিসে, বাকি অংশ যিনি ভুল ধরিয়াছেন তিনি পাইতেন। একটি ডাকব্যাগ ভুলে অন্যত্র পাঠাইলে তিন টাকা, এবং একটি পার্শেল বা প্যাকেটের ভুল হইলে আট আনা জরিমানা হইত। ইহার ফলে বিভিন্ন ডাকঘরের মধ্যে রেষারেষি ও ঝগড়া প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল। তজ্জন্য ১৮৮০ সনে এই প্রথা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

পূর্বেই বলিয়াছি, জমিদারদিগের ব্যয়ে প্রতিষ্ঠিত ডাকঘর পল্লী-ডাকঘরের অগ্রদূত। এখন পল্লী অঞ্চলের ডাকঘরের পোস্টমাস্টারের প্রধান রোজগার অন্যত্র। তিনি হয় শিক্ষক, নয় তো দোকানী, অথবা জমিজমার উপর নির্ভর করিয়া সংসার চালাইয়া থাকেন। ডাকবিভাগের এজেণ্ট হিসাবে তিনি অবসর সময়ে ডাকঘরের কাজ চালাইয়া জনসেবা করেন। তজ্জন্য তিনি মাসে সামান্য ভাতা পান। বাংলার পল্লী অঞ্চলে, শুধু বাংলা কেন, ভারতের পল্লীর সর্বত্র এই শ্রেণীর ডাকঘরই প্রায় সব।

পল্লীর ডাকঘরের সাহায্যে শুধু যে পল্লীর সহিত বাহিরের যোগসূত্র স্থাপিত হইয়াছে তাহা নহে, সঞ্চয়ের অভ্যাসে, শিক্ষাপ্রচারে, ছোট ছোট ব্যবসা-বাণিজ্যেও সাহায্য হইয়াছে যথেষ্ট। ইহার মূলে রহিয়াছে শত শত পল্লীবাসী ডাক-এজেণ্টের নীরব দেশসেবা। তাঁহাদের সংখ্যা কম নহে। ১৯৫২ সনে ভারতরাষ্ট্রে ২৫,৫৫৮টি ডাকঘরের ভার ছিল এই এজেণ্টগণের উপর।

পল্লীর ডাকঘরগুলি অবস্থিত কোথাও দোকানে, কোথাও বিদ্যালয়ের কুঠুরিতে, অথবা কাছারি-বাড়ির কোণে। এহেন পল্লী-ডাকঘরের দাওয়ায় বা চত্বরে হয় ডাকের অপেক্ষায় সমবেত গ্রামবাসীদিগের রাজনীতিচর্চা, পল্লী-সমাজের কু ও সু এর আলোচনা। ডাকঘরের ক্ষয়িষ্ণু বারান্দা হইতেই শুরু হয় সংবাদপত্র পাঠ ও সংবাদ প্রচার। পল্লীর ডাকঘর একাধারে সবই।

এইরূপেই ভারতের ডাকঘর গড়িয়া উঠিয়াছে।

স্বাধীন ভারতে ডাকঘর

১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দের ব্যবস্থার ভিত্তিতে ইংরেজ আমলে ডাকঘরের যে কাঠামো গড়িয়া উঠিয়াছিল স্বাধীন ভারত উহা বজায় রাখিয়াই অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে।

দেশীয় রাজ্যের ভারত-রাষ্ট্রের সহিত অন্তর্ভুক্তির পর উহাদের ডাকঘরগুলিও ভারতীয় ডাকবিভাগের অধীনে আসিয়াছে।

নূতন পরিস্থিতিতে ছোটখাটো পরিবর্তন কিছু কিছু হইয়াছে। চিঠি ও অন্যান্য সর্বপ্রকার মাশুল বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ভারত স্বাধীন হইবার পর হইতেই ডাকঘরের সংখ্যা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইতেছে। শুধু এক বৎসরেই (১৯৫১-৫২) প্রায় ছয় হাজার ডাকঘর খোলা হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৫,৩২৮টিই পল্লী অঞ্চলে।

স্বাধীন ভারতে শুধু যে ডাকঘরের সংখ্যাই বাড়িয়াছে তাহা নহে, নূতন ধরনের ডাকঘরও হইয়াছে। নাগপুর, দিল্লী, মাদ্রাজ এবং কানপুরে চলন্ত ডাকঘরও চলিতেছে। এইরূপ ডাকঘর বড় মোটর-গাড়িতে অবস্থিত। শহরের নির্দিষ্ট পথে চলন্ত ডাকঘর চলে। সাধারণত বেলাশেষেই, স্থানীয় ডাকঘরগুলি বন্ধ হইলে, ইহাদের কাজ শুরু হয়। এইসব ডাকঘরের কাজ রবিবার এবং ডাকঘরের ছুটির দিনেও হয়। ইহাতে চিঠি দেওয়া চলে, ডাকটিকিট বিক্রয় হয়, চিঠি ও এয়ার-পার্শেল রেজিস্ট্রি করা হয়। রাত্রের এয়ার-মেলে সব

পাঠানো হইয়া যায়। কাজেই ব্যবসায়ী ও সাধারণ গৃহস্থ সকলেরই স্থবিধা হইয়াছে।

ইংরেজ আমলে অনেক পল্লী ছিল যেখানে চিঠি বিলির কোনো ব্যবস্থাই ছিল না। স্বাধীন ভারতে এইরূপ পল্লী আর নাই; সর্বত্রই চিঠি বিলির ব্যবস্থা হইয়াছে।

শুধু জনকল্যাণের জন্যই আমাদের জাতীয় গবর্নমেণ্ট বিস্তর অর্থব্যয় করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। ইহার পূর্বে অগ্রগতির ধারা ঠিক এইরূপ ছিল না।

দেশীয় রাজ্যে ডাকঘর

ইংরেজ অধিকৃত ভারতে যখন সর্বভারতীয়-ডাকঘর প্রবর্তিত হইল, তখন প্রায় সাড়ে ছয় শত দেশীয় রাজ্য ভারতবর্ষে ছিল। এই রাজ্যগুলির মধ্যে কোথাও কোথাও উহাদের নিজস্ব ডাক-ব্যবস্থা ছিল। মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর, এবং কোচিনে সপ্তদশ শতাব্দীতেও ডাকের ব্যবস্থার অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিনের প্রাচীন ডাক-ব্যবস্থা অতি পুরাতন কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছিল। এই দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যেও ইংরেজ-প্রবর্তিত ডাকঘর ক্রমশ প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল।

ভারত স্বাধীন হইবার পূর্বেও প্রায় ১৫টি দেশীয় রাজ্য তাহাদের নিজস্ব ডাক-ব্যবস্থাই চালাইয়া আসিতেছিল। ইহাদের মধ্যে হায়দ্রাবাদ, গোয়ালিয়র, জয়পুর, পাতিয়ালা, ত্রিবাঙ্কুর প্রধান। ভারত স্বাধীন হইবার সঙ্গেসঙ্গেই দেশীয় রাজ্যগুলি স্বাধীন ভারতের সহিত যুক্ত হইয়াছে। কোনো কোনোটি পাকিস্থানের সহিত একত্রিত হইয়াছে। যেসকল দেশীয় রাজ্য ভারতের সহিত যুক্ত হইয়াছে তথাকার ডাকঘরগুলি এখন ভারত গবর্নমেণ্টের অধীনে আসিয়াছে। বর্তমান সময়ে নিখিল ভারতের সর্বত্র ভারতীয় ডাকঘর, এবং ভারতীয় ডাক-বিধি প্রবর্তিত হইয়াছে।

ডাকের বাহন

চিঠি বহিবার বাহন পূর্বে ছিল শুধু হরকরা ও ঘোড়সওয়ার। এই যুগে হইয়াছে আকাশযান, রেল, জাহাজ, বিভিন্ন প্রকারের মোটরযান, নৌকা, টাঙা, একা, টম্‌টম্‌, ঘোড়া, খচ্চর, উট, ইত্যাদি। এত রকমারি বাহন থাকা সত্ত্বেও হাজার হাজার হরকরা এখনও রহিয়াছে। ১৯৫১-৫২ খ্রীস্টাব্দে ভারতে ডাক-হরকরা ছিল ৯,২৬৪ জন। একস্ট্রা-ডিপার্ট্‌মেণ্টাল্‌ হরকরা অর্থাৎ ঠিকা-হরকরা ছিল ১২৬০০ জন। অপর ২৬০১ জন ঠিকা হরকরা ছিল যাহারা ডাকও বহিত এবং চিঠিও বিলি করিত। ইহারা সকলে ৯২০৯৩ মাইল পথে ডাক বহিয়াছে।

১৯৫১-৫২ খ্রীস্টাব্দে সমস্ত ভারতে এয়ার-মেল বাদে, ১৮০৭৩১ মাইল পথে বিভিন্ন যানবাহনে ডাক চলাচল করিয়াছে। উহার মধ্যে প্রায় ২০% ভাগ পথে (৩৬৬৮৮ মাইল) ডাক চলিয়াছে রেলের সাহায্যে, ২৬% (৪৬৬২২ মাইল) পথে মোটরগাড়িতে, ৫১% পথে (৯২০৯৩ মাইল) ডাকবহন করিয়াছে হর-করাগণ, এবং বাকী ৩% ভাগ (৫৩২৮ মাইল) পথে ডাক চলিয়াছে ষ্টীমার, নৌকা, টাঙ্গা, একা, ঘোড়া, উট প্রভৃতির সাহায্যে।

হরকরার কাজে আসে দেশের নিম্নস্তরের শক্তিশালী পুরুষেরা। অশেষ ক্লেশ সহ্য করিয়া জীবন বিপন্ন করিয়া তাহারা ডাক বহন করে। কর্তব্যনিষ্ঠা, দশের কল্যাণের জন্য নিজের জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করিবার শিক্ষা ভারতীয় ডাক-হরকরাকে আদর্শ স্থানীয় করিয়াছে। দুই-একটি ঘটনা বলি। এক হরকরাকে ডাক লইয়া বনের ভিতর দিয়া যাইতে হয় বৈকালে। বনের ধারেই একটি গ্রাম। কিছুদিন যাবৎ একটি বড় বাঘ ঐ গ্রামের মানুষ ও গোরু মারিতেছে। বৈকালেই বাঘ বাহির হয়। গ্রামের সকলেই হরকরাকে অনুরোধ করিল রাত্রে গ্রামে থাকিয়া পরদিন সকালে বন অতিক্রম করিতে। তাহাতে ডাকের দেরি হইবে; এবং বহু নরনারীর অসুবিধা হইবে এই চিন্তা করিয়া সে গ্রাম বৃদ্ধদিগের পরামর্শ

শুনিল না। বেশি দূর যাইতে হইল না, বনের মধ্যেই সেদিন সে বাঘের ভোজ্য হইল।

তিব্বতে যেমন প্রবল তুষারপাত হয়, তেমনি তুষার-ঝড়। একেই তো তিব্বতে প্রত্যহ দ্বিপ্রহরে একটা ঝড় বয়। সেই ঝড়ের বেগ বাংলাদেশের কালবৈশাখীর চেয়ে বেশি ছাড়া কম নহে। ছোট ছোট পাথরের নুড়ি সেই ঝড়ে উড়িয়া যায়। তখন পথ চলা দায়। এইজন্যই তিব্বতে রেওয়াজ অতি ভোরে পথ চলা শুরু করা, এবং দ্বিপ্রহরে আশ্রয়ে বিশ্রাম। এই ঝড়ের চেয়ে তুষার-ঝড়ের বেগ যদি বেশি হয়, তাহা হইলে উহা মানুষকেও উড়াইয়া লইয়া যাইতে পারে।

ডাকহরকরাগণ পথ চলিতেছিল কয়েকজন একসঙ্গে। একটা গিরিবর্ত্মের নিকটে যেই পৌঁছিয়াছে, অমনি তুষার-ঝড় উঠিল। প্রবল সেই ঝড়। কী বেগ! ডাকের দেরি হইবে ভয়ে তাহারা প্রাণপণে পথ চলিতেছিল। কিন্তু, ঝড়ের গতির মুখে তাহারা পড়িয়া গেল। সকলেই একটা বড় পাথরের আড়ালে আশ্রয় লইয়া বাঁচিল। একজন আর পারিল না। ঝড়ে সে উড়িয়া গেল। প্রবল বাতাসে তৃণখণ্ডের ন্যায় এই হরকরাটিকে ঝড় উড়াইয়া লইয়া গেল। সামরিক সন্ধানী দল যখন তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিল তখন দেখা গেল তাহার একখানা পা একেবারে ভাঙিয়া গিয়াছে। কিন্তু, আশ্চর্য সেই অবস্থাতেও সে ডাকের থলেটি বুকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া ছিল।

হরকরার হাতে থাকে একটি ঘুঙুর-বাঁধা বল্লম। উহা দেওয়া হয় আত্মরক্ষার্থে। ঘুঙুরের শব্দ শুনিয়া পরের আড্ডার হরকরা ডাক লইবার জন্য তৈয়ারি হইয়া থাকে যাহাতে সময় নষ্ট না হয়।

১৯০৩-৪ খ্রীস্টাব্দে চট্টগ্রামের একস্থানে দেখিয়াছি পাঁচটি হরকরা দল বাঁধিয়া চলিয়াছে। তাহাদের কাহারও হাতে বল্লম, কাহারো হাতে ছোট হাল্‌কা বর্শা, কাহারো হাতে বিউগল্‌। ছোট পাহাড়ীয়া নদী হাঁটিয়া পার

হইতে হইত বলিয়া ছোট বয়া থাকিত। বনের মধ্যে বুনো হাতীর দল তাড়াইতে হইলে বিউগল বাজাইতে হইত।

১৭৭৪ খ্রীস্টাব্দে দীর্ঘ হরকরা লাইনে[১] সাধারণত একাধিক ডাকহরকরা একসঙ্গে চলিত। তাহাদের দলে একজন মশালচী ও একজন ঢুলি দেওয়া হইত। বর্তমান যুগেও যতদিন হরকরাদিগকে রাত্রে ডাক লইয়া চলিতে হইয়াছে ততদিন একটি করিয়া লণ্ঠন দেওয়া হইত। আজকাল হরকরার রাত্রে পথ চলা বন্ধ হইয়াছে।

প্রায় ৪০ বৎসর পূর্বেও বাংলাদেশে হরকরা পল্লীডাকঘরের নিকটবর্তী হইয়া বিউগল বাজাইয়া ডাকের আগমন-বার্তা জানাইয়া দিত। আজকাল সেই প্রথা প্রায় বন্ধ হইয়া আসিয়াছে। নিশান উড়াইয়াও ডাকের পৌছখবর প্রচার করিবার ব্যবস্থা ছিল। বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় একবার বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার শৈশবে কলিকাতার ডাক শ্রীহট্ট শহরে যাইত জাহাজে। জাহাজ নির্দিষ্ট দিনে বা সময়ে প্রায়ই পৌছিত না। কেহ জানিতেও পারিত না কলিকাতার ডাক আসিল কিনা। অথচ অনেকেই উহার জন্য উদগ্রীব থাকিতেন। সেইজন্য কলিকাতার ডাকের পৌছখবর প্রচারিত হইত শ্রীহট্ট ডাকঘরের উপরে সুউচ্চ-দণ্ডে পতাকা উড়াইয়া। ঐ পতাকা উড়িলেই শহরবাসী বুঝিতে পারিত যে, কলিকাতার ডাক শ্রীহট্টে পৌছিয়াছে।

ইংরেজ আমলে য়ুরোপীয় ডাকের আগমন-সংবাদ ডাকঘরের নোটিশ-বোর্ডে ও সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপিত হইত।

হরকরার দ্বারা ডাক চালাইলে ডাকের গতি হয় মন্থর; চিঠি পাইতে হয় দেরি। জনসাধারণ যাহাতে চিঠিপত্রাদি শীঘ্র শীঘ্র পাঠাইতে পারে তজ্জন্য স্বাধীন ভারতে প্রতি বৎসরই হরকরার স্থলে মোটর-যানের ব্যবস্থা হইতেছে। ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৫৩ খ্রীস্টাব্দের ৩১শে

---

১ কলিকাতা হইতে পুরী পর্যন্ত হরকরা লাইন ছিল।

অক্টোবর পর্যন্ত, এই তিন বৎসর সাত মাস সময় মধ্যে ৪৬৬টি হরকরা লাইন তুলিয়া দিয়া মোটর-যানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই ডাকমোটরগুলি ৭২৮৯½ মাইল পথে ডাক বহিতেছে। তাহার ফলে বহু স্থানেই ডাক পৌছিতেছে পূর্বের চেয়ে অনেক কম সময়ে।

এখন আকাশযানের যুগ। আকাশযানে ডাক পাঠাইতে পারিলে চিঠি-পত্রাদি আরও শীঘ্র পাওয়া যাইতে পারে। স্বাধীন ভারতে সেই ব্যবস্থাও হইয়াছে। ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দের ১লা এপ্রিল হইতেই ভারতের আভ্যন্তরিক প্রথম শ্রেণীর ডাক, অর্থাৎ, খামের চিঠি ও পোস্টকার্ড, এবং মনিঅর্ডার উড়োজাহাজে পাঠানো হয়। সম্ভব হইলে ইন্সিয়োর চিঠি, এবং অতিরিক্ত মাশুল দিলে পার্শেলও আকাশযানে পাঠানো যাইতে পারে।

আগরতলা, আসাম, পাশিঘাট ও উত্তর লক্ষীমপুরের জন্য সকল প্রকার ডাকই আকাশযানে বহন করা হইয়া থাকে। তজ্জন্য অতিরিক্ত মাশুল নেওয়া হয় না।

ভারতের বাহিরে বহু দেশের সহিত ভারতের এয়ার-মেলের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ভারতের অভ্যন্তরে ডাকের উড়োজাহাজ এখন রাত্রে চলে। ইহাতে শীঘ্র চিঠি পাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ভারতের জাতীয় গবর্নমেণ্ট ডাক বহনের দ্রুত ব্যবস্থার জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন।

ডাক-গাড়ি

রেলগাড়িতে যে ডাকের ব্যবস্থা আছে উহাকে বলে 'রেলওয়ে মেল্ সার্ভিস্'। সংক্ষেপে বলে আর. এম. এস। শহরে যাহাতে চিঠি তাড়াতাড়ি বিলি হইতে পারে তজ্জন্য ডাকগাড়ি হইতেই ডাকঘর হিসাবে চিঠি বাঁটিয়া পাঠানো হয়।

১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে অল্প ওজনের ডাকের থলি রেলের গার্ডের কামরায় বহন করা হইত, এবং বহু ব্যাগ হইলে একটি পৃথক গাড়িতে একজন মেল-গার্ডের অধীনে ঐসব ব্যাগ পাঠানো হইত। সেই মেল-গার্ড প্রয়োজন মত স্টেশনে ব্যাগ নামাইয়া দিতেন। তাঁহাকে গাড়ির ভিতরে চিঠি সর্ট করিতে হইত না। চিঠি সর্ট করা হইত ডাকঘরে। এইজন্য উত্তর-ভারতের এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতের ও কলিকাতার মধ্যে চিঠি-পত্রাদি এলাহাবাদে, কানপুরে ও কাশীতে সর্ট করা হইত। তজ্জন্য যথেষ্ট দেরিও হইত। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য রেলগাড়ির মধ্যেই চিঠি সর্ট করিবার ব্যবস্থা প্রথম শুরু হইল ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দে জি. আই. পি. রেলে এলাহাবাদ হইতে কানপুর পর্যন্ত। তখন রেলের ডাকগাড়িকে বলা হইত 'ট্র্যাভেলিং পোস্ট অফিস', অর্থাৎ ভ্রাম্যমাণ বা চলন্ত ডাকঘর। ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দে 'রেলওয়ে মেল্ সার্ভিস' নামকরণ হয়।

বর্তমান সময়ে ডাক-গাড়িতে চিঠি সর্টিং-এর বা বাছাই-এর কাজ হয়। ছোট ছোট লাইনে মেল-গার্ড বন্ধ ব্যাগ লইয়া যায়, এবং প্রয়োজন মত স্টেশনে নামাইয়া দেয়। কোথাও কোথাও বা একটি-দুইটি ডাক-ব্যাগ রেলের গার্ডের তত্ত্বাবধানেই যায়। এইসকল ব্যাগ রেল-পার্শেল হইয়া যায়। ওজন হিসাবে ভাড়া দিতে হয়।

ডাকগাড়ি ব্যবহারের জন্য ডাক-বিভাগ রেল-বিভাগকে অর্থ প্রদান করে। ডাকগাড়ির জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ি হিসাবে ভাড়া দিতে হয়। ডাক ও রেল এই দুই বিভাগের মধ্যে চুক্তি অনুসারে ভাড়া দিবার নীতি নির্দিষ্ট হয়।

ডাক বহিবার জন্য রেল-বিভাগ যে অর্থ আদায় করে উহার হার ক্রমশ বাড়িয়াছে।

বঙ্গদেশে শিলিগুড়ি হইতে দার্জিলিঙে পূর্বে ডাক যাইত টাঙ্গায়। এই টাঙ্গায় ডাক ও যাত্রী দুইই চলিত। প্রতি টাঙ্গায় তিনজন যাত্রী যাইতে

পারিত। বসিবার স্থানের নীচে বাক্সে যাত্রীর মাল ও ডাক থাকিত। প্রতি যাত্রী ১২ সেরের বেশি মাল সঙ্গে লইতে পারিতেন না। শিলিগুড়ি হইতে দার্জিলিং যাইতে হইলে একজন যাত্রীর টাঙ্গা ভাড়া লাগিত ২৫৲ টাকা, শিলিগুড়ি হইতে কার্সিয়ং পর্যন্ত ভাড়া ছিল ১৫৲ টাকা, এবং কার্সিয়ং হইতে দার্জিলিং ১০৲ টাকা।

১৮৮০ খ্রীস্টাব্দে যখন দার্জিলিং স্টীম্-ট্রাম-গাড়ির চলন হইল তখন শিলিগুড়ি হইতে দার্জিলিং ঐ ট্রামগাড়িতেই ডাক যাইত। বাৎসরিক ১০,২৬০৲ টাকায় ঐ স্থানে ডাক বহার কাজ চলিত। এই ট্রামগাড়ির নাম পরে 'দার্জিলিং হিমালয়ান্ রেলওয়ে' হয়। শিলিগুড়ি হইতে কালিম্পং পর্যন্ত ছিল 'বুলক্ কার্ট ট্রেন', অর্থাৎ গোরুর গাড়ির লাইন। ঐ গাড়িতেই ব্যবসায়ীর মাল, সরকারের ডাক, ও যাত্রী সবই যাইত। সিকিম-তিব্বতের ডাকও চলিত ঐ পথেই। বুলক্-কার্ট-ট্রেন যখন উঠিয়া গেল তখন ঐ পথে ডাক চলিত রেলগাড়ি, রোপ্ওয়ে, হরকরা, এবং খচ্চরের সাহায্যে। এখন চলে সিকিমের রাজধানী পর্যন্ত মোটর গাড়িতে; তাহার পর তিব্বত যায় হরকরা ও খচ্চরের সাহায্যে।

রেলগাড়িতে কাজের জন্য সময়ও কম পাওয়া যায়। কাজেই অত্যন্ত দ্রুত কাজ করিতে হয়। ডাকগাড়ির কর্মচারীর চিঠি বাছাইয়ের চাপ কমাইবার জন্য কোনো কোনো রেলস্টেশনে মেল-আপিস খোলা হইয়াছে। ডাকগাড়ির অনেক কাজ এইসব আপিসেই করা হয়। ডাকঘরও কিছু কিছু চিঠি বাছাই করিয়া দেয়।

ডাকবাক্স খুলিয়া চিঠি ডাকঘরে আনিলে গন্তব্যস্থানের ডাকঘরের নাম হিসাবে বাছাই হয়। এই কাজকেই ডাকঘরে বলে সর্টিং করা। ইহার একটি প্রণালী আছে। ঐ প্রণালীর উপর ভিত্তি করিয়া যে জটিল তালিকা তৈয়ারি হয় উহা ভালোভাবে মুখস্থ করিতে না পারিলে এই কাজে গোলযোগের

সম্ভাবনা। মিনিটে কয়খানা চিঠি বাছাই করিতে হইবে তাহাও নির্দিষ্ট আছে।

ডাকঘরে ও রেলের কামরায় দক্ষ কর্মচারী কিরূপ ক্ষিপ্রভাবে চিঠি বাছাই বা সর্ট করে তাহা দেখিলে সকলেই খুশি হইবেন। অবশ্য ক্ষিপ্রতার সহিত এই কাজ করিতে যাইয়া এক খোপের চিঠি যে অপর খোপে না পড়ে তাহা নহে। এই জন্যই গল্প আছে যে, দিল্লীর চিঠিখানা এতদূর আমেরিকায় গেল কি করিয়া জানিতে চাহিলে ডেকো-কেরানী উত্তর দিয়াছিলেন, "আপনার নিকট দিল্লী হইতে আমেরিকা বহুদূর; কিন্তু আমার নিকট দিল্লী ও আমেরিকার মধ্যে ব্যবধান মাত্র আধ ইঞ্চি। কারণ, চিঠি বাছাই বা সর্টিং করিবার আলমারিতে দিল্লীর পাশের খোপই আমেরিকা।"

দিল্লীর খোপে ফেলিতে যাইয়া পাশের আমেরিকার খোপে ফেলা অসম্ভব নহে। তবে এরূপ ভুল খুবই কম হয়।

ডাকটিকিটের কথা

ভারতে প্রথম ডাকটিকিটের প্রচলন হয় সিন্ধুদেশে ১৮৫২ খ্রীস্টাব্দে। উহা সিন্ধু-দেশের স্থানীয় ডাকঘরে ব্যবহারের জন্যই ছাপা হইয়াছিল। উহাতে 'সিন্ধু ডিস্ট্রিক্ট ডাক' এই কথা ইংরেজিতে লিখিত থাকিত। সিন্ধুর ডাক-টিকিট যখন ছাপা হইয়াছিল তখনও সিন্ধুদেশের ডাকঘর ইম্পিরিয়াল ডাক-বিভাগের,, অর্থাৎ, সর্বভারতীয় ডাকবিভাগের অধীনে আসে নাই। ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দে সর্বভারতীয় ডাকটিকিটের প্রচলন হওয়ায় সিন্ধুদেশের ডাকটিকিট বন্ধ হইয়া যায়। ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দে তথাকার ডাকঘরগুলিও ইম্পিরিয়াল ডাকবিভাগের অধীনে আসে।

ভারতীয় ডাকবিভাগের প্রথম ডাকটিকিট ছাপা হয় ভারতবর্ষেই, কলিকাতার টাঁকশালে, ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দে। এই প্রথম ডাকটিকিটের নকশা ছিল 'তালগাছ ও সিংহ'।

কলিকাতা টাঁকশালের কর্নেল ফরব্‌স্‌-এর পরিকল্পনায় উহা তৈরি হয়। উহার যোগান খুব কম ছিল বলিয়া উহা ব্যবহারে আসে নাই।

তাহার পর ভারতীয় সার্ভে আপিসে দুই পয়সা মূল্যের লাল রঙের টিকিট ছাপা হয়। উহার নকশা ছিল ৯২টি অর্ধগোলাকৃতি খিলান। উহা লিথো করিয়া ছাপানো হয়। এই টিকিট কিছু ছাপাইবার পর লালকালির অভাব হইল। ভারতে ঐ প্রকার লালকালি আর তখন পাওয়া গেল না। সুতরাং ঐ টিকিটও ব্যবহারে আসিল না। তাহার পর ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দে 'আট খিলানে'র দুই পয়সার টিকিট নীলকালিতে ছাপা হয়। সিন্দূরের মত লাল রঙে হয় এক আনার, সবুজ রঙে দুই আনার, এবং দুই রঙে (লাল ও নীল) চারি আনার টিকিট ছাপা হয়। তাহার পর বহুবার ডাকটিকিটের নকশা ও রং পরিবর্তিত হইয়াছে। ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে লণ্ডন হইতে মেসার্স্‌ ডি লা র‍্যু অ্যাণ্ড্‌ কোম্পানি ভারতের ডাকটিকিট ছাপাইয়া পাঠান। হাতির মাথার জলছাপ সহ টিকিট ছাপা হয় ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দে। ইহাতে ছিল দুই পয়সা, ৮ পাই, এক আনা, দুই আনা নয় পাই, ৪ ও ৬ আনা, ৬ আনা ৮ পাই, ১২ আনা, এবং এক টাকার টিকিট। মহারানী ভিক্টোরিয়া ও সম্রাটের মূর্তিই চলিয়াছে বহুদিন।

১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে আট পাইয়ের টিকিট ভারতে বিক্রয় হইত। উহা সৈন্যদিগের চিঠি বিলাতে পাঠাইবার জন্য তখন ব্যবহৃত হইত।

সেই যুগে সিঙ্গাপুরেও একটি ভারতীয় ডাকঘর ছিল। তথা হইতে যে-সকল চিঠি আসিত উহাদের উপর ॥০, ।০, ৵০, এবং ৮ পাই-এর টিকিট কাটিয়া অর্ধেক লাগানো আছে দেখা যায়। ঐ সব টিকিটের অর্ধমূল্যের জন্য ঐ প্রথা অবলম্বিত হইত।

১৮৮২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ডাকটিকিটের উপর ছাপা থাকিত 'ঈস্ট ইণ্ডিয়া পোস্টেজ' (East India Postage)। উহা বিলাতের ডাকটিকিট হইতে

আকারে ছোট ছিল। ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দ হইতে 'ইণ্ডিয়া পোস্টেজ' (Indian Postage) ছাপা শুরু হইল। তখন ডাকটিকিটের আকারও পূর্বাপেক্ষা বড় হইল।

১৮৯১ খ্রীস্টাব্দের ১লা জানুয়ারী তারিখে এক, দুই, তিন ও পাঁচ টাকার টিকিট দুই রঙে ছাপা হয়। দুই, তিন ও পাঁচ টাকার টিকিটের আকার বিশেষ বড় ছিল, এবং উহাতে মহারানী ভিক্টোরিয়ার ঐ সময়ের চেহারার ছবি ছাপা হয়।

এই ছবিসহ এক পয়সার ডাকটিকিট ছাপা হয় প্রথম ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে।

সপ্তম এডওয়ার্ডের প্রতিমূর্তিসহ ডাকটিকিট প্রকাশিত হয় ১৯০২-৩ খ্রীস্টাব্দে।

পঞ্চমজর্জের ছবিসহ ভারতীয় ডাকটিকিট প্রচলিত হয় ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে।

ভারতে যখন প্রথম টেলিগ্রাফ আপিস খোলা হইল তখন টেলিগ্রাম পাঠাইতে হইলে উহার মাশুল নগদ টাকায় দিতে হইত। সেইজন্য দূরবর্তী ডাকঘর হইতে টেলিগ্রাফ আপিসে তার পাঠাইবার সময় নগদ টাকা পাঠাইবার অসুবিধা হইত। এইজন্য ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আদেশে ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে 'ইলেক্‌ট্রিক্‌ টেলিগ্রাফ্‌ টিকিট' ছাপা হয়। উহা।০, ১৲, এবং ৪৲ মূল্যের ছিল। ঐ টিকিটের মাঝখানে মহারানী ভিক্টোরিয়ার ছবি থাকিত। ইহার পর মহারানী ভিক্টোরিয়ার দুই মাথাওয়ালা টিকিট ছাপা হইয়াছিল। যেখানে টেলিগ্রাফ আপিস ছিল না সেই স্থান হইতে টেলিগ্রাফ পাঠাইতে হইলে এই টিকিটের প্রয়োজন হইত। ইহা সর্বভারতীয় না হওয়ায় কাজের বিশেষ সুবিধা হইল না। ইহার পর ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত টেলিগ্রাফ্‌ আপিসেই টেলিগ্রাফ্‌ টিকিট ব্যবহৃত হইত। ডাকঘর হইতে তার পাঠাইতে হইলে ডাকটিকিট ব্যবহার করা চলিত।

১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে পৃথক টেলিগ্রাফ্‌ টিকিটের প্রচলন বন্ধ হয়। তখন হইতে ডাকটিকিটই টেলিগ্রামে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে পৃথক রসিদ-টিকিট ছাপা বন্ধ করিয়া দিয়া দুই পয়সা ও এক আনা মূল্যের ডাকটিকিটের উপরই রসিদ ও ডাকটিকিট (Indian Postage and Revenue) এই কথা কয়টি ছাপিয়া দেওয়া হইল। ঐসব ডাকটিকিটই রসিদ-টিকিটের কাজ চালাইত। বর্তমান সময়ে রসিদ-টিকিট পুনরায় পৃথকভাবে ছাপা হইতেছে।

১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দে সরকারী চিঠির উপর ব্যবহারের জন্য সার্ভিস্ টিকিট ছাপা হয়। এই উদ্দেশ্যে দুই পয়সা, এক আনা, দুই আনা এবং চারি আনার ডাকটিকিটের উপর 'service' কথার পরিবর্তে 'On H. M. S.' ছাপা হয়। ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে পুনরায় উহা পরিবর্তন করিয়া 'service' ছাপা হয়। এই প্রথাই এখন পর্যন্ত চলিতেছে।

১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দে পোস্টকার্ডের প্রচলন হয়। পোস্টকার্ডের মূল্য ছিল এক পয়সা। অল্প মূল্যের বলিয়া কার্ডের বিক্রয় বৃদ্ধি পাইল। কিন্তু, দেশবাসী অনেকেই উহা সন্দেহের চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। তাঁহাদের ভয় হইল কার্ডে লিখিত সংবাদ প্রকাশিত হইয়া যাইবে। এই বিষয়ে ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দের ১৮ই জুলাই তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকায় যাহা লিখিত হইয়াছিল তাহার সারমর্ম নিম্নে দিতেছি—

"পোস্টকার্ডে লিখিত সংবাদ যাহাতে অপরে বুঝিতে না পারে তজ্জন্য কেহ কেহ উহাতে এরূপভাবে লিখিতেন যে, প্রাপকও উহা পড়িতে পারিত না। ডাকঘরের কর্মচারী ও ডাকপিওন যাহাতে পড়িতে না পারে এই উদ্দেশ্যে কেহ কেহ সংকেতে সংবাদ লিখিতেন। কাহারো কাহারো ধারণা, সরকারের হুকুম, চিঠি পোস্টকার্ডেই লিখিতে হইবে। এমন লোকেরও অভাব ছিল না যিনি একখানা পোস্টকার্ডে তাঁহার সকল সংবাদের স্থান হইল না দেখিয়া ১২ খানা পোস্টকার্ডে সেই খবর লিখিয়া জানাইলেন। কেহ কেহ পোস্টকার্ডে চিঠি লিখিয়া উহা খামে ভরিয়া টিকিট লাগাইয়া

পাঠান। এই শ্রেণীর লোকই পোস্টকার্ডের প্রচলনের জন্য ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছেন।"

বর্তমান সময়ে স্বাধীন ভারতের ডাকটিকিটের নকশা ও রং দুইয়েরই পরিবর্তন হইয়াছে। এখনকার নকশায় মহাত্মা গান্ধী, ভারতীয় সংস্কৃতি, ইতিহাস ও প্রাকৃতিক দৃশ্যের বিষয় দেখাইবার চেষ্টা চলিতেছে।

১৯৫৩ খ্রীস্টাব্দের ১৬ই এপ্রিল ভারতীয় রেলের শতবার্ষিকী উৎসব হয়। তখন ১৯৫৩ এবং ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দে ভারতবর্ষে কিরূপ রেলের ইঞ্জিন ছিল তাহার ছবিসহ দুইআনা মূল্যের শতবর্ষিকী-স্মৃতি-টিকিট ছাপা হইয়াছিল।

১৯৫৩ খ্রীস্টাব্দের ২৯শে মে তারিখে এভারেস্ট-শৃঙ্গে তেনজিং ও হিলারী উঠিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সেই ঘটনা স্মরণ রাখিবার জন্য এভারেস্ট-শৃঙ্গের ছবিসহ 'এভারেস্ট-বিজয়' ডাকটিকিট ছাপা হয়।

ভারতীয় টেলিগ্রাফের শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে 'টেলিগ্রাফ শতাব্দী' ডাকটিকিট মুদ্রিত হইয়াছিল।

এইরূপ ভাবে বহু নূতন নূতন ডাকটিকিট গত ছয়-সাত বৎসরে প্রকাশিত হইয়াছে।

টিকিট, পোস্টকার্ড, খাম সবই ছাপা হয় ভারতে। ভারত স্বাধীন হইবার পূর্ব হইতেই টিকিট ইত্যাদি ভারতে ছাপা হইতেছিল। স্বাধীন ভারতের ডাকটিকিটের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। পৃথিবীর সর্বত্র ডাকটিকিট সঞ্চয়কারীর নিকট বর্তমান ভারতের টিকিটের আদর বাড়িয়াছে।

ডাকটিকিটের সৌন্দর্য যাহাতে আরও বৃদ্ধি পায় তজ্জন্য নাসিক রোডের ছাপাখানায় নূতন নূতন যন্ত্রপাতি বসানো হইয়াছে। আশা করা যায়, ইহার ফলে ভারতীয় ডাকটিকিটের সৌন্দর্য আরও বৃদ্ধি পাইবে।

ডাকটিকিট, খাম, পোস্টকার্ড ইত্যাদি বিক্রয়ের দরুন আয়ও বাড়িয়াছে। এই বাবদ আয়ই ডাকবিভাগের মোট আয়ের শতকরা ৫৪·৭ ভাগ (১৯৫১-৫২)।

পোস্টকার্ড কলে বিক্রয় করা যায় কিনা তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য একটি পোস্টকার্ড-বিক্রয়-কল দিল্লীর চাঁদনীচক ডাকঘরে বসানো হইয়াছে। একটি এক আনি এই কলে ফেলিয়া দিলে একখানা পোস্টকার্ড ও একটি পয়সা বাহির হইয়া আসে।

ডাকটিকিট তো হইল। বর্তমান সময়ে যাঁহারা এক একবারে বহু চিঠি ডাকে দেন তাঁহারা আর এক নূতন বিপদে পড়িলেন। চাকর বা চাপরাশিগণ টিকিট না লাগাইয়া চিঠি ডাকে দেয় আবার কেউ কেউ চিঠি ডাকেই দেয় না। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য ডাকবিভাগ ব্যবস্থা করিলেন 'ফ্র্যাঙ্কিং মেশিনে'র। ডাকঘরে টাকা জমা দিয়া ডাকটিকিটের ফিল্ম বোঝাই এই কল ক্রয় করিয়া লইতে হয়। চিঠির উপর এই কলের সাহায্যে টিকিটের ছাপ ছাপিয়া দেওয়া যায়।

১৯৫১-৫২ খ্রীস্টাব্দে ভারতে ১৮৮১টি ফ্র্যাঙ্কিং মেশিন ব্যবহারে ছিল। সওদাগরী ও বড় বড় আপিসেই ইহার ব্যবহার বেশি।

প্রেরক হয়তো চাহিতেছেন চিঠির উত্তর দিবার জন্য প্রাপকের যেন গাঁটের পয়সা খরচ না হয়। তজ্জন্য ব্যবস্থা হইয়াছে রিপ্লাই-কার্ডের (জোড়াকার্ড); ব্যবসায়ীদিগের জন্য বিজনেস্ রিপ্লাই কার্ড বা খামের। বিদেশের জন্য আছে 'রিপ্লাই কুপন'। চিঠির সঙ্গে একখানা রিপ্লাই কুপন পাঠাইয়া দেন। প্রাপক উহা তথায় যে কোনো ডাকঘরে দেখাইয়া প্রয়োজনীয় টিকিট লইতে পারেন।

ডাকঘরে র‍্যাপার বা কাগজের মোড়ক, এবং ভিতরে কাপড় দেওয়া রেজেস্ট্রি খামও বিক্রয় হয়।

ডাকের কর্মকাহিনী

ডাকঘরের মুখ্য ও গৌণ কর্তব্য

ডাকঘরের একমাত্র নিজস্ব এবং মুখ্য কাজ চিঠি একস্থান হইতে অন্যত্র বহন করা, এবং প্রাপকের নিকট বিলি করা। অপর যত প্রকার কাজ ডাকঘরে হয় ঐ সকলই সমাজসেবার সুবিধার জন্য ডাকঘরের ঘাড়ে চাপানো হইয়াছে। ঐগুলি ডাকঘরের মুখ্য কর্তব্য নহে, গৌণ কর্তব্য।

এই গৌণ কর্তব্যের মধ্যে প্রথম হইতেই জুটিয়াছিল পার্শেলের কাজ।

এককাল গিয়াছে যখন সরকারী ও বে-সরকারী ব্যক্তিদিগের ভ্রমণের ব্যবস্থা ডাকঘরই করিত। কেহ কোথাও যাইতে চাহিলে দুই-তিনদিন পূর্বে স্থানীয় পোস্টমাস্টারকে বিস্তারিত জানাইতেন। এই নোটিশেই যাত্রার তারিখ ও সময় এবং পথে কোথায় কত সময় অপেক্ষা করিবেন তাহাও উল্লেখ করিয়া দিতে হইত। তখন বড় বড় বাঁধানো সড়কেই ঘোড়ার গাড়ি চলিত। অন্যত্র সব জায়গায় যাইতে হইত পালকিতে। তখনকার পালকি ছিল ছয় ফুট লম্বা, চারি ফুট উচ্চ। খড়খড়ির জানালা দুই পার্শ্বেই থাকিত। মুসাফিরকে তাঁহার নিজের পালকি লইয়া বাহির হইতে হইত। পোস্টমাস্টার ৮ জন পালকি বরদার, দুইজন মশালচী এবং দুইজন ভাঙ্গিবরদার (কুলী) দিতেন। প্রয়োজন হইলে মালের জন্য গোরুর গাড়িও যোগানো হইত। এই বার জন লোকের জন্য প্রতি মুসাফিরকে মাইল প্রতি প্রায় বারো আনা অগ্রিম জমা দিতে হইত। পথে মুসাফিরের জন্য দেরি হইলে অতিরিক্ত খরচ আদায় হইত। তখন আড্ডা ছিল প্রায় দশ মাইল অন্তর। এই দশ মাইল যাইতে তিন ঘণ্টা লাগিত। পোস্টমাস্টার পূর্বেই লিখিয়া সমস্ত পথের প্রতি আড্ডার ব্যবস্থা ঠিক করিয়া রাখিতেন। পরবর্তী আড্ডায় পৌছাইয়া দিয়া পালকিবরদার, ভাঙ্গিবরদার প্রভৃতি সকলেই পূর্ববর্তী নিজ আড্ডায় ফিরিয়া আসিত। ঘোড়ার গাড়ির জন্য প্রতি আড্ডায় কয়েকটি ঘোড়া রাখা হইত।

পথে হোটেল পাওয়া যাইত না। ডাকবাংলোগুলি ছিল ডাকঘরের তাঁবে। এইগুলি খড়ের চালের ঘর। প্রতি ডাকবাংলোতে খিদ্‌মতগার থাকিত। তাহাদের মধ্যেই কেহ আহারাদির ব্যবস্থা করিত, কেহ-বা জলকাঠ ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া দিত। এইসব কাজের জন্য তাহাদের সহিত রফা করিয়া ব্যবস্থা করিতে হইত। থাকার জন্য নির্দিষ্ট ভাড়া জমা দিতে হইত। এখন এই কাজ আর ডাকঘরকে করিতে হয় না। ডাকবাংলো আর ডাকঘরের তাঁবে নাই; কিন্তু উহার নামের মাঝে পুরাতন স্মৃতি এখনও জড়িত রহিয়াছে।

১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দ হইতে ডাকঘরের উপর শুল্ক পরীক্ষার কাজও আসিয়া চাপিল। পোস্টমাস্টারের সন্দেহ হইলে তিনি যে-কোনো চিঠি বা প্যাকেট ইত্যাদি আটক রাখিয়া শুল্কধার্য দ্রব্যাদি থাকিলে শুল্ক আদায় করিতে পারিতেন। এই কর্তব্য বর্তমান সময়েও ডাকঘরকে করিতে হয়।

জনকল্যাণের জন্য বর্তমান যুগের ডাকঘরকে বহুপ্রকার গৌণকর্তব্য করিতে হয়। ভারতের ডাকঘরকে ঔষধ (কুইনাইন) বিক্রয় করিতে হয়, নরনারীর টাকা পাঠাইবার ব্যবস্থা (মনিঅর্ডার) করিতে হয়। উহা এখন ব্যাঙ্ক (সেভিংস্‌ব্যাঙ্ক) ও বীমার (ইন্সিয়োর) কাজ করে, হুণ্ডির (পোস্টাল অর্ডার) কাজ চালাইয়া থাকে, সওদাগরদিগের বিক্রেয় পণ্য (ভি. পি.) দূরে বহন করিয়া গ্রাহকের নিকট বিলি করিয়া মূল্য প্রেরককে বুঝাইয়া দেয়। শুল্ক আদায়, ডাক ও সামরিক কর্মচারীর পেন্সন প্রদান, জীবনবীমা, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, রেডিয়োর লাইসেন্স-ফি আদায়, বেতার টেলিগ্রাফ, রেডিয়ো টেলিফোন, ন্যাশন্যাল সেভিংস সার্টিফিকেট্, গবর্নমেণ্ট সিকিওরিটি ক্রয় বিক্রয় প্রভৃতি এই কালের ডাকঘরের গৌণ কর্তব্য বলিয়া ধার্য হইয়াছে। এইভাবে বর্তমান যুগের ডাকঘরের কর্তব্যতালিকায় ক্রমশ বহুবিধ কাজ জুটিয়াছে।

যাঁহারা এইসব ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাঁহাদের আশা ছিল যে, ইহাতে ভারতে জনগণের চিঠি-পত্রাদি লেখা বাড়িবে, ব্যবসা-বাণিজ্যের বৃদ্ধি হইবে;

জ্ঞানবিস্তারের সাহায্য হইবে, সামাজিক সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হইবে। এইসকল উদ্যোক্তাদিগের নাম দেশবাসীর স্মৃতিপট হইতে আজ লুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের ভবিষ্যৎ দৃষ্টির ও শুভ কামনার ফল আমরা এখন ভোগ করিতেছি।

চিঠি-বিলি

চিঠি-বিলি করা ডাকঘরের মুখ্য কর্তব্য।

ডাকপিওনের কর্তব্যনিষ্ঠার উপরে সমাজের কল্যাণ নির্ভর করে। এই কাজে যাঁহারা আসেন তাঁহাদের শারীরিক স্বাস্থ্য ও অক্ষরজ্ঞানই যথেষ্ট নহে, চরিত্রও বড় কথা। পূর্বে সামান্য অক্ষরজ্ঞান থাকিলেই লোকে ডাকপিওনের কার্যে আসিত। বর্তমান সময়ে মাধ্যমিক শিক্ষা প্রায় শেষ করিয়া, অথবা ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাশ করিয়া যুবকগণ ডাকপিওনের কাজে ভর্তি হইতেছে। ডাকবিভাগও তাহাদিগকে সুযোগ দিয়াছেন পরীক্ষা দিয়া কেরানী স্তরে উঠিবার জন্য।

চিঠি-বিলি করিয়া সমাজসেবার যেটুকু করিতে পারা যায় তাহাতেই যথেষ্ট আনন্দ আছে; কিন্তু বড় ঝকমারি কাজ।

চিঠির ঠিকানায় রকমারি ভাষা দ্রুত বিলির এক অন্তরায়। ডাকঘরের কেরানী ও ডাকপিওন যেসকল চিঠির ঠিকানার ভাষা পড়িতে পারিলেন না তাহা অপরের সাহায্যে অনুবাদ করাইয়া তবে তা বিলি হইবে। তজ্জন্য ঐসব চিঠি বিলি করিতে দেরি হইয়া যায়। কলিকাতা শহরে বিলির জন্য প্রায় ১২ রকম বিভিন্ন ভাষায় ঠিকানা লেখা চিঠি পাওয়া যায়।

পূর্বে এরূপ ডাকপিওনও ছিলেন যাঁহাদের অক্ষরজ্ঞান কম ছিল। চিঠি বাঁটিয়া দিবার সময় তাঁহারা নাম-ঠিকানা শুনিয়াই তৎক্ষণাৎ চিঠির উপরে একটি 'ধোবী চিহ্ন' আঁকিয়া রাখিতেন। ঐ চিহ্ন দেখিয়া তাঁহারা চিঠি বিলি করিতেন। অথচ তাঁহাদের ভুলভ্রান্তি যে অপরের চেয়ে বেশি হইত তাহা নহে।

ডাকঘরের বর্তমান সময়েও ঠিকানা ছাড়া চিঠি পাওয়া যায় প্রতিদিন গড়ে ৩৪৩ খানা। যেমন, মিস্ জোন্স, কলিকাতা। এই কলিকাতার জনসমুদ্রে কি করিয়া তাঁহাকে পাওয়া যাইবে? কিন্তু ডাককর্মী তাঁহাকে বাহির করিয়াছিল পার্ক স্ট্রীটের এক ভাড়াটিয়া বাড়ির ফ্ল্যাটে। কলিকাতায় এরূপ ঠিকানা ছাড়া টেলিগ্রাম আসে অনেক। সেইগুলিও বিলি হয়।

চিঠির উপর এমন ঠিকানাও পাওয়া যায় যাহা পড়িয়া ঠিক ঠিকানা উদ্ধার করিতেই বহু সময় অপব্যয় হয়। যেমন, শ্রীমতী কুণ্ডু, ১৬নং কলিতা কটং সেলেন। এই ঠিকানা পড়িয়া বুঝিতে পারেন কি যে, উহা কলিকাতায় স্কট্ লেনে বিলি হইবে?

অসম্পূর্ণ বা ভুল ঠিকানায় চিঠিও যথেষ্ট পাওয়া যায়। একবার এক চিঠিতে ঠিকানা ছিল—

"পরমপূজনীয়,
শ্রীযুক্ত দেবনাথ দাশ
পিতৃদেব মহাশয়ের শ্রীচরণেষু
৩নং আমহার্স্ট স্ট্রীট,
পোঃ বরিশাল।"

চিঠিখানা বরিশাল ঘুরিয়া যখন কলিকাতায় আসিল তখন ৩নং আমহার্স্ট স্ট্রীটে তো তাঁহাকে পাওয়া গেলই না, আমহার্স্ট স্ট্রীটের কোনো বাড়িতেই তাঁহার খোঁজ মিলিল না। অবশেষে তাঁহাকে পাওয়া গেল ৩নং কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে।

কলিকাতায় তো পথের নাম, বাড়ির নম্বর আছে। চিঠি বিলি করা সহজ। মফস্বল শহরে চিঠি আসে পাড়ার ঠিকানায়। যেমন, শ্রীহরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, তেলীপাড়া, পোঃ জলপাইগুড়ি। ডাকপিওনকে তেলীপাড়ার শুধু তেলী চিনিলেই হইবে না, তাহাকে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, দোসাদ্ সকলকেই জানিতে হইবে।

কেবলমাত্র পুরুষ চিনিলেই কি হয়? মেয়েদেরও জানিতে হয়, নচেৎ টাকা বিলির সময় হয় টানাটানি।

দার্জিলিঙে চিঠি আসে প্রত্যেকটি বাড়ির নামে। এইসব নাম ডাকঘরের কেরানী ও পিওনকে মুখস্থ করিতে হয়। তাহারা স্মৃতিধর না হইলে চিঠির চলন চলিতেই থাকিবে, বিলি আর হইবে না।

শহরের চেয়ে বাংলার পল্লীতে চিঠি বিলির কাজ আরও কষ্টসাধ্য। নদী-নালা খাল-বিল তো আছেই, বর্ষাকালে ধানের ও পাটের ক্ষেতে ডিঙ্গি বাহিয়াও বিলির কাজে যাইতে হয়। ডাকপিওনকে পল্লীতে কাদা ভাঙিয়া পথ চলিতে হয়। কোথাও কোথাও গামছা পরিয়া নদী পার না হইলে বিলির কাজ বন্ধ হইয়া যায়। কোথাও আছে নিবিড় বনে বন্য পশুর ভয়। পাহাড়ের পল্লীতে যাইবার জন্য আছে বুক-ভাঙা চড়াই আর উৎরাই।

অনেক গ্রাম্য-পিওন সরকারকে না জানাইয়া নিজেদের সুবিধামত পল্লীহাটে চিঠি বিলির ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছে। প্রাপকের দেখা না পাইলেও গ্রামের যে-কোনো ব্যক্তির হাতে চিঠি বিলি করিয়াই তাহারা দায়মুক্ত হয়। একটা ঘটনা বলি। ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দ। দিনাজপুর হইতে কাটিহার যাইবার পথে বিরল রেল-স্টেশন। তথাকার হাট প্রসিদ্ধ ও খুব বড়। হাটে সব দোকানীর যেমন এক-একটি চালাঘর থাকে ডাকপিওনেরও তেমনি একটি দোকান-ঘর ছিল। সেই দোকানে লবণ লঙ্কা বিক্রয় হইত না। চিঠিগুলি গ্রাম হিসাবে সাজাইয়া পিওন বসিয়া থাকিত। ইহাই পিওনের দোকান। প্রতি গ্রামের লোকজন পিওনের দোকানে আসিয়া চিঠি লইয়া যাইত।

পিওনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এরূপ দোকান খুলিয়া চিঠি বিলি করিবার কারণ কি?"

সে বলিল, "আমার বিটে (এলাকায়) ১১২টি গ্রাম আছে। প্রতি সপ্তাহে যেটুকু ঘুরিয়া আসিতে হয় তাহা পায়ে হাঁটিয়া ঐ সময়ে শেষ করা যায় না।

তাই এই চিঠির দোকান খুলিয়া বিলি করি। এই ব্যবস্থায় লোকে চিঠি যথাসময়ে পায়।"

জমিদার বিনা পয়সায় এই পিওনের দোকানঘর তৈয়ারি করিয়া দিয়াছেন এবং হাটে বসিবার খাজনাও আদায় করেন না।

বাংলার পল্লীতেই এরূপ ব্যবস্থাও ছিল যে, পল্লীর ডাকপিওন মাসের প্রথমে বাহির হইয়া বিলির কাজ শেষ করিয়া পরবর্তী মাসের প্রথমে ডাকঘরে ফিরিত। আহার ও নিদ্রার জন্য তাহাকে পল্লীবাসীদিগের আশ্রয় লইতে হইত। বর্তমান সময়েও এইরূপ পল্লী-পিওন আছে। তবে এখন এক মাসের পরিবর্তে সাত বা পনেরো দিন অন্তর ফিরিতে পারে।

পল্লীর চিঠিতে রকমারি ঠিকানাও বিলির কাজে ব্যাঘাত ঘটায়। ঠিকানা থাকে, "হরেন কাণা, শেওড়াফুলির বাজার।" "অমর খোঁড়া, বৈদ্যবাটী।" পিওনকে স্থানীয় কাণা, খোঁড়া, কুঁজো, বাবাজী, বৈরাগীরও খোঁজ রাখিতে হয়; নচেৎ চাকরী চলে না।

আর এক ধরনের চিঠি আসে, "জসিমুদ্দিন মিঞা, চূণের নৌকা, কোলাঘাট।" "নন্দ মাঝি, ধানের নৌকা, উলুবেড়িয়া।" ডাকপিওনকে নদীর ঘাটে ঘাটে ঘুরিয়া এইসব চিঠির প্রাপকদিগকেও বাহির করিতে হয়।

চিঠি বিলির কাজে জাতও এক বড় বাধা। ভারতের দক্ষিণে মালাবার ব্রাহ্মণের বাড়িতে নিম্নজাতির ডাকপিওনের পক্ষে চিঠি বিলি করিতে যাওয়া প্রায় অসম্ভব ছিল। ডাক-বিভাগকে বাধ্য হইয়া সেইসব অঞ্চলে উচ্চবর্ণের পিওন নিযুক্ত করিতে হইত। একবার মণিপুর রাজ্যের এক পল্লীতে মুসলমান ডাকপিওন এক মণিপুরী হিন্দুর ঘরের বেড়ায় তাহার সাইকেল হেলান দিয়া রাখিয়া চিঠি বিলি করিতে যায়। ইহাতে ঐ ঘরই অপবিত্র হইয়া গিয়াছিল। হৈচৈ পড়িয়া গেল। শেষে ডাকপিওন ক্ষতিপূরণ দিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচে। বাংলার পল্লীতে এরূপ উগ্র গোঁড়ামি কেহ লক্ষ্য করে নাই।

তীর্থে তীর্থ-যাত্রীদিগের চিঠি বিলি করাও অধ্যবসায়ের আর এক পরীক্ষা। সবচেয়ে মুশকিল হয় শহরে অস্থায়ী মুসাফিরদিগের এবং তীর্থে তীর্থ-যাত্রীদিগের ইন্সিওর্, চিঠি, মনি-অর্ডার ইত্যাদি বিলি করা। তাহাদিগকে সনাক্ত করিবে কে? পূর্বে তীর্থে তীর্থ-যাত্রীদিগকে সনাক্ত করিবার জন্যও এক শ্রেণীর লোক থাকিত। তাহারা পয়সা পাইলেই হলফ করিয়া সনাক্ত করিয়া দিত। ইহার ফলে দশ বৎসর পূর্বে মৃত ব্যক্তিও জীবিত বলিয়া সনাক্ত হইয়াছেন। বড় শহরে অস্থায়ী পরিব্রাজকের পক্ষে সনাক্তের জন্য পরিচিত লোক ডাকঘরে আনয়ন করা সহজসাধ্য নহে। এইসব অসুবিধা দূর করিবার জন্য ডাক-বিভাগ "আইডেন্‌টিটি কার্ড" এর সৃষ্টি করিয়াছেন। উহার এক অংশে থাকে ফটো এবং অপর অংশে বিস্তারিত বিবরণ। উহা দেখাইয়া যে-কোনো ডাকঘরে মনিঅর্ডার, চিঠি ইত্যাদি বিলি লইবার সুবিধা হইয়াছে।

ভারতবর্ষে মনি-অর্ডার বাড়ি লইয়া যাইয়া বিলি করিবার প্রথা। পর্দানশীন নারীর চেহারাও না দেখিয়া তাহার নিকট টাকা বিলি করিবার দায়িত্ব অত্যন্ত বেশি। এইজন্য তাঁহাকে সনাক্ত করিবার বিশেষ ব্যবস্থার আদেশ আছে।

বিলির কাজের বহরও নেহাত কম নহে। ১৯৫১-৫২ সালে বিলির জন্য প্রাপ্ত সর্বপ্রকার দ্রব্যাদির সংখ্যা ছিল ২,৩৬,৫৭,৫১,২৩৭। এই সংখ্যায় মনিঅর্ডার ধরা হয় নাই। মাথাপিছু হিসাব করিলে দেখা যায়, পশ্চিমবঙ্গে পড়িয়াছে ১২·১ খানা, এবং সারাভারতে জনপ্রতি ৬·৬ খানা। সবচেয়ে বেশি দিল্লীতে, মাথাপিছু ৭১·১ খানা, এবং সবচেয়ে কম উড়িষ্যায় জনপ্রতি ২·৯। গত বৎসরের তুলনায় বাড়িয়াছে শতকরা ৪·২ খানা।

বিলির জন্য ঐ বৎসরে ভারতে ছিল ৩৫ হাজারেরও বেশি ডাকপিওন। পল্লী অঞ্চলের জন্য ছিল ১৯, ৬৭৮ জন। পশ্চিমবঙ্গের পল্লীর জন্য ছিল ১,৫৪৭ জন। পল্লী ডাকপিওনের সংখ্যা মাদ্রাজেই সবচেয়ে বেশি (৪,৪৮০)।

দ্রুত বিলির জন্য ডাক বিভাগ যথাসাধ্য ব্যবস্থা করিয়াছে। পল্লী অঞ্চলে

প্রতি পিওনের এলাকা কমাইয়া দিয়া বিলির ভালো ব্যবস্থা করা হইতেছে। যেসব স্থলে ডাকঘরের আয়ে পিওন রাখা চলে না তথায় ঠিকা পিওন বা একস্ট্রা-ডিপার্টমেণ্টাল্ ডেলিভেরি এজেণ্ট নিযুক্ত করিয়া চিঠি বিলির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যেখানে শুধু বিলির কাজের জন্য একজন ঠিকা পিওনও রাখা সম্ভবপর নহে, সেখানে ডাকবহিবার কাজ ও চিঠি-বিলির এই দুই কর্তব্যের জন্য একজন একস্ট্রা-ডিপার্টমেণ্টাল এজেণ্ট নিযুক্ত করা হইতেছে। ১৯৫১-৫২ খ্রীস্টাব্দে এরূপ এজেণ্টের সংখ্যা ভারতে ছিল ২,৬০১ জন।

ইংরেজ আমলে এরূপ গ্রাম ভারতে ছিল যেখানে বিলির কোনো ব্যবস্থাই করা হইয়াছিল না। বর্তমান সময়ে সেইরূপ পল্লীতেও বিলির ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

বহুদিন পূর্বে এই কলিকাতা শহরে 'অবিরাম বিলি'র ব্যবস্থা হইয়াছিল। প্রতি পাড়ায় বা ডাকপিওনের এলাকায় কোনো বাড়ি বা দোকানে একটি তালাবন্ধ বাক্স রাখা হইত। ডাকঘরে যখনই ঐ অঞ্চলের জন্য চিঠি জমিত তখনই ঐসব চিঠি উক্ত বাক্সে আনিয়া রাখা হইত। ডাকপিওনকে ডাকঘরে যাইতে হইত না। সে পাড়ার চিঠি বিলি শেষ করিয়া ঐ বাক্স হইতে চিঠি লইয়া পুনরায় বিলির কাজে যাইত। এইভাবে অবিরাম বিলির কাজ চলিত। কিন্তু ইহাতে দক্ষ-পরিদর্শকের প্রয়োজন। ঐ সময়ে উহা সম্ভবপর না হওয়ায় ডাক-বিভাগ ঐরূপ ব্যবস্থা তুলিয়া দিয়াছেন।

চিঠি বিলি আরও দ্রুত করিবার জন্য ডাকপিওনদিগকে ডাকঘর হইতে যার যার বিলির এলাকায় পৌঁছাইয়া দিবার জন্য অনেক স্থানে বাসের ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহাতে অনেক সময় বাঁচে। শহর ও পল্লী সর্বত্রই ডাকপিওনকে সাইকেল চলিবার জন্য উৎসাহ দেওয়া হয়। সাইকেল ক্রয়ের জন্য অর্থও গবর্নমেণ্ট ঋণ দেন।

নিজের লোক পাঠাইয়া ডাকঘর হইতেও চিঠি বিলি লইবার ব্যবস্থা আছে।

তজ্জন্য দরখাস্ত দিতে হয়। টাকা দিলে ডাকঘর হইতে চিঠিপত্রাদি তালাবন্ধ ব্যাগেও নিজের লোকের সাহায্যে বিলি লইবার ব্যবস্থা করা যায়। বড় শহরে পোস্ট-বক্সের ব্যবস্থাও হয়। যাঁহারা ইচ্ছা করেন তাঁহারা কেয়ার অব পোস্টমাস্টার এই ঠিকানায়ও চিঠি আনাইতে পারেন। এইসব চিঠি প্রাপককে ডাকঘরে উপস্থিত হইয়া বিলি লইতে হয়।

কেহ হয়তো চিঠি লিখিয়াছেন এক মুসাফিরকে এক ডাকঘরের ঠিকানায়। তাঁহার সন্দেহ হইতেছে তিনি তথায় পৌছিয়াছেন কিনা, এবং চাহিতেছেন চিঠিখানা যেন প্রাপকের পৌছা পর্যন্ত ঐ ডাকঘরে রাখা হয়। সমাজের এই প্রয়োজন মিটাইবার জন্যও ডাকবিভাগ ব্যবস্থা করিয়াছেন। চিঠির উপর 'Poste Restante' লিখিয়া দিলে প্রাপকের পৌছা পর্যন্ত উহা ডাকঘরে রাখা হয়।

কোথাও হয়তো ডাকঘরে ডাক পৌছিবার অনেক পরে ডাকপিওন চিঠি লইয়া বিলি করিতে বাহির হয়। আপনি চাহিতেছেন পিওন বাহির হওয়া পর্যন্ত দেরী না করিয়া আপনার চিঠিখানা আগেই বিলি হইলে আপনার উপকার হয়। তাহারও ব্যবস্থা আছে। অতিরিক্ত মাশুল দিয়া চিঠির উপর Express মার্কা করিয়া দিলেই চিঠিখানা হয় পিওনের নয়তো অপর বাহকের সাহায্যে আগেই বিলি করা হয়।

বিবাহ, জন্মদিন ইত্যাদি উপলক্ষে অনেকে অভিনন্দক টেলিগ্রাম্ পাঠান। এইসব টেলিগ্রাম রঙিন খাম ও কাগজে লিখিয়া বিলি হয়। ইচ্ছা করিলে এই চিত্রিত রঙীন কাগজ ও খাম ডাকঘর হইতে ক্রয় করিয়া ডাকেও 'অভিনন্দন-পত্র' পাঠাইতে পারেন।

প্রত্যেক বাড়িতেই যদি গৃহস্বামী বাড়ির বাহিরে একটি চিঠির বাক্স রাখেন, তাহা হইলে ডাকপিওনকে দরজা ধাক্কাইয়া, কড়া নাড়িয়া হাঁকাহাঁকি করিয়া চিঠি বিলি করিতে অযথা সময় নষ্ট করিতে হয় না। পাঁচতলা সাততলা ফ্ল্যাট

বাড়ির একতলায় যদি সকলেরই চিঠির বাক্স থাকে, তাহা হইলে অতি অল্প সময়ে ডাকপিওন চিঠি বিলি করিয়া অপর বাড়িতে যাইতে পারে। মনি-অর্ডার, রেজেষ্ট্রি চিঠি বিলি করিতে এক এক প্রাপকের সহি পাইতে যে কত সময় নষ্ট হয় তাহা ভুক্তভোগী ডাকপিওনই জানে। ডাকপিওনকে তাড়াতাড়ি বিদায় করিয়া দিলে অপর পড়শীগণ তাহাদের চিঠি ইত্যাদি শীঘ্র পাইতে পারেন। প্রত্যেক নর-নারীর দেশপ্রেম, কর্তব্যজ্ঞান, সহযোগিতা না থাকিলে শুধু ডাকবিভাগের ব্যবস্থায় বিলির কাজ আশানুরূপ দ্রুত হইতে পারে না।

অচল চিঠি

চিঠি চলে। চলাচলের পথে চলন থামিলেই হয় অচল, মৃত। চলার গতিতে বাধা পড়িলেই চলন থামে। প্রাপকের পাত্তা নাই, ঠিকানা নাই, আরও হরেক কারণে চিঠি বিলি হয় না। ভারতে শুধু ঠিকানাহীন চিঠিই দৈনিক পাওয়া যায় গড়ে প্রায় ৩৪৩ খানা। প্রেরকের ঠিকানাও হয়তো বাহিরে লেখা নাই। তাঁহার নিকট'ও উহা ফেরত পাঠাইবার জো নাই। চিঠির চলনে পড়িল বাধা। এখন ইহার আশ্রয় কোথায়? চলন্তের আশ্রয় ডাকঘরে হয়। কিন্তু, অচল চিঠি নিরাশ্রয়। উহারও আশ্রয় মিলে অচল চিঠির আপিসে।

অচল চিঠির ব্যবস্থা করিবার জন্য ডাকবিভাগে আপিস আছে। উহাকে ইংরেজিতে বলে 'ডেডলেটার আপিস'। বাংলায় 'অচল চিঠির আপিস' বলা যাইতে পারে।

১৮৩৭ খ্রীস্টাব্দের ভারতীয় বিধির ২৫, ২৬, এবং ২৭ ধারা অনুযায়ী অচল চিঠির আপিসের জন্ম হয়। ডাকঘর যেসকল চিঠি তিন মাসের মধ্যে বিলি করিতে পারিত না সেইগুলি তিন মাস পরে প্রদেশের জেনারেল পোস্টাফিসে পাঠাইয়া দিত। প্রতি তিন মাস অন্তর এইসকল দাবিহীন অচল চিঠির একটি তালিকা সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হইত। আঠারো মাস ঐগুলি জেনারেল

পোস্টাপিসে পড়িয়া থাকিবার পরে পোস্টমাস্টার-জেনারেল ঐ চিঠি ও প্যাকেট-গুলি খুলিতেন, এবং মূল্যবান কিছু পাওয়া গেলে গবর্নমেণ্ট ট্রেজারিতে উহা জমা দিতেন। অবশ্য প্রেরক দাবি করিলে উহা তাহাকে দিবার ব্যবস্থাও ছিল। ইহার পর আরও ১২ মাস অপেক্ষা করিয়া বেওয়ারিশ চিঠি নষ্ট করিয়া ফেলা হইত। বর্তমান সময়েও এই ব্যবস্থাই কিছু পরিবর্তিত হইয়া কাজ চলিতেছে।

একটি পার্শেলের উপর ঠিকানা ছিল, "পিতৃদেব, কলিকাতা"। বাড়ির নম্বর, পথের নাম নাই। উহার উপরে প্রেরকের নাম থাকিলেও হয়তো ডাকঘর প্রেরকের নিকট উহা বিলির চেষ্টা করিতে পারিত। কিন্তু, শুধু "পিতৃদেব" থাকায় কাহার পিতৃদেব কাহাকে ঠিক করিবে? উহা বিলি না হইয়া গেল 'ডেডলেটার আপিসে'। তথায় তাঁহারা খুলিয়া ভিতরে পাইলেন কিছু আমসত্ত্ব, একখানা ধুতি, দুটি টাকা, ও একখানা চিঠি। চিঠিতে পাওয়া গেল প্রেরকের নাম, আর শুধু মালদহ।

চিঠি হইতে ডাককর্মী বুঝিতে পারিলেন যে, প্রেরক নববিবাহিতা কন্যা। এখন ঠিকানাহীন এই কন্যাকে পাওয়া যায় কি করিয়া? মালদহ শহরে এই কন্যার নামীয়া সকল নারীর সংবাদ সংগ্রহ করিয়া ডাকঘর বাহির করিয়াছিল আসল কন্যাকে। তিনি শ্বশুরবাড়ির কাহাকেও না জানাইয়া গোপনে ঐসব পাঠাইয়াছিলেন বলিয়া তাড়াতাড়িতে ঠিকানা লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। ধুতি, টাকা সবই তিনি ফেরত পাইয়াছিলেন। এখন বুঝিয়া দেখুন, অচল চিঠির সদ্গতি করিতেও ঝকমারি কম নহে।

অচল চিঠি, প্যাকেট, পার্শেল ইত্যাদি আসিলেই অচল চিঠির বা ডেডলেটার আপিস প্রাপক বা প্রেরকের নিকট ঐগুলি বিলির জন্য সচেষ্ট হইয়া পড়ে। তজ্জন্য রকমারি ফন্দিফিকির করিতে হয়। ঝকমারিও কম নয়।

প্রতিবৎসর এইরূপ অচল চিঠি ইত্যাদির সংখ্যাও একেবারে কম নহে। ১৯৫১-৫২ খ্রীস্টাব্দে ইহার মোট সংখ্যা ছিল, ১২,৮৫৮,০৩৯খানা। ডেডলেটার

আপিস ইহার মধ্যে প্রাপকের নিকট পুনরায় পাঠাইতে পারিয়াছিল শতকরা ৫২·৬ খানা, প্রেরকের নিকট পাঠাইয়াছিল ২২·৪%, অন্যান্য ডেডলেটার আপিসে পাঠানো হইয়াছিল ১৩·৬%, আর একেবারেই অচল হিসাবে জমা ছিল ১১·৪%।

যেসকল চিঠিপত্রাদি সম্পূর্ণ অচল বলিয়া গণ্য হয় তাহাদের মধ্যে সাধারণ খামের চিঠি ও পোস্টকার্ডের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি।

অচল চিঠি, প্যাকেট, পার্শেল, ইত্যাদি ডেডলেটার আপিসে খুলিয়া সাধারণত পাওয়া যায় চিঠির সহিত চেক, হুণ্ডি, কারেন্সি নোট, বিদেশী টাকাপয়সা, এবং অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্যাদি। এইগুলির মোটমূল্যও কম নহে। বৎসরে প্রায় ২১ লক্ষ টাকা (১৯৫১-৫২)। ইহার বেশির ভাগই প্রেরকের নিকট, এবং কিছু কিছু প্রাপকের নিকটও বিলি করিয়া দেওয়া হয়। যেসকল দ্রব্যাদি রক্ষা করা সম্ভবপর নহে তাহা নির্দিষ্ট সময়ের পরে নষ্ট করিয়া ফেলা হয়।

কলিকাতায় বিলির জন্য পাওয়া যায় প্রায় ১২ রকম বিভিন্ন ভাষায় ঠিকানা লেখা চিঠি ইত্যাদি। কাজেই অচল চিঠির আপিসেও বিভিন্ন ভাষায় জ্ঞান আছে এইরূপ কর্মচারীর প্রয়োজন হয়।

পার্শেল

ভারতবর্ষে ডাকে পার্শেল (পুলিন্দা) পাঠাইবার ব্যবস্থা শুরু হয় ডাকঘরের জন্মের প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই। তখন অপর নামে ইহার পরিচয় ছিল। ইহাকে পার্শেল না বলিয়া 'ভাঙ্গি' বলা হইত। বাঁকে বা কাঁধে ঝুলাইয়া বহন করা হইত বলিয়াই ইহাকে ভাঙ্গি বলিত। ডাকঘরের প্রাচীন দলিলে 'পার্শেল-ডাক' বুঝাইতে 'ভাঙ্গি-পোস্ট' শব্দই ব্যবহৃত হইত।

তখনকার দিনে গবর্নমেণ্টের বেশি ওজনের দলিল ও দ্রব্যাদি একস্থান হইতে অপর স্থানে পাঠাইবার জন্যই ভাঙ্গি-ডাকের প্রয়োজন হইয়াছিল। বেসরকারি

পুলিন্দা উহাতে পাঠানো যাইত না। ১৮৩৭ খ্রীস্টাব্দের বিধি অনুসারে বেসরকারি লোকও ভাঙ্গি-ডাকে ভারী চিঠি বা পুলিন্দা পাঠাইবার অধিকার লাভ করিয়াছিল। চিঠির ওজন ১২ তোলার বেশি হইলেই ভাঙ্গি-ডাকে পাঠাইতে হইত। উহার মাশুল দূরত্ব ও ওজনের উপর নির্ভর করিত। পঞ্চাশ মাইলে পঞ্চাশ তোলায় ছয় আনা, এবং তদূর্ধে প্রতি ৫০ তোলায় বা উহার অংশে ৫০ হইতে ৩০০ শত মাইল পর্যন্ত তিন আনা মাশুল ধার্য হইত। ৩০০ শত মাইলের পর ১০০০ মাইল পর্যন্ত প্রতি শত মাইলে প্রতি ৫০ তোলায় তিন আনা মাশুল লাগিত। ইহার পর ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দে পার্শেলের মাশুলের হার হ্রাস করা হয়।

১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দে মাশুলের হার আরও কমিয়াছিল।

১৮৭১ খ্রীস্টাব্দে সর্বপ্রথম কেবলমাত্র ওজনের উপর নির্ভর করিয়া পার্শেল-মাশুল নির্ধারিত হইয়াছিল।

যেখানে যেখানে রেললাইন খোলা হইয়াছিল সেখানে রেলকোম্পানিকেই ডাকঘরের পার্শেল বিনা ভাড়ায় বহিতে হইত। ইহা লইয়া ক্রমশ ডাকবিভাগ ও বিভিন্ন রেলকোম্পানির মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। অবশেষে ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দে স্থির হইল যে, গবর্নমেণ্টের পার্শেল রেলকোম্পানি বিনা ভাড়ায় বহিবে; কিন্তু বে-সরকারী পার্শেলের জন্য রেলযাত্রীদিগের লাগেজের ভাড়ার হারে মাশুল দিতে হইবে। এই মাশুলের হার তখন ছিল প্রতিমাইলে মণ প্রতি $\frac{1}{6}$ আনা।

১৮৭১ খ্রীস্টাব্দের নূতন ব্যবস্থানুসারে পার্শেলের মাশুল দশ তোলায় তিন আনা হারে নির্দিষ্ট হইয়াছিল। ডাকহরকরা যেখানে ডাক বহে তথায় ৬০০ তোলার বেশি ওজনের পার্শেল ডাকঘর গ্রহণ করিত না। রেললাইনের বেলা উহার ওজন ২০০০ তোলা পর্যন্ত হইলেও চলিত।

১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে পার্শেলের মাশুল আরও হ্রাস পাইয়াছিল। ৪৪০ তোলার বেশি ওজনের পার্শেল রেজিস্ট্রি করা বাধ্যতামূলক হইয়াছিল।

১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে পার্শেল-মাশুলের হার আরও কমাইয়া দেওয়া হইল। রেলবাহী পার্শেলের ঊর্ধ্বতম ওজনও কমাইয়া ৮০০ তোলা করা হইয়াছিল।

১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দে ভারত হইতে গ্রেটবৃটেনে পার্শেল পাঠাইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। প্রথমে গ্রেটবৃটেনের ডাকবিভাগের সাহায্য পাওয়া যায় নাই। ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দ হইতে দুই দেশের ডাকবিভাগ পার্শেল বিনিময়ের ব্যবস্থা করিয়াছিল। ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে ভারতবর্ষ আন্তর্জাতিক পার্শেলপোস্ট ইউনিয়ানে যোগ দেয়। ইহার ফলে ১৮০৯ খ্রীস্টাব্দ হইতে ভারত পৃথিবীর যে-কোনো দেশে পার্শেল পাঠাইতে পারে, এবং তথা হইতে উহা পাইতেও পারে।

১৮৫৪-৫৫ খ্রীস্টাব্দে পার্শেলের সংখ্যা ছিল ৪৬৩,০০০, ১৮৭০-৭১ সালে হয় ৬৯৪,০০০ ; এবং ১৯৫১-৫২ খ্রীস্টাব্দে হইয়াছে ১৭, ৪২০, ৫৮৫।

ভি. পি. পার্শেল বা চিঠি

পার্শেল যখন জনপ্রিয় হইয়া উঠিল তখন ছোট ছোট ব্যবসায়ীগণ দাবি করিল যে, ডাকঘর সাহায্য করিলে তাহারা দূরের ক্রেতার নিকট ঘরে বসিয়াই পণ্য বিক্রয় করিতে পারে। দেশবাসীর সুবিধার জন্য ডাকঘর এই কাজও গ্রহণ করিল।

১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দে ভি. পি. অর্থাৎ ভ্যাল্যু পেয়েবল্ পার্শেলের প্রচলন হয়। এই প্রথায় ব্যবসায়ীগণ একস্থানে বসিয়াই দূরদূরান্তের গ্রাহকের নিকট তাহাদের পণ্য বিক্রয় করিতে পারে। ক্রেতাগণকেও পণ্য বিক্রয়স্থানে উপস্থিত হইতে হয় না। বিক্রেতা পার্শেল করিয়া ডাকঘরের সাহায্যে তাহার পণ্য ক্রেতার নিকট পাঠাইয়া দেন। ডাকবিভাগের সহিত বিক্রেতার শর্ত থাকে যে, পার্শেল বিলি হইলে গ্রাহকের নিকট হইতে মূল্য আদায় করিয়া উহা বিক্রেতাকে বুঝাইয়া দিতে হইবে। পল্লীপ্রধান ভারতবর্ষে জনসাধারণ এই প্রথায় যথেষ্ট উপকৃত হইল।

এইজন্য পার্শেলের সংখ্যাও বাড়িয়া গেল। ভি. পি. পার্শেল প্রচলনের পর ১৮৮০-৮১ খ্রীস্টাব্দে পার্শেলের সংখ্যা হইয়াছিল ১,০৮০,৮৬৮। এই পরিসংখ্যায় ভি. পি. পার্শেল পৃথক করিয়া দেখানো হয় নাই। কাজেই ঠিক কয়টি ভি. পি. পার্শেল সেই বৎসরে হইয়াছিল তাহা জানিবার উপায় নাই। কিন্তু ১৯৫১-৫২ খ্রীস্টাব্দে ভি. পি. পার্শেল হইয়াছিল ৪,৮২৬,১৬৪টি।

ইহা ছাড়া আছে ভি. পি. চিঠি। যেসকল ভারী পণ্য ডাকে পাঠানো যায় না উহা সওদাগরগণ রেলে পাঠাইয়া থাকেন; এবং রেলের রসিদখানাই, ভি. পি. চিঠিতে পাঠাইয়া ক্রেতার নিকট হইতে মালের মূল্য ডাকঘরের সাহায্যে আদায় করিয়া থাকেন। এইরূপ ভি. পি. চিঠির সংখ্যাও ১৯৫১-৫২ খ্রীস্টাব্দে হইয়াছে ৩,৬৪৯,৪১৮ খানা। এই দুইপ্রকার ভি. পি.র সাহায্যেই প্রেরকগণ একবৎসরে ৩৭·৮১ কোটি টাকার কারবার করিয়াছে। আমাদের দেশে ভি. পি.-ডাকও জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে।

ভারতের সহিত বিদেশের কোনো কোনো স্থানে ভি. পি. পার্শেল চলাচলের ব্যবস্থা হইয়াছে। বৎসরে প্রায় ৪½ হাজার ভি. পি. বিদেশ হইতে ভারতে আসে, এবং ১,৩৭০০০ হাজার ভি. পি. ভারত হইতে বিদেশে যায়।

মনি-অর্ডার

ডাকঘরের মনি-অর্ডার সকলের নিকটই সুপরিচিত। মনি-অর্ডারে, অনেককেই টাকা পাঠাইতে হয়। গরিবের গরজই বেশি; কারণ অল্প টাকা পাঠাইবার নির্ভরযোগ্য সুবিধাজনক ব্যবস্থা আর নাই।

মনি-অর্ডারের কাজ ডাকঘরের মুখ্য কর্তব্য নহে। সর্বপ্রথমে ডাকঘরকে এই কাজ করিতেও হইত না। ভারতে ডাকঘর প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে লোকে টাকা পাঠাইত হয় কোনো লোকের মারফত, নয় তো হুণ্ডির সাহায্যে। ইংরেজ আমলে ডাকঘর প্রতিষ্ঠিত হইবার পরেও মনি-অর্ডারের কাজ চালাইত গবর্নমেণ্ট

ট্রেজারি। এক ট্রেজারি অপর এক ট্রেজারির উপর বারোমাসের মেয়াদী হুণ্ডি কাটিত। এই ট্রেজারি-হুণ্ডির সাহায্যেই লোকের টাকা পাঠাইবার কাজ চালাইতে হইত। সমগ্র ভারতে ট্রেজারির সংখ্যা ছিল নগণ্য। হুণ্ডি কাটিবার ও ভাঙাইবার আপিস ইংরেজ-অধিকৃত ভারতে ছিল মাত্র ২৮৩টি। ইহাতে দেশবাসী বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিত। তজ্জন্য অনেকে চিঠির মধ্যে নোট পাঠাইতে আরম্ভ করিয়াছিল।

দেশবাসীর এই অসুবিধা দূর করিবার জন্যই ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দের ১লা জানুয়ারী তারিখে মনি-অর্ডারের কাজ গবর্নমেণ্ট ট্রেজারি হইতে তুলিয়া আনিয়া ডাকঘরকে দেওয়া হইয়াছিল। তখন সারা দেশে প্রায় ৫৫০০ ডাকঘর ছিল। ডাকঘর এই কর্তব্যভার গ্রহণ করিবার পরে দেশের অনেক বেশি লোক মনি-অর্ডারে টাকা পাঠাইবার সুযোগ লাভ করিয়াছিল। প্রথম বৎসরেই (১৮৮০-৮১ খ্রীঃ) ষোল লক্ষের বেশি মনি-অর্ডার হইয়াছিল।

এখন আমরা যে প্রণালীতে ডাকঘরে মনি-অর্ডার করিতে ও মনি-অর্ডারের টাকা পাইতে পারি, প্রথমে এইরূপ সহজ ব্যবস্থা ছিল না। তখন মনি-অর্ডারে টাকা পাঠাইতে হইলে ডাকঘরে একখানা দরখাস্ত দিতে হইত। টাকা পাঠাইবার কমিশন ডাকটিকিটে দিতে হইত। ঐ টিকিট দরখাস্তের অপর পৃষ্ঠায় আঁটিয়া দিবার রীতি ছিল। দরখাস্ত ও টাকা ডাকঘরে দিলে ডাকঘর প্রেরককে রসিদ দিত। প্রেরককে দরখাস্ত লিখিয়া দিতে হইত কোন্ ডাকঘর হইতে প্রাপক টাকা লইবে। ডাকঘর এই দরখাস্তখানা প্রাপক যেখানে থাকেন তথাকার হেড-পোস্টাপিসে পাঠাইয়া দিত। এই প্রধান ডাকঘরকে বলা হইত "মনি-অর্ডার তৈয়ারির আপিস"—কারণ, এই বড় ডাকঘরই মনি-অর্ডার তৈয়ারি করিয়া প্রাপক যে ডাকঘরের এলাকায় থাকেন তথায় মনি-অর্ডারখানা বিলির জন্য পাঠাইয়া দিত। মনি-অর্ডার পাইয়া প্রাপককে প্রাপ্তিস্বীকার-পত্রীতে সহি করিয়া দিতে হইত। ঐ প্রাপ্তিস্বীকারপত্রী প্রেরকের নিকট

পাঠাইয়া দেওয়া হইত। প্রাপক মনি-অর্ডার বিলি লইয়া, যে ডাকঘর টাকা দিবে তথা হইতে মনি-অর্ডার ভাঙাইয়া টাকা গ্রহণ করিত। মনি-অর্ডার ভাঙাইয়া টাকা লইয়া আসিবার দায়িত্ব ছিল প্রাপকের নিজের।

তখন ১৫০৲ টাকার বেশি এক মনি-অর্ডারে পাঠানো যাইত না। একজন প্রেরক একই প্রাপকের নিকট একদিনে চারিখানার অধিক মনি-অর্ডার পাঠাইতে পারিত না।

ভারতবর্ষ হইতে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে মনি-অর্ডারে টাকা পাঠাইবার ব্যবস্থা তখন হইতেই হইয়াছিল। বর্তমান সময়ে (১৯৫১-৫২ খ্রীঃ) বিদেশী মনি-অর্ডার ভারত হইতে বিভিন্ন দেশে পাঠানো হইয়াছে ১১,৯৬২ খানা, এবং বিদেশ হইতে ভারতে আসিয়া বিলি হইয়াছে ২২,৭৪,৮৩৫ খানা বিদেশী মনি-অর্ডার।

ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম টেলিগ্রাফ লাইন খোলা হইয়াছিল—ডায়মণ্ডহারবার কলিকাতার মধ্যে ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দের নবেম্বর মাসে। ১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতা ডায়মণ্ডহারবারের দিকে ২১ মাইল পথে টেলিগ্রাফের তার খাটাইয়া ইলেক্‌ট্রিক্ টেলিগ্রাফের প্রথম পরীক্ষা ভারতে করেন কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের রসায়নের অধ্যাপক ডাক্তার উইলিয়ম ব্রুক ও'সাগনসি। ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দের ৫ই নবেম্বর ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কলিকাতা হইতে ডায়মণ্ডহারবারের মধ্যে টেলিগ্রাফের লাইন স্থায়ী ভাবে নির্মাণ করিতে আরম্ভ করেন। ১৮৫১ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে উহা শেষ হয়। ডায়মণ্ডহারবার হইতে প্রথম এই লাইনে টেলিগ্রাফের সঙ্কেত প্রেরণ করেন একজন বাঙালী, রায় বাহাদুর শিবচন্দ্র নন্দী। ঐ বৎসর হইতেই ভারতে প্রথম টেলিগ্রাম প্রেরণের ব্যবস্থা হয়। তখন গবর্নমেণ্টের টেলিগ্রাফই বেশি হইত। ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতা হইতে আগ্রায় টেলিগ্রাফ লাইন তৈয়ারি শুরু হয় এবং ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দের ২৪শে মার্চ আগ্রা হইতে কলিকাতায় প্রথম টেলিগ্রাম পাঠানো হয়। ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দে আগ্রা হইতে বোম্বাই এবং মাদ্রাজের মধ্যেও টেলিগ্রাফ লাইন

তৈয়ারি হয়। ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতা হইতে পেশোয়ারে টেলিগ্রাফ পাঠাইবার ব্যবস্থা হয়। ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দে প্রথম ভারতীয় টেলিগ্রাফ আইন পাস হয়।

সমগ্র ভারত, কাশ্মীর ও ব্রহ্মদেশকে যুক্ত করিয়া টেলিগ্রাফ লাইন তৈয়ার করিতে এবং টেলিগ্রাফের যন্ত্রপাতির উন্নতি করিতে ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সময় কাটিয়া গেল। অবশ্য আমাদের দেশে ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে প্রথম টেলিগ্রাফ মনি-অর্ডার ('তার' মনি-অর্ডার) প্রচলিত হয়। মনি-অর্ডার কমিশন বাদে টেলিগ্রামের জন্য অতিরিক্ত দুই টাকা আদায় হইত। 'তার' মনি-অর্ডারে ছয় শত টাকা পর্যন্ত পাঠানো চলিত। প্রথম ছয় মাসেই ৫৭৮৮ খানা টেলিগ্রাফ মনি-অর্ডার হইয়াছিল। ১৯৫১-৫২ খ্রীস্টাব্দে হইয়াছে ১২,১১,৯২৯ খানা।

১৮৮৯ সনে মনি-অর্ডারের সংখ্যা ও ঊর্ধ্বতম টাকার পরিমাণের বিধিনিষেধের পরিবর্তন হইয়াছিল। সাধারণ ও তার মনি-অর্ডার দুই-ই ছয় শত টাকা পর্যন্ত পাঠাইবার আদেশ হইয়াছিল। এক প্রেরক যে একই প্রাপকের নিকট দিনে চারিখানা মনি-অর্ডারের বেশি পাঠাইতে পারিত না—সেই নিষেধ-আজ্ঞাও উঠিয়া গেল।

তখন মনি-অর্ডারের কমিশন ছিল দশ টাকা পর্যন্ত দুই আনা এবং পঁচিশ টাকা পর্যন্ত চারি আনা হারে। আমাদের দেশে দশ টাকার অনধিক মূল্যের মনি-অর্ডারের সংখ্যাই বেশি। সেকালেও অবস্থা এইরূপই ছিল। কমিশন হ্রাসের জন্য দেশবাসী দাবি জানাইল। ১৯০২ খ্রীস্টাব্দের ১লা এপ্রিল হইতে দশ টাকা পর্যন্ত মনি-অর্ডারের কমিশন দুই আনার পরিবর্তে এক আনা হইয়াছিল।

আমাদের দেশে সত্তর বৎসরে মনি-অর্ডারের অগ্রগতি দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায়, ডাকঘর মনি-অর্ডারের কাজ গ্রহণ করিয়া দেশসেবার কত বড় দায়িত্বে হাত দিয়াছে। ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দে হইয়াছিল প্রায় ষোল লক্ষ মনি-অর্ডার; ১৯৫২ খ্রীস্টাব্দে হইয়াছে ৫৩ কোটি ৮ লক্ষের বেশি।

সদর-খাজনা দিবার জন্য সুদূর পল্লী হইতে সদরে আসা যে কি ঝকমারি তাহা ভুক্তভোগীমাত্রেই জানেন। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্যও ডাকবিভাগ সচেষ্ট হইয়াছিল, রাজস্ব-মনি-অর্ডারের প্রচলনও হইয়াছিল। এই মনি-অর্ডারের জন্য পৃথক ফরম ব্যবহৃত হইত। এখনও উহাই চলিতেছে। এই মনি-অর্ডারের প্রথম পরীক্ষা হয় বারাণসীতে ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে। প্রথম এগার মাসেই ১৩,৯১৪ খানা রাজস্ব মনি-অর্ডার হইয়াছিল। বারাণসীতে পরীক্ষার সাফল্য দেখিয়া উহা ক্রমশ কুমায়ুন বাদে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের সর্বত্র, বঙ্গ-দেশের দশটি জেলায়, পাঞ্জাবে, মধ্যপ্রদেশে এবং মাদ্রাজেও চালু হইয়াছিল। মাদ্রাজে উহা প্রথমে জনপ্রিয় হয় নাই। তজ্জন্য ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দে উহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দ হইতে উহা পুনরায় তথায় প্রচলিত হইয়াছে। পরীক্ষায় সাফল্য দেখিয়াই সমগ্র ভারতে রাজস্ব-মনি-অর্ডার এখন চলিতেছে।

রেণ্ট মনি-অর্ডারও পরীক্ষামূলকভাবে প্রথম প্রচলিত হয় উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ও বঙ্গদেশে ১৮৮৬ সালে; এবং মধ্যপ্রদেশে ১৮৯১ সালে। এখন এই ব্যবস্থা স্থায়ী হইয়াছে।

নিম্নের পরিসংখ্যান হইতে দেখিতে পাওয়া যাইবে রেভিনিউ ও রেণ্ট মনি-অর্ডার ক্রমশ কিরূপ জনপ্রিয় হইয়া উঠিতেছে—

	রাজস্ব বা রেভিনিউ মনি-অর্ডার	রেণ্ট মনি-অর্ডার
১৮৮৬-৮৭	৬৬,২০৪	১,২১৩
১৯৫১-৫২	৫৩৩,২৯০	১৩৮,৭৩০

আমাদের দেশে মনি-অর্ডার এখন প্রাপকের বাড়িতে বিলি হয়। ইউরোপ আমেরিকার সর্বত্র এইরূপ ব্যবস্থা নাই। পূর্বেই দেখিয়াছি, আমাদের দেশেও সর্বপ্রথমে এই ব্যবস্থা ছিল না। প্রাপককে তখন ডাকঘরে যাইয়া মনি-অর্ডারের টাকা লইয়া আসিতে হইত। ইহাতে পল্লীবাসীর অত্যন্ত অসুবিধা হইতেছিল।

সেই অসুবিধা দূর করিবার জন্য ১৮৮৬ হইতে মনি-অর্ডারের টাকা বাড়িতে বিলির ব্যবস্থা হইল। ইহাতে জনসাধারণের সুবিধা হইয়াছে বটে, কিন্তু ডাকঘরের ঝুঁকি বাড়িয়াছে।

মনি-অর্ডার না করিয়া অল্প পরিমাণ টাকা পাঠাইবার অপর ব্যবস্থাও ডাকবিভাগ করিয়াছে। ইণ্ডিয়ান পোস্টাল অর্ডার ক্রয় করিয়াও টাকা পাঠানো যায়। ইহাকে ডাকঘরের চেক বা হুণ্ডি বলা যাইতে পারে। চিঠির সহিত খামে ইহা প্রাপকের নিকট পাঠানো যাইতে পারে। প্রাপক নির্দিষ্ট ডাকঘর হইতে ইহার বিনিময়ে টাকা পাইতে পারেন। ইচ্ছা করিলে ব্যাঙ্কের সাহায্যেও ইহার টাকা পাওয়া যাইতে পারে। চেকের মত ইহা 'ক্রস' করিয়া দেওয়া চলে।

১৯৫১-৫২ সনে ২৯,৩৫,৯৩০ খানা ইণ্ডিয়ান পোস্টাল অর্ডার বিক্রয় হইয়াছে। দেখা যায়, ইহাও জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে।

ব্যবসায়ীদিগের মত যাঁহারা বেশি পরিমাণ টাকা ডাকঘরের সাহায্যে পাঠাইতে চান, তাঁহাদের পক্ষে মনি-অর্ডার অথবা ইণ্ডিয়ান পোস্টাল অর্ডার কোনোটাই সুবিধাজক হয় না। তাঁহাদের জন্য ব্যবস্থা আছে ইন্সিয়োর চিঠি বা পার্শেলের। ইন্সিয়োর করিয়া হাজার হাজার টাকার নোট ডাকে পাঠানো যাইতে পারে। অবশ্য ইন্সিয়োর-ডাকে যে কেবল টাকাই পাঠানো হয় তাহা নহে, অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্যাদি বা দলিল ইত্যাদিও প্রেরিতে হইয়া থাকে।

এইরূপ নানাভাবে টাকা পাঠাইবার সুব্যবস্থা করিয়া ডাকঘর এই গৌণ কর্তব্যের সাহায্যেও দেশবাসীর যথেষ্ট সেবা করিতেছে।

ডাকঘরের সেভিংস্ ব্যাঙ্ক

জনসাধারণের সঞ্চয়ের সাহায্যের জন্য সেভিংস্ ব্যাঙ্কের সৃষ্টি। ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দের ১লা নভেম্বর তারিখে কলিকাতায় প্রথম গবর্নমেণ্ট সেভিংস্ ব্যাঙ্ক খোলা হইয়াছিল। সেভিংস্ ব্যাঙ্কের সমুদয় ঝুঁকি গবর্নমেণ্ট লইয়াছিলেন।

১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দের ১২ই অক্টোবর তারিখের কলিকাতা গেজেটে ইহার নিয়মাবলী প্রচারিত হইয়াছিল। একবারে এক টাকার কম জমা দেওয়া চলিত না। জমার উর্ধ্বতম পরিমাণ ছিল ৩০০০৲ টাকা। প্রাদেশিক শহরে ধনীরাই বেশি সুযোগ গ্রহণ করিলেন। কাজেই তিন হাজার টাকা জমা দিতে আর কয়দিন লাগে। শেষে নিয়ম হইয়াছিল যে, বৎসরে পাঁচশত টাকার বেশি জমা দেওয়া চলিবে না। সুদের হার ছিল শতকরা ৪৲ টাকা। কোনো আমানতকারীর গচ্ছিত টাকা পাঁচশত টাকায় পৌছিলে তাহা শতকরা চারি টাকা হারে 'লোন্' বা কর্জরূপে গৃহীত হইত। সুদের হার বাড়াইতে বা কমাইতে হইলে গবর্নমেণ্টকে ছয় মাস পূর্বে সেই বিষয়ে কলিকাতা গেজেটে বিজ্ঞাপিত করিবার ব্যবস্থা ছিল।

সেভিংস্ ব্যাঙ্ক খোলার প্রথম দিনেই এক হইতে চারি শত টাকা পর্যন্ত আমানত হইয়াছিল। সেইদিন আমানতী টাকার মোট পরিমাণ হইয়াছিল ৩,৮২৮৲ টাকা। প্রথম দিনের আমানতকারীদিগের মধ্যে সরকারি আফিসের ও বেঙ্গল ব্যাঙ্কের কর্মচারীগণই ছিলেন প্রধান। বেঙ্গল ব্যাঙ্কের খাজাঞ্চি রামকমল সেনের চেষ্টাতেই ঐ ব্যাঙ্কের অনেক কর্মী পাঁচ হইতে দশ টাকা পর্যন্ত জমা দিয়াছিলেন। প্রথম দিনের আমানতকারীদিগের নামের তালিকায় পুরোভাগে দেখিতে পাওয়া যায় দ্বারকানাথ ঠাকুর ও তাঁহার পুত্রের নাম। তাঁহাদের প্রত্যেকের নামে চারি শত টাকা জমা হইয়াছিল।[১]

প্রথম ছয় মাসে সেভিংস্ ব্যাঙ্কে জমা হইয়াছিল ১,৬৯,৬৭২৮/৩ পাই, এবং ১৮,০৬১৸৵৭ পাই তোলা হইয়াছিল। সুতরাং ব্যাঙ্কে আমানত ছিল বাদবাকী ১,৫১, ৬১০৸৵৮ পাই। এই আমানতী টাকার মধ্যে কতক অংশ চারি টাকা সুদের 'লোনে' পরিণত করা হইয়াছিল।

১৮৩৪ খ্রীস্টাব্দে মাদ্রাজে, এবং ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দে বোম্বাই শহরে গভর্নমেণ্ট

১ সেভিংস্ ব্যাঙ্কের গোড়ার কথা। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, প্রবাসী, পৌষ, ১৩৬১।

সেভিংস্ ব্যাঙ্ক খোলা হয়। এই তিনটি ব্যাঙ্কের প্রত্যেকটিই ইচ্ছানুযায়ী নিয়মাদি তৈয়ারি করিল। সর্বত্র এক নিয়ম গড়িয়া উঠিল না।

প্রথমে সেভিংস্ ব্যাঙ্কের কাজ ডাকঘর করিত না। উহার কাজ চালাইত সরকারি ট্রেজারি। ১৮৬৩ এবং ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই শহরে এই সেভিংস্ ব্যাঙ্কের কাজ পড়িল প্রেসিডেন্সী ব্যাঙ্কের ঘাড়ে। কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই শহর বাদে অন্যান্য জেলা শহরে ও গবর্নমেণ্ট সেভিংস্ ব্যাঙ্ক খোলা হইয়াছিল ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দে। সেইসব স্থানে সরকারী ট্রেজারিকেই সেভিংস্ ব্যাঙ্কের কাজ চালাইতে হইত।

তখন সমস্ত ভারতবর্ষে সেভিংস্ ব্যাঙ্কের সংখ্যা ১৯৭টির বেশি হয় নাই।

যে উদ্দেশ্যে সেভিংস্ ব্যাঙ্কের সৃষ্টি, অর্থাৎ জনসাধারণকে সঞ্চয়ে সাহায্য করা—ইহাতে সেই উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সফল হইল না। হইবেই বা কি করিয়া? দেশ-বাসীর কয়জনই বা বাস করে জেলা কিংবা বড় শহরে? পল্লীপ্রাণ ভারতবর্ষে শতকরা ১৫ জনেরও কম বাস করে ছোট-বড় শহরে। সুতরাং পল্লীবাসী উপকৃত না হইলে সেভিংস্ ব্যাঙ্ক ভারতের জনগণের অতি অল্পসংখ্যক নর-নারীকেই সাহায্য করিতে পারে। আমাদের দেশে শহর এবং পল্লীরও অনেক স্থলে তখন ডাকঘর ছিল। সেভিংস্ ব্যাঙ্কের কাজটা যদি ডাকঘরে দেওয়া যায় তাহা হইলে জনগণের মধ্যে আরও বেশি লোকের সাহায্য হইতে পারে—গবর্নমেণ্টেরও সেই ধারণা হইল। ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে সর্বপ্রথম ভারতের ডাকঘরে সেভিংস্ ব্যাঙ্কের কাজ আসিয়া চাপিল। কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই শহরের ডাকঘরে ইহা খোলা হইল। প্রেসিডেন্সী ব্যাঙ্কের এবং জেলা-শহরের সেভিংস্ ব্যাঙ্ক যেমন ছিল তেমনি রহিল।

১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দের ১লা এপ্রিল তারিখে জেলা শহরের সেভিংস্ ব্যাঙ্ক বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। সেভিংস্ ব্যাঙ্কের হিসাব ও তহবিল ডাকঘরে হস্তান্তরিত করিয়া দেওয়া হইল। ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দের ১লা অক্টোবর তারিখে তিনটি

প্রেসিডেন্সী ব্যাঙ্কে যে গবর্নমেণ্ট সেভিংস্ ব্যাঙ্ক ছিল তাহাও বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল।

ডাকঘরে যখন প্রথম সেভিংস্ ব্যাঙ্ক খোলা হইল তখন চারি আনার কম জমা দেওয়া চলিত না। সুদের হার ছিল প্রতি পাঁচ টাকায় প্রতি মাসে তিন পাই।

ডাকঘরের হাতে সেভিংস্ ব্যাঙ্কের কাজ আসিবার পর হইতেই জনগণের সেবায় কার্য প্রকৃতপক্ষে শুরু হইল। প্রথম বৎসরের শেষেই দেখা গেল, সেভিংস্ ব্যাঙ্কের সংখ্যা হইয়াছে ৪,২৪৩টি, আমানতকারীর সংখ্যা ৩৯,১২১ জন, এবং সালকাবারে আমানত ছিল ২৭,৯৬,৭৯৬৲ টাকা। পঞ্চাশ বৎসর পরে (১৯৩২ খ্রীস্টাব্দে) আমানতকারীর সংখ্যা ছিল ২৪,০২,০০০ জন, এবং সালকাবারে আমানতী টাকা জমা ছিল ৩৮,২০,০০,০০০ টাকা।

ভারত স্বাধীন হয় ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই আগস্ট তারিখে। সেই বৎসরের ৩১শে মার্চ তারিখে আমানতকারীর সংখ্যা ছিল ৩৯,৭৩,০০০ জন; এবং সালকাবারে তহবিল মজুদ ছিল ১৪২,৩৫,০০,০০০ টাকা। ইহা ইংরেজ শাসনের ফল। স্বাধীন ভারতে এই কয় বৎসরেই (১৯৫২ পর্যন্ত) আমানতকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়াইয়াছে ৪৪,৪৫,০০০ জন; এবং বৎসরশেষে আমানতী টাকাও বাড়িয়াছে। উহার পরিমাণ হইয়াছে ১৯৯,৮১,০০,০০০ টাকা। প্রতি আমানত-কারীর হিসাবে কত টাকা ছিল তাহা কষিয়া দেখিলেও দেখিতে পাওয়া যাইবে, ইংরেজ আমলের চেয়ে স্বাধীন ভারতে অনেক উন্নতি হইয়াছে। ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে আমানতকারীর মাথাপিছু ছিল গড়ে ৩৫৮'৪ টাকা। ১৯৫২ খ্রীস্টাব্দে উহা হইয়াছে ৪৪৯'৪ টাকা। স্বাধীন ভারতের পক্ষে উহা প্রশংসনীয়।

রাষ্ট্র হিসাবে যদি বিশ্লেষণ করিয়া দেখি, তাহা হইলে দেখা যাইবে, বর্তমান সময়ে ডাকঘরের সেভিংস্ ব্যাঙ্কের হিসাব সবচেয়ে বেশি খোলা হইয়াছে মাদ্রাজে (৮,৬৪,৪৫৬), তাহার পরেই উত্তর প্রদেশে (৭,৬৫,৫৮১)। উত্তর প্রদেশের

নীচেই বোম্বাইয়ের স্থান (৭,৫৬,৫৭৩)। পশ্চিমবঙ্গ চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়াছে (৬,৯৫,৪৬৯)। পঞ্চম স্থান পঞ্জাবের (৪,৮০,৪৬৮)। তাহার পরেই বিহারের স্থান (২,৮২,৬৮১)। বিহারের নীচেই পর পর মধ্যপ্রদেশ (২,৭৪,৭০১), দিল্লী (১,৪৩,৯৭৮), আসাম (১,০৩,৬১৬), এবং উড়িষ্যা (৭৮,৪০৩)।

কিন্তু ডাকঘরের সেভিংস্ ব্যাঙ্কের প্রতি আমানতকারীর মাথাপিছু গড়ে কত টাকা ছিল সেই হিসাব রাষ্ট্রওয়ারি করিলে দাঁড়ায় নিম্নরূপ—

পঞ্জাব	৬৩৮·৭ টাকা
দিল্লী	৫৮৯·৪ „
বিহার	৫২৪·৮ „
পশ্চিমবঙ্গ	৫১০·৭ „
বোম্বাই	৪৯৮·৪ „
আসাম	৪৮৬·৮ „
উত্তর প্রদেশ	৪৫৪·০ „
মধ্যপ্রদেশ	৪১৫·৮ „
উড়িষ্যা	৩০৪·৫ „
মাদ্রাজ	২১৯·৪ „

ইহা ছাড়া যুদ্ধের সময় এক বিশেষ সেভিংস্ ব্যাঙ্ক খুলিতে দেওয়া হইয়াছিল। উহার নাম ডিফেন্স সেভিংস্ ব্যাঙ্ক। ১৯৫১-৫২ খ্রীস্টাব্দে উহাতেও মোট আমানতকারীর সংখ্যা ছিল ১৫,০৯,৮৫৫ জন। সালকাবারে আমানতী টাকা ছিল ১·২৬ কোটি টাকা। ১৯৪৬-এর ১লা জুলাই তারিখ হইতে ডিফেন্স সেভিংস্ ব্যাঙ্কের নূতন হিসাব খুলিতে দেওয়া হয় না; এবং ১৯৪৭-এর ১লা এপ্রিল হইতে ডাকঘরের হাতে এইরূপ হিসাবে যে আমানতী টাকা রহিয়াছে তজ্জন্য সুদও বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

ডাকঘরের সেভিংস ব্যাঙ্ক জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। সঙ্গেসঙ্গে এক-শ্রেণীর আমানতকারী জুটিয়াছে যাহাদের উদ্দেশ্য সঞ্চয় নহে; তাহারা ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার জন্যই ডাকঘরের সেভিংস ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখে। যে সকল ব্যাপারী পল্লী-অঞ্চলে মাল কিনিতে যায় তাহাদিগকে নগদ টাকা ট্যাকে লইয়া হোটেলে বা আড়তে দুশ্চিন্তায় রাত্রি কাটাইতে হয়। পল্লীতে ব্যাঙ্কের সুবিধা নাই। বাংলার গঞ্জে বা বন্দরে আছে আড়ত। টাকা গচ্ছিত রাখিতে হয় আড়তদারদের নিকট শুধু বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া। আমাদের দেশে আড়তকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য কোনো আইন হয় নাই। কাজেই নগদ টাকা সঙ্গে লইয়া পল্লী অঞ্চলে গিয়া মাল খরিদ করা ঝুঁকির কাজ। এই জন্য কেহ কেহ ডাকঘরে সেভিংস ব্যাঙ্কের সাহায্য লইয়াছে। ডাকঘরের নিয়মে আছে যে, একজন তাহার নিজের নামে একটি হিসাব এবং নাবালক পোষ্য বা আত্মীয়ের প্রত্যেকের নামে একটি করিয়া হিসাব খুলিতে পারে। কল্পিত নাবালকের নামে এক-একটি হিসাব এক এক গঞ্জে বা বন্দরে অথবা বিভিন্ন পল্লীতে তাহারা খুলিয়া থাকে, এবং তথায় প্রয়োজনমত ঐ সকল হিসাব হইতে টাকা তুলিয়া ব্যবসায়ের কাজ চালায়। দূর হইতে নগদ টাকা লইয়া আর যাইতে হয় না। এইরূপ অবস্থা অন্যান্য রাষ্ট্রেও আছে। এই শ্রেণীর আমানতকারী হিসাব খুলিয়া থাকে ডজনে ডজনে।

দেখা গিয়াছে, কোনো কোনো দালাল বিভিন্ন স্থানের ডাকঘরে ৮৩টি পর্যন্ত সেভিংস ব্যাঙ্কের হিসাব খুলিয়া প্রায় ত্রিশ হাজার টাকার কারবার চালাইয়াছে। এই শ্রেণীর আমানতকারীদিগকেও সাহায্য করিবার জন্য ইংলণ্ডে ডাকঘরের সেভিংস ব্যাঙ্কের নিয়ম পরিবর্তিত হইয়াছে। লণ্ডন ডাকঘরে টাকা তুলিবার দরখাস্ত দিয়া যে-কোনো পল্লী অঞ্চলের ডাকঘরে টাকা পাওয়া যায়। কাজেই মিথ্যার আশ্রয় লইবার কোনো প্রয়োজন হয় না। আমাদের দেশেও নানা কারণে ডাকঘরে সেভিংস ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার যুগোপযোগী

পরিবর্তনের সময় আসিয়াছে। ভারত আর ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দের অবস্থায় পড়িয়া নাই। ব্যাবিংটন্ স্মিথ কমিটিও বহু বৎসর পূর্বেই বলিয়াছিলেন যে, শাসন-কার্যের অসুবিধা সত্ত্বেও ভারত গবর্নমেণ্টের উচিত পরীক্ষা করিয়া দেখা—ডাকঘরের সেভিংস ব্যাঙ্কের টাকা জমা দেওয়া ও তুলিবার নিয়মের পরিবর্তন কতদূর সম্ভবপর; সঙ্গেসঙ্গে ডাকঘরের ব্যাঙ্কের সংখ্যা বাড়ানো যাইতে পারে কিনা তাহাও দেখা দরকার। কিন্তু তখনকার গবর্নমেণ্ট বিশেষ কিছু করেন নাই। স্বাধীন ভারতের সরকারের এই দিকে নজর পড়িয়াছে। তাঁহারা ডাকঘরের সেভিংস ব্যাঙ্কের বিধিনিষেধের পরিবর্তনের জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন। পল্লী অঞ্চলে ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠার কথা চিন্তা করিতে গিয়া বিশেষজ্ঞগণের সম্প্রতি দৃষ্টি পড়িয়াছে ডাকঘরের সেভিংস ব্যাঙ্কের উপর। উহাকে ভিত্তি করিয়া পল্লী-ব্যাঙ্কের প্রসার সম্ভব কিনা, সেই চিন্তাও জাগিয়াছে।

প্রশ্ন এই, ডাকঘরের সেভিংস ব্যাঙ্কের নিয়মাদি কি ভাবে পরিবর্তন করিলে সর্বশ্রেণীর দেশবাসীর সুবিধা হয়, এবং পল্লীবাসীদিগকেও ব্যাঙ্কের আওতায় আনা যায়? মোটামুটি নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করা যাইতে পারে।

১। ডাক-বিভাগের হাতে সেভিংস ব্যাঙ্কের দরুন যে পরিমাণ টাকা থাকে তাহার কতক অংশ স্বল্পস্থায়ী ঋণদানের কাজে খাটানো যায় কিনা সেই বিষয়ে বিবেচনা করা উচিত। এই অর্থ সুবিবেচনার সহিত খাটাইয়া ডাক বিভাগ যথেষ্ট সুদ পাইতে পারে। ইংলণ্ডে তাহা হয়। ইংরেজ আমলে এই অর্থ সাধারণ রাজস্ব তহবিলের অংশ বলিয়া দেখানো হইত; এবং কিছু পরিমাণ টাকা কাউন্সিল বিলের কল্যাণে ব্যয় হইত।[১]

২। সপ্তাহে একাধিক বার টাকা তুলিবার অধিকার দেওয়া উচিত।

৩। চেকের সাহায্যে টাকা জমা বা তুলিবার ক্ষমতা আমানতকারীকে দেওয়া দরকার। ইউরোপ ও আমেরিকায় ডাকঘরে এই ব্যবস্থা হইয়াছে।

---

১ যোশী এবং ওয়াদিয়া প্রণীত *Money Market in India*, পৃষ্ঠা ৩৫৫

ইংলণ্ডে চেক কোনো বিশেষ ব্যাঙ্কের উপর ক্রস্‌ড্‌ না হইলে ডাকঘরে গৃহীত হয় 'অ্যাকাউন্ট পেয়ী' চেকও ডাকঘরে গৃহীত হয় যদি উহা আমানতকারীর নিজের নামে কাটা হইয়া থাকে।

৪। ভারতের যে-কোনো ডাকঘরে অপরের নামীয় সেভিংস ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিবার অধিকার প্রদান প্রয়োজনীয়।

৫। বর্তমান নিয়ম অনুসারে যে ডাকঘরে হিসাব খোলা আছে, শুধু সেই ডাকঘরেই টাকা তুলিতে পারা যায়। এই নিয়মও সংশোধিত হওয়া উচিত। এক প্রদেশের অভ্যন্তরে, অন্তত এক কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অধীন সকল শাখাব্যাঙ্কে টাকা তুলিবার ব্যবস্থা হওয়া উচিত। ইংলণ্ডে একজন আমানতকারী যে-কোনো ডাকঘরে তাহার পাস-বহি দেখাইয়া দুই পাউণ্ড পর্যন্ত অর্থ তুলিতে পারে। যে ডাকঘর হইতে টাকা তুলিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল, তথায় যদি আমানতকারী উপস্থিত হইতে না পারে, তাহা হইলে ওয়ারেণ্ট কণ্ট্রোলারের নিকট ফেরত পাঠাইয়া অপর ডাকঘরেও টাকা তুলিবার ব্যবস্থা করা যায়। ভারতে এইরূপ ব্যবস্থা হইলে ব্যবসায়ীর সুবিধা হইবে। মিথ্যার আশ্রয় লইয়া বেআইনী সেভিংস ব্যাঙ্ক খোলাও বন্ধ হইবে।

৬। পাস-বহিতে জমা ও টাকা তুলিবার হিসাব স্থানীয় ভাষায় হওয়া উচিত। এই বিষয়ে এখনও আইন আছে; কিন্তু উহা প্রতিপালিত হয় না।

৭। 'হোম সেফ' প্রচলিত হওয়া উচিত। ইংলণ্ডের ডাকঘরে এই ব্যবস্থা আছে। ভারতে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া প্রভৃতি কোনো কোনো ব্যাঙ্কে ইহা প্রচলিত হইয়াছে।

৮। বেশি টাকার ইণ্ডিয়ান পোস্টাল অর্ডার প্রচলিত হইলে উহা দ্বারা হুণ্ডির বা চেকের কাজ চলিবে।

লোকের সহোদর ভাইয়ের উপর যে বিশ্বাস তাহার চেয়ে অধিক বিশ্বাস ডাকঘরের উপর। এখন, ডাকঘরের সেভিংস ব্যাঙ্কের নিয়মগুলির যুগোপযোগী

পরিবর্তন করিলেই পল্লী-ব্যাঙ্কের বনিয়াদস্থাপন করা যাইতে পারে। অবশ্য এই সঙ্গে ডাকঘরের আভ্যন্তরীণ কার্যের প্রথারও পরিবর্তন প্রয়োজন।

মিয়াদী আমানত

ডাকঘরে সেভিংস ব্যাঙ্কের প্রচলন হওয়ায় অল্পকালের জন্য সঞ্চয়ের অভ্যাস জনগণের হইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা কিছু বেশি সময়ের জন্য অর্থ সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারেন তাঁহাদিগকেও সাহায্য করিবার জন্য ব্যবস্থা ডাকঘরে আছে।

সেভিংস ব্যাঙ্কের আমানতকারীদিগের ইচ্ছানুযায়ী ডাকঘর তাঁহাদিগকে গবর্নমেণ্ট সিকিউরিটি ক্রয় করিয়া দিয়া থাকে। প্রথম যুদ্ধের সমসময় হইতেই প্রচলিত হইয়াছিল পাঁচ বৎসরের মিয়াদী ক্যাশসার্টিফিকেট। পাঁচ বৎসর টাকা জমাইয়া রাখিতে পারিলে বেশি সুদও পাওয়া যাইত। ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের ১৬ই জুন হইতে ইহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বর্তমান সময়ে প্রচলিত হইয়াছে ন্যাশন্যাল সেভিংস সার্টিফিকেট। ইহা ১২, ৭ এবং ৫ বৎসরের মিয়াদী। সেভিংস ব্যাঙ্কের চেয়ে ইহাতে সুদ বেশি।

১৯৫১-৫২ খ্রীস্টাব্দে জনগণ ন্যাশন্যাল সেভিংস সার্টিফিকেটে প্রায় ২৪.৬ কোটি টাকা আমানত করিয়াছিল। ডাকঘর ঐ বৎসরে গবর্নমেণ্ট সিকিউরিটি ক্রয় করিয়া দিয়াছিল প্রায় ৯½ লক্ষ টাকার।

এইসকল সার্টিফিকেটের এবং সিকিউরিটির সাহায্যে জনগণের মিয়াদী আমানতের অভ্যাসও গড়িয়া উঠিয়াছে।

অন্ধজনে দেহ আলো

ভারতে সর্বসাধারণের মধ্যে জ্ঞানপ্রসারে সাহায্যের জন্যই ডাকবিভাগ স্থির করিয়াছিল যে, বই ও সংবাদপত্র কম মাশুলে ডাকে প্রেরণ করা চলিবে।

অন্ধের তরফ হইতে দাবি হইল, ডাকঘর তো তাহাদিগেরও জ্ঞানলাভে সাহায্য করিতে পারে। দেশসেবাই যখন ডাকঘরের আদর্শ, তখন অন্ধজনের এই দাবিও উপেক্ষা করা চলিল না।

অন্ধের জন্য যে বই লিখিত হয় উহা সাধারণ পুস্তকের মত ছাপা হয় না। ভারী, পুরু কাগজে চাপ দিয়া অক্ষরগুলি উঁচু করিয়া তৈয়ারি করা হয়। অন্ধ ব্যক্তি বইয়ের পাতায় উঁচু অক্ষরের উপর হাত বুলাইয়া অনুভব করিয়া বই পড়ে। এই জন্য অন্ধের বই পত্রিকা ইত্যাদি আকারে বড় ও ওজনে বেশি হইয়া যায়।

এইসব বই ওজন হিসাবে ডাকে আনাইতে হইলে অনেক খরচ পড়ে। একেই তো আমাদের দেশে অন্ধদিগের শিক্ষালাভের জন্য আগ্রহ কম, এবং প্রতিষ্ঠানও অপ্রচুর, তাহার উপর যদি বইয়ের ব্যয়ই আর্থিক ক্ষমতার বাহিরে যায়, তাহা হইলে অন্ধদিগের বিদ্যালাভে বাধা পড়িবে। দেশের এতগুলি নরনারীর জীবনে অগ্রগতি ব্যাহত হইবে। তাই অন্ধের জ্ঞানলাভে সাহায্যের জন্য ডাকবিভাগ অন্ধের বই পত্রিকা ইত্যাদির মাশুলের হার বিশেষ করিয়া কমাইয়া দিয়াছে। ইহা যে কেবল আমাদের দেশে তাহা নহে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও এই ব্যবস্থা আছে।

ডাকঘরের জীবনবীমা

উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে জনসাধারণের জন্য যে কয়টি জীবনবীমা কোম্পানি ছিল ঐগুলি সবই ছিল ইংলণ্ডে অবস্থিত কোম্পানিসমূহের শাখা-প্রতিষ্ঠান। উহারা ভারতবাসীর জীবনবীমা গ্রহণ করিতে রাজি হইত না। তাহাদের ধারণা ছিল ভারতবাসীর মধ্যে মৃত্যু-সংখ্যার হার বেশি। ১৮৪০ খ্রীস্টাব্দ হইতেই ভারতবাসী বুঝিতে পারিল যে, নিজেদের কল্যাণের জন্য ভারতীয় জীবনবীমা কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করা ছাড়া উপায় নাই। ১৮৪২

খ্রীস্টাব্দে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক ডাক্তার উইলিয়ম ব্রুক্ ও সগনেসি (W. B. O. Shaughnessy) মত প্রকাশ করিলেন, "বীমার পক্ষে ভারত-প্রবাসী ইউরোপীয়ানের জীবনের চেয়ে দেশীয় লোকের জীবন অনেক ভালো।" তখন হইতে 'নিউ ওরিয়েণ্টাল লাইফ অ্যাস্যুরেন্স কোম্পানি' ভারতবাসীর জীবনবীমা গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিল। ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দেও কয়েকজন ভারতবাসী পুনরায় দেশী জীবনবীমা কোম্পানি প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু, সফল হইতে পারেন নাই। তাঁহার পর ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টায় 'হিন্দু ফ্যামিলি অ্যান্যুইটি ফাণ্ড' নামে প্রথম ভারতীয় জীবনবীমা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়।

১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দের ৬ই মার্চ তারিখের কলিকাতা গেজেটে ভারতবর্ষে 'স্টেট লাইফ ইন্সিওরেন্স সোসাইটি' (গবর্নমেণ্ট জীবনবীমার) প্রস্তাব সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। ঐ বৎসর ১লা মে তারিখ হইতে কাজ আরম্ভ হইবার কথা ছিল। কিন্তু, য়ুরোপীয়ান ও ভারতবর্ষের কয়েক শ্রেণীর লোকের বিরুদ্ধ-আন্দোলনের ফলে ঐ প্রস্তাব আর কার্যে পরিণত হয় নাই। ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে সরকারী জীবনবীমার প্রস্তাব পুনরায় উত্থাপিত হইয়াছিল। বহু আলোচনার পর ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দে ইহাও বন্ধ হইয়া যায়। অবশেষে ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারি সরকারি জীবনবীমার কাজ শুরু হয়। পরিচালনার দায়িত্ব আসিয়া পড়িল ডাক বিভাগের উপর। যিনি সর্বপ্রথম ডাকঘরে জীবনবীমা করিয়াছিলেন তিনি ছিলেন একজন বাঙালী। তাঁহার নাম নির্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ডাক-বিভাগে কাজ করিতেন। ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে তিনি ৪০০০৲ টাকার বীমা করিয়াছিলেন ; এবং ১৯২২ সালের অক্টোবরে তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ওয়ারিশগণ ৫,৩৪৬ টাকা পাইয়াছিলেন।

সেই সময়ে কেবলমাত্র ডাককর্মচারিগণই এই বীমার সুযোগ গ্রহণ করিতে পারিতেন। ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে টেলিগ্রাফ ডিপার্টমেণ্টের এবং

১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে ইণ্ডো-যুরোপীয়ান টেলিগ্রাফস-এর কর্মচারীদিগকেও ইহার সুযোগ গ্রহণ করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল। ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারি হইতে গবর্নমেণ্টের অন্যান্য বেসামরিক এবং সামরিক বিভাগের স্থায়ী কর্মচারিগণকে এই জীবনবীমা করিবার সুযোগ দেওয়া হয়। বর্তমান সময়ে অস্থায়ী সরকারী কর্মচারিদিগকেও এই বীমার সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের (যেমন মিউনিসিপ্যালিটি) কর্মচারী, গবর্নমেণ্টের সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুল-কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি বহুবিধ প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী এখন ডাক-বিভাগের জীবনবীমা করিতে পারেন।

১৮৮৪-৮৫ খ্রীস্টাব্দে মোট ডাক-কর্মচারীর ১.০৫% ভাগ মাত্র এই জীবন-বীমা করিয়াছিলেন।। ১৮৮৬-৮৭ খ্রীস্টাব্দে ১.৭৯% ডাক-কর্মী এই বীমার সুযোগ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৯৫১-৫২ খ্রীস্টাব্দে মোট ৮,৩৬৩ জন নরনারী ডাকঘরের বীমা করিয়াছেন। তন্মধ্যে ডাক-বিভাগের কর্মচারীর সংখ্যা ২,৪৭৮ জন, অন্যান্য অফিসের ও প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী ৫,০১৫ জন এবং সামরিক বিভাগের কর্মচারী ৮৭০ জন মাত্র।

ইংরেজ আমল অপেক্ষা স্বাধীন ভারতে ডাকঘরের বীমার সংখ্যা ও টাকার পরিমাণ দুইই অনেক বাড়িয়াছে। ১৯৫৩-৫৪ সালের পরিসংখ্যান হইতে দেখা যায় ডাকঘরের জীবনবীমার কাজ সবচেয়ে বেশি হইয়াছে মাদ্রাজে, তাহার পরেই পশ্চিম-বাংলায়। তাহার পর যথাক্রমে পূর্বপঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই দিল্লী, উত্তরপ্রদেশ, অন্ধ্র, বিহার, আসাম, উড়িষ্যা, রাজস্থান প্রভৃতি রাজ্যের স্থান। ডাকঘরের জীবনবীমায় আজীবন বীমাকারীর সংখ্যা অপেক্ষা মেয়াদী-বীমাকারীর সংখ্যা দ্বিগুণের বেশি। সর্বপ্রথমে চারি হাজার টাকার বেশি জীবনবীমা করা যাইত না। বর্তমান সময়ে বিশ হাজার টাকা পর্যন্ত বীমা করা যায়। অল্প বেতনের কর্মচারীদিগের সুবিধার জন্য একশত টাকার জীবন-বীমা করিবার ব্যবস্থাও হইয়াছে।

জীবনবীমার ক্ষেত্রে পৃথিবীর অন্যান্য প্রগতিশীল দেশের তুলনায় ভারতবর্ষ এখনও অনেক পশ্চাতে রহিয়াছে। ১৯৫৩ সালে গ্রেটবৃটেনে জনপ্রতি বীমার পরিমাণ ছিল ১৬০০৲ টাকা, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ৮০০০৲ টাকা, অষ্ট্রেলিয়ার প্রায় এক হাজার এবং কানাডায় প্রায় দেড় হাজার টাকা। আর ভারতবর্ষে মাথাপিছু পঁচিশ টাকা মাত্র।

সম্প্রতি ডাকঘরের জীবনবীমাকারীদিগকে ঋণ দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ১৯৫৩ সালে পনেরো লক্ষ তিরাশি হাজার টাকারও বেশি ঋণ দেওয়া হইয়াছে।

ডাকঘরের ঔষধ বিক্রয়

উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে ভারতের বহুস্থানে, বিশেষত পূর্বপ্রান্তে ভীষণ ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। ইহার ফলে মৃত্যুসংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গের, বিহারের, এবং বর্তমান উড়িষ্যার অনেক পল্লী প্রায় ধ্বংস হইয়া যাইতেছিল। ম্যালেরিয়ার প্রধান ঔষধ কুইনাইন। কিন্তু, উহা পল্লীঅঞ্চলে, এমনকি ছোট ছোট শহরেও পাওয়া যাইত না। ডাকঘর কুইনাইন বিক্রয় করিলে উহা সর্বত্র সকলেরই সহজপ্রাপ্য হইতে পারে। স্থির হইল, জনকল্যাণের জন্য ডাকঘর কুইনাইন বিক্রয় করিবে। ডাকঘরে একপয়সা মূল্যের কুইনাইনের পুরিয়া বিক্রয় শুরু হইল। সেই হইতেই বর্তমান সময় পর্যন্ত কুইনাইন, অথবা উহার বিকল্প ডাকঘর বিক্রয় করিয়া আসিতেছে।

হায়দ্রাবাদ, দিল্লী, ও বিহার রাষ্ট্রে ডাকঘর কুইনাইন বিক্রয় করে না। তজ্জন্য ঐসকল রাষ্ট্রে পৃথক ব্যবস্থা আছে।

১৯৫১-৫২ খ্রীস্টাব্দে এক লক্ষ চৌদ্দ হাজারের বেশি টাকার কুইনাইন ডাকঘরের সাহায্যে বিক্রয় হইয়াছে।

পূর্বেই বলিয়াছি ডাকঘরের মুখ্য কর্তব্য চিঠিবহন ও বিলি করা। ইহা

ছাড়া বর্তমান সময়ে ডাকঘর বিভিন্ন প্রকারের যত গৌণ কাজ করিয়া থাকে সেইগুলি সবই জনকল্যাণের জন্যই ডাকঘরের কর্তব্য তালিকাভুক্ত হইয়াছে। সেইজন্যই বর্তমান যুগের সমাজজীবনের অগ্রগতি ডাকঘরকে বাদ দিয়া সম্ভবপর নহে।

—

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

॥ ১৩৫০ বৈশাখ হইতে নিয়মিত প্রকাশিত হইতেছে ॥
প্রতি গ্রন্থ আট আনা

১। সাহিত্যের স্বরূপ ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। চতুর্থ মুদ্রণ
২। কুটিরশিল্প ॥ শ্রীরাজশেখর বসু। চতুর্থ মুদ্রণ
৩। ভারতের সংস্কৃতি ॥ শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী। চতুর্থ মুদ্রণ
*৪। বাংলার ব্রত ॥ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তৃতীয় মুদ্রণ
*৫। জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার ॥ শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য। তৃতীয় মুদ্রণ
৬। মায়াবাদ ॥ মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ। তৃতীয় মুদ্রণ
৭। ভারতের খনিজ ॥ শ্রীরাজশেখর বসু। তৃতীয় মুদ্রণ
*৮। বিশ্বের উপাদান ॥ শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য। তৃতীয় মুদ্রণ
৯। হিন্দু রসায়নী বিদ্যা ॥ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। দ্বিতীয় মুদ্রণ
*১০। নক্ষত্র-পরিচয় ॥ শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত। তৃতীয় মুদ্রণ
*১১। শারীরবৃত্ত ॥ ডক্টর রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল। তৃতীয় মুদ্রণ
১২। প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী ॥ ডক্টর সুকুমার সেন। দ্বিতীয় মুদ্রণ
*১৩। বিজ্ঞান ও বিশ্বজগৎ ॥ শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়। তৃতীয় মুদ্রণ
১৪। আয়ুর্বেদ-পরিচয় ॥ মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন। দ্বিতীয় মুদ্রণ
১৫। বঙ্গীয় নাট্যশালা ॥ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃতীয় মুদ্রণ
*১৬। রঞ্জনদ্রব্য ॥ ডক্টর দুঃখহরণ চক্রবর্তী। দ্বিতীয় মুদ্রণ
১৭। জমি ও চাষ ॥ ডক্টর সত্যপ্রসাদ রায়চৌধুরী। দ্বিতীয় মুদ্রণ
১৮। • যুদ্ধোত্তর বাংলার কৃষি ও শিল্প ॥ ডক্টর কুদরত-এ-খুদা। দ্বিতীয় মুদ্রণ
১৯। রায়তের কথা ॥ প্রমথ চৌধুরী। দ্বিতীয় মুদ্রণ
২০। জমির মালিক ॥ শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত
২১। বাংলার চাষী ॥ শ্রীশান্তিপ্রিয় বসু। দ্বিতীয় মুদ্রণ
২২। বাংলার রায়ত ও জমিদার ॥ ডক্টর শচীন সেন। দ্বিতীয় মুদ্রণ
২৩। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ॥ শ্রীঅনাথনাথ বসু। তৃতীয় মুদ্রণ
২৪। দর্শনের রূপ ও অভিব্যক্তি ॥ শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য। দ্বিতীয় মুদ্রণ

* সচিত্র

২৫। বেদান্ত-দর্শন ॥ ডক্টর রমা চৌধুরী। দ্বিতীয় মুদ্রণ
২৬। যোগ-পরিচয় ॥ ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার। দ্বিতীয় মুদ্রণ
২৭। রসায়নের ব্যবহার ॥ ডক্টর সর্বাণীসহায় গুহসরকার। দ্বিতীয় মুদ্রণ
*২৮। রমনের আবিষ্কার ॥ ডক্টর জগন্নাথ গুপ্ত। দ্বিতীয় মুদ্রণ
*২৯। ভারতের বনজ ॥ শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু। দ্বিতীয় মুদ্রণ
৩০। ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাস ॥ রমেশচন্দ্র দত্ত
৩১। ধনবিজ্ঞান ॥ শ্রীভবতোষ দত্ত। দ্বিতীয় মুদ্রণ
*৩২। শিল্পকথা ॥ শ্রীনন্দলাল বসু। দ্বিতীয় মুদ্রণ
৩৩। বাংলা সাময়িক সাহিত্য ॥ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৪। মেগাস্থেনীসের ভারত-বিবরণ ॥ শ্রীরজনীকান্ত গুহ
*৩৫। বেতার ॥ ডক্টর সতীশরঞ্জন খাস্তগীর। দ্বিতীয় মুদ্রণ
৩৬। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ॥ শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ
৩৭। হিন্দু সংগীত ॥ প্রমথ চৌধুরী ও শ্রীইন্দিরা দেবী
৩৮। প্রাচীন ভারতের সংগীত-চিন্তা ॥ শ্রীঅমিয়নাথ সান্যাল
৩৯। কীর্তন ॥ অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র
*৪০। বিশ্বের ইতিকথা ॥ শ্রীসুশোভন দত্ত
৪১। ভারতীয় সাধনার ঐক্য ॥ ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত। দ্বিতীয় মুদ্রণ
৪২। বাংলার সাধনা ॥ শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী। দ্বিতীয় মুদ্রণ
৪৩। বাঙালী হিন্দুর বর্ণভেদ ॥ ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়
৪৪। মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী ॥ ডক্টর সুকুমার সেন
৪৫। নব্যবিজ্ঞানে অনির্দেশ্যবাদ ॥ শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত
*৪৬। প্রাচীন ভারতের নাট্যকলা ॥ ডক্টর মনোমোহন ঘোষ
৪৭। সংস্কৃত সাহিত্যের কথা ॥ শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী
৪৮। অভিব্যক্তি ॥ শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর
*৪৯। হিন্দু জ্যোতির্বিদ্যা ॥ ডক্টর সুকুমাররঞ্জন দাশ
৫০। ন্যায়দর্শন ॥ শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য সপ্ততীর্থ শাস্ত্রী
৫১। আমাদের অদৃশ্য শত্রু ॥ ডক্টর ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৫২। গ্রীক দর্শন ॥ শ্রীশুভব্রত রায় চৌধুরী
৫৩। আধুনিক চীন ॥ থান য়ুন শান
৫৪। প্রাচীন বাংলার গৌরব ॥ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

* সচিত্র

*৫৫। নভোরশ্মি ॥ ডক্টর সুকুমারচন্দ্র সরকার
৫৬। আধুনিক য়ুরোপীয় দর্শন ॥ শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
*৫৭। ভারতের বনৌষধি ॥ ডক্টর অসীমা চট্টোপাধ্যায়
৫৮। উপনিষদ্ ॥ মহামহোপাধ্যায় শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী
৫৯। শিশুর মন ॥ ডক্টর সুখেনলাল ব্রহ্মচারী। দ্বিতীয় মুদ্রণ
৬০। প্রাচীন ভারতে উদ্ভিদ্‌বিদ্যা ॥ ডক্টর গিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার
৬১। ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ ॥ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
*৬২। ভারতশিল্পে মূর্তি ॥ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
*৬৩। বাংলার নদনদী ॥ ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়
৬৪। ভারতের অধ্যাত্মবাদ ॥ ডক্টর নলিনীকান্ত ব্রহ্ম
৬৫। টাকার বাজার ॥ শ্রীঅতুল সুর
৬৬। হিন্দু সংস্কৃতির স্বরূপ ॥ শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী
৬৭। শিক্ষাপ্রকল্প ॥ শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি
৬৮। ভারতের রাসায়নিক শিল্প ॥ ডক্টর হরগোপাল বিশ্বাস
*৬৯। দামোদর পরিকল্পনা ॥ ডক্টর চন্দ্রশেখর ঘোষ
৭০। সাহিত্য-মীমাংসা ॥ শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য
*৭১। দূরেক্ষণ ॥ শ্রীজিতেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
৭২। তেল আর ঘি ॥ ডক্টর রামগোপাল চট্টোপাধ্যায়
৭৩। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান ॥ প্রমথ চৌধুরী
৭৪। ভারতে হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনা ॥ শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী
৭৫। বিভক্ত ভারত ॥ শ্রীবিনয়েন্দ্রমোহন চৌধুরী
৭৬। বাংলার জনশিক্ষা ॥ শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল
*৭৭। সৌরজগৎ ॥ ডক্টর নিখিলরঞ্জন সেন
*৭৮। প্রাচীন বাংলার দৈনন্দিন জীবন ॥ ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়
৭৯। ভারত ও মধ্য এশিয়া ॥ ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী
৮০। ভারত ও ইন্দোচীন ॥ ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী
৮১। ভারত ও চীন ॥ ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী
৮২। বৈদিক দেবতা ॥ শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য
*৮৩। বঙ্গসাহিত্যে নারী ॥ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
*৮৪। সাময়িকপত্র সম্পাদনে বঙ্গনারী ॥ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

* সচিত্র

*৮৫। বাংলার স্ত্রীশিক্ষা ॥ শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল
৮৬। গণিতের রাজ্য ॥ ডক্টর গগনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়
*৮৭। রসাঞ্জন ॥ ডক্টর রামগোপাল চট্টোপাধ্যায়
৮৮। নাথপন্থ ॥ ডক্টর কল্যাণী মল্লিক
৮৯। সরল ন্যায় ॥ শ্রীঅমরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য
৯০। খাদ্য-বিশ্লেষণ ॥ ডক্টর বীরেশচন্দ্র গুহ ও শ্রীকালীচরণ সাহা
৯১। ওড়িয়া সাহিত্য ॥ শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন
৯২। অসমীয়া সাহিত্য ॥ শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
৯৩। জৈনধর্ম ॥ শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন
৯৪। ভাইটামিন ॥ ডক্টর রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল
৯৫। মনস্তত্ত্বের গোড়ার কথা ॥ শ্রীসমীরণ চট্টোপাধ্যায়
৯৬। বাংলার পালপার্বণ ॥ শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী
*৯৭। জাভা ও বলির নৃত্যগীত ॥ শ্রীশান্তিদেব ঘোষ
৯৮। বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য ॥ ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী
৯৯। ধম্মপদ-পরিচয় ॥ শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন
১০০। সমবায়নীতি ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১০১। ধনুর্বেদ ॥ শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি
*১০২। সিংহলের শিল্প ও সভ্যতা ॥ শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত
১০৩। তন্ত্রকথা ॥ শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী
১০৪। বাংলার উচ্চশিক্ষা ॥ শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল
*১০৫। কুইনিন ॥ ডক্টর রামগোপাল চট্টোপাধ্যায়
১০৬। গ্রন্থাগার ॥ শ্রীবিমলকুমার দত্ত
১০৭। বৈশেষিক দর্শন ॥ শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য সপ্ততীর্থ শাস্ত্রী
১০৮। সৌন্দর্যদর্শন ॥ শ্রীপ্রবাসজীবন চৌধুরী
১০৯। পোর্সিলেন ॥ শ্রীহীরেন্দ্রনাথ বসু
১১০। কয়লা ॥ শ্রীগৌরগোপাল সরকার
*১১১। পেট্রোলিয়ম ॥ শ্রীমৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ
১১২। জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গনারী ॥ শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল
১১৩। বাংলা লিরিকের গোড়ার কথা ॥ শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়
*১১৪। ডাকের কাহিনী ॥ শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়

* সচিত্র

পঞ্জিকা-সংস্কার

শ্রীক্ষেত্রমোহন বসু



বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা

প্রকাশ ১৩৬৩ ফাল্গুন

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ। সংখ্যা ১২৪

মূল্য টা. 0·50

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন

বিশ্বভারতী। ৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

মুদ্রক শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড। ৫ চিন্তামণি দাস লেন। কলিকাতা ৯

৬·১

সূচী

নিবেদন

মানবসভ্যতার যেমন ক্রমবিকাশ আছে মনুষ্যসৃষ্ট পঞ্জিকারও তেমনি ক্রমবিকাশ আছে। 'পঞ্জিকা-সংস্কার' অর্থে পুরানোকে একেবারে ছাঁটাই করা নয়, তার প্রাচীনত্বের গোঁড়ামি ঘুচিয়ে তাকে নবীনত্বের আলোকে নবকলেবর দান করা। বৈদিক কাল থেকে শুরু হয়ে যুগে যুগে কতই-না সংস্কার হয়ে গেছে! কোনো যুগেই সংস্কারের যবনিকা পড়ে নি, পড়বেও না, সংস্কার চলতে থাকবে যাবচ্চন্দ্রদিবাকর! দেশী বিদেশী সব জাতীয় পাঁজিরই সংস্কার আবশ্যক, এ কথা অস্বীকার্য। একদিকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (U.N.O.) বিশ্বপঞ্জীর পরিকল্পনায় ব্যস্ত, অন্যদিকে স্বাধীন ভারত এক সম্মিলিত নতুন ভারতীয় পঞ্জিকার পত্তনে বদ্ধপরিকর। 'সাহা-পঞ্জিকা-সংস্কার-কমিটি'র প্রচেষ্টায় অসম্ভব আজ সম্ভবে পরিণত হল।

আমাদের দেশে পঞ্জিকা-সংস্কার বিষয়ক ধারণা প্রথম উদ্ভূত হয় মহারাষ্ট্রে। লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক, শংকর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত, বেংকটেশ বাপুশাস্ত্রী কেতকর, যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি প্রভৃতি এই সংস্কারের পথিকৃৎ। বাংলার মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-প্রতিষ্ঠিত 'বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা' ইংরেজি ১৮৯০ সন থেকে প্রকাশিত হয়ে আসছে, তাতে দৃক্‌সিদ্ধান্ত মতে গণনা দেওয়া আছে। এতাবৎ এই পঞ্জিকা-সংস্কারের প্রচেষ্টা ব্যক্তিগত স্তরেই সীমাবদ্ধ ছিল, এখন দেশে স্বরাট্ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এই প্রচেষ্টা রাষ্ট্রিক স্তরে উন্নীত হয়ে সাফল্যমণ্ডিত হল।

পঞ্জিকা সংক্রান্ত কোনো ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ব কখনও ভাবি নি, যদিও জ্যোতির্বিজ্ঞানে বহু বছর অধ্যাপনায় নিযুক্ত আছি। এর একটু ইতিহাস আছে। আট বছর আগে স্বর্গত ডক্টর মেঘনাদ সাহা প্রথমে তাঁর ইংরেজিতে লেখা এক পঞ্জিকা-সংস্কার বিষয়ক সুদীর্ঘ সন্দর্ভ আমাকে

দিয়ে বাংলায় অনুবাদ করান। 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় দু কিস্তিতে তা ছাপা হয়েছিল। তার পর, হঠাৎ গত জুন মাসে আমাদের পশ্চিম-বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় আমাকে ডেকে বললেন, সাহা-পঞ্জিকা-সংস্কার-কমিটির প্রস্তাব কার্যকরী করা যায় কি না এবং এ বিষয়ে আমার অভিমত কি। প্রস্তাবের সপক্ষেই মত দিয়ে অবিলম্বে নবপঞ্জিকা চালু করতে বলেছিলুম; আর তাঁকে বলেছিলুম 'শকাব্দা'র উৎপত্তি সংক্রান্ত ইতিহাস কিছু গোলমেলে, এজন্য ঐ অব্দ বাতিল করে 'স্বরাজ-অব্দ' নাম দিয়ে এক অভিনব অব্দের সূচনা করতে। কমিটির সুপারিশে এরূপ কিছু ছিল না, এজন্য বোধ করি পরিবর্তন সম্ভব হয় নি। তার পর, ভারতীয় Science News Association -এর পক্ষ থেকে আমাকে SCIENCE AND CULTURE পত্রিকায় সাহা-স্মৃতি-সংখ্যায় একটা পঞ্জিকা-সংস্কার সম্বন্ধে লেখবার তাগিদ আসে। আমিও রাজী হই। উক্ত প্রবন্ধ পঞ্জিকা-সংস্কার বিষয়ে ডক্টর সাহার অবদানকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছিল। অতঃপর বিশ্বভারতী গ্রন্থন-বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় অনুরোধ করলেন ওঁদের 'বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহে'র জন্যে একখানা পুস্তিকা লিখে দিতে। তাই এই উপস্থিত প্রয়াস। অল্প সময়ের মধ্যে, অল্প কথায়, অল্প মালমসলা সম্বল করে কতদূর কৃতকার্য হলেম তার বিচার করবেন সুধীগণ।

পরিশেষে বক্তব্য, পঞ্জিকাসংস্কার-কমিটির কর্মসচিব ও আলিপুর আবহাওয়া-বিভাগের আবহাওয়া-তত্ত্ববিৎ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র লাহিড়ী এম. এ. মহাশয় নানারূপ আলোচনা দ্বারা সাহায্য করে আমায় কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করেছেন। অলমতিবিস্তরেণ—

কলিকাতা
৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫৭

শ্রীক্ষেত্রমোহন বসু

বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী
ভারতীয় পঞ্জিকা-সংস্কার-কমিটির সভাপতি
ডক্টর মেঘনাদ সাহার
স্মৃতির উদ্দেশে

অবতরণিকা

"কালোহ্যয়ং নিরবধি র্বিপুলা চ পৃথ্বী"—

কাল নিরবধি, পৃথিবী বিপুলা— একথা ভবভূতি বলিয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু ইহাতে 'দেশে'র জ্ঞান অপেক্ষা তাঁহার 'কালে'র জ্ঞান যে স্পষ্টতর ছিল তাহা বেশ বুঝা যায়। আজকাল কে না জানে পৃথিবীর বিপুলত্ব মহাকাশের তুলনায় বিন্দুবৎ! পৃথিবীকে 'বিপুলা' না বলিয়া তিনি যদি 'সচলা' বলিতেন তবে তাঁহার পূর্ববর্ত্তী আর্যভটের বৈজ্ঞানিক সত্যোপলব্ধি খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর সাহিত্যের নিরিখে যাচাই হইয়া গিয়াছে বুঝা যাইত। যাহা হউক, কালের আদি-অন্ত নাই, ইহার স্রোত অবিরাম বলিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না, কালকে মাপিতে হইবে। কবে থেকে মাপিতে হইবে? তাহার শুরু কোথায়? মাপিবার মানদণ্ড কি? কালের একক কি? অনন্তকে সান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে, তবে তো ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের পটভূমিকায় বিশ্বঘটনার পৌর্বাপর্য বুঝা যাইবে।

এইসব প্রশ্ন জাগে। প্রাচীন কাল হইতে মানুষের মনে ঐসব প্রশ্ন বোধ করি উদয় হইয়া থাকিবে এবং মানুষ এক এক প্রকার মাপকাঠির সাহায্যে কালের পরিমাপে অগ্রসর হয়। যেসব মাপকাঠির কথা তাহার মনে জাগিয়াছিল তাহাদের মধ্যে একই সত্যের ধারা পরিলক্ষিত হইয়া তাহাকে কয়েকটি সাধারণ সিদ্ধান্তে পৌছাইয়া দিয়াছিল এবং সেই সিদ্ধান্তগুলি প্রধানতঃ তিনটি প্রাকৃতিক কালচক্রকে লক্ষ্য করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল—

প্রথম: পৃথিবীর স্বীয় কক্ষের উপর আহ্নিক গতি,

দ্বিতীয়: পৃথিবীর বার্ষিক গতি,

তৃতীয়: চন্দ্রের কলার হ্রাসবৃদ্ধি এবং অমাবস্যা-পূর্ণিমার ক্রম।

পৃথিবীর আহ্নিক গতি হইতে দিবাভাগ ও রাত্রভাগ লইয়া 'দিনে'র ['অহোরাত্র'-স°] উৎপত্তি; পৃথিবীর বার্ষিক গতি হইতে সূর্যের আপাত বার্ষিক গতি ও তাহা হইতে 'ঋতুপর্যায় ও বর্ষমান'; এবং চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধি হইতে 'মাসে'র উৎপত্তি। এই তিনটি প্রাকৃতিক কালচক্রকে ভূমিক স্থির করিয়া যে পঞ্জিকার উদ্ভব হইয়াছিল তাহা বুঝা যায়।

সুসভ্য মানুষের নিত্যনৈমিত্তিক জীবনধারায় আজ পঞ্জিকার ব্যবহার অপরিহার্য হইয়াছে। কী অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন, কী সামাজিক জীবন ও লোকব্যবহার, কী ধর্ম ও আচার-অনুষ্ঠান, সর্বকর্মেই মানুষের পঞ্জিকা ছাড়া চলে না। যাঁহারা স্মৃতিশাস্ত্রের ব্যবহার পদে পদে মানিয়া চলিবেন তাঁহাদের তাগিদ আরও বেশি। এ ছাড়া ফলিত জ্যোতিষে আস্থাবান নরনারী ও তথাকথিত গণৎকার-জ্যেতিষীর কাছে পঞ্জিকা এক মহামূল্য নিধি।

প্রাচীন কালে, খ্রীষ্টজন্মের কয়েক হাজার বছর আগে, যখন মানবজাতি সুব্যবস্থিত জীবন শুরু করে, যথা ভারতের সিন্ধু-গাঙ্গেয় উপত্যকায়, মিশরের নীলনদবিধৌত অঞ্চলে, মেসোপটেমিয়ার টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর অববাহিকায় ও চীনের হোয়াঙ্-হোর তটভূমিতে, তখন উক্ত নৈসর্গিক ঘটনাগুলির ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পায়। কারণ, এই আদিম জীবন-সংস্থার ভিত্তি কৃষির উপর নির্ভর করিয়াছিল। কৃষি নির্ভর করে ঋতু-পর্যায়ের বিবিধ জলবায়ুর উপর। চাষের প্রথার সহিত গড়িয়া উঠে জাতীয় পর্ব, ধর্মানুষ্ঠান— যেগুলি সমাজবোধ ও সংস্কৃতির উন্নয়নে যথেষ্ট সাহায্য করে। মনুষ্য পূর্বাহ্ণেই জানিতে উৎসুক হইল, অমাবস্যা কবে, পূর্ণিমা কবে; কারণ প্রাচীন পর্বানুষ্ঠানগুলি ঐসব দিনেই অনুষ্ঠিত হইত। বর্ষা শুরু হইবার কতদিন বাকি, শীতের প্রকোপ কতদিন পরে পড়িবে, কখন বীজ বপন করিতে হইবে, কখন শস্য

কাটিতে হইবে— এইসব ঘটনাবলীকে সূত্রাকারে গাঁথিয়া বোধ হয় আদিম পঞ্জিকার একটা ঝাপ্সা রূপ গড়িয়া উঠে।

পৃথিবীর যতগুলি জাতি ততগুলি তাহার পঞ্জিকা। জাতি-ধর্ম-সম্প্রদায় -ভেদে পঞ্জিকার রূপ অসংখ্য। শুধু ভারতেই পাঁজির সংখ্যা কম-বেশি চল্লিশখানি— বাংলা, উৎকল, আসাম, তামিল, তেলেগু, মালয়ালম, মারাঠি, হিন্দী, গুজরাটি, সংস্কৃত প্রভৃতি নানা ভাষায় নানা ধরনের পাঁজি। এইসব পঞ্জিকার মধ্যে দেখা যায় যে, দেশাচার, ধর্মানুষ্ঠান প্রভৃতি পর্বের বিভিন্ন দিন ব্যতীত বৎসরের আরম্ভ, মাসগণনা, তিথিগণনা প্রভৃতি স্বতন্ত্র। দেয়ালপঞ্জী, টেবিলপঞ্জী এখন 'ক্যালেণ্ডার' বা পঞ্জিকার সংক্ষিপ্ত সংস্করণ হিসাবে গণ্য। উহাতে প্রতি মাসে ছুটির দিন, উৎসবের দিন, ধর্মানুষ্ঠানের দিন ও জাতীয় জীবনের গৌরবময় দিন প্রভৃতি নির্দিষ্ট থাকে। এজন্য সাধারণ কাজকর্মে ও বৈষয়িক ব্যাপারে (civil and administrative life) আমাদের অনেক সুবিধা হয়। কিন্তু ধর্ম, সামাজিক ও কয়েকটি গার্হস্থ্য অনুষ্ঠানে আরও বিস্তারিত পঞ্জিকার ['পঞ্চাঙ্গ'] প্রয়োজন হয় ; যথা— বিশুদ্ধসিদ্ধান্ত, গুপ্তপ্রেস, জগজ্জ্যোতি, পি. এম. বাগ্‌চী— [বাংলা], নির্ণয়সাগর পঞ্চাঙ্গ, গ্রহলাঘবীয় পঞ্চাঙ্গ, বৃহৎ মহারাষ্ট্রীয় পঞ্চাঙ্গ-[মারাঠি], কুম্ভকোণম্ মদথু পঞ্চাঙ্গ-[তামিল], পতুরি বরি পঞ্চাঙ্গম্-[তেলেগু], সন্দেশ প্রত্যক্ষ পঞ্চাঙ্গ-[গুজরাটি], জ্যোতির্দীপিকা-[মালয়ালম], শ্রীসপ্তর্ষি পঞ্চাঙ্গ-[হিন্দী], ভাগ্যবতী পঞ্চাঙ্গ-[মণিপুরী] ইত্যাদি। এইসব পঞ্চাঙ্গে তিথি, নক্ষত্র, গ্রহস্ফুট, করণ, যোগ, বিবাহ-লগ্ন, যোগিনী, দিক্‌শূল, ত্র্যহস্পর্শ, কালবেলা, বারবেলা, পূজাপার্বণ প্রভৃতি নানারূপ শুভাশুভ দিনগুলির উল্লেখ আছে। এই জাতীয় পঞ্জিকা বেশ জটিল। যাঁহারা ধর্মানুষ্ঠান, গার্হস্থ্য ক্রিয়াকলাপ, শুভাশুভ যাত্রাসময় ইত্যাদির ধার ধারেন না তাঁহাদের কাছে এই পঞ্জিকার কোনো মূল্য নাই। কিন্তু, এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে, পৃথিবীর কোনো

দেশেরই পঞ্জিকা শুধু বৈষয়িক ব্যাপারে সীমাবদ্ধ নয়। পঞ্জিকার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য জাতির ধর্ম ও সামাজিক জীবনকে (socio-religious life) নিয়ন্ত্রিত করা।

প্রাচীন ও মধ্য যুগে সমাজ রাষ্ট্র ও ধর্ম একত্র মিশ্রিত থাকায় একই পঞ্জিকার সাহায্যে মানবজীবন নিয়ন্ত্রিত হইত। বর্তমানের কালধর্ম হইল বৈষয়িক ও ধর্মজীবনকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করিয়া তোলা। আবার, বর্তমান দ্রুতগতির যুগে দেশসমূহের অন্তর্বর্তী ব্যবধান হ্রাস পাইয়াছে। বিভিন্ন মানবসমাজ, বিভিন্ন সম্প্রদায়-গোষ্ঠী পরস্পর নিরপেক্ষ নয়, এক জাতির সহিত অপর জাতির রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে; এজন্য প্রত্যেক জাতি যদি পৃথক্ পৃথক্ পঞ্জিকা অনুসরণ করিয়া চলে তবে পৃথিবীর সামগ্রিক উন্নতি নানাভাবে ব্যাহত হইবে সন্দেহ নাই। বৈষয়িক ব্যাপারের জন্য পৃথিবীর সর্বত্র আজ খ্রীষ্টীয় গ্রেগরী-পঞ্জী আদৃত হইয়াছে। এই পঞ্জিকা রচনার পদ্ধতি প্রথমে প্রবর্তিত হয় ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে পোপ ত্রয়োদশ গ্রেগরী কর্তৃক। এই পঞ্জী য়ুরোপ ও আমেরিকায় ব্যবহৃত হয় বৈষয়িক ও ধর্ম সম্পর্কিত প্রয়োজনে; কিন্তু য়ুরোপের অধীনস্থ অন্যান্য দেশে ব্যবহৃত হয় একমাত্র বৈষয়িক তথা অর্থনৈতিক (civil) প্রয়োজনে। আপন আপন ধর্মানুষ্ঠানে হিন্দু, মুসলমান ও বৌদ্ধগণ স্ব স্ব সাম্প্রদায়িক ও আঞ্চলিক পঞ্জিকা অনুসরণ করে, এবং তাহাদের নিজ নিজ সাম্প্রদায়িক পঞ্জিকার মধ্যেও নানা পার্থক্য আছে। এই সব অসুবিধা দূর করিবার জন্য অধুনা 'সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ' (U.N.O.) একটি বিশ্বপঞ্জীর পরিকল্পনা করিতেছে; এবং, আমাদের এই ভারতেও গত 'সাহা-পঞ্জিকা-সংস্কার-কমিটি' (১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত) যে একটি সম্মিলিত ভারতীয় পঞ্জিকার পরিকল্পনা করে তাহার ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে মার্চ হইতে [১৮৭৯ নব-শকাব্দের ১লা চৈত্র] উদ্বোধন হইবে।

বিশ্বপঞ্জীর পরিকল্পনা

গ্রেগরী-পঞ্জীতে বহু ত্রুটি এবং রচয়িতার খামখেয়ালির নিদর্শন বর্তমান। ইহাতে মাসগুলির সংখ্যা সমান নয়। 'Thirty days hath September' ইত্যাদি প্রচলিত ইংরাজী ছড়াটি আমরা বাল্যকাল হইতে শুভঙ্করীর আর্যার ন্যায় কণ্ঠস্থ করিয়া আসিতেছি, কারণ ইহাতে প্রতি মাসের দিন সংখ্যা নির্দিষ্ট আছে, যথা—

তিরিশ দিনেতে হয় মাস সেপ্টেম্বর
সেরূপ এপ্রিল, জুন আর নভেম্বর ;
আটাশ দিনেতে সবে ফেব্রুয়ারী ধরে,
বাড়ে তার একদিন তিন বর্ষ পরে ;
অবশিষ্ট মাস সব একত্রিশ দিনে,
হিসাব রাখিবে শিশু সদা মনে মনে।

মাসের দিন-সংখ্যা অসমান হওয়ায় অসুবিধা প্রচুর। কিন্তু, কেন এই খেয়াল ? কেনই বা ফেব্রুয়ারী মাস ২৮ দিনে এবং বাকি মাস ৩০ বা ৩১ দিনে ? ইহার কি কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে ?

ধর্মোৎসবের ছুটির তারিখ বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া পরিবর্তিত আকারে ঘুরিতেছে। খ্রীষ্টাব্দের বিখ্যাত ঈষ্টার পর্ব ২২শে মার্চ হইতে ২৫শে এপ্রিল পর্যন্ত ৩৫ দিনের যে-কোনো দিনে পড়িতে পারে।* পুনশ্চ, এই রবিবারের দুই দিন পূর্ববর্তী শুক্রবারে যীশু মানবজাতির কল্যাণার্থ

---

* ঈষ্টার-পর্ব বাহির করিবার নিয়ম : সম্রাট Constantineএর সময়ে নাইসের সভা (Council of Nice) এই ঈষ্টারের রবিবার (Lord's Day) বাহির করিবার নিয়ম স্থির করেন (৩২৫ খ্রীষ্টাব্দ)। মহাবিষুবের ঠিক পরবর্তী সময়ে যে দিন চন্দ্রের বয়স ১৪ হইবে (শুক্লাচতুর্দশী) তাহার অব্যবহিত পরের রবিবার হইবে ঈষ্টার। প্রকৃতপক্ষে, কয়েকটি বিশিষ্ট তালিকার সাহায্যে ইহা নির্ণয় করিতে হয়।

ক্রুশে বিদ্ধ হইয়াছিলেন, এজন্য ইহাকে 'গুডফ্রাইডে' বলা হয়। গুডফ্রাইডে হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্তী সোমবার পর্যন্ত চারিদিনকে 'ঈষ্টার'-পর্ব বলে। এই মুখ্য ঈষ্টার হইতে গণনা করিয়া অপরাপর খ্রীষ্টীয় গৌণ ধর্মানুষ্ঠানের দিন নির্ণীত হয়। যথা—

ঈষ্টার (যীশুর পুনরুত্থান দিবস : রবিবার)

গুডফ্রাইডে (– ২)	[Good Friday]
পাম-সন্‌ডে (– ৭)	[Palm Sunday]
কোয়াড্রাজেসিমা-সন্‌ডে (– ৪২)	[Quadragesima Sunday]
সেপ্‌টুয়াজেসিমা-সন্‌ডে (– ৬৩)	[Septuagesima Sunday
অ্যাশ্‌-ওয়েড্‌নেসডে (– ৪৬)	[Ash Wednesday]
কুইন্‌কোয়াজেসিমা (– ৪৯)	[Quinquagesima]
লো-সন্‌ডে (+৭)	[Low Sunday]
রোগেশন্‌-সন্‌ডে (+৩৫)	[Rogation Sunday]
অ্যাসেন্সন্‌-দিবস (+৩৯)	[Ascension Day]
হুইট্‌-সন্‌ডে (+৪৯)	[Whit Sunday]
ট্রিনিটি-সন্‌ডে (+৫৬)	[Trinity Sunday]
কর্পাস-ক্রিষ্টি (+৬০)	[Corpus Christi]

দ্রষ্টব্য : উক্ত তালিকায় বন্ধনীর অন্তর্গত বিয়োগচিহ্ন (–) সূচিত করিতেছে ঈষ্টারের পূর্বে ও যোগচিহ্ন (+) ঈষ্টারের পরে। যথা "গুড-ফ্রাইডে (–২)" অর্থে যীশুর ক্রুশে বিদ্ধ হওয়ার দিনটি ঈষ্টার পর্বের ২ দিন পূর্বে, এবং "অ্যাসেন্সন্‌ (+৩৯)" পর্ব উক্ত ঈষ্টারের ৩৯ দিন পরে অনুষ্ঠিত হয়।

বৎসরের এই ঈষ্টারের তারিখটা যাহাতে অনায়াসে নির্ণীত হইতে পারে তাহার একটা সহজ সংকেত বিখ্যাত গণিতবিশারদ গাউস (Gauss) বাহির করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু তিনি কৃতকার্য হন নাই।

যাহা হউক, ফলে এই দাঁড়াইয়াছে যে সারা বছর ব্যাপিয়া সমস্ত খ্রীষ্টীয় পর্বতারিখ পরিবর্তিত হইতেছে। এই ধরনের তারিখ-পরিক্রমায় সাধারণের অসুবিধা ঘটিয়াছে। যীশুর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার সময় কোনো "বারে"র প্রচলন হয় নাই, সম্রাট Constantineএর সময় তাহা হইয়াছে, এজন্য "রবিবার" সম্বন্ধে উল্লেখ আমরা তাঁহার সময়ে পাইতেছি।

সুশিক্ষিত খ্রীষ্টান জাতিগুলি অন্যান্য জাতিদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলিয়া দোষারোপ করে, কিন্তু তাহাদের ধর্মানুষ্ঠানের পর্ব নির্ধারণ-কার্যে ত্রি-দেবতার পরিতুষ্টি সাধন করিতে হয়,— সূর্য (মহাবিষুব), চন্দ্র (পূর্ণিমা) এবং ব্যাবিলোনীয় সপ্তগ্রহ সংবলিত দেবতাগোষ্ঠী (সপ্তাহ); কিন্তু হিন্দুরা ধর্মকার্যে মাত্র চন্দ্রসূর্যরূপ যুগল দেবতাকে সন্তুষ্ট করে। কাজেই, খ্রীষ্টানরা যে ভিন্নধর্মীদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলে তাহা একেবারে অযৌক্তিক।

আবার, সারা বৎসর ধরিয়া সপ্তাহের সাতটি বারের এক পৌনঃপুনিক আবর্তন চলিতে থাকায় কোন বিশিষ্ট বারে কোন বিশেষ অব্দ বা কোন বিশেষ মাস শুরু হইবে প্রথম হইতে ধরিবার উপায় নাই, দস্তুরমত অঙ্ক কষিয়া বাহির করিতে হয়। বর্ষারম্ভের বারের কথাই ধরা যাক। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দ আরম্ভ হইয়াছে মঙ্গলবারে। তাহা হইলে—

১৯৫৮ আরম্ভ হইবে বুধবারে
১৯৫৯ বৃহস্পতিবারে
১৯৬০ শুক্রবারে : অধিবর্ষ (leap year)
১৯৬১ রবিবারে
১৯৬২ সোমবারে
১৯৬৩ মঙ্গলবারে
১৯৬৪ বুধবারে : অধিবর্ষ
১৯৬৫ শুক্রবারে, ইত্যাদি।

বৈষয়িক ও অর্থ নৈতিক জীবনে যদি (দৃষ্টান্তস্থলে) প্রতি ১লা জানুয়ারী

রবিবারে ফেলা যায় তবে সুবিধা হয় না কি? এই সব অসুবিধা দূর করিবার জন্য অধুনা 'সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ' এইরূপ একটি বিশ্বপঞ্জীর (World Calendar) পরিকল্পনা করিতেছেন।

পূর্বে বলিয়াছি যে, ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দ রবিবারে শুরু হইবে। তাহা হইলে ঐ বছরের শেষদিন ৩১শে ডিসেম্বরও রবিবার। ঐ শেষোক্ত দিনটিকে যদি রবিবার না বলিয়া "বর্ষশেষ দিন" বলি, তাহা হইলে পরবর্তী খ্রীষ্টাব্দ ১৯৬২ পুনরায় রবিবারেই শুরু হয়, কেবল অধিবর্ষ ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দের জন্য যে অতিরিক্ত দিন হইবে তাহার ব্যবস্থা একটু ভিন্ন প্রকার করিতে হইবে। অধিবর্ষের অতিরিক্ত দিনটিকে যদি পূর্বের ন্যায় কোনো "বার" সংজ্ঞা না দিয়া জুন মাসের শেষে জুড়িয়া দেওয়া যায়, তবে ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারীও রবিবারে পড়িবে। এইরূপ ব্যবস্থায় যে বিশ্বপঞ্জী উদ্ভূত হইবে তাহা সর্বপ্রকার জটিলতা বর্জিত হইবে। এই বিশ্বপঞ্জীর পরিকল্পনায় বৎসরকে চারিটি পাদে বিভক্ত করা হইয়াছে— প্রত্যেক পাদের তিনটি মাসের দিন-সংখ্যা যথাক্রমে ৩১, ৩০, ৩০ ; একুনে, এক-একটি পাদে ৯১টি দিন। তাহা হইলে, জানুয়ারী, এপ্রিল, জুলাই ও অক্টোবর প্রত্যেকে ৩১ দিনে এবং প্রতি মাসের আরম্ভ রবিবারে। ফেব্রুয়ারী, মে, আগস্ট ও নভেম্বর প্রত্যেকে ৩০ দিনে এবং প্রতি মাসের আরম্ভ বুধবারে। মার্চ, জুন, সেপ্টেম্বর ও ডিসেম্বর প্রত্যেকে ৩০শ দিনে এবং প্রতি মাসের আরম্ভ শুক্রবারে। পরিকল্পিত বিশ্বপঞ্জীর গঠনপদ্ধতি নিম্নে বিশদ রূপে বুঝানো গেল—

১ম বর্ষপাদ

জানুয়ারী

র	সো	ম	বু	বৃ	শু	শ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১
২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮
২৯	৩০	৩১				

ফেব্রুয়ারী

র	সো	ম	বু	বৃ	শু	শ
			১	২	৩	৪
৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫
২৬	২৭	২৮	২৯	৩০		

মার্চ

র	সো	ম	বু	বৃ	শু	শ
					১	২
৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩
২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০

২য় বর্ষপাদ

এপ্রিল

র	সো	ম	বু	বৃ	শু	শ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১
২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮
২০	৩০	৩১				

মে

র	সো	ম	বু	বৃ	শু	শ
			১	২	৩	৪
৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫
২৬	২৭	২৮	২৯	৩০		

জুন

র	সো	ম	বু	বৃ	শু	শ
					১	২
৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩
২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০ M

৩য় বর্ষপাদ

জুলাই

র	সো	ম	বু	বৃ	শু	শ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১
২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮
২৯	৩০	৩১				

আগস্ট

র	সো	ম	বু	বৃ	শু	শ
			১	২	৩	৪
৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫
২৬	২৭	২৮	২৯	৩০		

সেপ্টেম্বর

র	সো	ম	বু	বৃ	শু	শ
					১	২
৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩
২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০

৪র্থ বর্ষপাদ

অক্টোবর

র	সো	ম	বু	বৃ	শু	শ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১
২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮
২৯	৩০	৩১				

নভেম্বর

র	সো	ম	বু	বৃ	শু	শ
			১	২	৩	৪
৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫
২৬	২৭	২৮	২৯	৩০		

ডিসেম্বর

র	সো	ম	বু	বৃ	শু	শ
					১	২
৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩
২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০ W

W সূচিত করিতেছে বর্ষশেষ দিন (৩১শে ডিসেম্বর—৩৬৫তম দিবস)—উহা প্রতি বর্ষের ৩০শে ডিসেম্বরের পরে থাকিবে।

M সূচিত করিতেছে বর্ষমধ্য দিন—ইহা অধিবর্ষে প্রযুক্ত হইবে এবং সেই বৎসরের ৩০শে জুনের পরে বসিবে।

এই বিশ্বপঞ্জীর বিশেষত্ব এইগুলি—

১. প্রতি বৎসরের রূপ একই প্রকার।

২. বৎসরের প্রতি পাদ একই প্রকার, প্রত্যেক পাদে ৯১ দিন বা ১৩ সপ্তাহ বা ৩ মাস; বৎসরের চারিটি পাদেরই একপ্রকার রূপ।

৩. প্রতি মাসে ২৬টি করিয়া "কর্মদিবস" (weekdays); প্রতি পাদের প্রথম মাসে ৫টি রবিবার (১লা, ৮ই, ১৫ই, ২২শে ও ২৯শে) এবং অন্যান্য মাসে ৪টি রবিবার (৫ই, ১২ই, ১৯শে, ২৬শে, অথবা, ৩রা, ১০ই, ১৭ই, ২৪শে)।

৪. প্রতি বৎসরেব প্রারম্ভ ১লা জানুয়ারী রবিবারে।

৫. এই পঞ্জিকা সনাতন ও ধ্রুব। প্রতি বৎসরের শেষে (বারবিহীন) একটি বর্ষশেষ দিন, সেটি ছুটির দিন হইবে; এবং অধিবর্ষ হইলে আর-একটি জুনের শেষে ছুটির দিন হইবে। প্রথমটিকে ৩১শে ডিসেম্বর বলিতে পারি, এবং দ্বিতীয়টিকে ৩১শে জুন বলিতে পারি।

এই বিশ্বপঞ্জী প্রচলিত হইলে বিভিন্ন জাতির যে নিজস্ব পঞ্জিকা আছে তাহার কোনো অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই। জাতীয় পঞ্জিকাগুলি এই বিশ্বপঞ্জীর পাশাপাশি থাকিতে পারে, অবশ্য যদি সপ্তাহচক্রের অবিরামগতি বজায় রাখিতে হয় তবে তাহাদের পর্বদিনগুলি এই বিশ্বপঞ্জীর বারের দিনগুলির সহিত ঘুরিতে থাকিবে এবং কতিপয় গোঁড়া লোকের অসুবিধা ঘটাইবে। ইহুদী জাতি এই বিশ্বপঞ্জীর প্রচলনে আপত্তি তুলিয়াছে, কারণ উক্ত 'বর্ষশেষ দিন' ও 'বর্ষমধ্য দিন' দুইটিতে কোনো বারের ছাপ পড়িতেছে না, এবং তাহাতে তাহাদের ধর্মজীবনে হস্তক্ষেপ করা হইতেছে। এ সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে—

"কতিপয় ইহুদী ধর্মতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত দাবী করিয়া থাকেন যে সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে সর্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর কর্তৃক এই সপ্তাহচক্রের নিয়ম প্রচলিত হইয়াছে, এবং কোনো এক অমাবস্যায় জলবিষুবের দিনে এই

সৃষ্টি শুরু হইয়াছে— ইহা মধ্যযুগীয় পণ্ডিতদের উদ্ভট কল্পনা মাত্র, বর্তমান ডারুইন ও আইনস্তাইনের যুগে কোনো সুস্থ মস্তিষ্কের লোক এরূপ ধারণা পোষণ করিতে পারে না।"*

এইরূপ উক্তিতে দেখা যাইতেছে যে, সৃষ্টির আদিতেও চন্দ্র-সূর্য বর্তমান রহিয়াছে !

ইহুদী জাতির এই আপত্তির বিরুদ্ধে ডক্টর মেঘনাদ সাহা গত ১৯৫৪ সালের জুন মাসে জেনেভায় যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ECOSOC [Economic and Social Council of the United Nations] অনুষ্ঠান হইয়াছিল তাহাতে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন এই বলিয়া যে, সপ্তাহচক্র বৎসরের ন্যায় কোনো নৈসর্গিক চক্র নয়, বৎসরের সঙ্গে সূর্যের যোগ আছে সপ্তাহের সঙ্গে কিছু নাই, ইহা মনুষ্যসৃষ্ট এবং প্রথামূলক (conventional)। এমন কি পোপ ত্রয়োদশ গ্রেগরী পর্যন্ত বিজ্ঞানকে প্রণতি জানাইয়া ঋতুর সহিত সংগতি রক্ষার্থে তারিখ পরিবর্তন করিয়াছিলেন, যথা ৫ই অক্টোবর শুক্রবারকে ১৫ই অক্টোবর "শুক্রবার" করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, এমন কি, মাসের ন্যায় নৈসর্গিক চক্রও ইহা নয়, যদিও এই মাসের চক্রটি কিছু গোলমেলে ; কাল-পরিমাপক হিসাবে চন্দ্রকে তো মিশরীয় পণ্ডিতগণ ছাঁটাই করিয়া দিয়াছিলেন। হিপ্পার্কস, টলেমী হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্যন্ত কেহই বৈষয়িক ও অর্থনৈতিক ব্যাপারের জন্য 'চান্দ্রমাস' গ্রহণ করিতে রাজী নয়, এমন কি ধর্মসম্বন্ধীয় ব্যাপারে হিন্দু ও আরবীয় জাতির ন্যায় ইহুদী জাতি চন্দ্রকে প্রাধান্য দিলেও বৈষয়িক ব্যাপারে কদাপি দেয় নাই।

---

* "The claims of certain Jewish Rabbis to prove that the seven-day week cycle has been ordained by God Almighty from the moment of creation which event, according to these Jewish Rabbis, took place on the day of the autumnal equinox, also a new-moon day, is a fantastic conception of medieval scholars, which no sane man can entertain in these days of Darwin and Einstein."—Report of the Calendar Reform Committee, p. 173.

সপ্তাহচক্র

পূর্বেই বলিয়াছি 'সপ্তাহ', বৎসর ও মাসের ন্যায় প্রাকৃতিক কালবিভাগ নয়, উহা কৃত্রিম ও প্রথামূলক এবং ইহার সহিত প্রাকৃতিক ঘটনার কোনো যোগসূত্র নাই। কিছুদিন একটানা কাজ করিবার পর মানুষের স্বাভাবিক একটা অবসাদ আসে। সেইজন্যই বোধ করি একটি বিশ্রামের দিনের মনোবৈজ্ঞানিক প্রয়োজন আছে। এই নিমিত্ত সপ্তাহের সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। আদিতে পক্ষার্ধ কালকে সপ্তাহ বলা হইত। কিন্তু চন্দ্রের ভ্রমণগতি অনেকটা অনিয়মিত হওয়ায় পক্ষার্ধ কালটি ধ্রুব থাকিতে পারে না, এজন্য একটি স্থির-সংখ্যার প্রয়োজন হয়তো হইয়াছিল। বৈদিক যুগের আর্যদের 'ষড়াহ' ছিল, অর্থাৎ ছয় দিনের কালচক্র। সাতদিনের চক্র উদ্ভূত হয় প্রাচীন ব্যাবিলোনীয় সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে। প্রাচীন মিশরীয়গণ দশদিনের চক্র পালন করিত। প্রাচীন ইরানীরা মাসের প্রত্যেক দিনটির নামকরণ করিয়া সাত দিন অন্তর এক-একটি দিন ধার্য করিত 'দিন-ই-পর্ব' অর্থাৎ ধর্মকার্যের জন্য। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী হইতে ক্যাল্‌ডিয়া বা গ্রীস্‌ হইতে এই সপ্তাহচক্র উদ্ভূত হইয়া থাকিবে এবং সেই সময় হইতে উহা প্রথামত পঞ্জিকার গঠনে প্রবেশাধিকার পাইয়া থাকিবে। শনি, বৃহস্পতি, মঙ্গল, শুক্র, বুধ এই পাঁচটি গ্রহ এবং চন্দ্র সূর্যের (গ্রহ নয়) নাম লইয়া সপ্তাহচক্র উদ্ভূত হয়। ব্যাবিলোনীয় দেবতা-গোষ্ঠীর নামে সপ্তাহের বারের নামকরণ হইয়াছে। যথা

১. মহামারী ও বিপদের দেবতা 'নিনিবে'র নামে গ্রহ ও বারের নাম 'শনি' ;

২. দেবতাদের রাজা 'মার্দুকে'র নামে গ্রহ ও বারের নাম 'বৃহস্পতি' ;

৩. যুদ্ধবিগ্রহের দেবতা 'নার্গলে'র নামে গ্রহ ও বারের নাম 'মঙ্গল' ;

৪. ন্যায় ও বিচারের দেবতা 'শামশে'র নামে গ্রহ (?) ও বারের নাম 'রবি' ;

৫. প্রেমের দেবতা 'ঈষ্টারে'র নামে গ্রহ ও বারের নাম 'শুক্র' ;

৬. বিদ্যা ও জ্ঞানের দেবতা 'নাবু'র নামে গ্রহ ও বারের নাম 'বুধ', ; এবং

৭. কৃষির দেবতা 'সিন্'-এর নামে গ্রহ (?) ও বারের নাম 'সোম'।

এই সাত দিনের সপ্তাহচক্র সম্বন্ধে প্রাচীন গ্রীক, রোমক ও প্রাথমিক খ্রীষ্টানগণের কোনো জ্ঞান ছিল না। ব্যাবিলোনীয়গণের শনিবার ছিল অমঙ্গলবার, উহা মড়কের অধিরাজকে উৎসর্গীকৃত, এজন্য ঐ দেবতার রোষভয়ে ভীত হইয়া তাহারা ঐদিন কাজকর্ম বন্ধ রাখিত। সাত দিনের সপ্তাহ গণনায় প্রধান প্রচারক ছিল ইহুদী জাতি। উহারা অংশতঃ মিশর এবং বহুলাংশে ব্যাবিলন ও অ্যাসিরিয়া হইতে সভ্যতা অর্জন করিয়াছিল, এবং ব্যাবিলোনীয় সপ্তাহচক্রটি গ্রহণ করিয়া উহাতে শুচিতার একটা প্রলেপ মাখাইয়া দিয়াছিল— বাইবেলের ১ম অধ্যায়ে বর্ণিত সৃষ্টিরহস্যের উপাখ্যানটির সৃষ্টি করিয়া। ব্যাবিলোনীয়দের নিকট যে দিনটি ছিল 'অশুভ' ইহুদীরা তাহাকে বলিল 'বিশ্রাম দিন' (Sabbath day), অর্থাৎ তাহাদের মতে ঐ দিনটিই জগৎসৃষ্টির সপ্তম দিন— যে দিন সৃষ্টিকর্তা জেহোভা বিশ্রাম লইয়াছিলেন। এই 'স্যাব্যাথ' দিনটিতে এত বেশি পরিমাণে পবিত্রতা আরোপিত হইয়াছে যে, পৃথিবীর যাবতীয় ইহুদী ঐ দিনে কাজকর্ম করে না। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, রোমকগণ এই ব্যাপারটার সুযোগ লইয়া স্যাব্যাথ দিনে ইহুদীদের রাজধানী জেরুজেলেম আক্রমণ করে এবং বিনা যুদ্ধে নগরী দখল করে। ঐতিহাসিক প্রমাণে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, রোমসম্রাট কন্সট্যান্টাইন (Constantine) ৩২৩ খ্রীষ্টাব্দে রোমক সাম্রাজ্যে, তথা খ্রীষ্টীয় জগতে, সাত দিনের সপ্তাহ প্রবর্তন করেন। ভারতেও এই সময়ে বোধ হয় সেই একই উৎস হইতে

এই সপ্তাহচক্র ও বারের নাম প্রচারিত হইয়া পড়ে। হিন্দুদের বেদে, মহাভারতে বা অন্য কোনো পুরাণাদি প্রাচীন গ্রন্থে সপ্তাহচক্র ও বারের নাম ছিল না। ৪৮৪ খ্রীষ্টাব্দে (=গুপ্তাব্দ ১৬৫) সম্রাট বুধগুপ্তের ইরানীয় শিলাস্তম্ভে উৎকীর্ণ লিপিতে সপ্তাহ-বারের নাম প্রথম পাওয়া যায়—

শতে পঞ্চষষ্ট্যাধিকে বর্ষাণাং ভূপতৌ চ
বুধগুপ্তে আষাঢ় মাস [শুক্ল]— [দ্বা] দশ্যাং
সুরগুরোরদিবসে···

অর্থাৎ, ১৬৫ গুপ্তাব্দে সম্রাট বুধগুপ্তের রাজত্বকালে আষাঢ় মাসে শুক্লপক্ষের দ্বাদশীতিথিতে বৃহস্পতিবারে···

আজ পর্যন্ত হিন্দুদের পূজাপার্বণে বারের কোনো প্রাধান্য নাই, তিথির প্রাধান্যই প্রবল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও পঞ্জিকায় কোন্ বারে কোন্ যামার্ধ কালবেলা ও বারবেলা কোন্ বারে কোন্ যামার্ধ কালরাত্রি তাহার নির্দেশ আছে। যামার্ধ অর্থে দিনমানের আট ভাগের এক ভাগ। বচনগুলি এইরূপ—

রবৌ বর্জ্যং চতুঃপঞ্চ সোমে সপ্তদ্বয়স্তথা।
কুজে ষষ্ঠদ্বিতীয়ঞ্চ বুধে বাণতৃতীয়কম্॥
গুরৌ সপ্তাষ্টকঞ্চৈব ত্রিচত্বারি চ ভার্গবে।
শনাবাদ্যং তথা চান্ত্যং ষষ্ঠঞ্চপরিবর্জয়েৎ॥

রবিবারে ৪র্থ ও ৫ম, সোমবারে ৭ম ও ২য়, মঙ্গলবারে ৬ষ্ঠ ও ২য়, বুধবারে ৫ম ও ৩য়, বৃহস্পতিবারে ৭ম ও ৮ম, শুক্রবারে ৩য় ও ৪র্থ, শনিবারে ৮ম ও ৬ষ্ঠ যামার্ধকে যথাক্রমে বারবেলা ও কালবেলা বলে। শনিবারে আবার প্রথম যামার্ধ কালবেলা। সেইরূপ আবার কালরাত্রি আছে—

রবৌ ষষ্ঠং বিধৌ বেদং কুজবারে দ্বিতীয়কম্।
বুধে সপ্ত গুরৌ পঞ্চ ভৃগুবারে তৃতীয়কম্।
শনাবাদ্যন্তথা চান্ত্যং রাত্রৌ কালং বিবর্জয়েৎ॥

অর্থাৎ, রবিবারের রাত্রির ৬ষ্ঠ, সোমবারের ৪র্থ, মঙ্গলবারের ২য়, বুধবারের ৭ম, বৃহস্পতির ৫ম, শুক্রবারের ৩য় ও শনিবারের ১ম, ৮ম যামার্ধ কালরাত্রি। কোনো শুভকর্মে বারবেলা, কালবেলা, কালরাত্রি বর্জন করিয়া কাজ করিতে হইবে।

আবার, সোম বুধ বৃহস্পতি ও শুক্র এই চারি বার সকল কর্মে শুভ; রবি শনি ও মঙ্গল কোনো কোনো শুভকর্মে প্রশস্ত। মৃতে 'বারদোষ' হয়। তদ্ভিন্ন 'তিথি' ও 'নক্ষত্রে'র দোষ ইত্যাদি অনেক কিছুই শাস্ত্রীয় বলিয়া হিন্দুর সমাজে চলিয়া আসিতেছে।

রোমক ও গ্রেগরী পঞ্জী

খ্রীষ্টান জগতের পঞ্জী বলিয়া যে পঞ্জী আজ চলিতেছে আদৌ তাহার সহিত খ্রীষ্টান ধর্মের কোনো যোগাযোগ ছিল না। য়ুরোপের উত্তরাঞ্চলে অর্ধবর্বর কতকগুলি জাতির মধ্যে একপ্রকার পাঁজি (বা একপ্রকার বর্ষমান) প্রচলিত ছিল, তাহাতে বছরে ৩০৪টি দিন ছিল—বসন্ত-ঋতুর কিছু পূর্ব হইতে (১লা মার্চ হইতে ২৫ শে মার্চের মধ্যকালীন কোনো তারিখ হইতে) গণনা করিয়া মকর-সংক্রান্তির কাছাকাছি (প্রায় ২৫শে ডিসেম্বর পর্যন্ত) বছরের দিন ছিল; অবশিষ্ট ৬১ দিন (দুই মাস) বৎসরের মধ্যে গণ্য হইত না, কারণ, তখন তাহারা শিশিরের (শীতকালের) শীতঘুমে আচ্ছন্ন হইয়া থাকিত, কাজকর্ম কিছুই করিত না। প্রাচীন রোমকরাষ্ট্রই এই ৩০৪ দিনের 'দশমেসে' পঞ্জী প্রথম গ্রহণ করে; তাহার পর বহু যুগ গত হইলে নানারূপ পরিবর্তনের মধ্য দিয়া আসিয়া জুলিয়স সীজারের সময় (খ্রীষ্ট-পূর্ব ৪৬ অব্দে) ঐ পঞ্জীর সংস্কার হইয়া তাহা 'জুলীয়পঞ্জী'তে (Julian Calendar) পর্যবসিত হয়। বলা বাহুল্য যে এই মাসগুলি চান্দ্রমাস ছিল। আনুমানিক ৬৭৩ পূর্ব-খ্রীষ্টাব্দে পম্পিলিয়স (Numa

Pompilius) নামে কোনো রাজা দুই মাস যোগ করিয়া (প্রকৃতপক্ষে ৫১ দিন) ৩৫৫ দিনের 'বারমেসে' বৎসর সৃষ্টি করেন। মাসের দিন-সংখ্যাগুলি এইরূপ হইল—

জা. ২৯, ফে. ২৮, মা. ৩১, এ. ২৯, মে. ৩১, জু. ২৯, জু. ৩১, আ. ২৯, সে. ২৯, অ. ৩১, ন. ২৯, ডি. ২৯ = ৩৫৫

ঋতুর সহিত সামঞ্জস্য রাখিতে দুই বা তিন বৎসর অন্তর একটি করিয়া ত্রয়োদশমাস (২২ বা ২৩ দিনের) ধরা হইত, তাহাকে বলা হইত 'অধিক মাস' (*Mercedonius* : intercalary month)। নিয়মমত যদি অধিমাস ধরা হইত তবে চার বছরে (২২ + ২৩ =) ৪৫ দিন যোগ হইত, অর্থাৎ গড়ে প্রতি বৎসরে ১১¼ দিন। এই হিসাবে সৌর বৎসর (tropical year = ঋতুচক্রকাল) ৩৬৬¼ দিনে হইত, অর্থাৎ প্রকৃত বৎসর অপেক্ষা ১ দিন বেশি হইত। কিন্তু নিয়মমত অধিমাস সংযুক্ত না হওয়ায়— কখনও দ্বিবার্ষিক কখনও ত্রিবার্ষিক সংযোগ হওয়ায়— বৎসরের প্রথম দিন ক্রমশঃ সরিয়া গিয়া অনেক সময়ে ঋতু-সূচনার অনেক আগেই শুরু হইত।

রোমকপঞ্জীর বিশেষত্ব এই যে, কোনো মাসের কয়েকটি বিশিষ্ট দিনকে নাম দিয়া গণনা করা হইত ; যথা—ক্যালেণ্ডস্ (Calends) প্রথম দিন, নন্‌স্ (Nones) পঞ্চম দিন (অথবা, ৩১শ দিনের মাস হইলে সপ্তম দিন) ও ইডিস্ (Ides) ত্রয়োদশ দিন (অথবা, ৩১শ দিনের মাস হইলে পঞ্চদশ দিন)। এই দিন গণনা আবার উলটা দিক হইতে (অর্থাৎ, আগামী মাসের প্রথম— ক্যালেণ্ডস্— হইতে করা হইত)। এইরূপে রোমকপঞ্জীতে নানারূপ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়।

৪৫ পূর্ব-খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রোমকগণের 'বৎসর কয়দিনে হয়' সে সম্বন্ধে কোনো ধারণা ছিল না। জুলিয়স সীজার ৪৪ পূর্ব-খ্রীষ্টাব্দে ঈজিপ্ট জয় করিবার পর ঈজিপ্টের [সৌর] পঞ্জিকা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করেন ও

ঈজিপ্টীয় জ্যোতির্বিদ সোসিজেনীসের (Sosigenes) পরামর্শে ৩৬৫ দিনে বৎসর ও প্রতি চতুর্থ বৎসরে ১ দিন বৃদ্ধি (অর্থাৎ ৩৬৬ দিনে বৎসর) এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া নূতন পাঁজির সৃষ্টি করিলেন, কারণ বৎসরে ৩৬৫¼ দিন হয় এই জ্ঞান তখন ঈজিপ্টে প্রচলিত ছিল। সেই সময় মার্চকে বৎসরের প্রথম মাস ধরিয়া গণ্য করিয়া পঞ্চম মাস কুইন্‌টিলিস্ (Quintilis)-কে জুলিয়স সীজরের সম্মানার্থে 'জুলাই' বলা হইল, এবং ইহার কয়েক বৎসর পরে (৮ পূর্ব-খ্রীষ্টাব্দ) তাঁহার উত্তরাধিকারী পরবর্তী নৃপতি অগাস্টাস (Octavious Augustus)-এর আমলে তাঁহার সম্মানার্থে ষষ্ঠমাস সেক্সটিলিস্ (Sextilis)-কে 'আগস্ট' নাম দেওয়া হইল।

সংস্কার সাধনে উদ্যত হইয়া সীজর দেখিলেন যে, ঋতুর সহিত সামঞ্জস্য রাখিতে হইলে ৪৬ পূর্ব-খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভ প্রায় ৯০ দিন আগে হইতে করিতে হয়। এজন্য ফেব্রুয়ারীর পর ২৩ দিন এবং নভেম্বর ও ডিসেম্বরের মধ্যবর্তী সময়ে অতিরিক্ত ৬৭ দিন সংযুক্ত করিতে হয় ; একুনে, বৎসরটিকে (৩৫৫+৯০=) ৪৪৫ দিনে ধরিতে হয়। তাহাই হইল। এজন্য য়ুরোপের লোকেরা আজও ৪৬ পূর্ব-খ্রীষ্টাব্দকে 'গোলমেলে বছর' (year of confusion) বলে।

সীজারের ইচ্ছা ছিল তখনকার প্রচলিত মকরক্রান্তির (winter solstice) দিন ২৫শে ডিসেম্বর হইতে বৎসরারম্ভ হউক ; কিন্তু পরবর্তী পূর্ব-খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী অমাবস্যা পড়িতেছে এবং অমাবস্যা লোকমতে শুভসংযোগ, এজন্য ৬ দিন পরবর্তী ঐ অমাবস্যার দিনই নববর্ষ হইবে তিনি এই মত প্রচার করিলেন। জনপ্রীত্যর্থে সীজার জ্যোতিষের মৌলিকবিন্দু মকর-ক্রান্তি অগ্রাহ্য করিয়া এই নবপঞ্জীর সৃষ্টি করেন। এই পঞ্জিকা সুবিস্তীর্ণ রোমকসাম্রাজ্যে প্রচলিত হইল এবং খ্রীষ্টধর্ম প্রবর্তিত হইবার পরেও বহু বৎসর য়ুরোপে প্রচলিত ছিল। তার পর, খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে ঐ পঞ্জীর যে সংস্কার হইল তাহা বলিতেছি।

জুলীয় বৎসর ৩৬৫'২৫ দিনে, এজন্য উহা প্রকৃত মান ৩৬৫'২৪২২ দিন অপেক্ষা '০০৭৮ দিন অধিক। ৩২৩ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে ডিসেম্বর যে মকর-সংক্রান্তি হইয়াছিল সেটি ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে ১২৬০ বৎসর পরে (১২৬০ × '০০৭৮ =) ১০ দিন (আসন্নমান) কমিয়া যাওয়ায় খ্রীষ্ট-জন্মদিনের* সহিত মকর-সংক্রান্তির কোনো সংস্রব আর রহিল না। এজন্য মহাবিষুবের সহিতও সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ায় ঈষ্টার-পর্বেরও কালনির্ণয় সঠিক হইল না। উক্ত ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে পোপ ১৬শ গ্রেগরী নবপঞ্জিকা প্রকাশের পূর্বাহ্নে এক ইস্তাহার ঘোষণা করিলেন যে, ঐ বৎসরের ৫ই অক্টোবর শুক্রবারকে ১৫ই অক্টোবর শুক্রবার গণ্য করিতে হইবে। পাঁজিতে অক্টোবর মাসের বার ও দিনগুলি নিম্নলিখিত রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল—

১৫৮২ অক্টোবর ১৫৮২

রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহস্পতি	শুক্র	শনি
	১	২	৩	৪	১৫	১৬
১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩
২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০
৩১						

মাসের এই ১০ দিন নষ্ট হওয়ায় গোলযোগ বড় কম হয় নাই। অধিবর্ষের জন্য যে জুলীয় নিয়ম প্রচলিত ছিল তাহারও সংশোধন হইয়া

*'খ্রীষ্টাব্দে'র প্রচলন হয় জুলিয়স সীজরের অনেক পরে ৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে। সিথীয় খ্রীষ্টান পাদ্রী Dionysius Exiguus গবেষণা করিয়া বাহির করেন যে, ২৫শে ডিসেম্বর (জুলীয়-মতে মকরক্রান্তি দিবস) পারস্যদেবতা 'মিথ্রে'র জন্মদিবসই হইল খ্রীষ্টের জন্মদিবস। আংকারায় (Ankara) যে রোমক শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে তাহাতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, বাইবেল-বর্ণিত রাজা হেরড (Herod) খ্রীষ্টপূর্ব ৪র্থ অব্দে মৃত হইয়াছিলেন; এজন্য তিনি যদি নিষ্পাপী-হত্যার (massacre of the innocents) আদেশক হইয়া থাকেন তবে যীশুখ্রীষ্টের জন্মতারিখ খ্রীষ্টপূর্ব ৪র্থ অব্দে বা তাহার কিঞ্চিত পূর্বে ফেলিতে হয়।

গেল। জুলীয় নিয়মে যে সব 'শতাব্দী'র বৎসরাঙ্কের শেষে দুই শূন্য ["00"] থাকিবে তাহা ৪ দ্বারা বিভাজ্য হইলেও যদি ৪০০ দ্বারা বিভাজ্য না হয় তবে তাহা অধিবর্ষ রূপে গণ্য হইবে না। দৃষ্টান্ত স্থলে, খ্রীষ্টাব্দ ১৬০০ (অধিবর্ষ), ১৭০০, ১৮০০, ১৯০০ (অধিবর্ষ নয়), ২০০০ (অধিবর্ষ), ইত্যাদি। অতএব, ৪০০ বছরের মধ্যে ১০০ বছর অধিবর্ষ হইবে না, ৯৭ বৎসর অধিবর্ষ হইবে। এই সংস্কারের পরেও যাহা সামান্য ভুল থাকিবে তাহার সংশোধন করিতে হইলে ৩৩০০ বছর লাগিবে এবং ১ দিন ভুল হইবে। এজন্য তার কথা এখন চিন্তা না করিলেও চলে।

গ্রেগরীয় সংস্কার য়ুরোপের প্রতি ক্যাথলিক খ্রীষ্টান সম্প্রদায় গ্রহণ করে কিন্তু প্রোটেস্টান্ট খ্রীষ্টানরা অনেক বিলম্বে তাহা গ্রহণ করে। ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে আইন পাশ করিয়া ইংলণ্ডে ইহার প্রচলন হয়, এবং ইহার অব্যবহিত পরে আমাদের এই ভারতে (ব্রিটিশ আমলের গোড়া হইতে) রাষ্ট্রীয় ও বৈষয়িক ব্যাপারের সুবিধার জন্য চলিতে আরম্ভ করে। পৃথিবীর অনেক দেশে বিংশ শতাব্দীর পূর্বে এই গ্রেগরী পঞ্জী গৃহীত হয় নাই। চীন ও অ্যালবেনিয়া ১৯১২ অব্দে, বুলগেরিয়া ১৯১৬ অব্দে, সোভিয়েট রাশিয়া ১৯১৮ অব্দে, রুমানিয়া ও গ্রীস ১৯২৪ অব্দে এবং তুরস্ক ১৯২৭ অব্দে এই পঞ্জী গ্রহণ করে।

দিন মাস ও বৎসর

পৃথিবী স্বীয় ধ্রুবাক্ষের উপর পশ্চিম হইতে পূবে প্রায় ২৪ ঘণ্টায় একবার ঘুরিতেছে, তজ্জন্য আমাদের প্রতীয়মান হইতেছে যে, সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-তারা সংবলিত আকাশ প্রত্যহ একবার করিয়া পূব হইতে পশ্চিমে ঘুরিতেছে। এতদ্ভিন্ন সূর্য চন্দ্র গ্রহাদির স্ব স্ব গতি আছে, নাই কেবল

তারার (মোটামুটি হিসাবে)। সময়ের পরিমাপক হিসাবে 'দিন'কে মৌলিক একক ধরিয়া মাস, বৎসর, ঋতুকাল প্রভৃতি প্রকাশ করিতে হয়। পৃথিবীর নানা জাতি দিনের বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়াছে— সূর্যোদয় হইতে সূর্যোদয় ('সাবন দিন'—ভারতবর্ষ), সূর্যাস্ত হইতে সূর্যাস্ত (ব্যাবিলনীয় ও ইহুদী জাতি)। কিন্তু দেখা যায় যে, এই দিনমানের কালটি (অহোরাত্র —স°) স্থির নয়, হ্রাসবৃদ্ধিশীল ; কারণ, পৃথিবীর নিরক্ষীয় স্থান (equatorial regions) ছাড়া অন্যান্য স্থানে (অক্ষাংশে—latitude) বৎসরের বিভিন্ন ঋতুতে সূর্য একই সময়ে উদিত হয় না (বা অস্ত যায় না)। পরবর্তী কালে, মধ্যরাত্রি হইতে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত সময়কে 'দিন' ধরিয়া সূক্ষ্ম কালপরিমাপক যন্ত্র ক্রোনোমিটার (chronometer) সাহায্যে দেখা গেল যে দিনমান অসমান হইতেছে। তখন জোতির্বিদগণ দিনের একটি মৌলিক একক-সংজ্ঞা স্থির করিলেন ; ইহাই 'মধ্যম সাবন দিন' (mean solar day)। কোনো স্থানের মধ্যরেখায় (meridian) সূর্যের পর পর আসিতে সূর্যের যে সময় অতিবাহিত হয় তাহার গড় পরিমাণ-কালকে মধ্যম সাবন দিন বলিতে হইবে। ইহা কৃত্রিম।

এই সাবন দিন ব্যতীত জ্যোতির্বিদরা আর-একটি মৌলিক দিনের সংজ্ঞা দিয়াছেন ; ইহাকে বলে 'নাক্ষত্র দিন' (sidereal day)। ইহা পৃথিবীর ধ্রুবাক্ষের উপর একবার আবর্তন কাল— অর্থাৎ কোনো নক্ষত্রের ক্ষিতিজ উদয় (horizontal rising) হইতে পরবর্তী ক্ষিতিজ উদয় পর্যন্ত কাল, অথবা (ঐ নক্ষত্রের) কোনো স্থানের মধ্যরেখা হইতে একপাক ঘুরিয়া পুনরায় মধ্যরেখায় আসিবার কাল। ইহা ধ্রুব ও নিত্য। নাক্ষত্রদিনের মান মধ্যম সাবন দিনের মানাপেক্ষা ঈষৎ কম ; তাহার কারণ এই যে, যখন পৃথিবী ধ্রুবাক্ষের উপর একবার পশ্চিম হইতে পূবে ঘুরিয়া আসে তখন সূর্য প্রায় এক অংশ (ডিগ্রি) পূবে সরিয়া যায় (সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর নিজ কক্ষে বার্ষিক গতির জন্য), এজন্য

সূর্যের মধ্যরেখায় পুনরায় আসিতে প্রায় ৪ মিনিট বেশি সময় লাগে। সাবন ও নাক্ষত্র দিনের পরস্পর সম্পর্ক দেখানো যাইতেছে—

মধ্যম সাবন দিন = ২৪ ঘ.

নাক্ষত্র দিন = ২৩ ঘ. ৫৬ মি. ৪ সে. (মধ্যম সাবন দিনের ঘড়িতে)

৩৬৫¼ মধ্যম সাবন দিন = ৩৬৬¼ নাক্ষত্র দিন

চন্দ্রের গতি হইতে মাসের উৎপত্তি হইয়াছে। সূর্য ও চন্দ্রের যে যুতি (conjunction) তাহাকে বলে অমাবস্যা। এক অমাবস্যা হইতে পরবর্তী অমাবস্যা পর্যন্ত যে সময় তাহাকে আমরা 'মাস' (চান্দ্রমাস) বলি। কিন্তু এই সংজ্ঞা অনুসারে মাসের দিন-সংখ্যা স্থির থাকে না, ২৯·২৪৬ দিন (মধ্যম সাবন দিন) হইতে ২৯·৮১৭ দিন (ম. সা. দি.) পর্যন্ত মাসের দিন-সংখ্যা পরিবর্তিত হইতে পারে; কারণ চন্দ্রের কক্ষ ঠিক বৃত্তাকার নয়, উহা বৃত্তাভাস হওয়ায় ঐ কক্ষের উৎকেন্দ্রতা (eccentricity) বর্তমান। প্রকৃত পক্ষে, চন্দ্র আকাশে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে (উহা পৃথিবীর উপগ্রহ হওয়ায় উহা পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতেছে) এবং উহার মার্গের কোনো বিশিষ্ট অবস্থান (ধরা গেল, মঘানক্ষত্র) হইতে সেইস্থানে চক্রাকারে ফিরিয়া আসিতে যে সময় লাগে তাহা প্রায় ২৭⅓ দিন। ইহাই চন্দ্রের 'নাক্ষত্রকাল' (sidereal period)। কিন্তু সূর্যও সেই দিকে ভ্রমণ (আপাত) করে; অতএব চন্দ্র, সূর্যের সহিত পূর্ব সংযোগস্থলে ফিরিয়া আসিবে (পরবর্তী যুতিতে) কিছু বেশী সময়ে। এই সময়ই 'চান্দ্রমাস'। ইহার গড় মান নিম্নে দেওয়া গেল—

১ চান্দ্রমাস = ২৯·৫৩০৫৮৮২ দিন − ০·০০০০০০২ শ, এস্থলে 'শ' অর্থে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তী কোনো শতাব্দীর সংখ্যা। উপস্থিত গড় চান্দ্রমাসের মান ২৯·৫৩০৫৮৮১ দিন, অথবা ২৯ দি. ১২ ঘ. ৪৪ মি. ২·৮ সে.। ইহাকেই মোটামুটি ৩০ দিন ধরিয়া ১৫ দিন ব্যাপী এক-একটিকে 'পক্ষ' কাল নির্দেশ করা হয়।

পুরাকালে অধিকাংশ দেশে অধিকাংশ জাতির মধ্যেই অমাবস্যার অব্যবহিত পরে যে দিন চন্দ্রের ক্ষীণ কলাটি পশ্চিম দিগন্তে সূর্যাস্তের পবক্ষণে প্রথম দৃষ্টিগোচর হইত সেই দিনটিকেই মাসের প্রথম দিন ধরা হইত। তাহার পর ক্রমিক ২য়, ৩য়, ইত্যাদি চাঁদের দিনগুলিকেই মাসের দোসরা, তেসরা, ইত্যাদি বলা হইত। ইসলামধর্মী দেশগুলিতে তারিখ-গণনার এই পদ্ধতি আজও অনুসৃত হইতেছে। মহরমের চাঁদ হইল ১০ম চাঁদ (শুক্লা একাদশীর)। অনুরূপ পদ্ধতি ব্যাপকভাবে প্রাচীন হিন্দু, গ্রীক্, রোমক, ব্যাবিলন প্রভৃতি জাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল। ইহাই হিন্দুদের 'তিথি' গণনার ভিত্তি, যাহা পূর্বে ছিল 'চান্দ্রদিন'। এইটিই ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে আজ পর্যন্ত ব্যবহৃত হইতেছে ধর্মোৎসবের দিন নির্ধারণে।

সময়ের বৃহত্তর মান হইল বৎসর। বৎসর নানারূপে গণনা করা হয়। একই ঋতুর পর পর পুনরাগমন-কালের মধ্যবর্তী সময় হইল এই বর্ষ। ইহার মান মধ্য সাবন দিনের একক হিসাবে এইরূপ দাঁড়ায়—

সৌরবর্ষ = ৩৬৫·২৪২১৯৮৭৯—১০$^{-৮}$ × ৬১৪ × জ,

সংকেতটির "জ" অর্থে 'এক জুলীয় শতাব্দী', অর্থাৎ ৩৬৫২৫ দিন। অতএব বর্ষের দৈর্ঘ্যকাল ধ্রুব নয়। বর্তমান সৌরবৎসরের মান হইল ৩৬৫·২৪২১৯৫৫ দিন, অথবা, ৩৬৫ দি. ৫ ঘ. ৪৮ মি. ৪৫·৭ সে.।

স্পষ্টতঃ, পুরাকালের নানাজাতির পৌরাণিক আখ্যান হইতে বুঝা যায় যে, বছরে ৩৬০ দিন ছিল, ১২ মাস ছিল, এবং ৩০ দিনে এক মাস ছিল। তখন লোকে ভাবিত যে চন্দ্রের কলার পুনরাবর্তন হইয়া থাকে ঠিক ৩০ দিন অন্তর। মিশরের পুরোহিতরা নীলনদের বন্যার কালচক্র হইতে প্রথম স্থির করেন যে ৩৬৫$\frac{১}{৪}$ দিনে এক বৎসর।

মিশর দেশ নদীমাতৃক ; ইহার মধ্য দিয়া নীলনদ প্রবাহিত না হইলে মিশর সাহারা মরুভূমির অঙ্কশায়ী হইয়া যাইত। এই নদের উৎপত্তিস্থল

মিশর হইতে বহুদূরে মধ্য-আফ্রিকা ও অ্যাবিসিনিয়ার পর্বতশ্রেণীতে। এই দুই স্থানে প্রচুর বারিপাতের ফলে নীলনদে বন্যা উৎপন্ন হয়। প্রাচীন কাল হইতেই মিশরীয়গণ এই বন্যার জল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রণালীর সাহায্যে নীলনদের উভয় পার্শ্বে প্রবাহিত করাইয়া শস্যাদি রোপণ করিত ('অববাহিক সেচন'— Basin Irrigation)। এজন্য বন্যার সময় পূর্ব হইতে সঠিক নির্ধারণ করা তাহাদের কর্তব্যকর্ম ছিল। তাহারা লক্ষ্য করিল যে, বন্যা ঠিক ৩৬৫ দিন অন্তর অন্তর আসে না; এক বছর যদি বন্যা আসে 'থথ' মাসের ১লা তারিখে, চার বছর পরে আসে ২রা তারিখে, আট বছর পরে আসে ৩রা তারিখে। এইভাবে স্থূলতঃ ১৪৬০ বৎসর অতিক্রান্ত হইলে পুনরায় প্রথম বর্ষের মত থথ-মাসের ১লা তারিখে নীলনদের বন্যা দেখা দিবে। এই ১৪৬০ বর্ষ-ব্যাপী বন্যার আবর্তন-কালকে 'সথিক-চক্র' (Sothic Cycle) বলে। এই চক্র সম্বন্ধে নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষণ যাহা হইয়াছিল তাহা বলিতেছি।

অত্যুজ্জ্বল তারকা লুব্ধক Sirius. (Sothis— ঈজিপ্ট)] হইল মিশরীয় দেবী আইসিস (Isis='Sothis)। পূজাপার্বণের জন্য লুব্ধকের গতিবিধির উপর সর্বদা দৃষ্টি রাখা হইত। বহুযুগব্যাপী অবিরাম পর্যবেক্ষণের ফলে দেখা গেল যে, পূর্বদিকচক্রবালে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ঐ নক্ষত্রটিকে উদিত হইতে (heliacal rising) দেখা যাইবে ৩৬৫ দিন অন্তর নয়, ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা অন্তর; অর্থাৎ সূর্য আকাশমার্গের কোনো বিন্দু হইতে সেই বিন্দুতে ফিরিয়া আসে স্থূলত ৩৬৫¼ দিন পরে।

নাক্ষত্র বৎসর ও সূর্যের অয়নচলন

অতি প্রাচীন কাল হইতে কোনো কোনো দেশে লোকে বৎসর বলিত সেই কালপরিমাণকে যে সময়ে সূর্য ক্রান্তিবৃত্তের (ecliptic) উপর দিয়া

একই বিন্দুতে ঘুরিয়া আসিত, অবশ্য ইহা সূর্যের আপাতঘূর্ণন, আসলে পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে স্বীয় কক্ষে ঘুরিয়া আসে। ইহাই 'নাক্ষত্র বৎসর' (sidereal year)। ক্রান্তিবৃত্তের উপর মহাবিষুব একটি বিন্দু— ইহা নিরক্ষরেখা (equator) ও ক্রান্তিবৃত্তের একটি ছেদবিন্দু। অপর ছেদবিন্দুকে জলবিষুব বলে। সূর্য ঐ বিন্দুতে আসিলে দিন-রাত্রি সমান হয়। মহাবিষুব বিন্দু কিন্তু অচল নয়, উহা অতি ধীরে ধীরে ক্রান্তি-বৃত্তের উপর দিয়া সূর্যগতির বিপরীত দিকে (পশ্চিমে) বৎসরে ৫০″ (বিকলা : সেকেণ্ড-ই°) সরিয়া যাইতেছে, এজন্য সৌরবৎসর বলিতে 'ঋতুর বৎসর' বুঝায় এবং ইহা মহাবিষুব হইতে পুনরায় ঐ স্থানে আসিতে সূর্যের যে সময় লাগে তাহাকে বুঝায়। অতএব, সৌরবৎসর (tropical year) নাক্ষত্র বৎসর অপেক্ষা ঈষৎ কম, ঐ ৫০″ যাইতে সূর্যের যত সময় লাগে তত কম।

মহাবিষুবের (বা জলবিষুবের) উক্ত ধীর পশ্চিমমুখী অবিরাম গতিকে 'অয়ন' (precession) বলে। সৌরবৎসরের প্রকৃতমানের উপর ঋতুপর্যায় নির্ভর করিতেছে। পঞ্জিকাগণনার পক্ষে 'নাক্ষত্র বৎসরে'র (৩৬৫·২৫৬৩৬২ মধ্যম সাবন দিন) ব্যবহার নাই। ব্যবহার করিলে (সৌরবৎসর ৩৬৫·২৫২২ দিনের পরিবর্তে) ঋতুপর্যায় মিলিবে না, এবং যে-কোনো ঋতুর প্রারম্ভ ও শেষ ক্ষণ ধার্য করিতে ভুল হইবে, এবং অনেক বৎসর গত হইলে বৎসরারম্ভ যে ঋতুতে হইত তাহা কয়েকদিন আগাইয়া আসিবে। সূর্যসিদ্ধান্ত ও বরাহমিহিরের পঞ্চসিদ্ধান্তিকায় সৌরবৎসর ধরিয়া ঋতুগণনার কথা (সায়ন) শাস্ত্রীয় বলিয়াছে। কিন্তু ভারতীয় পঞ্জিকাকারগণ ভুল বুঝিয়া খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী হইতে নাক্ষত্র বৎসর ধরিয়া (নিরয়ণ) গণনা করিতেছে। খ্রীষ্টীয় প্রায় ৫০০ অব্দে হিন্দুগণ বিজ্ঞানানুগ পঞ্জিকা-সংস্কার আরম্ভ করিলেন [ভারতের জ্যোতির্বিদ্যার 'সিদ্ধান্তযুগ']— মহাবিষুবে সৌরবর্ষ আরম্ভ হইল, সৌর ও চান্দ্র গণনাপদ্ধতি লিপিবদ্ধ হইল ; কিন্তু

একটি মারাত্মক ভুলে পঞ্জিকার স্থায়ী রূপটি পণ্ড হইয়া গেল, সেটি হইল সৌরবর্ষের মান ৩৬৫·২৫৮৭৫ দিনে ধরা হইল বলিয়া। এই সংখ্যা প্রকৃত সৌরবর্ষের মান অপেক্ষা ·০১৬৫ বেশি। অতএব, ১৪০০ বৎসর পরে বর্ষশেষ-দিন মহাবিষুবে সূর্যের সংক্রমণে না ঘটিয়া উহা ঘটিবে উহার ২৩·১ দিন পূর্বে। পুনশ্চ, হিন্দুমতে রেবতী নক্ষত্র (ই° জিটা-পিসিয়াম) সন্নিকটস্থ মহাবিষুববিন্দুর অবস্থানটি ধ্রুব, যে বিন্দুটিকে আনুমানিক ৫০০ খ্রীষ্টাব্দে মহাবিষুববিন্দু হিসাবে ধরা হইয়াছিল।

এই ভুলের কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, যদিও অয়নান্তবিন্দুর (equinoctial points) অয়নচলনের (precession) মৃদুগতির বিষয় তাৎকালিক হিন্দু জ্যোতির্বিদগণের অবিদিত ছিল না, কিন্তু গতি সম্পর্কিত ধারণা ভ্রমাত্মক ছিল। তাঁহারা মনে করিতেন অয়নান্তবিন্দুর গতি সূর্যবিমুখী অবিচ্ছিন্ন এক দিকের (unidirectional) গতি নয়, উহা দোলন-যন্ত্রের ন্যায় দোদুল্যমান মৃদুগতি অর্থাৎ কিছুকাল একদিকে যাইয়া পুনরায় বিপরীত দিকে ফিরিয়া আসে। অতএব, তাঁহারা স্থির করিলেন যে সৌরবর্ষ (tropical year) ধরিবার কোনো আবশ্যকতা নাই, তৎপরিবর্তে নাক্ষত্রবর্ষ (sidereal year) ধরিলেই চলিবে; উহাতে অয়নান্তবিন্দু গতিহীন হইল (নিরয়ণ)। য়ুরোপেও অয়নচলন সম্বন্ধে অনুরূপ ভ্রমাত্মক ধারণা প্রচলিত ছিল, তাহাকে বলা হইত 'বিক্ষেপগতি' (trepidation)। পরে তথ্যটি নিউটনের গতিবিজ্ঞানের সাহায্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে দেখা গেল যে, অয়নচলন ব্যাপারটির মূল কারণ হইল পৃথিবীর গোলাভাস (spheroidal) আকার। অয়নচলনের মান গতিবিজ্ঞানে কষিয়া বাহির করা হইয়াছে; উহা গোলাভাস পৃথিবীর ধ্রুবাক্ষ (polar axis) ও নিরক্ষীয়াক্ষ (equatorial axis) সম্পর্কে যে দুইটি 'জাড্যের ভ্রামক' (moments of inertia) আছে তাহার অন্তরফলের সহিত সমানুপাতিক (proportional) এবং এই অয়নচলন

একমুখী (unidirectional)। পৃথিবীর উপর সূর্য ও চন্দ্রের যুগল আকর্ষণ হইতে উদ্ভূত এই আয়নিক গতি; এই আকর্ষণের মাত্রা আবার স্থির নয়, এজন্য দেখা গিয়াছে যে বাৎসরিক অয়নমাত্রা ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে। নিম্ন স্তম্ভগুলিতে এই মাত্রা এবং কত বৎসরে এক ডিগ্রি পিছাইবে তাহার একটা হিসাব দেওয়া গেল—

অব্দ	অয়ন-মাত্রা	ডিগ্রি-পিছু সরিতে কত বছর লাগিবে
২০০০ পূর্ব-খ্রীষ্টাব্দ	৪৯″৩৯১	৭২˙৮৯
০ অব্দ	৪৯˙৮৩৫	৭২˙২৪
১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ	৫০˙২৫৬	৭১˙৬৩
২০০০ খ্রীষ্টাব্দ	৫০˙২৭৯	৭১˙৬০

হিপ্পার্কস্ (পূর্ব-খ্রীষ্টাব্দ ১২৬) গ্রীসীয় পর্যবেক্ষক ছিলেন, রোড্‌সে (Rhodes) তাঁহার কর্মস্থান ছিল। তিনিই সর্বপ্রথম জ্যোতির্বিদ যিনি বিষুবের এই অয়নগতি সম্বন্ধে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, তাঁহার অগ্রবর্তী পর্যবেক্ষক টিমোচারী (Timocharis) যিনি ২৮০ পূর্ব-খ্রীষ্টাব্দে আলেক্‌জান্দ্রিয়ায় থাকিতেন তাঁহার কাল হইতে হিপ্পার্কসের কাল পর্যন্ত উজ্জ্বল চিত্রা তারাটি জলবিষুববিন্দু (Autumnal equinoctial point) হইতে ২ অংশ সরিয়া আসিয়াছে; এজন্য তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে, অয়নান্তবিন্দুদ্বয়ের পশ্চিমমুখী একটা অতি ধীর গতি আছে এবং তাহা বৎসরে ৫১½ বিকলা (সেকেণ্ড)। যদিও হিপ্পার্কস্ জ্যোতিষে সে সময়ে এক বিরাট আবিষ্কার করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সেই আবিষ্কারের মর্ম বুঝিতে তাঁহার সমসাময়িক তো কেউ ছিলেনই না, তাঁহার পরবর্তী জ্যোতির্বিদ্ বহু শতাব্দী পরে তাহা বুঝিয়াছে। হিপ্পার্কস্ যে বিষুববিন্দু স্থির করিয়াছিলেন তাহা অশ্বিনী (আল্‌ফা এরিটিস্) নক্ষত্রের ৮° পশ্চিমস্থ একটি বিন্দু। টলেমির সময়ে (১৫০ খ্রীঃ অঃ), প্রায় ৩০০ বৎসর পরে, উহা ৪° সরিয়া যায়। মেসোপটেমিয়ায় যে মৃৎফলকে উৎকীর্ণ লিপি আবিষ্কৃত

হইয়াছে তাহাতে দুইটি পদ্ধতির পঞ্জিকা সম্বন্ধে জানা গিয়াছে [Ephemeris A ও Ephemeris B]; দ্বিতীয় পদ্ধতি মতে মেষরাশির ৮°তে বিষুব ধরা হইয়াছে, তাহাতে মনে হয় যে, সে সময়কার পর্যবেক্ষণ টলেমির সাড়ে পাঁচ শত বছর আগে। টলেমির সময়কে ১৫০ খ্রীষ্টাব্দ ধরিলে উক্ত পঞ্জিকার শুরু ৪০০ পূর্ব-খ্রীষ্টাব্দে। দ্বিতীয়তঃ, প্রথম পদ্ধতি মতে বিষুব মেষরাশির ১০°তে পড়ে, এজন্য উহা আরও কিছু পূর্বের— ক্যাল্‌ডীয় জ্যোতির্বিৎ কিডিন্নু [Kidiunu] যে সময়ে ব্যাবিলনের বরসিপ্পায় পর্যবেক্ষণ করিতেন সেই সময়ের। উঁহার কাল প্রায় ৫০০ পূর্ব-খ্রীষ্টাব্দ ধরা যাইতে পারে।

অয়নচলনের আবিষ্কারে তথাকথিত ফল্য জ্যোতিষীদের গণনা একেবারে অর্থহীন হইয়াছে। জ্যোতিষ-শাস্ত্রে রাশিগুলির প্রত্যেকটি কতিপয় তারাগুচ্ছের সমষ্টি। অয়নগতির দরুণ রাশিগুলি চলন্ত হইয়াছে এবং অনুরূপ তারাগুচ্ছ হইতে ক্রমশঃ সরিয়া যাইতেছে। উদাহরণস্থলে বলা যাইতে পারে যে, হিপ্পার্কসের সময় হইতে বিষুব প্রায় ৩০° পশ্চিমে সরিয়া গিয়াছে, তজ্জন্য তাঁহার সময়ে যেটি 'মীন' রাশি ছিল এখন সেটি 'মেষ' রাশিতে পরিণত হইয়াছে, এবং বর্তমানে জ্যোতিষের মেষরাশির সহিত মেষরাশিস্থ তারাপুঞ্জের (constellation) কোনো যোগাযোগ নাই। টলেমির অব্যবহিত পরবর্তী জ্যোতির্বিৎগণ অয়ন সম্বন্ধে কোনো কথা কিছু বলেন নাই, কেবল 'বিক্ষেপগতি'র আবিষ্কর্তা আলেক্‌জান্ড্রিয়ার থিঅন্‌ ছাড়া। তিনি কিন্তু অয়নগতি যে একমুখী তাহা বলেন নাই। এথেন্সের প্লেটো প্রতিষ্ঠিত অ্যাকাডেমির অধ্যক্ষ প্রোক্লস্‌ (৪১০-৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দ) সে সময়ে অত্যন্ত জ্ঞানীব্যক্তি ও নব্য প্লেটোনীয়-বাদের একজন প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ; তিনি অয়নগতি একেবারে অস্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

তার পর আরব ও হিন্দু যুগের জ্যোতিষীদের কথা বলিতেছি।

বোগদাদের থাবিট্-ইবন্-কুরা (Thabit ibn Qurra) যাঁহার কাল (৮২৬-৯০১ খ্রীষ্টাব্দ) প্রধানতঃ নবম শতাব্দী এবং যিনি টলেমির আলমাজেস্ট (Almagest) পঞ্জীর আর্বীতে অনুবাদ করেন তিনি অয়ন সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও বিষুববিন্দুর বিক্ষেপগতি সমর্থন করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু অন্যান্য আরবীয় জ্যোতির্বিদপণ্ডিত, যথা অল্ ফর্ঘানি (al-Farghāni : বোগ্দাদ্ : আঃ ৮৬১), অল্-বত্তানি (al-Battāni : সিরিয়া : আঃ ৮৫৮), আবদ্ অল্-রহঁমান্ অল্-সুফী (Abd al-Rahmaān al-Sūfi : ৯০৩-৯৮৬ : তেহেরান্) এবং ইবন্ য়ুনুস্ (Ibn Yūnus : কাইরো : ১০০৯ খ্রীষ্টাব্দে মৃত) সকলেই অয়ন ব্যাপার পর্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন কিন্তু বিক্ষেপগতির পরিকল্পনা বর্জন করেন। ইঁহাদের মধ্যে অল্-বত্তানি অয়নগতির হার বৎসরে ৫৪″ (বিকলা) বলিয়া ঘোষণা করেন। টলেমি এই হার বৎসরে ৩৬″ বলেন, কিন্তু অল্-বত্তানি গতিটি প্রায় নির্ভুলভাবে ধরিতে পারিয়াছিলেন।

ভারতে বেদাঙ্গ জ্যোতিষের প্রচলন প্রায় তের শত বৎসরের অধিক দিন ছিল (১০০০ পূর্ব-খ্রীষ্টাব্দ হইতে ৩০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কাল); গর্গ মহাভারত-বর্ণিত জ্যোতিষশাস্ত্রের উপাধ্যায় ও 'গর্গসংহিতা' নামক সিদ্ধান্ত-পূর্বযুগের পঞ্জিকা রচয়িতা ছিলেন—তাঁহার কথা হইতে মনে হয় যে মহাভারত লিখিত হইয়াছিল ৪৫০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দের কিছু পূর্বে; তাহার পর, বরাহমিহিরের পঞ্চসিদ্ধান্তিকা ও বৃহৎসংহিতা (৫৫০ খ্রীষ্টাব্দ) হইতে জানা যায় যে, অয়নান্তবিন্দুর অয়নচলন সম্বন্ধে তাঁহাদের জ্ঞান ছিল, কিন্তু পর্যবেক্ষণ দ্বারা কিরূপে অয়নগতির বাৎসরিক হার বাহির করিতে হয় তাহা তাঁহারা জানিতেন না। খ্রীষ্টীয় ১০ম ও ১১শ শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যের মুঞ্জাল ভট্ট ও শ্রীপতি (১০৩৯ খ্রীষ্টাব্দ) এই বিষুববিন্দুর গতি সম্বন্ধে স্পষ্ট জ্ঞান লাভ করেন। মুঞ্জাল ৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে একখানি জ্যোতিষগ্রন্থ লেখেন তাহার নাম 'লঘুমানস'। তাঁহার গ্রন্থের টীকাকার মুনীশ্বর নিম্নলিখিত সূত্র মুঞ্জালের রচিত বলিতেছেন—

নির্দিষ্টো-য়নসন্ধিশ্চলনংতত্রৈব সম্ভবতি
তদ্ভগণাঃ কল্পেস্থ্যগোরসরসগোংক-চন্দ্রমিতাঃ ।

কর্কট ও মকর -ক্রান্তি বিন্দু দুইটির যে গতি তাহাই অয়নগতি, এবং এক কল্পে ইহার আবর্তন সংখ্যা ১৯৯৬৬৯। এক কল্প $=৪.৩২\times১০^{৯}$ বৎসর। অতএব এক বৎসরে

$$\text{অয়নমাত্রা}=\frac{১৯৯৬৬৯\times৩৬০\times৬০\times৬০}{৪.৩২\times১০^{৯}}=\frac{১৯৯৬৬৯\times১২৯৬}{৪৩২০০০০}=৫৯''.৮৭$$

পৃথূদকস্বামী (জন্ম : ৯২৮ খ্রীষ্টাব্দ) কুরুক্ষেত্রের কাছাকাছি পাইহোবা (Peihowa) নামক স্থানে থাকিয়া পর্যবেক্ষণ করিতেন; তাঁহার মতে এক কল্পে উক্ত আবর্তন-সংখ্যা ১৮৯৪১১ এবং ইহাকেই 'অয়নযুগ' বলে। পৃথূদকস্বামীর মত গ্রহণ করিয়া অঙ্ক কষিলে বাৎসরিক অয়নমাত্রা ৫৬''.৮২ দাঁড়ায়।

ভাস্করাচার্য ২য় (১১১৪—১১৭৮ খ্রীষ্টাব্দ) অয়নের কথা না বলিয়া 'সম্পাতচলন' বলিয়াছেন। ভারতীয় জ্যোতিষীগণ এ বিষয়ে পাশ্চাত্য গ্রীসীয় অথবা আরবীয় জ্যোতিষীগণ কর্তৃক বিশেষ প্রভাবান্বিত হন নাই, তাঁহারা নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিতেন।

হিন্দু পঞ্জিকাকারগণের নিরয়ণগণনা নিতান্ত মান্ধাতা আমলের সেকেলে হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নিউটনের অয়নচলন সংক্রান্ত রহস্য উদ্‌ঘাটন ও গাণিতিক ব্যাখ্যার পর আর নিরয়ণ বা বিক্ষেপগতির কথা জগতে টিকে না। সায়ন ধরিয়া পঞ্জিকার সংস্কার করিতে অনেকেই বলিয়া আসিতেছেন, যথা, বালগঙ্গাধর তিলক, শংকর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত, বোম্বাইএর বেঙ্কটেশ বাপুজী কেতকর, কাশীর সুধাকর দ্বিবেদী ও তস্য গুরু কাশীর অধ্যাপক বাপুদেব শাস্ত্রী, বাংলার ডঃ যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, বৈজ্ঞানিক ডঃ মেঘনাদ সাহা প্রভৃতি, এবং সম্প্রতি 'সাহা পঞ্জিকা-সংস্কার

কমিটি' সায়ন ধরিয়া নব্য ভারতীয় পঞ্জিকার সৃষ্টি করিয়াছেন। বাপুদেব শাস্ত্রী ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে বলিতেছেন—

"যেহেতু নিরয়ণসংক্রান্তিগুলি সূক্ষ্মভাবে এবং নিঃসন্দেহে জানা যায় না, এবং যেহেতু নিরয়ণরাশিগুলির ক্রান্তিবৃত্ত সম্পর্কে কোনো সম্বন্ধ নাই, অতএব আমাদের ধর্ম ও পূজাবিষয়ক যাবতীয় অনুষ্ঠানে নিরয়ণ-পদ্ধতির জন্য লালায়িত হওয়া উচিত নয়; আমাদের সায়ন-পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া সেই অনুসারে ধর্মাদি আচার-অনুষ্ঠান নির্বাহ করা বিধেয়।"

মিটন-চক্র

মিশরীয় পঞ্জিকায় চন্দ্র কোনো অংশ গ্রহণ করে নাই; কিন্তু সমসাময়িক অন্যান্য সভ্যজাতি, যথা ব্যাবিলনের সুমেরীয়-আক্কাডীয় জাতি, ভারতের বৈদিক হিন্দু জাতি, সূর্য ও চন্দ্র উভয়কে কালনির্দেশক রূপে গণ্য করিয়াছিলেন,— বৎসর-গণনায় সূর্য, মাস-গণনায় চন্দ্র। ভারতীয় জ্যোতিবিদ্‌গণ চন্দ্রকে 'মাসকৃৎ' বলিতেন।

সূর্য ও চন্দ্র উভয়কে গণনায় ধরিলে কয়েকটি সমস্যা সমুপস্থিত হয়। দ্বাদশটি ২৯½ দিনের চান্দ্রমাসে হয় ৩৫৪ দিন, অর্থাৎ সৌরবৎসর অপেক্ষা ১১ দিন কম; পরবর্তী বৎসরে, প্রতি চান্দ্রমাসকে ১১দিন আগে শুরু করিতে হইবে, তিন বছর পরে ৩৩দিন নষ্ট হইবে। কোনো বিশিষ্ট মাসে কোনো বিশিষ্ট ঋতু হইতে হইলে দুই-তিন বছর অন্তর আর-একটি অতিরিক্ত মাস (ত্রয়োদশ মাস) সন্নিবিষ্ট করিতে হয়।

* "Since the *nirayaṇa saṁkrāntis* cannot be determined with precision and without doubt and since the *nirayaṇa rāśis* have no bearing on the ecliptic and its northern and southern halves, we must not hanker after *nirayaṇa* system for the purposes of our religious and other rites. We must accept *sāyana* and our religious and other rites should be performed in accordance with the *sāyana* system."

সৌরবৎসর ও চান্দ্রমাসের গণনার মীমাংসা ছাড়া আরও একটি সমস্যা আছে। সেটি হইল কোন্ দিন অমাবস্যান্তে প্রতিপদের সূক্ষ্ম চন্দ্রকলা পশ্চিম দিগন্তে দেখা দিবে। এইসব চন্দ্র-সূর্য-সম্পর্কিত সময়ের মীমাংসা তখনই সম্ভব যখন সৌর বৎসর ও গড় চান্দ্রমাসের দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে নির্ভুল জ্ঞান বর্তমান থাকে। গড় চান্দ্রমাসের দৈর্ঘ্য ২৯·৫৩০৫৮৮ দিন, এবং এইরূপ বার মাসে হয় ৩৫৪·৩৬৭০৬ দিন (= গড় চান্দ্রবৎসর), এবং সৌরবৎসরের দৈর্ঘ্য ৩৬৫·২৪২২০ দিন। অতএব, চান্দ্রবৎসর সৌরবৎসর অপেক্ষা ১০·৮৭৫১৪ দিন কম, অথবা, এক সৌরবৎসরে ১২·৩৬৮২৭টি চান্দ্রমাস।

খ্রীষ্টপূর্ব ৩৮৩ অব্দ হইতে ক্যাল্ডীয় জ্যোতিষীগণ একটি ১৯ বছরের কালচক্র ব্যবহার করিতেন। নিয়মটি এই—

১৯ সৌরবর্ষ = ১৯ × ৩৬৫·২৪২১ দিন = ৬৯৩৯·৬০ দিন

২৩৫ চান্দ্রমাস = ২৩৫ × ২৯·৫৩০২ দিন = ৬৯৩৯·৬৯ দিন

অর্থাৎ, ১৯ বছরে ·০৯ দিনের তফাত হইলে ২১১ দিনে ১ দিনের ভুল হয়।

এখন ১৯ বছরে ২২৮টি (= ১৯ × ১২) মাস; উহা ২৩৫টি চান্দ্রমাস অপেক্ষা ৭ মাস কম। এজন্য ১৯ বছরে ৭টি অতিরিক্ত মাস যোগ করিলে সৌর ও চান্দ্র মাস এক সময়ে আরম্ভ করা যাইতে পারে। এই ১৯ বছরের চক্রকে 'মিটন-চক্র' (Metonic Cycle) বলে।

দিগ্বিজয়ী আলেকজান্দারের মৃত্যুর ১২ বৎসর পরে, ৩১১ পূর্ব-খ্রীষ্টাব্দে, সেলেউকাস নিকেতর ব্যাবিলন অধিকার করেন। ঐ ৩১১ পূর্ব-খ্রীষ্টাব্দ হইতে যে অব্দের সূত্রপাত হয় তাহা ম্যাকিদন ও গ্রীকরাজ্যের সর্বত্র প্রচলিত হয়। এই অব্দকে 'ম্যাকিদন অব্দ' বা 'সেলুসিডীয় অব্দ' বলে। এজন্য, খ্রীষ্টাব্দ ও সেলুসিডীয়াব্দের সম্পর্ক এই যে

খ্রীঃ অ. = সে. অ. − ৩১১

পূঃ খ্রীঃ অ. = ৩১২ − সে. অ.

নিম্নে ১৯ বছরে যে যে অধিমাস হইয়াছিল তাহা দেখানো গেল (ক্যাল্‌ডীয় মতে) :

মিটন-চক্রের বৎসর	মোটমাট বর্ষমান (দিন)	সেলুসিডীয় অব্দ					
১*	৩৮৪	১৩৪	১৫৩	১৭২	১৯১	২১০	২২৯
২	৩৫৪	১৩৫	১৫৪	১৭৩	১৯২	২১১	২৩০
৩	৩৫৫	১৩৬	১৫৫	১৭৪	১৯৩	২১২	২৩১
৪*	৩৮৪	১৩৭	১৫৬	১৭৫	১৯৪	২১৩	২৩২
৫	৩৫৫	১৩৮	১৫৭	১৭৬	১৯৫	২১৪	২৩৩
৬	৩৫৪	১৩৯	১৫৮	১৭৭	১৯৬	২১৫	২৩৪
৭*	৩৮৪	১৪০	১৫৯	১৭৮	১৯৭	২১৬	২৩৫
৮	৩৫৪	১৪১	১৬০	১৭৯	১৯৮	২১৭	২৩৬
৯*	৩৮৪	১৪২	১৬১	১৮০	১৯৯	২১৮	২৩৭
১০	৩৫৫	১৪৩	১৬২	১৮১	২০০	২১৯	২৩৮
১১	৩৫৪	১৪৪	১৬৩	১৮২	২০১	২২০	২৩৯
১২*	৩৮৪	১৪৫	১৬৪	১৮৩	২০২	২২১	২৪০
১৩	৩৫৫	১৪৬	১৬৫	১৮৪	২০৩	২২২	২৪১
১৪	৩৫৪	১৪৭	১৬৬	১৮৫	২০৪	২২৩	২৪২
১৫*	৩৮৪	১৪৮	১৬৭	১৮৬	২০৫	২২৪	২৪৩
১৬	৩৫৪	১৪৯	১৬৮	১৮৭	২০৬	২২৫	২৪৪
১৭	৩৫৫	১৫০	১৬৯	১৮৮	২০৭	২২৬	২৪৫
১৮**	৩৮৩	১৫১	১৭০	১৮৯	২০৮	২২৭	২৪৬
১৯	৩৫৪	১৫২	১৭১	১৯০	২০৯	২২৮	২৪৭
মোট	৬৯৪০						

ক্যালডীয়গণ ব্যতীত অনেক প্রাচীন জাতি সৌর-চান্দ্র পঞ্জিকার ব্যবহার করিত, যথা বৈদিক হিন্দুগণ, ম্যাকিদনীয়গণ (গ্রীসীয়গণ), রোমান ও ইহুদীগণ।

বার মাস : সাতাশ নক্ষত্র

যজুর্বেদে যে বৎসরের বার মাসের নাম আছে তাহা ঋতু-সম্পর্কিত (tropical) নাম। উহার অন্তর্গত তৈত্তিরীয় সংহিতায় আছে—

মধু ও মাধব মাসদ্বয় হইল বসন্ত, শুক্র ও শুচি হইল গ্রীষ্ম, নভঃ ও নভস্য হইল বর্ষা, ইষ ও উর্জ হইল শরৎ, সহঃ ও সহস্য হইল হেমন্ত, এবং তপঃ ও তপস্য হইল শিশির (শীত)।

এখন এইসব নামের প্রচলন নাই, তৎপরিবর্তে চান্দ্রমাসের নাম প্রচলিত হইয়াছে, যথা, চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ইত্যাদি। যজুর্বেদে উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ন, বিষুবান্ (বিষুবসংক্রান্তি) প্রভৃতির উল্লেখ আছে; ঐতরেয় ব্রাহ্মণের কয়েকটি উক্তি হইতে বুঝা যায় যে, প্রধান সংক্রান্তিগুলির সময় সূর্যঘড়ির সাহায্যে নির্ণীত হইত। বসন্তের প্রথম মাস 'মধু', মকর-সংক্রান্তির ৬১ দিন পরে অথবা মহাবিষুবের ৩০ বা ৩১ দিন আগে আরম্ভ হইত এবং দ্বিতীয় 'মাধব' মাস মহাবিষুবের পরের দিন আরম্ভ হইত।

যজুর্বেদে নক্ষত্রগণের সম্পূর্ণ তালিকা আছে। 'কৃত্তিকা' (Pleiades) হইতে নক্ষত্রের শুরু হইত; এখন নক্ষত্র আরম্ভ হয় 'অশ্বিনী' (আল্‌ফা বা বা বিটা Arietes) হইতে। এই অশ্বিন্যাদি পদ্ধতির প্রারম্ভ সিদ্ধান্ত-জ্যোতিষের সময় (৫৫০ খ্রীঃ অঃ) হইতে হয়, যখন জ্যোতিষ-সিদ্ধ মহাবিষুব রেবতী নক্ষত্রে বা অশ্বিনীর প্রথম দিকে অবস্থিত ছিল। মহাভারত-রচনার যুগে (৪৫০-৪০০ পূর্ব খ্রীষ্টাব্দ) কৃত্তিকায় মহাবিষুব ছিল— বিষয়টি শংকর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত শতপথ ব্রাহ্মণের শ্লোক হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। বর্তমানে মহাবিষুব 'উত্তরভাদ্রপদা' নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে হঠিয়া আসিয়াছে; কিন্তু জ্যোতিষীগণ নিরয়ণ-প্রথা অবলম্বনে 'সিদ্ধান্ত-জ্যোতিষ' বর্ণিত অশ্বিনীকেই মহাবিষুব বলিয়া ধরিয়া আসিতেছেন। 'বেদাঙ্গ-জ্যোতিষে' নক্ষত্র সমাবেশের সংজ্ঞা এইরূপ ছিল যে উহাদের যে-কোনো একটির

প্রান্তদ্বয়ের ব্যবধান ক্রান্তিবৃত্তের ১৩° ২০′ (=৩৬০°÷২৭), যদিও আসলে ব্যবধান বিভিন্ন বিভিন্ন। প্রতি নক্ষত্রের প্রধান উজ্জ্বল তারাকে 'যোগতারা' বলে। নীচের তালিকায় নক্ষত্রগুলির নাম, প্রত্যেকের যোগতারা, অক্ষাংশ, ক্রান্ত্যংশ [সায়নমতে] দেওয়া হইল—

	নক্ষত্র	যোগতারা	অক্ষাংশ		ক্রান্ত্যংশ	
১.	অশ্বিনী	β Arietes	+৮°	২৯′	৩৩°	২২′
২.	ভরণী	41 Arietes	+১০	২৭	৪৭	৩৬
৩.	কৃত্তিকা	η Tauri	+৪	৩	৫৯	২৩
৪.	রোহিণী	α Tauri	−৫	২৮	৬৯	১১
৫.	মৃগশিরা	λ Orionis	−১৩	২৩	৮৩	৬
৬.	আর্দ্রা	Betelgeuse				
		α Orionis	−১৬	২	৮৮	৯
৭.	পুনর্বসু	β Geminorum	+৬	৪১	১১২	৩৭
৮.	পুষ্যা	δ Cancri	+০	৫	১২৮	৭
৯.	অশ্লেষা	α Cancri	−৫	৫	১৩৩	২
১০.	মঘা	α Leonis	+০	২৮	১৪৯	১৩
১১.	পূর্বফল্গুনী	δ Leonis	+১৪	২০	১৬৫	৪২
১২.	উত্তরফল্গুনী	β Leonis	+১২	১৬	১৭১	১
১৩.	হস্তা	δ Carvi	−১২	১২	১৯২	৫১
১৪.	চিত্রা	Spica				
		α Virginis	−২	৩	২০৩	১৪
১৫.	স্বাতী	Arcturus				
		α Bootes	+৩০	৪৬	২০৩	৩৮
১৬.	বিশাখা	α Libra	+০	২০	২২৪	২৮

	নক্ষত্র	যোগতারা	অক্ষাংশ	ক্রান্ত্যংশ
১৭.	অনুরাধা	δ Scorpii	−১ ৫৯	২৪১ ৫৮
১৮.	জ্যেষ্ঠা	∝ Scorpii (Antares)	−৪ ৩৪	২৪৯ ৯
১৯.	মূলা	λ Scorpii	−১৩ ৪৭	২৬৩ ৫৯
২০.	পূর্বাষাঢ়া	δ Sagittari	−৬ ২৮	২৭৩ ৫৮
২১.	উত্তরাষাঢ়া	σ Sagittari	−৩ ২৭	২৮১ ৪৭
২২.	শ্রবণা	∝ Aquilae	+২৯ ১৮	৩০১ ১০
২৩.	ধনিষ্ঠা	β Delphini	+৩১ ৫৫	৩১৫ ৪৪
২৪.	শতভিষা	λ Aquarii	−০ ২৩	৩৪০ ৫৮
২৫.	পূর্বভাদ্রপদা	∝ Pegasi	+১৯ ২৪	৩৫২ ৫৩
২৬.	উত্তরভাদ্রপদা	γ Pegasi	+১২ ৩৬	৮ ৩৩
২৭.	রেবতী	ζ Piscium	−০ ১৩	১৯ ১৬

উপরিলিখিত তালিকার ক্রান্ত্যংশ (longitude)-স্তম্ভ হইতে স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, তাহাদের ক্রমিক ব্যবধান পরস্পর অসমান, এবং আদর্শ গাণিতিক ব্যবধান ১৩° ২০′ কোথাও বজায় নাই। পুনশ্চ, অনেকগুলি নক্ষত্র ক্রান্তিবৃত্তের সন্নিকটস্থও নয় এবং চান্দ্রমার্গ (moon's celestial path) হইতেও অনেক দূরে দূরে (চান্দ্রমার্গের ক্রান্তিবৃত্তের সহিত নতি মোটামুটি±৫°) ;— বিষয়টি অক্ষাংশ হইতে বোধগম্য হইবে। উদাহরণ স্থলে, স্বাতী, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, পূর্বভাদ্রপদ দ্রষ্টব্য। কতকগুলি যোগতারা তাহাদের স্বকীয় নক্ষত্র হইতে চ্যুত, যথা আর্দ্রা, স্বাতী, জ্যেষ্ঠা, পূর্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা। উপরের নক্ষত্রবিভাগ এরূপভাবে করা আছে যাহাতে চিত্রা তারকাটি চান্দ্র রাশিচক্রের (lunar zodiac) ১৮০ ডিগ্রিতে থাকে, তাহা হইলে উহার সম্মুখস্থ ধনিষ্ঠা-তারা (∝-অথবা β-Delphi) ধনিষ্ঠা-নক্ষত্রের আদি তারা হইবে। 'বেদাঙ্গ

জ্যোতিষে' এইরূপ ব্যবস্থা আছে এবং বরাহমিহিরের সূর্যসিদ্ধান্তে মঘার (Regulus : α Leonis) অবস্থিতি হইবে মঘা নক্ষত্রের ৬°তে। বোম্বাইএর বেঙ্কটেশ বাপুশাস্ত্রী কেতকর প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে চিত্রাতারার সম্মুখস্থ খগোল বিন্দুই প্রাচীন অশ্বিন্যাদি বিন্দু। বেদাঙ্গ-জ্যোতিষে একটি শ্লোক আছে—

স্বরাক্রমেতে সোমার্কৌ যদা সাকং সবাসবৌ।
স্যাত্তদাঽহ দিযুগং মাঘস্তপঃ শুক্লোঽয়নং হ্যুদক্ ॥

ইহার সোমাকর-কৃত টীকার অর্থ এই যে— চন্দ্র সূর্য এবং ধনিষ্ঠা তারা, এই তিন জ্যোতিষ্ক যে সময়ে আকাশে এক স্থানে আসে (কিংবা ক্ষিতিজে উদিত হয়), সেই সময়ে আদিযুগ, মাঘ, তপঃমাস, শুক্লপক্ষ, এবং উত্তরায়ণ, এই পাঁচের আরম্ভ হয়।* বেদাঙ্গ-জ্যোতিষের কালে যদি ধনিষ্ঠার (α Delphini) ক্রান্ত্যংশ ২৭০° হয় এবং ১৯৫০ সালে ক্রান্ত্যংশ ৩১৬°৪১′ হয়, তবে ৪৬°·৭ ক্রান্ত্যংশের ব্যবধান ৪৬°·৭ × ৭২ = ৩৩৬২ বছরে হইবে, অর্থাৎ বেদাঙ্গ-জ্যোতিষের কাল হইল ১৪১৩ পূর্ব-খ্রীষ্টাব্দ। β-Delphini-কে ধনিষ্ঠা ধরিলে উহার কাল ১৩৩৮ পূর্ব-খ্রীষ্টাব্দ হইবে।

বুঝা গেল যে, বারোটি চান্দ্রমাস হইলে ২৭ নক্ষত্রের মধ্যে ১২ সংখ্যাটি বাছাই করিতে হইবে। দ্বাদশ মাসের নাম নক্ষত্রের নাম হইতে বৈদিক-যুগের অনেক পরে নির্বাচিত হয়।

১৪ সংখ্যক	নক্ষত্র	চিত্রা	হইতে	চৈত্র
১৬	,,	বিশাখা	,,	বৈশাখ
১৮	,,	জ্যেষ্ঠা	,,	জ্যৈষ্ঠ
২০ ও ২১	,,	আষাঢ়া	,,	আষাঢ়
২২	,,	শ্রবণা	,,	শ্রাবণ

*"পঞ্জিকা-সংস্কার"। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, ভারতবর্ষ, আশ্বিন ১৩৩১, পৃ ৫২২

২৫ ও ২৬	নক্ষত্র	ভাদ্রপদা	হইতে	ভাদ্র
১	,,	অশ্বিনী	,,	আশ্বিন
৩	,,	কৃত্তিকা	,,	কার্তিক
৫	,,	মার্গশীর্ষ	,,	মার্গশীরঃ (অগ্রহায়ণ)
৮	,,	পুষ্যা	,,	পৌষ
১০	,,	মঘা	,,	মাঘ
১১ ও ১২	,,	ফল্গুনী	,,	ফাল্গুন

চিত্রা হইতে চৈত্র, এবং চৈত্রই বছরের প্রথম মাস।*

তৈত্তিরীয় সংহিতা (৭।৫।৮) বলিতেছেন—

চিত্রা পূর্ণমাসে দিক্ষেরন মুখং বা এতৎ সম্বৎসরস্য
যৎ চিত্রা পূর্ণমাসো মুখত এব···

চৈত্র মাসের পূর্ণিমা হইল বর্ষের মুখ (আদি), ঐ দিনই যজ্ঞ আরম্ভ করিতে হইবে।

বৎসরে যদি ১২টি মেষাদিরাশি ও ২৭টি আশ্বিন্যাদি নক্ষত্র হয়, তবে এক-একটি রাশিতে গড়ে ২¼ নক্ষত্র পড়িবে। ইহা আদর্শ ব্যবস্থা। কোন্ দিন কোন্ নক্ষত্র বলিলে বুঝিতে হইবে চন্দ্রের অবস্থান সেই দিন কোন্ নক্ষত্রের ১৩° ২০′ সীমানার মধ্যে, কেননা স্থূলতঃ ২৭ দিনে চন্দ্র রাশিচক্রের (প্রকৃতপক্ষে, চন্দ্রমার্গের) ৩৬০° ঘুরিয়া আসে। পাঁজিতে পূর্ব হইতেই দৈনন্দিন চন্দ্রের অবস্থিতি কোন্ নক্ষত্রে লেখা থাকে। বেদাঙ্গ-জ্যোতিষের কালে বৎসরে ৩৬৬ দিন ধরা হইত। অতএব ৫ বছরে (=একযুগ) ১৮৩০ দিন, এবং চন্দ্রের ঐ সময়ে আবর্তন হয় ৬৭ বার, এজন্য

* ভারতের 'সম্মিলিত নবপঞ্জিকা'য় চৈত্র মাসই বছরের প্রথম মাস হইবে এইরূপ পরিকল্পিত হইয়াছে।

চন্দ্রকে মোটমাট ১৮০৯টি নক্ষত্র অতিক্রম করিতে হয়। এজন্য বুঝা যায় যে (চন্দ্রের নাক্ষত্রকাল = ২৭·৩২১৬৬ দিন ধরিলে)—

$$১ \text{ নাক্ষত্র দিন} = \frac{২৭·৩২১৬৬}{২৭} = ১·০১১৯১৩ \text{ দিন।}$$

$$\text{কিন্তু বেদাঙ্গ-জ্যোতিষের মতে উহা} = \frac{১৮৩০}{১৮০৯} = ১·০১১৬০৮ \text{ দিন।}$$

অতএব, প্রাচীন গণনায় ভুল হইবে ·০০০৩০৫ দিন, অর্থাৎ ৩২৭৯ দিনে (প্রায় ৯ বছরে) ১ নক্ষত্র।

তিথি করণ ও যোগ

চান্দ্রদিনকে 'তিথি' বলে, অর্থাৎ যখন চন্দ্র সূর্যকে ক্রান্তিবৃত্তে পশ্চাতে ফেলিয়া ১২° অগ্রসর হয় তখন একটি তিথি সম্পূর্ণ হয়। অমাবস্যা হইল আদি তিথি— যখন চন্দ্র ও সূর্যের যুতি (একত্র অবস্থান) হয়। তার পরই শুক্লপক্ষের প্রতিপদ আরম্ভ। চন্দ্র ১২° চলিয়া যাইলে প্রতিপদের শেষ এবং শুক্লদ্বিতীয়া তিথি আরম্ভ হয়। এইরূপে একটি চান্দ্রমাসে ৩০টি তিথি (৩৬০° ÷ ১২) হয়— পনেরটি শুক্লপক্ষীয়, পনেরটি কৃষ্ণপক্ষীয়। অতএব ২৯·৫৩০৫৮৮ দিনে ৩০টি তিথি ধরিলে দেখা যায় যে,

$$১\text{টি (গড়) তিথি} = \frac{২৯·৫৩০৫৮৮}{৩০} = ·৯৮৪৩৫৩ \text{ দিন} = ২৩·৬২ \text{ ঘ.}$$

কিন্তু বেদাঙ্গ-জ্যোতিষে ধৃত তিথির মান = ·৯৮৩৮৭১ দিন। এখানে ভুল হইল ·০০০৪৮২ দিন অর্থাৎ ২০৭৫ দিনে (= ৫$\frac{৩}{৪}$ বছরে) একটি তিথি। উপরে যেসব গণনা দেখানো হইল তাহা চন্দ্রের গতি সর্বত্র সমপরিমাণ (uniform) ধরিয়া,— ইহা সম্ভব হইত যদি চন্দ্র পৃথিবীর চারিদিকে বৃত্তাকারে প্রদক্ষিণ করিত। কিন্তু ইহার কক্ষ বৃত্তাভাস হওয়ায় এবং

ইহার মার্গ ক্রান্তিবৃত্তের সহিত একটি ক্ষুদ্র কোণে নত হওয়ায় চন্দ্রের গতি অত্যন্ত জটিল হইয়াছে। এজন্য, তিথির মান ২০ ঘণ্টা হইতে ২৬·৮ ঘণ্টা পর্যন্ত পরিবর্তিত হইতে পারে। চন্দ্রের গতি শৃঙ্খলিত ও সুসম হইলে কোনো কথাই ছিল না। ঋগ্বেদে তিথির কোনো কথাই নাই, যজুর্বেদে ও ব্রাহ্মণে, তৈত্তিরীয় সংহিতায়, ঐতরেয় ব্রাহ্মণে প্রতি পক্ষে দুইটি তিথি বর্ণিত আছে।

অতএব তিথি কোনো সৌরদিনের (পঞ্জিকার তারিখের) যে-কোনো সময়ে শুরু হইতে পারে— দিবাভাগে বা রাত্রিকালে। সাধারণতঃ, হিন্দুর কোনো পঞ্জিকার যে-কোনো তারিখে সূর্যোদয়ের সময় যে তিথি চলিতেছে উহাই সেই সৌরদিনের তিথি হইবে।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৩২।১০) কিন্তু তিথির সংজ্ঞা এইরূপ—

যম্ পর্যস্তমিয়াদ্ অভ্যুদিয়াদিতি সা তিথিঃ

চন্দ্রের অস্ত ও উদয়কাল হইতে তিথি গণিত হইবে। ভাবার্থ এই, শুক্লপক্ষে চন্দ্রাস্ত হইতে চন্দ্রাস্ত পর্যন্ত তিথি ধরিতে হইবে, কৃষ্ণপক্ষে চন্দ্রোদয় হইতে চন্দ্রোদয় পর্যন্ত। এজন্য তিথিগুলির দৈর্ঘ্য অসমান। সাধারণত, প্রত্যেক দিনেই একটি করিয়া তিথি পড়ে। সময়ে সময়ে একই পঞ্জিকাধৃত দিনে (civil day) একটি তিথি আরম্ভ হইয়া সেই দিনের মধ্যেই শেষ হইয়া যায়; এইরূপ তিথি গণ্য হয় না এবং এই তিথিতে কোনো ধর্মক্রিয়া সম্পাদিত হয় না। ইহার পরবর্তী দিনে পরবর্তী তিথি শুরু হয়। ধরা যাক, যদি তৃতীয়া নাই ধর্তব্য হয়, তবে সেই পক্ষের তিথিপরম্পরা এইরূপ হইবে— প্রতিপদ, দ্বিতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী ইত্যাদি। এখানে তিথিক্রমের ভঙ্গ হয়। পক্ষান্তরে, কখনও একই তিথি দুইদিন ধরিয়া চলে; যথা— ১, ২, ৩, ৩ (অধিক), ৪, ৫ ইত্যাদি। যে অহোরাত্র দিনে ক্রমান্বয়ে তিন তিথির সঞ্চার হয় সেই দিনকে 'ত্র্যহস্পর্শ' বলে।

হিন্দুর পঞ্চাঙ্গে বার, নক্ষত্র, তিথি ব্যতীত আরও দুইটি জিনিস থাকে যথা 'যোগ' ও 'করণ'। যদি সূর্য ও চন্দ্র উভয়ের উদয়কালের ক্রান্ত্যংশ দেওয়া থাকে, তবে উভয়ের যোগফলকে ১৩$\frac{১}{৩}$ (= $\frac{৩৬০^{\circ}}{২৭}$) দিয়া ভাগ করিলে যাহা বাকী থাকিবে তাহাই 'যোগ'। যোগ ২৭টা। যদি উক্ত যোগ ও ভাগের ফল ২৭ হইতে অধিক হয় তবে ২৭ বিয়োগ করিয়া উক্ত 'যোগ' স্থির করিতে হইবে। সাতাশটি যোগ এইগুলি— বিষ্কুম্ভ, প্রীতি, আয়ুষ্মান, সৌভাগ্য, শোভন, অতিগণ্ড, সুকর্ম, ধৃতি, শূল, গণ্ড, বৃদ্ধি, ধ্রুব, ব্যাঘাত, হর্ষণ, বজ্র, অসৃক, ব্যতিপাত, বরীয়ান্, পরিঘ, শিব, সিদ্ধি, সাধ্য, শুভ, শুক্র, ব্রহ্ম, ইন্দ্র, বৈধৃতি।

সেইরূপ 'করণ' হইল তিথির অর্ধাংশ। কোনো তিথির প্রথম অর্ধাংশ একটি করণ, দ্বিতীয়টি অন্য করণ। সুতরাং মাসের ত্রিশ তিথিতে ৬০টি করণ। এগুলির স্বতন্ত্র নাম নাই। করণ মোট ১১টি। যথা, বব, বালব, কৌলব, তৈতিল, গর, বণিজ, বিষ্টি (এই সাতটি সাধারণ) এবং শকুনি, চতুষ্পদ, নাগ ও কিন্তুঘ্ন— এই চারিটি বিশেষ বিশেষ তিথির বিশেষ বিশেষ অর্ধাংশে প্রযোজ্য। কৃষ্ণচতুর্দশীতে একটি, অমাবস্যায় দুইটি এবং শুক্ল প্রতিপদের প্রত্যেকটিতে একটি বিশেষ করণ আছে। বাকি ৫৬টি করণ প্রথম সাতটি সাধারণ করণের পৌনঃপুনিক ক্রম মাত্র। বারের ন্যায় উক্ত যোগ ও করণের কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নাই। ফল্য জ্যোতিষে যোগ ও করণের প্রয়োগ দেখা যায়।

সৌরমাস : সংক্রান্তি

সূর্যসিদ্ধান্তমতে সৌরমাসের গড় দৈর্ঘ্য ৩০·৪৩৮২৩ দিন (আধুনিক মতে উহা ৩০·৪৩৬৮৫ দিন)। কিন্তু এই সৌরমাসের গণনা কিরূপ?— সূর্য উহার মার্গে যে রাশিতে প্রবেশ করিয়া উহার ৩০° পর্যন্ত যাইতে সময় লইবে উহাকেই সৌরমাস বলা হয়। আর্য ও ব্রহ্মসিদ্ধান্তেরও এই মত।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন সৌরমাসের দৈর্ঘ্য এবং উক্ত গড় দৈর্ঘ্যের মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ আছে। ইহার কারণ এই যে, পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্রে রাখিয়া কোনো বৃত্তাকার কক্ষে সমবেগে পরিভ্রমণ করে না, উহা সূর্যকে ফোকাসে রাখিয়া বৃত্তাভাস কক্ষে অসমবেগে ছুটিতেছে। ধনুরাশিস্থ সময়ে সূর্য পৃথিবীর নিকটতম হওয়ায় (অনুসূর : perihelion) সূর্যের আপাতবেগ গড়বেগ অপেক্ষা বেশি এজন্য সূর্য শীঘ্র ঐ রাশি অতিক্রম করে এবং তজ্জন্য সৌরমাসের দৈর্ঘ্য কম হয়— ইহাই পৌষ মাস; আবার মিথুন-রাশির অন্তর্গত সূর্য পৃথিবীর দূরতম হওয়ায় (অপসূর : aphelion) সূর্য অপেক্ষাকৃত বিলম্বেই ঐ রাশি অতিক্রম করে এবং মাসের দৈর্ঘ্য বেশি হয়— ইহাই আষাঢ় মাস। জ্যোতিষী কেপ্‌লারের নিয়ম অনুসারে ব্যাপারটি গত খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী হইতে পরিষ্কার বুঝা গিয়াছে। দ্বাদশটি সৌরমাসের দৈর্ঘ্য বিভিন্ন বিভিন্ন। কিন্তু তাহাও প্রতি বৎসরে একরূপ থাকে না। যে-কোনো মাসের দৈর্ঘ্য কালচক্রের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ পরিবর্তিত হইতেছে। উহারও কারণ আছে; কিন্তু এই পরিবর্তন অতি সূক্ষ্ম, ইহার কথা উপস্থিত না ধরিলেও চলে।

সূর্যোদয়ের সঙ্গে দিন আরম্ভ। সূর্যের কোনো রাশিতে প্রবেশ যে ঠিক সূর্যোদয়ের সঙ্গেই হইবে এমন কোনো কারণ নাই— দিনের যে কোনো সময়ে হইতে পারে। জ্যোতিষের সিদ্ধান্ত অনুসারে মাসের শুরু ঐ সময়েই করিতে হয়; কিন্তু লোকব্যবহারে সূর্যোদয়েই মাসের প্রারম্ভ। এই কারণে সৌরমাসের শুরু 'সংক্রান্তির দিনে'ও ধরা যাইতে পারে অথবা 'সংক্রান্তির পরের দিন হইতে' ধরা যাইতে পারে। এক এক দেশে এক এক প্রথা। আমরা নীচে বঙ্গদেশের সংক্রান্তির কয়েকটি স্থানীয় নিয়ম দিতেছি—

কোনো পঞ্জিকার তারিখে (civil day) যদি সূর্যোদয় ও মধ্যরাত্রের মধ্যে সংক্রমণ হয় তবে সৌরমাস পরবর্তী দিনে আরম্ভ হইবে; কিন্তু ঐ

দিনের মধ্যরাত্রির পর সংক্রমণ হইলে পরবর্তী দিনের পরবর্তী দিন মাসের শুরু হইবে। ইহাই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু মধ্যরাত্রির ২৪ মিনিট আগে এবং ২৪ মিনিট পরে— এই দুই ক্ষণের মধ্যে যদি সংক্রমণ হয় তবে তিথি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে হইবে। যদি সূর্যোদয়ে আরদ্ধ তিথিটি সংক্রমণকাল পর্যন্ত বজায় থাকে তবে পরদিন মাসের আরম্ভ; এবং সংক্রমণের পূর্বেই যদি উক্ত তিথি শেষ হয় তবে পরদিনের পরদিন মাসের আরম্ভ। কর্কট ও মকর সংক্রান্তির বেলায় উক্ত তিথির নিয়ম খাটিবে না। কর্কট-সংক্রান্তিতে (উক্ত মধ্যরাত্রির ৪৮ মিনিটের মধ্যে সংক্রমণ হইলে) পরের দিন মাসের আরম্ভ, এবং মকরসংক্রান্তিতে তার পরের দিন।

উৎকল, তামিল ও মালাবার দেশে বিভিন্ন নিয়ম (convention) প্রচলিত; এজন্য সৌরমাসের আরম্ভে দুই বা একদিন এদিক-ওদিক হইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন সৌরমাসের পূর্ণ দিনসংখ্যা ২৯ হইতে ৩২ পর্যন্ত হইতে পারে। তাই বাংলার বিভিন্ন পাঁজিতে সাধারণতঃ দেখা যায়— কার্তিক, অগ্রাণ, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন প্রত্যেকে ২৯ বা ৩০ দিনে (দুটি মাস অন্ততঃ ২৯ দিনের হইবে) এবং চৈত্র, বৈশাখ ও আশ্বিন প্রত্যেকে ৩০ বা ৩১ দিনে এবং অবশিষ্ট জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্র কেউ ৩১ দিনে কেউ-বা ৩২ দিনে (অন্ততঃ বছরে এক মাস ৩২ দিনে হইবেই)। তৃতীয়তঃ, প্রতি বছরে কোনো সৌরমাসের পূর্ণ দিনসংখ্যা যে একই থাকিবে এমন কোনো কথা নাই, ইহা পরিবর্তনশীল।

বাসন্তীবিষুব হইতে গণনা করিয়া বিভিন্ন সৌরমাসের দৈর্ঘ্য—

(১)	(২)	(৩) (সূঃ সি) দি. ঘ. মি.	(৪) (১৯৫০ খ্রীঃ অঃ) দি. ঘ. মি.	(৫) নূতন নামকরণ
বৈশাখ (মেষ)	(০°-৩০°)	৩০ ২২ ২৭	৩০ ১১ ২৫	চৈত্র
জ্যৈষ্ঠ (বৃষ)	(৩০-৬০)	৩১ ১০ ৫	৩০ ২৩ ৩০	বৈশাখ

		(সূঃ সি)			(১৯৫০ খ্রীঃ অঃ)			নূতন নামকরণ
		দি.	ঘ.	মি.	দি.	ঘ.	মি.	
আষাঢ় (মিথুন)	(৬০-৯০)	৩১	১৫	২৮	৩১	৮	১০	জ্যৈষ্ঠ
শ্রাবণ (কর্কট)	(৯০-১২০)	৩১	১১	২৪	৩১	১০	৫৫	আষাঢ়
ভাদ্র (সিংহ)	(১২০-১৫০)	৩১	০	২৭	৩১	৬	৫৩	শ্রাবণ
আশ্বিন (কন্যা)	(১৫০-১৮০)	৩০	১০	৩৬	৩০	২১	১৯	ভাদ্র
কার্তিক (তুলা)	(১৮০-২১০)	২৯	২১	২৬	৩০	৮	৫৮	আশ্বিন
অগ্রহায়ণ (বৃশ্চিক)	(২১০-২৪০)	২৯	১১	৪৬	২৯	২১	১৫	কার্তিক
পৌষ (ধনু)	(২৪০-২৭০)	২৯	৭	৩৮	২৯	১৩	৯	অগ্রহায়ণ
মাঘ (মকর)	(২৭০-৩০০)	২৯	১০	৪৫	২৯	১০	৩৯	পৌষ
ফাল্গুন (কুম্ভ)	(৩০০-৩৩০)	২৯	১৯	৪১	২৯	১৪	১৯	মাঘ
চৈত্র (মীন)	(৩৩০-৩৬০)	৩০	৮	২৯	২৯	২৩	১৯	ফাল্গুন
		৩৬৫	৬	১২	৩৬৫	৫	৫১	

মেষাদি দ্বাদশটি রাশিচক্রের আদিবিন্দুতে সূর্যের পরপর সংক্রমণ হইলে দ্বাদশটি (নিরয়ণ) সংক্রান্তির উৎপত্তি হয়। রাশিচক্রের বিভিন্ন রাশির দৈর্ঘ্য উপরের (২)-স্তম্ভের বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া আছে। এক এক রাশির উপর অবস্থান সময় হইল উক্ত রাশিযুক্ত সৌরমাস [(১)-স্তম্ভে দেখানো হইয়াছে]। যদিও দুইটি ক্রমিক রাশিদ্বয়ের অংশ ৩০°, কিন্তু সূর্যের গতি সমপরিমাণ নয় থাকায় সৌরমাসের দিনমান স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র। কিন্তু এই সংক্রান্তি গণনা নিরয়ণ (sidereal)। সায়ন (tropical) সংক্রান্তির অর্থ অন্যরূপ হইবে। ক্রান্তিবৃত্তের মহাবিষুব বিন্দুর উপর যখন সূর্যের কেন্দ্র আসিবে তখন শুরু হইবে মেষ-সংক্রান্তি। মহাবিষুবের অয়নচলন সম্বন্ধে পূর্বেই বলিয়াছি, এবং মেষাদি তাহা হইতে উপস্থিত ২৩ অংশ ১৫ কলা (২১শে মার্চ, ১৯৫৬) ক্রান্ত্যংশে অবস্থিত আছে। মেষাদির অয়নাংশ বছরে ৫০″·২৭ (বিকলা) করিয়া বাড়িয়া যাইবে।

'সাহা পঞ্জিকা-সংস্কার কমিটি' এই সংক্রান্তি গণনা কিভাবে করিয়াছেন তাহা পরে বলিতেছি।

অধিমাস মলমাস ও ক্ষয়মাস

মিটন-চক্রের বর্ণনাকালে আমরা দেখিয়াছি যে, ২৩৫টি চান্দ্র মাসে ১৯টি চান্দ্রবৎসর ও ৭টি অধিবর্ষ (অর্থাৎ ত্রয়োদশমাসীবর্ষ), যেহেতু ২৩৫ = ১৯ × ১২ + ৭, এবং বিস্তারিত তালিকা সাহায্যে কিরূপে অধিবর্ষ ফেলিতে হয় তাহাও পরীক্ষা করিয়াছি। বর্ষমান বিভিন্ন মতে ধরিয়া আমরা দেখিব যে, উনিশ বর্ষচক্রের উক্ত ৭টি অধিবর্ষে ৭টি মলমাসের যোগ করিলে বর্তমান হিসাবে ভুল সর্বাপেক্ষা কম হইবে।

	সূর্যসিদ্ধান্তমতে (দিন)	আধুনিক নাক্ষত্রবর্ষ মতে (দিন)	আধুনিক সৌরবর্ষ মতে (দিন)
বর্ষমান	৩৬৫.২৫৮৭৫৬	৩৬৫.২৫৬৩৬১	৩৬৫.২৪২১৯৫
চান্দ্রমাস	২৯.৫৩০৫৮৮	২৯.৫৩০৫৮৮	২৯.৫৩০৫৮৮
১৯ বৎসর =	৬৯৩৯.৯১৬৩৬	৬৯৩৯.৮৬৮৯৬	৬৯৩৯.৬০১৭১
২৩৫ চান্দ্রমাস (= ১৯ × ১২ + ৭) =	৬৯৩৯.৬৮৮১৮	৬৯৩৯.৬৮৮১৮	৬৯৩৯.৬৮৮১৮
১৯ বর্ষচক্রে ভুলের মান	−০.২২৮১৮	−০.১৮০৭৮	+০.০৮৬৪৭

অতএব, আধুনিক সৌরবর্ষ ধরিলে ভুল কম হইবে, কিন্তু নাক্ষত্রবর্ষ ধরিলে ভুল তদপেক্ষা অধিক এবং সূর্যসিদ্ধান্ত মতে বর্ষমান লইলে ভুল সর্বাপেক্ষা বেশি। এই ভুল (০.০৮৬৪৭) ১১½টি ১৯-বর্ষ চক্রে ১ দিন। সহজেই দেখা যায় যে, গড়ে ৩২½টি সৌরমাস অন্তর একটি করিয়া মলমাস পড়ে*;

---

* $\frac{১৯ \times ১২}{২৩৫}$ = .৯৭০২, এবং $\frac{৩২\frac{১}{২}}{৩৩\frac{১}{২}} = \frac{৬৫}{৬৭}$ = .৯৭০১

অর্থাৎ, ৩২ সৌরমাস অন্তর ১টি চান্দ্রমাস এবং তৎপরে ৩৩ সৌরমাস অন্তর আর ১টি চান্দ্রমাস যোগ করিলেও চলে।

আমাদের দেশে চান্দ্রমাস দুই রকমে ধরা হয়— অমান্ত ও পূর্ণিমান্ত। এক অমাবস্যা হইতে পরবর্তী অমাবস্যা পর্যন্ত কাল অমান্ত মাস বা মুখ্য চান্দ্রমাস, এবং এক পূর্ণিমা হইতে পরবর্তী পূর্ণিমা পর্যন্ত কাল পূর্ণিমান্ত মাস বা গৌণ চান্দ্রমাস। যদি কোনো সৌরমাসের প্রারম্ভে প্রথম অমাবস্যা পড়ে তবে ঐ চান্দ্রমাসের নাম সৌরমাসের নামানুযায়ী হয়। যদি কোনো সৌরমাস ঐ চান্দ্রমাসকে সম্পূর্ণ অন্তর্ভুক্ত করে, অর্থাৎ ঐ সৌরমাসের প্রারম্ভে ও শেষে দুটি অমাবস্যা হয় তাহা হইলে প্রথম অমান্ত হইতে যে চান্দ্রমাস শুরু হইয়াছিল তাহাকে অধিক বা মলমাস বলিতে হইবে, এবং দ্বিতীয় অমান্ত হইতে যে অব্যবহিত পরবর্তী চান্দ্রমাস শুরু হইল তাহাকেই নিয়মিত [শুদ্ধ—নিজ (সিদ্ধান্ত মতে)] চান্দ্রমাস গণ্য করিতে হইবে। সৌরমাসের যে নাম এই উভয় চান্দ্রমাসের তাহাই নাম হইবে— প্রথমটি মলমাস, দ্বিতীয়টি শুদ্ধমাস। মলমাসে ধর্মকর্ম শাস্ত্রীয় বলিয়া গণ্য নয়। পক্ষান্তরে, কোনো চান্দ্রমাস যদি এরূপ দীর্ঘতর হয় যে একটি সৌরমাসকে সম্পূর্ণ ঢাকিয়া ফেলে এবং উক্ত সৌরমাসের মধ্যে যদি কোনো অমাবস্যা না হয়, তবে উক্ত চান্দ্রমাসকে ক্ষয়মাস বলিতে হইবে। গৌণ চান্দ্রমাস মুখ্য চান্দ্রমাসের ১৫ দিনের আগে আরম্ভ হয়, এজন্য উহা পূর্ববর্তী সৌর-মাসের শেষার্ধের যে-কোনো দিনে আরম্ভ হইয়া ইষ্ট সৌরমাসের প্রথমার্ধে শেষ হয়।

শংকর বালকৃষ্ণ দীক্ষিতের মতে হিন্দু পঞ্জিকা সৃষ্টির তিনটি যুগ। প্রথম, বৈদিক যুগ [অনৈতিহাসিক প্রাচীনকাল হইতে ১৩৫০ পূর্ব-খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত]; দ্বিতীয়, বেদান্ত-জ্যোতিষ যুগ [১৩৫০ পূর্ব-খ্রীষ্টাব্দ হইতে ৪০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত]; এবং, তৃতীয়, সিদ্ধান্ত-জ্যোতিষ যুগ [৪০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত]। সিদ্ধান্ত-জ্যোতিষ যুগের প্রারম্ভে মলমাস ও ক্ষয়মাস চন্দ্র-

সূর্যের 'গড়-গতি' হইতে নির্ধারিত হইত, এজন্য ক্ষয়মাসের উৎপত্তি (সংজ্ঞানুসারে) অসম্ভব ছিল। কিন্তু গত ১১০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে উহাদের 'প্রকৃত গতি'র উপর ভিত্তি করিয়া চান্দ্রমাস গণ্য করায় ক্ষয়মাসের উৎপত্তি হইয়াছে এবং অধিক মাসগুলি অনিয়মিত কালব্যবধানে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। এখন দেখা যায় যে, পৌষ মাস ব্যতীত অন্য যে-কোনো মাস মলমাস হইতে পারে, এবং অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘ এই তিন মাসই ক্ষয়মাস হইতে পারে।

আধুনিক গণনা অনুসারে শকাব্দ** ১৪৭৭ হইতে ১৯০২ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে মলমাস কোন্‌গুলি তাহা দেখানো গেল।

শকাব্দ	খ্রীষ্টাব্দ	মলমাস	শকাব্দ	খ্রীষ্টাব্দ	মলমাস
১৮৭৭	১৯৫৫-৫৬	ভাদ্র	১৮৯১	১৯৬৯-৭০	আষাঢ়
১৮৮০	১৯৫৮-৫৯	শ্রাবণ	১৮৯৪	১৯৭২-৭৩	বৈশাখ
১৮৮৩	১৯৬১-৬২	জ্যৈষ্ঠ	১৮৯৬	১৯৭৪-৭৫	ভাদ্র
১৮৮৫	১৯৬৩-৬৪	কার্তিক ও চৈত্র (অগ্রহায়ণ : ক্ষয়)	১৮৯৯	১৯৭৭-৭৮	শ্রাবণ
১৮৮৮	১৯৬৬-৬৭	শ্রাবণ	১৯০২	১৯৮০-৮১	জ্যৈষ্ঠ

** মধ্যএশিয়া হইতে শকগণ আসিয়া পার্থিয় রাজ্য ব্যাকট্রিয়া আক্রমণ করে ১২৯ পূর্ব-খ্রীষ্টাব্দে এবং তাহারা ১২৩ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে উহা দখল করে। ড. সাহার মতে শকাব্দ ঐ সময় হইতে শুরু হয়। কণিষ্কের সময় পুরাতন শকাব্দ গুলিতে ২০০ সংখ্যাটির উল্লেখ দেখা যায় না, এজন্য ২০১ শকাব্দ (পুরাতন) = ১ শকাব্দ (নূতন), অর্থাৎ কণিষ্কের সময় হইতে শকাব্দ নবরূপ লইয়াছে এবং ১ শকাব্দ = ৭৯ খ্রীষ্টাব্দ এইরূপ গণনা করিতে হইবে। শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণ পঞ্জিকাগণনায় শকাব্দ ব্যবহার করিত, এবং তাহার পর হইতে ফল্য জ্যোতিষেও উহা স্থান পায়। এজন্য আজ পর্যন্ত পঞ্জিকায় শকাব্দ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

এ বিষয়ে শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত তাঁহার 'Ancient Indian Chronology' পুস্তকে লিখিতেছেন : Thus we see that the hypothesis that the era of King Kaniṣka was started from Dec. 25 of 79 A.D. or from

হিন্দুর পঞ্জিকা

দৃশ্যমান্ জগতের কেন্দ্রস্থলে পৃথিবী নিশ্চল অবস্থায় আছে এবং সূর্য গ্রহরূপে উহার চারিদিকে ভ্রমণ করিতেছে— হিন্দু এই ধারণা লইয়া জ্যোতিষ বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছে। সূর্যের বৃত্তাকার কক্ষকে দ্বাদশটি ভাগে (প্রত্যেক ভাগ ৩০°) বিভক্ত করিয়া মেষাদি দ্বাদশটি রাশির স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে ; ইহার পূর্বে তাহারা ঐ কক্ষকে ২৭ (বা ২৮টি) অশ্বিন্যাদি নক্ষত্র-বিভাগে বিভক্ত করিয়াছিল— এক এক দিনে স্থূলতঃ চন্দ্রের এক এক নক্ষত্রভাগ এইরূপ ধারণা বর্তমান ছিল। মেষাদির আদি বিন্দু বিভিন্ন যুগে নক্ষত্রচক্রের বিভিন্ন স্থানে ধরিয়াছিল। সূর্যসিদ্ধান্তের শেষ-মতে (৫৭০ খ্রীষ্টাব্দ) রেবতী নক্ষত্রে ('জিটা পিসিয়ম') অশ্বিন্যাদি আদিবিন্দু ধরা হয়, এবং ঐ স্থানে মহাবিষুব বিন্দুটি যেন নিশ্চলভাবে আছে এরূপ কল্পনা লইয়া জ্যোতিষের চর্চা চলিতে থাকে— ইহাই 'নিরয়ণ' গণনা রূপে প্রচলিত। হিন্দু অয়নচলন সম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টি দেয় নাই। হিন্দুর সৌরবৎসর ও নাক্ষত্র বৎসরে কোনো প্রভেদ নাই। সূর্যসিদ্ধান্তের প্রথম মতে মেষাদির আদিবিন্দু ৪৯৯ খ্রীষ্টাব্দে (আর্যভট) মহাবিষুবের সহিত সংলগ্ন ছিল, দ্বিতীয় মতে ৫২২ খ্রীষ্টাব্দে ও ভাস্করাচার্যের ('সিদ্ধান্তশিরোমণি') মতে ৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে, ও সূর্যসিদ্ধান্তের শেষমতে ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে। কাহারও কাহারও মতে মহাবিষুববিন্দু চিত্রাতারা (আল্ফা ভার্জিনিস) হইতে ১৮০° দূরে ছিল। সে যাহাই হউক, উপস্থিত সমস্যা এইগুলি—

---

the year 2 of the Śaka era, satisfies all the conditions that arise from the dates given in the Kharoṣṭhī inscriptions, Group B, of Dr. Konow (p. 227).

* Report of the Calendar Reforms Committee, পৃ ২৫০

তারিখ	সপ্তাহ বার	ইংরাজী তারিখ	সূর্যের ক্রান্ত্যাংশ প্রাতে ৫½ ঘ. সময়ে			সূর্যোদয়		সূর্যাস্ত		তিথি				
										ক্রমিক নং		অন্ত-সময়		ক্রমিক নং
		১৯৫৭ খৃঃঅঃ	°	'	"	ঘ.	মি.	ঘ.	মি.			ঘ.	মি.	
১	শুক্র	মার্চ ২২	১	৬	১৮	৬	৪	১৮	১০	কৃ.	৭	২১	৫২	১৮
২	শনি	২৩	২	৫	৪৯		৩		১০		৮	২৩	২৫	১৯
৩	রবি	২৪	৩	৫	১৯		২		১১		৯	২৫	৩০	২০
৪	সোম	২৫	৪	৪	৪৬		২		১১		১০	২৭	৫৪	২১
৫	মঙ্গল	২৬	৫	৪	১২	৬	০		১২		১১	—	—	২২
৬	বুধ	২৭	৬	৩	৩৬	৫	৫৯	১৮	১২	কৃ.	১১	৬	২৫	২৩
৭	বৃহ	২৮	৭	২	৫৯		৫৮		১২		১২	৮	৫৩	২৩
৮	শুক্র	২৯	৮	২	১৯		৫৭		১৩		১৩	১১	১০	২৪
৯	শনি	৩০	৯	১	৩৭		৫৬		১৩		১৪	১৩	১০	২৫
১০	রবি	৩১	১০	০	৫৪		৫৫		১৪	কৃ.	৩০	১৪	৫৯	২৬
১১	সোম	এপ্রি ১	১১	০	৮	৫	৫৪	১৮	১৪	শু.	১	১৬	৬	২৭
১২	মঙ্গল	২	১১	৫৯	২১		৫৩		১৪		২	১৬	৫৯	১
১৩	বুধ	৩	১২	৫৮	৩১		৫২		১৫		৩	১৭	২৮	২
১৪	বৃহ	৪	১৩	৫৭	৩৯		৫১		১৫		৪	১৭	৩১	৩
১৫	শুক্র	৫	১৪	৫৬	৪৫		৫০		১৫		৫	১৭	৭	৪
১৬	শনি	৬	১৫	৫৫	৪৮	৫	৪৯	১৮	১৬	শু.	৬	১৬	১৪	৫
১৭	রবি	৭	১৬	৫৪	৫০		৪৮		১৬		৭	১৪	৫৩	৬
১৮	সোম	৮	১৭	৫৩	৪৯		৪৮		১৬		৮	১৩	৫	৭
১৯	মঙ্গল	৯	১৮	৫২	৪৫		৪৭		১৭		৯	১০	৫০	৮
০	বুধ	১০	১৯	৫১	৩৯		৪৬		১৭		১০	৮	১৪	৯
											(১১	২৯	২১)	
১	বৃহ	১১	২০	৫০	৩১	৫	৪৫	১৮	১৮	শু.	১২	২৬	১৯	১০
২	শুক্র	১২	২১	৪৯	২১		৪৪		১৮		১৩	২৩	১৬	১১
৩	শনি	১৩	২২	৪৮	৯		৪৩		১৮		১৪	২০	২০	১২
														(১৩
৪	রবি	১৪	২৩	৪৬	৫৪		৪২		১৯	শু.	১৫	১৭	৩৯	১৪
৫	সোম	১৫	২৪	৪৫	৩৮		৪১		১৯	কৃ.	১	১৫	২৩	১৫
৬	মঙ্গল	১৬	২৫	৪৪	১৯	৫	৪০	১৮	১৯		২	১৩	৪০	১৬
৭	বুধ	১৭	২৬	৪২	৫৯		৩৯		২০		৩	১২	৩৬	১৭
৮	বৃহ	১৮	২৭	৪১	৩৬		৩৯		২০		৪	১২	১৫	১৮
৯	শুক্র	১৯	২৮	৪০	১৩		৩৮		২১		৫	১২	৩৯	১৯
০	শনি	এপ্রি ২০	২৯	৩৮	৪৭	৫	৩৭	১৮	২১	কৃ.	৬	১৩	৪৬	২০

দ্র° যাবতীয় সময়, ভারতীয় স্ট্যাণ্ডার্ড ঘড়িতে ৮২½

নক্ষত্র নাম	অস্ত-সময় ঘ.	অস্ত-সময় মি.	সৌর মাস	চান্দ্র মাস	সূর্যের সংক্রমণ কাল	নৈসর্গিক ঘটনা
ষ্ঠা	১৭	১				
লা	১৯	০				
র্বাষাঢ়া	২১	৩১		চান্দ্র ফাল্গুন		
ত্তরাষাঢ়া	২৪	২৩				
বণা	২৭	২৩				
নিষ্ঠা	—	—				
„	৬	২১				
তভিষা	৯	৯				৮. বৈধৃতি
ূ. ভাদ্রপদা	১১	৪১			৯. রবি রেবতীতে	(২৪ঘ. ৫৪মি.)
. ভাদ্রপদা	১৩	৫৪	চৈত্র		(২৭ঘ. ২৬ মি.)	১০. অমাবস্যা
রবতী	১৫	৪৫				(১৪ঘ. ৪৯মি.)
শ্বিনী	১৭	১৪				
রণী	১৮	২০				
ৃত্তিকা	১৯	০				
রোহিণী	১৯	১৪				
গশিরা	১৯	০				
আর্দ্রা	১৮	১৮				২১.-ব্যতিপাত
ুনর্বসু	১৭	৮				(১৫ঘ. ২মি.)
ষ্যা	১৫	৩৪		চান্দ্র চৈত্র		
শ্লেষা	১৩	৩৯				
ঘ	১১	৩০			২৩. মেষাদি	
. ফাল্গুনী	৯	১৩			(১৬ ঘ. ২৮মি)	
. ফাল্গুনী	৬	৫৮			২৩-আশ্বিনীতে	২৪. পূর্ণিমা
স্ত	২৮	৫৩)				
ত্রা	২৭	৮			(১৬ঘ. ৪০ মি.)	(১৭ঘ. ৩৯মি.)
াতী	২৫	৫১				
শাখা	২৫	৯				
নুরাধা	২৫	৯	সৌর বৈশাখ			
্যেষ্ঠা	২৫	৫২				
লা	২৭	১৮			৩০. বৃষে	
র্বাষাঢ়া	২৯	২২			(১৪ঘ. ১২মি.)	

পর্বানুষ্ঠানাদি

১—ভারতীয় নববর্ষ দিবস।
২—শীতলাষ্টমী, বর্ষীতপারম্ভ (জৈন
৬—পাপমোচনী একাদশী, উন্মীল মহাদ্বাদশী।
৮—বারুণী (২ঘ. ৯ম. পর্যন্ত)।
১১—নবরাত্রারম্ভ।
১৩—গৌরী তৃতীয়া, দোলাৎ আন্দোলন তৃতীয়া, সৌভা শয়নব্রত, সরহুল (বিহার)।
১৫—শ্রীপঞ্চমী (লক্ষ্মী)।
১৬—অশোকষষ্ঠী (বাংলা), স্কন্দ (উৎকল), অলি আরম্ভ (জৈন
১৭—বাসন্তীপূজা (বাংলা)।
১৮—অন্নপূর্ণাপূজা (বাংলা), ভবা উৎপত্তী, অশোকাষ্টমী, রামনব (স্মার্ত), রামজয়ন্তী।
১৯—বামনবমী (বাংলায় ও স বৈষ্ণবদের)।
২০—ধর্মরাজদশমী, কামদা একাদ (গান্ধার্বা)।
২১—কামদা একাদশী (বাংলায় বৈষ্ণবদের সর্বত্র), দোলোৎস বামনদ্বাদশী, মদনদ্বাদশী, বি দমনোৎসব।
২২—পংগুনি উত্তিরম-ন (দাক্ষিণাত্য), অনঙ্গত্রয়োদ মহাবীরজয়ন্তী (জৈন)।
২৩—মদনভঞ্জী, শিবদমনক (উৎকল বিষ্ণুদমনক (উৎকল), বহুগবি (আসাম) বৈশাখী বিষু (টি বা চৈরাওবা (মণিপুর), চড়কপূ (বাংলা)।
২৪—হনুমৎজয়ন্তী, অলিরঅ (জৈন), পংগুনি উত্তিরম-পূর্ণি (দাক্ষিণাত্য)।

গ্রী পূর্ব দ্রাঘিমার মধ্যরেখা ধরিয়া গণ্য করিতে হইবে

ক. সূর্যমার্গের কোন্ বিন্দুতে মেষাদির প্রারম্ভ জানা না থাকিলে যদি আজকে মাঘ মাসের কোন্ তারিখ জানিতে হয় তবে সূর্য কোন্ রাশির কোন্ অংশে আছে জানিতে হইবে; এজন্য 'আদিবিন্দু'র জ্ঞান অপরিহার্য। যাবতীয় পাঁজিতে আজ যে ২রা মাঘ তাহা নাও হইতে পারে। এজন্য বৈষয়িক কর্ম ও লোকব্যবহারে অসুবিধা আছে।

খ. এক এক রাশির 'সংক্রমণ' সময়ে লোকে পুণ্যকৃত্য করিয়া থাকে, যথা শুক্ত, জলপূর্ণ ঘটদান ইত্যাদি; অদিনে কৃত্যকর্ম করিলে কোনো ফল হইবে না। এ ধারণা হিন্দুর মজ্জাগত।

গ. 'তিথি'-গণনায় মেষাদিবিন্দুর বালাই নাই বটে— কারণ ইহা সূর্য-চন্দ্রের আপেক্ষিক গতির উপর নির্ভর করে— কিন্তু সকল পাঁজিতে তিথির ঐক্য না থাকিলে বিষম বিভ্রাট। আবার, বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন পাঁজিতে বিভিন্ন তিথি নির্দেশ করিতে পারে।

ঘ. 'তিথি'র ভুলে তিথির অর্ধাংশ 'করণে' ভুল হইবে। নক্ষত্র-গণনায় ভুল হইলে (চন্দ্রের ক্রান্ত্যংশ ভুল হইলে) 'যোগে'ও ভুল হইবে। পঞ্জিকাগুলির মধ্যে ঐক্য থাকিবে না।

ঙ. 'মলমাসের' গণনায় ভুল থাকিলে ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তির কষ্টের অবধি থাকে না। চান্দ্রমাস নৈসর্গিক, কিন্তু সৌরমাস কৃত্রিম। সৌরমাসের প্রারম্ভ (সংক্রান্তি গণনায়) ভুল হইলে চান্দ্রমাসের নাম বিভিন্ন হইতে পারে।

আষাঢ় মাসে পুরীতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা হয়। একবার বাংলার পাঁজিতে আষাঢ় মাস মলমাস ছিল না, উৎকলের পাঁজিতে ছিল। মহাসমারোহে বাঙালী রথযাত্রী পুরীধামে গিয়া হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিল। এজন্য প্রদেশভেদে কালভেদ হইলে বিষম বিড়ম্বনা।

চ. বিবাহাদি শুভকর্মে 'লগ্নে'র আবশ্যক হয়। ঘড়িতে নির্দিষ্ট যে সময়ের লগ্ন খুঁজিতে হইবে সেই সময়ে ক্ষিতিজে কোন্ রাশির উদয় জানিতে হয়। ক্রান্ত্যংশ ধরিতে দুই এক ডিগ্রি তফাত হইলে

রাশিচক্রস্থ রাশির যে অংশ ক্ষিতিজে উঠিবে তাহার ভুল হইতে পারে। গণকেরা আবার রাশির হোরা (অর্দ্ধেক), নবাংশ, দ্বাদশাংশ, ত্রিশাংশ প্রভৃতি গণনা করেন— পাঁজিতে রাশির লগ্ন ভুল হইলে সবই ভুল হইল।

কাজেই বৈষয়িক ও আনুষ্ঠানিক পঞ্জিকা অংশদ্বয়ের সংস্কার আবশ্যক হইয়াছে। অনেক নিরয়ণ পন্থাবলম্বী পঞ্জিকাকারগণ 'সংস্কার' অর্থে কহিয়াছেন "বৈজ্ঞানিক কৌতূহল নিবারণ" বা "মানসিক ঔৎসুক্য নিবৃত্তি"। তাঁহাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, অসত্যের প্রতি মানুষের কৌতূহল হইতে পারে না অথবা মানসিক ঔৎসুক্য নিবৃত্ত হইতে পারে না। প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ কোথাও লিখেন নাই যে, সায়ন বা দৃক্‌সিদ্ধমত অগ্রাহ্য এবং নিরয়ণ অদৃক্‌সিদ্ধ তিথিতে ধর্মকর্ম বিধেয়।

পঞ্জিকাসংস্কার-কমিটির প্রস্তাব

ক. বৈষয়িক ভাগ

১. সম্মিলিত ভারতীয় পঞ্জিকায় 'শকাব্দ' ব্যবহৃত হইবে। খ্রীষ্টাব্দ ১৯৫৭-৫৮এর অনুরূপ শকাব্দ ১৮৭৯, অথবা ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের অনুরূপ শকাব্দ ১৮৭৮-৭৯। জ্যোতিষে শকাব্দার প্রচলন আমাদের দেশে বহুদিনব্যাপী, এজন্য ইহার নবপ্রচলন কর্তব্য।

২. মহাবিষুবের পরের দিন হইতে সৌরবৎসরের প্রারম্ভ হইবে।

৩. সাধারণ ব্যবহারিক (civil) বৎসর ৩৬৫ দিনে, অধিবর্ষ ৩৬৬ দিনে হইবে। শকাব্দায় ৭৮ যোগ করিলে যদি যোগফল ৪ দ্বারা বিভাজ্য হয় তাহা হইলে এই শকাব্দ অধিবর্ষ (leap year) হইবে; কিন্তু ঐ যোগফল যদি ১০০ দ্বারা বিভাজ্য হয় তাহা হইলে উহা সাধারণ বৎসর হইবে এবং ৪০০ দ্বারা বিভাজ্য হইলে ঐ শকাব্দ অধিবর্ষ হইবে। উদাহরণ স্থলে, শকাব্দ ১৮৭৮, ১৮৮২, ১৮৮৬ ইত্যাদি ৩৬৬ দিনের অধিবর্ষ;

শকাব্দ ২০২২, ২১২২, ২২২২ অধিবর্ষ নয়, কিন্তু শকাব্দ ১৯২২, ২৩২২, ২৭২২ প্রত্যেকটিই অধিবর্ষ।

৪. ১লা চৈত্র বর্ষারম্ভ (পূর্বে ছিল ১লা বৈশাখ)। বৎসরের বিভিন্ন মাসের দিনসংখ্যা নিম্নে বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হইল—

চৈত্র (৩০ দিন; অধিবর্ষ হইলে ৩১ দিন), বৈশাখ (৩১ দিন), জ্যৈষ্ঠ (৩১ দিন), আষাঢ় (৩১ দিন), শ্রাবণ (৩১ দিন), ভাদ্র (৩১ দিন), আশ্বিন (৩০ দিন), কার্তিক (৩০ দিন), মার্গশীর্ষ: অগ্রহায়ণ (৩০ দিন), পৌষ (৩০ দিন), মাঘ (৩০ দিন), ফাল্গুন (৩০ দিন)। এই দিনসংখ্যার বৎসরে বৎসরে কোনো পরিবর্তন হইবে না।

৫. ভারতীয় পঞ্জী ও গ্রেগরীয় পঞ্জীর মধ্যে চিরন্তন সাদৃশ্য হইবে এইরূপ—

ভারতীয় পঞ্জী		গ্রেগরীয় পঞ্জী
১লা চৈত্র	সাধারণ বর্ষে	২২শে মার্চ
	অধিবর্ষে	২১শে মার্চ
১লা বৈশাখ		২১শে এপ্রিল
১লা জ্যৈষ্ঠ		২২শে মে
১লা আষাঢ়		২২শে জুন
১লা শ্রাবণ		২৩শে জুলাই
১লা ভাদ্র		২৩শে আগস্ট
১লা আশ্বিন		২৩শে সেপ্টেম্বর
১লা কার্তিক		২৩শে অক্টোবর
১লা অগ্রহায়ণ		২২শে নভেম্বর
১লা পৌষ		২২শে ডিসেম্বর
১লা মাঘ		২১শে জানুয়ারী
১লা ফাল্গুন		২০শে ফেব্রুয়ারী

৬. উক্ত সংশোধিত পঞ্জিকায় ঋতুগুলির মাস এইরূপ হইবে—

ঋতু	পঞ্জিকাধৃত মাস
গ্রীষ্ম	বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ
বর্ষা	আষাঢ় ও শ্রাবণ
শরৎ	ভাদ্র ও আশ্বিন
হেমন্ত	কার্তিক ও অগ্রহায়ণ
শিশির : শীত	পৌষ ও মাঘ
বসন্ত	ফাল্গুন ও চৈত্র

এই পঞ্জিকা কার্যকরী করিতে হইলে যে সমস্ত পঞ্জিকা এখন চলিতেছে তাহাদের তারিখগুলি ২৩ দিন আগাইয়া আনিতে হইবে। উপস্থিত পঞ্জিকাগুলিতে নববর্ষ ১লা বৈশাখে আরম্ভ (গ্রেগরীয় পঞ্জীর ১৪ই এপ্রিল)। ২৩ দিন আগাইয়া দিলে ২২শে মার্চ পাই, কিন্তু দেশীয় পঞ্জিকায় ৮ই চৈত্র হয়। উহাকে ১লা চৈত্র ধরিতে হইবে, অর্থাৎ চৈত্র মাসের ৭ দিন গত হইলে নবপঞ্জিকা অনুসারে ৮ই চৈত্রের স্থানে ১লা চৈত্র হইবে।*

খ. আনুষ্ঠানিক ভাগ

১. সৌরমাস মহাবিষুবের ২৩ অংশ ১৫ কলা পূর্ব হইতে আরম্ভ হইবে, অর্থাৎ ঐ বিন্দুতে সূর্য আসিলে চৈত্রমাস আরম্ভ হইবে (কারণ মেষাদির সূচনা অয়নাংশ ২৩ অংশ ১৫ কলা)। এই ব্যবস্থায় পঞ্জিকা-কারগণের ব্যবহৃত মেষাদির সহিত অনৈক্য হইবে না। অর্থাৎ বিশদরূপে লিখিতে গেলে মাসগুলির আরম্ভ সূর্যের নিম্নলিখিত ক্রান্ত্যংশ (longitude) সময়ে হইবে—

* পোপ ত্রয়োদশ গ্রেগরী যেরূপ ৪ঠা অক্টোবরের পরের দিন (১০ দিন বাদ দিয়া) ১৫ই অক্টোবর ঘোষণা করিয়াছিলেন, আমাদের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুকেও ৭ই চৈত্রের (বঙ্গাব্দ ১৩৬৩) পরদিন ১লা চৈত্র (১৮৭৯ শকাব্দ) বলিয়া ঘোষণা করিতে হইবে।

বিশদরূপে লিখিতে গেলে মাসগুলির আরম্ভ সূর্যের নিম্নলিখিত ক্রান্ত্যংশ (longitude) সময়ে হইবে—

বৈশাখ	২৩° ১৫′	কার্তিক	২০৩° ১৫′
জ্যৈষ্ঠ	৫৩° ১৫′	মার্গশীর্ষ	২৩৩° ১৫′
আষাঢ়	৮৩° ১৫′	পৌষ	২৬৩° ১৫′
শ্রাবণ	১১৩° ১৫′	মাঘ	২৯৩° ১৫′
ভাদ্র	১৪৩° ১৫′	ফাল্গুন	৩২৩° ১৫′
আশ্বিন	১৭৩° ১৫′	চৈত্র	৩৫৩° ১৫′

এখানে পঞ্জিকায় প্রচলিত চিরাচরিত প্রথার সহিত সংগতি আছে।

২. আচরিত প্রথা অনুযায়ী ধর্মকৃত্যের জন্য চান্দ্রমাসগুলির শুরু হইবে প্রতিমাসের অমাবস্যার পরক্ষণ হইতে এবং যে সৌরমাসে এই অমাবস্যা পড়িবে সেই মাসের নামানুসারে চান্দ্রমাসের নামও অনুরূপ হইবে। যদি কোনো সৌরমাসে দুইটি অমাবস্যা পড়ে তবে প্রথম অমাবস্যার পর হইতে শুরু যে চান্দ্রমাস তাহাই অধিকমাস বা মলমাস হইবে এবং দ্বিতীয় অমাবস্য হইতে শুরু চান্দ্রমাসটি শুদ্ধ বা নিজমাস হইবে।

৩. খ্রীষ্টীয় ১৯৫৬ সালের ২১শে মার্চ মেষাদির অয়নাংশ ২৩ অংশ ১৫ কলা ধরা হইয়াছে, এজন্য নক্ষত্রগুলি প্রত্যেকে ১৩ অংশ ২০ কলা স্থান অধিকার করায় উহাদের অবস্থিতি ঐ তারিখ হইতে খ্রীষ্টীয় ১৯৫৭ সালের ২১শে মার্চ পর্যন্ত স্থির আছে; কিন্তু বছরে ৫০″·২৭ বিকলা অয়নাংশের বৃদ্ধি হইলে অশ্বিন্যাদির ক্রান্ত্যংশও ঐ হারে বৃদ্ধি পাইবে, যদি অশ্বিন্যাদিকে স্থির রাখা যায়। আমরা কিন্তু অশ্বিন্যাদির অয়নাংশ ২৩ অংশ ১৫ কলা স্থির রাখিয়া এক গতিশীল নক্ষত্রচক্রের পরিকল্পনা করিয়াছি। এজন্য কোন্ সময়ে চন্দ্র কোন্ নক্ষত্র (১৩°২০′ স্থান ব্যাপী) হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবে অথবা কোন্ সময়ে সূর্য উহাতে প্রবেশ করিবে তাহা প্রতি বৎসর গণনা করিয়া বসাইতে হইবে।

এইরূপ পদ্ধতি অবলম্বনে মহাবিষুব সংক্রান্তি, উত্তরায়ণ সংক্রান্তি, দক্ষিণায়ন সংক্রান্তিগুলি প্রকৃত ঋতুর সহিত সংযুক্ত হইবে এবং ধর্মকৃত্য নির্ভুল ঋতুতেই অনুষ্ঠিত হইবে; কিন্তু বর্তমান প্রথা অনুসারে চান্দ্রমাস মলমাসাদির গণনা অপরিবর্তিত থাকায় ঋতু হইতে অনুষ্ঠানগুলির দিনক্ষণ বিচলিত হইবার সম্ভাবনা আর রহিল না।

পঞ্জিকাকারগণ অয়নচলন বর্জন করায় ধর্মানুষ্ঠানগুলি ১৪০০ বৎসর পূর্বে যে যে তারিখে হইত তাহা হইতেছে বটে কিন্তু ঋতুপর্যায় ২৩ দিন আগাইয়া আসায় অনুষ্ঠানগুলির উপস্থিত ঋতুর সহিত সংগতি থাকিতেছে না। অতএব, বর্তমান নিয়মের সহিত চলিত নিয়মের বিশেষ কোনো ব্যতিক্রম হইতেছে না।

৪. বৈষয়িক ব্যাপারের জন্য উজ্জয়িনীর সন্নিকটবর্তী একটি কেন্দ্রীয় স্থান ধরা হইয়াছে যাহার দ্রাঘিমা ৮২°½ পূ. এবং অক্ষাংশ ২৩°১১′। মধ্যরাত্রি হইতে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত সময়কে (অহোরাত্র) 'দিন' বলিতে হইবে, কিন্তু ধর্মকৃত্যের জন্য স্থানীয় সূর্যোদয়ে দিনের শুরু ধরিতে হইবে।

৫. যাবতীয় গণনা চন্দ্র ও সূর্যের চলমান ক্রান্ত্যংশ (longitude) হইতে লইতে হইবে। তাহা হইলেই ইহা দৃক্‌সিদ্ধানুযায়ী হইবে।

পঞ্জিকা-সংস্কার কমিটির অন্যান্য প্রস্তাবের মধ্যে দুইটি বিষয় অতি প্রয়োজনীয়—

ক. সূর্য, চন্দ্র, গ্রহগণের অবস্থিতি পূর্বাহ্নে যাহাতে জানিতে পারা যায় এরূপ একখানি ইংরাজী নাবিক পঞ্জিকার ন্যায় 'ভারতীয় এফিমেরিস ও নাবিক পঞ্জিকা' প্রকাশনের ভার ভারত সরকারকে লইতে হইবে, এবং কমিটির প্রস্তাবানুসারে সৃষ্ট ভারতীয় পঞ্জিকা (ব্যবহারিক ও আনুষ্ঠানিক) প্রতি বৎসরে উক্ত নাবিক পঞ্জিকার সহিত প্রতি বৎসর প্রকাশিত হইতে থাকিবে।

খ. দ্বিতীয়তঃ, যাহাতে আধুনিক যন্ত্রপাতি, সাজ-সরঞ্জাম, কাল-

পরিমাপক যন্ত্র, দূরবীক্ষণাদি সম্বলিত একটি মানমন্দির কোনো উপযুক্ত স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয় অবিলম্বে তাহার বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

উপসংহার

বরাহমিহিরের 'সূর্যসিদ্ধান্ত', আর্যভটের 'আর্ধরাত্রিকা', ব্রহ্মগুপ্তের 'খণ্ডখাদ্যক' ভুলক্রমে বৎসরের মান ৩৬৫.২৫৮৭৫৬ দিন ধরিয়াছিল, উহা বিশুদ্ধ 'নাক্ষত্র বৎসর' অপেক্ষা '০০২৩৯৪ দিন বেশি এবং বিশুদ্ধ 'সৌরবৎসর' অপেক্ষা '০১৬৫৬০ দিন বেশি। তৎপূর্বে, পৈতামহ সিদ্ধান্তের বর্ষমান ছিল ৩৬৫.৩২৬৯ দিন, এবং তারও পূর্বে বেদাঙ্গজ্যোতিষে ধৃত বর্ষমান ছিল ৩৬৬ দিন। সকলেই ভূকেন্দ্রিক পরিকল্পনার (geocentric theory) উপর জ্যোতিষিক তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কপার্নিকাসের (Copernicus: ১৪৭৩-১৫৪৩ খ্রীষ্টাব্দ) সূর্য কেন্দ্রীয় সত্য (heliocentric theory) চারশত বৎসর পূর্বে আবিষ্কৃত ও জগতে গৃহীত হইয়াছে। পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিদদের সাড়ে চার হাজার বছরের উপর লাগিয়াছিল (খৃঃ পূঃ ৩০০০ হইতে ১৫৮২ খৃঃ অঃ পর্যন্ত কাল) প্রকৃত সৌরবর্ষের মান (৩৬৫.২৪২৫ দিন) নির্ণয় করিতে; অল্‌বত্তানী (al-Battani) প্রভৃতি আরবীয় পর্যবেক্ষকের গণনার ফলে ইরানীয় জ্যোতির্বিদ্‌গণ ওমর খৈয়মের (১০৭২ খ্রীষ্টাব্দ) সময়ে প্রকৃত বর্ষমানের সন্ধান পাইয়াছিলেন, কিন্তু ভারত পিছাইয়া ছিল। ভারতের রাষ্ট্রজগত হইতে ইংরাজ বিদায় নিয়াছে বটে কিন্তু ইংরাজ তথা পাশ্চাত্য প্রগতিশীল জাতি-লব্ধ বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলি যদি ভারত গ্রহণ না করে তবে স্বাধীনতা পাইয়াও জাতিকে অন্ধকারে ফেলিয়া রাখিলে জাতির সাংস্কৃতিক উন্নতিকে বাধা দেওয়া হয়। তাই ভারতের প্রধানমন্ত্রী নেহরু বলিতেছেন: "ভারতসরকার এই পঞ্জিকা-সংস্কার কমিটিকে

যে কার্যভার ন্যস্ত করিয়াছে তাহা সংক্ষেপতঃ এই যে, কমিটির প্রধান কর্তব্য হইবে প্রথমতঃ ভারতে যে বিভিন্ন পঞ্জিকা প্রচলিত আছে তাহার যথাযথ পরীক্ষা করা এবং দ্বিতীয়তঃ যাহাতে বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী অবলম্বনে এক অদ্বিতীয় সম্মিলিত বিশুদ্ধ পঞ্জিকা প্রণয়ন করিতে পারা যায় সরকারকে তৎসম্বন্ধে এক সুসংবদ্ধ পরিকল্পনা দাখিল করা। আমাদের দেশে যে উপস্থিত ত্রিশটি বিভিন্ন পঞ্জিকার প্রচলন আছে তাহাদের মধ্যে নানারূপ অনৈক্য বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং তাহাতে কালনির্ণয়ের পদ্ধতিও (methods of time-reckoning) বিভিন্ন প্রকারের। এই পঞ্জিকাগুলি আমাদের অতীতের রাষ্ট্রীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনের ইতিহাস বহন করিতেছে, এবং বলিতে গেলে, অংশতঃ, আমাদের দেশের অতীতকালের রাষ্ট্রীয় বিভাগগুলিও নির্দেশ করিয়া দিতেছে। কিন্তু, এখন আমাদের দেশে স্বাধীনতা আসিয়াছে, এজন্য প্রচলিত পঞ্জিকাগুলির মধ্যে এমন একটি মিল ও সামঞ্জস্য থাকা প্রয়োজন যাহাতে আমাদের নাগরিক, সামাজিক প্রভৃতি জীবনেও একটা ঐক্য বজায় থাকে, এবং সেই সম্মিলিত পঞ্জিকা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর গড়িয়া উঠে ও দৃক্‌সিদ্ধ হয়। স্বীকার করি যে, এতাবৎ 'গ্রেগরী-পঞ্জী' দ্বারা আমরা চালিত হইয়া আসিতেছি, কারণ পৃথিবীর নানা সভ্যদেশে উহার সমাদর হইয়াছে, এজন্য গ্রেগরী-পঞ্জী দৈনন্দিন জীবনে অপরিহার্য সন্দেহ নাই ; কিন্তু ইহার বহু গুণ থাকা সত্ত্বেও ইহাতে ত্রুটিও আছে যথেষ্ট এবং বিশ্বপঞ্জী হইবার পক্ষে ইহা অদ্যাপি সন্তোষজনক হয় নাই। আমি জানি যে, লোকে যে পঞ্জিকায় অভ্যস্ত হইয়া পড়ে তাহার রদবদল হইলে গোলোযোগে পড়িবে, কারণ উহাতে সামাজিক ব্যবহার বিচলিত হইবে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও পঞ্জিকাসংস্কারের প্রচেষ্টা হওয়া বাঞ্ছনীয়। বর্তমানে ভারতে প্রচলিত আমাদের পঞ্জিকাগুলির মধ্যে যেসব বিশৃঙ্খলা দেখা যাইতেছে তাহার অপসারণ করা আশু প্রয়োজন হইয়াছে। আমি আশা করি যে, এ সম্পর্কে

আমাদের দেশের বিজ্ঞানীরা সঠিক দিকৃদর্শন উপস্থিত করিয়া দেশের ও দশের কল্যাণ সাধনে উদ্যোগী হইবেন !*

সাহা-পঞ্জিকা-সংস্কার কমিটির স্থিরসিদ্ধান্ত এই যে, যেহেতু উপস্থিত দেশীয় পঞ্জিকামতে বৎসরে '০১৬৫৬ দিন বর্ষারম্ভ আগাইয়া আসিয়াছে এবং সিদ্ধান্ত-যুগ হইতে আজ পর্যন্ত ১৪০০ বৎসরে ২৩'২ দিন আগাইয়াছে এজন্য ১লা বৈশাখ ২২শে মার্চ (মহাবিষুব) আরম্ভ না হইয়া ১৩ই বা ১৪ই এপ্রিল আরম্ভ হইতেছে। সায়ন-গণনা অবলম্বনে এজন্য মহাবিষুবের পরের দিন হইতে (৮ই চৈত্র) বর্ষারম্ভ ধরাই বাঞ্ছনীয়। উহাই ১লা চৈত্র রূপে নব্যশকাব্দের বছরের প্রথম দিন। এই নবপঞ্জিকায় যদি শকাব্দই গৃহীত হইল তবে সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি যুগ, শ্বেতবরাহকল্প প্রভৃতি অনৈতিহাসিক সুদীর্ঘ যুগের তালিকা ও নানা বচনের কোনো আবশ্যকতা রহিল না। দেশ যখন গণতন্ত্রের অধীন, তখন বুধ রাজা শনি মন্ত্রী ইত্যাদি রাজা অধিপতি প্রভৃতি অবান্তর বিষয় ও তাহাদের দেবত্ব প্রভৃতির গুণাগুণ বর্ণনা এবং রোগ শোক ভয় মহামারী শস্যবৃদ্ধি দুর্ভিক্ষ বাণিজ্য সুখ প্রভৃতি সম্বন্ধে অবৈজ্ঞানিক কতকগুলি ঘোষণা করিয়া মানুষকে অনর্থক বিভ্রান্ত করিবার কোনো প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না।

পঞ্জিকার সঙ্গে ফল্যজ্যোতিষ ঢুকাইয়াও কোনো ফল নাই। তবে যেসব মানুষের মনে হয় যে, ধর্মকৃত্যের আবশ্যতা আছে তাঁদের জন্য পঞ্জিকায় আনুষ্ঠানিক দিন-ক্ষণ-তিথি সন্নিবিষ্ট থাকা উচিত। স্মার্তমত বর্জন করা অত সহজে হয় না। এজন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রে প্রচলিত ধর্মানুষ্ঠানের দিনগুলি যথাযথ সন্নিবিষ্ট করা উচিত। স্বামী কন্নু পিল্লাই রচিত ***An Indian Ephemeris***, এবং নিরয়ণ-সিন্ধু, ধর্ম-সিন্ধু, বৈদ্যনাথ-

* Report of the Calendar Reform Committee.

দীক্ষিতীয়ম্, তিথিতত্ত্বম্, উৎকলকলিকা, তন্ত্র ও পুরাণ প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থ অবলম্বনে এই নবপঞ্জিকায় পর্বতারিখ ও বিভিন্ন ধর্মকৃত্যের তারিখগুলি দেওয়া হইয়াছে। কতকগুলির দিন-সন্নিবেশ চান্দ্র-পঞ্জিকার সাহায্যে করিতে হইবে, কতকগুলির সৌর-পঞ্জিকার সাহায্যে। চৈত্র-শুক্ল হইতে অমান্ত চান্দ্রমাস আরম্ভ করিয়া এই ধর্মানুষ্ঠানগুলির তারিখ ঘোষণা করা হইয়াছে।

অনেকে হয়তো মুখে বলিবেন যে, পঞ্জিকা-সংস্কার হইতেছে, বাঁচা গিয়াছে— হাঁচি-টিকটিকি, কালবেলা-বারবেলা, যোগিনী দিক্‌শূল, ত্র্যহস্পর্শ, অশ্লেষা-মঘা দেশছাড়া হইতেছে এবার দেশের মঙ্গলই হইবে। এঁদের মধ্যে যে সকলেই materialistic, অবিশ্বাসী এবং অহিন্দু তাহা নয়। কেহ ভাবিতেছেন স্মৃতি ও ধর্মশাস্ত্র মিথ্যা হয় না। বিশুদ্ধ দিনক্ষণ নির্ধারিত হইয়া যে পাঁজি আসিতেছে তাহা স্মৃতির ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হইয়া যে নবকলেবর লাভ করিবে তাহাতে বোধ হয় মানুষের জীবনে ফলাফল ভালোই হইবে। তবে মঙ্গলের ঊষা বুধে পা, মাহেন্দ্র ও অমৃত যোগ, যোগ-যোগিনী যতই বর্জন করিয়া সরল পঞ্জিকার অনুশাসন মানিয়া চলা যায় ততই সভ্যজগতের উত্তরোত্তর জটিল কর্মজীবনের পক্ষে মঙ্গল।

আগামী নববর্ষের প্রথম মাস চৈত্র মাসের পাঁজিটি কিরূপ হইবে তাহার একটি নমুনা দেওয়া হল—পৃ ৫৬-৫৭।

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

॥ ১৩৫০ বৈশাখ হইতে নিয়মিত প্রকাশিত হইতেছে ॥

প্রতি গ্রন্থ আট আনা

১। সাহিত্যের স্বরূপ ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। চতুর্থ মুদ্রণ
২। কুটিরশিল্প ॥ শ্রীরাজশেখর বসু। চতুর্থ মুদ্রণ
৩। ভারতের সংস্কৃতি ॥ শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী। চতুর্থ মুদ্রণ
*৪। বাংলার ব্রত ॥ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তৃতীয় মুদ্রণ
*৫। জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার ॥ শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য। তৃতীয় মুদ্রণ
৬। মায়াবাদ ॥ মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ। তৃতীয় মুদ্রণ
৭। ভারতের খনিজ ॥ শ্রীরাজশেখর বসু। তৃতীয় মুদ্রণ
*৮। বিশ্বের উপাদান ॥ শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য। তৃতীয় মুদ্রণ
৯। হিন্দু রসায়নী বিদ্যা ॥ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। দ্বিতীয় মুদ্রণ
*১০। নক্ষত্র-পরিচয় ॥ শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত। তৃতীয় মুদ্রণ
*১১। শারীরবৃত্ত ॥ ডক্টর রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল। তৃতীয় মুদ্রণ
১২। প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী ॥ ডক্টর সুকুমার সেন। দ্বিতীয় মুদ্রণ
*১৩। বিজ্ঞান ও বিশ্বজগৎ ॥ শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়। তৃতীয় মুদ্রণ
১৪। আয়ুর্বেদ-পরিচয় ॥ মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন। দ্বিতীয় মুদ্রণ
১৫। বঙ্গীয় নাট্যশালা ॥ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃতীয় মুদ্রণ
*১৬। রঞ্জনদ্রব্য ॥ ডক্টর দুঃখহরণ চক্রবর্তী। দ্বিতীয় মুদ্রণ
১৭। জমি ও চাষ ॥ ডক্টর সত্যপ্রসাদ রায়চৌধুরী। দ্বিতীয় মুদ্রণ
১৮। যুদ্ধোত্তর বাংলার কৃষি ও শিল্প ॥ ডক্টর কুদরত-এ-খুদা। দ্বিতীয় মুদ্রণ
১৯। রায়তের কথা ॥ প্রমথ চৌধুরী। দ্বিতীয় মুদ্রণ
২০। জমির মালিক ॥ শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত
২১। বাংলার চাষী ॥ শ্রীশান্তিপ্রিয় বসু। দ্বিতীয় মুদ্রণ
২২। বাংলার রায়ত ও জমিদার ॥ ডক্টর শচীন সেন। দ্বিতীয় মুদ্রণ
২৩। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ॥ শ্রীঅনাথনাথ বসু। তৃতীয় মুদ্রণ
২৪। দর্শনের রূপ ও অভিব্যক্তি ॥ শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য। দ্বিতীয় মুদ্রণ
২৫। বেদান্ত-দর্শন ॥ ডক্টর রমা চৌধুরী। দ্বিতীয় মুদ্রণ
২৬। যোগ-পরিচয় ॥ ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার। দ্বিতীয় মুদ্রণ
২৭। রসায়নের ব্যবহার ॥ ডক্টর সর্বাণীসহায় গুহসরকার। দ্বিতীয় মুদ্রণ

* সচিত্র

*২৮। রমনের আবিষ্কার ॥ ডক্টর জগন্নাথ গুপ্ত। দ্বিতীয় মুদ্রণ
*২৯। ভারতের বনজ ॥ শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু। দ্বিতীয় মুদ্রণ
৩০। ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাস ॥ রমেশচন্দ্র দত্ত
৩১। ধনবিজ্ঞান ॥ শ্রীভবতোষ দত্ত। দ্বিতীয় মুদ্রণ
*৩২। শিল্পকথা ॥ শ্রীনন্দলাল বসু। দ্বিতীয় মুদ্রণ
৩৩। বাংলা সাময়িক সাহিত্য ॥ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৪। মেগাস্থেনীসের ভারত-বিবরণ ॥ শ্রীরজনীকান্ত গুহ
*৩৫। বেতার ॥ ডক্টর সতীশরঞ্জন খাস্তগীর। দ্বিতীয় মুদ্রণ
৩৬। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ॥ শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ
৩৭। হিন্দু সংগীত ॥ প্রমথ চৌধুরী ও শ্রীইন্দিরা দেবী
৩৮। প্রাচীন ভারতের সংগীত-চিন্তা ॥ শ্রীঅমিয়নাথ সান্যাল
৩৯। কীর্তন ॥ অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র
*৪০। বিশ্বের ইতিকথা ॥ শ্রীসুশোভন দত্ত
৪১। ভারতীয় সাধনার ঐক্য ॥ ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত। দ্বিতীয় মুদ্রণ
৪২। বাংলার সাধনা ॥ শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী। দ্বিতীয় মুদ্রণ
৪৩। বাঙালী হিন্দুর বর্ণভেদ ॥ ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়
৪৪। মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী ॥ ডক্টর সুকুমার সেন
৪৫। নব্যবিজ্ঞানে অনির্দেশ্যবাদ ॥ শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত
*৪৬। প্রাচীন ভারতের নাট্যকলা ॥ ডক্টর মনোমোহন ঘোষ
৪৭। সংস্কৃত সাহিত্যের কথা ॥ শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী
৪৮। অভিব্যক্তি ॥ শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর
*৪৯। হিন্দু জ্যোতির্বিদ্যা ॥ ডক্টর সুকুমাররঞ্জন দাশ
৫০। ন্যায়দর্শন ॥ শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য সপ্ততীর্থ শাস্ত্রী
৫১। আমাদের অদৃশ্য শত্রু ॥ ডক্টর ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৫২। গ্রীক দর্শন ॥ শ্রীশুভব্রত রায় চৌধুরী
৫৩। আধুনিক চীন ॥ থান য়ুন শান
৫৪। প্রাচীন বাংলার গৌরব ॥ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
*৫৫। নভোরশ্মি ॥ ডক্টর সুকুমারচন্দ্র সরকার
৫৬। আধুনিক য়ুরোপীয় দর্শন ॥ শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
*৫৭। ভারতের বনৌষধি ॥ ডক্টর অসীমা চট্টোপাধ্যায়
৫৮। উপনিষদ্ ॥ মহামহোপাধ্যায় শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী
৫৯। শিশুর মন ॥ ডক্টর সুখেনলাল ব্রহ্মচারী। দ্বিতীয় মুদ্রণ
৬০। প্রাচীন ভারতে উদ্ভিদ্‌বিদ্যা ॥ ডক্টর গিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার

* সচিত্র

* সচিত্র

* সচিত্র

চর্যাগীতি

তারাপদ মুখোপাধ্যায়



বি শ্ব ভা র তী
কলিকাতা

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ : ১৩১

প্রকাশ বৈশাখ ১৩৭২ : ১৮৮৭ শক

মূল্য এক টাকা

প্রকাশক শ্রীকানাই সামন্ত

বিশ্বভারতী। ৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

মুদ্রক শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড। ৫ চিন্তামণি দাস লেন। কলিকাতা ৯

২.১

এই পুস্তিকায় আছে চর্যাগীতির পুথি ভাষা এবং লিপি সম্বন্ধে কিছু অনুমান, কিছু প্রমাণ এবং কিছু জ্ঞাত তথ্য। গানগুলির ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে আমার কোনো বক্তব্য নেই। এই দুর্বোধ্য তত্ত্বকথার যেটুকু সাধারণের বোধগম্য করে বলা যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তা বলেছেন। বিস্তৃত পরিচয়ের জন্য দ্রষ্টব্য শশিভূষণ দাশগুপ্ত-রচিত ***Obscure Religious Cults*** এবং D. L. Snellgrove -এর ***Hevajra-Tantra***। কবি-পরিচয় পাওয়া যাবে শাস্ত্রীর 'বৌদ্ধগান ও দোহা'য় এবং শ্রীসুকুমার সেনের 'চর্যাগীতিপদাবলী'তে। ভাষার বিস্তৃত আলোচনা আছে বর্তমান লেখকের ***The Old Bengali Language and Text***-এ।

লিপি সম্বন্ধে আলোচনাটি অন্যান্য প্রসঙ্গের তুলনায় একটু বেশি বিস্তৃত। তার কারণ, চর্যাগীতের লিপি সম্বন্ধে অনেকের ধারণা স্পষ্ট নয়, তাই চর্যার পুথির প্রত্যেকটি অক্ষরকে বাংলা পুথির অক্ষরের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হয়েছে। অন্য আর একটা উদ্দেশ্যও ছিল, অক্ষর-গঠন দেখে যদি পুথির লিপিকাল সম্বন্ধে কোনো আভাস পাওয়া যায়।

চর্যার পুথির ছবিগুলি পেয়েছি শ্রীযুক্ত সুকুমার সেনের কাছ থেকে। এই ছবিগুলি না পেলে লিপি-সম্পর্কিত আলোচনার অনেকখানি বাদ পড়ত।

প্রাচীন বাংলাভাষার এই মূল্যবান্ দলিলখানি শ্রদ্ধার সঙ্গে খুঁটিয়ে পড়তে গিয়ে যে কথাগুলি আমার মনে এসেছে সেগুলি আমি এই পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ করেছি। এগুলি যদি অন্য কোনো জিজ্ঞাসুর মনে জিজ্ঞাসা জাগায় তা হলে কৃতার্থ হব।

স্কুল অব্ ওরিয়েন্টাল্ অ্যাণ্ড্ আফ্রিকান স্টাডিজ,
লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়

তারাপদ মুখোপাধ্যায়

স্বর্গত সুধীরকুমার দাশগুপ্ত'র স্মরণে

উনবিংশ শতাব্দীর আগে আমাদের জানা ছিল না যে মহাযান বৌদ্ধধর্মের ভিত্তিতে বাংলা-মগধ-নেপাল-তীব্বতে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম নামে এক বিরাট ধর্মসম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল এবং এই সম্প্রদায়ের অসংখ্য শাস্ত্রগ্রন্থ নেপাল এবং তীব্বতে সংরক্ষিত আছে। Brian Hodgson নামে একজন ইংরেজ সর্বপ্রথম নেপাল থেকে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের অনেকগুলি পুঁথি আবিষ্কার করেন এবং সেগুলি বিভিন্ন প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেওয়া হয় পরীক্ষা করে দেখবার জন্য। এই পুঁথিগুলির ভিত্তিতে বৌদ্ধধর্মের পরবর্তীকালের ইতিহাস অনেকখানি গড়ে তুলতে পারা গেছে। এ-কাজ ব্যাপকভাবে প্রথম করেন Eugène Burnouf তাঁর *Introduction à l'histoire du Buddhisme Indien* (Parish 1844) গ্রন্থে।[১]

Hodgson-এর আবিষ্কারের ফলে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস রচনা এবং শাস্ত্রগ্রন্থ সম্পাদনার দিকে যেমন প্রাচ্য-পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞদের তৎপরতা দেখা দেয় তেমনি নেপাল-তীব্বতে পুঁথি সংগ্রহের কাজও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।[২] Hodgson-এর পর Daniel

১. Hodgson নিজেও তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের পুঁথিগুলির বিষয়ানুক্রমিক বিবরণ প্রকাশ করেছিলেন, দ্রষ্টব্য Notices of the Languages, Literature, and Religion of Nepál and Tibet, *Asiatic Researches,* Vol. XVI, p. 409, 1828.

২. Hodgson সংগৃহীত যে-পুঁথিগুলি লণ্ডনের এশিয়াটিক সোসাইটিতে আছে তার তালিকা প্রস্তুত করেন E. B. Cowell এবং J. Eggeling; এই তালিকা সোসাইটির জার্নালে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ সালে। Hodgson-সংগ্রহের যে পুঁথিগুলি কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত আছে তার তালিকা এবং বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করেন রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র *Nepal Buddhist Literature,* Calcutta 1882, গ্রন্থে।

Wright[১] নামে আর একজন ইংরেজ নেপাল থেকে অনেকগুলি মূল্যবান পুথি সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য।

Hodgson-Wright-এর পরে আধুনিক কাল পর্যন্ত বহু বিশেষজ্ঞ নেপালে গিয়েছেন পুথির সন্ধানে। এঁদের মধ্যে এ-আলোচনায় উল্লেখ-যোগ্য দুইজন— Cecil Bendall এবং মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। Bendall তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের পুথির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন অনেক আগে থেকেই। তাঁর ক্যাটালাগের বিবরণ লিখতে গিয়ে এই জাতীয় যাবতীয় জ্ঞাত পুথির খবর তিনি সংগ্রহ করেছিলেন। Bendall ১৮৯৭ সালে নেপাল গিয়ে 'সুভাষিতসংগ্রহ' নামে একখানি পুথি নিয়ে আসেন। পুথিখানি বাংলা অক্ষরে লেখা, ভাষা প্রধানত সংস্কৃত, বিষয় বৌদ্ধতান্ত্রিক ধর্মব্যাখ্যান। ১৯০৫ সালে Bendall 'সুভাষিতসংগ্রহ'[২] পুথিখানি অতি যত্ন-পরিশ্রম-সতর্কতার সঙ্গে সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন। 'সুভাষিতসংগ্রহ' প্রকাশিত হওয়ার ফলে একটা "নূতন ভাষা"-র নিদর্শন প্রথম ছাপার অক্ষরে দেখতে পাওয়া গেল। এই "নূতন ভাষা"-র অস্তিত্বের সংবাদ আগেই জানিয়েছিলেন Wassiliew;[৩] কিন্তু ছাপার অক্ষরে ইংরেজি অনুবাদ এবং ব্যাকরণ-গত টীকা-ব্যাখ্যা-সহযোগে তা পাওয়া গেল 'সুভাষিতসংগ্রহ'-এ। এই গ্রন্থে বাংলাভাষার অব্যবহিত পূর্বরূপ অবহট্টে রচিত আঠাশটি দোহা উদ্ধৃত হয়েছিল। এই জাতীয় অবহট্টের সঙ্গে এর আগে আর কারও পরিচয় ঘটে নি বলে এই আঠাশটি দোহার

১. Wright সংগৃহীত পুথিগুলির বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য C. Bendall, *Catalogue of Buddhist Sanskrit Manuscripts in the University Library of Cambridge*, Cambridge, 1883. সংগৃহীত সব পুথির বিবরণ এতে নেই।

২. *Subhāṣita-Saṃgraha*, ed. Cecil Bendall, "Muséon" Nouvelle série, iv-v, 1905

৩. W. Wassiliew, *Der Buddhismus*, St. Petersburg, 1860

ভাষা বিশেষজ্ঞদের বিভ্রান্ত করেছিল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী একে "নূতন ভাষা" বলেছেন,[১] Bendall একে বলেছেন, "difficult Apabhramsa Prakrit"[২] ; এই অবহট্টকেই হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বাংলা বলে অনুমান করেছিলেন। 'সুভাষিতসংগ্রহ' প্রকাশের আর একটি গুরুত্ব এই : এই গ্রন্থে উদ্ধৃত দোহাগুলির বিশুদ্ধ পাঠ ঠিক করতে তিব্বতী অনুবাদের সাহায্য নেওয়া হয়েছিল।

Hodgson নেপাল থেকে কেবলমাত্র তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের পুথিই আবিষ্কার করেন নি। তিনি আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছিলেন যার ফলে পরবর্তীকালের বিশেষজ্ঞরা তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের জটিলতাকে কিছু পরিমাণে সরল করতে পেরেছিলেন। অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতক পর্যন্ত তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের বহু শাস্ত্রগ্রন্থ তিব্বতী ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। এই অনুবাদগুলি দুই শ্রেণীর গ্রন্থে সংরক্ষিত আছে, এক শ্রেণীর নাম কাঞ্জুর, অন্য শ্রেণীর নাম তাঞ্জুর। কাঞ্জুর এবং তাঞ্জুরকে একাধিকভাগে ভাগ করবার রীতি আছে। একটি রীতি এইরকম—কাঞ্জুর— ১৩ খণ্ড বিনয়, ২১ খণ্ড প্রজ্ঞাপারমিতা, ৪৪ খণ্ড মহাযানসূত্র, ২২ খণ্ড তন্ত্র, মোট গ্রন্থসংখ্যা ১০০। তাঞ্জুর— প্রজ্ঞাপারমিতা এবং মহাযানসূত্রের টীকা ১৩৭ খণ্ড, তন্ত্রের টীকা ৮৬ খণ্ড ; মোট গ্রন্থসংখ্যা ২৪৩। ১৭০৩ সালে কাঞ্জুর এবং তাঞ্জুর পুথির আকারে কাগজের উপর কাঠের ব্লকে প্রথম ছাপা হয়েছিল তিব্বতে। Hodgson নেপাল থেকে দুই কপি করে কাঞ্জুর এবং তাঞ্জুর সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন। অচিরেই এই গ্রন্থরাজির গুরুত্ব এবং উপযোগিতা উপলব্ধি করে বিশেষজ্ঞরা তাঞ্জুর এবং কাঞ্জুর-এর বিস্তৃত বিবরণ এবং তালিকা প্রকাশ করেন। এই কাজ প্রথম শুরু করেন একজন হাঙ্গেরিয়ান্ পণ্ডিত A. Csoma de

১. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বৌদ্ধগান ও দোহা, কলিকাতা ১৩২৩, মুখবন্ধ পৃ. ৫

২. Bendall, *Subhāṣita Saṃgraha,* p. 1

Körös, ইনি Hodgson-সংগৃহীত কাঞ্জুর এবং তাঞ্জুর-এর তালিকা এবং বিশ্লেষণ প্রকাশ করেন ১৮২০ সালে[১]। Körös-এর এই তালিকা ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন L. Feer। পরবর্তীকালে আরও অনেকে তাঞ্জুর-কাঞ্জুরের তালিকা প্রকাশ করেছিলেন। তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত যে-কোনো আলোচনায়— ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা বা শাস্ত্রগ্রন্থসম্পাদনা— কাঞ্জুর-তাঞ্জুর-এর সাহায্য ছাড়া কোনো বিশেষজ্ঞই এক পা অগ্রসর হতে পারে নি। পদে পদে তীব্বতী অনুবাদের সাহায্য তাঁদের নিতে হয়েছে। Bendall 'সুভাষিতসংগ্রহ' সম্পাদনাকালে উদ্‌ধৃত দোহাগুলির পাঠ-বিভ্রাট তীব্বতী অনুবাদের সাহায্যে কিছু পরিমাণে মীমাংসা করতে পেরেছিলেন।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এশিয়াটিক সোসাইটির পুথিসংগ্রহের কাজে নিযুক্ত হয়ে তিনবার নেপাল গিয়েছিলেন। ১৮৯৭-৯৮ সালে দুইবার, ১৯০৭ সালে আর-একবার। শাস্ত্রীর প্রথমবার নেপাল যাওয়ার আগেই তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের অনুসন্ধিৎসা দেখা দিয়েছে। Bendall, Cowell-Eggeling এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্রের তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের পুথির বিবরণ এবং তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। তারানাথের বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসকে অংশত ভিত্তি করে লেখা Wassiliew-এর বইও প্রকাশিত হয়েছে (শাস্ত্রী এই বই-এর খবর জানতেন)[২]; Körös -এর কাঞ্জুর-তাঞ্জুর-এর তালিকা (এবং কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় Wilson-এর সে-সম্পর্কে আলোচনা) এবং কালচক্রযান বিষয়ে লেখা প্রবন্ধ শাস্ত্রী অবশ্যই দেখে থাকবেন। তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের শাস্ত্রগ্রন্থও

১. *Asiatic Researches*, Vol. XX.

২. দ্রষ্টব্য বৌদ্ধগান ও দোহা, মুখবন্ধ পৃ. ১৯

কিছু কিছু প্রকাশিত হয়েছে[১] ; এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য Louis de la Paussin সম্পাদিত 'পঞ্চকর্ম'। শাস্ত্রীর তৃতীয়বার নেপাল যাত্রার আগেই Bendall-এর 'সুভাষিতসংগ্রহ'খানি নিশ্চয়ই তাঁর হাতে পৌচেছিল।

এই অবস্থায় ১৯০৭ সালে তৃতীয়বার নেপাল গিয়ে শাস্ত্রী তান্ত্রিকবৌদ্ধ সম্পর্কিত আরও কয়েকখানি নূতন পুথি আবিষ্কার করলেন।

"একখানির নাম 'চর্য্যাচর্য্য-বিনিশ্চয়', উহাতে কতকগুলি কীর্ত্তনের গান আছে ও তাহার সংস্কৃত টীকা আছে। গানগুলি বৈষ্ণবদের কীর্ত্তনের মত, গানের নাম 'চর্য্যাপদ'। আর একখানি পুস্তক পাইলাম—তাহাও দোহাকোষ, গ্রন্থকারের নাম সরোরুহবজ্র, টীকাটি সংস্কৃতে, টীকাকারের নাম অদ্বয়বজ্র। আরও একখানি পুস্তক পাইলাম, তাহার নামও দোহাকোষ, গ্রন্থকারের নাম কৃষ্ণাচার্য্য, উহারও একটি সংস্কৃত টীকা আছে।"[২]

'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' ও তার সংস্কৃত টীকা, দোহাকোষ দুখানি ও টীকা দুটি এবং আগের বার নেপাল গিয়ে পাওয়া 'ডাকার্ণব'— এই চারখানি পুথি একত্রে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সম্পাদনায় ১৯১৬ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ থেকে প্রকাশিত হয় 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ-গান ও দোহা' নামে।

'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা'— এই গ্রন্থনামটির সাহায্যে সম্পাদিত পুথিগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় বিবৃত করা

---

১. জাপান থেকে সংগৃহীত তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের পুথি (অনেকগুলি পুথির প্রতিলিপি এবং Bühler-এর লিপিতত্ত্ব বিষয়ক দীর্ঘ প্রবন্ধসহ) *Anecdota Oxoniensia* নামক গ্রন্থাবলীতে Max Müller এবং Bunyiu Nanjio (দ্বিতীয় খণ্ড)-এর যুগ্মসম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে।

২. বৌদ্ধগান ও দোহা, মুখবন্ধ, পৃ. ৪

হয়েছে। পুথিগুলির ভাষা হাজার বছরের পুরাণ বাংলা ভাষা, বিষয় বৌদ্ধধর্ম, এবং পুথিগুলিতে আছে গান এবং দোহা। 'বৌদ্ধ' কথাটিকে সম্পাদক এখানে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছেন, 'বৌদ্ধ' অর্থে এখানে তান্ত্রিক বৌদ্ধ বুঝতে হবে— এ সম্পর্কে কিছু কিছু আলোচনা আগে প্রকাশিত হয়েছে; বিষয়টি একেবারে অজ্ঞাত বা অপরিচিত নয়। "দোহা"-র সামান্য কিছু নিদর্শন 'সুভাষিতসংগ্রহ'-এ ইতিপূর্বে পাওয়া গেছে। "গান"-এর নিদর্শন এর আগে পাওয়া যায় নি, শাস্ত্রীর বইতেই প্রথম পাওয়া গেল। "ভাষা" শাস্ত্রীর কাছে অবশ্যই নূতন নয়, কারণ 'সুভাষিতসংগ্রহ'-এ উদ্ধৃত "দোহা"-র ভাষাকেও তিনি বাংলা বলেই অনুমান করেছিলেন এবং "দোহা" ও "গান"-এর ভাষার পার্থক্যকেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন নি,

> "যদিও অনেকের ভাষায় একটু একটু ব্যাকরণের প্রভেদ আছে, তথাপি সমস্তই বাঙ্গালা বলিয়া বোধহয়।"[১]

এই "বাঙ্গালা ভাষা" যে হাজার বছরের পুরাণ সে সিদ্ধান্তে পৌছতে শাস্ত্রী প্রধানত "গান" ও "দোহা"-রচয়িতাদের জীবৎকালকেই প্রমাণ হিসাবে মেনে নিয়েছিলেন।

শাস্ত্রী অনেকগুলি সিদ্ধান্ত করেছিলেন, সুতরাং কোনো কোনোটিতে কিছু গোলমাল থাকা অস্বাভাবিক নয়। এই গোলমালের কথা প্রথম জানালেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।[২] তিনি "দোহা" এবং "গান"-এর ভাষা সূক্ষ্মভাবে বিচার করে সিদ্ধান্ত করলেন যে "গান"-এর ভাষা বাংলা, "দোহা"-র ভাষা আধুনিক অপভ্রংশ যার অন্য নাম অবহট্ট। তখন থেকে

---

১. বৌদ্ধগান ও দোহা, মুখবন্ধ, পৃ. ৬

২. *Origin and Development of the Bengali Language,* Calcutta University, 1926. Vol. I পৃ. ১১৪-২৩

"গান"-এর ভাষা বাংলা বলে স্বীকৃত হয়ে আসছে।[১] প্রাচীন বাংলা বলতে আমরা এই গানগুলিই বুঝি। গানগুলি এখন "চর্যাপদ" নামে পরিচিত। বৈষ্ণব পদাবলীর অনুরূপ মনে করে শাস্ত্রী গানগুলিকে কখনও "বৌদ্ধকীর্তন" কখনও বা "বৌদ্ধসঙ্কীর্তন" নামে অভিহিত করেছেন এবং সেই অনুসারে "চর্যাপদ" নামটি শাস্ত্রীরই সৃষ্টি। বৈষ্ণব পদাবলীর সঙ্গে "গান"গুলির গঠনগত সাদৃশ্য আছে ঠিকই, কিন্তু "পদ" আর "গান" সমার্থক নয়। প্রাচীনকালে শব্দদুটির পার্থক্য স্পষ্ট ছিল। "গান"-গুলির টীকা যিনি লিখেছেন তিনিও "পদ" বলতে "গান"-এর দুটি লাইনই বুঝতেন। টীকায় তাই "দ্বিতীয় পদেন", "তৃতীয় পদেন" দ্বারা গানের দ্বিতীয়, তৃতীয় couplet-কে বোঝানো হয়েছে। ধ্রুবপদকে অবশ্য টীকাকার গানের পদ হিসাবে ধরেন নি। সে যুগে "পদ" এবং "গীত" শব্দদুটির পার্থক্য বজায় ছিল বলেই কোথাও চর্যাগীতিকে "চর্যাপদ" বলা হয় নি। বহু জায়গায় "চর্যাগীতি", "দোহাগীতি", "বজ্রগীতি", "উপদেশ-গীতি" ইত্যাদির উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু "বজ্রপদ" বা "দোহাপদ" কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। সেই কারণে "চর্যাপদ" না বলে গানগুলিকে 'চর্যাগীতি' বলাই সঙ্গত।

২

শাস্ত্রী চর্যাগানের তীব্বতী অনুবাদের কথা জানতেন। কিন্তু তীব্বতী অনুবাদ তিনি ব্যবহার করতে পারেন নি।

"* * * তেঙ্গুরে এই সকল অপভ্রংশ পুস্তকের তর্জমা আছে। কিন্তু

---

১. ভাষা প্রকৃতই হাজার বছরের পুরাণ কিনা সে-বিচারে প্রবৃত্ত হয়ে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় স্থির করলেন গানগুলি ৯৫০-১২০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রচিত।—*Orig. Dev. Beng. Lang.* Vol. I পৃ. ১২৩

ভুটিয়া শিখিয়া তেঙ্গুর পড়িয়া পুস্তক ছাপান আমার পক্ষে অসাধ্য হইয়াছিল।"[১]

চর্যাগীতির তীব্বতী অনুবাদের সন্ধান প্রথম করেন স্নীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।[২] তিনি ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান্ F. W. Thomas-এর কাছ থেকে তাঞ্জুরের খোঁজ পেয়ে Cordier-এর ক্যাটালাগ এবং Jean Przyluski-র সাহায্যে তীব্বতী পুথি থেকে চর্যাগানের অনুবাদ সন্ধান করেছিলেন। এই সন্ধানের ফলে একটি চর্যাগীতের (গীতসংখ্যা ২৯) তীব্বতী অনুবাদ পাওয়া যায়।

যে-চর্যাগীতের তীব্বতী অনুবাদের খোঁজ স্নীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় পেয়েছিলেন সেই চর্যাগীতটি (গীতসংখ্যা ২৯) এবং তার তীব্বতী অনুবাদের তুলনামূলক আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিল *Indian Historical Quarterly* পত্রিকার একটি প্রবন্ধে।[৩] চর্যাগীতটির তীব্বতী অনুবাদ পাওয়া যায় সিদ্ধাচার্য "লুইপাদ" রচিত "তত্ত্বস্বভাবদৃষ্টি-গীতিকা" নামীয় পুথিতে।

"চর্যাচর্যবিনিশ্চয়" পুথিখানির তীব্বতী অনুবাদ প্রথম প্রকাশ করেন প্রবোধচন্দ্র বাগচী।[৪] পরে এই পুথিখানি প্রবোধচন্দ্র বাগচী এবং শান্তি-ভিক্ষু শাস্ত্রীর যুগ্ম-সম্পাদনায় "চর্যাগীতিকোষ" নামে[৫] প্রকাশিত হয়। তীব্বতী অনুবাদে মূল গান এবং সংস্কৃত টীকা দুইই আছে। "চর্যাচর্য-

---

১. বৌদ্ধগান ও দোহা

২. *Orig. Dev. Beng. Lang.* Vol. I পৃ. ১১৯

৩. Vol. III, ১৯২৭, পৃ. ৬৭৬-৮২

৪. Materials for a Critical Edition of the Old Bengali Caryāpadas, *Journal of the Department of Letters*, University of Calcutta, Vol. XXX. 1938.

৫. *Caryāgītikoṣa*, Visva-Bharati, 1956.

বিনিশ্চয়" পুথির কয়েকটি পাতা পাওয়া যায় নি, বিশেষ করে শেষের দিকের পাতা না থাকায় টীকাকারের নাম জানা যায় নি। তীব্বতী অনুবাদে কয়েকটি লুপ্ত চর্যাগীতের বিষয়ের আভাস পাওয়া গেল এবং জানা গেল গানগুলির টীকা লিখেছিলেন আচার্য মুনিদত্ত। পুথিখানির অনুবাদ হয়েছিল নেপালের স্বয়ম্ভূ নামক জায়গায়, অনুবাদ করেছিলেন কীর্তিচন্দ্র। অনুবাদের জায়গার নাম এবং অনুবাদকের নাম মূল পুথিতে নেই। এ-সংবাদ পাওয়া গিয়েছে Cordier-এর ক্যাটালাগ থেকে। "চর্যাগীতিকোষ-"এ তীব্বতী অনুবাদের শেষ-অংশের সংস্কৃত-ছায়া (মূল তীব্বতী পাঠও) দেওয়া আছে। তা থেকে জানা যায় যে মূলে এক শতটি চর্যাগীতির একখানি সংকলন ছিল · সেই সংকলন থেকে আচার্য মুনিদত্ত পঞ্চাশটি গীত বেছে নিয়ে টীকা লিখেছিলেন। এবং এই সটীক চর্যাগীতিগুলিও "চর্যাগীতিকোষ" এই গ্রন্থনামে অভিহিত হয়েছিল।

এখানে একটু গোলমাল আছে। Cordier-এর ক্যাটালাগে তীব্বতী অনুবাদের পুথির নাম পাওয়া যাচ্ছে "চর্যাগীতিকোষবৃত্তিনাম"; অথচ অনুবাদের মুদ্রিত পুথিতে নাম পাওয়া যাচ্ছে "চর্যাগীতিকোষ"। তীব্বতী অনুবাদক টীকাশুদ্ধই "চর্যাচর্যবিনিশ্চয়" অনুবাদ করেছিলেন তথাপি তিনি গ্রন্থখানিকে "কোষ" বলেছেন কেন? গোলমাল শুধু এইখানেই নয়।

"চর্যাচর্যরিনিশ্চয়" পুথিতে দশম চর্যাগীতিটির টীকার শেষে আছে "লাড়ীডোম্বীপাদানাম্ সুনেত্যাদি। চর্য্যায়া ব্যাখ্যা নাস্তি।" অর্থাৎ দশ নম্বরের চর্যাগীত এবং টীকার পরে লাড়ীডোম্বীপাদের একটি চর্যাগান ছিল, সে-গানটি শুরু হয়েছিল "সুণ" শব্দ দিয়ে। কিন্তু এই গীতটির "ব্যাখ্যা" নেই। মন্তব্যটি অবশ্যই মুদ্রিত "চর্যাচর্যবিনিশ্চয়" পুথির লিপিকরের। লিপিকর যে মূল পুথি দেখে নকল করেছিলেন সে-পুথিতে "ব্যাখ্যা" ছিল না, তবে চর্যাগীতটি ছিল, নতুবা লাড়ীডোম্বীপাদের

নাম তিনি জানলেন কি করে এবং গীতটি যে "সুণ" শব্দ দিয়ে শুরু হয়েছিল সে-সংবাদ তিনি সংগ্রহ করলেন কোথা থেকে? সুতরাং গানটি মূল পুথিতে ছিল, "ব্যাখ্যা" না থাকায় লিপিকর গানটিকে নকল করেন নি। এবং অনুদ্ধৃত গানটির ক্রমিক সংখ্যাটিকেও লিপিকর গণনার মধ্যে ধরেন নি। তা হলে বর্তমান লিপিকরের পুথিতে যে গানটির ক্রমিক সংখ্যা এগারো, লিপিকরের মূল পুথিতে সেটির সংখ্যা ছিল বারো। বারোকে এগারো করল কে? বর্তমান লিপিকর কিংবা মূল পুথির লিপিকর (মূল পুথি যদি টীকাকারের স্বহস্ত লিখিত হয় তা হলে টীকাকার)? কিন্তু মূল পুথির লিপিকর গানের সংখ্যা বদল করবেন কেন? তাঁর পুথিতে টীকা না থাক, গান তো ছিল। এবং গান থাকলে গানের সংখ্যা থাকবেই— এ অতি সাধারণ কথা। সুতরাং গানের সংখ্যা পরিবর্তন করেছেন মুদ্রিত "চর্যাচর্যবিনিশ্চয়" পুথির লিপিকর। তীব্বতী অনুবাদে লাড়ীডোম্বীপাদের গানটি নেই, ব্যাখ্যাও নেই, সে সম্বন্ধে কোনো মন্তব্যও নেই; এবং গানের ক্রমিক সংখ্যা ১০।১১।১২ ঠিকই আছে। এর থেকে অনুমান করা যায় যে তীব্বতী অনুবাদক যে পুথিখানি থেকে অনুবাদ করেছেন সে পুথিখানি বোধ হয় মুদ্রিত "চর্যাচর্যবিনিশ্চয়" নয়, কারণ তা হলে লিপিকরের মন্তব্যটি অনুবাদক একেবারেই অগ্রাহ্য করতেন না। মুদ্রিত "চর্যাচর্যবিনিশ্চয়"-এর পূর্ববর্তী কোনো পুথি অবশ্যই নয়, তা হলে এগারো-সংখ্যক চর্যাটি বারো, এবং বারো-সংখ্যক চর্যাটি তেরো ইত্যাদি হত। সুতরাং এ অনুমান অসঙ্গত নয় যে, তীব্বতী অনুবাদকের মূল আধুনিক পুথি। সেই আধুনিক পুথিতে মুদ্রিত পুথির লিপিকরের মন্তব্যটি ছিল না।

আবার তীব্বতী অনুবাদের পুথির পুষ্পিকায় বলা হল, একশতটি গানের কোষগ্রন্থ থেকে পঞ্চাশটি গান বেছে নিয়ে মুনিদত্ত টীকা লিখলেন। তীব্বতী অনুবাদক এ-সংবাদ কোথা থেকে সংগ্রহ

করলেন? মুনিদত্ত যদি প্রকৃতই গান বেছে থাকেন তা হলে তিনি পঞ্চাশটি গান বাছেন নি, বেছেছিলেন একান্নটি গান। গানের সংখ্যা পঞ্চাশে দাঁড়িয়েছে পরবর্তীকালের লিপিকরের সংশোধনে। মুনিদত্ত যে একান্নটি গানেরই টীকা লেখেন নি তার তো কোনো প্রমাণ নেই। মুনিদত্তের স্বহস্তলিখিত পুথিতে হয়তো একান্নটি চর্যাগান এবং তার টীকা ছিল। পরবর্তী কোনো লিপিকর হয়তো একটি গানের ব্যাখ্যা ফেলে গিয়েছিলেন এবং মুদ্রিত "চর্যাচর্যবিনিশ্চয়" পুথির লিপিকর যে গানটিকেও বর্জন করেছিলেন তার প্রমাণ তো পাওয়াই যাচ্ছে। একান্ন সংখ্যাটির তাৎপর্য আছে, সুতরাং মুনিদত্তের নিজের হাতের লেখা পুথিতে একান্নটি গানের টীকা থাকাই স্বাভাবিক। তা হলে তীব্বতী অনুবাদক যে-সংবাদ দিলেন তার ভিত্তি কি? ভিত্তি বিশেষ কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না। তবে এটুকু অনুমান করা যাচ্ছে যে, তিনি যে-পুথি দেখে অনুবাদ করেছিলেন সে-পুথি আধুনিককালের। কত আধুনিক বলা যায় না। তিব্বতী অনুবাদের সময়ও জানা যায় নি।

চর্যাগীতের তীব্বতী অনুবাদের এই একখানি পুথিই আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে বটে কিন্তু খোঁজ করলে এরকম পুথি অনেক পাওয়া যায়। Cordier-এর ক্যাটালাগে চর্যাগীতির টীকার অনেকগুলি পুথির উল্লেখ আছে। যে-পুথিগুলি চর্যাগীতের টীকা নয় সাধারণ ধর্মব্যাখ্যা, সেরকম পুথিতেও চর্যাগান উদ্‌ধৃত থাকতে পারে, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে লুইপাদের "তত্ত্বস্বভাবদৃষ্টিগীতিকা" পুথিতে।

চর্যাগীতের শুদ্ধ পাঠ ঠিক করতে তীব্বতী অনুবাদের সাহায্য নেওয়া হয়। কেউ কেউ (যেমন বাগচী-শহীদুল্লা ইত্যাদি) তীব্বতী অনুবাদের সাহায্যের উপর বড়ো বেশি নির্ভর করেছেন। তীব্বতী অনুবাদের যত মূল্যই থাক্, আসলে তা অনুবাদ ছাড়া আর কিছু নয়। অনুবাদ দিয়ে মূলের অর্থ সম্বন্ধে কিছু আভাস পাওয়া যায়, তার বেশি প্রত্যাশা করা

অনুচিত। পাঠ-নির্ধারণে তিব্বতী অনুবাদের সাহায্য নেওয়া আর গীতাঞ্জলির ইংরেজি অনুবাদের সাহায্যে বাংলা গীতাঞ্জলির পাঠ পুনর্গঠিত করতে যাওয়া একই ব্যাপার নয় কি ?

৩

"চর্যাচর্যবিনিশ্চয়" পুথিতে দশম চর্যার শেষে লিপিকরের মন্তব্যটির বিশেষ গুরুত্ব আছে। এই মন্তব্য থেকে নিশ্চিতভাবে জানা যাচ্ছে যে, পুথিখানি মুনিদত্তের স্বহস্তলিখিত নয়। অবশ্য মুনিদত্তের কত পরের পুথি সে সম্বন্ধেও কিছু আভাস পাওয়া যাচ্ছে না। আর একটি বিষয় বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, গানগুলিই লিপিকরের লক্ষ্য নয়, ব্যাখ্যাই তাঁর লক্ষ্য। লিপিকরের মূল পুথিতে ব্যাখ্যা না থাকলেও গানটিকে তিনি যথাযথ উদ্ধার করে দিতে পারতেন। তিনি লিপিকর, তার কাজ 'যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং'। লিপিকর এখানে editor-এর কাজ করতে গেলেন কেন ? এর থেকে কি এ অনুমান করা সঙ্গত যে পুথিখানি যখন নকল করা হয়েছে তখন টীকার সাহায্য ব্যতিরেকে গানগুলির অর্থোদ্ধার করা সম্ভব ছিল না এবং সেই কারণেই লিপিকর টীকাহীন গানটিকে বর্জন করেছেন ?

আরও একটি অনুমান করা যেতে পারে।

লিপিকরের সামনে দুখানি পুথি ছিল। একখানিতে শুধুই টীকা, গান নেই, আর-একখানিতে শুধুই গান, টীকা নেই। লিপিকরের কাজ ছিল এই দুখানি পুথির বস্তু একখানিতে আহরণ করা। এ অনুমান ঠিক হলে মানতে হয় মুনিদত্তের টীকার পুথিতে গান ছিল না। তিনি শুধু টীকাই লিখেছিলেন গানগুলি উদ্ধার করেন নি। তিনি গানগুলির reference দিয়েছেন পদসংখ্যা এবং পদাদিস্থিত শব্দের সাহায্যে। যেমন,

"দ্বিতীয় পদেন তমেবার্থং বদতি—
চালিঅ ইত্যাদি"

যিনি টীকা পড়বেন তিনি বুঝবেন যে টীকাকার গানের দ্বিতীয় পদটির ব্যাখ্যা লিখছেন এবং এই পদটি শুরু হয়েছে "চালিঅ" শব্দ দিয়ে। পাঠক তৎক্ষণাৎ পদটি ধরতে পারবে।

চালিঅ ষষহর গউ নিবার্ণেঁ।
কমলিনি কমল বহই পণালেঁ॥

অথবা,

ধ্রুবপদেন মার্গস্থানুশংসামাহ—
উজু ইত্যাদি

এর থেকে বোঝা গেল

উজুরে উজু ছাড়ি মা লেহু রে বঙ্ক।
নিঅড়ি বোহি মা জাহুরে লাঙ্ক॥

অথবা,

ষষ্ঠ পদেন ডোম্বিনীদ্বিধাভেদমাহ—
সরবরেত্যাদি

অর্থাৎ,

সরবর ভাঞ্জীঅ ডোম্বী খাঅ মোলাণ।
মারমি ডোম্বী লেমি পরাণ॥

এইভাবে পদের উল্লেখ করে এবং পদাদিস্থিত শব্দটি উদ্ধার করে মুনিদত্ত তাঁর টীকায় মূল গানগুলির reference দিয়েছেন। এইভাবে reference দেওয়ার রীতি তখন বেশ চালু ছিল। অদ্বয়বজ্র-কৃত সরহের দোহাকোষের টীকায় মূল দোহা উদ্ধৃত হয় নি। যে অংশের ব্যাখ্যা লেখা হয়েছে সেই অংশের প্রথম ও শেষ শব্দটি উদ্ধার করা হয়েছে মাত্র। যেমন,

বন্ধণেহিমিত্যাদিনা জানিঅ তুল্লেমিতি পর্যন্তং

অর্থাৎ "বন্ধণেহি" থেকে "তুল্লে" পর্যন্ত অংশের ব্যাখ্যা লেখা হচ্ছে। আধুনিক কালে লিখলে আমরা এইভাবে reference দিতাম "ব্রন্ধণে··· তুল্লে"।

সুতরাং টীকা লিখতে গেলে মূল গানের সম্পূর্ণ অংশ যে উদ্ধার করে দিতেই হবে, এমন কোনো কথা নেই। অদ্বয়বজ্রের টীকাই তার প্রমাণ। তবে অদ্বয়বজ্র টীকায় যেভাবে মূলের reference দিয়েছেন সেরকম reference তখনই দেওয়া সম্ভব যখন প্রথম ও শেষ শব্দ দুটি দেখে পাঠক গানের গোটা অংশটি পাঠ ধরতে পারে। অদ্বয়বজ্র "বন্ধণেহি" থেকে "তুল্লে" পর্যন্ত— এই কথাটি দিয়ে দশটি লাইনের reference দিয়েছেন। সুতরাং এই দশটি লাইনের পাঠ যদি পাঠকের কণ্ঠস্থ না থাকে তা হলে তার পক্ষে টীকার অর্থ বোঝা শক্ত। সুতরাং "দোহা" বা "গান"গুলি যখন অত্যন্ত পরিচিত এবং পাঠকের কণ্ঠস্থ তখনই এই রীতিতে reference দেওয়া সম্ভব, নতুবা নয়। সম্ভবত মুনিদত্তের টীকা-রচনার কিছুকাল পরে মুনিদত্তের reference দিয়ে গানগুলিকে আর সনাক্ত করা সম্ভব হচ্ছিল না। গানটিকে সনাক্ত করতে পারা গেলেও গোটা গানের পাঠ ঠিক ঠিক ধরা যাচ্ছিল না। গানগুলি আর আগের মতো সুপরিচিত ছিল না, পাঠকের কণ্ঠস্থও ছিল না। তাই টীকার সঙ্গে গানগুলিকে যুক্ত করবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। এবং টীকাকে গানের সঙ্গে যুক্ত করাই বর্তমান "চর্যাচর্যবিনিশ্চয়" পুথির লিপিকরের কাজ ছিল। সেইকারণে যে গানের টীকা তিনি পান নি সেটিকে তিনি বর্জন করেছেন। কারণ, গান নকল করা তাঁর কাজ নয়, টীকাকে গানের সঙ্গে যুক্ত করাই তার কাজ। সুতরাং যে-গানের টীকা নেই, সে-গানটি তাঁর কাছে বাহুল্য। এই অনুমান ঠিক হলে "চর্যাচর্যবিনিশ্চয়" পুথি সম্পর্কে একটা বড়ো গোলমালের মীমাংসা হয়।

এই পুথিতে মূল গানগুলির একরকম পাঠ, আবার টীকায় গানের উদ্ধৃতিতে আর একরকমের পাঠ। একই লিপিকরের লেখা পুথিতে একই গানের দুরকম পাঠ কি করে সম্ভব? সম্ভব এই কারণে যে, গানগুলি এক পুথি থেকে নেওয়া, টীকা আর একখানি পুথি থেকে নেওয়া। গানের পাঠ এবং টীকায় উদ্ধৃত পাঠ ভিন্ন ভিন্ন মূল থেকে এসেছে। টীকাকার গানের একরকম পাঠ জানতেন, সেই পাঠ তিনি তাঁর উদ্ধৃতির মধ্যে ধরে দিয়েছেন, গানের পুথিতে ভিন্নতর পাঠ ছিল সেই পাঠ গানগুলির মধ্যে ধরা আছে। সৌভাগ্যক্রমে লিপিকর দ্বিবিধ প্রকারের পাঠই নকল করে দিয়েছেন।

উপরে যে অনুমানের কথা বলা হল সে অনুমান ঠিক হলে অনেক গোলমালের মীমাংসা হয় ঠিকই। কিন্তু এ অনুমানের বিরুদ্ধেও প্রমাণ আছে। মুনিদত্তের পুথিতে গানগুলির মূল ছিল না বলে যদি স্বীকার করি তা হলেও প্রশ্ন থাকে মুনিদত্ত তাঁর ব্যাখ্যাত গানের প্রথম লাইনের reference কিভাবে দিয়েছেন। এবং এই reference-এর মূল্যই সবচেয়ে বেশি, কারণ প্রথম লাইন দিয়েই গানগুলিকে সনাক্ত করা হয়। "চর্যাচর্যবিনিশ্চয়" পুথিতে ১।২।৩-সংখ্যক গানের reference দেওয়া আছে এইভাবে—

১. কাআতরুবরেত্যাদি।··· সিদ্ধাচার্য শ্রীলূইপাদঃ···

কাঅতরুব্যাজেন··· রচয়িতুমাহ···

এর দ্বারা বোঝা গেল লুইপাদের "কাআ তরুবর" পদটির ব্যাখ্যা লেখা হচ্ছে।

২. ···কুক্কুরীপাদাঃ সন্ধ্যাভাষয়া প্রকটয়িতুমাহুঃ। দুলীত্যাদি বোঝা গেল কুক্কুরীপাদের "দুলি দুহি পিঠা" পদটির টীকা।

৩. ···বিরুআপাদাঃ··· প্রকটয়িতুমাহুঃ— এক সে শুণ্ডিনীত্যাদি বোঝা গেল বিরুবাপাদের "এক সে শুণ্ডিনী দুই ঘরে সান্ধঅ" পদটির টীকা।

কিন্তু প্রথম তিনটি গানের পরে প্রায় প্রত্যেকটির টীকাই শুরু হয়েছে "তমেবার্থং" শব্দ দিয়ে। "তমেবার্থং" শব্দটির "তম্" নিশ্চয়ই "গান" এর পরিবর্তে বসেছে। তা যদি হয় তা হলে গানটি পুঁথিতে না থাকলে কি করে "তম্" ব্যবহৃত হতে পারে? তা হলে কি এই অনুমান করব যে বর্তমান পুঁথির লিপিকর গানটিকেও যখন টীকার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছেন তখন তিনিই টীকার সূচনায় "তমেবার্থং" শব্দটি সংযোগ করে দিয়েছেন?

৪

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী চর্যাগানের যে পুঁথিখানি প্রকাশ করেছিলেন সেখানি নামহীন, তারিখহীন (গানগুলির রচনার তারিখ অথবা লিপির তারিখ কোনোটিই নেই) একখানি খণ্ডিত পুঁথি। তালপাতার পুঁথি, ৬৯টি পাতা, প্রতি পাতার দু দিকে পাঁচটি করে লাইন, মাঝখানে ছিদ্র। শাস্ত্রী পাতাগুলিকে ১।১ক, ২।২ক, ৩।৩ক এইভাবে সংখ্যাত করেছেন। ৩৫।৩৫ক, ৩৬।৩৬ক, ৩৭।৩৭ক, ৩৮।৩৮ক এবং ৬৬।৬৬ক— এই পাতাগুলি পাওয়া যায় নি; ফলে তিনটি গোটা গান এবং একটি গানের শেষ চারটি লাইন পাওয়া যায় নি। পুঁথিতে গানগুলি সংখ্যাত, সংখ্যাটি আছে টীকার শেষে। শাস্ত্রী পাঠকের সুবিধার জন্য গানের আগেও সংখ্যা দিয়েছেন। নামহীন পুঁথিখানিকে সম্পাদক "চর্যাচর্যবিনিশ্চয়" নাম দিয়ে প্রকাশ করেছেন। "চর্যাচর্যবিনিশ্চয়" গ্রন্থনামটি সম্ভবত শাস্ত্রী নিয়েছিলেন মূল পুঁথির প্রথমে উদ্ধৃত একটি সংস্কৃত শ্লোক থেকে। এই সংস্কৃত শ্লোকটি দিয়ে পুঁথি শুরু হয়েছে; কিন্তু মুদ্রিত গ্রন্থে সম্পাদক শ্লোকটিকে প্রথম গানটির পরে বসিয়েছেন। তাতে অনেকের ধারণা হয়েছে, সংস্কৃত শ্লোকটি দিয়ে টীকা শুরু হয়েছে। আসলে তা নয়। সংস্কৃত শ্লোকটি দিয়ে সমগ্র পুঁথিখানি শুরু হয়েছে; তাই "শ্রীলূয়ীচরণাদিসিদ্ধরচিতেঽপ্যাশ্চর্যচর্যাচয়ে" লাইনটির যে গুরুত্ব এতদিন আমরা দিয়েছি তার

চেয়ে বেশি গুরুত্ব এর প্রাপ্য। প্রথমেই লক্ষণীয় "শ্রীলূয়ীচরণাদি···" কথাটির "আদি" শব্দটি দিয়ে লুই ব্যতীত অন্যান্য আর যে-সব গীতরচয়িতার গান এই পুথিতে আছে তাদের উল্লেখ করা হয়েছে। লুই-এর গান দিয়ে পুথি শুরু হয়েছে, সে কথা ঠিক। কিন্তু সেই গানের টীকায় তো বলা হয়েছে যে রচয়িতা "সিদ্ধাচার্য শ্রীলুইপাদঃ"। সুতরাং সূচনার সংস্কৃত শ্লোকে কেবলমাত্র লুই-এর উল্লেখ কেন? সম্ভবত টীকাকার লুইকে আদিসিদ্ধাচার্য বলে জানতেন এবং টীকাতে চতুর্থপদের ব্যাখ্যায় একবার লুইকে আদিসিদ্ধাচার্য বলে উল্লেখও করেছেন, "আদিসিদ্ধাচার্যলূয়ীপাদ এবং বদতি"।

সকলে অনুমান করেছেন শাস্ত্রী "আশ্চর্যচর্যাচয়" এই কথাটির ভিত্তিতে "চর্যাচর্যবিনিশ্চয়" নামটি ঠিক করেছেন। এ অনুমানের কি কোনো ভিত্তি আছে? "আশ্চর্যচর্যাচয়" কথাটির "-চয়" বাদ দিলে থাকে "আশ্চর্যচর্যা" তার ভিত্তিতে "চর্যাচর্যবিনিশ্চয়" হয় কি করে? বাগচী বলেছেন, শাস্ত্রী পুথির পাঠ ধরতে পারেন নি। পুথির "ংত্যাশ্চায্যচর্যাচয়"-কে শাস্ত্রী, ভুল করে "ংপ্যাশ্চায্যচর্যাচয়" পড়েছেন। মূল পুথির যে জায়গায় কথাটি আছে সে জায়গার ছবি শাস্ত্রীর বইতে দেওয়া আছে। কিন্তু সেখানে "ত্য" আছে কি "প্য" আছে বলা শক্ত। যদি বাগচীর পাঠই ঠিক হয়, তাতে প্রমাণ হয় কি? অথচ বাগচী স্পষ্টই বলেছেন,···"the name chosen by Dr. Sastri was based on a wrong reading of the title"; আসলে শাস্ত্রী পুথিখানির যে নাম দিয়েছেন তা পুথির শুদ্ধ বা অশুদ্ধ পাঠের উপর নির্ভর করছে না। বিধুশেখর ভট্টাচার্য এবং প্রবোধচন্দ্র বাগচীর "আশ্চর্য" কথাটির উপর বড়ো বেশি ঝোঁক, কারণ তা হলে তীব্বতী অনুবাদের সঙ্গে সঙ্গতি থাকে, সেখানে কথাটি "very wonderful songs" বলা হয়েছে। কিন্তু "আশ্চর্য" কথাটি তো শাস্ত্রীর অজ্ঞাত ছিল না। তথাপি তিনি "চর্যাচর্য" করলেন কেন? তা আমরা

জানি না। যখন জানি না তখন কিছু না বলাই সঙ্গত। তিনি পুথির শুদ্ধ পাঠ ধরতে পারেন নি— এ অভিযোগের কথাই ওঠে না। তা ছাড়া যদি তীব্বতী অনুবাদের কথাই আনতে হয় তা হলে সেখানে তো স্পষ্টই গ্রন্থের নাম 'চর্যাগীতিকোষ' বলে দেওয়া আছে।

গানগুলিকে যে 'চর্যা' বলা হত সে কথা বহু সূত্র থেকে জানা যায়। এই পুথির একটি গানে একজন গীতরচয়িতা গানটিকে 'চর্যা' বলেছেন— "অইসনি চর্যা কুক্কুরীপাএ গাইউ"; শুধু গীতও কেউ বলেছেন, "ঢেণ্ঢণপাএর গীত বিরলে বুঝঅ"। টীকাকার বহু জায়গায় গানগুলিকে "চর্যা" বলেছেন। "বিনিশ্চয়" কথাটি অনঙ্গবজ্রের "প্রজ্ঞোপায়বিনিশ্চয়সিদ্ধি" গ্রন্থনামটিতে ব্যবহৃত হয়েছে। নামটি যদি শাস্ত্রীর গড়া হত তা হলে "বিনিশ্চয়" শব্দটি হয়তো তিনি ব্যবহার করতেন না। "চর্যাচয়" বা "আশ্চর্যচর্যাচয়" বা "চর্যাসমুচ্চয়" এই শ্রেণীর কোনো একটি নামই দিতেন। "চর্যাচর্যবিনিশ্চয়" নামটি শাস্ত্রীর নিজের গড়া ভাবতে একটু অস্বাভাবিক বোধ হয়। অনুমান করি নামটি তিনি কোথায়ও পেয়েছিলেন। হয়তো আধুনিক অক্ষরে কোথায়ও লেখা ছিল। নেপালের পুথিতে এইরকম আধুনিক অক্ষরে নাম লিখে রাখা অভাবিত ব্যাপার নয়। এর বহু দৃষ্টান্ত আছে।

৫

'চর্যা' কথাটির অর্থ কি? শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে মনে হয়। তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের বহু শাস্ত্রগ্রন্থে শব্দটির উল্লেখ আছে, কোথায়ও সাধারণ অর্থে, কোথায়ও পারিভাষিক অর্থে। তীব্বতী ভাষায় 'চর্যা' কথাটি সংস্কৃত 'আচার' কথাটির সমার্থক। সেই কারণে অসঙ্গের 'যোগাচারভূমি' গ্রন্থখানি তীব্বতে 'যোগচর্যাভূমি' নামে পরিচিত। এ সম্বন্ধে বিধুশেখর ভট্টাচার্যের মন্তব্য—"...in Tibet it ['যোগাচারভূমি'] is called *Yogacaryābhūmi (Rnal. ḥbyor. spyod. paḥi. sa)*. The

Tibetan word *spyod* may be taken also for Sanskrit *ācāra*, yet in transliteration there is always *caryā* and not *ācāra*". [১]

'চর্যা' কথাটি 'পাঠ' বা 'অধ্যয়ন' অর্থেও ব্যবহৃত হতে দেখা যায়, অন্তত Max Müller সেই অর্থে শব্দটি গ্রহণ করেছিলেন এবং 'চর্যা'-র ইংরেজি প্রতিশব্দ দিয়েছিলেন 'study'। Max Müller এবং Bunyiu Nanji ১ সম্পাদিত 'প্রজ্ঞাপারমিতাহৃদয় সূত্র' গ্রন্থে 'চর্যা'-র প্রয়োগ পাওয়া যায় এইভাবে—[২]

যঃ কশ্চিৎকুলপুত্রো গম্ভীরায়াং প্রজ্ঞাপারমিতায়াং চর্যাং
চতুর্কামঃ কথং শিক্ষিতব্যঃ

লাইনটির ইংরেজি অনুবাদে 'চর্যা' শব্দটিকে 'study' বলা হয়েছে।

আবার,

"আর্যাবলোকিতেশ্বরবোধিসত্ত্বো গম্ভীরায়াং প্রজ্ঞাপারমিতায়াং চর্যাং চরমানো ব্যবলোকয়তি স্ম"[৩]

এখানেও 'চর্যা'র অর্থ দেওয়া হয়েছে 'study', উপরের এই উদ্ধৃতি দুটিতে 'চর্যা'-কে কোনো পারিভাষিক অর্থে ব্যবহার করা হয় নি, এবং কেবলমাত্র 'চর্যা' শব্দটিই নয়, চর-ধাতু নিষ্পন্ন 'চতুর্কামঃ' এবং 'চরমানো' শব্দ দুটিও 'চর্যা'র পাশাপাশি ব্যবহৃত হয়েছে।

"হেবজ্রতন্ত্র" তান্ত্রিক বৌদ্ধদের একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ। "হেবজ্রতন্ত্র"-

---

১. দ্রষ্টব্য *The Yogācārabhūmi of Ācārya Asanga*, pt. I, ed. Vidhusekhar Bhattacharya, University of Calcutta, 1957, Introduction p. 7.

২. *Anecdota Oxoniensia*, Oxford, 1884, p. 52.

৩. ঐ পৃ. ৪৮

এর প্রথম খণ্ডের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদটির নাম "চর্যাপটল"।[১] চর্যাপটলের শুরুতে বলা হয়েছে—

অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি চর্যাং পারংগতাং বরাং
গম্যতে যেন সিদ্ধান্তং হেবজ্রে সিদ্ধিহেতুনা।

এই শ্লোকের টীকায় ("যোগরত্নমালা") টীকাকার কৃষ্ণাচার্যপাদ বলেছেন—

চর্যয়া বিনা নাস্তি শীঘ্রতরা বোধি।

এখানেও 'চর্যা'কে অপারিভাষিক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে; 'চর্যা' অর্থে বোঝানো হয়েছে যোগীর আচরণ-ব্যবহার। তবে "হেবজ্রতন্ত্রে" যোগীর আচরণ-ব্যবহারের যে বিধিনিষেধ দেওয়া আছে 'চর্যাপটলে' তা নিতান্তই বাহ্যিক আচরণ-ব্যবহার। যেমন, যোগীর কানে থাকবে "দিব্যকুণ্ডল", মাথায় "চক্রী", হাতে "রুচকদ্বয়ং" কটিতে "মেখলা", বাহুমূলে "কেয়ূর", এবং "ব্যাঘ্রচর্ম পরিধানম্"। "চর্যাপটলে" তত্ত্বকথা কিছুই নেই, তা আছে "তত্ত্বপটল" নামক পঞ্চম পরিচ্ছেদে।

"হেবজ্রতন্ত্র" গ্রন্থেই আবার তন্ত্রকে পাঁচ শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে, 'ক্রিয়া', 'চর্যা', 'যোগ', 'যোগোত্তর', 'যোগনিরুত্তর'।[২]

'চর্যা' যখন তন্ত্রের শ্রেণীবিশেষের নাম তখন নিশ্চয়ই শব্দটি পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে "বোধিসত্ত্বভূমি" নামে একখানি পুথি আছে। এই পুথির তৃতীয় খণ্ডের নাম "আধারনিষ্ঠা যোগস্থান"। এই তৃতীয় খণ্ডের চতুর্থ পটলের নাম "চর্যাপটল" ("আধারনিষ্ঠা যোগস্থানে চতুর্থং চর্যাপটলং")।

---

১. *The Hevajra Tantra*, D. L. Snellgrove, London, 1959, Vol. I. পৃ. ১৯-২০

২. ঐ Vol. I. পৃ. ১৩৭

এখানে 'চর্যা'-কে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে—

১. পারক্ষিতা চর্যা, ২. বোধিপক্ষ চর্যা, ৩. অভিজ্ঞা চর্যা, ৪. সত্বপরিপাক চর্যা।[১]

এখানেও চর্যা শব্দটিকে অবশ্যই পারিভাষিক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

আবার 'চর্যা' শব্দটি দিয়ে একাধিক গ্রন্থনামের উল্লেখ Cordier-এর ক্যাটালগে পাওয়া যাচ্ছে। এই গ্রন্থনামগুলিতে 'চর্যা' শব্দটি দিয়ে কোথায়ও কোথায়ও চর্যাগানকে বোঝানো হয়েছে, যেমন "চর্যাগীতি"। কিন্তু আর-একখানি ক্যাটালগে[২] 'ভদ্রচর্যা প্রণিধান', 'বোধিসত্বচর্যাবতার', 'প্রজ্ঞাপারমিতাচর্যা', 'যোগচর্যা' প্রভৃতি কথাগুলি পাওয়া যাচ্ছে। এর মধ্যে কোনো কোনোটি (যেমন বোধিসত্বচর্যাবতার) গ্রন্থনাম।

'অক্ষর-শতক-নাম-প্রকর্ণ-কারিকা' নামে একখানি পুঁথিতে "অধিমুক্তি-চর্যা" নামে একটি অধ্যায় আছে। "অধিমুক্তি" বোধিসত্ত্বের দশটি "ভূমির" একটি।

'চর্যা' শব্দটি সংগীত-প্রবন্ধের প্রকারভেদ হিসাবেও কোনো কোনো সংগীত-শাস্ত্রের বইতে ব্যবহৃত হয়েছে।[৩]

এর থেকে বোঝা যাচ্ছে 'চর্যা' কথাটি তিন প্রকারের অর্থ ছিল। ১ সাধারণ অর্থ— যোগীদের আচরণ-ব্যবহার, রীতি-পদ্ধতি, ২. পারিভাষিক অর্থ— যেমন "ভূমি" কথাটি পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। ৩. সংগীত-প্রবন্ধের প্রকার ভেদ।

---

১. C. Bendall, *Catalogue of Buddhist Sanskrit Manuscripts,* পৃ. ১৯১-৯৫

২. *Catalogue of the Tibbetan Manuscripts from Tun-Huang in the India Office Library,* Louis De La Vallée-Paussin, Oxford University Press, 1962.

৩. রাজ্যেশ্বর মিত্র, চর্যাগীতি, বিশ্বভারতী পত্রিকা।

এই তিন প্রকারের অর্থের কোনটি 'চর্যাগীতি'-তে প্রযুজ্য ?[১]

চর্যাগীতিতে যোগীদের আচরণ-ব্যবহারের নির্দেশ আছে বটে কিন্তু সে নির্দেশ আধ্যাত্মিক নির্দেশ, বাহ্যিক আচরণ-ব্যবহারের নির্দেশ নয়, যেমন আছে হেবজ্রতন্ত্রে। তথাপি চর্যাগীতি বলতে যোগীদের আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক আচরণ-ব্যবহার সংক্রান্ত গানকেই বোঝানো হয়েছে মনে হয়।

তান্ত্রিক বৌদ্ধদের প্রকীর্ণ সাহিত্য মোটামুটি পাঁচ রকমের—

১. মন্ত্র, ২. ধারিণী, ৩. সাধনা, ৪. দোহা, ৫. চর্যা।

প্রথম তিনটি সংস্কৃতে, চতুর্থটি অবহট্টে, পঞ্চমটি বাংলায় লেখা। মন্ত্র-ধারিণী-সাধনা এ-সবকটি নামের অর্থ ই স্পষ্ট। দোহার অর্থও স্পষ্ট, যা কিছু গোলমাল 'চর্যা'-কে নিয়ে। 'দোহা' এবং 'চর্যা'-র বিষয়বস্তু মোটামুটি একই, গঠন-প্রকৃতিতে অবশ্য কিছু পার্থক্য আছে। কিন্তু 'বজ্রগীতি' আর 'চর্যাগীতি'-র মধ্যে বিষয় এবং গঠনগত পার্থক্য তো প্রায় কিছুই নয়। পার্থক্য শুধু ভাষার, বজ্রগীতির ভাষা অবহট্ট, চর্যাগীতির ভাষা বাংলা। 'বজ্রগীতি' নামটি যদি 'বজ্র'-এর নামানুসারে হয়ে থাকে তা হলে সেই নামটিই 'চর্যাগীতি' সম্পর্কে প্রযুক্ত হতে পারত। আবার 'বজ্রযান' এবং 'সহজযান'-এর পার্থক্যটি যদি বড়ো করে দেখি তা হলে সহজের নামানুসারে 'চর্যাগীতি'গুলি 'সহজগীতি' হতে পারত। কেন হয় নি, বলা শক্ত। এবং কেন যে 'চর্যা' শব্দটি দিয়ে গানগুলিকে বিশেষিত করা হয়েছে তাও বলা শক্ত।[২]

---

১. তান্ত্রিক যোগীরা নিজেদের কখনও কখনও কাপালিক বলেছেন। মুনিদত্তের কথায় জানতে পারি কাপালিকদের 'চর্যাধর'-ও বলত। "হুঁউ কাপালিকঃ। চর্যাধরশ্চ", বৌদ্ধ-গান ও দোহা, পৃ. ২০

২. চর্যাগানের কোনো শ্রেণীবিশেষের নাম কি কামচণ্ডালী ছিল ? কাহ্নপাদের একটি গানে আছে "কাহ্নে গাইউ কামচণ্ডালী" (গীতসংখ্যা ১৮)। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে 'ডোমচাণ্ডালী' কথাটি পাওয়া যাচ্ছে। "কিসক পাতহ রাধা ডোম্বচাণ্ডালী"। সুকুমার সেন বলেছেন,

৬

'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' পুথির যে অংশ পাওয়া গেছে তাতে বাইশ জন কবির ছেচল্লিশটি সম্পূর্ণ এবং একটি গানের ভগ্নাংশ আছে। ৪৭-সংখ্যক গানটির উপর লেখা আছে 'গুঞ্জরীপাদানাং', কিন্তু গানের ভণিতায় এবং টীকায় রচয়িতার নাম পাওয়া যাচ্ছে 'ধাম'। গুঞ্জরীপাদ স্বতন্ত্র কোনো কবির নাম কিনা, ধর্মপাদের নামান্তর গুঞ্জরীপাদ কিনা, ৩-সংখ্যক গীতের রচয়িতা গুণ্ডরীপাদ (গুডরী/গুড্ডরী) আর গুঞ্জরীপাদ একই ব্যক্তি কিনা, ধামপাদ, গুঞ্জরীপাদ এবং গুডরীপাদ একজনের তিনটি নাম কিনা— এ প্রশ্নের মীমাংসা হওয়া শক্ত। শাস্ত্রী ধামপাদ এবং গুণ্ডরীপাদকে অভিন্ন মনে করেছেন, গুঞ্জরীপাদ সম্বন্ধে তিনি স্পষ্ট কোনো মন্তব্য করেন নি; সম্ভবত গুঞ্জরীপাদকে তিনি গীতকারের নাম হিসাবে গ্রাহ্য করেন নি। শাস্ত্রীর অনুমান ঠিক হতে পারে। গুঞ্জরীপাদ খুব সম্ভব কবির নাম নয়। ৪৭-সংখ্যক গানটির মাথায় কোনো রাগের উল্লেখ নেই; খুব সম্ভব গানটির আগে 'রাগ গুঞ্জরী' কথাটি ছিল, যেমন আছে অন্য গানগুলিতে। লিপিকর ভুল করে গুঞ্জরীপাদানাং লিখে ফেলেছেন। গুডরীপাদ এবং ধামপাদকে স্বতন্ত্র ব্যক্তি মনে করলে কবির সংখ্যা হবে তেইশ।

পুথির শেষ গানটির সংখ্যা পঞ্চাশ। পুথি খণ্ডিত বলে আর কোনো গান এর পরে ছিল কিনা জানা যায় নি। তীব্বতী অনুবাদের সাক্ষ্যে সকলেই স্বীকার করেছেন 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' পুথিতে ৫০-সংখ্যক গীতের পর আর কোনো চর্যাগীত ছিল না। তীব্বতী অনুবাদে পঞ্চাশটির বেশি গান ছিল না; কিন্তু তাতেই প্রমাণ হয় না যে এই পুথিতে

'ডোমচাড়ালীর অর্থ অশ্লীল গান, ছড়া ও কথা কাটাকাটি' (দ্র. সুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পূর্বার্ধ, ১৯৫৯, পৃ. ১০২১। 'কামচণ্ডালী' ও 'ডোমচাণ্ডালী' শব্দ দুটির মধ্যে অর্থগত বা বিষয়গত সম্পর্ক থাকা অস্বাভাবিক নয়।

পঞ্চাশটির বেশি গান থাকতে পারে না। তীব্বতী অনুবাদকের সাক্ষ্য যে তেমন জোরালো নয় তার প্রমাণ আগেই পাওয়া গেছে এবং মুনি-দত্তের স্বহস্ত-লিখিত পুথিতে যে একান্নটি গান (একান্নটি গানেরই টীকা থাক বা না থাক) ছিল তার প্রমাণও আগে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং একমাত্র তীব্বতী অনুবাদের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করে কোনো সিদ্ধান্তে পৌছতে গেলে একটু বেশি মাত্রায় সতর্ক হওয়া দরকার। 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' পুথিতে ৫০-সংখ্যক গীতের পর আর কোনো চর্যাগান ছিল কি ছিল না সে-সম্বন্ধে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌছবার আগে আরও একটি বিষয় বিবেচনা করে দেখা দরকার। টীকায় দুই জায়গায় (১৭ এবং ৩২-সংখ্যক গানের টীকায়) 'চর্যান্তরং' বলে চর্যাগানের দুটি করে লাইন উদ্ধৃত করা হয়েছে। এই উদ্ধৃতির একটি (৩২-সংখ্যক গীতের টীকায় উদ্ধৃত) "চর্যাচর্যবিনিশ্চয়" পুথিতে ব্যাখ্যাত একটি চর্যাগানের (১৭-সংখ্যক গীতের) একটি লাইন। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে 'চর্যান্তরং' বলতে টীকাকার 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' পুথিতে ব্যাখ্যাত চর্যাগানকে বুঝিয়েছেন। তা না হলে অন্য ক্ষেত্রে তিনি যা করেছেন এখানেও তাই করতেন, চর্যাকারের নাম বলতেন অথবা গ্রন্থের নাম উল্লেখ করতেন। 'চর্যান্তরং' বলে যে দ্বিতীয় উদ্ধৃতিটি টীকাকার দিয়েছেন সেটি এই :

ভব ভুঞ্জই ন বাস্‌সইরে অপূব বিনানা।
জেব বিলোঅর বান্ধন বিজোইর মেলানা॥

'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' পুথির প্রাপ্ত অংশে ব্যাখ্যাত কোনো চর্যাগানে এই লাইন দুটি পাওয়া যাচ্ছে না। উদ্ধৃতির মূলটি তা হলে কোথায় গেল ? সে সম্পর্কে দুইটি অনুমান করা চলে : উদ্ধৃতির মূল পুথির লুপ্ত অংশে ছিল ; অথবা, পঞ্চাশ-সংখ্যক গানের পরও পুথিতে আরও গান ছিল, উদ্ধৃতিটি সেখান থেকে নেওয়া। প্রথম অনুমান সম্পর্কে আরও বলা চলে, পুথির লুপ্ত অংশে যে গানগুলি ছিল তার মূল না হোক তীব্বতী অনুবাদ তো

পাওয়া গেছে। সেই অনুবাদের উপর নির্ভর করে কি বলা যায় যে লাইন দুটির মূল গানটি সেই লুপ্ত অংশে ছিল? আমার মনে হয় বলা যায় না। সুতরাং দুটি অনুমানের প্রথমটিকে অগ্রাহ্য করতে হয়। তা হলেই স্বীকার করতে হয় 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' পুথিতে ৫০-সংখ্যক চর্যাগীতটির পরেও চর্যাগান ছিল, তবে কটি ছিল তা বলা সম্ভব নয়।

চর্যাগানগুলির দৈর্ঘ্য সাধারণত দশ লাইন। তিনটি চৌদ্দ লাইনের, দুটি বারো লাইনের, একটি আট লাইনের গানও আছে। গানগুলিতে বৈষ্ণব পদাবলীর মতো ভণিতা আছে, কবির নাম ভণিতায় উল্লিখিত। শেষ পদটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভণিতা। কোনো কোনো গানে ভণিতা দুইবার আছে। লুইপাদের যে দুটি গান আছে (গীতসংখ্যা ১।২৯), সে-দুটি গানেই দুইবার করে ভণিতা। একবার দ্বিতীয় পদে, আর-একবার শেষ পদে। শান্তিপাদের একটি গানে (গীতসংখ্যা ২৬) দ্বিতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম পদে ভণিতা দেখা যায়।

কাহ্নপাদের গানগুলির একটা বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি প্রায় সমস্ত গানেই নিজের নামোল্লেখ করেছেন। কতকগুলি গানে ভণিতায় কবির নামোল্লেখ না থাকলেও দ্বিতীয় পদে আছে (যেমন ১০-সংখ্যক গীতে। দ্বিতীয় পদ— "আলো ডোম্বি তোএ সম করিবে ম সাঙ্গ। নিঘিণ কাহ্ন কাপালি জোই লাগ॥" কিন্তু শেষ পদে কবির নামোল্লেখ নেই, "সরবর ভাঞ্জীঅ ডোম্বী খাঅ মোলাণ মারমি ডোম্বী লেমি পরাণ॥") আবার কোনো কোনো গানে দ্বিতীয় এবং শেষ পদ দুজায়গায়ই কবির নামোল্লেখ পাওয়া যায়। কাহ্ন-রচিত যে বারোটি গান এই পুথিতে আছে তার মধ্যে মাত্র দুটি গানে দ্বিতীয় পদে কবির নামের উল্লেখ নেই (গীতসংখ্যা ১৮।৪০)। একটি গানে (গীতসংখ্যা ১৩) দ্বিতীয় পদের পরিবর্তে তৃতীয় পদে কাহ্নের নাম পাওয়া যায়। পদ দুটি স্থানভ্রষ্ট হওয়া অস্বাভাবিক নয়, অর্থাৎ তৃতীয় পদটি দ্বিতীয় পদটির জায়গায়, দ্বিতীয় পদটি তৃতীয়

পদটির জায়গায় বসেছে।

দ্বিতীয় পদে কবির নামোল্লেখের রীতি শুধুমাত্র কাহ্নপাদের গানেই যে দেখা যায় তা নয়। লুইপাদের দুটি গানেই, ভসুকুর চারটি গানে, শবরপাদের দুটি গানেই এবং চাটিল, আর্যদেবপাদ, দারিকপাদ, কম্বলাম্বরপাদ (কামলি), ডোম্বীপাদ, বীণাপাদ, শান্তিপাদ— এদের গানেও এই রীতির অনুসরণ আছে। আবার পুথিতে গানের সব পদগুলিই ॥ ধ্রু ॥ চিহ্নিত হওয়া সত্ত্বেও টীকাকার কেবলমাত্র দ্বিতীয় পদটিকে ধ্রুবপদ বলেছেন। এর থেকে একটি অনুমান সংগতভাবে করা যায় যে চর্যাগানে দ্বিতীয় পদ এবং পঞ্চম পদ— এই দুটি পদের বিশেষ গুরুত্ব ছিল। সম্ভবত দুটি পদই প্রথমে ভণিতা ছিল (যেমন দেখা যায় লুইপাদের গান দুটিতে), পরে দ্বিতীয় পদটি ভণিতা রইল না কিন্তু কবির নামটি উল্লিখিত হতে থাকল (যেমন কাহ্ন এবং আর আর সকলের গানে দেখা যাচ্ছে), তার পরে দ্বিতীয় পদে ভণিতাও রইল না, কবির নামও উল্লিখিত হতে থাকল না; অর্থাৎ দ্বিতীয় পদটি গানের প্রথম, তৃতীয় এবং চতুর্থ পদের মতো সাধারণ পদ হয়ে গেল (এর দৃষ্টান্ত চর্যাগানের কতকগুলিতে পাওয়া যাচ্ছে)। চর্যাগানের দ্বিতীয় পদের এই ক্রমক্ষীয়মান গুরুত্বকে প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করে গানগুলির কালানুক্রমিক ক্রমটি আবিষ্কার করা বোধ হয় সম্ভব যদি এই প্রমাণকে আরও কয়েকটি বাহ্যিক প্রমাণ দিয়ে দৃঢ় করা যায়।

শেষ পদে ভণিতা দেওয়ার রীতিটি পরবর্তীকালে বৈষ্ণব এবং শাক্ত কবিরা অনুসরণ করেছিলেন।

সুকুমার সেন সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে কয়েকটি চর্যাগানের ভণিতায় যে-কবির নাম পাওয়া যায় আসলে তিনি রচয়িতা নন। এ সন্দেহ সংগত। ১৭-সংখ্যক গীতে ভণিতা নেই। দ্বিতীয় পদে 'বাজই অলো সহি হেরুঅবীণা', লাইনটির 'বীণা' গীতকারের নাম বলে ধরা হয়েছে।

শবরপাদের রচনা বলে যে গান দুটিকে ধরা হয় তার কোনোটিতেই ভণিতা নেই। দুটিতেই অবশ্য 'শবর' এবং 'শবরী'র উল্লেখ আছে। এই-রকম অনেক গানেই ভণিতা নেই, তবে গানের মধ্যে 'চাটিল', 'কামলি' প্রভৃতি কথাগুলি আছে। চর্যাগানে যে ভণিতা দেওয়া রীতি ছিল ভণিতাযুক্ত গানগুলি তার প্রমাণ (যেমন 'ভুসুকু ভণই মই বুঝিঅ মেলেঁ', 'সরহ ভণতি অচিন্ত সো ধাম'), কোনো কোনো কবি যথাযথ ভণিতা কেন দেন নি বলা শক্ত। টীকাকার প্রত্যেক কবির নাম উদ্‌ধৃত গানটির আগে দিয়েছেন (যেমন 'শবর পাদানাম্', 'ভুসুকু পাদানাম' ইত্যাদি, আবার টীকার মধ্যেও উল্লেখ করেছেন যেমন 'ভুসুকু পাদস্তমেবার্থং প্রতিপাদয়তি', 'তাড়কস্তমেবার্থং প্রতিপাদয়তি', 'জয়নন্দিপাদঃ প্রতিপাদয়তি' ইত্যাদি)।

পুথিতে এই কয়জন কবির গান আছে।

লুইপাদ, কুক্কুরীপাদ, বিরুবাপাদ, গুণ্ডরীপাদ, চাটিল্লপাদ, ভুসুকুপাদ, কৃষ্ণাচার্যপাদ (কাহ্ন), কম্বলাম্বরপাদ (কামলি), ডোম্বীপাদ, শান্তিপাদ, মহীধরপাদ, বীণাপাদ, সরহপাদ, শবরপাদ, ভাদেপাদ, আর্যদেবপাদ, ঢেণ্ডণপাদ, দারিকপাদ, কঙ্কনপাদ, তাড়কপাদ, জয়নন্দীপাদ, ধামপাদ।

এ ছাড়া টীকায় এই কয়জন সিদ্ধাচার্যের রচনা উদ্‌ধৃত হয়েছে।

চর্যাপাদ, ইউড়ীপাদ, ধোকড়ীপাদ, দড়তীপাদ, মীননাথ, আচার্য বিনাত্তক, তিলোপাদ, বিরুপাক্ষপাদ, সরহপাদ, কৃষ্ণাচার্যপাদ।

প্রত্যেকটি গানের আগে রাগের উল্লেখ আছে (১।৪৭-সংখ্যক গীত এর ব্যতিক্রম। ১-সংখ্যক গীতের রাগের নাম টীকায় দেওয়া হয়েছে। আর কোনো গানের রাগের নাম টীকায় উল্লিখিত হয় নি)। পুথিতে সবশুদ্ধ সতেরোটি রাগের নাম পাওয়া যাচ্ছে।

পটমঞ্জরী, গবড়া (গউড়া), অরু, গুঞ্জরী, দেবক্রী, দেশাখ (দ্বেশাখ), ভৈরবী, কামোদ, ধানসী, রামক্রী, বরাড়ী (বলাড্ডী), শীবরী (শবরী), মল্লারী, মালসী-গবুড়া, কাহ্নু গুঞ্জরী, বঙ্গাল।

চর্যাগানগুলি রচিত হওয়ার কত পরে মুনিদত্ত তাঁর সংস্কৃত টীকা লিখেছিলেন তা জানা যায় না। তবে বেশ কিছু দিন পরে যে টীকা লেখা হয়েছিল তার প্রমাণ টীকায় গানের পাঠান্তর পাওয়া যাচ্ছে। টীকার পাঠান্তর এবং গানের পাঠ এখানে দেওয়া হল[১]। টীকার পাঠান্তর প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শাস্ত্রী তাঁর বই-এর পাদটীকায় দিয়ে দিয়েছেন।

টীকার পাঠান্তর	গানের পাঠ
সঅল সমাহি (১।৫)	সঅল সমাহিঅ
ভণই লুই (১।৪)	লুই ভণই
এক ঘ ডুলী (৩।৯)	এক স ডুলী
সাঙ্কম (৫।৭)	সাঙ্কমত
তরংগতে হরিণা (৬।৯)	তরঙ্গন্তে হরিণার
নগরি (১০।১)	নগর
হউ (১০।১১)	হাউ
গঅবরেণ (১২।৬)	গঅবর
ফীট (১২।৩)	ফিটউ
অঠকুমারী (১৩।১)	অঠক মারী
সম্বেইন (১৫।১)	সম্বেঅন
ফিটলেষু (২০।৩)	ফেটলিউ
নিশি আন্ধিরী (২১।১)	নিসিঅ অন্ধারী
অন্ধ (২২।৩)	অন্তে

১. বন্ধনীর মধ্যে প্রথম সংখ্যাটি গীতসংখ্যা, দ্বিতীয় সংখ্যাটি লাইনের সংখ্যা।

টীকার পাঠান্তর	গানের পাঠ
তিঅধা (২৮।৭)	তিঅধাউ
নিহএ (৩০।৬)	নিহুরে
ছাড়িল (৩১।৭)	ছাড়িঅ
বলদা (৩৩।৫)	বলদ
অলখ (৩৪।৩)	অলক্ষ
শাখি করি (৩৬।৯)	শাখি করিব
নোবাঅ (৩৮।৫)	নৌবাহী
অমিঅ (৩৯।৭)	অমিয়া
অলে (৩৯।৫)	আলে
বান্ধী (৪১।৭)	বাঁন্ধি
চউখণ (৪৪।৩)	আচ্ছহুঁ চউখণ
সুনতরুবর (৪৫।৯)	সুনতরু
দাহ (৪৭।৩)	ডাহ
ধাম ভণই (৪৭।৯)	ভণই ধাম
চউকোটী (৪৯।৯)	চউকোড়ি
ধবণ চবণ (১।১০)	ধমণ চমণ
সস্থর (২।৫)	সুস্থর
তিয়ড়া (৪।১)	তিয়ড্ডা
কাহেরে (৬।১)	কাহৈরি
খংটী (৮।৫)	খুণ্টি
অলো (১০।৩)	আলো
পহিলে (১২।৫)	পহিলেঁ
মতিএ (১২।৭)	মতিএঁ
ঠকুর (১২।৯)	ঠাকুরক

টীকার পাঠান্তর	গানের পাঠ
বাহুতু (১৩।৬)	বাহতু
শূন্য (১৫।৭)	সুনা
পহিলে (২০।৫)	পহিল
গতি (২১।৫)	গাতি
যে যে (২২।৯)	জে
হিত্রঁ (২৮।৯)	হিঅ
এতেলোএ (৩০।৯)	এতৈলোএ
আয্যদেব (৩১।৯)	আজদেবেঁ
যো সোবুদ্ধি (৩৩।৭)	যোসোবুধী
দুঃখ (৩৪।৭)	দুঃখেঁ
জইসনি (৩৭।৫)	জইসনে
বাটত (৩৮।৭)	বাট
সরহ ভণ (৩৯।৯)	সরহ ভণন্তি
তেজই (৪০।৭)	জেতই
ভুসুকু (৪১।৯)	রাউতু
নাদ (৪৪।৫)	বিহুনাদ
পেখই (৪৬।১)	পেখু
নৌখর (৪৭।৫)	নউখর
দহিঅ (৪৯।৪)	ডহি
ছাড় (৫০।৩)	ছাড়ু
অঙ্গন (২।৩)	আঙ্গন
রাত্রি (২।৮)	রাতি
ফাড়িঅ (৫।৫)	ফাড়িঅ
তিন ন খণ্ডই (৬।৫)	তিন নচ্ছুপই

টীকার পাঠান্তর	গানের পাঠ
ছড়িগই (৯।৭)	ছড়গই
তুলে (১০।১১)	তুলো
বড়িক (১২।৫)	বড়িআ
মারি (১১।৯)	মারিঅ
ভণ (১২।১১)	ভণই
চান্দ (১৪।৭)	চন্দ
কাহ্নে গাই (১৮।৯)	কাহ্নে গাইতু
নবযৌবন (২০।৭)	জাণ যৌবন
কাল (২১।৭)	কলা
তুল ধুনী (২৬।৫)	তুলা ধুনি
উইএ (৩০।৩)	উইত্তা
চান্দেরি (৩১।৫)	চান্দরে
পারোআরে (৩২।৭)	পারউআরেঁ
সুনকরুণা (৩৪।১)	সুনকরুণরি
ভণই ভাদে (৩৫।৯)	ভাদে ভণই
বণ্টে (৩৭।৭)	বাণ্ড
খণ্ট (৩৮।৭)	খাণ্ট
তুষ্ট বলদ (৩৯।৯)	তুঠা বলন্দেঁ
আই (৪১।১)	আইএ
জাস্থ নাহি (৪৩।৫)	জংপুণাহি
যথা (৪৪।৭)	জথাঁ
নো (৪৬।৫)	নৌ
দাটই (৪৭।৭)	ফাটই
সোনরুঅ (৪৯।৭)	সোণতরুঅ

টীকার পাঠান্তর এবং গানের পাঠ—এই দুটির মধ্যে কোন্‌টির মূল্য বেশি, কালের দিক থেকে কোন্‌টি পূর্ববর্তী অর্থাৎ কোন্‌টি মূলের বেশি কাছাকাছি, সে-সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া শক্ত। গানের পাঠের সঙ্গে তুলনায় পাঠান্তরগুলির বৈশিষ্ট্য এইভাবে নির্দেশ করা যেতে পারে।

১. কোনো কোনো পাঠান্তর পাঠের তুলনায় সংস্কৃত-ঘেঁষা। যেমন—
দুষ্ট বলদ (৩৯৷৯) : দুঠ্য বলন্দেঁ ; শূন্য (১৫৷৭) : সুনা ; আর্য্যদেব (৩৯৷৯) : আজদেবেঁ ; যো সো বুদ্ধি (৩১৷৭) : যো সো বুধী ; দহিঅ (৪৯৷৪) : ডহি ; ছড়িগই (৯৷৭) : ছড়গই ; বড়িক (১২৷৫) : বড়িআ ; বান্ধী (৪১৷৭) : বাঁন্ধি ; দাহ (৪৭৷৩) : ডাহ ; যথা (৪৪৷৭) : জথাঁ ; রাত্রি (২৷৮) : রাতি ;
এর ব্যতিক্রমও আছে ; যেমন, অলখ (৩৪৷৩) : অলক্ষ, উইএ (৩০৷৩) : উইত্তা।

২. পাঠান্তরে কোনো কোনো শব্দের আধুনিক রূপ পাওয়া যায় ; যেমন, তিয়ড়া (৪৷১) : তিঅড্ডা, ফাড়িঅ (৫৷৫) : ফাড্ডিঅ। এখানে স্পষ্টতই পাঠের -ড্ড-> পাঠান্তরে -ড়- হয়েছে। এরও ব্যতিক্রম আছে, চউকোটী (৪৯৷৬) : চউকোড়ি। তা ছাড়া -ড্ড-> -ড়- এই সাক্ষ্য দিয়ে পাঠ বা পাঠান্তরের প্রাচীনতা-আধুনিকতা প্রমাণিত হয় না। কারণ, গানে -ড্ড- এবং -ড়- দুইই পাওয়া যাচ্ছে। ণিঅড়ি (৭৷৯) : নিয়ড্ডী (৫৷৮), বলাড্ডি (২৮) : বরাড়ী (২৩)।

৩. পাঠান্তরে অনেকগুলি ক্রিয়াপদের বিভক্তির পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। পেখই (৪৬৷১) : পেখু ; ফীট (১২৷৩) : ফীটউ, কাহ্নে গাই (১৮৷৯) : কাহ্নে গাইতু, ফিটলেষু (২০৷৩) : ফেটলিউ, ছাড়িল (৩১৷৭) : ছাড়িঅ, শাখি করিব (৩৬৷৯) : শাখি করি, উইএ (৩০৷৩) : উইত্তা, মারি (১১৷৯) : মারিঅ ; সরহ ভণ (৩৯৷৯) : সরহ ভনন্তি, দহিঅ (৪৯৷৪) :

ভহি ; ছাড় (৫০।৩) : ছাড়ু, ভণ (১২।১১) : ভণই ; ফীট (১২।৩) : ফীটউ।

৪. পাঠান্তরে কোনো কোনো নামপদের বিভক্তির লোপ।

সমাহি (১।৫) : সমাহিঅ ; আর্য্যদেব (৩১।৯) : আজদেবেঁ, সাক্ষম (৫।৭) : সাক্ষমত, সুনকরুণা (৩৪।১) : সুনকরুণারি, আই (৪১।১) : আইএ। এরও ব্যতিক্রম আছে, পহিলে (২০।৫) : পহিল।

৫. পাঠান্তরে শব্দের স্থান-পরিবর্তন।

ভণই লুই (১।৪) : লুই ভণই ; ভণই ভাদে (৩৫।৯) : ভাদে ভণই ধাম ভণই (৪৭।৯) : ভণই ধাম।

৬. পদাদিস্থিত অ/আ বিপর্যয়।

অঙ্গন (২।৩) : আঙ্গন ; অলো (১০।৩) : আলো ; গতি (২১।৫) : গাতি ; বাণ্ট (৩৭।৭) : বাণ্ড ; খণ্ট (৩৮।৭) : খাণ্ট, ঠকুর (১২।৯) : ঠাকুরক।

৭. একটি জায়গায় শব্দের পরিবর্তন লক্ষ করা যায়।

তিন ন খণ্ডই (৬।৫) : তিন ন চ্ছুপই।

উপরে যে বৈশিষ্ট্যগুলির উল্লেখ করা হল তার দ্বারা একটি বিষয় প্রমাণিত হচ্ছে যে পাঠ এবং পাঠান্তরের গুরুত্ব প্রায় সমান। একটিমাত্র জায়গায় পাঠে যে শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে সেটির পরিবর্তে পাঠান্তরে অন্য আর একটি শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। এ ছাড়া পাঠ-পাঠান্তরের যে পার্থক্য তা মূলত বানানের এবং ব্যাকরণের। সুতরাং একটির তুলনায় আর একটিকে বেশি প্রামাণিক বা মূলের বেশি কাছাকাছি এমন মনে করবার পক্ষে তেমন প্রবল যুক্তি নেই। তাই টীকায় পাঠান্তর থাকলেই তা দিয়ে গানের পাঠ সংশোধন করে নিতে হবে এমন কোনো কথা নেই। গানের পাঠ সংশোধনের আগে পাঠান্তরের পাঠটি যে সব দিক দিয়ে যুক্তিযুক্ত সেটি প্রতিষ্ঠিত করে নিতে হবে।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে গানের পাঠ শুদ্ধ, পাঠান্তর বিকৃত। যেমন,

তেজই (৪০।৭) : জেতই ; এই লাইনটিতে 'জেতই'-র পরে আছে 'তেতবি'। 'জেত' এবং 'তেত' আধুনিক বাংলার 'যত' এবং 'তত' সর্বনাম। সর্বনাম দুটি পরস্পরের পরিপূরক। সুতরাং 'জেতই' পাঠে কিছুমাত্র গোলমাল নেই। এবং পাঠান্তরের 'তেজই' হয় লিপিকর প্রমাদ কিংবা বিকৃত পাঠ।

তবে এ কথা ঠিক যে অনেক জায়গায় পাঠান্তরের সাহায্যে পাঠ সংশোধন করলে ব্যাকরণের রীতি বজায় থাকে, অর্থেরও সামঞ্জস্য পাওয়া যায়। যেমন,

'জাসু নাহি' (৪৩।৪) : 'জংপুনাহি'— এখানে পাঠ বিকৃত। 'জাসু'-র সমর্থনে টীকার সংস্কৃত ব্যাখ্যায় পাওয়া যাচ্ছে 'যস্য'। সুতরাং পাঠান্তর ঠিক। 'সোনরুঅ' (৪৯।৭) : 'সোনতরুঅ'— এখানে গানের পাঠ বিকৃত নয়, শূন্যতারূপ তরু 'সোনতরুঅ' হতে পারে, কিন্তু তাতে অর্থসংগতি থাকে না। পাঠান্তরের 'সোনরুঅ' টীকার দ্বারা সমর্থিত 'সোনমিতি শূন্যতাগ্রহঃ। রুয় ইতি ভাবগ্রহঃ।' অন্য গান থেকেও সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে, সোনা এবং রূপার রূপক ৮-সংখ্যক গীতে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং এখানে পাঠান্তর দিয়েই অর্থের সামঞ্জস্য থাকছে। 'কাহ্নে গাই' (১৮।৯) : 'কাহ্নে গাইতু'— এখানে 'গাইতু' ব্যাকরণের নিয়মানুযায়ী নয়। 'গাইতু-র জায়গায় 'গাই' অথবা 'গাইউ' সম্ভব। 'গাই' পাঠান্তরে পাওয়া যাচ্ছে, সুতরাং পাঠান্তর শুদ্ধ। 'কাহেরে' (৬।১) : 'কাহৈরি'— এখানে 'রে' দ্বিতীয়ার এবং '-রি' ষষ্ঠীর বিভক্তি। শব্দটির পরে আছে অসমাপিকা ক্রিয়া 'ঘিনি', সুতরাং ষষ্ঠী বিভক্তিযুক্ত 'কাহৈরি' এখানে অচল, 'কাহেরে' শুদ্ধ পাঠ। ঠিক এর বিপরীত দৃষ্টান্ত পাওয়া যাচ্ছে আর একটি জায়গায় 'চান্দেরি' (৩১।৫) : 'চান্দরে'— এখানে পরবর্তী

শব্দটি 'চন্দ্রকান্তি'। 'চন্দ্রকান্তি' অবশ্যই চাঁদের, সুতরাং ষষ্ঠী বিভক্তিযুক্ত 'চান্দেরি' শুদ্ধ এবং দ্বিতীয়া বিভক্তিযুক্ত 'চান্দরে' অশুদ্ধ পাঠ। 'এক ঘ ডুলী' (৩৯) : 'এক স ডুলী'— পাঠান্তরটি শাস্ত্রী যেভাবে মুদ্রিত করেছেন তাতে স্পষ্টই ধারণা হতে পাবে এটি বিকৃত। আসলে এটি মুদ্রিত হওয়া উচিত এইভাবে—'এক ঘড়ুলি'। 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' পুথিতে ড-এর নীচে বিন্দু নেই। বিন্দু সম্পাদককে দিয়ে নিতে হবে অবস্থা বুঝে, যেমন তিনি দিয়েছেন অন্যসব ক্ষেত্রে। 'ঘডুলী'-তে একটি বিন্দুর দরকার, বিন্দু দিলে শব্দটি 'ঘড়ুলী' হয়। এই গানেই 'ঘড়ি' শব্দটি পাওয়া যাচ্ছে (দ্র "ঘড়িয়ে" ৩৭); টীকায় শব্দটির সংস্কৃত প্রতিশব্দ পাওয়া যাচ্ছে 'ঘট' সুতরাং ঘড়ুলী পাঠ ঠিক। 'এক স ডুলী' গানের পাঠ বিকৃত। গান আগে টীকা পরে। সাধারণ বিচারে তাই পাঠান্তরের চেয়ে পাঠের গুরুত্ব স্বীকার করতে হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে পাঠ-পাঠান্তরের কালগত মূল্য সমান সমান। তবে পাঠান্তর অধিকাংশ জায়গায়ই পাঠের তুলনায় বিশুদ্ধ। সুতরাং স্বীকার করতে হয় টীকাকার যে পাঠ জানতেন তা পুরানো কি আধুনিক জানি না, তবে বিশুদ্ধতর।

টীকায় উদধৃত পাঠান্তরের চেয়ে চর্যাগানের পাঠ নির্ধারণে সংস্কৃত টীকার উপযোগিতা অনেক বেশি। বস্তুত টীকার সাহায্য ব্যতিরেকে গানগুলির অর্থোদ্ধার প্রায় অসম্ভব ছিল। সংস্কৃত টীকায় গানগুলির বাচ্যার্থ অবশ্য নেই, টীকাকারের উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ব্যাখ্যা, তথাপি আধ্যাত্মিক অর্থ ব্যাখ্যার ফাঁকে ফাঁকে এমন ইঙ্গিত ছড়ানো আছে যার সাহায্যে গানগুলির বাচ্যার্থও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। তা ছাড়া প্রতি গানের টীকায় গানের অনেকগুলি শব্দের প্রতিশব্দ পাওয়া যাচ্ছে এবং সেই প্রতিশব্দগুলির সাহায্যে মূল গানের পাঠটি সংশোধন বা নির্বাচন করা সহজ হচ্ছে। এ পর্যন্ত চর্যাগানের যত পাঠ সংশোধন হয়েছে তার প্রায় সবটাই হয়েছে টীকার সাহায্যে। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাচ্ছে।

৮-সংখ্যক গানটির 'গেলী জাম বহু উই কইসেঁ' লাইনটিতে 'বহু উই' বিভ্রান্তিকর। লাইনটির সংস্কৃত ব্যাখ্যা পাওয়া গেল এইভাবে 'গতং জন্মান্তরং ব্যাঘুটতীত্যর্থঃ', টীকার 'ব্যাঘুটতি' শব্দটির সাহায্যে অনুমান করা গেল মূল গানের 'বহু উই' দুটি শব্দ নয়, একটি শব্দ। শব্দটিতে 'উ' নেই, আছে 'ড়' ('উ' এবং 'ড়' সহজেই গুলিয়ে যেতে পারে। আধুনিক 'উ'-র মাথায় একটি ঝুটি থাকে। চর্যার পুথিতে 'উ'-র মাথায় ঝুটি নেই, সুতরাং অক্ষরটি দেখায় আধুনিক ড-র মতো) সুতরাং প্রকৃত পাঠ হবে 'বহুড়ই' অর্থ 'ফিরে আসে'। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে 'বাহুড়', 'বাহুড়িয়া'-র অনেক প্রয়োগ আছে।

১৭-সংখ্যক গানে 'অনহা দাণ্ডী বাকি কিঅত অবধূতী' লাইনটির 'বাকি' শব্দটিতে অর্থের সংগতি হয় না। টীকায় লাইনটির অর্থ পাওয়া গেল, 'বিষয়চক্রী অবধূতিকয়া সহ একীকৃত্য'। টীকার 'একীকৃত্য' শব্দটির সাহায্যে গানের 'বাকি' পাঠটিকে সংশোধন করে 'একী' করা হল।

টীকার অনেক জায়গায় বাংলা গানের ঠিক ঠিক অনুবাদও পাওয়া যাচ্ছে। যেমন,

'ধরণ ন জাই' (২।১) : 'ধরণং ন যাতি,' 'সহজে থির করী' (৩।৩) : 'সহজানন্দং স্থিরীকৃত্য,' 'তিঅড্ডা চাপী' (৪।১) : 'ত্রিনাড়ং চাপয়িত্বা,' 'রুন্ধেলা' 'রুদ্ধতং,' 'নিঅড়ি জিনউর বট্টই' (৭।৯) : 'মহসুখপুরং অতীব মম সন্নিহিতং বর্ত্ততে,' 'ছাড়িঅ ভয় ঘিন লোআচার' (৩১।৭) : 'ভয়লজ্জাদিকং লোকস্য ব্যবহারঃ পরিত্যক্ত,' 'কিন্তো মন্তে কিন্তো তন্তে কিন্তো রে ঝানবখানে' (৩৪।৫) : কিং তব মন্ত্রজ্ঞাপেন 'কিং তব তন্ত্রপাঠেন চ ধ্যান ব্যাখ্যানেন বা কিম্।' মঝ বেণী (১৩।৪) : মধ্যবেণিকায়াং।

সুতরাং সংস্কৃত টীকা থেকে আমরা ত্রিবিধ সাহায্য পাচ্ছি।

১. গানের পাঠ-সংশোধনে সাহায্য পাচ্ছি, ২. গানগুলির বাচ্যার্থ স্পষ্ট হচ্ছে, ৩. আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাও পাওয়া যাচ্ছে।

টীকায় বক্তব্য বিষয়কে পরিস্ফুট করবার জন্য তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের আরও বহু শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া আছে। সে গ্রন্থগুলির নাম—

সেকোদ্দেশ টীকা, হেরুকতন্ত্রতত্ত্ব পটল, বোধিচর্যাবতার, সহজসম্বর, হেরুকতন্ত্ররাজ, রতিবজ্র, সম্পুটোদ্ভবতন্ত্ররাজ, শ্রীসমাজ, বজ্রচাপ, হেবজ্রতন্ত্র, যোগরত্নমালা, মধ্যমকশাস্ত্র, অপ্রতিষ্ঠানপ্রকাশ, অনুত্তরসন্ধি, জ্ঞানসম্বোধি, একশ্লোকাভগবতী, অদ্বয়সিদ্ধি, প্রজ্ঞাপরিচ্ছেদ দ্বিকল্পরাজ, কৃষ্ণাচার্যের দোহাকোষ, সরহপাদের দোহাকোষ।

৮

শাস্ত্রী বলেছেন চর্যাগানগুলি সন্ধ্যাভাষায় রচিত। এরূপ মনে করবার হেতু টীকায় 'সন্ধ্যা' কথাটি পাওয়া যাচ্ছে। শাস্ত্রী আরও বলেছেন সন্ধ্যাভাষার অর্থ 'আলো-আঁধারি ভাষা', কিছু বোঝা যায়, কিছু বোঝা যায় না। সন্ধ্যাভাষার ব্যুৎপত্তি, বানান এবং অর্থ সম্পর্কে নানা লোকে নানা সিদ্ধান্ত করেছেন।[১] তার ফলে, 'সন্ধা'-কে 'সন্ধ্যা'র পরিণত করা হয়েছে, শব্দটির অর্থ করা হয়েছে 'অভিপ্রায়িক', 'অভিপ্রেত্য', 'উদ্দিশ্য'। ইংরেজিতে শব্দটির অর্থ 'secret language' বা 'Intentional language' (Eliade-এর *"Le Language Intentional"* অনুসারে)।

---

১. Vidhusekhar Shastri, "Sandhābhāsā", *Indian Historical Quarterly*, Vol. IV, 1928, পৃ. ২৮৭-৯৬

P. C. Bagchi, "Sandhābhāsā and Sandhāvacara", *Studies in the Tantras*, Part I, 1939, পৃ. ২৭-৩৩

Mercia Eliade, *Le Yoga: Immortalité et Liberté*, 1954, পৃ. ৩৯৪-৯৫

A. Bharati, "Intentional Language in the Tantras", *Journal of the American Oriental Society*, No. 3, 1961, পৃ. ২৬১-৮০

এখানে বলা প্রয়োজন 'সন্ধা' কোনো স্বতন্ত্র ভাষার নাম নয়। যে-বইগুলিতে সন্ধাভাষার নিদর্শন আছে সেগুলি সংস্কৃত, অবহট্ট এবং বাংলা ভাষায় লেখা।

তান্ত্রিক বৌদ্ধ যোগীদের সাধনপদ্ধতি গুহ্য ব্যাপার। সাধনার এই গুহ্যত্ব বজায় রাখবার উদ্দেশ্যে তাঁরা কতকগুলি কায়িক এবং বাচনিক সংকেত সৃষ্টি করেছিলেন। এই সংকেতগুলিকে বলা যায় একশ্রেণীর code; এই code-এর সাহায্যে যোগীরা সম্প্রদায়-ভুক্ত অন্য যোগীর সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান করতেন অথবা তত্ত্বকথা আলোচনা করতেন। 'সন্ধাভাষা' যোগীদের বাচনিক সংকেত। এই সংকেতের তাৎপর্য কেবলমাত্র যোগীদেরই বোধগম্য ছিল। 'হেবজ্রপিণ্ডার্থটীকায়'[১] বলা হয়েছে হেবজ্রযোগ-চর্যায় নিযুক্ত যোগী এবং যোগিনীরা অবশ্যই কায়িক এবং বাচনিক সংকেতগুলি ব্যবহার করবে। তা হলে তাদের সাংকেতিক আলাপন বজ্রকুলগোষ্ঠী বহির্ভূত সাধারণ লোকের বোধগম্য হবে না। হেবজ্রব্যাখ্যা বিবরণে'[২] আরও বলা হয়েছে, চর্যারত যোগী যখন পীঠ এবং ক্ষেত্রে যোগিনীর সন্ধানে ঘুরে বেড়াবে তখন কায়িক সংকেতের দ্বারাই যোগিনীর সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান করবে।

'সন্ধাভাষা'-র ব্যবহার যোগী এবং যোগিনীর পক্ষে আবশ্যিক। এ-সম্পর্কে হেবজ্রতন্ত্রে নির্দেশ দেওয়া আছে—

যোঽভিসিক্তোঽত্র হেবজ্রে ন বদেৎ সন্ধ্যাভাষয়া।
সময়বিদ্রোহনং তস্য জায়তে নাত্র সংশয়ঃ॥
ইত্যুপদ্রবচৌরশ্চগ্রহজ্বরবিষাদভিঃ।
ম্রিয়তেঽসৌ যদি বুদ্ধোঽপি সন্ধ্যাভাষান্ ন ভাষয়েৎ॥

---

১. Snellgrove, *Hevajra-Tantra,* Vol. I, পৃ. ৬৬

২. ঐ

যোগী-যোগিনী ব্যবহৃত কায়িক এবং বাচনিক সংকেতগুলি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আছে 'হেবজ্রতন্ত্র' গ্রন্থে। এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের সপ্তম পটলের নাম 'ছোম্বাপটল' এবং দ্বিতীয়খণ্ডের তৃতীয় পটলের নাম 'হেবজ্রসর্বতন্ত্রনিদানসন্ধ্যাভাষো নাম তৃতীয়ঃ পটলঃ ॥'।

'ছোম্বা' অর্থে কায়িক সংকেত, অর্থাৎ আকার ইঙ্গিতে মনের ভাব-প্রকাশ। যেমন,

একটি আঙুল দেখালে বোঝায় জিজ্ঞাসা করছে, সে গ্রহণযোগ্য কিনা।
দুটি আঙুল দেখালে বোঝায়, সে গ্রহণযোগ্য।
ক যদি চতুর্থ আঙুল দেখায় খ দেখাবে কড়ে আঙুল।
ক যদি মধ্যম আঙুল দেখায় খ দেখাবে দ্বিতীয় আঙুল।
ক যদি বুকের দিকে ইঙ্গিত করে খ সিঁথির দিকে ইঙ্গিত করবে।
ক যদি মাটির দিকে ইঙ্গিত করে খ মুখের দিকে ইঙ্গিত করবে।
ক যদি পায়ের তলার দিকে ইঙ্গিত করে খ আনন্দে নৃত্য করবে।

হেবজ্রতন্ত্রে 'সন্ধাভাষা'র কোনো সংজ্ঞা দেওবা নেই, আছে 'সন্ধাভাষা'র একটি তালিকা এবং তাদের অর্থ।

বজ্রগর্ভ জিজ্ঞাসা করলেন, সন্ধাভাষা কাকে বলে? যোগিনীদের এই 'মহাসময়ং'-এর রহস্য 'শ্রাবক' বা অন্য আর কেউ ভেদ করতে পারে? আসলে ব্যাপারটা কি, খুলে বলবেন প্রভু?

সন্ধ্যাভাষং কিম্ উচ্যেত ভগবান্ বোক্রত নিশ্চিতং।
যোগিনীনাং মহাসময়ং শ্রাবকাদ্যৈর্ণ ছিদ্রিতং ॥

ভগবান বললেন, 'সন্ধাভাষা'-র রহস্যটা আমি বিশদ করে বলছি, একাগ্রচিত্তে শোনো। এই বলে ভগবান্ 'সন্ধাভাষা'-র তালিকা এবং অর্থ বলে যেতে লাগলেন।

মদনং সন্তং বলং মাংসং মলয়জং মিলনং মতং।
গতিঃ খেটঃ শব-শ্রায়ো অস্থ্যাভরণং নিরংশুকং ॥ ইত্যাদি

হেবজ্রতন্ত্রে নিম্নলিখিত সন্ধাশব্দগুলি পাওয়া যায়।

'মদন' — 'মদ্য', 'বল' — 'মাংস', 'খেট' — 'গতি', 'প্রেক্ষণ' — 'আগতি', 'অস্থ্যাভরণ' — 'নিরংশুক', 'কলিঞ্জর' — 'ভব্য', 'কপাল' — 'পদ্মভাজন', 'তৃপ্তিকর' — 'ভক্ষ', 'মালতীন্ধন' — 'ব্যঞ্জন', 'মূত্র' — 'কস্তুরিকা', 'শিহলক' — 'স্বয়ম্ভূ', 'শুক্র' — 'কর্পূরক', 'মহামাংস' — 'অলিজ', 'বোল' — 'বজ্র', 'কক্কোল' — 'পদ্ম', 'ডোম্বী' — 'বজ্রকুলি,' 'নতি' — 'পদ্মকুলি', 'চণ্ডালী' — 'রত্নকুলি,' 'দ্বিজা' — 'তথাগতী', 'ললনা' — 'প্রজ্ঞা', 'রসনা' — 'উপায়', 'অবধূতী' — 'নৈরাত্মা'।

শহীদুল্লা দোহাকোষ থেকে আরও কতকগুলি সন্ধাশব্দ সংগ্রহ করেছেন।

'পদ্ম' — 'ভগ', 'উষ্ণীষ' — 'কমল', 'বজ্র' — 'লিঙ্গ', 'রবি'/'সূর্য' — 'পিঙ্গলা', 'রবি'/'সূর্য' — 'রজঃ', 'শশি'/'চন্দ্র' — 'ললনা'/'ইড়া', 'বোধি-চিত্ত' — 'শুক্র', 'তরুণী' — 'মহামুদ্রা', 'গৃহিণী' — 'মহামুদ্রা'/'দিব্যমুদ্রা'/'জ্ঞান-মুদ্রা', 'করিন' — 'চিত্ত'।

A. Bharati তাঁর *"Intentional Language in the Tantras"* প্রবন্ধে 'বোধিচিত্ত' শব্দটি উদাহরণ দিয়ে সন্ধাশব্দের প্রকৃতি বিচার করেছেন। 'বোধিচিত্ত' শব্দটি সাধারণ অর্থে এবং 'সন্ধা' অর্থে বহু তান্ত্রিক গ্রন্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সাধারণ অর্থে 'বোধিচিত্ত' মানে 'বোধি-প্রয়াসী চিত্ত'। গুহ্যসমাজে সাধারণ অর্থে 'বোধিচিত্ত' শব্দটির প্রয়োগ বহু জায়গায় পাওয়া যায়। যেমন—

প্রকৃতি-প্রভাস্বরা ধর্মাঃ সুবিশুদ্ধা নভঃসমা। ন বোধির্ণাভিসময়ম্ ইদং বোধিনয়ং ['বোধিচিত্ত'] দৃঢ়ং ॥

'সন্ধা' অর্থে 'বোধিচিত্ত' মানে 'শুক্র'। এই অর্থে শব্দটির প্রয়োগও তান্ত্রিক গ্রন্থে পাওয়া যায়। যেমন পদ্মবজ্রের গুহ্যসিদ্ধিতে

ভগে লিঙ্গং প্রতিষ্ঠাপ্য বোধিচিত্তং ন চোৎসৃজেৎ।

কাহ্নের দোহাকোষের টীকায়ও বলা হয়েছে,

সহজে বোধিচিত্তং জায়তে শুক্রং উৎপদ্যতে।

'সাধারণ' এবং 'সন্ধা' অর্থে 'বোধিচিত্ত'-এর প্রয়োগ তান্ত্রিক গ্রন্থের বহু জায়গায় পাওয়া যায়। তান্ত্রিক গ্রন্থে কোনো কোনো শব্দের এই দ্বিবিধ অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে Eliade বলেছেন—

'. . . the tantric texts are frequently couched in intentional language—a secret, obscene language with a double meaning, wherein a particular state of consciousness is expressed in erotical terminology, the mythological and cosmological vocabulary of which is charged both with *haṭha*-yogic and with sexual significance.'

এইটি সন্ধাশব্দের প্রকৃত সংজ্ঞা।

চর্যাগানে 'সন্ধাশব্দ' ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু 'সন্ধাশব্দ' কোনগুলি? এ-সম্পর্কে টীকাকার মুনিদত্তের কিছু বক্তব্য আছে। তিনি গানগুলির তত্ত্বব্যাখ্যা করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন তাই 'সন্ধাশব্দ'গুলিকেও তাঁকে চিনে নিতে হয়েছে। টীকার অনেক জায়গায় বলা হয়েছে, "তুলিসন্ধা সঙ্কেতে বোদ্ধব্যং", "হরিণাশব্দ সন্ধ্যাভাষয়া কথয়তি", "নৌকাসন্ধ্যাভাষয়া বোদ্ধব্যং" ইত্যাদি। সুতরাং টীকাকারের নির্দেশানুসারে চর্যাগানে এই 'সন্ধাশব্দ'গুলি এবং তাদের অর্থ পাওয়া যাচ্ছে। 'তুলি' (২): 'মহাসুখকমল', 'বারুণী' (৩): 'সংবৃত্তিবোধিচিত্ত', 'হরিণা' (৬): 'চিত্ত', 'হরিণী' (৬): 'জ্ঞানমুদ্রা', 'ডোম্বী' (১০): 'পরিশুদ্ধাবধূতিকা', 'বড়িক' (১২): 'ষষ্ঠ্যুত্তরশতপ্রকৃতি', 'পুলিন্দ' (১৫): 'নপুংসক', 'মূষকঃ' (২১): 'চিত্তপবন', 'বন্ধ' (৪৮): 'বিটনাড়িকা', 'গঙ্গা জউনা' (১৪): 'চন্দ্রাভাসসূর্য্যাভাসৌ', নাই [নৌঃ] (১৪): 'শুক্রনাড়িকা',

মুনিদত্তের নির্দেশানুসারে 'তুলি', 'বারুণী', 'হরিণা', 'হরিণী', 'ডোম্বী', 'বড়িক', 'পুলিন্দা', 'মূষকঃ', 'বন্ধ', 'গঙ্গা জউনা', নাঈ— এইগুলি 'সন্ধাশব্দ'। কারণ, এই শব্দগুলির দ্বিবিধপ্রকারের অর্থ আছে—বাহ্যার্থ এবং সাধনা-সংক্রান্ত অর্থ। কিন্তু চর্যাগানে তো দ্বিবিধার্থক আরও অনেক শব্দ আছে। যেমন—

'শুণ্ডিনী' (৩): 'অবধূতিকা', 'নলিনীবন' (৯): 'মহাসুখকমল', মতিঅঁ (১২): 'প্রজ্ঞাপারমিতানুবদ্ধ্যা', 'মাতঙ্গী' (১৪): 'সহজযান-প্রত্তমাঙ্গী ডোম্বী নৈরাত্মা', ইত্যাদি। এগুলিকে টীকাকার 'সন্ধাশব্দ' বলেন নি কেন, বোঝা যাচ্ছে না। 'কমল কুলিশ' যে সন্ধা অর্থে 'ভগ' এবং 'লিঙ্গ' তা অন্য সূত্র থেকে জানা যাচ্ছে। কিন্তু মুনিদত্ত 'কমল কুলিশ'-কে 'সন্ধাশব্দ' বলেন নি। কিন্তু এ-সম্পর্কে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে 'সন্ধাশব্দ' সর্বত্র 'সন্ধা' অর্থে ব্যবহৃত নাও হতে পারে।

'সন্ধাশব্দ' ছাড়াও চর্যাগানে প্রচুর পারিভাষিক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন—

'মহাসুহ', 'ধমন', 'চমন', 'মণিকুল' (শব্দটিকে টীকায় 'মণিমূল' বলা হয়েছে), 'ওড়িআন', 'চান্দ', 'সূজ', 'আলি', 'কালি', 'জিনউর', 'বাম', 'দাহিণ', 'সহজ', 'দশবল', 'অনহা', 'পঞ্চতথাগত', 'গঅণ', 'হেরুঅ', 'সুন', 'করুণা', 'কাজ', 'কারণ', 'নিরামণি', 'নাদ', 'বিন্দু', 'বাজুল' ইত্যাদি।

পারিভাষিক শব্দের কোনো কোনোটি 'সন্ধা' অর্থে ব্যবহৃত হওয়া বিচিত্র নয়।

'সন্ধাশব্দ' এবং পারিভাষিক শব্দ কণ্টকিত এই গানগুলির আধ্যাত্মিক অর্থ দূরে থাক, বাচ্যার্থও সব ক্ষেত্রে এ-যুগের তান্ত্রিক-সাধনায় অনভিজ্ঞ পাঠকের কাছে স্পষ্ট নয়। টীকা ছাড়া শুধু গানগুলিই যদি আমাদের কাছে পৌঁছত তা হলে এর বাচ্যার্থ বুঝতেও আমাদের কষ্ট হত। টীকার

সাহায্যে গানগুলির আধ্যাত্মিক অর্থ কিছু বোঝা যায় তবে অন্য তান্ত্রিক গ্রন্থের সাহায্যে গানগুলির আধ্যাত্মিক অর্থ কিছু সরল হয়েছে।

৯

'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' পুথির লিপিকরের বানান-পদ্ধতি কিছু বিভ্রান্তিকর। বানানে লিপিকর কোনো নির্দিষ্ট রীতি অনুসরণ করেছেন বলে মনে হয় না। শহীদুল্লা পুথির বানানকে সংশোধন করতে চান। তাঁর মতে পুথিতে কি বানান আছে সেটা লক্ষ্য করার চেয়ে কি বানান হওয়া উচিত তার নির্দেশ দেওয়াই বড়ো কাজ। তিনি 'চর্যা'-কে 'চজ্জা', 'কুলিশ'-কে 'কুলিস', 'বিদ্যা'-কে 'বিজ্জা', 'শক্তি'-কে 'সত্তি'-তে পরিণত করতে চান। 'চর্যা', 'কুলিশ', 'বিদ্যা', 'শক্তি'—এগুলি সংস্কৃত শব্দ, তাই স্বভাবতই সংস্কৃত বানান-রীতি অনুসরণ করা হয়েছে। চর্যার পুথিতে এইরকম বহু সংস্কৃত শব্দ, সংস্কৃত বানানে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এর দ্বারাই প্রমাণ হচ্ছে যে ঐ যুগে বহু সংস্কৃত শব্দ বাংলাভাষার শব্দ-ভাণ্ডারকে পুষ্ট করেছে—দোহাকোষের ভাষায় এত সংস্কৃত শব্দ নেই, বাংলাভাষার এটি একটা বড়ো বৈশিষ্ট্য। সংস্কৃত 'বিদ্যা'-কে প্রাকৃতিক 'বিজ্জা'-য় পরিণত করবার অধিকার কোনো সম্পাদকের নেই। যদি কেউ করেন তা হলে তিনি ঐতিহাসিক প্রমাণকে বিকৃত করবেন। তবে যে বানান লিপিকরের অনবধানবশত ভুল বা বিকৃত সেগুলি সংশোধনের যোগ্য। 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' পুথির বানানে এই বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করা যায়।

১. বানানে অনেক সময় স্বরের দীর্ঘত্ব রক্ষিত হয় নি।

পিটা (২), তিনা (৩৩)

২. শব্দের আদ্যাক্ষরে 'অ'/'আ' বিপর্যয়। এই বিপর্যয়ের সবগুলি সম্ভবত বানানের নয়।

'মঝ' (১৩)/'মাঝ' (৪৪), 'পঙ্ক' (১৩)/'পাঙ্ক (১৪), 'অইস' (১৪)/

'আইস' (২৯),'অণ' (৪৪)/'আণ' (৪৪), 'হথা' (৪১)/'হাথেরে' (৩২), 'ঘরেঁ' (৪)/ 'ঘারেঁ' (৩৯), 'অছিলে' (৩৭)/'আচ্ছন্তে' (৩৯) 'ভ্রন্তি' (১৫)/'ভ্রান্তি' (১৫), 'সমাঅ' (৪৩)/'সামাঅ' (৩৩), 'অহারিউ' (১৯)/'আহারা' (২১), 'চন্দ' (১৪)/'চান্দ' (২৯) 'কবালী' (১১),/'কাবালী' (১৮)

৩. 'শ', 'ষ', 'স' যথেচ্ছা ব্যবহৃত হয়েছে।
'মুসা' (২১)/'মুষা', (২১), 'যহজে' (২৭)/'সহজ' (২৮), 'শূণ' (১৩)/ 'সুণ' (৩৬)

৪. ই/ঈ এবং উ/ঊ ইচ্ছামত ব্যবহৃত হয়েছে।
'লুই' (১) 'লূই'/(২৯), 'দীসঅ' (১৫)/'দিসই' (১৫), 'সবরী' (২৮)/ 'শবরি' (৫০), 'জোই' (১০)/'জোঈ' (৩৭)

৫. ণ/ন যথেচ্ছা ব্যবহার।
'ণিঅ' (৩০)/'নিঅ' (১৩)

৬. বানানে কোথায়ও কোথায়ও প্রাকৃতের সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি রয়ে গেছে, কোনো কোনো জায়গায় সরল হয়েছে।

(ক) -চ্ছ-/-ছ-
'পুচ্ছসি' (১৫), 'পুচ্ছতু' (৪১), 'পুছমি' (১০), মিচ্ছা (২৯), মিছেঁ (২২), 'আচ্ছন্তে' (৩৯), আচ্ছিলেঁ (৩৫), 'অছিলে' (৩৭), পদাদিস্থিত চ্ছ-/ছ-
'চ্ছাড়া' (৬), 'চ্ছাড়ী' (১৫), 'চ্ছাড়িঅ' (৩১), 'ছাড়অ' (৬), 'চ্ছিজই', (৪৬) 'ছিজঅ' (৪৫),

(খ) -জ্ঝ-/ঝ ঝ/ঝ
'বুঝিঝঅ' (৩০), 'বুঝিঝলে' (৩৯), 'বুঝসি' (১৫), 'বুঝতু' (৩২)

(গ) -ড্ড-/-ড়-

'নিয়ড্ডী' (৫), নিঅড়ি (৭), নিঅড় (১২), 'মোড্ডিউ' (৯), 'মোড়িঅ' (১৬),

(ঘ) -ট্ট-/-ট-

তুট্টই (৩০), 'তুটই' (৪৬),

(ঙ) -ঠ্য-[-ঠ্ঠ], -প্য-[-প্প-] /-ঠ-, -প-

'দুঠ্য' (৩৯), 'দুঠ' (৩৯), 'অপ্যনা' (৩৯), 'অপনা' (৩৯)

(চ) -ক্ক-/-ক-

'বিমুক্কা' (৪৬), 'বিমুক' (৩৭)

(ছ) -জ্জ-/-জ-

'সুজ্জ' (১৪), 'সুজ' (৪)

(জ) -ন্ন-/-ন-

'বিহুন্নে' (৩৫), 'বিহুনে' (১৩)

(ঝ) -ঠ্ঠ-/-ঠ-

'চৌষঠ্ঠী' (১০), চউশঠী (৩)

৭ একই শব্দের একাধিক বানান।

'নিংদ' (১৩)/নিদ (৩৬), 'কবালী' (১১)/'কাপালী' (১০)/'কাবালী' (১৮), 'ভন্তি' (১৫)/'ভ্রান্তি' (১৫)/'ভাংতি' (৪১)/'ভান্তী' (৪১), 'নইরামণি' (২৮)/'নিরামণি' (২৮)/'নৈরামণি' (৫০), 'পুণ্য' (১৬)/'পুন্ন' (৩৫), 'তৈলোএ' (৪২)/'তেলোএ' (৪৩), 'অলকৃখ' (১৫)/'অলক্ষ' (৪২)

৮. কোনো কোনো গানে -গ/-ঙ্গ, -ঙ্ক/-খ-, লে/-ড়ে, -লী/-রী, ইত্যাদিতে অন্ত্যমিল করা হয়েছে।

ক. বামদাহিণ চাপী মিলি মিলি মাগা।
বাটত মিলিল মহাযুহ সঙ্গা॥ (৮)

তুলনীয়: চিঅ কন্নহার সুনত মাঙ্গে।
চলিল কাহ্ন মহাসুহ সাঙ্গে॥ (১৩)

খ. আলো ডোম্বি তোএ সম করিবে ম **সাঙ্গ**।
নিঘিন কাহ্ন কাপালি জোই **লাগ**॥ (১০)

গ. তিনি ভুঅন মই বাহিঅ **হেলেঁ**।
হাঁউ সুতেলি মহাসুহ **লীড়ে**॥ (১৮)

ঘ. জা এথু জাম মরণে **বিশঙ্কা**।
সো করউ রস রসানেরে **কংখা**॥ (২২)

তুলনীয় : উজুরে উজু ছাড়ি মা লেহুরে **বঙ্ক**।
নিঅড়ি বোহি মা জাহুরে **লাঙ্ক**॥ (৩২)

ঙ. কাজ ন কারণ জএহু জ**অতি**।
সঁএ সঁবেঅন বোলথি **সান্তি**॥ (২৬)

তুলনীয় : জে সচরাচর তিঅস **ভমন্তি**।
তে অজরামর কিম্পি ন **হোন্তি**॥ (২২)

চ. চান্দিঅ ষষহর গউ **নিবাণেঁ**।
কমলিনি কমল বহই **পনালেঁ**॥ (২৭)

ছ. নিঅ ঘরিণী ণামে সহজ **সুন্দারী**।
ণাণা তরুবর মৌলিলরে গঅণত লাগেলী **ডালী**॥ (২৮)

জ. পেখসি দহদিহ সর্ব্বই **শূন**।
চিঅ বিহুন্নে পাপ ন **পুন্ন**॥ (৩৫)

তুলনীয় : চিঅ সহজে শূন **সংপুন্না**।
কান্ধবিয়োএ মা হোই **বিসন্না**॥ (৪২)

ঝ. বাঁঝিসুআ জিম কেলি করই খেলই বহুবিহ **খেড়া**।
বালুআতেঁলেঁ সসরসিংগে আকাশ **ফুলিলা**॥ (৪১)

ঞ সুনতরু গঅন **কুঠার**।
ছেবহ সো তরু মূল ন **ডাল**॥ (৪৫)

ট. ফাটই হরিহর বাহ্ম **ভল্লা**।
ফাঁটা হই নবগুণ শাসন **পড়া** ॥ (৪৭)

৯. অন্ত্যমিলে -অ/-ই

(ক) তরঙ্গন্তে হরিণার খুর ন **দীসঅ**।
ভুসুকু ভণই মুঢ়া হিঅহি ণ **পইসঈ**। (৬)

(গ) অকট করুণা ডমরুলি **বাজঅ**।
আজদেব নিরাসে **রাজই** ॥ (৩১)

(ঘ) চান্দরে চান্দকান্তি জিম **পতিভাসঅ**।
চিঅ বিকরণে তহি টলি **পইসই** ॥ (৩১)

১০. সংস্কৃত শব্দের বানানে বহু জায়গায় সংস্কৃত বানান-রীতির অনুসরণ করা হয়েছে।

'চঞ্চল' (১), 'গম্ভীর' (৫), 'দ্বাদশ' (৩৪), 'শঙ্কা' (৩৭), 'জলবিম্ব' (৩৯)

লিপিকরের বানান-প্রবৃত্তির যে বৈশিষ্ট্যের কথা উপরে বলা হল সেগুলিকে শহীতুল্লা লিপিকর প্রমাদ বলে সংশোধন করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এর মধ্যে অনেকগুলি অবশ্যই লিপিকর প্রমাদ। একই গানে 'শান্তি' এবং 'সান্তি' আছে, তাতেই প্রমাণ হয় বানানের দিকে লিপিকরেব লক্ষ্য ছিল না। কিন্তু বানানের সব বৈশিষ্ট্যগুলিই কি লিপিকরের অনবধান বা অজ্ঞানবশত ঘটেছে? এমন মনে করবার সঙ্গত কারণ নেই।

বানানে সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি এবং সরলীকৃত একক ব্যঞ্জনধ্বনি ধ্বনি-পরিবর্তনের দুটি স্তর নির্দেশ করে। -ড্ড-/-চ্ছ-/-ক্ক-/-জ্জ-/-ন্ন- ইত্যাদি অবহট্ট স্তরের, -ড়-/-ছ-/-ক-/-জ-/-ন-/প্রাচীন বাংলাস্তরের। তবে সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনিযুক্ত শব্দগুলিকে অবহট্টের লুপ্তাবশেষ মনে করবার সঙ্গত কারণ নেই, কারণ '-ইলে' প্রত্যয়যুক্ত 'আচ্ছিলে' (৩৫) এবং 'বুঝ্ঝিলে' (৩৯) শব্দ

অবহট্ঠ স্তরে সম্ভব নয়। তাই অনুমান করা যায় যে বানান-প্রবৃত্তি ধ্বনি পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে চলে নি। মুখের ধ্বনির পরিবর্তন ঘটে গেছে, কলমের মুখে সে-পরিবর্তন সর্বত্রগামী হয় নি।

১০

চর্যাগানগুলি যে-ভাষায় লেখা সে-ভাষা কত পুরানো? শাস্ত্রী বলেছেন এক হাজার বছরের পুরানো। এ-সিদ্ধান্তে যুক্তি কি? যুক্তি গীত-রচয়িতাদের আবির্ভাবকাল। শাস্ত্রীর অনুমান চর্যাগীতকারেরা এক হাজার বছর আগে আবির্ভূত হয়েছিলেন। কিন্তু গীতকারদের আবির্ভাবকাল সম্পর্কে যে-সব লোকশ্রুতি, কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে তার কোনোটিকেই ঐতিহাসিক প্রমাণ হিসাবে গ্রাহ্য করা চলে না। সাধারণভাবে অনুমান করা যায় যে সিদ্ধাচার্যেরা দশম থেকে ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন। কেউ কালের সীমানা আরও কয়েক শো পিছিয়ে নিয়ে যেতে ইচ্ছুক, কিন্তু সেটা প্রমাণের সাহায্যে নয়, আন্দাজের জোরে। যদি গীতরচয়িতাদের আবিভাবকাল নিশ্চিত-ভাবে জানা যেত তা হলে চর্যাগানের রচনাকাল সম্পর্কে সঠিক ধারণা পাওয়া যেত বটে কিন্তু চর্যার ভাষার যে নিদর্শন আমাদের হস্তগত হয়েছে তার বয়স ঠিক হত না। কারণ, গানগুলি রচয়িতাদের স্বহস্তলিখিত পুথিতে পাওয়া যায় নি, পাওয়া গেছে পরবর্তীকালের লিপিকরের নকল করা পুথিতে। মধ্যযুগের কবি কৃত্তিবাসের আবির্ভাবকাল আমরা নিশ্চিতভাবে জানি না বটে, কিন্তু কৃত্তিবাসের রামায়ণ যে-ভাষায় আমাদের কাছে পৌঁচেছে সে-ভাষাকে আমরা কখনই কবির সমসাময়িক-কালের ভাষা বলে স্বীকার করি না। তা হলে চর্যাগানের ভাষাকেও সিদ্ধাচার্যদের সমসাময়িককালের ভাষা বলে ধরব কেন? চর্যাগানগুলি

গেয় সাহিত্য। গায়কের কণ্ঠে কণ্ঠে গানগুলি প্রচারিত হয়েছে। রচয়িতারা গানগুলিকে আদৌ কালির অক্ষরে পুথির পাতায় লিপিবদ্ধ করেছিলেন কিনা আমরা জানি না। হয়তো করেন নি। করলেও কতগুলি লিপিকরের কলমে ভাষার রূপ কালে কালে কতখানি পরিবর্তিত হয়েছে তা আমরা জানি না বটে কিন্তু সহজেই অনুমান করতে পারি। এক 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' পুথির পাতায় ভাষার পরিবর্তনের দুটি স্তর আমাদের চোখের সামনে স্পষ্ট ধরা পড়ছে। পরিবর্তনের এই রকম আর কটি স্তর আমাদের চোখের আড়ালে ঘটে গেছে তা অনুমান করা শক্ত নয়। একটি উদাহরণ দিচ্ছি। ৩২-সংখ্যক চর্যা-গানের টীকায় "তথাচ চর্যান্তরং" বলে পূর্বে ব্যাখ্যাত একটি চর্যাগানের শেষ লাইনটি উদ্‌ধৃত করা হয়েছে। সেই উদ্‌ধৃতিটি এবং মূল গানের শেষ লাইনটি তুলনা করলেই বোঝা যাবে গানগুলির ভাষার কিরকম পরিবর্তন ঘটেছে।

টীকার উদ্‌ধৃতি : ঘটমনগুম্নাখড়দতি বোহঅ অক্ষি বুঝিঅা মাগ চালী॥
মূল গানের পাঠ : ঘাট ন গুমা খড়তড়ি নো হই আখি বুজিঅ বাট জাইউ॥

আরও কয়েকটি বিষয় এই প্রসঙ্গে বিবেচনা করে দেখা দরকার। 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' পুথিতে ভাষার যে নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে তার মধ্যে ভাষার একটা 'uniform pattern' সহজেই আবিষ্কার করা যায়। ভাষার মধ্যে heterogenous উপাদান অবশ্যই আছে, কিন্তু সে উপাদানগুলি প্রায় প্রত্যেকটি গানে সমানভাবে মিশে আছে, সুতরাং heterogenous উপাদানও গানের ভাষার মধ্যে প্রায় homogenous হয়ে গিয়েছে। সব গানগুলির মধ্যে ভাষার একই রূপ যদি না থাকত তা হলে ভাষার সাক্ষ্যে একজন কবির রচনা আর একজনের রচনা থেকে সহজেই আলাদা করে বেছে নেওয়া যেত এবং এই উপায়ে কবিদের আবির্ভাবকালের ক্রম-পারম্পর্যটিও ধরা যেত।

আমরা জানি কাহ্ন নামাঙ্কিত সব চর্যাগানগুলি একজনের রচনা নয়। কাহ্ন নামাঙ্কিত একাধিক চর্যাকার ছিলেন এবং তাঁরা সকলে একই সময় আবির্ভূত হন নি। কিন্তু ভাষার সাক্ষ্যে কাহ্ন নামাঙ্কিত চর্যাগান-গুলিকে কি একাধিকভাগে ভাগ করা সম্ভব? সুতরাং মোটামুটিভাবে বলা যায় যে চর্যার ভাষা একটি বিশেষ যুগের ভাষা এবং যে-কয়জন কবির রচনা এই পুথিতে পাওয়া যাচ্ছে তাঁদের আবির্ভাবকালের মধ্যে পার্থক্য যাই থাক তাঁদের প্রত্যেকেরই ভাষা এক এবং অভিন্ন। কিন্তু এরকম তো হওয়ার কথা নয়। চর্যাগানের ভাষা তো কোনো যুগবিশেষের ভাষা নয়। রচয়িতাদের মধ্যে কালের ব্যবধান এক শো দু শো তিন শো এমন-কি চার শো বছর হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু এই কালের ব্যবধান তাদের রচনায় ভাষার ব্যবধান সৃষ্টি করে নি। গানগুলিতে আমরা বাংলাভাষার চার শো বছরের ইতিহাস দেখতে প্রত্যাশা করি, পরিবর্তে পাচ্ছি একটি যুগের ভাষার নিদর্শন। আরও একটি কথা। যে-সময় গানগুলি রচিত হয়েছে সে-সময় বাংলাভাষার কোনো সাহিত্যিক আদর্শ গড়ে ওঠে নি। তাই স্বভাবতই লিখিত ভাষার উপর রচয়িতাদের মুখের ভাষার প্রভাব কিছু বেশি ছিল। সিদ্ধাচার্যদের কিম্বদন্তীতে কিছুমাত্র সত্য থাকলে স্বীকার করতে হয় তাঁরা কোনো একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের লোক নয়, সিদ্ধাচার্যদের মধ্যে একাধিক অঞ্চলের লোক ছিল। এবং এই বিভিন্ন অঞ্চলে অবশ্যই একাধিক উপভাষা প্রচলিত ছিল। এই উপভাষার চিহ্ন গানগুলিতে আমরা দেখতে প্রত্যাশা করি। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় অনুমান করেছেন, চর্যাগানগুলির ভাষা পশ্চিমবঙ্গের কোনো উপভাষার উপর প্রতিষ্ঠিত।

কিন্তু চর্যাগানে একাধিক উপভাষার চিহ্ন থাকা উচিত, গানগুলির ভাষার মধ্যে তা খুঁজে পাওয়া শক্ত। সেই কারণে স্বীকার করতে হয় সিদ্ধাচার্যেরা যে ভাষায় চর্যাগানগুলি লিখেছিলেন সে-ভাষা মাঝপথে

লুপ্ত হয়ে গেছে। চার শো বছরের বাংলাভাষার ইতিহাস একটি শতাব্দীর ভাষার নিদর্শনের মধ্যে সঙ্কুচিত হয়ে আমাদের কাছে পৌঁচেছে। স্বভাবতই তাই চর্যার ভাষার বয়স ঠিক করতে গেলে আমরা দুটি সমস্যার সম্মুখীন হই— এক, চর্যাগানগুলির রচনাকাল— এ-সময়টা জানা যায় রচয়িতাদের আবির্ভাবকাল নিশ্চিতভাবে জানা গেলে। দুই, 'চর্যাচর্য-বিনিশ্চয়' পুথির লিপিকাল— এটি জানা গেলে চর্যার ভাষার বয়স জানা যায়। সাধারণত আমরা এই দুটি সমস্যাকে একটিতে পরিণত করে গীতকারদের আবির্ভাবকাল নিয়েই বেশি মাথা ঘামিয়েছি, এবং আশা করেছি রচয়িতাদের আবির্ভাবকালের উপরই ভাষার বয়স নির্ভর করছে। আসলে চর্যাগানের ভাষা যে-অবস্থায় আমাদের কাছে পৌঁচেছে তা 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' পুথির লিপিকালের সমসাময়িক।

১১

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী চর্যাগানগুলি যেভাবে প্রকাশ করেছিলেন তাতে পাঠের কিছু গোলমাল ছিল। তা স্বাভাবিক। পুথির অক্ষর সম্পূর্ণ অপরিচিত না হলেও সুপরিচিতও নয়। কয়েক জায়গায় শাস্ত্রীকে আন্দাজে অক্ষর চিনতে হয়েছে, আন্দাজ সব জায়গায় খাটে নি। পুথির ভাষা অপরিচিত, অর্থ দুর্বোধ্য। এখনকার ছাপা বইতে বা লিখিত বাংলায় পাঠককে পদ-বিভাগ (word division) করতে হয় না। শব্দের মধ্যে ফাঁক থাকে, তাতে শব্দগুলিকে আলাদা করে দেখতে পাওয়া যায়। ফাঁক না থাকলেও অর্থবোধে বাধা হয় না, কারণ ভাষার ব্যাকরণ জানা, শব্দগুলি চেনা। 'কথাটাযেনজানাজানিনাহয়'— আজকের পাঠকের কাছে বিভ্রান্তি-কর নয়। কারণ, শব্দগুলি পরিচিত। চর্যার পুথি যে-ভাষায় লেখা সে-ভাষা শাস্ত্রীর কাছে নূতন, তদুপরি পুথিতে পদবিভাগ নেই। তাই পুথি সম্পাদনায় শাস্ত্রীর দুরূহ কাজ ছিল এক-একটি লাইনের অন্তর্গত

সমস্ত শব্দগুলিকে আলাদা আলাদা করে চিনে নেওয়া। এ-কাজ দুরূহ এই কারণে যে ভাষার ব্যাকরণের কাঠামোটি তখন পর্যন্ত স্পষ্ট বোঝা যায় নি। তাই শব্দের শৃঙ্খল কোথায় ভাঙতে হবে, কোন্‌টি মূল শব্দ, কোন্‌টি বিভক্তি তা ঠিক করতে শাস্ত্রী বিব্রত হয়েছিলেন। সুতরাং 'ডোম্বিতআগলি' এই পদপরম্পরার (word sequence) উপযুক্ত পদ-বিভাগ কি—'ডোম্বিত আগলি' অথবা 'ডোম্বি তআগলি'—তা শাস্ত্রী যখন পুথি সম্পাদনা করেছেন তখন পর্যন্ত সমস্যা ছিল।

পরবর্তীকালে একাধিক বিশেষজ্ঞ শাস্ত্রীর পাঠকে সংশোধন করেছেন ; তাঁদের সংশোধন দেখে বোঝা যাচ্ছে যে শাস্ত্রী কয়েক জায়গায় পুথি পড়তে গোলমাল করেছিলেন, কয়েক জায়গায় তাঁর পদ-বিভাগ ঠিক হয় নি।

১. চর্যার পুথিতে ড/ড়/উ—এই তিনটি অক্ষরের আলাদা আকার নেই। ড়-এর নীচে বিন্দু নেই, উ-র মাথায় চৈতন নেই। তাই আধুনিক ড-এর মতো একটি অক্ষর দিয়ে 'ডাল', 'নিঅড়ি' এবং 'উবেসেঁ'—এই তিনটি শব্দের ড, -ড়-, এবং উ লেখা হয়েছে। সেই কারণে ('ভেদ'>) 'ভেউ'-কে শাস্ত্রী 'ভেড়' (৪৩) পড়েছিলেন, 'গাইউ'-কে পড়েছিলেন 'গাইড়' (২।৯)।

খ/থ-এর গোলমাল লিপিকরেরও হতে পারে, শাস্ত্রীর পড়তেও ভুল হতে পারে। অক্ষর দুটির মধ্যে পার্থক্য সামান্য (চর্যার লিপিমালা দ্রষ্টব্য)। তাই 'কংখা'-র জায়গায় আছে 'কংথা' (৩৭), 'শাখি' র জায়গায় 'শাথি' (৩৬), ড/ড়, এবং ঢ/ঢ়-এর মধ্যে লিপিগত পার্থক্য নেই। শাস্ত্রী তাই কোথাও 'ড' পড়েছেন, কোথাও ড়, সেইরকম কখনও ঢ, কখনও ঢ়। যেমন, ফুড় (৪৭), ফুড (৬৬), মূঢা (৬), মূঢ়া (৪২)।

পুথিতে 'ঠ'-এর আকার শূন্যের মতো (লিপিমালা দ্রষ্টব্য), গোল্লাকার 'ঠ'-এর সঙ্গে আ-কার যুক্ত হওয়ায় অক্ষরটিকে মাত্রাহীন ণ-এর মতো

দেখায়। তাই 'বইঠা'-কে শাস্ত্রী 'বইণ '(১) পড়েছেন। পুথির অন্ত -'ঠা' এবং -'ঠো'-র সঙ্গে তুলনা করলে শাস্ত্রীর ভুলের কারণ বোঝা যায়।

শহীদুল্লা একটি প্রবন্ধে[১] বলেছেন প্রাচীন লিপিতত্ত্বও চর্যাগানের পাঠ-সংশোধনে সাহায্য করে। ঠিকই। কিন্তু লিপিতত্ত্বের সাহায্য সতর্কতার সঙ্গে না নিলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা। এ-সম্পর্কে তিনটি বিষয় স্পষ্ট হওয়া চাই।

ক. লিপিকর-প্রমাদ। পুথিতে লিপিকর-প্রমাদ বহু আছে। লিপিকর যন্ত্র নয়, মানুষ; ভুল হওয়া স্বাভাবিক। লিপিকর 'ত'-এর জায়গায় 'ট' এবং 'প'-এর জায়গায় 'খ' লিখতে পারেন। এবং সম্ভবত লিখেছেন।

খ. শাস্ত্রী পুথি পড়তে ভুল করতে পারেন। সে-ক্ষেত্রে ভুল লিপিকরের নয়, সম্পাদকের। এরকম ভুল শাস্ত্রী কয়েক জায়গায় করেছেন।

গ. দুটি অক্ষরের আকারের সাদৃশ্যবশত ভুল হওয়ার সম্ভাবনা আছে। একমাত্র এই প্রকারের ভুলই লিপিতত্ত্বের সাহায্যে সংশোধন করা যেতে পারে। 'সগাঅ' (৪)-র জায়গায় যে 'সমাঅ' হবে— এ কথা লিপিতত্ত্ব থেকে জানা যাবে না। 'গ' এবং 'ম' আকারে এত পৃথক যে এই ভুল অক্ষরের আকার সাদৃশ্যবশত নয়। লিপিতত্ত্বের সাহায্যে অনুমান করা যায় 'ভইম'-র জায়গায় 'ভইঅ' হতে পারে; কারণ 'ম' এবং 'অ' আকারে প্রায় একরকম।

লিপিতত্ত্বের সাহায্যে পাঠ সংশোধন করতে গিয়ে শহীদুল্লা 'রাহঅ' (৩৬) স্থানে 'চাহই' পড়েছেন। কারণ, "বাঙ্গালার প্রাচীন লিপিতত্ত্ব

১. বৌদ্ধগান ও দোহার পাঠ আলোচনা, সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা, ৪৮শ ভাগ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৩৪৮, পৃ. ৭৮-৮৬

হইতে আমরা জানি যে, র ব চ, এই তিন অক্ষরের মধ্যে গোলযোগ সম্ভবপর ছিল।" এখানে সম্ভবত শহীদুল্লা অষ্টাদশ শতকের পুথির লিপির কথা বলেছেন। চর্যার পুথিতে র. ব. চ.-এই তিনটি অক্ষরের গোলযোগ একেবারে অসম্ভব (লিপিমালা দ্রষ্টব্য)। আধুনিক লিপিতে র এবং ব-এর আকার এক, পার্থক্য শুধু একটি বিন্দুর। কোনো কোনো পুথিতে এই বিন্দুটিও থাকে না তাই র-ব অভিন্ন, যেমন ড/ড়, ঢ/ঢ়। কিন্তু চর্যার পুথিতে র-এর পেটটি এমনভাবে মসীলিপ্ত যে তাকে চ বা ব-এর সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা প্রায় অসম্ভব। সুতরাং প্রাচীন বাংলার লিপিতত্ত্বের নজিরে 'রাহঅ'-কে 'চাহই' করা চলে না, অন্য নজির দেখতে হবে।

চর্যার পুথিতে নিম্নলিখিত অক্ষরগুলির মধ্যে গোলযোগ হওয়া সম্ভব। ম/অ, খ/থ, ড/ড়/উ, ঢ/ঢ়, ত/দ, প/ব, ন/ল, ধ/ব, য/য়, শু/শ্ব, ণ/ল।

২. কয়েক জায়গায় শাস্ত্রীর পদ-বিভাগ ঠিক হয় নি।

পদপরম্পরা	শাস্ত্রীর পদ-বিভাগ	শুদ্ধ পদ-বিভাগ
"সভাবিঅই"	"সভাবি অই" (২৬)	"স ভাবিঅই"
"পসরিউরে"	"পসরি উরে" (২৩)	"পসরিউ রে"
"দিধলিবলী"	"দিধ লিবলী" (৫০)	'দিধলি বলী"
"জালইঅচ্ছমতাহের"	"জালই অচ্ছমতা হের" (২৯)	"জা লই অচ্ছম তাহের"
"মুষাএর"	"মুষা এর" (২১)	"মুষাএর"
"কাজণকারণ"	"কাজণ কারণ" (১৮)	"কাজ ণ কারণ"
"ডোম্বিতআগলি"	"ডোম্বি তআগলি" (১৮)	"ডোম্বিত আগলি"
"কোবীনদেখী"	"কো বী ন দেখী" (১৬)	"কোবী ন দেখী"
"বাহবাণজাই"	"বাহবাণ জাই" (১৪)	"বাহবা ণ জাই"
"মোহিঅহি"	"মোহিঅহি" (৭)	"মো হিঅহি"
"মূঢাহিঅহিণপইসঙ্গ"	"মূঢা হিঅ হি ণ পইসঙ্গ" (৬)	"মূঢ়া হিঅহি ণ পইসঙ্গ"

পদপরম্পরা	শাস্ত্রীর পদ-বিভাগ	শুদ্ধ পদ-বিভাগ
"একসডুলী"	"এক স ডুলী" (২)	"এক ঘড়ুলী"

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় চর্যার ভাষার ব্যাকরণ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা স্পষ্ট করে দিয়েছেন, তাই প্রবোধচন্দ্র বাগচী, মোহম্মদ শহীদুল্লা এবং সুকুমার সেন চর্যাগানের পাঠ-বিভ্রাট কিছু পরিমাণে সমাধান করতে পেরেছেন। চর্যার পাঠ সংশোধনের উপাদান পাঁচটি—ছন্দ-ব্যাকরণ, সংস্কৃত টীকা, টীকার পাঠান্তর, তীব্বতী অনুবাদ, পুথির লিপি। এর মধ্যে ব্যাকরণের সাক্ষ্যের জোর বেশি। তীব্বতী অনুবাদ এবং সংস্কৃত টীকা সব জায়গায় নির্ভরযোগ্য নয়। দুটি উদাহরণ দেওয়া যাচ্ছে।

মুদ্রিত পাঠ—"গুরুবোধসে সীসা কাল" (৪০)

তীব্বতী অনুবাদ—"গুরুর বোধের দ্বারা শিষ্য ভ্রান্ত হইবে"

সংস্কৃত—"বজ্রগুরু···বচনদরিদ্র স্তেন যুক্তঃ। তস্য শিষ্যেণাপ্যবচস্তেন···কিঞ্চিন্ন শ্রুতম্।"

এখানে স্পষ্টই মূল গানের পাঠ বিকৃত, তীব্বতী অনুবাদক সেই বিকৃত পাঠের অনুবাদ করেছেন। টীকাকারের ব্যাখ্যা থেকে শুদ্ধ পাঠ অনুমান করা যাচ্ছে—"গুরু বোব সে সীসা কাল"।

অন্যত্র তীব্বতী অনুবাদে শুদ্ধ পাঠের ইঙ্গিত, সংস্কৃত টীকায় বিকৃত পাঠের সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে।

মুদ্রিত পাঠ—"কালেঁ বোব সংবোহিঅ জইসা" (৪০)

তীব্বতী অনুবাদ—"বোবা কালাকে যেমন উপদেশ দিল"

সংস্কৃত টীকা—"যথা বধিরঃ সংকেতাদিনা মূকস্য সংবোধনং করোতি"।

সংশোধিত পাঠ—"কাল বোবেঁ সংবোহিঅ জইসা।"

এখানে 'বোব' যেন 'বোবেঁ সংবোহিঅ জইসা।"

এখানে 'বোব'-কে যে 'বোবেঁ' করা হল তাও ব্যাকরণের জোরে। তীব্বতী অনুবাদে যথার্থ পাঠটি পাওয়া যাচ্ছে না, পাওয়া যাচ্ছে

অর্থের আভাস। সেই অর্থের আভাসে এবং ব্যাকরণের সাহায্যে পাঠটি সংশোধন করতে পারা গেল।

পাঠ-সংশোধনে প্রবোধচন্দ্র বাগচী তীব্বতী অনুবাদের উপর বেশি নির্ভর করেছেন। শহীদুল্লা ব্যাকরণ এবং ধ্বনি পরিবর্তনের নিয়মের উপর জোর দিয়েছেন। সুকুমার সেন টীকা থেকে সাহায্য নিয়েছেন বেশি, কিন্তু মোটামুটিভাবে শাস্ত্রীর পাঠ-কে রক্ষা করতে চেষ্টা করেছেন।

শহীদুল্লা পাঠ-সংশোধনে চরমপন্থী। তাঁর মতে সংস্কৃত বানানের পরিবর্তন করা উচিত, বর্গীয় এবং অন্তস্থ ব (যার ব্যবহার চর্যার পুথিতে নেই) ব্যবহার করা উচিত। তিনি 'ঠাবী'-র পরিবর্তে 'ঠাৰী' পাঠ সমর্থন করেন, 'বিকণঅ' (১০)-কে 'বিকণহ, চ্ছিণালী' (১৮)-কে 'ছিণালী', 'দিবসই' (২)-র পরিবর্তে 'দিবসহি', 'হোই' (১৫)-র জায়গায় 'হোহী' পাঠের নির্দেশ দিয়েছেন। শহীদুল্লার নির্দেশানুসারে চর্যার পাঠ সংশোধিত হলে সে-পাঠ ব্যাকরণসম্মত হয় ঠিকই। কিন্তু সে-পাঠ যে মূলের কাছাকাছি পৌঁছয় তা বলা যায় না। 'কর্ম' এবং 'কাম' দুই-ই এখনকার বাংলা ভাষায় চলছে। আমরা 'কর্ম' সংস্কৃত শব্দ বলে তাকে বাংলা 'কাম' করি নি। অবহট্টের পরের স্তর বাংলা, বাংলার স্তরে পদার্পণের পরই ভাষা অবহট্টের খোলসমুক্ত হল এমন মনে করবার কারণ নেই।

চর্যায় ব্যবহৃত অনেক শব্দের অর্থ আমরা জানি না, অনেক প্রয়োগও এখনও ধাঁধাঁর মতো। তুলনা করবার মতো উপাদান বেশি নেই। যেখানে আমাদের জ্ঞান এত সামান্য উপাদানের উপর নির্ভর করছে সেখানে সংশোধনের ব্যাপারে একটু বেশি সতর্ক হওয়া দরকার।

চর্যার পাঠ-বিভ্রাটের কয়েকটি উদাহরণ এখানে দেওয়া যাচ্ছে।

১. হাথেরে কাঙ্কণ মা লোউ দাপণ (৩২)

এই লাইনটির 'লোউ' শব্দটি নিয়ে মতদ্বৈত আছে। বাগচী-শহীদুল্লা

উভয়েই 'লোউ'-কে বিকৃত পাঠ মনে করেছেন। বাগচীর মতে শুদ্ধ পাঠ 'লেউ', শহীদুল্লার মতে 'লেহু'। মতবিরোধ বিভক্তি নিয়ে, উভয়ে একমত 'লো'-ধাতু ঠিক নয়, 'লে-'ধাতু ঠিক। এক নম্বর চর্যাগানে 'লাহু' আছে; বাগচী-শহীদুল্লা 'লাহু'-কে 'লেহু'-তে পরিণত করেছেন। চর্যাগানে 'লইআ' (২৮), 'লাইঅ' (১১), 'লেই' (১৭), 'লোউ' (৩২) সবই পাওয়া যাচ্ছে। সম্ভবত 'ল-', 'লা-', 'লে-', 'লো-'—এই চারটি ধাতু এক বা একাধিক উপভাষায় চালু ছিল। চালু ছিল কিনা নিশ্চিতভাবে জানবার উপায় যখন নেই, তখন এর মধ্যে যে-কোনো একটিকে শুদ্ধ এবং অপরগুলিকে বিকৃত মনে করবারও কারণ নেই। তা ছাড়া চারটি ধাতুর তিনটিকে অশুদ্ধ মনে করলে এই তিন জায়গায় লিপিকরের লিপিকে অবিশ্বাস করতে হয়। সে-অবিশ্বাস অসঙ্গত। চর্যার ভাষায় অবশ্যই একাধিক উপভাষার মিশ্রণ আছে। এই উপভাষাগুলির নিদর্শন লিপিকরের কলমের খোঁচায় খোঁচায় প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, ছিঁটেফোঁটা যা অবশিষ্ট আছে তা 'ল'-, 'লা'-, 'লে-', 'লো'-র মতো ধাতুতে। এগুলিকে সংশোধন করা সংগত নয়। শহীদুল্লা মুদ্রিত পাঠের প্রত্যয়ও পরিবর্তন করতে চান। 'লোউ' প্রথম পুরুষের অনুজ্ঞা, 'লেহু' মধ্যম পুরুষের অনুজ্ঞা। হয়তো মধ্যম পুরুষের অনুজ্ঞা হলে আমাদের আধুনিক বুদ্ধিতে অর্থ-সংগতি ভালো হয়। কিন্তু গানগুলি তো আধুনিক পাঠকের উপযোগী করে লেখা নয়; তাই 'লোউ'-কে 'লেহু'-তে পরিবর্তিত করাও অনুচিত।

২. 'রূপা থোই মহিকে ঠাবী' (৮)

এই পাঠ ঠিক হলে অর্থ হয়, "রূপা রেখে মহির (=মহীর) ঠাই"। গোলমাল বাধে 'মহিকে' নিয়ে। 'মহি' ধরা গেল 'মহী', কিন্তু '-কে' বিভক্তি কিসের। ষষ্ঠীতে '-ক' বিভক্তি দু-এক জায়গায় আছে। কিন্তু '-কে' নেই। টীকায় জায়গাটির অর্থ পাওয়া গেল "স্থান ভেদং নাস্তি",

সেই অনুসারে "মহিকে" সংশোধন করে করা হল "নাহিকে"। "নাহিকে" শব্দটি ঐ গানের অন্য লাইনেও পাওয়া যাচ্ছে। এই পাঠ যদি ঠিক হয় তা হলে বুঝতে হবে লিপিকর 'না' লিখতে গিয়ে 'ম' লিখে ফেলেছিলেন। কিন্তু লিপিকরের পক্ষে এ-রকম ভুল করা কি সম্ভব। চর্যার লিপিতে অবশ্য 'ম' 'ন'-র গোলমাল হওয়ার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নেই। অগত্যা লিপিকরের ভুল। কিন্তু এইভাবে চর্যার পুথি লিখতে গিয়ে লিপিকর কত জায়গায় ভুল করেছিলেন তার যদি হিসাব নেওয়া যায় তা হলে দেখব লিপিকর শুদ্ধ করে যতটুকু লিখেছিলেন তার চেয়ে বেশি লিখেছিলেন অশুদ্ধ করে। তাও কি ঠিক? এই সম্ভব-অসম্ভবের কথাটাও সংশোধন করবার সময় স্মরণ রাখা উচিত।

৩. 'তিশরণ নাবী কিঅ অঠকমারী' (১৩)

এই লাইনের 'অঠকমারী' নিয়ে গোলমাল। শাস্ত্রী এখানে পদ-বিভাগ করেছেন 'অঠক মারী', টীকায় পাঠ পাওয়া যাচ্ছে 'অঠকুমারী'। একেও যদি শাস্ত্রীকে অনুসরণ করে পদ-বিভাগ করি তা হলে হয় 'অঠকু মারী'। এই পদ-বিভাগে গোলমাল -ক/-কু নিয়ে। '-ক' ষষ্ঠীর বিভক্তি বটে, কিন্তু 'অঠক'-র পরে আছে ক্রিয়া 'মারী'। সুতরাং ষষ্ঠী-বিভক্তি এখানে অচল, এই জায়গায় একমাত্র দ্বিতীয়া বিভক্তির প্রয়োগ সম্ভব, কিন্তু-ক/-কু দিয়ে দ্বিতীয়া বিভক্তির কোনো উদাহরণ চর্যাগানে নেই। তা ছাড়া, বাক্যগঠনের দিক থেকে 'কিঅ' এই ক্রিয়াপদের পরে কেবলমাত্র বিশেষ্যই বসতে পারে। যেমন 'কিঅ কেড়আল' (৩) 'কিঅঅবধূতি', 'কিঅ আন্নতুধাম'। সুতরাং 'কিঅ অঠকমারী' এই পাঠকেই বাক্যগঠনের রীতি-অনুসারে স্বীকার করতে হয়।

১২

এবার 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' পুথির কয়েকটি অক্ষরের গঠন সম্পর্কে সাধারণ-ভাবে কিছু আলোচনা করা যাচ্ছে।

বৌদ্ধগান ও দোহা'র ভূমিকায় চর্যাচর্যবিনিশ্চয় পুথির লিপিকাল ও লিপিবৈশিষ্ট্য[১] সম্পর্কে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কোনো অভিমত প্রকাশ করেন নি ; তবে ঐ বই-এর পঁচিশ পৃষ্ঠায়[২] একটি মন্তব্য আছে—

পোই এই দুটি অক্ষরের পর একটি আ বার শতাব্দীর বাঙ্গালা অক্ষরে উপরে তুলিয়া দেওয়া আছে।

এই মন্তব্য থেকে অনুমান করা যায় যে শাস্ত্রীর ধারণা ছিল পুথির লিপিকাল দ্বাদশ শতক। আর এক জায়গায় চর্যার পুথি সম্বন্ধে শাস্ত্রী বলেছেন,[৩]

...যে পুথিগুলি [চর্যা ও দোহার পুথি] পাইয়াছি সেগুলি মুসলমান আমলেরও পূর্বে লেখা। পুথিগুলি পাকান তালপাতায় লেখা ; সে তালপাতা প্রায় কাগজের মত। আর অক্ষর সেই সেকালের বাঙ্গালা। পুথিগুলিতে তারিখ নাই। কিন্তু ঐ কালের যেসমস্ত

১. 'বৌদ্ধগান ও দোহা'র ভূমিকায় লিপিবৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কোনো আলোচনা না থাকলেও 'প্রাচীন বাংলা অক্ষর' নামক প্রবন্ধে (দ্রষ্টব্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'হরপ্রসাদ-রচনাবলী' প্রথম সম্ভার, ১৯৫৬, পৃ. ৩০১) চর্যার পুথির লিপি সম্পর্কে নিম্ন-উদ্ধৃত সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে।

"ইহার 'প' অনেকটা এখনকার 'প'এর মত হইয়া আসিয়াছে অর্থাৎ 'প'এর টাঙ্গির মত যে মুখ আছে তাহার নীচের রেখাটি 'প'এর দাঁড়িটার তলা পর্যন্ত যায় না, মাঝামাঝি পর্যন্ত যায়।...'খ'এর আর সেরূপ পেট মোটা নাই, পেটটা পড়িয়া গিয়াছে। সব তেকোনা অক্ষরেরই কোণগুলা বেশ স্পষ্ট হইয়া আসিতেছে। 'র' 'ব' ঠিক তেকোনা হইয়া উঠিয়াছে। 'ধ'এর মাথায় একটু বাড়ী দেখিতে পাওয়া যায়।"

বিবরণ সংক্ষিপ্ত বটে, তবে চর্যার পুথির লিপি সম্পর্কে এই একমাত্র বিবরণ— পুথির প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ— তাই মূল্যবান্।

২. 'বৌদ্ধগান ও দোহা', প্রথম সংস্করণ, ১৩২৩

৩. 'হরপ্রসাদ-রচনাবলী', প্রথম সম্ভার, পৃ. ২৪১

তারিখওয়ালা পুথি আছে তাহার সহিত ইহাদের বেশ মিল আছে। আরও এক জায়গায় শাস্ত্রী বলেছেন,[১]

এ ['চর্যাচর্যবিনিশ্চয়'] পুথির অক্ষরগুলি ১২ শতকের গোড়ার।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় চর্যাগীতির পুথি শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির চেয়ে পুরানো নয় বলে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন।[২]

উহা [শ্রীকৃষ্ণকীর্তন] বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত অদ্যাবধি আবিষ্কৃত গ্রন্থসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা পুরাতন। বাঙ্গালাভাষায় লিখিত "চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়" প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি. আই. ই কর্তৃক নেপালে আবিষ্কৃত গ্রন্থসমূহ, রচনাকাল হিসাবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন অপেক্ষা প্রাচীন। কিন্তু পূজ্যপাদ শাস্ত্রী মহাশয় উক্ত গ্রন্থসমূহের যে পুথিগুলি আনাইয়াছেন, তাহা কৃষ্ণকীর্তন অপেক্ষা প্রাচীন কিনা সন্দেহ।

বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির লিপিকাল "১৩৮৫-খৃষ্টাব্দের পূর্বে, সম্ভবত খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে"।[৩] কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের লিপিকাল সম্পর্কে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় নিঃসংশয় নন। তিনি একবার বলেছেন লিপিকাল চতুর্দশ শতক[৪], আর একবার বলেছেন

---

১. 'হরপ্রসাদ-রচনাবলী', প্রথম সম্ভার, পৃ. ৩০১

২. বসন্তরঞ্জন রায়-সম্পাদিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' (১৩২৩) গ্রন্থে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির লিপিকাল', পৃ. /০

৩. 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির লিপিকাল', পৃ. ৷৶০

৪. "...the script makes it impossible to assign the ms. [শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন] to any date later than the 14th Century A.D.—"—*The Origin of the Bengali Script*, ১৯১৯ পৃ. ৪

পঞ্চদশ শতক[১]। কোন্‌টি তাঁর আসল মত বলা শক্ত। আসল মত যদি পঞ্চদশ শতক হয় তা হলে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন যখন তাঁর অনুমানে চর্যার চেয়ে পুরানো তখন চর্যার পুথির লিপিকাল রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে ষোড়শ শতকের আগে নয় বলেই বুঝতে হবে।

সুকুমার সেন-এর অনুমান চর্যার পুথি "চতুর্দশ হইতে ষোড়শ শতাব্দের মধ্যে অনুলিখিত।"[২]

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সুকুমার সেন—এঁদের অনুমান থেকে জানা যাচ্ছে যে চর্যাচর্যবিনিশ্চয় পুথিখানির লিপিকালের ঊর্ধ্বসীমা দ্বাদশ শতক, নিম্নসীমা ষোড়শ শতক।

১৩

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন চর্যার পুথির লিপি বাংলা। তথাপি অনেকের ধারণা পুথিখানির লিপি বাংলা নয়, নেওয়ারী। পুথিতে নেওয়ারী অক্ষরে সংশোধনের চিহ্ন আছে, সে-কথাও শাস্ত্রী বলেছেন; কিন্তু মূল পুথিখানি যে বাংলা অক্ষরে লেখা সে-সম্পর্কে শাস্ত্রীর মনে কোনো সংশয় ছিল না। যাঁরা শাস্ত্রীর মন্তব্য না দেখে বা অগ্রাহ্য করে নেওয়ারী অক্ষরের কথা বলেছেন তাঁদের কেউই অবশ্য মূল পুথি চোখে দেখেন নি। সম্ভবত পুথি নেপালে পাওয়া গিয়েছে বলেই নেওয়ারী লিপি এবং নেওয়ার লিপিকারের কথা উঠেছে।

নেওয়ারী অক্ষর বলতে আমরা যা বুঝি তার উদ্ভবের এবং বিবর্তনের

১. "...*Kṛsn-Kīrtana* of Caṇḍīdāsa which is certainly not later than the 15th Century A.D."— *The Origin of the Bengali Script*. পৃ. ৮৯

২. 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস', প্রথম খণ্ড, পূর্বার্ধ, পৃ. ৫০

আলাদা কোনো ইতিহাস নেই, তা নাগরী বা বাংলা অক্ষরেরই স্থানীয় প্রকারভেদ। এ-সম্পর্কে Bendall-এর উক্তি[১] প্রণিধানযোগ্য—

> The Nepalese must not, then, be regarded as a distinct and original development of the Indian alphabet in the same sense that Bengali, for instance, is so.

প্রাচীন নেওয়ারী অক্ষর মূলত নাগরী বা বাংলা—এ কথা স্মরণ রেখেও নিঃসংশয়ে বলা চলে যে চর্যার পুথির অক্ষর নেওয়ারী নয়, বাংলা[২]। নেপালে পাওয়া গেছে বলেই চর্যার পুথির লিপিকর নেওয়ার এবং লিপি নেওয়ারী হবেই এমন অনুমান করবারও কোনো কারণ নেই। বাংলা অক্ষরে লেখা বহু পুথি নেপাল থেকে পাওয়া গেছে। যেমন, বোধিচর্যাবতার, অষ্টশাব্দিকা, কালচক্রতন্ত্র ইত্যাদি।

---

১. C. Bendall, *Catalogue of Buddhist Sanskrit Manuscripts* পৃ. xxvii

২. চর্যার পুথির প্রায় সব অক্ষরকেই বাংলা অক্ষরের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া যায়; কোনো কোনো অক্ষরের সঙ্গে নাগরী অক্ষরেরও মিল আছে। এই মিল প্রাচীন যুগের বাংলা লিপিতে প্রত্যাশিত। তথাপি প্রাচীন বাংলা লিপি এবং প্রাচীন নাগরীর পার্থক্যটি সুস্পষ্ট। এই পার্থক্যের কথা Burnell এইভাবে বলেছেন,

"The last [*Gauḍī* or *Bengali*] is chiefly distinguished from the other types by the way of marking secondary *e* and *o*, which is done by a perpendicular stroke before the consonant in the case of *e*, and by a similar stroke before and another after the consonant in the case of *o*, and this is, very nearly, the actual Bengali system. The other type marks these vowels in the same way as is done by the ordinary Nāgari Alphabet."—A. C. Burnell, *Elements of South Indian Palaeography*, ১৮৭৮ পৃ. ৫৩

এক সময় নেপালে বহু বাঙালির বাস ছিল, তাঁরা বাংলা অক্ষরে পুথিও লিখতেন।[১] সুতরাং নেপালে বাংলা অক্ষরে বাঙালি লিপিকরের লেখা পুথির অস্তিত্ব অভাবিত ব্যাপার নয়।

আবার, চর্যার পুথি যে নেপালেই লেখা হয়েছে এমন নিশ্চিত প্রমাণ কি পাওয়া গেছে? পুথি যে বাংলা দেশ থেকে নেপালে যায় নি, তার প্রমাণ কি? মুসলমান আক্রমণের সময় বাংলাদেশের বহু পুথি নিরাপদ-স্থান নেপালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল—এ কাহিনীকে কিম্বদন্তী মনে করবার কারণ নেই। Bendall বলেছেন,[২]

> ...both Dr. Wright and Mr. Hodgson found in Nepal Mss. actually written in Bengal.

সুতরাং নিশ্চিত প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত চর্যার পুথি নেপালে লেখা হয়েছিল এবং নেওয়ারী লিপিকর লিখেছিলেন—এ ধারণা পরিত্যাজ্য।

১৪

চর্যার পুথির লিপিকাল জানা যায় নি বটে তবে তারিখওয়ালা অনেক পুথির অক্ষরের সঙ্গে চর্যার পুথির অক্ষরের মিল আছে। সবচেয়ে বেশি মিল আছে ১১৯৯ খ্রীস্টাব্দে অনুলিখিত পঞ্চাকার[৩] পুথির সঙ্গে।

---

১. **'হরপ্রসাদ-রচনাবলী', প্রথম সম্ভার, পৃ. ২৪২**

২. Bendall, *Catalogue of Buddhist Sanskrit Manuscripts,* পৃ. xx

৩. **এই পুথির বিবরণ আছে** Bendall-**এর** *Catalogue*-**এর ১৮৯-১৯০ পৃষ্ঠায়। পুথির সংখ্যা** Add. 1699 ; **পুথিখানি সম্পর্কে** Bendall-**এর মন্তব্য এই—**

"This number [Add. 1699] consists of three works and a fragment written by one scribe, Kāśrīgayākāra, in three successive years (1198-1200 A.D.) in the Bengali character, forming the earliest example of that writing at present found."

এই পুথিখানির Bendall-**কৃত লিপি-সংক্রান্ত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য** *Journal of the Palaeographical Society (Oriental Series),* **১৮৭৩-১৮৮৩**

এই পুথিখানির অক্ষর আর চর্যাচর্যবিনিশ্চয় পুথির অধিকাংশ অক্ষর হুবহু এক তো বটেই, লেখার ধাঁচও এক। নেপালে পাওয়া অধিকাংশ পুথির অক্ষর খাড়া খাড়া, এই পুথি-দুখানির অক্ষরগুলি একটু ডান দিকে হেলানো। লিপিকরের হস্তাক্ষর সুন্দর নয়, বিশেষত চর্যাচর্যবিনিশ্চয় পুথির লিপিকরের। অক্ষরের আকারে সমতা নেই। অক্ষরগুলির মধ্যে বেশ অনেকখানি করে ফাঁক আছে। দুখানি পুথিই মোটা কলমে লেখা।

এই আলোচনায় পঞ্চাকার এবং চর্যাচর্যবিনিশ্চয়[১] পুথির কয়েকটি অক্ষর পাশাপাশি রেখে এদের সাদৃশ্য দেখাতে চেষ্টা করব এবং আরও কয়েকখানি বাংলা পুথির (বিশেষত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন) অক্ষরের সঙ্গে চর্যা এবং পঞ্চাকার পুথির অক্ষরের সাদৃশ্যের কথাও প্রসঙ্গক্রমে এসে পড়বে। বিশেষ করে পঞ্চাকার পুথিখানি নির্বাচন করবার কারণ এই—পুথিখানি তারিখওয়ালা এবং চর্যার পুথির অক্ষরের সঙ্গে এই পুথির অক্ষরগুলির ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য।

১৫

অক্ষরগুলির আকার পরীক্ষা করবার আগে বাংলা অক্ষরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির নাম ঠিক করে নেওয়া দরকার, নতুবা কোন শব্দ দিয়ে অক্ষরের কোন অংশটি আমি নির্দেশ করেছি তা বোঝা শক্ত হতে পারে।

অনেকগুলি অক্ষরকে বাঁ এবং ডান—এই দুটি অংশে ভাগ করা হয়েছে। বাঁ অংশটির গুরুত্বই সর্বাধিক, কারণ বাঁ অংশের গঠনের পরিবর্তনেই অক্ষরের পরিবর্তন। ডান অংশ প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দাঁড়ি। যেমন, 'ব' অক্ষরটির মাত্রা ❮ বাদ দিলে এই কোণাকার অংশটি বাঁ, দাঁড়িটি ডান অংশ। অনেকগুলি অক্ষরে ডান এবং বাঁ-অংশের

১. 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' পুথির ছবি শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন-এর সৌজন্যে ব্যবহার করতে পেরেছি।

মধ্যে একটি যোজক-রেখা আছে। 'অ' অক্ষরটির ডান-বাঁ-অংশ এবং "যোজক" আলাদা করে দেখাচ্ছি—

অ

এখানে আধুনিক বাংলার '৩'-এর মতো অংশটি বাঁ, দাঁড়িটি ডান অংশ এবং এই দুই অংশের মধ্যবর্তী নিম্নমুখী রেখাটি "যোজক"।

যোজক মাত্রার সঙ্গে সমান্তরাল হতে পারে— অ, অর্ধবৃত্তাকার হতে পারে— আবার অ নিম্নগামীও হতে পারে— অ

অক্ষরের বাঁ অংশ ডান অংশের যে-জায়গায় মিলিত হয় তার নাম "সংযোগ"। সংযোগ উঁচুতে হতে পারে— প, মাঝে হতে পারে য, নীচেয় হতে পারে— ঝ

এই আলোচনাতেই পরে দেখতে পাওয়া যাবে যে সংযোগের উচ্চ/মধ্য/নীচ অবস্থানের সঙ্গে বাংলা লিপির বিবর্তনের যোগ আছে।

আধুনিক বাংলার অনেকগুলি অক্ষরের ভিত্তি বাঁ অংশে সূক্ষ্ম 'কোণ' < এবং ডান অংশে দাঁড়ি । বাঁ অংশের ঈষৎ পরিবর্তন করে অনেকগুলি অক্ষর গঠিত। যেমন—

থ থ ঘ ম ঝ ধ ব র য ব

সুতরাং বাংলা অক্ষরের বাঁ অংশের বিশেষ গুরুত্ব। 'কোণ' সূক্ষ্ম হতে পারে (যেমন উপরের অক্ষরগুলিতে) আবার অর্ধবৃত্তাকার হতে পারে—

থ ব

অনেকগুলি বাংলা অক্ষরে বামাংশ এবং নিম্নাংশ যেমন কোণাকার, তেমনি আরও কতকগুলি অক্ষরের নিম্নাংশ অর্ধবৃত্তাকার—ত ভ ড জ অ

স্বতরাং এই অক্ষরগুলির নিম্নাংশ বোঝাতে অর্ধবৃত্তাকার আঁকুড়ি কথাটি ব্যবহার করেছি। এ ছাড়া শাস্ত্রীর ব্যবহৃত 'চৈতন' এবং 'বাড়ী'ও ব্যবহার করেছি।

আধুনিক বাংলার 'ল'-এর বামাংশকে m বাঁক বলেছি। 'ল'-এ দুটি বাঁক আছে, 'ন'-তে একটি বাঁক। 'ড'-এর সঙ্গে 'জ'-এর পার্থক্য এই রেখাটিতে ｢ -একেও 'কোণ' বলা যেতে পারে। তবে আমি একে 'বাহু' বলেছি।

১৬

স্বরবর্ণ : আদ্যাক্ষর : অ

নবম শতকের মাঝামাঝি সময় লেখা (৮৫৭-৫৮ খ্রীস্টাব্দ) পারমেশ্বরতন্ত্র[১] নামে একখানি পুঁথিতে দেখা যায় 'অ'-এর বামাংশটির একাধিক ভাগ ছিল। উপরের ভাগে ছোটো একটি ত্রিভুজ, নীচে অর্ধবৃত্তাকার আঁকুড়ি

ऽ এই দুটি ভাগকে যুক্ত করেছে মাত্রার সঙ্গে সমান্তরাল 'যোজক'

স

১. 'Bendall, *Catalogue*, পৃ. ২৭ ; *Palaeographical Society* (Oriental Series), plate xciii.

পঞ্চাকারের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায়, নবম শতকের 'অ' ত্রয়োদশ শতকের শুরুতে (তুলনীয় পঞ্চাকার (১১৯৯) পুথির 'অ') অনেকখানি পরিবর্তিত হয়েছে। বামাংশের উপরিভাগের ত্রিভুজটি লুপ্ত-প্রায়, লুপ্তচিহ্নস্বরূপ মাত্রা থেকে একটি ছোটো রেখা নীচে নেমে এসে আঁকুড়ির মাথার উপর বসেছে। আঁকুড়িটি নবম শতকে ক্ষীণকায় ছিল, ত্রয়োদশ শতকে আকার বিস্ফারিত হয়েছে। 'সংযোজক' নবম শতকে ছিল মাত্রার সমান্তরাল এবং 'সংযোগ' ছিল মাঝারি। ত্রয়োদশ শতকে 'সংযোজক' নিম্নমুখী এবং 'সংযোগ' নিচু। চর্যার পুথির 'অ' আর পারমেশ্বরতন্ত্র পুথির 'অ' আকারে প্রায় এক। পার্থক্যের মধ্যে চর্যার পুথিতে 'সংযোজক' নিম্নমুখী নয়, আবার পারমেশ্বরতন্ত্র পুথির মতো স্পষ্ট সমান্তরালও নয়— এই দুয়ের মাঝামাঝি। 'সংযোগ' অবশ্যই পঞ্চাকার পুথির মতো নিচু নয়, একটু উঁচুতে। চর্যার পুথিতে দক্ষিণাংশের আঁকুড়িটি তেমন সুডোল এবং সুপুষ্ট নয়, আঁকুড়ির লেজটি মাঝপথে ঠিক কাটা না পড়লেও পঞ্চাকার পুথির 'অ'র মতো লেজটি মাথায় ওঠে নি। সেই কারণে চর্যার পুথিতে 'অ' এবং 'ম' অক্ষরের মধ্যে গোলমাল হয়। চর্যা এবং পঞ্চাকার পুথির কোনো কোনো 'অ'-এর দক্ষিণাংশের নীচে ত্রিভুজ আছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথিতে 'সংযোজক' অর্ধবৃত্তাকার এবং সংযোজকের উৎপত্তি আঁকুড়ির নিম্নদেশ থেকে। 'সংযোগ' নিচুই বলতে হবে। সংযোজকের অর্ধবৃত্তাকার দেখে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির 'অ' অক্ষরটিকে প্রাচীন বলে অনুমান করেছিলেন। এখানে বলা দরকার অর্ধবৃত্তাকার 'সংযোজক' কেবলমাত্র পুথির প্রথমাংশেই পাওয়া গেছে। 'অ' অক্ষরে অর্ধবৃত্তাকার 'সংযোজক' দ্বিতীয় কোনো বাংলা পুথিতে পাওয়া যায় নি, সুতরাং এটা প্রাচীন কি আধুনিক বুঝবার উপায় নেই। তবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অন্য অক্ষরগুলি দেখলেই বোঝা যায় 'কোণ'-কে অর্ধবৃত্তাকার করা লিপিকরের বৈশিষ্ট্য। 'ক', 'খ', 'ধ', 'ব'

প্রভৃতি অক্ষরের ‘কোণ’গুলি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের লিপিকর কলমটিকে ঘুরিয়ে অর্ধবৃত্তাকৃতি করেছেন—এটি যে বাংলা অক্ষরের প্রকারভেদ নয়, লিপিকরের বৈশিষ্ট্য, তা বোঝা যায় এই থেকে যে কোণাকার ‘ব’ এবং অর্ধবৃত্তাকার ‘ব’ পুথির একই জায়গায় পাশাপাশি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। সম্ভবত লিপিকর সাজিয়ে লিখতে গিয়ে ‘কোণ’গুলি অর্ধবৃত্তাকার করেছেন। আধুনিক কালেও সাজিয়ে লিখতে গিয়ে কেউ কেউ এমন করে থাকেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের যাবতীয় অর্ধবৃত্তকে লিপিকরের বৈশিষ্ট্য বলতে হবে।

নীচে বিভিন্ন পুথির ‘অ’ অক্ষরটি দেখানো হল।

স	স	অ	অ
পারমেশ্বরতন্ত্র	চর্যা	পঞ্চাকার	শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

আ

পারমেশ্বরতন্ত্র পুথিতে ‘আ’র দীর্ঘত্ব দেখানো হয়েছে অক্ষরের নীচে সু পঞ্চাকার এবং চর্যার পুথিতে আধুনিক বাংলার মতো ‘অ’-এর ডান পাশে দাঁড়ির মতো রেখা দিয়ে দীর্ঘত্ব দেখানো হয়েছে। এই দুখানি পুথিতেই ‘অ’ ‘আ’ আকারে এক, পার্থক্যের মধ্যে ‘আ’-য় দাঁড়ি আছে।

ই

পারমেশ্বরতন্ত্রে ‘ই’ অক্ষরটির আকার দুটি বিন্দুর নীচে আঁকুড়ি ঃ

চর্যা এবং পঞ্চাকার পুথির ‘ই’ এক। চর্যার ‘ই’— ৫ ৫, পঞ্চাকারের ‘ই’— ৫। পার্থক্যের মধ্যে চর্যার কোনো কোনো ‘ই’-র

ডান-অংশ বাঁ-অংশের সঙ্গে যুক্ত নয়। চর্যা ও পঞ্চাকার পুথির 'ই'-র আকার বিচিত্র। Bühler এই 'ই'-তে দক্ষিণ ভারতীয় লিপির প্রভাবের কথা বলেছেন। এই 'ই'-র সঙ্গে পারমেশ্বরতন্ত্র পুথির 'ই' এবং আধুনিক বাংলা 'ই'-র সাদৃশ্য নেই বলা চলে।

পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি সময় (১৪৪৬) নকল করা কালচক্রতন্ত্র[১] এবং বোধিচর্যাবতার (১৪৩৫) পুথিতেই 'ই' পাওয়া যাচ্ছে আধুনিক বাংলার 'উ' র মতো, এমন-কি মাথায় চৈতনও আছে—

আধুনিক বাংলার মতো 'ই' দেখতে পাওয়া গেল পঞ্চদশ শতকের শেষে (১৪৮৯) নকল করা ধর্মরত্ন[২] পুথিতে—

এই পুথির 'ই' দেখে অনুমান করা চলে এর পূর্বরূপটি দেখতে পাওয়া গেছে কালচক্রতন্ত্র পুথিতে। ধর্মরত্ন পুথির 'ই'-কে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়—১. চৈতন, ২. আধুনিক বাংলার 'ড'-এর মতো মধ্যাংশ, ৩. নিম্নমুখী রেখাটি।

কালচক্রতন্ত্র পুথিতে তৃতীয়াংশ অর্থাৎ নিম্নমুখী রেখাটি ছিল না। এবং মধ্যাংশের 'ড'-টির আকার বৃহৎ ছিল। ধর্মরত্ন পুথিতে মধ্যাংশের 'ড'-এর আকার কৃশ হয়েছে এবং 'ড'-এর লেজের কিছুটা কাটা পড়েছে ; তবে তৃতীয়াংশের ঊর্ধ্বভাগ 'ড'-এর সঙ্গে যুক্ত না হয়েও লেজের কাজ করছে। ধর্মরত্ন পুথির 'ই' থেকে তৃতীয়াংশ অর্থাৎ নিম্নমুখী রেখাটি বাদ দিলে যা থাকে তা কালচক্রতন্ত্র পুথির 'ই'।

---

১. *Palaeographical Society* (Oriental Series) plate xxiii.

২. Rajendra Lal Mitra, *Notices of Sanskrit Manuscripts*, Vol. V, Plate II.

কালচক্রতন্ত্র, ধর্মরত্ন, এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তন— এই তিনখানি পুথির 'ই' পাশাপাশি রেখে তুলনা করলে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 'ই' অন্য দুখানি পুথির 'ই'-র তুলনায় আধুনিক মনে হবে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 'ই'-র মধ্যাংশ প্রায় আধুনিক হয়ে এসেছে 'ড'-এর আকার আর নেই, যদিও তৃতীয়াংশ মধ্যাংশের সঙ্গে যুক্ত হয় নি। তুলনার জন্য এই তিনখানি পুথির 'ই' পাশাপাশি রাখা হল।

কালচক্রতন্ত্র ধর্মরত্ন শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

ধর্মরত্ন এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির 'ই' অল্পবিস্তর পরিবর্তিত অবস্থায় ষোড়শ শতকের একাধিক পুথিতে পাওয়া গেলেও চর্যা এবং পঞ্চাকার পুথির 'ই' এই সময়কার অন্য কোনো পুথিতে পাওয়া যাচ্ছে না। এই 'ই' বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হত কিনা বলা শক্ত। তবে এ কথা ঠিক আধুনিক বাংলা 'ই'-র সঙ্গে এর সাদৃশ্য নেই। পারমেশ্বরতন্ত্র পুথির 'ই'-র আঁকুড়িটি সম্ভবত ধর্মরত্ন এবং কালচক্রতন্ত্র 'ই'-র মধ্যাংশ। এই আঁকুড়িটি সম্ভবত পরে 'ড'-এর আকার নিয়েছিল। এবং 'ড'-এর লেজ কাটা গিয়ে এবং নিম্নমুখী রেখাটি যুক্ত হয়ে আধুনিক বাংলার 'ই'-র রূপ নিয়েছিল। এ-সমস্ত অনুমানের কথা। কিন্তু এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে আধুনিক বাংলায় 'ই' প্রকারান্তে 'হ', কেবল 'হ'-এর মাথায় চৈতন নেই। তবে 'হ' এবং 'ই' আধুনিক কালে প্রায় অভিন্ন হলেও অক্ষর দুটির বিবর্তনের ইতিহাস আলাদা। এ কথা বলা চলে না যে কোনো একসময় 'হ'-এর মাথায় চৈতন জুড়ে দিয়ে 'ই' করা হয়েছে।

উ

পঞ্চাকার এবং চর্যার পুথির 'উ' এক। অক্ষরটি দেখতে আধুনিক বাংলার 'ড'-এর মতো— মাথায় চৈতন নেই। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির 'উ'-র মাথায়ও চৈতন নেই, সেখানেও অক্ষরটির আকার আধুনিক বাংলা 'ড'-এর মতো। এইরকম চৈতনহীন 'উ' অষ্টাদশ শতকে লেখা পুথিতেও পাওয়া যায় (যদিও রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের চৈতনহীন 'উ'-কে পুথির প্রাচীনত্বের প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন); সুতরাং বলতে হবে দীর্ঘকাল যাবৎ এই অক্ষরটির আকারের কোনো পরিবর্তন হয় নি।

এ

পারমেশ্বরতন্ত্র পুথিতে 'এ' ত্রিভুজাকার।

পঞ্চাকার পুথিতে অক্ষরটির ত্রিভুজাকার সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নি, কেবল বাঁ দিকের উপরের কোণটি খুলে গেছে। ডান দিকে উপরে ও নীচে তখনও কোণ আছে। ত্রিভুজের বাঁ বাহুটি ভূমিতে নেমে আসে নি। সে তুলনায় চর্যার পুথির 'এ' অনেকটা আধুনিক। অক্ষরের উপরের দিকটা ছাতার বাঁটের মতো বাঁকানো, নীচের দিকটা প্রায় ভূমির সঙ্গে সমান্তরাল, তবে ঢেউ খেলানো নয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 'এ' আর চর্যার পুথির 'এ' একরকম।

পারমেশ্বরতন্ত্র পঞ্চাকার চর্যা শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

চর্যা, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, মিতাক্ষরা[১] (১৫০৬) ইত্যাদি পুথির 'এ' অক্ষরে কোনো পার্থক্য নেই। একমাত্র কালচক্রতন্ত্র পুথিতে 'এ'-র নিম্নবাহু

১. Rajendra Lal Mitra, *Notices of Sanskrit Manuscripts*, Vol. V, plate III.

দাঁড়ির মাঝামাঝি জায়গা থেকে বেরিয়েছে, অন্যান্য পুথির মতো নিচু থেকে বেরয় নি। কালচক্রতন্ত্র পুথির 'এ' এইরকম—

ঐ

আধুনিক বাংলাতেও 'এ' এবং 'ঐ' আকারে প্রায় অভিন্ন, পার্থক্যের মধ্যে 'ঐ'-র মাথায় চৈতন আছে। পারমেশ্বরতন্ত্রেও 'এ' 'ঐ'-র পার্থক্য কেবল চৈতনে। পারমেশ্বরতন্ত্র পুথিতে 'ঐ'-র চৈতন উঠেছে ত্রিভুজের ডান দিকে উপরের কোণ থেকে। পঞ্চাকার পুথিতেও চৈতন ডান দিকের কোণ থেকে উঠেছে, যদিও কোণ প্রায় বাঁকের আকার নিয়েছে। চর্যা এবং পঞ্চাকার পুথির 'ঐ' এক আকারের।

পারমেশ্বরতন্ত্র 'পঞ্চাকার

ও।ঔ

চর্যার পুথিতে আদ্যাক্ষরে 'ও' এবং 'ঔ' আমি দেখি নি, কারণ গোটা পুথির ছবি আমি পাই নি। তবে অনুমান করতে পারি চর্যার পুথির 'ও' এবং 'ঔ' পঞ্চাকার পুথি থেকে পৃথক নয়। আধুনিক বাংলার মতো 'ও' পারমেশ্বরতন্ত্র এবং পঞ্চাকার পুথিতে পাওয়া যাচ্ছে।

পারমেশ্বরতন্ত্র পঞ্চাকার

'ঔ-র আকার প্রায় 'ও'-র মতো, পার্থক্য শুধু চৈতনে। পারমেশ্বরতন্ত্র পুথিতে 'ঔ'-র চৈতন নেই, তবে ডান দিকে একটি কোণাকার রেখা আছে। পঞ্চাকার পুথিতে সেই কোণাকার রেখাটিকেই চৈতনে পরিণত করা হয়েছে।

অ ঐ

পারমেশ্বরতন্ত্র পঞ্চাকার

পদমধ্যস্থিত স্বরবর্ণ

আ

পারমেশ্বরতন্ত্র পুথিতে আদ্যাক্ষরে 'অ'-এর নীচে আঁকুড়ি দিয়ে দীর্ঘত্ব দেখানো হলেও, পদমধ্যস্থিত 'আ' আধুনিক বাংলার মতো দাঁড়ি দিয়ে দেখানো হয়েছে। চর্যা এবং পঞ্চাকার পুথিতেও পদমধ্যস্থিত 'আ' ব্যঞ্জনের ডান দিকে দাঁড়ি।

ই

চর্যা এবং পঞ্চাকার পুথির অক্ষরের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য পদমধ্যস্থিত 'ই'। চর্যার পুথিতে পদমধ্যস্থিত 'ই' আধুনিক বাংলার মতো। ব্যঞ্জনের বাঁ দিকে দাঁড়ি এবং দাঁড়ির মাথায় ছত্রাকার একটি রেখা। চর্যার পুথিতে কখনো কখনো মনে হয় দাঁড়ি এবং ছত্রাকার রেখাটি কলমের একটি টানে লেখা হয়েছে। পঞ্চাকার পুথিতে ছত্রাকার রেখাটি আছে কিন্তু দাঁড়িটি নেই। যেমন নীচের 'অমিতাভ' শব্দটিতে।

অমিতাভ

Bendall-এর মতে[১] পদমধ্যস্থিত 'ই'-র এই আকার প্রাচীন। তবে চর্যার পুথির পদমধ্যস্থিত 'ই' পঞ্চাকার পুথিরও কয়েক জায়গায় দেখা যায়।

---

১. "The writing is Bengali, with several antique features, e.g. medial *i* written simple curve its consonants, not before it." —Bendall, *Catalogue*, পৃ. ১০৬

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথিতে পদমধ্যস্থিত 'ই'-র দাঁড়িটি আছে, ছত্রাকার ঊর্ধ্বাংশটি অনেক জায়গায় নেই যেখানে আছে সেখানেও ঠিক ছত্রাকারে নেই, প্রায় মাত্রার সঙ্গে মিলে আছে। মিতাক্ষরা পুথিতেও কয়েক জায়গায় ছত্রাকার ঊর্ধ্বাংশটি মাত্রার সঙ্গে মিলে আছে। আবার কালচক্র-তন্ত্র (১৪৪৬), শূদ্রপদ্ধতি (১৫১৪), শকুন্তলা (১৫৭১), ধর্মরত্ন (১৪৮৯), শিশুপালবধ (১৫১১) প্রভৃতি পুথিতে ছত্রাকার ঊর্ধ্বরেখাটি বেশ স্পষ্ট। পারমেশ্বরতন্ত্র (৮৫৮ খ্রীস্টাব্দ) পুথিতে পদমধ্যস্থিত 'ই' চর্যার মতো (পঞ্চাকার পুথির মতো নয়) এবং ছত্রাকার ঊর্ধ্বাংশটি বেশ স্পষ্ট এবং ব্যঞ্জনের উপর অনেকখানি উঁচুতে উঠেছে। ১০৮৪ খ্রীস্টাব্দে নকল করা 'শিষ্যালেখ'[১] পুথিতেও (এ পুথিখানির অধিকাংশ অক্ষরগুলি নেওয়ারী) পদমধ্যস্থিত 'ই' পারমেশ্বরতন্ত্র এবং চর্যার মতো। সুতরাং আধুনিক বাংলায় প্রচলিত পদমধ্যস্থিত 'ই'—যা চর্যার পুথিতে পাওয়া যাচ্ছে—নবম শতকের পুথিতেও (পারমেশ্বরতন্ত্র) অবিকল সেই আকারে পাওয়া যাচ্ছে। তাই Bendall ঠিক কেন পঞ্চাকার পুথির পদমধ্যস্থিত 'ই'-কে প্রাচীন বলেছেন বোঝা গেল না।

উ

আধুনিক বাংলায় পদমধ্যস্থিত 'উ' ব্যঞ্জনবর্ণ অনুসারে বিবিধ প্রকারের হয়ে থাকে, 'শু', 'কু', 'রু' ইত্যাদি তার দৃষ্টান্ত। চর্যার পুথিতেও এই রীতি।

চর্যার পুথিতে 'রু' আধুনিক বাংলার মতো। 'উ' যুক্ত হয়েছে 'র'-র ডান-অংশের মাঝখানে, অন্যান্য অক্ষরের মতো ব্যঞ্জনের নীচে নয়। তবে 'উ'-র আকার আধুনিক বাংলার মতো উল্টো 'কমা' কিনা বলা শক্ত, সম্ভবত নয়। যতদূর মনে হয় মাত্রার সঙ্গে সমান্তরাল একটি রেখা বেরিয়ে এসেছে, 'কমা'-র আকার পায় নি।

১. পৃ ৮০, পাদটীকা ১ দ্রষ্টব্য

'তু' চর্যার পুথিতে আধুনিক বাংলার 'ত্ত'। 'তু' এবং 'ত্ত' লিখতে চর্যার পুথির লিপিকর এই একটি অক্ষরই ব্যবহার করেছেন। 'গু' এবং 'শু' অবিকল আধুনিক বাংলার আকার না পেলেও প্রবণতা সেই দিকে। 'গ' এবং 'শ'-এর দাঁড়ির নীচের দিকটা বাঁ দিকে বেঁকে গিয়েছে 'ত'-এর নিম্নাংশের মতো।

'পু', 'তু', 'স্থ', 'মু' লিখতে চর্যার লিপিকর যে 'উ' ব্যবহার করেছেন তার আকার আধুনিক বাংলার 'ব' ফলার মতো। 'থু' 'মু' প্রভৃতি অক্ষরে আধুনিক বাংলার 'উ' ব্যবহৃত হয়েছে। এই-সব ক্ষেত্রে 'উ' ব্যঞ্জনের নীচে একটি আঁকুড়ি চিহ্ন হয়ে এমনভাবে ঝুলে থাকে যে ব্যঞ্জনটিকে আঁকুড়ি চিহ্ন থেকে সহজে পৃথক করা যায়।

চর্যার পুথিতে আরও একরকমের 'উ' ব্যবহৃত হয়েছে 'কু' লিখতে গিয়ে। সেখানে 'উ' আর স্বতন্ত্র নেই, ব্যঞ্জনের অক্ষর গঠনের সঙ্গে এক হয়ে মিশে গেছে।

সুতরাং চর্যার পুথিতে পাঁচরকমের পদমধ্যস্থিত 'উ' দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

১. আধুনিক বাংলার 'ত'-এর নিম্নাংশের মতো। এই 'উ' ব্যবহৃত হয়েছে 'গু' এবং 'শু' লিখতে।

২. ব্যঞ্জনের মধ্যাংশের সঙ্গে যুক্ত উ, যেমন 'রু'

৩. ব্যঞ্জনের নিম্নাংশের সঙ্গে যুক্ত আঁকুড়ি চিহ্ন, যেমন 'থু', 'ষু' ইত্যাদ

৪. ব্যঞ্জনের সঙ্গে সংযুক্ত যেমন, 'কু'। এখানে 'উ' ব্যঞ্জন থেকে আলাদা করা যায় না।

৫. ব্যঞ্জনের নীচে 'ব' ফলার মতো, যেমন 'পু' 'তু' ইত্যাদি।

এই পাঁচ প্রকারের পদমধ্যস্থিত 'উ' শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এবং অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত সমস্ত বাংলা পুথিতে দেখতে পাওয়া যায়।

চর্যার কয়েকটি পদমধ্যস্থিত 'উ'-র দৃষ্টান্ত নীচে দেওয়া হল।

ক্লু মু ড়ু তু স্নু গু মু কু

এর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পদমধ্যস্থিত 'উ'-র তুলনা করা যেতে পারে।

গু ড়ু ক্লু কু নু মু স্নু

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে 'স্নু' 'যু' '(মু)' চর্যার 'কু' শ্রেণীর, অর্থাৎ 'উ' ব্যঞ্জনের সঙ্গে সংযুক্ত, স্বতন্ত্র নয়। চর্যার 'কু' এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 'কু' আকারে প্রায় এক। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির লিপির বিস্তৃত পরিচয় দেওয়ার স্থান এটি নয়, তথাপি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা কর্তব্য যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে 'যু' এবং 'মু' অভিন্ন, 'নু' এবং 'ন্ন' আকারে অভিন্ন (তুলনীয়, 'আনুমান' এবং 'জগন্নাথ'), আদ্যাক্ষর 'ঈ' 'দ্দ' এবং 'কু' অভিন্ন (তুলনীয়, 'ঈসত' 'উদ্দেশ' এবং 'গোকুল'), 'যু' ('মু')-র পাশে একটি ছোটো রেখা যোগ করলে 'ম্ব' হয়। অর্থাৎ পদমধ্যস্থিত 'উ' যেমন অনেকগুলি ব্যঞ্জনের আকারে পরিবর্তন এনেছে তেমনি সেই অক্ষরগুলি একাধিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে।

এবার ষোড়শ শতকের এবং সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের কয়েকখানি পুথির পদমধ্যস্থ 'উ'-র দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

মিতাক্ষরা ধর্মরত্ন শূদ্রপদ্ধতি কালচক্রতন্ত্র

মু ক্লু কু পু তু শু পু যু গু বু

কবিকঙ্কণ (সপ্তদশ শতকের শেষ)

'কু' 'পু' 'গু'

স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে চর্যার পুথির পাঁচ শ্রেণীর পদমধ্যস্থিত 'উ'-র প্রত্যেকটি প্রায় অপরিবর্তিত অবস্থায় অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত পৌঁচেছে।

ঊ

চর্যার পুথির পদমধ্যস্থিত 'ঊ' আধুনিক বাংলার মতো, তবে চিহ্নটিতে সম্পূর্ণতা আসে নি। নীচের 'শূ' দেখলেই বোঝা যাবে যে চিহ্নটির গতি আধুনিক বাংলার 'ঊ'-র দিকে।

'শূ' ব্যতীত অন্য অক্ষরগুলিতে পদমধ্যস্থিত 'ঊ' আধুনিক বাংলার 'ঊ'-র সঙ্গে অভিন্ন।

ঋ/এ/ঐ/ও/ঔ

চর্যার পুথির পদমধ্যস্থিত 'ঋ', 'এ', 'ঐ', 'ও', 'ঔ' আধুনিক বাংলার ঐ স্বর-চিহ্নগুলি থেকে একটুও পৃথক নয়। নীচের উদাহরণগুলি লক্ষ্য করলে এ মন্তব্যের সত্যতা প্রমাণিত হবে।

গৃ বে দৈ বো যৌ

(উপরের উদাহরণগুলির মধ্যে 'য' অক্ষরটির আকার এখানে একটু বিচিত্র, অন্যত্র অবশ্য স্বাভাবিক 'য' আছে।) পদমধ্যস্থিত 'ঋ', 'এ', 'ও' চিহ্ন আধুনিক বাংলা থেকে একটুও পৃথক নয়। কেবল 'ঐ' এবং 'ঔ'-র চৈতনের উৎপত্তিস্থল আধুনিক বাংলা থেকে পৃথক। আধুনিক বাংলায়

'ঐ'-র চৈতনের উৎপত্তি 'ৈ'-এই আঁকুড়ি-চিহ্নটির উপর থেকে, 'ঔ'-র চৈতনের উৎপত্তি 'ৌ' দাঁড়ির মাথা থেকে।

ব্যঞ্জনবর্ণ

ক

পারমেশ্বরতন্ত্র পুথির 'ক' প্রায় আধুনিক বাংলার মতো। সুতরাং অক্ষরটির গঠন নবম শতকেই সম্পূর্ণ হয়েছে। পরবর্তীকালে পরিবর্তন যা হয়েছে তা যৎসামান্য। পারমেশ্বরতন্ত্র পুথিতে 'ক' ত্রিভুজাকার এবং ডান দিকে আঁকুড়ি। ডান দিকের আঁকুড়িটি একটু বেশি লম্বিত, প্রায় ভূমি স্পর্শ করেছে। আঁকুড়িটি মাত্রারেখা এবং ত্রিভুজের সংযোগস্থল থেকে বেরিয়ে দাঁড়ির মতো রেখাটির সমান্তরাল হয়ে লম্বিত।

চর্যার পুথির 'ক' পারমেশ্বরতন্ত্র পুথির 'ক' থেকে বেশি পৃথক নয়। দুখানি পুথির 'ক'-তেই সূক্ষ্ম কোণ আছে। পারমেশ্বরতন্ত্র পুথির 'ক'-এর আঁকুড়িটি বেশি লম্বিত, চর্যার 'ক'-এর আঁকুড়ি অত লম্বিত নয়।

আঁকুড়ির দৈর্ঘ্য-অনুসারে চর্যার পুথির 'ক' দুই শ্রেণীতে পড়ে। এক শ্রেণীর আঁকুড়ি দীর্ঘ এবং বেশি বাঁকানো নয়, সম্ভবত এইটি প্রাচীন রীতি, আর-এক শ্রেণীর আঁকুড়ি ছোটো এবং বাঁকানো। যেমন—

ক ক

দীর্ঘ এবং স্বল্পবক্র আঁকুড়িকে প্রাচীন মনে করেছি, এই কারণে যে এইরকম আঁকুড়ি পারমেশ্বরতন্ত্র এবং শিষ্যালেখ পুথিতে পাওয়া যাচ্ছে। এই দুখানি পুথিতে ছোটো এবং বাঁকানো আঁকুড়ি পাওয়া যাচ্ছে না। চর্যায় দুরকমই আছে। আবার, পঞ্চাকার (১১৯৯), কালচক্রতন্ত্র (১৩৩৬), শিশুপালবধ (১৫১১) ধর্মরত্ন (১৪১৭), শূদ্রপদ্ধতি (১৫১৪), শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বোধিচর্যাবতার (১৪৩৫) সর্বত্রই 'ক' অক্ষরটিতে ছোটো এবং বাঁকানো

আঁকুড়ি। সুতরাং স্বভাবতই অনুমান করা যায় দীর্ঘ স্বল্প বক্র এবং আঁকুড়ি প্রাচীন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে একরকমের 'ক' দেখতে পাওয়া যায় তাতে আঁকুড়ি নেই। দ্রুত এবং টানা লিখতে গিয়ে আঁকুড়ি ত্রিভুজের সঙ্গে এমনভাবে যুক্ত হয়ে গেছে যে তাকে আর দেখতে পাওয়া যায় না।

ক ক ক ক ক

পারমেশ্বরতন্ত্র শিষ্যালেখ পঞ্চাকার শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

খ

পারমেশ্বরতন্ত্র (৮৫৭-৫৮) এবং শিষ্যালেখ (১০৮৪) পুথির 'খ'-র সঙ্গে আধুনিক বাংলা 'খ'-র সাদৃশ্য নেই। আধুনিক বাংলা 'খ' দেখতে পাওয়া গেল চর্যা এবং পঞ্চাকার (১১৯৯) পুথিতে। এই 'খ' পারমেশ্বরতন্ত্র এবং শিষ্যালেখ পুথির 'খ' থেকে উদ্ভূত কিনা বা চর্যা এবং পঞ্চাকার পুথির 'খ'-এর বিবর্তনের স্বতন্ত্র কোনো ইতিহাস আছে বলা শক্ত।

কালচক্রতন্ত্র পুথির 'খ' বিচিত্র আকারের। এই পুথির 'খ'-র সঙ্গে চর্যার পুথির 'খ'-র কিছুমাত্র সাদৃশ্য নেই বলা যায় না। তবে চর্যার পুথির 'খ' সরল এবং আধুনিক বাংলা 'খ'-র বেশি কাছাকাছি। কালচক্রতন্ত্র পুথির 'খ'-র বাঁ অংশটি জটিল। অক্ষরটির গঠন দেখে বলতেই হয় কালচক্রতন্ত্র পুথির 'খ' চর্যার পুথির 'খ' থেকে পুরানো। কিন্তু কালচক্রতন্ত্রের অন্য অক্ষরগুলি যে চর্যার পুথির তুলনায় আধুনিক, সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। সম্ভবত 'খ' অক্ষরটি প্রাচীন রূপ কোনো অজ্ঞাত কারণে এই পুথিতে রক্ষা পেয়েছে। এই অনুমান যদি ঠিক হয় তা হলে চর্যার পুথির 'খ'-র পূর্বরূপ দেখতে পাওয়া গেল কালচক্রতন্ত্র পুথিতে। তা হলে প্রশ্ন দাঁড়ায়, কালচক্রতন্ত্রের 'খ' কি পারমেশ্বরতন্ত্র এবং চর্যার 'খ'-এর মধ্যবর্তী রূপ? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া শক্ত। বিভিন্ন পুথির 'খ'গুলি পরীক্ষা করে দেখা যাক।

পারমেশ্বরতন্ত্র চর্যা কালচক্রতন্ত্র শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

পারমেশ্বরতন্ত্র এবং কালচক্রতন্ত্র[১] পুথির 'খ' স্পষ্টই নেওয়ারী। এইরকম 'খ' সমস্ত নেওয়ারী পুথিতে পাওয়া যায়। চর্যা এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির 'খ' বাংলা। এ অনুমান হয়তো অসংগত নয় যে কালচক্রতন্ত্র পুথির 'খ' থেকে চর্যার পুথির 'খ'-র উৎপত্তি।

গ

পারমেশ্বরতন্ত্র পুথির 'গ' অক্ষরটির বাঁ-অংশে কিছু কারুকার্য আছে। কারুকার্যটুকু বাদ দিলে অক্ষরটি আধুনিক বাংলার রূপ পায়। চর্যার পুথিতে তাই হয়েছে ; তাই চর্যার 'গ' আধুনিক বাংলার মতো।

পারমেশ্বরতন্ত্র চর্যা পঞ্চাকার কালচক্রতন্ত্র শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

চ

পারমেশ্বরতন্ত্র পুথির 'চ' অক্ষরটি ডান অংশটি দাঁড়ি, বাঁ অংশটি অর্ধবৃত্তাকার। চর্যার পুথির 'চ'-তে দাঁড়ি নেই। অর্ধবৃত্তাকার অংশটি

১. এখানে প্রসঙ্গক্রমে একটি কথা উল্লেখ করা যেতে পারে যে বাংলা বর্ণমালার সব অক্ষরের বঙ্গীয়ত্ব একই সময় প্রকাশ পায় নি। কোনো কোনো অক্ষরের বাংলা রূপ (যেমন 'ক') অনেক আগে প্রকাশিত হয়েছে: কোনো কোনো অক্ষরের পরে। সুতরাং একাদশ-দ্বাদশ শতকের বাংলা অক্ষরে লেখা পুথি মানে এই নয় যে তার প্রত্যেকটি অক্ষরকে নিঃসন্দিগ্ধভাবে বাংলা বলে প্রমাণ করা যায়। এখানে কালচক্রতন্ত্র পুথিখানি যে বাংলা অক্ষরে লেখা তা যে-কোনো বাঙালি পুথিখানিকে একবার চোখে দেখলেই স্বীকার করবেন ; তথাপি এই পুথিতে একটি নেওয়ারী অক্ষর পাওয়া গেল।

মাত্রার সঙ্গে ঝুলে আছে। অর্ধবৃত্তাকার বাঁ-অংশটি ছুঁচলো, পারমেশ্বরতন্ত্র পুথিতেও তাই ছিল। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ছুঁচলো অংশটা সরল হয়ে প্রায় ডিম্বাকার হয়েছে। কালচক্রতন্ত্র এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির 'চ' এক।

পারমেশ্বরতন্ত্র চর্যা চর্যা শ্রীকৃষ্ণকীর্তন শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

জ

আধুনিক বাংলায় 'ড'-র ডান দিকে বাহু যোগ করলে 'জ' হয়। পারমেশ্বর-তন্ত্র পুথিতে যে 'জ' পাওয়া যাচ্ছে তাও এইরকম, তবে 'জ'-এর 'ড' আধুনিক আকার পায় নি। বাহুও বাঁকানো নয়, নিম্নগামী একটি সরলরেখা। পঞ্চাকার পুথিতে 'ড' আধুনিক আকার-ধারণ করেছে বটে তবে বাহু এখনো পারমেশ্বরতন্ত্র পুথির মতো।

চর্যার পুথিতে দুরকম 'জ' দেখা যাচ্ছে। একরকমে বাহুর অর্ধেকটুকু আছে, বাহু-রেখাটি মাত্রার সঙ্গে সমান্তরাল, আর-একরকমে বাহু বেঁকে ভূমি পর্যন্ত গিয়েছে। যোড়শ শতকের বহু পুথিতে বাহুর অর্ধ এবং সম্পূর্ণরূপ একই সঙ্গে পাওয়া যাচ্ছে।

পারমেশ্বরতন্ত্র পঞ্চাকার চর্যা চর্যা কালচক্রতন্ত্র শ্রীকৃষ্ণকীর্তন শিশুপালবধ
৮৫৭-৫৮ খ্রীঃ ১১৯৯ খ্রীঃ ১৪৪৬ খ্রীঃ ১৫১১ খ্রীঃ

শূদ্রপদ্ধতি শকুন্তলা মিতাক্ষরা
১৫১৪ খ্রীঃ ১৫৭১ খ্রীঃ ১৫০৬ খ্রীঃ

ঙ

'জ'-র বাহুর পূর্ণ বা সংক্ষিপ্ত আকারের উপর অক্ষরটির প্রাচীনত্ব বা আধুনিকত্ব নির্ভর করছে না। দশম শতকের অনেক নেওয়ারী পুথিতে 'জ'-এর পূর্ণ বাহু ছিল। উপরের উদাহরণগুলিতে একটি বিষয় লক্ষণীয়। শূদ্রপদ্ধতি শকুন্তলা পুথিতে 'জ'-এর নিম্নভাগের লেজটি মাথায় উঠেছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এবং চর্যার পুথিতে লেজ মাথায় না উঠলেও অনেকখানি এগিয়েছে। পারমেশ্বরতন্ত্রে লেজটি কাটা গিয়েছে। লেজের ক্রমবর্ধমান আকারের সঙ্গে অক্ষরের প্রাচীনত্ব-আধুনিকত্বের যোগ আছে। বাংলায় লেজওয়ালা অক্ষর অনেকগুলি 'ভ', 'ত', 'জ', 'ড' ইত্যাদি। পুথি কালের দিক থেকে যত আধুনিক লেজ তত বেশি মাথায় উঠেছে। লেজকে মাথায় তোলা বাংলা লিখনভঙ্গীর একটি বৈশিষ্ট্য।

ঝ

চর্যার পুথিতে 'ঝ' আধুনিক বাংলার মতো।

ঝ

ট

চর্যার পুথির 'ট' পারমেশ্বরতন্ত্র পুথির 'ট' থেকে বিশেষ পৃথক নয়। এখনও চৈতন দেখা যাচ্ছে না, গলার কাছে খাঁচটা পারমেশ্বরতন্ত্র পুথিতে বেশি, চর্যার পুথিতে কম। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথিতে খাঁচটি প্রায় মিলিয়ে এসেছে এবং মাথায় চৈতনও দেখা দিয়েছে।

পারমেশ্বরতন্ত্র চর্যা পঞ্চাকার কালচক্রতন্ত্র শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ধর্মরত্ন

উপরের এই ছয়টি 'ট'-র গঠন পরীক্ষা করলে এদের ক্রমবিবর্তনের ধারাটি স্পষ্ট হয়। অক্ষরগুলির গঠনে দুটি বিষয় লক্ষণীয় গলার কাছের খাঁচের ক্রমবিলীয়মানতা এবং চৈতনের আবির্ভাব। পারমেশ্বরতন্ত্র পুথিতে খাঁচটি

সূক্ষ্ম, চৈতন নেই তবে চৈতনের বদলে একটি ছোটো নিম্নগামী রেখা আছে। চর্যার এবং পঞ্চাকার পুথিতে গলার খাঁচের সূক্ষ্মতা কমে গেছে এবং পঞ্চাকারে যেন চৈতনের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। কালচক্রতন্ত্র পুথিতে গলার খাঁচটি উপরে উঠেছে, খাঁচের সূক্ষ্মতা আরো কমে গেছে, নিম্নভাগ অনেকটা আধুনিক বাংলা 'ট'-এর আকার নিয়েছে। চৈতনও আছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে গলার খাঁচটি মিলিয়ে গিয়ে সে-জায়গায় একটু বাঁক দেখা দিয়েছে। চৈতনের আকার আধুনিক হয়েছে। ধর্মরত্ন পুথিতে গলার কাছের বাঁকটি অনেকটা সরল হয়ে আধুনিক বাংলা 'ট'-তে পরিণত হয়েছে।

ঠ

চর্যার পুথির 'ঠ' গোলাকার, এমন গোলাকার যে তার সঙ্গে আ-কার যুক্ত হলে তাকে মাত্রাহীন 'ন' বলে ভুল হয়। এই কারণে শাস্ত্রী এক জায়গায় 'বইঠা'-কে 'বইণ' পড়েছেন। এই আকারের 'ঠ' পারমেশ্বরতন্ত্র পুথিতেও পাওয়া যাচ্ছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে 'ঠ' ডিম্বাকার, উপরের দিকটা সরু, নীচের দিকটা স্ফীত। অক্ষরটি মাত্রা ধরে দোদুল্যমান।

ঠা

পারমেশ্বরতন্ত্র চর্যা শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

ড

আগেই বলা হয়েছে চর্যার পুথিতে 'ড', 'ড়' এবং 'উ'— এই অক্ষর তিনটির মধ্যে আকারগত কোনো পার্থক্য নেই। সুতরাং 'গাইউ'-কে 'গাইড়' বা 'গাইড' পড়তে কোনো বাধা নেই। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথিতেও এই রীতি,

'উ'-র মাথায় চৈতন নেই, 'ড়'-র নীচে বিন্দু নেই। 'ড'-র মাথায় চৈতন দিয়ে 'উ', এবং নীচে বিন্দু দিয়ে 'ড়' অষ্টাদশ শতকের শেষে পাওয়া যায়। বিন্দু এবং চৈতনের ব্যবহার অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে হয়েছে; তাই 'চর্যা' এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে পুরানো বলতে হয় এবং চর্যাকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের চেয়েও পুরানো বলতে হয়, কারণ চর্যার 'ট' অচৈতন, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 'ট' চৈতনযুক্ত।

ণ

আধুনিক বাংলায় 'ণ' এবং 'ন'-র পার্থক্য গুরুতর নয়। 'ণ' মাত্রাহীন, 'ন'-য় মাত্রা আছে। 'ণ'-র বাঁ-অংশের ডান-অংশের সঙ্গে সংযোগ উঁচুতে, 'ন'-র মাঝে। চর্যা এবং কোনো কোনো পুরানো বাংলা পুথিতে 'ণ' এবং 'ন'-র পার্থক্য এর চেয়ে বেশি ছিল।

চর্যার পুথির 'ণ'-র বাঁ-অংশটির আকার আধুনিক বাংলার 'ল'-র বাঁ-অংশের অনুরূপ। এবং বাঁ-অংশ ও ডান-অংশের সংযোগ উঁচুতে, প্রায় মাত্রার কাছাকাছি। পারমেশ্বরতন্ত্র পুথির 'ণ'-র সঙ্গে তুলনায় চর্যার 'ণ'-র বাঁ-অংশ অনেক সরল। চর্যার পুথির 'ণ'-কে বলতে পারি দ্বিবাঁকযুক্ত 'ণ', কারণ এর বাঁ-অংশে দুটি বাঁক আছে।

দ্বিবাঁকযুক্ত 'ণ' পাওয়া যাচ্ছে চর্যার পুথিতে, পঞ্চাকার (১১৯৯), কালচক্রতন্ত্র (১৪৪৬), শূদ্রপদ্ধতি (১৫১৪), ধর্মরত্ন (১৪৮৯), বোধিচর্যাবতার (১৪৩৫) পুথিতে।

একবাঁকযুক্ত 'ণ' পাওয়া যাচ্ছে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, মিতাক্ষরা (১৫০৬), শিশুপালবধ (১৫১১), শকুন্তলা (১৫৭১) পুথিতে।

দ্বিবিধপ্রকার 'ণ'-র মধ্যে দ্বিবাঁকযুক্ত 'ণ' যে প্রাচীন সে-সম্বন্ধে সন্দেহ করবার কারণ নেই, কারণ পারমেশ্বরতন্ত্র পুথির 'ণ'-র সঙ্গে তুলনায় এই 'ণ'-র ইতিহাসটি পাওয়া যাচ্ছে। তা ছাড়া তারিখযুক্ত প্রাচীন পঞ্চাকার পুথিতে শুধু দ্বিবাঁকযুক্ত 'ণ' পাওয়া যাচ্ছে।

ধর্মরত্ন (১৪৮৯) পুথিতে দ্বিবিধপ্রকারের 'ণ' পাওয়া যাচ্ছে। সুতরাং একবাঁকযুক্ত 'ণ'-র এক দিকের সীমা ১৪৮৯-কে ধরা যেতে পারে। আবার দ্বিবাঁকযুক্ত 'ণ' পাওয়া যাচ্ছে শূদ্রপদ্ধতি (১৫১৪) পুথিতে। তা হলে বুঝতে হবে ১৪৮৯-১৫১৪ এই সময়ের মধ্যে দ্বিবিধপ্রকারের 'ণ'-র ব্যবহারই চালু ছিল। কিন্তু ১৫১৪-র পরে দ্বিবাঁকযুক্ত 'ণ' আর পাওয়া যায় নি।

বিরুদ্ধপ্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত তা হলে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো বোধ হয় অযৌক্তিক হবে না যে ষোড়শ শতকের দ্বিতীয় দশকের পরে প্রাচীন 'ণ'-র প্রচলন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং যে-পুথিতে আধুনিক (অর্থাৎ একবাঁকযুক্ত) 'ণ' ব্যবহৃত হয়েছিল সে-পুথির লিপিকাল ষোড়শ শতকের দ্বিতীয় দশকের আগে নয়। এই সিদ্ধান্ত-অনুসারে চর্যার পুথি ষোড়শ শতকের আগে লেখা। কত আগে সে-বিচার স্বতন্ত্র, এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির লিপিকালের ঊর্ধ্বসীমা ১৫১৪।

পারমেশ্বরতন্ত্র চর্যা পঞ্চাকার কালচক্রতন্ত্র শূদ্রপদ্ধতি ধর্মরত্ন

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন শকুন্তলা শিশুপালবধ মিতাক্ষরা

ত

চর্যার পুথিতে 'ত' এবং 'দ'-র মধ্যে গোলমাল হওয়া অস্বাভাবিক নয়। দুটি অক্ষরেই মাত্রা থেকে একটি রেখা নীচের দিকে বেরিয়ে এসে ডান দিকে বাঁক নিয়েছে। আধুনিক বাংলায় 'ত' অক্ষরের মাত্রার নীচে বিন্দু আছে এবং লেজটি সেই বিন্দু থেকে বেরিয়েছে। চর্যার পুথিতে বিন্দুর

বদলে একটি রেখা আছে ᐟ এই রেখাটি থেকে লেজ নির্গত হয়েছে, পরে লেজটি পাক খেয়ে নীচের দিকে নামলে কাটা পড়েছে

তাই 'ত' দেখতে 'দ'-র মতো হয়েছে। পঞ্চাকার পুথিতে আধুনিক বাংলার 'ত' দেখা গেল। এই পুথির 'ত'-তে দেখা যাচ্ছে মাত্রা থেকে একটি রেখা নীচের দিকে নেমে এসেছে, রেখাটি যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে একটি বিন্দু, এই বিন্দু থেকে লেজ বেরিয়েছে। লেজ মাঝপথে কাটা পড়ে নি, মাথা পর্যন্ত উঠেছে। কালচক্রতন্ত্র এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির 'ত' পঞ্চাকারের 'ত'-র মতো। পঞ্চাকার পুথির সাক্ষ্যে বলা যায় 'ত'-র লেজ মাথায় উঠেছে ত্রয়োদশ শতকের শুরুতে। পরবর্তী কোনো পুথিতে লেজ কাটা 'ত' দেখা যাচ্ছে না। তবে এ ব্যাপারে 'ত'-র লেজই একমাত্র সাক্ষ্য নয়। বাংলায় যতগুলি লেজযুক্ত অক্ষর আছে, যেমন 'ড', 'ভ', 'ত', 'জ', 'ড'— এই সবগুলি অক্ষরের সাক্ষ্য গ্রহণ করলে এই সিদ্ধান্তে পৌছানো যায় যে ত্রয়োদশ শতকের আগে এই অক্ষরগুলির কোনোটিরই লেজ মাথায় ওঠে নি, প্রত্যেকটিরই লেজ মাঝপথে কাটা পড়েছে। নীচে বিভিন্ন পুথির 'ত' অক্ষরটি দেখানো হল।

পারমেশ্বরতন্ত্র চর্যা পঞ্চাকার কালচক্রতন্ত্র শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

থ

চর্যার পুথির 'থ' আধুনিক বাংলার মতো। তবে বাঁ-অংশ এবং ডান-অংশের 'সংযোগ' সূক্ষ্ম কোণাকৃতি নয়, নীচেয়ও নয়। আগেই বলা হয়েছে যে বাংলার অক্ষরের ডান-অংশ এবং বাঁ-অংশের 'সংযোগ' সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য করবার বিষয়। প্রাচীন অক্ষরে 'সংযোগ' অপেক্ষাকৃত উপরের দিকে,

আধুনিক অক্ষরে অপেক্ষাকৃত নীচের দিকে। 'ত' 'ভ' 'ড'-র লেজ উপরে ওঠা যেমন আধুনিকতার লক্ষণ তেমনি 'খ' 'য' 'ব' 'ম' প্রভৃতি অক্ষরের 'সংযোগ' নীচের দিকে নেমে আসা এবং সূক্ষ্ম কোণাকার হওয়া আধুনিকতার লক্ষণ। 'থ' অক্ষরটিতে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে সংযোগ সূক্ষ্ম কোণাকারও নয়, ঠিক নীচেরও নয়।

'চর্যার 'থ'-র সঙ্গে তুলনীয় পঞ্চাকার পুথির 'থ' অক্ষরটি।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 'থ' পঞ্চাকার পুথির মতোই। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির অন্যান্য অক্ষরে যেমন এই অক্ষরেও তেমনি কিছু অলঙ্কার আছে।

দ

পারমেশ্বরতন্ত্র পুথিতে 'দ'-র আকার কিছু জটিল। পঞ্চাকারও কালচক্রতন্ত্র পুথিতেও এই জটিল 'দ'। কিন্তু চর্যার পুথির 'দ' সরল, আধুনিক বাংলা 'দ'-র সঙ্গে তার পার্থক্য নেই। আগেই বলা হয়েছে চর্যার পুথির 'দ' অনেকটা 'ত'-র মতো। 'ত'-র মতো 'দ' অক্ষরেও মাত্রা থেকে একটি রেখা নেমে এসে ডান দিকে বাঁক নিয়েছে। চর্যার পুথিতে এই রেখাটি সরল, পঞ্চাকার, কালচক্রতন্ত্র পুথিতে এই রেখাটি সরল নয়।

পারমেশ্বরতন্ত্র পঞ্চাকার কালচক্রতন্ত্র চর্যা

এই চারটি 'দ'-র মধ্যে 'চর্যা'-র 'দ'-কে আধুনিক বলতে হয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এবং ষোড়শ শতকের অন্যান্য পুথির 'দ' চর্যার 'দ' থেকে পৃথক নয়।

ধ

চর্যা এবং পঞ্চাকার পুথির 'ধ' এক। মাথায় সামান্য একটু 'বাড়ি' বোধ হয় আছে। তবে 'বাড়ি' অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পদমধ্যস্থিত 'ই' বা 'এ'-র সঙ্গে মিশে রয়েছে বলে এর দৈর্ঘ্য বা অস্তিত্ব অনুমান করা শক্ত। কালচক্রতন্ত্র পুথিতে 'ধ'-র মাথায় 'বাড়ি' আছে; তবে 'বাড়ি' মাত্রারেখা ছাপিয়ে উপরে ওঠে নি; শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 'ধ' আর কালচক্রতন্ত্র পুথির 'ধ' এক।

চর্যা পঞ্চাকার কালচক্রতন্ত্র শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

সম্ভবত চর্যা এবং পঞ্চাকার পুথির 'ধ'-র বাড়ি নেই। যদি থাকে, তা হলে তা 'ই'-র ছত্রের সঙ্গে মিশে গেছে এবং কালচক্রতন্ত্র এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 'ধ'-র মতো 'বাড়ি' নীচের দিকেও নামে নি, উপরের দিকেও ওঠে নি। 'বাড়ি' না থাকলে চর্যা এবং পঞ্চাকার পুথির 'ধ'-র আকার 'ব'-র মতো হয়। তবে 'ব' এবং 'ধ'-র গোলমাল হওয়ার সম্ভাবনা নেই, কারণ 'ব'-য় মাত্রা আছে, 'ধ'-য় মাত্রা নেই।

ন

চর্যার 'ন' আধুনিক বাংলার মতো বটে তবে পঞ্চাকার পুথির 'ন'-র সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় যে চর্যার পুথিতে বাঁ-অংশ এবং ডান-অংশের সংযোগটি একটু উপরে, পঞ্চাকার পুথিতে নীচে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথিতেও 'সংযোগ' পঞ্চাকার পুথির মতো।

চর্যা পঞ্চাকার শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কালচক্রতন্ত্র

প

পারমেশ্বরতন্ত্র পুথিতে 'প'-র বাঁ-অংশ ঠিক টাঙ্গির মতো নয়, আধুনিক বাংলা 'য'-র মতো। পারমেশ্বরতন্ত্র পুথির 'প' সামান্য পরিবর্তিত আকারে পাওয়া যাচ্ছে পঞ্চাকার পুথিতে। পরিবর্তনের মধ্যে উপরের দিকটা জুড়ে গেছে, পারমেশ্বরতন্ত্র পুথিতে উপরের দিকটা খোলা ছিল। এই দুটি 'প'-র আকার তুলনা করলেই পার্থক্য স্পষ্ট হবে।

পারমেশ্বরতন্ত্র পঞ্চাকার

পঞ্চাকার পুথির 'প'-র তুলনায় চর্যার 'প' আধুনিক বাংলা 'প'-র বেশি কাছাকাছি। চর্যার পুথিতে 'প'-র বাঁ-অংশ টাঙ্গির আকার ধারণ করেছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 'প' অক্ষরটির বাঁ-অংশ, ডান-অংশ থেকে যেন সম্পূর্ণ আলাদা। দুটি অংশ এক হয়েছে মাত্রার সূত্রে। মাত্রা না থাকলে দুটি অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। বাঁ-অংশের আকারও ঠিক টাঙ্গির মতো নয়।

চর্যা শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

ষোড়শ শতকের সমস্ত পুথিতেই চর্যার পুথির 'প' দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 'প' বড়োই অদ্ভুত। এইরকম মাত্রা থেকে ঝুলে থাকা 'প' দ্বিতীয় কোনো পুথিতে দেখা যায় নি। তবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 'গ' অক্ষরটির সঙ্গে তুলনা করলে 'প'-র অদ্ভুত আকারকে লিপিকরের বৈশিষ্ট্য বলে মনে করা যায়। 'গ'-র বাঁ দিকের আঁকুড়িটিও মাত্রা থেকে ঝোলা।

ব

চর্যার 'ব' আধুনিক বাংলার মতো। অক্ষরটির ত্রিকোণাকার প্রায় সম্পূর্ণ হয়েছে বটে তবে বাঁ-অংশ এবং ডান-অংশের সংযোগ এখনকার 'ব'-র মতো নীচেয় নয়। সে তুলনায় পঞ্চাকার পুথির 'ব' আধুনিক বাংলা 'ব'-র বেশি কাছাকাছি।

ব ব ব ব

চর্যা পঞ্চাকার শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কালচক্রতন্ত্র

এর মধ্যে এক পঞ্চাকার ছাড়া আর কোনো পুথির 'ব' অক্ষরে সূক্ষ্ম কোণ নেই। তবে প্রবণতা সেই দিকে।

ভ

চর্যার 'ভ'-র লেজটি মাঝপথে কাটা পড়েছে, যেমন কাটা পড়েছে 'ত'-র লেজ। মাথার দিকটাও জটিল। সে তুলনায় পঞ্চাকার পুথির 'ভ' আধুনিক বাংলা 'ভ'-র বেশি কাছাকাছি। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এবং পঞ্চাকার পুথির 'ভ' একরকম।

ভ ভ ভ ভ ভ

পারমেশ্বরতন্ত্র চর্যা পঞ্চাকার শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কালচক্রতন্ত্র

পারমেশ্বরতন্ত্র পুথির 'ভ' চর্যার পুথির 'ভ' থেকে বেশি পৃথক নয়, কেবলমাত্র চর্যার পুথিতে লেজ একটু বেঁকেছে। পঞ্চাকার পুথিতে পরিবর্তন অনেক বেশি। লেজ অনেকখানি বেঁকেছে, মাথার দিকটাও সরল হয়েছে। একেবারে আধুনিক বাংলার 'ভ' দেখা যাচ্ছে শকুন্তলা (১৫৭১) পুথিতে।

ম

চর্যা এবং পঞ্চাকার পুথির 'ম' আধুনিক বাংলার মতো।

ম ম

চর্যা পঞ্চাকার

চযার পুথিতে 'য' এবং 'য়'-য় কোনো পার্থক্য নেই, বলা বাহুল্য, প্রাচীন বাংলার অধিকাংশ পুথিতেই নেই। চর্যার 'য' অক্ষরটি অন্যান্য অক্ষরের তুলনায় কিছু বিচিত্র আকারের। প্রথমত, বাঁ দিকের নীচের রেখাটি মাত্রার সঙ্গে সমান্তরাল, এটি হওয়া উচিত ছিল নিম্নগামী এবং ঈষৎ বক্র, যেমন 'ব' 'র' ইত্যাদি অক্ষরে দেখা যায়। দ্বিতীয়ত, বাঁ-অংশ এবং ডান-অংশের 'সংযোগ' অনেক উঁচুতে। চর্যার অনেক অক্ষরেই 'সংযোগ' উঁচুতে, তবে 'য' অক্ষরটিতে যেন কিছু বেশি উঁচুতে। চর্যার 'য'-র তুলনায় পঞ্চাকার পুথির 'য' আধুনিক বাংলা 'য'-র বেশি কাছাকাছি। এই পুথির 'য'র 'সংযোগ' অনেক নিচুতে, যেমন বাংলা-অক্ষরের পক্ষে স্বাভাবিক।

কালচক্রতন্ত্র পুথির 'য'-তে কোণগুলি খুব সূক্ষ্ম এবং 'সংযোগ' খুব নিচুতে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথিতে 'য'-র কোণ সূক্ষ্ম নয় (না হওয়াই স্বাভাবিক, কারণ অধিকাংশ অক্ষরেরই কোণ সূক্ষ্ম নয়) তবে 'সংযোগ' নিচুতে।

য য য য য

পারমেশ্বরতন্ত্র চর্যা পঞ্চাকার শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কালচক্রতন্ত্র

র

আধুনিক বাংলা 'র' এবং 'ব'-র পার্থক্য বিন্দুতে। ষোড়শ শতকের অনেক পুথিতে (যেমন ধর্মরত্ন, মিতাক্ষরা) এবং তার পরবর্তীকালের বহু পুথিতে 'র' 'ব'-র কোনো আকারগত পার্থক্য নেই। ষোড়শ শতকের

কোনো কোনো পুথিতে 'র'-র পেট চিরে 'ব' থেকে পৃথক করা হয়েছে।[১]

চর্যা, পঞ্চাকার এবং কালচক্রতন্ত্র পুথিতে 'র'-র পেটটিকে মসীলিপ্ত করে 'ব' থেকে পৃথক করা হয়েছে। এইরকম মসীলিপ্ত 'র' এই তিনখানি পুথিতে ছাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। এই তিনখানি পুথিই নেপালে পাওয়া। সুতরাং এই রীতিটি নেপাল অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল কিনা সে-সম্বন্ধেও নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না। চর্যার 'র' নিম্নরূপ।

র

ল

চর্যার পুথিতে দুইরকম 'ল' পাওয়া যায়। একটি খাঁটি আধুনিক বাংলার 'ল', আর একটি আধুনিক বাংলার মাত্রাযুক্ত 'ণ'র মতো। প্রথম শ্রেণীর 'ল' সংখ্যায় কম। পঞ্চাকার পুথিতে আধুনিক বাংলার 'ল' দেখা যাচ্ছে। কালচক্রতন্ত্র পুথিতেও তাই। তবে 'ন'-র মতো 'ল'-ও আছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও আধুনিক বাংলার 'ল' এবং 'ণ'-র মতো 'ল' দুইই পাওয়া যাচ্ছে।

ল ন ল ল ন ল

চর্যা পঞ্চাকার কালচক্রতন্ত্র শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

১. পঞ্চদশ শতকের একেবারে শেষে [১৪৯৬ খ্রীঃ] নকল করা একখানি পুথিতে [বর্ধমান রচিত 'গঙ্গাকৃত্যবিবেক', বৃটিশ মিউজিয়ামের পুথি, সংখ্যা Or 8567 a.] দ্বিবাকযুক্ত 'ণ' এবং পেট-কাটা 'র' একসঙ্গে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এই পুথির লিপিকাল যদি ঠিক হয় (লিপিকালের জন্য দ্রষ্টব্য Killhorn, JASB, 1898, পৃ. ২৩২) তা হলে পেট কাটা 'র'-র একটা নিম্নসীমা পাওয়া যাচ্ছে ১৪৯৬। এর আগেও পেট-কাটা 'র'-র প্রচলন ছিল কিনা তা আমার জানা নেই। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পেট-কাটা 'র' আছে বটে, কিন্তু একবাকযুক্ত 'ণ'।

মাত্রাযুক্ত 'ণ'কে 'ল'র জায়গায় ব্যবহার করবার রীতি অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত চালু ছিল।

এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় 'ল'কেও 'ণ'র জায়গায় ব্যবহার করা হয়েছে চর্যার পুথিতে। তবে 'ল' এবং 'ণ'র পার্থক্য স্পষ্ট; 'ল'র মাত্রা আছে 'ণ'র মাত্রা নেই।

শ

চর্যার পুথির 'শ' আধুনিক বাংলার মতো, দোপুঁটুলি আকারটি সুস্পষ্ট। এইরকম 'শ' পঞ্চাকার পুথির কয়েক জায়গায় আছে, তবে পঞ্চাকার পুথির অধিকাংশ 'শ' আকারে 'ল'-র মতো। এইরকম 'শ' কালচক্রতন্ত্র পুথিতেও আছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 'শ' চর্যার পুথির মতো।

চর্যা পঞ্চাকাব কালচক্রতন্ত্র শ্রীকৃষ্ণকীর্তন মিতাক্ষরা

ষ

চর্যার পুথির 'ষ' আধুনিক বাংলার মতো পেট-কাটা। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও তাই।

চর্যা শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

লক্ষণীয় যে চর্যার পুথিতে মাঝের খাঁচটা ক্ষীণ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে স্পষ্ট,

নীচের বাঁকটি চর্যার পুথিতে কোণাকার, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে অর্ধবৃত্তাকার।[১] চর্যার পুথির 'র' 'ব' 'খ' 'থ'-র তুলনায় 'ষ'-য় কোণগুলি স্পষ্ট নয়। পঞ্চাকার এবং কালচক্রতন্ত্র পুথিতে কোণ স্পষ্ট।

ষ ষ

পঞ্চাকার কালচক্রতন্ত্র

স

'স'-র আকার প্রায় সব পুথিতেই একরকম।

স স স স

চর্যা পঞ্চাকার কালচক্রতন্ত্র শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

হ

চর্যা, পঞ্চাকার, কালচক্রতন্ত্র—এই তিনখানি পুথির কোনোখানিতেই 'হ' আধুনিক আকার পায় নি। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আধুনিক বাংলার মতো 'হ' দেখতে পাওয়া গেল, তবে তখনো নিম্নগামী রেখাটি মধ্যাংশের সঙ্গে যুক্ত হয় নি।

হ হ হ হ

চর্যা পঞ্চাকার কালচক্রতন্ত্র শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

১. শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অধিকাংশ অক্ষরের যে অর্ধবৃত্তাকার বাঁক আছে তা যে লিপিকরের বৈশিষ্ট্য তার প্রমাণ পাওয়া যায় এই থেকে যে চর্যা, কালচক্রতন্ত্র পুথিতেও অনুরূপ অর্ধবৃত্তাকার বাঁক আছে— ষ ষ

চর্যার পুথির কয়েকটি সংযুক্ত ব্যঞ্জন—

কুং ঞ্চ ন্ত্র ন্থ প্র ন্যৈ

১৭

চর্যার পুথির অক্ষরগুলি পরীক্ষা করে দেখা গেল আধুনিক বাংলা অক্ষর থেকে এই অক্ষরগুলির আকারগত পার্থক্য বেশি নয়। একমাত্র আদ্যাক্ষরে 'ই' ছাড়া এমন আর-একটি অক্ষরও এই পুথিতে নেই যার বঙ্গীয়ত্বে সন্দেহ করা যায়।

আর-একটি প্রসঙ্গ এখানে স্মরণীয় যে আধুনিক বাংলা অক্ষরের প্রত্যেকটির গঠনের সম্পূর্ণতা একই সময়ে হয় নি। কোনো কোনো অক্ষরের বিবর্তনে কয়েক শত বছরের ব্যবধান আছে; অর্থাৎ 'ক' যদি আধুনিক রূপ পেয়ে থাকে নবম শতাব্দীতে, 'ই' আধুনিক রূপ পেয়েছে অনেক পরে। এই কথাটি মনে রাখলে চর্যার পুথির দু-একটি অক্ষরের বিচিত্র আকার বিভ্রান্তিকর মনে হবে না।

এখন স্বভাবতই প্রশ্ন হবে এই অক্ষরগুলি কত পুরানো, অর্থাৎ চর্যার পুথি লেখা হয়েছিল কবে।

অক্ষরের গঠন পরীক্ষা করে কোনো কোনো প্রাচীন পুথি বা অনুশাসনের লিপিকাল সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া গেছে বটে, কিন্তু অক্ষর-গঠন দেখে চর্যার পুথির লিপিকাল অনুমান করবার আগে বাংলা লিপির আঞ্চলিক প্রকারভেদ সম্বন্ধে কিছু ধারণা পাওয়া দরকার এবং ত্রয়োদশ-চতুর্দশ এবং পঞ্চদশ শতকের বাংলা লিপির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কিছু তথ্য বিস্তৃতাকারে জানা দরকার।

চর্যার পুথির উল্লেখযোগ্য লিপিগত বৈশিষ্ট্য এইগুলি—

১. দ্বিবাঁকযুক্ত 'ণ'

২. লেজকাটা 'ত' এবং 'ভ'

৩. 'অ'-র সংযোগ মাঝে

৪. চৈতনহীন 'ট'

৫. 'য'-র সংযোগ উঁচুতে

৬. 'ক'-র আঁকুড়ি লম্বা

১১৯৯ খ্রীস্টাব্দে অনুলিখিত পঞ্চাকার পুথির সঙ্গে চর্যার লিপিগত সাদৃশ্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। কিছু অমিলও আলোচনা-প্রসঙ্গে ধরা পড়েছে, যেমন 'ত', 'য', 'ভ', 'স' ইত্যাদি। পঞ্চাকার পুথির এই অক্ষরগুলি আধুনিক বাংলার বেশি কাছাকাছি। আবার, চর্যার পুথির 'দ', 'প', 'শ' অবশ্যই পঞ্চাকার পুথির তুলনায় আধুনিক। এই সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য থেকে চর্যার পুথির লিপিকাল সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যাচ্ছে না বটে তবে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে চর্যার পুথিতে অধিকাংশ অক্ষরগুলির 'সংযোগ' নিচুতে নয়, বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'অ', 'থ', 'য', 'ব' ইত্যাদি। এটি প্রাচীনত্বের লক্ষণ। প্রাচীনত্বের আর-পাঁচটি লক্ষণের কথা উপরে বলা হয়েছে। সেই কারণে আমার অনুমান চর্যার পুথি খুব সম্ভব পঞ্চাকার পুথির আগে লেখা হয়েছিল।

পঞ্চাকার পুথির লিপিকাল যদি যথার্থই ত্রয়োদশ শতকের শুরুতে হয় তা হলে আমার অনুমান চর্যার পুথির লিপিকাল দ্বাদশ শতকের শেষার্ধ। মনে রাখতে বলি, এ অনুমান এক জোড়া চোখের সাক্ষ্যে এবং স্বল্পসংখ্যক পুথির ভিত্তিতে।

—

পুথি-চিত্র

১ চর্যাচর্যবিনিশ্চয়

[illegible]

[illegible]

২

২ গক্কাকার (১১৯৯ খ্রীস্টাব্দ)

৩

৪

৫

৩ কালচক্রতন্ত্র (১৪৪৬ খ্রীস্টাব্দ) ৪ ধর্মরত্ন (১৪৮৯ খ্রীস্টাব্দ) ৫ মিতাক্ষরা (১৫০৬ খ্রীস্টাব্দ)

৬

৮

৬ শিশুপালবধ (১২১১ খ্রীস্টাব্দ) ৭ শূদ্রপদ্ধতি (১৫১৪ খ্রীস্টাব্দ) ৮ শকুন্তলা (১৫৭১ খ্রীস্টাব্দ)

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা

শ্রীঅনাথনাথ বসু



বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা

প্রকাশ আষাঢ় ১৩৫১
পুনর্মুদ্রণ বৈশাখ ১৩৫৩, অগ্রহায়ণ ১৩৫৯
চৈত্র ১৩৬৭

মূল্য এক টাকা

রবীন্দ্রনাথের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে

সূচী

আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থার সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলে প্রথমেই সংক্ষেপে ইহার ইতিহাস আলোচনা করা প্রয়োজন। এই ঐতিহাসিক পটভূমিকায় আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার বর্তমান রূপ ও সমস্যাগুলি স্পষ্টভাবে বোঝা যাইবে।

আজ দেশে যে শিক্ষাব্যবস্থা চলিতেছে ইহার সূত্রপাত হয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে। তাহার মূলে ছিল কয়েকজন ভারতীয় ও বিদেশী এবং বিশেষ করিয়া কতকগুলি ইউরোপীয় মিশনারীর উৎসাহ ও চেষ্টা। তাঁহাদের চেষ্টার ফলেই এদেশে বর্তমান ইংরেজী শিক্ষাব্যবস্থার গোড়া-পত্তন হইয়াছিল। একদল বিদেশীর ধারণা বুঝি বা পশ্চিমদেশ হইতে, বিশেষ করিয়া ইংলণ্ড হইতে, এদেশে প্রথম জ্ঞানের আলোক আসে এবং বিদেশীদের চেষ্টাতেই বুঝি আমাদের অজ্ঞানের অন্ধকার দূরীভূত হয়। তাঁহারা জানেন না যে অতি প্রাচীনকাল হইতেই এদেশে শিক্ষাব্যবস্থা সুসংহত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল; রাজ্যবিপ্লবে সে ব্যবস্থা সাময়িকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও কোনোদিনই তাহা সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত হইয়া যায় নাই। বরং আমাদের দেশের কেহ কেহ মনে করেন যে আগেকার দিনের তুলনায় ইংরেজ আমলে এ পর্যন্ত শিক্ষার প্রসার হওয়া দূরে থাক, উলটাই হইয়াছে। তাঁহাদের মতে এই আমলে এখনও পর্যন্ত দেশে নিরক্ষরতা বাড়িয়াছে বই কমে নাই। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে বিলাতে এক বক্তৃতায় গান্ধীজী এই মর্মে অভিযোগ করেন। সুপরিচিত ইংরেজ শিক্ষাবিদ্ সার ফিলিপ হার্টগ ইহার উত্তর দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার উত্তরেরও প্রত্যুত্তর দেওয়া হইয়াছে। বস্তুত এখনও এ বিষয়ে কোনো নিষ্পত্তি হয় নাই।

সেকালের শিক্ষাব্যবস্থা

ইউরোপীয়েরা যখন প্রথম এদেশে আসেন তখনও আমাদের প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থা ঠিকমত চলিতেছিল ; এমন-কি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম-ভাগে যখন নবীন শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন হইল তখনও সেই সুপ্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হইয়া যায় নাই ; তখনও দেশের সর্বত্র বহু টোল-চতুষ্পাঠী ছিল, মক্তব-মাদ্রাসা ছিল ; তখনও গ্রামে গ্রামে গুরু-মহাশয়গণ পাঠশালায় দেশের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিখাইতেছিলেন, টোলে অধ্যাপকগণ শাস্ত্রচর্চায় রত ছিলেন।

টোল ও মক্তবগুলি তখন ছিল এদেশের উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র, আর পাঠশালাগুলি ছিল প্রাথমিক শিক্ষার কেন্দ্র।

সেকালের পাঠশালাগুলির ব্যবস্থা ছিল খুব সাদাসিধে ধরণের। সকল পাঠশালারই যে নিজস্ব গৃহ ছিল তাহা নহে ; অনেক ক্ষেত্রেই কোনো সম্পন্ন গৃহস্থের চণ্ডীমণ্ডপে বা বারোয়ারীতলার পূজামণ্ডপে পাঠশালা বসিত ; যেখানে নিদেনপক্ষে তাহাও জুটিত না সেখানে গুরুমহাশয় গাছতলায় আশ্রয় লইতেন ; আম্রবটের ছায়ায় গ্রাম্য পাঠশালা বসিত, ছেলেরা পাততাড়ি-বগলে সেখানে আসিয়া জুটিত, এবং গুরুমহাশয় বেত্রহস্তে তাহাদের বিদ্যা বিতরণ করিতেন।

পাঠশালার কাজ শুরু হইবার কোনো নির্দিষ্ট সময় ছিল না, গুরুমহাশয়ের সুবিধামত পাঠশালা বসিত, পাঠশালার ছুটি হইত। গ্রাম্য উৎসবে পূজাপার্বণে পাঠশালা বন্ধ থাকিত ; এখনকার মত সাপ্তাহিক বা বাৎসরিক নির্দিষ্ট কোনো ছুটির ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু তাই বলিয়া অনধ্যায়ের ব্যবস্থা অপ্রতুল ছিল এটা মনে করিবার কারণ নাই।

পাঠশালার পাঠ্য ছিল সংকীর্ণ ; সামান্য লেখাপড়া ও জমাখরচের হিসাব, পাঠ্য বলিতে এইটুকুই ছিল। তাহাতে না ছিল ইতিহাস ভূগোল,

না ছিল ধর্মশিক্ষা স্বাস্থ্যতত্ত্ব, হাতের কাজ বা ব্যায়াম। ছেলে চার-পাঁচ বছর পাঠশালায় কাটাইয়া কোনোমতে রামায়ণ-মহাভারত পড়িতে, চিঠিটা-পত্রটা লিখিতে, দলিল-দস্তাবেজ তৈয়ারি করিতে ও জমিদারী-মহাজনী হিসাবটা রাখিতে শিখিলেই তাহার পাঠশালার শিক্ষা শেষ হইত। তখনও ছাপা পুস্তকের চল হয় নাই; সুতরাং পাঠশালায় সেগুলির ব্যবহার ছিল না।

পাঠশালায় হিন্দুমুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ছেলেই পড়িত; এবং সাধারণত মধ্যবিত্ত বলিতে আমরা যাহাদের বুঝি তাহাদের ছেলেরাই লেখাপড়া শিখিতে যাইত। লেখাপড়া শিখিয়া তাহারা জমিদারী সেরেস্তায় বা মহাজনের গদিতে মুহুরীগিরি করিত। এই হিসাবে পাঠশালার শিক্ষাকে বৃত্তিমূলক শিক্ষার পর্যায়ে ফেলা যাইতে পারে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম আমলের একটা বিবরণে দেখিতে পাই, পাঠশালার ছাত্রদের মধ্যে তথাকথিত উচ্চবর্ণের ছাত্রের সংখ্যা বেশি হইলেও তাহাদের মধ্যে তথাকথিত নিম্নবর্ণের ছাত্রও যে এক-আধ জন দেখা যাইত না এমন নহে; এমন-কি হাড়ি বাগদি মুচি বাউরি জেলে মাল কলু কামার প্রভৃতি জাতির ছাত্রের সন্ধানও এই বিবরণে আমরা পাই। মেয়েরা সাধারণত পাঠশালায় যাইত না; তাহারা যেটুকু লেখাপড়া শিখিত, সেটুকু বাড়িতেই শিখিত। তবে এক-আধ জন মেয়ে যে পাঠশালায় পড়িত না তাহা নহে; কিন্তু সে খুব অল্প বয়সে। একটু বড় হইলেই তাহাদের গৃহকর্মের শিক্ষা আরম্ভ হইত, তাহার মধ্যে আর পাঠশালায় যাইবার অবসর থাকিত না।

দেশের উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র ছিল টোল মক্তব মাদ্রাসাগুলি। দেশের স্থানে স্থানে সেগুলি প্রতিষ্ঠিত ছিল। নবদ্বীপ মিথিলা বিক্রমপুর প্রভৃতি স্থানগুলি ছিল সংস্কৃত শিক্ষার বড় বড় কেন্দ্র। সে সকল স্থানে বহু টোল

ছিল ; দূর দূর দেশ হইতে ছাত্রেরা আসিয়া সেখানে লেখাপড়া করিত। পাটনা মুর্শিদাবাদ দিল্লী প্রভৃতি স্থানে আরবী-ফারসীর চর্চা ছিল, মক্তব-মাদ্রাসা ছিল। ব্রাহ্মণের ছেলে টোলে কাব্য ব্যাকরণ ন্যায় মীমাংসা প্রভৃতি পড়িত। সকলেই যে যাজন বা অধ্যাপনা করিবার জন্য পড়িত তাহা নহে। অনেকে জ্ঞানলাভের আগ্রহে বিদ্যাচর্চা করিত। সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারের ছেলেরা ঘরে আখনজী রাখিয়া ফারসী শিখিত, কোরান পড়িতে শিখিত ; তাহাদের মধ্যে যাহারা উচ্চতর শিক্ষা লাভ করিতে চাহিত তাহাদের মক্তব-মাদ্রাসায় গিয়া ভরতি হইতে হইত। সেগুলিও ঠিক ছিল টোলগুলির মত। সেখানে ছাত্রগণ বিনা ব্যয়ে লেখাপড়া শিখিত, এমন-কি তাহাদের থাকিবার খাইবার খরচ পর্যন্ত লাগিত না। ফারসী ছিল তখনকার রাজভাষা ; তাই বহু হিন্দুসন্তানও ফারসী শিখিত রাজসরকারে চাকরির জন্য। কেহ কেহ আবার শুধু জ্ঞান অর্জনের জন্যই আরবী-ফারসী পড়িত। ইহাই ছিল তখনকার দিনে উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা।

একটা কথা মনে রাখিবার মত, তখন উচ্চশিক্ষা অবৈতনিক ছিল। টোল মক্তব মাদ্রাসাগুলি রাজসরকারের বা ধনীদের সাহায্য যথেষ্ট পরিমাণে পাইত। ব্রাহ্মণ অধ্যাপক ব্রহ্মোত্তর ভোগ করিতেন, পূজা-পার্বণে বৃত্তি ও বিদায়ী পাইতেন এবং তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিয়া নিজের কুটিরে বসিয়া বিদ্যাদান ও শাস্ত্রচর্চায় মগ্ন থাকিতেন। তাঁহারা বিদ্যা বিক্রয়ের কথা ভাবিতেও পারিতেন না।

টোলে বেতনের ব্যবস্থা না থাকিলেও পাঠশালায় লেখাপড়া শিখিবার জন্য বেতন লাগিত। তবে সেখানে বেতন নির্দিষ্ট ছিল না। ছাত্রদের মধ্যে যাহার যাহা সাধ্য সে তাহাই দিত। কেহ হয়তো কিছু চাল দিল, কেহ বা তৈল দিল ; আবার যে দিতে পারিত সে পয়সাই দিত। হিসাব

করিয়া দেখা গিয়াছে, তখনকার দিনের পাঠশালার গুরুমহাশয়দের আর্থিক অবস্থা আজকালকার তুলনায় বেশ সচ্ছলই ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের একটা হিসাবে দেখিতে পাই তখন পাঠশালার একজন গুরুমহাশয় গড়ে মাসে নগদ প্রায় পাঁচ-ছয় টাকা উপার্জন করিতেন। এক শ বছর আগে পাঁচ-ছয় টাকা আয়ে ঘরে দুর্গাপূজা করা যাইত। তাহার উপর লাউটা কুমড়াটা, পূজাপার্বণে বিদায়ী, উৎসবে একখানা ধুতি বা গামছা এগুলি তো ছিলই। সুতরাং এখনকার তুলনায় তখনকার গুরুমহাশয় ভালোই পাইতেন বলা যাইতে পারে।

* আধুনিক কালের মাপকাঠি দিয়া বিচার করিলে হয়তো তখনকার দিনের পাঠশালার এই শিক্ষা পর্যাপ্ত বলিয়া মনে হইবে না; কিন্তু সে যুগের সমাজব্যবস্থা ও প্রয়োজনের তুলনায় সে শিক্ষা যে অকিঞ্চিৎকর ছিল তাহা বলা চলে না। সে যুগের একজন অভিজ্ঞ দর্শক তাঁহার নিজের দেশ স্কটল্যাণ্ডের পাঠশালাগুলির সঙ্গে তুলনা করিয়া আমাদের দেশের এই গ্রাম্য পাঠশালাগুলিকে ভালো বলিয়াছেন এবং পাঠশালার গুরুমহাশয়দের কাজের প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।

পুরাতন শিক্ষাব্যবস্থার কয়েকটি বিশেষত্ব লক্ষ্য করিতে হইবে। প্রথমত আজ যেমন আমরা প্রাথমিক মাধ্যমিক ও উচ্চ, শিক্ষার এই ধরণের কয়েকটি ভাগ করি আগেকার দিনে তেমন করা হইত না। আজকালকার হিসাবে তখন শিক্ষার প্রাথমিক ও উচ্চ মাত্র এই দুইটি স্তরই ছিল। মাধ্যমিক শিক্ষা বলিতে তখন কিছুই ছিল না।

এই শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে আর-একটি বিষয় লক্ষ্য করা যাইতে পারে। তখন প্রায়-গ্রামেই পাঠশালা ছিল, কারণ পাঠশালা গ্রাম্যদেবতার মতই তখনকার পল্লীসমাজের অপরিহার্য অঙ্গ ছিল। প্রতি গ্রামেই অবশ্য টোল অর্থাৎ উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান ছিল না। কিন্তু সাধারণত প্রাথমিক

শিক্ষার জন্য গ্রামের ছেলেদের গ্রামের বাহিরে যাইতে হইত না। বড় বড় গ্রামে পাঁচ-ছয়টি পর্যন্ত পাঠশালা থাকিত। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে সরকারের পক্ষ হইতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার প্রসার সম্বন্ধে যে তথ্য সংগ্রহ করা হয় তাহাতে আমরা দেখিতে পাই যে তখন শুধু এই বাংলা দেশেই (তখন বিহার ও ছোটনাগপুর এবং কটক জেলাও বাংলার অন্তর্ভুক্ত ছিল) এক লক্ষ পাঠশালা ছিল।

কিন্তু সে সময়টা ছিল প্রাচীন, সকলপ্রকার ব্যবস্থার পড়তির সময়; রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন অর্থনৈতিক সামাজিক এবং শিক্ষাব্যবস্থাও ধীরে ধীরে শক্তিহীন, প্রাণহীন হইয়া পড়িতেছিল। বহু প্রাচীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নষ্ট হইয়া গিয়াছিল এবং যাইতেছিল। দেশের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্যই ছিল তাহার প্রধান কারণ। ১৮২২ সালে মাদ্রাজের এক কালেক্টার প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থার ধ্বংসের কারণস্বরূপ নির্দেশ করিয়াছিলেন, দেশের সর্বত্র সৈন্যদের চলাচল, বিদেশী বস্ত্রশিল্পের প্রসার ও প্রাচীন কুটীরশিল্পগুলির ধ্বংস। প্রাচীন সমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নষ্ট হইবার সঙ্গে সঙ্গে কত গ্রাম্য পাঠশালা যে ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল তাহার হিসাব আর কেহ রাখে নাই। সুতরাং ঊনবিংশ শতাব্দীতে শিক্ষার বিস্তার সম্বন্ধে যে সকল তথ্য সংগৃহীত হইযাছিল তাহাদের উপর নির্ভর করা যায় কিনা সন্দেহ। তখনকার তথ্যের হিসাবে প্রাথমিক শিক্ষার যতখানি প্রসার ছিল মনে করা যাইতে পারে বস্তুত শিক্ষার প্রসার তাহার চেয়ে যে অনেক বেশি ছিল তাহা অনুমান করিলে বিশেষ অন্যায় করা হইবে না।

এই তো গেল প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থার অবস্থা। এমন সময়ে ইউরোপীয় মিশনারী ও অন্য কয়েকজনের চেষ্টায় সম্পূর্ণ নূতন ধরণের এক শিক্ষা-ব্যবস্থার পত্তন এদেশে হইল। সারা ঊনবিংশ শতাব্দী ধরিয়া এক দিকে

যেমন এই নূতন শিক্ষাব্যবস্থার প্রসার হইতে লাগিল, অন্য দিকে তেমনি প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থার অবনতি ঘটিতে লাগিল।

নূতন ব্যবস্থার সূত্রপাত

পূর্বেই বলিয়াছি মিশনারীগণই এদেশে নূতন শিক্ষাব্যবস্থার প্রথম প্রবর্তন করিয়াছিলেন। ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের আগমনের সঙ্গেই এদেশে মিশনারীগণের পদার্পণ ঘটে। পর্তুগীজ বণিকদের আগমনের কিছু কাল পরেই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের রোমান ক্যাথলিক মিশনারীগণ এদেশে আসেন। তাঁহারা ভারতের পশ্চিম উপকূলে বিভিন্ন পর্তুগীজ বাণিজ্যকেন্দ্রে ধর্ম প্রচারের সহিত তাঁহাদের স্বদেশীয় আদর্শে গঠিত কতকগুলি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। পর্তুগীজদের পতনের পর সেই বিদ্যালয়গুলিও ধীরে ধীরে নষ্ট হইয়া যায়। এই রোমান ক্যাথলিক মিশনারীগণের মধ্যে জেসুইট সম্প্রদায়ের সেণ্ট জেভিয়ারের নাম এখনও এদেশের কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত রহিয়াছে।

পর্তুগীজদের পরে দিনেমারগণ এদেশে বাণিজ্য করিতে আসে। দিনেমারদের সময়েই প্রটেস্টাণ্ট মিশনারীরা প্রথম এদেশে আসেন। এই সকল মিশনারীদের বড় কর্মকেন্দ্র ছিল পূর্ব উপকূলে মাদ্রাজের আশেপাশে। তাঁহারাই এদেশে প্রথম ইংরেজী শিখাইবার জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আগমনের কিছুকাল পরেই ইংরেজ মিশনারীরা এদেশে আসিতে আরম্ভ করেন। প্রথম আমলে মাদ্রাজ অঞ্চলেই তাঁহাদের কাজ সীমাবদ্ধ ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে মাদ্রাজের এক ব্রিটিশ মিশনারী স্থানীয় মিশন ইস্কুলে 'সর্দার পোড়ো' ব্যবস্থা আবিষ্কার করিয়া তাহা নিজেদের দেশে প্রবর্তন করিয়া বিখ্যাত হন। মাদ্রাজের পর ধীরে ধীরে বাংলা দেশে মিশনারীদের কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত হয়।

অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে ব্যাপটিস্ট মিশনারী সম্প্রদায়ের বিখ্যাত উইলিয়ম কেরী কয়েকজন সহকর্মীসহ বাংলাদেশে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করিতে আসেন।

মিশনারীরা যেখানেই গিয়াছেন সেখানেই মুদ্রাযন্ত্র লইয়া গিয়াছেন, স্থানীয় ভাষা শিখিয়াছেন, সেই ভাষায় বাইবেল ও অন্যান্য গ্রন্থ ছাপিয়াছেন, খ্রীস্টের বাণী প্রচার করিয়াছেন, দেশের ধর্ম ও সমাজ -ব্যবস্থার নিন্দা করিয়াছেন, যাহারা তাঁহাদের প্রলোভনে, প্ররোচনায় বা শিক্ষায় স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া খ্রীস্টান হইয়াছে তাহাদের আশ্রয় দিয়াছেন, তাহাদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিখাইবার জন্য বিদ্যালয় করিয়াছেন। কোথাও বিদ্যালয় আগে হইয়াছে এবং বিদ্যালয়ের ভিতর দিয়া ধর্মপ্রচারের চেষ্টা পরে হইয়াছে; কোথাও বা প্রচারকেন্দ্র আগে হইয়াছে পরে বিদ্যালয় হইয়াছে। এইভাবে ইংরেজ আমলের প্রথমভাগে মিশনারীদের চেষ্টায় এদেশে এক নূতন ধরণের শিক্ষাব্যবস্থার সূত্রপাত হইয়াছিল।

মিশনারীরা যে ইস্কুলগুলি প্রতিষ্ঠা করেন দেশের প্রাচীন পাঠশালাগুলি হইতে সেগুলি অনেকটা স্বতন্ত্র ধরণের ছিল। প্রথমত সেখানে খ্রীস্টানধর্ম শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা থাকিত; বস্তুত সেই শিক্ষা দেওয়াই ইহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। দ্বিতীয়ত সেখানে ইতিহাস ভূগোল ব্যাকরণ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়গুলি পড়ানো হইত। আর সেখানকার কাজকর্মের ব্যবস্থাও অনেক পরিমাণে নির্দিষ্ট ছিল; রবিবার দিন পাঠশালার ছুটি থাকিত। তাহা ছাড়া মিশনারীরাই এদেশে প্রথমে বিদ্যালয়-পাঠ্য পুস্তক লেখেন ও ছাপেন। মিশনারী ইস্কুলগুলিতে সেই পুস্তক ব্যবহার করা হইত। আর-একটি ব্যাপারেও তাঁহাদের বিশেষত্ব ছিল; প্রাচীনকালের পাঠশালায় বা টোলে একজন গুরুমহাশয়ই পড়াইতেন; নবীন ধরণের মিশনারী ইস্কুলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে একাধিক গুরু শিখাইতেন। তাহা ছাড়া পুরাতন

পাঠশালায় ছাত্রদের মধ্যে কোনো শ্রেণীবিভাগ ছিল না, নূতন ধরণের পাঠশালায় ক্রমে শ্রেণীবিভাগ প্রবর্তন করা হয়। এইভাবে মিশনারীদের ইস্কুলগুলিতে এক নূতন ধরণের শিক্ষাব্যবস্থা শুরু হইল।

ইতিমধ্যে দেশে অনেক পরিবর্তন ঘটিয়া গিয়াছে। ধীরে ধীরে বিদেশী বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় গোলমাল হইয়া গিয়াছে; ফলে সমাজদেহেও নানাপ্রকারের বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে; ১৭৫৭ সালের পলাশীর রণ-প্রাঙ্গণে আমরা স্বাধীনতা হারাইয়াছি। ১৭৬৫ সালে কোম্পানি দেওয়ানি লইয়া দেশের অর্থনৈতিক জীবন আপনার করায়ত্ত করিয়াছে। ধীরে ধীরে বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডরূপে দেখা দিয়াছে; কোম্পানি ব্যবসায়ের সঙ্গে সঙ্গে রাজত্ব করা শুরু করিয়াছে। আমরা যখনকার কথা বলিতেছি তখন ইংরেজের রাজ্যবিস্তার দ্রুত চলিয়াছে এবং একটির পর একটি করিয়া দেশী রাজ্যগুলি ছলে বলে ব্রিটিশরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হইতেছে।

ইহার মধ্যে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার দিকে দৃষ্টি দিবার অবসর কোম্পানির ছিল না। বরং পাছে রাজ্যবিস্তারে বাধা ঘটে এই ভয়ে তখন কোম্পানি-রাজ দেশের সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে হাত দিতে অনিচ্ছুক; এমন-কি মিশনারীদের প্রতি তাহাদের নীতির পরিবর্তন ঘটিয়াছে; এককালে কোম্পানি যতদূর সম্ভব মিশনারীদের আনুকূল্য করিয়াছিল, কিন্তু রাজ্য প্রতিষ্ঠার এই সন্ধিক্ষণে পাছে মিশনারীদের ধর্মপ্রচারের ফলে এই ধর্মপ্রাণ দেশের লোক উত্তেজিত হইয়া রাজ্যবিস্তারে বাধা ঘটায় এইজন্য কোম্পানি মিশনারীদের শাসন করিয়া দিয়াছে। যখন ১৭৯৯ সালে উইলিয়ম কেরী বাংলাদেশে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্য আসিলেন তখন তাঁহাকে কোম্পানির মুলুক ছাড়িয়া শ্রীরামপুরে দিনেমারদের আশ্রয় লইতে হইল। শুধু তাহাই নহে, ইতিমধ্যে কোম্পানির একজন বড় কর্মচারী ওয়ারেন হেস্টিংস সম্মো-

রাজ্যভ্রষ্ট মুসলমানদের সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ দেখাইবার জন্য এবং তাহাদের কয়েকটি চাকরি দিয়া খুশী করিবার জন্য ১৭৮১ সালে কলিকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, দেখাদেখি ১৭৯১ সালে কাশীতে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের সন্তুষ্ট করিবার জন্য সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই দুইটি প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য জ্ঞানচর্চা নহে, উভয় সম্প্রদায়ের নেতাদের সন্তুষ্ট করা এবং তাহাদের সন্তানদের জন্য কয়েকটা চাকরির সুবিধা করিয়া দেওয়া। তখন ইংরেজ জজদের সঙ্গে দেশীয় আইন ব্যাখ্যা করিয়া দিবার জন্য জজপণ্ডিত ও মৌলবী থাকিত। মাদ্রাসা ও সংস্কৃত কলেজের ছাত্রগণ এই কাজ পাইত এবং ইহারই লোভে সেখানে পড়িতে যাইত। পড়ার সুযোগও ছিল যথেষ্ট; অধিকাংশ ছাত্রই বৃত্তি পাইত; সুতরাং সেখানে লেখাপড়া শেখার খরচ বিশেষ ছিল না।

১৭৯৩ সালে কোম্পানির সনন্দ নূতন করিয়া দিবার প্রসঙ্গে কোম্পানি এদেশের অধিবাসীদের শিক্ষার জন্য কোনো চেষ্টা বা অর্থব্যয় করিবে কিনা এই কথা ওঠে; বলা হয়, সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় ও খরচে এদেশের লোককে শিক্ষা দিবার জন্য কিছু মিশনারী ও শিক্ষক পাঠানো হউক। কোম্পানির কর্তৃপক্ষ এই প্রস্তাবে চঞ্চল হইয়া উঠেন এবং প্রাণপণে প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। কেহ কেহ বলেন, লেখাপড়া শিখাইবার জন্য আমেরিকা হাতছাড়া হইয়াছে, ভারতের লোককে আর লেখাপড়া শিখাইয়া কাজ নাই। কেহ বলিলেন, যদি আদান-প্রদানের কথা তোলা যায় তাহা হইলে ভারতবর্ষকে জ্ঞান দান করার চেয়ে সেখান হইতে জ্ঞান আহরণ করার চেষ্টাই বরং করা উচিত হইবে। এইভাবে কথাটা সে সময়ে চাপা পড়ে। বিশ বৎসর পরে, ১৮১৩ সালে, মিশনারীদের পৃষ্ঠপোষকদের চেষ্টায় পার্লামেণ্টে আবার কথাটা উঠে; ইতিমধ্যে কোম্পানির রাজত্ব অনেকটা কায়েম হইয়াছে, রাজ্য হারাইবার ভয়ও কমিয়াছে; সুতরাং

কোম্পানির কর্মকর্তাদের আপত্তি এবার আর টিকিল না; মিশনারীদের জয় হইল। কোম্পানির সনন্দের আইনে শিক্ষা সম্বন্ধে একটি ধারা বিধিবদ্ধ হইল; তাহাতে বলা হইল, "এদেশে, প্রাচ্যবিদ্যার পরিপোষকতা এবং ইউরোপীয় বিদ্যার প্রচারের জন্য কোম্পানি অন্য সকল রকমের খরচখরচা মিটাইয়া বৎসরে একলক্ষ টাকা খরচ করিবেন।" একলক্ষ টাকায় এই বিরাট দেশে একাধারে প্রাচীন শিক্ষার পৃষ্ঠপোষণ এবং নবীন শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন হইবে।

পূর্বেই বলিয়াছি কোম্পানির কর্মকর্তাদের এই ব্যাপারে আপত্তি ছিল। সুতরাং আইন হওয়া সত্ত্বেও সামান্য যে একলক্ষ টাকা বরাদ্দ হইয়াছিল ১৮২৩ সাল পর্যন্ত তাহাও বিশেষ খরচ হইল না। এদিকে কিন্তু কতকগুলি ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। ভারতের জাতীয় জীবনে রামমোহন রায়ের আবির্ভাব হইয়াছে; তিনি বর্তমান অবস্থা ও পাশ্চাত্যের সহিত স্পর্শের সুযোগ লইয়া ভারতবর্ষকে এক নিমেষে মধ্যযুগ হইতে বর্তমান যুগে টানিয়া আনিবার স্বপ্ন দেখিতেছেন। ডেভিড হেযার এদেশে আসিযাছেন মানবসেবার পবিত্র আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া; তাঁহাদের ও অন্যান্য কয়েকজনের চেষ্টায় ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সেখানে বাঙালীর ছেলে পাশ্চাত্য মনীষিগণের পরিচয় লাভ করিতেছে। মিশনারীদের শিক্ষাদানব্যবস্থাও প্রসার লাভ করিতেছে। ১৮১৮ সালে শ্রীরামপুর কলেজ ও ১৮২০ সালে বিশপ্‌স কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ছোটদের শিক্ষার জন্য মিশনারীরা এবং হেয়ার, রামমোহন প্রভৃতি নূতন ধরণের পাঠশালা স্থাপন করিতেছেন। তাঁহাদের পাঠশালায় ইংরেজী শিখাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। তাঁহাদের আদর্শ অনুসরণ করিয়া অন্য অনেকেও নূতন ধরণের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। আর-একদল লোকও ইতিমধ্যে ইংরেজী শিক্ষার অর্থকরী শক্তি উপলব্ধি করিয়া ফেলিয়াছে।

তাহাদের ইংরেজী শিখাইবার জন্য আর-এক ধরণের বিদ্যালয় তৈয়ারি হইয়াছে; সেখানে কোনোমতে কতকগুলি ইংরেজী শব্দ মুখস্থ করিয়া লোকে অনায়াসে ইংরেজ ব্যবসায়ীদের হৌসে চাকরি পাইয়া 'বাবু' আখ্যা লাভ করিতেছে, নূতন সামাজিক পদমর্যাদা পাইতেছে। এ দিকে ইংরেজরাজত্বের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এক দিকে যেমন শাসনকর্তাদের রাজ্য হারাইবার ভয় কমিয়াছে, অন্য দিকে তেমনি দিনে দিনে অধিক সংখ্যক কর্মচারীর প্রয়োজন বাড়িয়া চলিয়াছে। বিলাত তখন বহু দূরের দেশ; সেখান হইতে লোক আনানো যেমন আযাসসাধ্য তেমনি ব্যয়সাপেক্ষ। সুতরাং সরকারের পক্ষে স্বল্পবেতনে কর্মচারী নিয়োগের সমস্যাটাও ক্রমশ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে।

কোম্পানির আমল : প্রথম যুগ

১৮১৩ সাল পর্যন্ত শিক্ষাবিষয়ে কোম্পানির কোনো নির্দিষ্ট নীতি ছিল না বলিলেই হয়। কিন্তু ক্রমশ একদল মুখ্যস্থানীয় কর্মচারীর অভাবে কোম্পানি প্রাচ্যবিদ্যার পৃষ্ঠপোষকতা করাই স্থির করেন। তাঁহাদের অনেকেই সংস্কৃত আরবী ফারসী ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন এবং বিভিন্ন প্রাচ্য ভাষায় নবাবিষ্কৃত জ্ঞানভাণ্ডারের পরিচযলাভে মুগ্ধ হইয়া তাঁহারা এই ভাষাগুলি অনুশীলনের পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই নীতি গ্রহণের পক্ষে একটা বড় যুক্তি, ইহার দ্বারা এ দেশের হিন্দুমুসলমান সম্প্রদায়ের উচ্চশ্রেণীর লোকদের খুশী করা যাইতে পারিবে। সুতরাং যদি *শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতাই করিতে হয় তাহা হইলে প্রাচীন শাস্ত্রাদির* অধ্যাপনার জন্যই অর্থব্যয় করা সমীচীন। ইহাই ছিল সে আমলের শাসনকর্তাদের মনের ভাব।

এই নীতি অনুসরণ করিয়া গবর্নমেণ্ট বিভিন্ন স্থানে সংস্কৃত ও আরবী ফারসী শিখাইবার ব্যবস্থা করেন। ১৮২১ সালে লর্ড আমহার্স্টের আমলে

কলিকাতায় একটি সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করার কথা উঠে। তখন রামমোহন তীব্রভাবে এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করেন। তাহার ফলে এক আন্দোলনের সৃষ্টি হয। এই আন্দোলনে বাদীপক্ষ ছিলেন সংস্কৃত আরবী ফারসীর অনুরাগী দল; প্রথমটা তাঁহাদের সংখ্যাই অধিক ছিল। প্রতিবাদীপক্ষে ছিলেন আর-একদল; তাঁহাদের মতে সরকারের পক্ষে এখন ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করা সময়োপযোগী এবং সমীচীন হইবে। আরম্ভে এই দলে অল্প লোকই ছিল; কিন্তু যত দিন যাইতে লাগিল ততই ইহাদের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। এমন অবস্থায় মেকলে আসিয়া আসরে অবতীর্ণ হইলেন। তখন বেন্টিঙ্ক এ দেশের বড়লাট, আমাদের দণ্ডমুণ্ডের হর্তাকর্তাবিধাতা।

শিক্ষাসম্বন্ধে এই-যে দেশময় আন্দোলন চলিতেছিল, তাহাতে কয়েকটা বিষয় লক্ষ্য করিবার মত। ধীরে ধীরে শিক্ষার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে লোকের, বিশেষ করিয়া মুখ্যস্থানীয় লোকদের, ধারণা স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল; প্রায় সকলেই এ বিষয়ে একমত হইযাছিলেন যে ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রচলন করিতে হইবে, পুরাতন শাস্ত্রের কচকচি লইয়া আর দিন কাটাইলে চলিবে না। কিন্তু প্রশ্ন হইল, কোন্ ভাষার সাহায্যে এই নূতন ধরণের শিক্ষা দেশের লোককে দিতে হইবে, ইংরেজী, না, সংস্কৃত আরবী ফারসীর সাহায্যে? দেশের ভাষায় শিক্ষা দেওয়ার কথা বড় কেহ ভাবে নাই;[১] সকলেই যেন ধরিয়া লইয়াছিলেন, বাংলা হিন্দী তেলেগু তামিলের সাহায্যে এ দেশের লোককে নব্যশিক্ষায় দীক্ষিত করা যাইবে না, সুতরাং হয় ইংরেজী, না হয় সংস্কৃত আরবী ফারসীর সাহায্য লইতে হইবে।

১ বোম্বাইয়ের গভর্নর এলফিনস্টোন মাতৃভাষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া তাহার জন্য বলেন বটে কিন্তু তাহাতে কোনো ফল হয় নাই।

আর-একটা ব্যাপারেও বিদেশী শাসনকর্তারা এবং দেশী গণ্যমান্য লোকে অনেকখানি একমত হইয়াছিলেন ; শিক্ষা দিতে হইলে প্রথম উচ্চবর্ণকে শিক্ষা দিতে হইবে ; উচ্চবর্ণের মধ্যে নব্যশিক্ষার প্রসার হইলে কালক্রমে সে শিক্ষা সমাজের বিভিন্ন স্তরের ভিতর দিয়া চুঁইয়া গিয়া অবশেষে নিম্নশ্রেণীর অর্থাৎ দেশের জনসাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িবে। ইহাই ছিল বিখ্যাত filtration theory ; এই থিওরিতে বলে, জনসাধারণের শিক্ষার দিকে প্রথমে দৃষ্টি দিবার প্রয়োজন নাই, আপাতত উচ্চবর্ণের মধ্যে শিক্ষার প্রসার তো হউক, তাহা হইলেই ক্রমে প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়মে আপনা হইতেই দেশের জনসাধারণ শিক্ষিত হইয়া উঠিবে।

ইংরেজী শিক্ষার পক্ষে তখন চারিটি দল ছিল ; কিন্তু চারিটি দলেরই যুক্তি ছিল ভিন্ন ভিন্ন। মিশনারীরা ইংরেজী শিক্ষার সাহায্যে ধর্মপ্রচারের সুবিধা হইবে বলিযা এই ধরণের শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। রামমোহন রায় ভাবিয়াছিলেন নব্যশিক্ষার সাহায্যে দেশের নষ্টগৌরব পুনরুদ্ধার করা যাইবে। এই আশাতেই তিনি ইংরেজী শিক্ষার পক্ষে দাঁড়াইয়াছিলেন। ইংরেজী শিক্ষার পক্ষপাতী তৃতীয় দল ছিল কলিকাতা ও আশেপাশের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ; তাহারা নিজেদের আর্থিক সুবিধার জন্য ইংরেজী শিক্ষার প্রসার কামনা করিয়াছিল। দেশের সরকারও ধীরে ধীরে ইংরেজীর পক্ষে আসিয়া পড়িতেছিলেন, কারণ দেশের লোককে ইংরেজী শিখাইতে পারিলে সস্তা বেতনে কর্মচারী পাওয়ার সমস্যাটাও মিটিবে, আর এই ইংরেজী শিক্ষিত দেশী লোকদের সাহায্যে দেশে আপনাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিবার সুবিধাও হইবে।

কিন্তু তখনও সরকার পুরাপুরি মনস্থির করিতে পারেন নাই। এমন সময়ে মেকলে এ দেশে আসিলেন এবং তাঁহার উপর সরকারের শিক্ষানীতি নির্ধারণ করার ভার পড়িল। এ দেশের শিক্ষাসমস্যা সম্বন্ধে

মেকলে এক সুদীর্ঘ মন্তব্য লিখিয়া বেন্টিঙ্কের সম্মুখে পেশ করিলেন ; তাহাতে আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতি সম্বন্ধে অনেক কুকথাই তিনি বলিলেন ; বলিযা তিনি মত দিলেন ইংরেজীর সাহায্যে ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসারই এখন হইতে সরকারী শিক্ষানীতির একমাত্র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হইবে। প্রথমে দেশের উচ্চবর্ণের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন করিতে হইবে ; এই ইংরেজীশিক্ষিত ভারতবাসী শুধু নামে আর রঙেই ভারতবাসী হইবে, কিন্তু মনেপ্রাণে ভাষায় ও সংস্কৃতিতে তাহারা হইবে ইংরেজ। তাহারাই দোভাষী হইয়া এ দেশের জনসাধারণের মধ্যে নূতন জ্ঞান প্রচার করিবে। বেন্টিঙ্ক মেকলের মতে মত দিলেন, ভারত সরকারের শিক্ষানীতি নির্দিষ্ট হইল এবং নব্যশিক্ষাব্যবস্থা সরকারী সমর্থন লাভ করিল। এইবার তাহার জয়যাত্রা শুরু হইল।

এইভাবে যখন নূতন শিক্ষাব্যবস্থার পত্তন হইল তখন সরকারের সম্মুখে দুইটি পথ উন্মুক্ত ছিল। তাঁহারা প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থার সাহায্যেই দেশে নূতন ভাবধারা আনয়ন করিবার চেষ্টা করিতে পারিতেন, অথবা তাহার সহিত কোনো সম্বন্ধ না রাখিয়া সম্পূর্ণ নূতন এক শিক্ষাব্যবস্থা আরম্ভ করিতে পারিতেন। প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থার সাহায্য লইলে পাঠশালাগুলির সংস্কার করিতে হইত, সেখানে নূতন ধরণের শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইত। ইহাতে যেমন জনসাধারণকে শিক্ষা দেওয়ার কাজটা সহজ হইয়া উঠিত তেমনই দেশের লোকের সহযোগিতা লাভ করা যাইত এবং দেশের চিরাচরিত ধারা অব্যাহত থাকিত। সঙ্গে সঙ্গে গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে জাতীয় শিক্ষার ভিত্তি গড়িয়া উঠিত। কিন্তু তাহা হইল না। সরকার প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থাকে অবজ্ঞা করিলেন এবং সম্পূর্ণ নূতন ভাবে নব্যশিক্ষার সৌধ গড়িয়া তুলিবার সংকল্প করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে এই এক নূতন জাতিভেদের সৃষ্টি হইল; সমগ্র দেশ ইংরেজী শিক্ষিত এবং ইংরেজী

অশিক্ষিত এই দুই জাতিতে বিভক্ত হইল ; আমরা 'শিক্ষিত' এই শব্দটির নূতন এক সংজ্ঞা শিখিলাম, শিক্ষিত অর্থাৎ ইংরেজী বিদ্যায় শিক্ষিত। প্রাচ্য বিদ্যায় যাঁহারা পণ্ডিত ছিলেন এতদিন যাঁহারা সমাজে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন, এইবার তাঁহাদের আসন টলিল ; নব্য শিক্ষিতের দল তাঁহাদের স্থান অধিকার করিতে লাগিলেন। ভারতের সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে এক দূরপ্রসারী বিপ্লবের সূচনা ঘটিল।

একটা বিষয় এইখানে দেখিতে হইবে; সুবিস্তৃত প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থাকে অস্বীকার করায় লোকশিক্ষা প্রসারের প্রথম ও প্রধান বাধার সৃষ্টি সেদিন হইল। আজও সে বাধা সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হয় নাই। পরবর্তীকালে অবশ্য মাঝে মাঝে দেশের পুরাতন পাঠশালাগুলিকে নূতন শিক্ষাব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু ততদিনে সেগুলি এতই প্রাণহীন ও জীর্ণ হইয়া গিয়াছিল যে তখন আর সেগুলির সংস্কারের উপায় ছিল না। অথচ আজও সেগুলি সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হইযা যায় নাই। ফলে যেগুলি এককালে লোকশিক্ষার প্রধান সহায হইতে পারিত, আজ সেই-গুলিই তাহার সকলের চেযে বড় অন্তরায়স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। এই সুপ্রাচীন জীর্ণ পাঠশালাগুলির সংস্কার সাধন আজ একটা প্রকাণ্ড সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

উডের ডেসপ্যাচ ও উচ্চশিক্ষার প্রসার

১৮৩৫ সালের পর বেন্টিঙ্কের শিক্ষানীতির ফলে ইংরেজী শিক্ষার দ্রুত প্রসার আরম্ভ হইল। প্রতি জেলায় সরকারী জিলা ইস্কুল গড়িয়া উঠিল। ১৮৩৫ হইতে ১৮৫৪ সাল পর্যন্ত সরকার শিক্ষার জন্য যাবতীয় টাকা জিলা ইস্কুল ও কলেজের জন্য খরচ করিলেন। ইংরেজী শিক্ষার উৎসাহে মাতৃভাষায় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা উঠিয়া যাইবার মত হইল। ছেলেরা

অ আ ক খ -র প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এ বি সি ডি শিখিতে লাগিল। এই নূতন শিক্ষার এত চাহিদা হইল যে প্রথম যেদিন হুগলি কলেজ খোলা হইল সেই একদিনেই ১২০০ আবেদন আসিল। দূর দূর গ্রাম হইতে কত লোক ছেলে ভরতি করিতে আসিয়া স্থানাভাবে ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিয়া গেল। চাহিদা দেখিয়া সরকারী ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গেই নানা স্থানে বেসরকারী ইংরেজী ইস্কুল গড়িয়া উঠিতে লাগিল। দলে দলে ছাত্র আসিয়া সেগুলিতে ভরতি হইল। এইভাবে আজ যাহাকে আমরা মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বলি তাহার প্রসার হইতে লাগিল।

ইতিমধ্যে আবার নূতন শিক্ষাপ্রচেষ্টায় উৎসাহ দিবার জন্য ১৮৪৪ সালে লর্ড হার্ডিঞ্জ ঘোষণা করিয়া দিলেন, যাহারা সরকারী বিদ্যালয় হইতে পাস করিবে তাহাদের ভিতর হইতেই রাজকর্মচারী নিয়োগ করা হইবে। ইহাতে দেশবাসীদের মধ্যে ইংরেজী শিখিবার আগ্রহ আরও বাড়িয়া গেল। কিন্তু এই ব্যবস্থার একটি কুফল হইল, এখন হইতে ইংরেজী শিক্ষা অর্থাৎ উচ্চশিক্ষা অর্থকরী বৃত্তিশিক্ষায় পরিণত হইল। লোকে ইংরেজী শিখিতে গেল জ্ঞানের জন্য নহে, অর্থের লোভে, ভালো চাকরী পাইবার আশায়।

১৮৫৩ সালে কোম্পানির সনন্দ নূতন করিয়া দিবার সময় আসিলে পার্লামেণ্টে আর একবার ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইল। এই আলোচনার ফলে ১৮৫৪ সালে কোম্পানির কর্তৃপক্ষের তরফ হইতে বোর্ড অব ডিরেক্টরের পক্ষে সার চার্লস উড শিক্ষা সম্বন্ধে এক ডেসপ্যাচ ভারত-সরকারের নিকট পাঠাইলেন। এই ডেসপ্যাচের নির্দেশ অনুযায়ী ভারত-সরকার তাঁহাদের শিক্ষানীতি পুনর্গঠিত করিলেন। পরবর্তী কালে এ দেশের শিক্ষার ক্ষেত্রে যাহা কিছু ঘটিয়াছিল তাহার মূলে এই উডের ডেসপ্যাচ। বস্তুত উডের ডেসপ্যাচই এ দেশের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

এই ডেসপ্যাচেই এ দেশে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিবার এবং পৃথক ভাবে শিক্ষাবিভাগ গঠন করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। তাহা ছাড়া উডের ডেসপ্যাচেই প্রথম এদেশের শিক্ষাসমস্যাকে সমগ্রভাবে দেখার একটা চেষ্টা হয়। ১৮৩৫ সালের পর হইতে এতদিন ইংরেজী শিক্ষা ছাড়া অন্য কোনো প্রকারের শিক্ষার কথা বড় একটা শোনা যায় নাই; কিন্তু এই ডেসপ্যাচে প্রাথমিক ও লোকশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও মাতৃভাষা চর্চার আবশ্যকতার প্রতি ভারত-সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় এবং এই ধরণের শিক্ষার উপর জোর দেওয়া হয়; সেই সঙ্গে বৃত্তিশিক্ষা, শিক্ষকদের শিক্ষা ইত্যাদি সম্বন্ধেও উল্লেখ করা হয়।

উডের ডেসপ্যাচে আর-একটি নূতন নীতির নির্দেশ ছিল। এতদিন বেসরকারী শিক্ষাবিস্তারচেষ্টাকে সাহায্য দেওয়ার কোনো নির্দিষ্ট নীতি ছিল না। ডেসপ্যাচের নির্দেশের ফলে সাহায্যদান-নীতির প্রবর্তন করা হইল। এখন হইতে স্থির হইল সরকার স্থানীয় শিক্ষাবিস্তারচেষ্টাকে উপযুক্ত পরিমাণে সাহায্য দিবেন; এমন-কি, ক্রমে সরকারী প্রতিষ্ঠান-গুলিও বেসরকারী কর্মকর্তাদের হাতে ছাড়িয়া দিয়া শিক্ষার কাজ পুরাপুরি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সাহায্যেই করা হইবে; সরকার শুধু প্রয়োজনমত এবং উপযুক্ত পরিমাণ সাহায্যদান করিয়াই ক্ষান্ত থাকিবেন। এই নীতির মূলে ছিল দেশের শাসন ও শিক্ষাব্যাপারে জনসাধারণের সহিত সহযোগিতার আদর্শ। বস্তুত উদারপন্থী আদর্শবাদের ভিত্তিতেই উডের ডেসপ্যাচ রচিত হইয়াছিল।

ডেসপ্যাচের ফলে বিভিন্ন প্রদেশে স্বতন্ত্র শিক্ষাবিভাগ গঠিত হইল এবং ডিরেক্টর অব পাবলিক ইন্‌স্ট্রাক্‌শন নিযুক্ত হইলেন। বাংলাদেশের প্রথম ডিরেক্টর হইলেন গর্ডন ইয়ং; তিনি সিভিল সার্ভিসের লোক ছিলেন।

উডের ডেসপ্যাচের বড় কীর্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। দেশে উচ্চ ও মধ্য শিক্ষার যে ব্যবস্থা ছিল তাহাদের নিয়ন্ত্রিত করিবার একটা ব্যবস্থার প্রয়োজন কিছুদিন হইতেই অনুভব করা গিয়াছিল। অনেক ছেলেই আজকাল এই সকল প্রতিষ্ঠানে ইংরেজী লেখাপড়া শিখিতেছিল; তাহাদের মধ্যে কাহারা ভালো, কাহারা সরকারী চাকরি পাইবার যোগ্য তাহা বাছাই করিয়া লইবার দরকার হইয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং পরীক্ষার ব্যবস্থা চাই, এবং পরীক্ষা করিয়া যোগ্যতার তারতম্য নির্ধারণেরও একটা মাপকাঠি চাই। কিন্তু নিরপেক্ষভাবে এই পরীক্ষার ব্যবস্থা কে করিবে? ইহার জন্য একটা বিশেষ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন। এই উপলক্ষ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা ওঠে। কিন্তু কয়েক বৎসর পূর্বে যখন কলিকাতায় একটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব হয় তখন বোর্ড অব ডিরেক্টর সে প্রস্তাব নামঞ্জুর করিয়াছিলেন। এইবার ঠিক হইল লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শে কলিকাতা বোম্বাই ও প্রয়োজন হইলে মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। পরীক্ষা গ্রহণ ও ডিগ্রী বিতরণই এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মুখ্য উদ্দেশ্য হইবে।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সাক্ষাৎভাবে অধ্যাপনার বন্দোবস্তের কথা ডেসপ্যাচে ছিল, কিন্তু সেটা গৌণ ভাবে। ফলে ১৮৫৭ সালে যখন কলিকাতা বোম্বাই ও মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য হইল স্কুল-কলেজের ছাত্রগণের পরীক্ষা লওয়া এবং পরীক্ষার ফলাফলের উপর উপাধি বিতরণ করা। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিগুলির দাম সেদিন যথেষ্ট ছিল; কারণ এই উপাধিগুলিই ছিল সরকারী চাকরি লাভের ছাড়পত্র বা তকমা স্বরূপ। তখনকার দিনে যে-কেহই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইত তাহারই সরকারী চাকরির অভাব ঘটিত না। পরীক্ষায় পাস না করিলে চাকরি জোটা কঠিন হইত।

এইভাবে এ দেশে বর্তমান উচ্চশিক্ষার সহিত আর্থিক লাভের যোগ ঘটিয়া গেল, এবং জ্ঞান নহে, বিদ্যা নহে, অর্থের মাপকাঠি দিয়া উচ্চশিক্ষার বিচার শুরু হইল এবং লোকেও মুখ্যত জ্ঞানের জন্য নহে অর্থের লোভেই উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করিতে গেল।

১৮৫৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম এণ্ট্রান্স এবং ১৮৫৮ সালে বি. এ. পরীক্ষা হইল। বি. এ. পরীক্ষায় সেবার ১৩ জনের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং যদুনাথ বসু, মাত্র এই দুইজন ছাত্রই পাস করিলেন। তাঁহারা উভয়েই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হইলেন।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময় এণ্ট্রান্সের পর একেবারে বি. এ. দিবার ব্যবস্থা ছিল; কিছুকাল পরে এফ্. এ. অর্থাৎ ফার্স্ট আর্টস পরীক্ষার প্রচলন হয়। বি. এ. তে অনার্সের ব্যবস্থাও ছিল, একজন একসঙ্গে এক বা দুই, এমন-কি তিনটি পর্যন্ত বিষয়ে অনার্স লইতে পারিতেন। অনার্স লইয়া বি. এ. পাস করার এক বৎসরের মধ্যে এম. এ. পরীক্ষা দেওয়া যাইত।

উচ্চশিক্ষার বাহন ছিল ইংরেজী; পরীক্ষার বাহন হইল ইংরেজী। প্রথমটা মাতৃভাষা পরীক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে অন্যতম ছিল এবং তাহার পরীক্ষা লওয়া হইত; কিন্তু কয়েক বৎসর পরে সে ব্যবস্থা বন্ধ হইয়া যায়। অনেককাল পরে আবার মাতৃভাষা পরীক্ষার বিষয়গুলির মধ্যে স্থান পায়; কিন্তু উচ্চশিক্ষিতের মধ্যে মাতৃভাষাচর্চার প্রসারের কোনো ব্যবস্থাই বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ হইতে করা হয় নাই। মাতৃভাষার অনাদর যেন তখন আমাদের উচ্চশিক্ষার অঙ্গ হইয়া গিয়াছিল।

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় পরীক্ষার প্রাধান্য কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল তাহা পূর্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে। ইংরেজীকে শিক্ষার বাহন করিয়া মাতৃভাষাকে অবজ্ঞা করার ফলে আমাদের জাতীয় জীবন কিভাবে দ্বিধাবিভক্ত হইয়া

গেল তাহাও বলিয়াছি। শিক্ষার ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থার কি প্রভাব ঘটিয়াছিল তাহার উল্লেখ এইখানে প্রাসঙ্গিক হইবে।

শিক্ষার বাহন হইল ইংরেজী; ইতিহাস ভূগোল অঙ্ক প্রভৃতি সকল বিষয়ই ছাত্রদের ইংরেজীর সাহায্যে শিখিতে হইল। ফলে যে কোনো বিষয়েই শেখার বাধা দ্বিগুণ হইয়া উঠিল; এক তো বিষয়ের বাধা, দ্বিতীয়ত ভাষার বাধা। এই ভাষার বেড়া ডিঙাইয়া তবে বিষয়ের রাজ্যে প্রবেশ করিতে হইবে। কিন্তু কয়টি ছেলেমেয়ে ভালো করিয়া ইংরেজী শিখিতে পারে? সুতরাং সকলেই সহজ পথ আবিষ্কারের চেষ্টায় লাগিয়া গেল। যেখানে পরীক্ষায় পাস করাটাই শিক্ষাব্যবস্থার ফলবিচারের একমাত্র মাপকাঠি, যেখানে বিদেশী ভাষার সাহায্যে অধীত বিদ্যা কোনোমতে বিদেশী ভাষায় পরীক্ষাপত্রে উদ্‌গীরণ করিয়া দিলেই হইল, সেখানে না শিখিয়া মুখস্থ করাই সহজ; তাহাতে বুদ্ধিও খরচ করিতে হয় না, লেখাপড়া শেখার কষ্টও কম হয়। অতএব, বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা না করিয়া স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করা যাক, তাহারই অনুশীলন করা হোক। কে কত মুখস্থ করিতে পারে দেখা যাক। বিদ্যার্জনশ্রম লাঘব করিবার এই শুভ চেষ্টায় সহায়কও জুটিয়া গেল; নোটবইকর্তারা জাল নোটে বাজার ছাইয়া দিল, নকল আসিয়া আসলকে সিংহাসনচ্যুত করিল।

১৮৮২ সালের শিক্ষা-কমিশন

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার আরম্ভ হইতেই ইহাতে আর একটি ত্রুটি ছিল। এই শিক্ষা নেহাতই পুঁথিগত শিক্ষা; তাহাতে ব্যাবহারিক শিক্ষার কোনো স্থান ছিল না। একটা দেশের সকলেই পুঁথি লইয়া দিন কাটায় না; বেশির ভাগই হয় কর্মী; হাতেকলমে তাহাদের কাজ; পুঁথির সঙ্গে তাহাদের সম্বন্ধ কম। সুতরাং তাহাদের শিক্ষা ব্যাবহারিক ধরণের হওয়াই বাঞ্ছনীয়; ইহার অর্থ এই নয় যে তাহাদের প্রথম হইতে বৃত্তি

শিক্ষা দিতে হইবে। ব্যাবহারিক শিক্ষামাত্রেই বৃত্তিশিক্ষা নয় : কিন্তু বেশির ভাগ বৃত্তিশিক্ষার মূলে ব্যাবহারিক শিক্ষা। তাহা ছাড়া একদল ছাত্র ব্যাবহারিক শিক্ষার ভিতর দিয়া যত সহজে শেখে অন্যভাবে অর্থাৎ পুঁথির সাহায্যে তত সহজে পারে না। এইজন্যই শিক্ষাব্যবস্থামাত্রেই ব্যাবহারিক শিক্ষার প্রয়োজন। কিন্তু প্রথম আমলে আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় তাহার কোনো স্থান ছিল না। ইহার মূলেও শিক্ষার বাহনরূপে ইংরেজীর ব্যবহার। এক হিসাবে তো ইংরেজী শিক্ষাই আমাদের কাছে বৃত্তিশিক্ষা হইয়া উঠিয়াছিল অর্থাৎ ইংরেজী শিখিলেই বৃত্তির ব্যবস্থা হইত। আর-এক দিকে ইংরেজী বাহনের ফলে শিক্ষাব্যবস্থায় স্বাধীনতার কোনো অবকাশ ছিল না ; অর্থাৎ সেখানে স্বাধীনভাবে পাঠ্যবিষয় নির্বাচনের বা পাঠ্যক্রম তৈয়ারি করিবার সুযোগ ছিল না। যেখানে কাঠামোটা ফরমায়েশী সেখানে নূতন কিছু করা কঠিন। এইজন্যই যতক্ষণ না বাহির হইতে ব্যাবহারিক শিক্ষার ফরমাশ আসিল আমরা আপনার তাগিদে তাহার ব্যবস্থা করিলাম না। বিজ্ঞান ও যন্ত্র শিক্ষার ব্যবস্থাও অনেকদিন পরে হইল। ১৮৮২ সালের আগে এ দিকে বিশেষ কাহারও দৃষ্টি পড়িল না।

উডের ডেসপ্যাচে বৃত্তিশিক্ষাব্যবস্থার উল্লেখ ছিল ; কিন্তু সে বৃত্তি উচ্চবর্ণের— আইন চিকিৎসা এবং ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি ভদ্রলোকের বৃত্তি। ডেসপ্যাচে তাহাদের সম্বন্ধে বলা হইল। অবশ্য তাহার অনেক আগেই ১৮৩৫ সালে কলিকাতায় মেডিকেল কলেজ খোলা হইয়াছিল ; আইন শিক্ষার বন্দোবস্তও ক্রমে হইল। গবর্মেণ্টের পূর্তবিভাগে কাজের জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা দিবার ব্যবস্থাও হইল। কিন্তু একে তো ইহাদের ক্ষেত্র সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ, তাহা ছাড়া আইন ছাড়া অন্য আর দুই রকমের বৃত্তিশিক্ষাও লোকে চাকরিরই জন্য গ্রহণ করিল ; অল্প

কয়েকজন স্বাধীনভাবে ডাক্তারি করিতে গেল বটে কিন্তু বেশির ভাগ ছাত্রই মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া চাকরির সন্ধান করিতে লাগিল এবং প্রথম প্রথম কাহারও চাকরির অভাব ঘটিল না। এ দেশে তখনও স্বাধীনভাবে ইঞ্জিনিয়ারের ব্যবসায় চালাইবার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় নাই।

সুতরাং আমাদের প্রায় সকল প্রকার উচ্চশিক্ষারই লক্ষ্য হইল চাকরি। স্বাধীনভাবে ব্যবসায় ও বাণিজ্যের পথ তখন আমাদের পক্ষে রুদ্ধ; দেশের বাণিজ্য বিদেশীর করতলগত, পুরাতন শিল্পগুলি ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল, নূতন কোনো শিল্পেরও সৃষ্টি হইল না। আমাদের শোনানো হইল শিল্পচর্চা আমাদের জন্য নয়, চিরকাল ধরিয়া আমরা নাকি ভূমিকেই আশ্রয় করিয়া আছি, সেই ভূমিলক্ষ্মীর সেবা আমাদের জাতীয় জীবনের সাধনা। সুতরাং যখন ইংলণ্ডে ও ইউরোপে বিজ্ঞানের চর্চার ফলে নূতন নূতন যন্ত্রের আবিষ্কার ও নূতন নূতন শিল্পের সৃষ্টি হইতে লাগিল তখন আমরা হয় সরকারী চাকরি করিবার নাহয় বিলাতের বাজারে কাঁচামাল জোগাইবার ও এ দেশে বিলাতী মাল কাটাইবার জন্য যে বড় বড় বিলাতী হৌস ছিল তাহাতে কেরানীগিরি করিবার চেষ্টায় ফিরিলাম: বড় জোর এই সব হৌসে দালালি করিয়া 'ব্যবসায় করিতেছি' এই ভাবিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিলাম। উচ্চশিক্ষা-লাভের সাক্ষাৎ ফল ইহার চেয়ে আর বেশি কিছু হইল না।

এইভাবে অনেকদিন কাটিয়া গেল; ভারত-সরকার নিজেদের বুদ্ধি ও বিবেচনা অনুযায়ী উডের ডেসপ্যাচে নির্দিষ্ট নীতির হেরফের করিয়া শিক্ষাব্যবস্থার পরিচালনা করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে ১৮৮২ সালে ভারতীয় শিক্ষা-কমিশন বসিল। ১৮৫৪ সালের শিক্ষানীতি ঠিকমত চলিতেছে কি না, মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থায় কোনো ত্রুটি ঘটিয়াছে কি না এইগুলিই হইল কমিশনের আলোচনার বিষয়। কমিশনের সভ্যদের

মধ্যে ছিলেন আনন্দমোহন বসু, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, মহারাজা যতীন্দ্র-মোহন ঠাকুর, জাস্টিস তেলাং প্রভৃতি।

তখন উদারপন্থী লর্ড রিপন ভারতবর্ষের বড়লাট। তাঁহার মাথায় দেশের লোকের সহিত সহযোগিতার ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের আদর্শ ঘুরিতেছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে সহযোগিতার আদর্শ প্রথম প্রচার করা হয় উডের ডেসপ্যাচে। সেই আদর্শেই সাহায্য (গ্র্যাণ্ট) নীতির প্রবর্তন করা হয়। তাহার ফলে মধ্য ও উচ্চ শিক্ষার প্রসার যথেষ্ট হইয়াছিল ; কারণ এই শ্রেণীর শিক্ষা অর্থকরী বলিয়া তাহাদের চাহিদা খুবই ছিল। সরকার এই শ্রেণীর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতেছিলেন, এই ধরণের বেসরকারী প্রতিষ্ঠানও বহু স্থাপিত হইতেছিল। কিন্তু ইহার সাহায্যে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার আশানুরূপ হইতেছিল না। ইহাই ছিল সেদিনকার সমস্যা। একে তো প্রাথমিক শিক্ষার আর্থিক মূল্য কিছুই নাই, দ্বিতীয়ত, যাহাদের জন্য এই শিক্ষার আয়োজন তাহারা নিজেদের অভাব বুঝিয়া শিক্ষার জন্য দাবি করিতে পারে এমন তাহাদের শক্তি ও বুদ্ধি নাই : জ্ঞানের অভাবে তাহাদের মন তখনও অতখানি বিকশিত হয় নাই। অতএব তাহাদের ভিতর শিক্ষার তাগিদ ছিল না। তাহার উপর সরকারের তরফে ছিল অর্থের অভাব।[১] সুতরাং জন-সাধারণের শিক্ষা তেমন অগ্রসর হইতেছিল না।

এই অবস্থায় লর্ড রিপন আইন করিয়া কতকটা বিলাতের কাউন্টি কাউন্সিলগুলির আদর্শে ডিস্ট্রিক্ট ও লোকাল বোর্ডগুলি প্রতিষ্ঠা

১ এই অভাব মিটাইবার জন্য ১৮৭০ সালের কাছাকাছি সময়ে শিক্ষাকরের প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু বাংলা-সরকার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দোহাই দিয়া শিক্ষাকর বসাইতে আপত্তি করেন। ভারত-সরকার এই আপত্তি গ্রাহ্য করেন না এবং ধীরে ধীরে যুক্তপ্রদেশ, মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ে শিক্ষাকর বসানো হয় ; কিন্তু নানা কারণে ভারতসরকারের মঞ্জুরি সত্ত্বেও বাংলাদেশে আর কর বসানো হইল না।

করিলেন। শিক্ষা-কমিশনও নির্দেশ দিলেন যে, এই সকল স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানকে প্রাথমিক শিক্ষার ভার দিতে হইবে। এতদিন এমন কোনো বেসরকারী বা আধাসরকারী প্রতিষ্ঠান ছিল না যাহার উপর এই ভাবের ভার দেওয়া যায়। লর্ড রিপনের আইনের পর সে বাধা অপসারিত হইয়াছিল। শিক্ষা-কমিশনও ভাবিয়াছিলেন এই নবগঠিত প্রতিষ্ঠানগুলির উপর প্রাথমিক শিক্ষার ভার দিলে প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারের আর কোনও বাধা থাকিবে না। তাহাদের উৎসাহে দেশের চারি দিকে শিক্ষা ছড়াইয়া পড়িবে।

প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারের জন্য কমিশন দেশের প্রাচীন পাঠশালা-গুলি সংস্কারের কথাও বলিলেন। যদি ইহাদের ব্যবহার করা যায় তাহা হইলে হয়তো প্রাথমিক শিক্ষাসমস্যার সমাধান সহজ হইবে। কিন্তু তখনকার অবস্থায় সে চেষ্টা যে সফল হওয়া কঠিন ছিল কমিশন তাহা বুঝিতে পারেন নাই। যদি সেদিন সরকার দায়িত্ব না এড়াইয়া নিজের হাতে প্রাথমিক শিক্ষার ভার লইতেন তাহা হইলেও হয়তো কিছু হইতে পারিত; কিন্তু তাহা হইল না। গবর্মেণ্ট প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব নিজের কাঁধ হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া নবগঠিত বোর্ডগুলির হাতে সে ভার অর্পণ করিলেন।

কমিশনের আর একটি নির্দেশ ছিল হাই ইস্কুলে এণ্ট্রেন্স কোর্সের মতই আর-একটি কোর্সের ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহার নাম দেওয়া হইবে 'বি কোর্স'। বি. কোর্সে ব্যবহারিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে। যাহারা ব্যবহারিক শিক্ষা চায়, যাহাদের সাধারণ শিক্ষার দিকে ঝোঁক নাই বা সে শিক্ষার ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে যে ধরণের বুদ্ধির প্রয়োজন সে ধরণের বুদ্ধি যাহাদের নাই তাহারাই বি. কোর্স পড়িবে এবং বি. কোর্সের পরীক্ষা দিবে।

বি. কোর্সের ব্যবস্থা হইল বটে কিন্তু তাহাতে কোনোদিনই বেশি ছাত্র জুটিল না। তাহার একটা কারণ, লোকের মনে এণ্ট্রেন্সের তুলনায় বি. কোর্স জাত্যংশে ছোট ছিল ; সেখানে ছুতোর-কামারের কাজ শিখিবার জন্য ছাত্রদের মধ্যে তাই বিশেষ আগ্রহ দেখা গেল না। এইভাবে বিদ্যালয়ের শিক্ষাকে ব্যাবহারিক করিয়া তোলার একটা চেষ্টা বিফল হইল।

কিন্তু এই সময়েই ড্রয়িং বিজ্ঞান প্রভৃতি নূতন কয়েকটি শিক্ষণীয় বিষয় বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে স্থান পাইল। তাহাতে পাঠ্যক্রমের ভার বাড়িল বটে, কিন্তু তাহার মৌলিক কোনো রূপান্তর ঘটিল না।

যন্ত্রশিক্ষার ব্যবস্থার কথাটা কমিশন এড়াইয়া গেলেন। ব্যাবহারিক শিক্ষাই যথেষ্ট, যান্ত্রিক শিক্ষার এখনও আবশ্যকতা নাই, কমিশন কতকটা এইভাবের মত দিলেন।

কমিশনের আর-একটা নির্দেশ ছিল— নীতিশিক্ষা দিবার জন্য একটা পাঠ্যপুস্তক তৈয়ারি করিতে হইবে। মিশনারীরা সরকারী ও বেসরকারী সকলপ্রকার বিদ্যালয়েই ধর্মশিক্ষা দিবার জন্য বড় পীড়াপীড়ি করিতেছিলেন। কিন্তু ১৮৫৪ সালেই সরকার ধর্মব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন, সুতরাং সরকারী বিদ্যালয়ে বাইবেল পড়াইবার এই অন্যায় মিশনারী দাবি তাঁহারা স্বীকার করিতে পারিলেন না। তখন নীতিশিক্ষার দাবি উঠিল। ধর্মহীন নীতিহীন শিক্ষা ছেলেমেয়ের সর্বনাশ সাধন করিবে, ইহার একটা প্রতিকার চাই, এই রব উঠিল। তাহারই ফলে কমিশন এই প্রস্তাব করিয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে ভারত-সরকার এই প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন না।

কার্জনী আমল ও স্বদেশী যুগ

শিক্ষা-কমিশনের সময় হইতে এই শতাব্দীর শেষের মধ্যে এ দেশের শিক্ষার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কোনো বিশেষ নীতির পরিবর্তন ঘটে নাই ; যে নীতি এতদিন অনুসরণ করা হইতেছিল তাহাই অনুসরণ করা হইতে লাগিল। কমিশনের চেষ্টা সত্ত্বেও শিক্ষার ধারা যে পথে এতদিন বহিয়া আসিতেছিল সে পথ ছাড়িয়া অন্য পথে গেল না ; অর্থাৎ পূর্বেরই মত এখনও মধ্য ও উচ্চ -শিক্ষার প্রসার যথেষ্ট হইতে লাগিল, দেশে হাই স্কুল ও কলেজের সংখ্যা বাড়িয়াই চলিল, কিন্তু স্বায়ত্তশাসক প্রতিষ্ঠানগুলির চেষ্টা সত্ত্বেও প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার মোটেই আশানুরূপ হইল না। তাহার উপর এই সময়ে (১৮৮৮ সালে) আবার ভারত-সরকার শিক্ষা-ব্যাপারে ব্যয়সংকোচ করিবার কথা তুলিলেন। তাঁহাদের যুক্তি, শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারের কাজ পথ দেখানো ; এখন যখন পথ দেখানো হইয়া গিয়াছে, কাজ শুরু হইয়াছে তখন সরকারের কাজও শেষ হইয়াছে। সরকার এখন শিক্ষার দায়িত্ব দেশবাসীর হাতে দিয়া সরিয়া দাঁড়াইবেন। এখন হইতে শিক্ষাব্যাপারে সরকারী ব্যয় ক্রমশ কম করা হইবে।

ইতিমধ্যে ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা ঘটিয়া গেল। ইলবার্ট বিল আন্দোলন উপলক্ষে দেশময় সাড়া পড়িয়া রাজনৈতিক জাগরণের সূচনা দেখা দিল এবং ১৮৮৫ সালে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হইল। ভারত-সরকার প্রথমে কংগ্রেস সম্বন্ধে কতকটা উদারভাব দেখাইলেও শীঘ্রই তাঁহাদের মনোভাব পরিবর্তিত হইল। জাতীয়তার এই জন্ম তাঁহারা সন্দেহের চক্ষেই দেখিতে লাগিলেন।

শিক্ষার ব্যাপারে কংগ্রেস প্রথম হইতেই কয়েকটি দাবি জানাইলেন। শিক্ষাবিস্তারের আরও ব্যবস্থা করিতে হইবে, শিক্ষাধারাকে জাতীয় ভাবাপন্ন করিতে হইবে, যন্ত্রশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে, ইত্যাদি।

ইতিপূর্বেই দেশের একদল চিন্তাশীল ব্যক্তি শিক্ষাসংস্কারের, বিশেষ করিয়া মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করিবার জন্য আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিলেন। কংগ্রেসও সেই আন্দোলন সমর্থন করিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ শতকে কয়েকটি নূতন ধরণের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। লাহোরে দয়ানন্দ অ্যাংলো-বেদিক কলেজ ও কাশীতে সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজ স্থাপিত হইল। সেখানে শিক্ষার আদর্শের মধ্যে ধর্মকে স্থান দেওয়া হইল। এই সময়েই রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় এবং মুনশীরাম হরিদ্বারে গুরুকুল প্রতিষ্ঠা করেন। উভয় প্রতিষ্ঠানই সাধারণ শিক্ষায়তনগুলি হইতে স্বতন্ত্রধরণের হইল ; উভয়স্থানেই প্রাচীন আদর্শের ভিত্তিতে নবীন ও প্রাচীনের সমন্বয়ে নূতনধরণের শিক্ষা দিবার চেষ্টা করা হইল। এইভাবে শিক্ষাব্যবস্থায় জাতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য এবং এ দেশীয় ধর্মকে আসন দিবার, শিক্ষার প্রকৃতিকে দেশীয়ভাবাপন্ন করিবার একটা চেষ্টা এই সময়ে দেখা গেল।

এমন সময় কার্জন ভারতের বড়লাট হইয়া আসিলেন। তিনি আসিয়াই সিমলায় প্রাদেশিক ডিরেক্টরগণের এক গোপন সভা আহ্বান করিলেন ; সেই সভায় শিক্ষানীতি লইয়া অনেক আলোচনা হইল। সেখানে বড়লাট তাঁহার পরিকল্পিত নূতন নীতি ব্যাখ্যা করিলেন। শিক্ষা-ব্যাপারে সরকারী দায়িত্ব এড়াইলে চলিবে না ; বরং, সেখানে নানা-ভাবে সরকারী প্রভাব বেশি করিয়া বিস্তার করিতে হইবে। ইহার জন্য সরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়াইতে হইবে, বেশি খরচ বরাদ্দ করিতে হইবে।

একদল লোক ভাবিলেন, দেশে শিক্ষিতসমাজের মধ্যে যে জাতীয় জাগরণের সূচনা দেখা দিয়াছে এবং যে জাতীয় মনোভাব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-গুলির ভিতর দিয়া চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে, এইভাবে সরকারী

প্রভাব বাড়াইবার প্রকৃত উদ্দেশ্য হইল সেই জাতীয়তাবাদ অঙ্কুরেই বিনষ্ট করা। এই সন্দেহ আরও দৃঢ়তর হইল যখন কার্জন কর্তৃক নিযুক্ত ইউনিভার্সিটি কমিশনের রিপোর্ট বাহির হইল।

কার্জন ইউনিভার্সিটি কমিশন বসাইয়াছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সংস্কারের জন্য। সে সংস্কার যে প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না। ১৮৫৭ সালের পর পাঞ্জাব ও এলাহাবাদ এই দুইটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। সুতরাং কার্জনের সময়ে দেশে পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমান। ইহাদের শাসন ও পরিচালন-ব্যবস্থার মধ্যে অনেক গোলমাল ছিল। তাহা ছাড়া ইস্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সম্পর্ক সুনির্দিষ্ট ছিল না; বিশ্ববিদ্যালয় শুধু পাঠ্য নির্দেশ করিয়া এবং পরীক্ষার ব্যবস্থা করিয়া ক্ষান্ত থাকিত, ইস্কুল কলেজে কি ভাবে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে তাহার উপর তাহার বিশেষ কোনো হাত ছিল না। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এইরূপ ছোটবড় নানা সমস্যা সেদিন দেখা দিয়াছিল।

ইউনিভার্সিটি কমিশন বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা সম্বন্ধে নূতন ব্যবস্থার নির্দেশ দিলেন। তাহার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারের প্রভাব না কমিয়া বাড়িবার ব্যবস্থাই হইল। নূতন বিধানে যে একশত ফেলো বা সদস্য লইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট বা পরিচালক সমিতি গঠিত হইবে তাঁহাদের মধ্যে ৮০ জনই সরকার-মনোনীত হইবেন। এই ব্যবস্থায় উচ্চশিক্ষার ব্যাপারে স্বাধীনতা কতখানি পরিমাণে রক্ষিত হইবে দেশবাসীর পক্ষে তাহা অনুমান করা কঠিন হইল না। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কমিশনের অধিকাংশ সভ্যের এই মন্তব্যের বিরুদ্ধে মত দিলেন; কিন্তু তাঁহার মত গ্রাহ্য হইল না। দেশেও এই ব্যাপারে খুব আন্দোলন হইল; কিন্তু তাহাতেও কোনো ফল হইল না। ইউনিভার্সিটি বিল পাস হইয়া আইনে

পরিণত হইল; কার্জন এ দেশের উচ্চ শিক্ষাব্যবস্থার যে সংস্কার চাহিয়াছিলেন তাহা আরম্ভ হইল।

১৯০৪ সালে কার্জন তাঁহার শিক্ষানীতি ঘোষণা করিলেন। তাহাতে তিনি এ দেশের শিক্ষাপ্রণালীর প্রধান ত্রুটিগুলি বিশ্লেষণ করিয়া সেগুলি দূর করিবার উপায় নির্দেশ করিলেন। মাতৃভাষার অবজ্ঞা, পরীক্ষার প্রাধান্য ইত্যাদি বিষয়ে অনেক কথাই তিনি বলিলেন। তাঁহার অনেক কথাই ঠিক; কিন্তু গোল হইল সেখানে নয়, অন্যত্র।

শিক্ষাসংস্কারের প্রয়োজন যে এ দেশের লোক বোঝে নাই তাহা নহে, বস্তুত আমাদের ব্যবস্থার অনেক সমালোচনাই অনেকদিন ধরিয়া শোনা যাইতেছিল। কিন্তু কার্জন যেভাবে শিক্ষাসংস্কার আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহাতে এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে সন্দেহ হইয়াছিল। তাঁহারা ভাবিলেন ইহার পিছনে কোনো গূঢ় রাজনৈতিক অভিসন্ধি আছে। একদল লোক বলিলেন, কার্জনের নূতন ব্যবস্থা ভারতের শিক্ষার প্রসার বন্ধ করার একটা ফিকিরমাত্র।

এমন সময়ে কার্জন বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ ঘোষণা করিলেন। এই ব্যাপারে দেশময় ক্ষোভের সঞ্চার হইল। তাহাই স্বদেশী আন্দোলনরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া দেশব্যাপী তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি করিল। স্বদেশী আন্দোলনে জাতীয়তাবাদের যে আদর্শের পরিচয় আমরা পাইলাম তাহাতে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক উভয় প্রকার আদর্শ মিলিত হইয়াছিল।

স্বদেশী আন্দোলনের সময়েই এদেশের ছাত্রগণ প্রথম রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিল। সরকার সেটা সুনজরে দেখিলেন না। বাংলা গবর্নমেণ্টের সেক্রেটারী রিসলি এক সার্কুলার বাহির করিলেন, ইস্কুলের ছেলেরা যেন সভাসমিতিতে যোগ না দেয়, দিলে কড়া শাসন করা হইবে। ছেলের দল ক্ষেপিয়া গেল।

দেশের নেতাদের মনের মধ্যে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার বিরোধীভাব জমিয়া উঠিতেছিল। এই ব্যাপারের পর এই বিরুদ্ধ মনোভাব জাতীয় শিক্ষা -আন্দোলন রূপে আত্মপ্রকাশ করিল। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাসবিহারী ঘোষ প্রভৃতি সেই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন ; তাঁহাদের চেষ্টায় বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হইল ; দেখিতে দেখিতে লক্ষ লক্ষ টাকা উঠিল ; জাতীয় শিক্ষার বিস্তৃত খসড়া প্রস্তুত হইল এবং উচ্চতম শ্রেণী হইতে নিম্নতম শিশুশ্রেণী পর্যন্ত কোথায় কখন কি পড়ানো হইবে সমস্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে স্থির করা হইল। কলিকাতায় ন্যাশনাল কলেজ স্থাপিত হইল, অরবিন্দ ঘোষ আসিলেন তাহার অধ্যক্ষ হইয়া। যন্ত্র শিক্ষার জন্য টেকনিকেল স্কুলও খোলা হইল। বাংলাদেশের নানাস্থানে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হইল এবং ছেলের দল ভিড় করিয়া আসিল।

ইহাই এদেশে প্রথম জাতীয় শিক্ষা -আন্দোলন। ইহার পূর্বে সরকারী ব্যবস্থা হইতে দূরে নূতন ভাবের শিক্ষা দিবার জন্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহাদেরও উদ্দেশ্য ছিল জাতীয়ভাবে শিক্ষা দেওয়া। গুরুকুল এবং শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যবিদ্যালয়ের কথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। রবীন্দ্রনাথ ও মুন্সীরাম উভয়ের জাতীয়তাবাদের স্বরূপ এক না হইলেও উভয়েই দেশের ভাষার সাহায্যে জাতীয়ভাবের শিক্ষা দিবার আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সেই আদর্শে তাঁহাদের প্রতিষ্ঠান গড়িয়াছিলেন।

নানাকারণে জাতীয় শিক্ষা -আন্দোলন বেশি দিন থাকিল না। রাজনৈতিক আন্দোলনের ভাবধারার জোয়ারের মুখে যাহা আসে আন্দোলনে ভাটা পড়িলে তাহার বেশির ভাগই সরিয়া যায়। স্বদেশী আন্দোলন মন্দীভূত হইয়া আসিল। ন্যাশনাল কলেজ বন্ধ হইল, জাতীয় বিদ্যালয়গুলি

উঠিয়া গেল, বেশির ভাগ ছাত্রই সরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে ফিরিয়া গেল; রহিল শুধু বেঙ্গল টেক্‌নিকাল ইনস্টিট্যুট; তাহা আজ বিরাট যাদবপুর কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাণ্ড টেকনলজিতে পরিণতি লাভ করিয়াছে। টেক্‌নিকাল ইস্কুল থাকিয়া গিয়া প্রমাণ করিল যে দেশে যন্ত্রশিক্ষার তাগিদ আছে এবং সে ধরণের শিক্ষার জন্য অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি ক্রমে হইতেছে। বস্তুত তখন হইতেই দেশের সর্বত্র একটির পর একটি করিয়া যন্ত্রবিদ্যা-শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইতে লাগিল।

স্বদেশী আন্দোলনের কিছুকাল পরে মর্লি-মিণ্টো পরিকল্পিত শাসন সংস্কার প্রবর্তিত হয়। শিক্ষাব্যবস্থার ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে রাষ্ট্রনৈতিক ঘটনার উল্লেখ সাধারণত প্রয়োজন হয় না। কিন্তু এখানে ইহার প্রয়োজন আছে; কারণ এই ঘটনাটির ফল অনেকদূর পর্যন্ত গিয়াছে। সকলেই জানেন এই সময়েই আমাদের জাতীয় জীবনে সাম্প্রদায়িকতার জন্ম হয়। ভারত-সরকার নানাভাবে সাম্প্রদায়িকতা নীতির সমর্থন করেন। নূতন সাম্প্রদায়িক নির্বাচন ব্যবস্থা এই ভেদবুদ্ধির প্রশ্রয় দেয়। তাঁহাদের সমর্থন না পাইলে সাম্প্রদায়িকতা যে বেশি দিন টিকিত না এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। একদল লোক স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া হয়তো খানিকটা গোলমাল করিত; কিন্তু সে গোলমাল বেশি দিন পর্যন্ত থাকিত না। কিন্তু তাহা হইল না; প্রশ্রয় পাইয়া সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। শুধু মুসলমানদেরই জন্য পৃথক প্রতিষ্ঠানের দাবি তাহাদের অন্যতম। দেখাদেখি হিন্দুদের মধ্যেও অনুরূপ দাবি উঠিল। সরকার সে দাবি অগ্রাহ্য করা দূরে থাক্ তাহা সমর্থন করিলেন।

এইভাবে আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার বিষ প্রবেশ করিল।

গোখলের বিল ও ১৯১২ সালের শিক্ষানীতি

স্বদেশী আন্দোলনের সময়েই এদেশে প্রথম ব্যাপকভাবে বয়স্কশিক্ষার চেষ্টা হইয়াছিল। তখন বয়স্কদের শিক্ষার জন্য গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে বহু নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠেন। দেড়শত বৎসর ব্রিটিশ শাসনের পরও যে দেশে লেখাপড়া-জানা লোকের সংখ্যা শতকরা পাঁচ-ছয়জনের বেশি হয় নাই এই দৃষ্টিকটু ব্যাপারটি এই সময়ে সকলের চোখে পড়ে এবং এই লইয়া নানা আলোচনার সৃষ্টি হয়।

ইহার সহজ ও স্বাভাবিক প্রতিকার ছিল প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার। সরকার মুখে প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিলেও কার্যত কিছুই করিতেছিলেন না। এমন সময়ে ১৯১১ সালে গোখলে ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে একটি বিল উপস্থিত করিলেন। বিলের দাবি বেশি নহে; যদি কোনো প্রাদেশিক সরকার মনে করেন কোনো বিশেষ স্থানে প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক করার অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা হইলে সেখানে আবশ্যিকভাবে প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করার অনুমতি দেওয়া হইবে; তাও শুধু ছেলেদের জন্যই, মেয়েদের লেখাপড়া শিখিতে বাধ্য করা হইবে না।

এই সামান্য দাবিও ভারত-সরকার স্বীকার করিলেন না। সরকার-পক্ষের মুখপাত্র সার্ হারকোর্ট বাটলার বলিলেন প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক করার কথা উঠিতেই পারে না; এখনও দেশ তাহার জন্য প্রস্তুত হয় নাই। গোখলে যখন বরোদার (বরোদা রাজ্যে অনেক আগেই প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক ও অবৈতনিক করা হইয়াছিল) নজির দেখাইলেন তখন বাটলার উহা গণতান্ত্রিক প্রথায় শাসিত রাজ্য নহে বলিয়া উড়াইয়া দিলেন; উত্তরে যখন গোখলে পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির কথা বলিলেন তখন

হারকোর্ট বাটলার সে নজিরও স্বীকার করিতে রাজি হইলেন না। গোখলে হতাশ হইয়া বলিলেন, দেশী রাজ্যের উদাহরণ দিলে স্বৈরতান্ত্রিক রাজ্য বলিয়া সে উদাহরণ বাটলার সাহেব স্বীকার করিবেন না, তিনি গণতান্ত্রিক দেশের উদাহরণ চাহিবেন, তখন পাশ্চাত্ত্য গণতান্ত্রিক দেশগুলির নজির তুলিলে সেগুলিও তিনি মানিতে চাহিবেন না। ভারতবর্ষের শাসনতন্ত্রের অনুরূপ বিচিত্র শাসনতন্ত্রের উদাহরণ কোথায় পাইব? সরকার-পক্ষ মানিয়া লইতে পারেন এমন কোন্ নজির দিব?

সরকারের বিরোধিতায় গোখলের সকল যুক্তি ও চেষ্টা ব্যর্থ হইল। লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে অধিকাংশ সভ্যের ভোটের জোরে গোখলের বিল নাকচ হইয়া গেল।

গোখলের বিল লইয়া দেশময় তুমুল আন্দোলন হয়। সরকার-অনুগৃহীত একদল মুষ্টিমেয় ব্যক্তি ছাড়া দেশের প্রায় সকলেই এই বিল সমর্থন করিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ শূদ্র, হিন্দু মুসলমান ধনী নির্ধন, সকল সম্প্রদায়েরই লোক ছিল। কংগ্রেস হইতে আরম্ভ করিয়া সকল রাজনৈতিক দলই গোখলের বিলের পক্ষে ছিলেন।

এই অবস্থায় ভারত-সরকার যখন বিলের বিরোধিতা করিলেন তখন তাঁহাদের পক্ষে সাফাই গাহিবার, এ বিষয়ে তাঁহাদের নীতি সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিবার একটা প্রয়োজন হইল। এমন সময়ে দিল্লিতে দরবার বসিল; স্বয়ং ভারতসম্রাট এদেশে আসিলেন; দেশের কল্যাণ কামনা করিয়া তিনি শিক্ষাবিস্তারের কথা বলিলেন। এই উপলক্ষে ও এই সুযোগে ভারত-সরকার আর একবার তাঁহাদের শিক্ষানীতি ঘোষণা করিলেন।

প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহারা বলিলেন, যদিচ তাঁহারা গোখলের বিলের বিরোধিতা করিয়াছেন তথাপি তাঁহারাও প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার

চান। সুতরাং এখন হইতে তাঁহারা প্রাথমিক শিক্ষার জন্য আরও অনেক অর্থ বরাদ্দ করিবেন। দরবার উপলক্ষে শিক্ষার জন্য যে অতিরিক্ত পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ব্যয় মঞ্জুর করা হইয়াছে তাহার অধিকাংশই প্রাথমিক শিক্ষার জন্য খরচ করা হইবে।

১৯১২ সালের নীতির মধ্যে দুইটি নূতন কথা শোনা গেল। প্রথমটি মাধ্যমিক শিক্ষার বিষয়ে, দ্বিতীয়টি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সংস্কার সম্বন্ধে।

এতদিন পর্যন্ত পরীক্ষা অনুমোদন প্রভৃতি কয়েকটা ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি হাই স্কুলগুলির উপর কর্তৃত্ব করিতোছল। লর্ড কার্জন ইচ্ছা করিয়াই এই কর্তৃত্বের ভার তাহাদের উপর দিয়াছিলেন। তাহাতে শিক্ষাবিভাগের অধিকার খর্ব করিবার কোনো কথাই ছিল না। তাহার একটা কারণ, তখন শিক্ষাবিভাগ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে কোনো বিরোধ ছিল না এবং এমন-কোনো বিরোধ যে ভবিষ্যতে ঘটিতে পারে তাহাও কাহারও মনে হয় নাই।

ইতিমধ্যে স্বদেশী আন্দোলন এবং অন্যান্য রাজনৈতিক আন্দোলন হইল, কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় বহুল পরিমাণে আত্মনির্ভরশীল হইয়া স্বাধীনভাবে সরকারী আওতার বাহিরে চলিতে লাগিল ; এমন-কি, শোনা যায় নাকি একটি বিদ্যালয়ের অনুমোদন বন্ধ করিবার ব্যাপারে একটি প্রদেশে বিশ্ব-বিদ্যালয় এবং.ছোটলাটের মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় লাটসাহেবের অভিপ্রায়মত না চলায় লাটসাহেব চাকরি ছাড়িয়া চলিয়া যান। এ অবস্থায় সরকারী শিক্ষাবিভাগের গাত্রদাহ হইবারই কথা। তাঁহাদের ভাবটা যেন বিশ্ববিদ্যালয় অন্যায়ভাবে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির উপর কর্তৃত্ব করিতেছে ; অযোগ্য বিদ্যালয়কে অনুমোদন করিয়া তাহারা অনুমোদনের অধিকারের অপব্যবহার করিতেছে এবং শিক্ষার উন্নতি করা দূরে থাক ক্ষতিই করিতেছে। অতএব অনুমোদনের অধিকার তাহাদের

হাতে না রাখিয়া এই ভার অন্য কাহারও উপর দেওয়া প্রয়োজন। পরবর্তীকালে সেকেণ্ডারী বোর্ডের যে কথা ওঠে এখানেই তাহার প্রথম আভাস আমরা পাই।

সরকারের এই যুক্তির সমর্থনে আরও বলা হইল, বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কাজ বস্তুত মধ্যশিক্ষা লইয়া নহে, উচ্চশিক্ষা লইয়া। মধ্যশিক্ষার দিকে নজর দিতে গিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজের কাজ ঠিকমত করা হইতেছে না। সুতরাং মধ্যশিক্ষা সংস্কারের জন্যও বটে আর বিশ্ববিদ্যালয়গুলির নিজেদের সুবিধার জন্যও বটে, কাজের ভাগ করিতে হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে মধ্যশিক্ষা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির অনুমোদন, পরীক্ষা ইত্যাদি ব্যাপারের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি দিতে হইবে। তাহা হইলে উভয়পক্ষেই সুবিধা হইবে। তখন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে আজ যে-সকল সংস্কার একান্ত প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে তাহাদের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করা সহজ হইয়া উঠিবে। এই প্রসঙ্গেই বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন আদর্শের, নূতন ধরণের বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা উঠিল।

বিশ্ববিদ্যালয় মোটামুটি কয়েক রকমের হইতে পারে। এক, প্রাচীন-কালের নালন্দা, বিক্রমশীলা বা বর্তমানকালের অক্সফোর্ড কেমব্রিজের মতো আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়। সেখানে ছাত্রগণ বাস করিয়া জ্ঞানচর্চা করে, সেখানে দৈনন্দিন সামাজিক জীবন প্রাচীন গুরুগৃহেরই মতো সুসংহত সুনিয়ন্ত্রিত। সেখানে ছাত্রগণ অহরহ জ্ঞানতপস্বী অধ্যাপকদিগের স্পর্শ লাভ করে এবং সেই সান্নিধ্যের ফলে, সেই পরিবেশে বাস করিয়াই তাহাদের সকলের চেয়ে বড় শিক্ষা হয়। ইহাই ছিল এদেশের প্রাচীন আদর্শ। আর এক ধরণের বিশ্ববিদ্যালয় উনবিংশ শতাব্দীর সৃষ্টি ; তাহার উদাহরণ লণ্ডন এবং তাহারই আদর্শে গঠিত এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি। এগুলিতে ছাত্রগণের বাসের বিশেষ কোনো বিধিনিষেধ নাই, তাহারা স্বগৃহে

বা অন্য কোথাও থাকে ; দিবসের মধ্যে কোনো-একটা নির্দিষ্ট সময়ে কিছুক্ষণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে আসে, লেখাপড়া করে এবং লেখাপড়া শেষ হইলে ঘরে ফিরিয়া যায়। এখানে গুরুশিষ্যের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপিত হওয়া অপেক্ষাকৃত কঠিন। এখানে ছাত্রগণের দৈনন্দিন ও সামাজিক জীবনের উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাক্ষাৎ কোনো প্রভাব নাই এবং সেরূপ প্রভাব বিস্তারের বিশেষ কোনো চেষ্টাও নাই। আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে এইভাবের অনেক কথাই বলা যায়।

দ্বিতীয় শ্রেণীর যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া গেল কলিকাতা ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় যখন প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় তখন কিন্তু সেগুলি সে ধরণের ছিল না। বস্তুত সেগুলিকে তৃতীয় আর-এক শ্রেণীর মধ্যে ফেলাই ঠিক হইবে। দ্বিতীয় শ্রেণীর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনায় বিশ্ববিদ্যালয়ে সাক্ষাৎভাবে লেখাপড়া শিখাইবার কথা বলা হইয়াছে ; শুধু সেখানে ছাত্রগণ দিনরাত্রি বাস করিবে না ; প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে এইটুকুই প্রভেদ। এখানে যে তৃতীয় শ্রেণীর বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বলিতেছি সেখানে সাক্ষাৎভাবে লেখাপড়া শিখাইবার ব্যবস্থাও থাকে না। সেখানে লেখাপড়া শেখানো হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত বিভিন্ন কলেজে। বিশ্ববিদ্যালয় শুধু অনুমোদন, পাঠ্যনির্ধারণ, পরীক্ষাগ্রহণ ও উপাধিবিতরণ করিয়া ক্ষান্ত। এক হিসাবে সে ধরণের প্রতিষ্ঠানকে বিশ্ববিদ্যালয় নামে অভিহিত করা সমীচীন নহে, কারণ সেখানে কোনো বিদ্যারই চর্চা নাই। বস্তুত সেগুলি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নহে, পরীক্ষাকেন্দ্র। কিছুদিন আগে পর্যন্তও কলিকাতা এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এই তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেখানে সাক্ষাৎভাবে জ্ঞানচর্চার কোনো আয়োজন ছিল না। ১৯০৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সংস্কারের যে চেষ্টা হয় তাহাতে আইনের সংস্কার হয় বটে কিন্তু কার্যত বিশেষ কিছুই হয় নাই।

১৯১২ সালের শিক্ষানীতিতে সরকারের পক্ষ হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কারের কথা তোলা হয় এবং প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শের উল্লেখ করা হয়। পুরাতন তৃতীয় শ্রেণীর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকারের ক্ষেত্র সংকুচিত করিয়া ভালো ভালো কলেজগুলিকে কেন্দ্র করিয়া ছোট ছোট প্রথম শ্রেণীর বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া তুলিতে হইবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সাক্ষাৎ তত্ত্বাবধানে শিক্ষার আয়োজন করিতে হইবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে শুধু পরীক্ষাকেন্দ্র না করিয়া প্রকৃতই সকল বিদ্যার আলয় ও উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র করিয়া তুলিতে হইবে।

এই প্রসঙ্গেই আমরা প্রাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতার আদর্শের সরকারী সমর্থন দেখিতে পাই। সাম্প্রদায়িক বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের নীতি সমর্থন করিয়া বলা হয়, সরকার আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় ও কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় উভয় বিদ্যালয়কেই যথাযথ অর্থসাহায্য করিবেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথাও এইখানে উল্লেখ করা হয়। পূর্ববঙ্গের শিক্ষিত মুসলমানগণের মধ্যে একদল কিছুদিন হইতে স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবি জানাইয়াছিলেন। ভারত-সরকার স্পষ্টই বলিলেন, সে দাবি তাঁহারা সমর্থন করিবেন। বিভিন্ন প্রদেশের জন্য প্রাদেশিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গে পাটনা ও নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা হয়।

১৯১২ সালের শিক্ষানীতি ঘোষণার কিছুদিন পরেই পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সংস্কারের জন্য নূতন এক কমিশন বসাইবার কথা ওঠে।

দেখা গিয়াছে, যখনই ইংলণ্ডে শিক্ষাসংস্কারের কথা উঠিয়াছে তাহার কিছুকালের মধ্যে এদেশেও অনুরূপ সংস্কারের চেষ্টা সরকারের তরফ হইতে করা হইয়াছে। দুইটি চেষ্টার মধ্যে সময়ের ব্যবধান কোথাও পাঁচ বৎসর, কোথাও দশ বৎসর হইয়াছে। ১৯১০ সালে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কারের জন্য লর্ড হলডেনের নেতৃত্বে রয়াল কমিশন

বসিয়াছিল। ১৯১৪ সালে তাঁহারই নেতৃত্বে এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সংস্কারের জন্য এক কমিশন বসাইবার প্রস্তাব হইল। লর্ড হলডেন অবশ্য আসিতে রাজী হইলেন না। এমন সময়ে ইউরোপে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এদেশেও শিক্ষাসংস্কারের এবং শিক্ষাবিস্তারের সকল কথা ও চেষ্টা সাময়িকভাবে বন্ধ হইয়া গেল।

বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কারের আরম্ভ

১৯১৭ সালে যুদ্ধের অবস্থা কতকটা ভালো হইয়াছে। তাই তখন শিক্ষাসংস্কারের দিকে দৃষ্টি দিবার খানিকটা সুযোগ ঘটিল। এই সুযোগে ভারত-সরকার কলিকাতা ইউনিভার্সিটি কমিশন নিয়োগ করিলেন। বিলাতের লীডস বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার মাইকেল স্যাডলার হইলেন কমিশনের সভাপতি। তাঁহারই নামে ইহা স্যাডলার কমিশন নামে পরিচিত। কমিশনের এদেশী সভ্যদের মধ্যে প্রধান ছিলেন সার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। অনেকে মনে করেন কমিশন বহুল পরিমাণে তাঁহার মতামতের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিল।

যদিচ কমিশনের ব্যক্ত উদ্দেশ্য হইল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার সম্বন্ধে পরামর্শ দেওয়া তবুও ভারতবর্ষের সর্বত্র বিশ্ববিদ্যালয়-গুলিতে যে ধরণের শিক্ষা দেওয়া হইতেছিল সেই সম্বন্ধে সমগ্রভাবে আলোচনা করাই যে ইহার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল এটা মনে করা অসংগত হইবে না। বস্তুত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে উপলক্ষ করিয়া দেশে এই ধরণের শিক্ষার সংস্কার কি ভাবে করা যায় কমিশন তাহাই আলোচনা করিলেন; কমিশনের সভ্যগণ সারা ভারতবর্ষ ঘুরিলেন, দেশের সর্বত্র ছোট বড় নানা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দেখিলেন, শিক্ষাবিদ্‌গণের সহিত আলাপ-আলোচনা করিলেন এবং সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তাঁহাদের

শিক্ষাসংস্কারের পরিকল্পনা প্রস্তুত করিলেন। স্যাডলার কমিশন সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিবার পূর্বে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে যে দুই-একটি ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছিল তাহার উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রথম ব্যাপারটি হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা।

১৯১৬ সালে পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়ের চেষ্টায় নূতন আদর্শে কাশীতে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। কয়েকটি বিষয়ে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলি হইতে স্বতন্ত্র ধরণের ছিল। প্রথমত, এখানে সাক্ষাৎভাবে প্রবেশিকার পর হইতে এম. এ. পর্যন্ত সকল প্রকার শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হয়; দ্বিতীয়ত, ইহা পুরাপুরি না হইলেও অনেক পরিমাণে আবাসিক। তৃতীয়ত, এই বিশ্ববিদ্যালয়েই উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক আদর্শ প্রথম সুস্পষ্ট-ভাবে আত্মপ্রকাশ করে। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে আর-একটি ব্যাপার লক্ষ করিবার মতো। এতদিন পর্যন্ত এদেশে যতগুলি বিশ্ববিদ্যালয় হইয়াছিল তাহাদের প্রত্যেকটি সরকারের আগ্রহে এবং সরকারের চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। জনসাধারণের চেষ্টায় এই প্রথম সরকার-অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া উঠিল। ইহাতে প্রমাণ হইল যে আগ্রহ থাকিলে এবং গভর্নমেণ্ট বাধা না দিলে এদেশে জনসাধারণের চেষ্টাতেও বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া উঠিতে পারে।

এই সময়েই দেশীয় রাজ্যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার কথা ওঠে। এতদিন শুধু ব্রিটিশ ভারতেই বিশ্ববিদ্যালয় ছিল; দেশীয় রাজ্যের ছাত্রেরা সেখানে উচ্চশিক্ষার জন্য আসিত। ১৯১২ সালের পর হইতে আমাদের জাতীয় জীবনে প্রাদেশিকতাবোধ নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে আরম্ভ করে। দেশীয় রাজ্যগুলির স্বাতন্ত্র্যবোধ এই প্রাদেশিকতাবোধেরই রূপান্তর। সেই স্বাতন্ত্র্যবোধের ফলেই দেশীয় রাজ্যে বিশ্ববিদ্যালয়

প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হয়। ১৯১৭ সালে মহীশূর ও ১৯১৮ সালে হায়দরাবাদে ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে উর্দুকে উচ্চশিক্ষার বাহনরূপে গ্রহণ করিয়া শিক্ষার ক্ষেত্রে নূতনত্ব প্রবর্তনের চেষ্টা হইল। ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতম পরীক্ষাও উর্দুতে দিতে হয়। উর্দুকে শিক্ষার বাহন করায় যেন কেহ না মনে করেন দেশবাসী বহুদিন ধরিয়া মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করিবার যে দাবি করিতেছিল, ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই দাবি স্বীকৃত হইয়াছে এবং সেইমত শিক্ষার বাহন সম্বন্ধে সংস্কার সাধিত হইয়াছে। নিজামের রাজ্যে শতকরা পাঁচজনেরও মাতৃভাষা উর্দু নহে; সুতরাং সে-রাজ্যের প্রজার পক্ষে ইংরেজী বাহনের ফলে যেরূপ সুবিধা অসুবিধা উর্দু বাহনেরও অনেকটা সেই রকমই সুবিধা অসুবিধা হইল। তবে উর্দুর ব্যবহারে ইহাই নিশ্চিতভাবে প্রমাণ হইল যে, যদি সরকার ইচ্ছা করেন তাহা হইলে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও এদেশী ভাষাকে বাহনরূপে স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

দ্বিতীয় যে ব্যাপারটির কথা উল্লেখ করিয়াছি, সেটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পোস্টগ্র্যাজুয়েট বিভাগ গঠন।

১৯১৭ সালে সার্ আশুতোষের প্রেরণায় ও নেতৃত্বে কলিকাতায় পোস্টগ্র্যাজুয়েট শিক্ষা কেন্দ্রীভূত করার ব্যবস্থা হইল। এতদিন এম. এ. এম. এসসি. পড়ার ব্যবস্থা ছিল বিভিন্ন কলেজে। এইবার কলিকাতায় সাক্ষাৎভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনায় তাহার ব্যবস্থা করা হইল। এক প্রেসিডেন্সি কলেজ ছাড়া অন্য কোনো কলেজের এম. এ, এম. এসসি. পড়াইবার অধিকার রহিল না।

সৌভাগ্যক্রমে এই সময়েই সার্ আশুতোষের চেষ্টাতেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইজন কৃতী ছাত্র, সার্ তারকনাথ পালিত এবং সার্

রাসবিহারী ঘোষ, বিশ্ববিদ্যালয়কে বহুলক্ষ টাকা দান করিলেন। তাঁহাদের বদান্যতায় বিজ্ঞানচর্চার জন্য সায়েন্স কলেজ ও ল্যাবরেটারি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর হইল।

কলিকাতায় পোস্টগ্র্যাজুয়েট বিভাগের সৃষ্টির ফলে এদেশের অন্তত একটি পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয় প্রকৃতই শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হইল। সেখানে উচ্চতর জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোচনা ও গবেষণার সুযোগ ঘটিল। গবেষণা সম্বন্ধে এই শতাব্দীর প্রথম দিকে জনৈক উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী বলিয়াছিলেন, এদেশে নাকি গবেষণা সম্ভব নহে, আমরা নাকি গবেষণা করিবার যোগ্য নহি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্টগ্র্যাজুয়েট বিভাগ কয়েক বৎসরের মধ্যেই সেই কথার উপযুক্ত উত্তর দিল।

এই ভাবে স্যাডলার কমিশনের কাজ আরম্ভ হইবার আগেই এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সংস্কারের সূত্রপাত হইয়াছিল।

স্যাডলার কমিশন

১৯১৯ সালে স্যাডলার কমিশনের রিপোর্ট বাহির হইল। শিক্ষা সম্বন্ধে এত দীর্ঘ এবং প্রয়োজনীয় রিপোর্ট ইতিপূর্বে আর কখনও বাহির হয় নাই। রিপোর্টে এক প্রাথমিক শিক্ষা ছাড়া আর প্রায় সকল প্রকার শিক্ষারই আলোচনা ছিল।

প্রাথমিক শিক্ষার সহিত সাক্ষাৎভাবে উচ্চশিক্ষার কোনো যোগ নাই বলিয়া কমিশন সে সম্বন্ধে কোনো আলোচনা করেন নাই। কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষা উচ্চশিক্ষার সহিত এত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত যে উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে কোনো আলোচনা করিতে গেলে মাধ্যমিক শিক্ষা হইতে আরম্ভ না করিলে চলে না। এই যুক্তিতে কমিশন বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কারের কথা বলিতে গিয়া এদেশের মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কারের পরামর্শ দিলেন।

দেশের মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া কমিশন যে মন্তব্যগুলি করিয়াছিলেন এইখানে তাহাদের কয়েকটি উল্লেখ করা প্রয়োজন।

কমিশন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের ত্যাগ ও জ্ঞানার্জনস্পৃহার প্রশংসা করিলেন। দারিদ্র্যের জন্য বহু ছাত্র যে মাধ্যমিক শিক্ষা পায় না তাহাও উল্লেখ করিলেন। মাধ্যমিক শিক্ষার যে আরও প্রসার প্রয়োজন সে-কথাও তাঁহারা স্বীকার করিলেন। কিন্তু এখন বিদ্যালয়গুলি যে অবস্থায় আছে তাহাদের সংস্কার না হইলে কোনো উন্নতিই সম্ভবপর হইবে না। তাঁহারা বলিলেন, সকল ত্রুটির মূলে আছে উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যে বেতন দেওয়া হয় তাহাতে যোগ্য লোকের সেখানে কাজ করা কঠিন। অধিকন্তু যাঁহারা শিক্ষকতার কাজ গ্রহণ করেন তাঁহাদের অনেকেই এ বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা লাভ করেন নাই। তাহার উপর আবার ছাত্রদের দারিদ্র্য। এই সকল কারণ মিলিয়া মাধ্যমিক শিক্ষার অবস্থা এরূপ হইয়াছে।

সুতরাং শিক্ষার উন্নতি করিতে হইলে আরও অধিক অর্থের প্রয়োজন। গভর্ণমেণ্টকে উপযুক্ত পরিমাণ অর্থসাহায্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে, নতুবা কোনো সংস্কারই সম্ভব হইবে না। কমিশনের মতে সরকারকে ইহার জন্য বৎসরে অন্তত আরও ৪০ লক্ষ টাকা খরচ করিতে হইবে। তাহার ব্যবস্থা না করিয়া কোনো সংস্কারে হাত দেওয়া সম্ভব নহে।

টাকার পরই পরিচালনার ব্যবস্থা। মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনার জন্য কমিশন নূতন এক বোর্ড গঠনের প্রস্তাব করিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়কে আর মাধ্যমিক শিক্ষা পরিচালনার ভার দেওয়া হইবে না, কারণ মাধ্যমিক শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য বিশ্ববিদ্যালয় নহে; সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়কে সে ভার দিলে শিক্ষাব্যবস্থায় পক্ষপাতদোষ ঘটিতে পারে। দ্বিতীয়ত, এ কাজ

করিতে গেলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রকৃত যে কাজ তাহাতে বাধা ঘটে। অতএব সবদিক দিয়াই মাধ্যমিক শিক্ষা পরিচালনার জন্য নূতন ব্যবস্থার দরকার।

এই নূতন ব্যবস্থা হইতেছে নূতন এক বোর্ড গঠন। সে বোর্ড কিভাবে গঠিত হইবে, তাহার কি কি কাজ হইবে, কমিশন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহা আলোচনা করিয়া সকল বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশ দিলেন। বোর্ডের অধিকাংশ সভ্যই বেসরকারী হইবেন। আর যাহাতে জনসাধারণ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির স্বার্থ সম্পূর্ণভাবে রক্ষিত হয়, সেইজন্য বোর্ডে জনসাধারণের ও বিশ্ববিদ্যালযগুলির প্রতিনিধি উপযুক্ত সংখ্যায় রাখিতে হইবে। তাহাতে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই প্রতিনিধি থাকিবেন। এইভাবে সাম্প্রদাযিক প্রতিনিধির ব্যবস্থা হইল বটে, কিন্তু স্যাডলার কমিশনের রিপোর্ট পড়িলে বোঝা যায় যে, তাঁহারা শিক্ষার ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক নির্বাচনের উপর বিশেষ জোর দেন নাই। অর্থাৎ প্রত্যেকটি বিষযে চুলচেরা হিসাব করিয়া সম্প্রদায়বিশেষের প্রতিনিধির সংখ্যা নির্ধারণ করিতে হইবে ইহা তাঁহাদের অভিমত ছিল না। উদাহরণস্বরূপ বোর্ডের গঠনের কথাই বলা যায়; যে জন-ষোলোকে লইয়া বোর্ড গঠিত হইবে তাহাতে অন্তত তিনজন হিন্দু ও তিনজন মুসলমান থাকিবে ইহাই তাঁহারা মত দিলেন। বস্তুত সাম্প্রদায়িক নির্বাচন মুখ্যত রাজনীতির ব্যাপার, শিক্ষানীতির নহে। এইখানে একটা কথা মনে রাখিতে হইবে, কমিশন সাম্প্রদায়িক নির্বাচন সমর্থন করিলেও পৃথক নির্বাচনের কথা বলেন নাই।

মাধ্যমিক শিক্ষার উপর সরকারী কর্তৃত্ব কতদূর হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে কমিশন বলিলেন, বোর্ডের ব্যাপারে মোটামুটিভাবে সরকার কর্তৃত্ব অবশ্যই করিবেন, কিন্তু যেন তাহার ফলে বোর্ডের ও বিদ্যালয়গুলির

স্বাধীনতা অতিমাত্রায় ক্ষুণ্ণ না হয়, সে কর্তৃত্বে যেন জনসাধারণের স্বাধীনভাবে শিক্ষাদানের চেষ্টা ব্যহত না হয়। দেশের লোকের সহযোগিতা না পাইলে কোনো শিক্ষাব্যবস্থাই সার্থক হইতে পারে না, সুতরাং সেরূপ সহযোগিতার পুরা ব্যবস্থা করিতে হইবে। বোর্ড যেন সরকারী শিক্ষাবিভাগের শাখামাত্র না হইয়া ওঠে সেদিকেও প্রখর দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কারণ সেরূপ হইলে বোর্ড জনসাধারণের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস হারাইবে এবং তাহার উপযোগিতা নষ্ট হইয়া যাইবে।

কমিশনের মতে কলেজে প্রথম দুই বৎসরে যে কাজ হয় তাহা অনেকাংশে মাধ্যমিক শিক্ষারই অনুরূপ; অতএব শিক্ষাব্যবস্থার এই অংশটুকু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থা হইতে বাদ দিয়া ইহাকে মাধ্যমিক শিক্ষার সঙ্গে জুড়িয়া দিতে হইবে। এই দুই বৎসরের শিক্ষার স্তরের নাম দেওয়া হইল ইণ্টারমিডিয়েট শিক্ষা। কমিশন শিক্ষানিয়ন্ত্রণের জন্য যে বোর্ডের প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহার উপর মাধ্যমিক ও ইণ্টার-মিডিয়েট এই দুই প্রকার শিক্ষাপরিচালনা করিবার ভার দেওয়া হইল এবং বোর্ডের নাম করা হইল বোর্ড অব সেকেণ্ডারি অ্যাণ্ড ইণ্টারমিডিয়েট এডুকেশন। কিন্তু ইণ্টারমিডিয়েট শিক্ষার ভার ইস্কুলগুলির উপর দেওয়া হইল না; তাহার জন্য স্বতন্ত্র দুই বৎসরের কলেজের প্রস্তাব হইল। এই ধরণের কলেজের শিক্ষারীতির পরিবর্তন ও সংস্কারের কথা বলা হইল।

১৮৮২ সালে শিক্ষা-কমিশন এবং ১৯০২ সালে বিশ্ববিদ্যালয়-কমিশন যে দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন ১৯১৯ সালের নববিধানে নূতন নামে সেইগুলিই বিশ্ববিদ্যালয়-সংস্কারের অমোঘ অস্ত্র বলিয়া গণ্য হইল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার সম্বন্ধে কমিশন প্রস্তাব করেন

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ডিগ্রি হইবে বি. এ. এবং বি. এ. কোর্স দুই বৎসরের না হইয়া তিন বৎসরের করা হইবে। তিন বৎসর করার পক্ষে তাঁহারা যুক্তি দিলেন, (বিলাতেও এইরকম ব্যবস্থা আছে) ইহার কমে ঠিকমত পড়াশোনা হয় না, ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে ঘনিষ্ঠ অন্তরের যোগ সৃষ্টি হইতে পারে না, এবং সেইজন্যই বিদ্যাভ্যাস সার্থক হইবার বাধা ঘটে।

ইণ্টারমিডিয়েট ক্লাসগুলিকে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পৃথক করিয়া দেওয়া এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাধি-পরীক্ষার পাঠ্য তিন বৎসরের করিয়া দেওয়া, স্যাডলার কমিশনের এই দুইটিই হইল মূল প্রস্তাব।

তাঁহাদের মতে মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কার করিলে এবং এই দুইটি প্রস্তাব কার্যে পরিণত করিতে পারিলেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রধান ত্রুটি দূর হইবে। তখন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে প্রকৃত শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত করা যাইবে। এই ধরণের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপরে কমিশন জোর দিলেন। প্রসঙ্গক্রমে তাঁহারা অবিলম্বে ঢাকায় এই ধরণের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে বলিলেন। এই শ্রেণীর বিশ্ববিদ্যালয়ের শাসনের জন্য নূতন প্রস্তাব হইল। পুরাতন সেনেট সিণ্ডিকেটের বদলে কোর্ট, অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল এক্সিকুটিভ কমিটির ব্যবস্থা করা হইল। যাঁহারা পড়াইতেন, এতদিন বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা ব্যাপারে সেই অধ্যাপকদের বিশেষ কোনো হাত ছিল না। এখন তাঁহাদের কিছু পরিমাণ প্রাধান্য দিবার চেষ্টা হইল। পরিচালকসমিতিগুলিতে তাঁহাদের প্রতিনিধির সংখ্যা বাড়ানো হইল। ভাইস চ্যান্সেলারের পদ এ পর্যন্ত অবৈতনিকই ছিল, কমিশন সে পদ বৈতনিক করিতে বলিলেন।

শিক্ষার অন্যান্য দিকগুলির বিষয়েও কমিশন নানা প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিলেন এবং অনেক নূতন প্রস্তাব করিলেন। বস্তুত প্রাথমিক শিক্ষা বাদে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার এমন-কোনো দিক ছিল না যে-বিষয় তাঁহারা

আলোচনা করেন নাই বা যে-বিষয়ে তাঁহারা নূতন কোনো প্রস্তাব করেন নাই। এদেশের শিক্ষার ইতিহাসে এত মূল্যবান আর কোনো রিপোর্ট ইতিপূর্বে লেখা হয় নাই। পরবর্তী কালের শিক্ষাধারার গতি বহুল পরিমাণে ইহার দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিল। আজও ইহার প্রভাব একেবারে হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই।

স্যাডলার কমিশনের ফলে এদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ব্যবস্থা সম্বন্ধে খুব একটা নাড়াচাড়া পড়িয়া যায় এবং নূতন নূতন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা দেখা যায়। ১৯২০ হইতে ১৯৩০ পর্যন্ত এই দশ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে আটটি নূতন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাদের সবগুলিই যে নূতন আদর্শে গঠিত হইল তাহা নহে: কতকগুলি পুরাতনেরই অনুকরণ করিল, আবার কতকগুলি নূতন ভাবে গড়িয়া উঠিল। ১৯২১ সালে ঢাকায় আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এবং ১৯২৭ সালে আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়। আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণী দূরে থাক একেবারে তৃতীয় শ্রেণীর বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শে গঠিত। সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাক্ষাৎ তত্ত্বাবধানে ছাত্রদের বাস ও শিক্ষার আয়োজন বা কেন্দ্রীভূত পোস্টগ্র্যাজুয়েট শিক্ষার ব্যবস্থা এই দুইয়ের কোনোটাই নাই। আগ্রার পর ১৯২৯ সালে অন্নমলই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহার পর ১৯৩৭ সালে ত্রিবাঙ্কুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার পর আর-কোনো নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম হয় নাই। ত্রিবাঙ্কুরকে লইয়া এ পর্যন্ত এদেশে মোট ১৮টি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহাতে সর্বশুদ্ধ প্রায় সওয়া লাখ ছাত্রছাত্রী উচ্চশিক্ষা লাভ করিতেছে।

কমিশনের প্রস্তাবের ফলে কয়েকটি প্রদেশে সেকেণ্ডারি ও ইণ্টার-মিডিয়েট শিক্ষা বোর্ড গঠিত হইল। ঢাকাতে বোর্ড স্থাপিত হইল; কিন্তু

এই বোর্ড গঠনের ব্যাপারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও গভর্নমেণ্টের মধ্যে মতের অনৈক্য হওয়ায় বাংলাদেশে কোনো বোর্ড গঠিত হইতে পারে নাই। ঢাকা বাদে বাংলাদেশে এখনও মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাব পূর্বেরই মতো আছে। ইহাতে কোনো ক্ষতি হইয়াছে কিনা তাহা বলা কঠিন; কারণ অন্যত্র যেখানে যেখানে বোর্ড গঠিত হইয়াছে সেখানে যে মোটের উপর মাধ্যমিক শিক্ষার বিশেষ উন্নতি হইযাছে, একথা কেহই জোর গলায় বলিতে পারিতেছে না।

একটা কথা প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখি। স্যাডলার কমিশন যে আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর জোর দিয়াছিলেন তাহার খরচ অনেক। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে এরূপ একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অন্তত ৫০ লক্ষ টাকা দরকার। এই গরিব দেশে সে টাকা কোথা হইতে আসিবে? যদি গভর্নমেণ্ট টাকা দেন তবেই তাহা সম্ভব, নতুবা নহে। অন্য ধরণের বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা বড় সুবিধা, তাহার খরচ তুলনায় অনেক কম। আবাসিক বিশ্ববিদ্যালযে একটি ছাত্রের যে খরচ লাগে এদেশের অধিকাংশ পিতামাতাই তাহা বহন করিতে পারেন না। লণ্ডন বা বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক নহে, কিন্তু তাহাদের ছাত্রেরা যে আবাসিক কেম্‌ব্রিজ বা অক্সফোর্ডের ছাত্রদের তুলনায় কোনো বিষয়ে কম অগ্রসর সেকথাতো বলা যায় না। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সংস্কার করিতে যাইবার আগে কথাটা আর একবার ভাবিয়া দেখা দরকার। মনে হয় এদেশে ছোট বড় নানা আকারের নানা ধরণের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রয়োজন; তাহাদের কতকগুলি হইবে আবাসিক, কতকগুলি অনাবাসিক। কতকগুলিতে হয়তো পোস্টগ্র্যাজুয়েট শিক্ষা কেন্দ্রীভূত করা হইবে; কতকগুলি আবার শুধু পরীক্ষা লইয়াই ক্ষান্ত থাকিবে। তাহাদের অধীনে ও নেতৃত্বে ছোট ছোট কলেজগুলিতে

লেখাপড়ার ব্যবস্থা থাকিবে (সে ব্যবস্থা আবাসিক অনাবাসিক দুই ভাবেরই হইতে পারে) এবং কলেজে গ্রন্থাগার, পরীক্ষাশালা ইত্যাদির উন্নততর ব্যবস্থা করিয়া এবং শিক্ষক-ছাত্রের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপনের সুযোগ দিয়া শিক্ষাব্যবস্থার প্রকৃত উন্নতি সাধন করা হইবে। এতবড় একটা প্রকাণ্ড দেশে ছড়ানো ছোট ছোট অনেক কলেজ থাকিতে বাধ্য; তাহাদের প্রত্যেকটিকে আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করা অসম্ভব। সুতরাং তাহাদের একত্র করিয়া অনাবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করা ছাড়া আর উপায় নাই।

কিন্তু কলেজগুলির কোনো উন্নতি সাধন করিতে গেলে প্রথমেই অর্থের প্রয়োজন। সে অর্থ কোথা হইতে আসিবে এদেশের উচ্চশিক্ষার তাহাই সকলের চেয়ে বড় সমস্যা।

প্রাথমিক শিক্ষার সমস্যা

যুদ্ধ শেষ হইতে কয়েক বৎসর কাটিয়া গেল। ইতিমধ্যে আর একবার ভারতবর্ষের শাসনপদ্ধতির সংস্কারের কথা উঠিল এবং ১৯২১ সালে মণ্টেগু-চেমসফোর্ডের পরিকল্পিত সংস্কার প্রবর্তিত হইল। ইহার ফলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে দ্বৈতশাসন শুরু হয়। এই শাসনসংস্কার প্রবর্তন উপলক্ষে দেশে মতভেদ দেখা গেল। দেশের অধিকাংশ নেতাই তাহার বিরুদ্ধে গেলেন। মাত্র কয়েকজন এই সংস্কারব্যবস্থা স্বীকার করিয়া লইলেন; তাঁহারা নবনির্বাচিত ব্যবস্থাপক সভায় যোগ দিলেন এবং মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিলেন। এইভাবে মণ্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কারব্যবস্থার ফলে জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত সদস্যদের মধ্য হইতে নিযুক্ত দেশী মন্ত্রী, ও গভর্নরকর্তৃক নিযুক্ত একজিকিউটিভ কাউন্সিলার এই দুইয়ে মিলিয়া দেশশাসনের ভার লইলেন। ব্যবস্থাপক সভাগুলি আইন করার ব্যাপারে

অনেকখানি স্বাধীনতা লাভ করিল এবং মন্ত্রীগণও কিছু পরিমাণ ক্ষমতা হাতে পাইলেন। অবশ্য আর্থিক ব্যাপারে সমস্ত ক্ষমতাই রহিল গভর্নর ও তাঁহার একজিকিউটিভ কাউন্সিলারদের হাতে।

তখন যুদ্ধের মেঘ কাটিয়া গিয়াছে; কয়েক বৎসর দুঃখকষ্ট ভোগ করার পর দেশে আবার শান্তি ফিরিয়া আসিয়াছে। অর্থের অনটনও কিছুটা কমিয়াছে। সুতরাং তখন আদর্শকে বাস্তবরূপ দান করিবার জন্য চারি দিকে একটা উৎসাহ দেখা গেল। যুদ্ধের সময় সাম্য স্বাধীনতা গণতন্ত্র স্বায়ত্তশাসন প্রভৃতি কয়েকটা আদর্শের কথা বড় করিয়া শোনা গিয়াছিল। যুদ্ধশেষে ইহাদের কয়েকটাকে আংশিকভাবেও বাস্তবে পরিণত করিবার চেষ্টা হইল।

নবনির্বাচিত মন্ত্রীগণ নূতন আদর্শে দেশকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিবার চেষ্টায় প্রথমেই শিক্ষাসংস্কারের কাজ হাতে লইলেন। শিক্ষা-সংস্কারের প্রথম কথা প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার। সুতরাং নূতন ব্যবস্থাপক সভাগুলির প্রথম একটা কাজ হইল প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে আইন তৈয়ারি করা। প্রাথমিক শিক্ষার বিল উপস্থিত করা হইল এবং আইন পাস হইয়া গেল। নবনির্বাচিত ব্যবস্থাপক সভাগুলি এইভাবেই গোখলের পরাজয়ের প্রত্যুত্তর দিল।

১৯২০ হইতে ১৯৩০ সালের মধ্যে ভারতবর্ষের প্রায় প্রত্যেক প্রদেশেই প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে আইন করা হয়। আমাদের বাংলাদেশে প্রথম আইন করা হইল ১৯২০ সালে; সে আইনে শহরে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থা হইল। ১৯২১ সালে যখন গ্রামগুলিকে লইয়া ইউনিয়ন বোর্ডগুলি গঠিত হয় তখন সেগুলিতেও যাহাতে বিশ সালের আইন প্রয়োগ করা যায় তাহার চেষ্টা করা হইয়াছিল। কিন্তু পল্লী-অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের ঠিকমত আইন হইতে আরও কয়েক বৎসর কাটিয়া গেল।

অবশেষে ১৯৩০ সালে বঙ্গীয় পল্লী অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাস হয়।

নূতন আইনে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় নির্বাহের জন্য শিক্ষা-কর ধার্য করার ব্যবস্থা হইল। টাকায় ছয় পাই শিক্ষা-কর। উপরন্ত সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থাও থাকিল; বাংলা-সরকার প্রতি বৎসর শিক্ষা-কর হইতে যাহা আয় হইবে তাহার উপর আরও ২৩ লক্ষ টাকা দিবেন।

তখন হইতে প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনার জন্য নূতন ধরণের এক ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রত্যেক জেলায় প্রাথমিক শিক্ষার জন্য এক বোর্ড গঠিত হইয়াছে; তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে জেলা স্কুল বোর্ড। এতদিন জেলাবোর্ডের উপরই প্রাথমিক শিক্ষার ভার ছিল; এখন তাহার জায়গায় জেলা স্কুল বোর্ডকে সে ভার দেওয়া হইল। জেলা স্কুল বোর্ড শিক্ষা-করের টাকা পাইবে, সরকারী সাহায্যের অংশ পাইবে এবং এই টাকায় জেলায় প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিবে। পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন, শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষকের শিক্ষা, বিদ্যালয় পরিদর্শনের ব্যবস্থা, এ-সকল ব্যাপারই জেলা স্কুল বোর্ডের হাতে থাকিবে। জেলা স্কুল বোর্ড গঠনের পর প্রথম দুইবার অর্থাৎ প্রথম আট বৎসর তাহার সভাপতি হইবেন জেলার ম্যাজিস্ট্রেট; পরে সভ্যগণ তাঁহাদের সভাপতি নির্বাচন করিবেন। আপাতত এইভাবে জেলা স্কুল বোর্ডগুলি আধাসরকারী হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং তাহাদের উপর প্রাথমিক শিক্ষার ভার দেওয়া হইয়াছে।

আগেকার প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম ছিল মোট পাঁচ বৎসরের। নূতন আইনে পাঠ্যক্রমের প্রসার কমাইয়া চার বৎসরের করা হইল এবং তাহার জন্য নূতন পাঠ্যক্রম তৈয়ারি করা হইল। তাহাতে ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থাও হইল। ধীরে ধীরে বাংলাদেশের বহু জেলায় স্কুল বোর্ড গঠিত হইল; কয়েকটা জেলাতে শিক্ষা-করও

বসিল। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের তৈয়ারি করিবার জন্যও ব্যবস্থা করা হইল। মনে হইল বুঝি আমাদের প্রাথমিক শিক্ষার সমস্যা এইবারে মিটিল। কিন্তু কিছুদিন পরেই দেখা গেল, এত আয়োজন ও আইন সত্ত্বেও কার্যত প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার বিশেষ কিছুই হইতেছে না। ইতিমধ্যেই নূতন ব্যবস্থার কতকগুলি ত্রুটি ধরা পড়িয়াছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য যে পাঠ্যক্রম নির্দিষ্ট হইয়াছে চার বৎসরে তাহা ভাল করিয়া শেষ করা যায় না, তাহার জন্য অন্তত পাঁচ বৎসর চাই। জেলা স্কুল বোর্ডগুলিও ঠিকমত কাজ করিতেছে না। বহু ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতা ও স্থানীয় রাজনীতি বোর্ডের কাজে ব্যাঘাত ঘটাইতেছে। সাম্প্রদায়িক অনুপাতে শিক্ষক রাখিতে হইবে, এদিকে সম্প্রদায়বিশেষের মধ্যে উপযুক্ত শিক্ষিত লোক পাওয়া গেল না, সুতরাং অযোগ্য লোককেই লইতে হইল; এমন ব্যাপার বহু স্থানে ঘটিয়াছে এবং ঘটিতেছে। এইভাবে একদিকে যেমন শক্তি ও সুযোগের অপচয় ঘটিতেছে, অন্যদিকে তেমনই অর্থের অভাব বাড়িয়া চলিয়াছে।

বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিকভাবে প্রবর্তন করিতে গেলে কত খরচ হইবে ১৯২২ সালে তাহার একটা হিসাব করা হয়। তাহাতে দেখা যায় শুধু বাংলাদেশেই এই বাবদ দুই কোটি টাকার প্রয়োজন হইবে।

শিক্ষা-কর সর্বত্র বসাইলে ও কর আদায় হইলে এবং সরকারী সাহায্য ঠিকমত পাইলে হয়তো এই খরচের খানিকটা উঠিতে পারে। কিন্তু এই বাংলাদেশেই এখনও সকল জেলাতে জেলা স্কুল বোর্ড গঠিত হয় নাই; শিক্ষা-করও সর্বত্র বসানো হয় নাই এবং কবে যে বসানো হইবে তাহাও বোঝা যাইতেছে না। কারণ আইন করিতে করিতে এদিকে দেশের অবস্থা ১৯২১ সালের তুলনায় অনেকটা খারাপ হইয়াছে, উৎসাহও

মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছে। এইজন্যই ব্যাপকভাবে প্রাথমিক শিক্ষা-আইন প্রয়োগ করা সম্ভবপর হইতেছে না। ফলে আইন হইয়াছে বটে কিন্তু আইন ঠিকমত চালানো যাইতেছে না।

একটা উদাহরণ দিলেই অবস্থাটা স্পষ্ট বোঝা যাইবে। শহরে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের আইন বাংলাদেশে প্রথম হয় ১৯২০ সালে, অথচ তাহার পর এই চব্বিশ বৎসরের মধ্যে (১৯৪৪) কলিকাতা কর্পোরেশনের অল্প একটু অংশ, চট্টগ্রাম ও চাঁদপুর মিউনিসিপ্যালিটি ছাড়া বাংলা-দেশের অন্য কোনো শহরে প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিকভাবে প্রবর্তন করা হয় নাই। বস্তুত সারা ব্রিটিশ ভারতবর্ষে এ পর্যন্ত মাত্র ১৯৪টি শহরে ও চৌদ্দ হাজার গ্রামে আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তিত হইয়াছে। তাহাও শহরগুলিতে যে সর্বত্র পুরাপুরি আবশ্যিক করা হইয়াছে তাহা নহে। সারা কলিকাতার দুইটি মাত্র পাড়ায় এবং বোম্বাই শহরে দুইটি পল্লীতে প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক করা হইয়াছে; শহরে অন্যান্য অংশে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা আগেকার মতই আছে।

প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের দেশে যে আইনগুলি হইয়াছে তাহাদের দাবি অন্য দেশের তুলনায় বেশি নহে। অন্য দেশে যেখানে আট বৎসর আবশ্যিক শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে আমাদের দেশের আইনে সে জায়গায় মাত্র চার বৎসর অর্থাৎ ছয় হইতে দশ বৎসর পর্যন্ত বয়সের ছেলেদের আবশ্যিকভাবে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থার কথা বলা হইয়াছে। অর্থাৎ ঠিক যে বয়সটাতেই সব চেয়ে শিক্ষার দরকার সেই বয়সটাতেই আমাদের ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শেষ করিয়া বিদ্যালয় ছাড়িয়া আসে।

ইতিমধ্যে একটা ব্যাপার সকলের চোখে পড়িয়াছে; আমাদের পাঠশালায় বেশির ভাগ ছাত্রই প্রথম শ্রেণীতেই তাহাদের লেখাপড়া শেষ

করে, তাহার বেশি আর অগ্রসর হইবার সুযোগ পায় না। যদি এক-শ জন ছাত্র প্রথম শ্রেণীতে ভরতি হয় তবে তাহাদের মধ্যে মাত্র কুড়ি জন শেষ পর্যন্ত টিঁকিয়া থাকে অর্থাৎ পুরা চার বৎসর লেখাপড়া শেখে। ইহার ফলে শতকরা আশিজনের জন্য যে অর্থ ও পরিশ্রম ব্যয় হয় তাহা কোনো কাজেই আসে না। সেটা হয় শুধু পণ্ডশ্রম।

এই অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে কয়েকটি কারণে। তাহাদের মধ্যে প্রথম, দেশের জনসাধারণের দারিদ্র্য ; ছেলে রাখালি করিয়া বৎসরে এক টাকা বেতন পাইলেও সেটা সংসারের পক্ষে প্রকাণ্ড লাভ ; সুতরাং পাঠশালায় যাওয়ার চেয়ে রাখালি করার আকর্ষণ বেশি। অন্যদেশে সরকার পরিবারকে সাহায্য করে, বিনা বেতনে লেখাপড়া শেখায়, বিনামূল্যে বইপত্র দেয় ; আমাদের তো সে ব্যবস্থা নাই।

দ্বিতীয় কারণ, আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থা। অন্যদেশের তুলনায় এ ব্যবস্থা নেহাতই নীরস, নিরানন্দ। আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্য এমন মনোরঞ্জক এবং তাহার শিক্ষাব্যবস্থা এমন চিত্তাকর্ষক নহে যাহার ফলে ছেলে রাখালি করার চেয়ে পাঠশালায় যাওয়া বেশি পছন্দ করিবে। সে শিক্ষায় কাহারও মন ভরে না, না শিক্ষকের, না ছাত্রের।

এই প্রসঙ্গে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সকলের চেয়ে বড় সমস্যার উল্লেখ করা উচিত। সে সমস্যা শিক্ষকের সমস্যা ; প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক যদি নিজে শিক্ষিত না হন, তিনি যদি মনোবিদ্যাসম্মত উপায়ে চিত্তাকর্ষক ভাবে ছেলেমেয়েদের শিক্ষা না দিতে পারেন তাহা হইলে সে শিক্ষায় কোনো উন্নতি হইতে পারে না। কিন্তু এরূপ উপযুক্ত শিক্ষক পাইতে হইলে উপযুক্ত বেতন দিতে হইবে, শিক্ষকের ট্রেনিঙের ব্যবস্থা করিতে হইবে, তাঁহাকে নানাপ্রকার সুযোগ-সুবিধা দিতে হইবে এবং পাঠশালাগুলির

আবহাওয়া বদলাইয়া দিতে হইবে। কিন্তু অন্য সব দূরে থাক প্রাথমিক পাঠশালার গুরুমহাশয়দের আমরা যে বেতন দিই তাহাতে কোনো লোকই সে কাজ স্বেচ্ছায় লইতে পারে না। একটা আদালতের পেয়াদাও গুরুমহাশয়ের চেয়ে বেশি বেতন পান; অত কম বেতনে শহরে একটা ভালো চাকরও পাওয়া যায় না। এ অবস্থায় গুরুমহাশয়দের কাছ হইতে বেশি কিছু আশা করা কঠিন। এই সকল কারণেই পূর্বের তুলনায় আজ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রের সংখ্যা বাড়িলেও দেশে লেখাপড়া-জানা লোকের সংখ্যা সেই অনুপাতে বাড়িতেছে না। ১৯৪১ সালের লোকসংখ্যা হইতে দেখিতে পাই, এদেশে লেখাপড়া-জানা লোকের সংখ্যা এখনও শতকরা দশের বেশি হয় নাই।

এই সমস্যার একমাত্র যুক্তিসংগত সমাধান, আবশ্যিক ভাবে প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন। কিন্তু তাহার প্রধান বাধা অর্থের অভাব। সে অভাব আজও ঘুচিল না। যখন দ্বৈতশাসনের আমলে আর্থিক সমস্ত ক্ষমতাই গভর্নর ও তাঁহার একজিকিউটিভ কাউন্সিলারদের হাতে ছিল তখন নাহয় মন্ত্রীগণ বলিতে পারিতেন রাজস্বের ভার তাঁহাদের হাতে নাই, সুতরাং তাঁহারা খরচ জোগাইতে পারেন না; কিন্তু আজ তো রাজস্বের ভার প্রাদেশিক মন্ত্রীদের হাতেই আসিয়াছে; কিন্তু দেখা যাইতেছে তাঁহারাও এ বিষয়ে বিশেষ সুবিধা করিতে পারিতেছেন না। তথাকথিত স্বাধীন মন্ত্রীগণ মন্ত্রিত্ব হারাইবার ভয়ে শিক্ষা-কর বাড়ানো দূরে থাক্ ঠিকমত বসাতেই সাহস পাইতেছেন না। তাঁহারা দেশের লোককে সাহস করিয়া বলিতে পারিতেছেন না, টাকা চাই, টাকা না থাকিলে লেখাপড়া হয় না, ভালো শিক্ষা দিতে গেলে ভালো করিয়া খরচ করিতে হয়। সুতরাং আজও আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিয়া গেলাম; এখনও আমাদের প্রাথমিক শিক্ষাসমস্যার কোনো সমাধানই হইল না।

অবশ্য দোষটা পুরাপুরি মন্ত্রীদের উপর দেওয়া চলে না; কারণ ত্রুটি তাঁহাদের নহে, ত্রুটি আমাদের শাসনব্যবস্থার। ১৯৩৫ সালের ব্যবস্থায় ১৯২১ সালেরই মতো বৈষম্যের সৃষ্টি হইয়াছে, তবে নূতন আকারে। এখন রাজস্ব বাড়াইবার সকল উপায়গুলি গিয়াছে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে, আর খরচ বাড়াইবার সকল চাপ পড়িয়াছে প্রাদেশিক সরকারের উপর। সাধারণত আয়কর, কাস্টমস শুল্ক ইত্যাদিই আয় বাড়াইবার পথ; তাহাদের নিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রাদেশিক সরকারের নহে, ভারত-সরকারের; এমন-কি, যে পাট বাংলার নিজস্ব সম্পত্তি তাহার মুনাফাও ভারত-সরকারের। এ অবস্থায় হয় ভারত-সরকারকে প্রাদেশিক গবর্মেণ্টগুলিকে উপযুক্তমত অর্থ সাহায্য করিতে হইবে, নতুবা প্রাদেশিক সরকারকে রাজস্ব ঠিকমত বাড়াইবার উপায় করিয়া দিতে হইবে। এরূপ ব্যবস্থা না করিলে কোনোদিনই শিক্ষার সংস্কার করা যাইবে না। গবর্মেণ্ট আজও উপযুক্ত পরিমাণ টাকা দিতে পারেন নাই বলিয়াই এদেশে আজও প্রাথমিক দূরে থাক্ কোনোপ্রকার শিক্ষার সংস্কারই সম্ভবপর হয় নাই।

মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কারের চেষ্টা

মণ্টেগু-চেমসফোর্ড পরিকল্পিত শাসনসংস্কার প্রবর্তন করার ব্যাপারে দেশে মতভেদ উপস্থিত হয় এবং এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ কল্পে ১৯২০ সালে গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হয়। তখন বহু ছাত্রছাত্রী সরকারী ও সরকারসম্পর্কিত বিদ্যালয় ছাড়িয়া আসে। তাহাদের শিক্ষার জন্য আবার একবার জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন দেখা দেয়; তখন আর একবার কথা ওঠে জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

এই আন্দোলনের ফলে ১৯২১ সালে আবার বহু জাতীয় বিদ্যালয়

গঠিত হইল ; জাতীয় মেডিকেল কলেজ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় খোলা হইল ; কলিকাতায় গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তন স্থাপিত হইল। পাটনায়, কাশীতে, গুজরাটে বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠিত হইল ; এমন-কি আলিগড়ে (এখন ইহা দিল্লির নিকট সরাইয়া আনা হইয়াছে) জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া অর্থাৎ জাতীয়. মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হইল। ছাত্রের দল সেগুলিতে যোগ দিল। কিন্তু স্বদেশী যুগেরই মত এবারও কিছুদিনের মধ্যেই জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন বন্ধপ্রায় হইয়া আসিল। রাজনৈতিক আন্দোলনের উৎসাহ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। এইজন্যই তাহার সাহায্যে স্থায়ী কিছু সৃষ্টি করা কঠিন। তাহার উপর আবার বাহিরের প্রতিকূলতার সহিত অহরহ লড়াই করিয়া নূতন ব্যবস্থাকে বাঁচাইয়া রাখিতে হয় ; সে কাজ সহজ নহে, বিশেষ করিয়া যখন বাহিরে দীর্ঘদিনের একটা ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে, যে ব্যবস্থা তাহার দীর্ঘজীবনের ভার ও অধিকার লইয়া আপন আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া বসিয়া আছে।

সেদিনকার এই জাতীয় শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে কয়েকটি এখনও কোনোমতে টিঁকিয়া আছে। কিন্তু সেগুলির দ্বারা দেশের সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার- বিশেষ কোনো উপকার হয় নাই। এবারকার জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করা গেল। যে-অঞ্চলে বেশির ভাগ লোক সরকারের উপর নির্ভর করে, সে-অঞ্চলের তুলনায় যে-অঞ্চলে লোকে ব্যবসায় ইত্যাদি বেশি করে সেখানে জাতীয় বিদ্যালয়গুলি ভালো ও বেশিদিন চলিয়াছিল। সরকারী চাকরি করিতে গেলে সরকারী ছাপ চাই। এইজন্যই সরকারী শিক্ষাব্যবস্থার পাশে তাহার সহিত প্রতিযোগিতায় সরকারী সম্পর্করহিত জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার টিঁকিয়া থাকা কঠিন। আমাদের দেশের শিক্ষার ইতিহাসে কয়েকবারই এই কথার সত্যতা প্রমাণ হইয়া গিয়াছে।

জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের একটা দাবি ছিল মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষা দিতে হইবে। এককালে প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাড়া আর সর্বত্রই ইংরেজীর সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া হইত। এখনও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার বাহন ইংরেজী, কিন্তু গত কুড়ি বৎসরের মধ্যে ধীরে ধীরে মাতৃভাষাকে মাধ্যমিক শিক্ষার বাহনরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। অবশ্য এখনও সর্বত্র মাতৃভাষার অধিকার কার্যত ও পুরাপুরিভাবে স্বীকার করিয়া লওয়া হয় নাই; কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এই নীতি আজ সর্বজনস্বীকৃত হইয়াছে। এদেশের শিক্ষার ক্ষেত্রে ইদানীন্তন কালে ইহাকেই সব চেয়ে বড় সংস্কার বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

গত দশ বৎসরের মধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কারের অন্য নানা চেষ্টাও দেখা গিয়াছে। আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থা, বিশেষ করিয়া মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা যে বড় বেশি পুঁথিঘেঁষা, এ অভিযোগ অনেকদিনের। এই অভিযোগ দূর করিয়া মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে ব্যাবহারিক অর্থাৎ হাতে-কলমে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিবার চেষ্টাও মাঝে মাঝে করা হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার পাঠ্যক্রমের সংস্কার করিয়াছেন; অন্যত্রও এই ধরণের চেষ্টা করা হইয়াছে। মাদ্রাজে হাইস্কুলগুলিতে শর্টহ্যাণ্ড, টাইপ রাইটিং, বুক-কিপিং শিখাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ইদানীং এদিকে দেশের লোকের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয় একটি কারণে। আমাদের দেশের শিক্ষিত ছেলেদের মধ্যে বেকার-সমস্যা যে দিনের পর দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে তাহা সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন। আমাদের এদেশের জাতীয় জীবনে এ সমস্যার গুরুত্ব অনেকখানি। সরকারও ইহার গুরুত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। তাঁহাদের ধারণা দেশের অনেক রাজনৈতিক গোলমালের মূলে রহিয়াছে এই শিক্ষিতের বেকার-

সমস্যা। অতএব সকলেই একমত হইয়া সমস্যার সমাধান খুঁজিতেছেন এবং একস্বরে শিক্ষাব্যবস্থাকে ইহার জন্ম দায়ী করিতেছেন। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা একটিমাত্র খাত বাহিয়া চলে, ইহার একমাত্র লক্ষ্য বিশ্ববিদ্যালয়, অথচ অনেকেই সেখানে যাইবে না বা অনেকের সেখানে যাইবার যোগ্যতা নাই। মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যেই তাহাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ করিবার আয়োজন থাকা উচিত; সেখানে ব্যাবহারিক ও হাতেকলমের শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা থাকিলে তাহারা সে শিক্ষা তাহাদের জীবনে প্রয়োগ করিতে পারে; সুতরাং বর্তমান বৈচিত্র্যহীন মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কার করিয়া শিক্ষার ক্ষেত্রে বৈচিত্র্যের আয়োজন করিতে হইবে, সেখানে যন্ত্র (টেকনিকাল), কৃষি, ব্যবসায়ী (কমার্শিয়াল), শিল্প ইত্যাদি নানাধরণের শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে, আবার সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থাও রাখা হইবে; ছাত্রেরা আপন আপন অভিপ্রায়, রুচি ও জীবনের লক্ষ্য অনুযায়ী যাহার যে ভাবের প্রয়োজন সেই ভাবেই শিক্ষা গ্রহণ করিবে। তাহা করিতে পারিলে একদিকে যেমন মাধ্যমিক শিক্ষা সার্থক হইবে, অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাও বহু ব্যর্থতার হাতহইতে মুক্তি পাইবে; তখন সেখানে যাহাদের যে শিক্ষা লাভের যোগ্যতা ও অবসর আছে শুধু তাহারাই যাইবে। আজ যেমন সকলকেই বাধ্য হইয়া সেখানে যাইতে হয় তেমন আর হইবে না। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার আপনা হইতেই হইয়া যাইবে। এই ধরণের কথা আজকাল অনেকের মুখেই শোনা যাইতেছে।

কথাটা যখন উঠিয়াছে তখন এইখানেই বলা ভালো। দেখা গিয়াছে যখনই আমাদের জাতীয় জীবনে কোনো ত্রুটি ধরা পড়ে তখনই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকেই এই ত্রুটির জন্ম দায়ী করা হয়; অপবাদ গিয়া পড়ে তাহারই উপর। আমাদের শিক্ষাই যেন সকল অন্যায়ের মূল। বাস্তব মনেও হয় তাই; বুঝি শিক্ষার সংস্কার করিলে ত্রুটিগুলি আপনা হইতেই দূর

হইবে, এবং সকল দুঃখের অবসান ঘটিবে। কিন্তু ব্যাপার তো সেরূপ নহে। শিক্ষার ক্ষমতা অনেকখানি এ কথা ঠিক; কিন্তু এই শিক্ষাই পদে পদে অন্ত বহু শক্তির দ্বারা প্রভাবিত হইতেছে; বস্তুত তাহারাই শিক্ষাকে পরিচালিত করিতেছে। এই শক্তিগুলির মধ্যে রাজনীতিই প্রধান। প্রকৃতপক্ষে রাজনীতিই শিক্ষাকে প্রতিপদে নিয়ন্ত্রিত করে, তাহার কার্যকারিতা কমায় বাড়ায়, তাহার রূপান্তর সাধন করে। তাই রাজনীতিকে বাদ দিয়া শিক্ষার আলোচনা করিলে সে আলোচনা অবাস্তব হইয়া উঠে। যেমন দেখা যাক বেকার-সমস্যা ও মাধ্যমিক শিক্ষার কথা। ধরিয়াই লওয়া যাক যে মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কার করিয়া আমরা সেখানে যন্ত্র, শিল্প, ব্যবসায়, কৃষি ইত্যাদি নানা ধরণের শিক্ষার আয়োজন করিলাম, ছেলেরাও বিশ্ববিদ্যালয়ে না গিয়া এই ধরণের শিক্ষা লাভ করিল। তাহা হইলেই কি আপনা হইতেই বেকার-সমস্যার সমাধান হইবে? তাহা হইলেই অমনি কি ছেলেদের কাজ জুটিয়া যাইবে? না, তাহা হয় না। কারণ আদতে সমস্যাটা বেকার-সমস্যা নহে, বে-পেশা-সমস্যা। কাজের নহে, দেশে নানা রকমের পেশারই অভাব ঘটিয়াছে। পেশা নির্ভর করে জাতির অর্থনৈতিক জীবনের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের উপর। দেশে ব্যবসায় ও শিল্প বাণিজ্যের প্রসার না হইলে যন্ত্রশিক্ষাই বলুন, ব্যবসায়শিক্ষাই বলুন সকল প্রকার শিক্ষাই ব্যর্থ। এদিকে এদেশে শিল্পবাণিজ্যের প্রসার মুখ্যত রাজনীতির সমস্যা, অর্থনীতির নহে। সুতরাং আমরা বিদ্যালয়ে যন্ত্রশিক্ষা দিলাম আর দেশের সর্বত্র নানারকমের যন্ত্রশিল্প গড়িয়া উঠিল, এমন হয় না। দেশে যন্ত্রশিক্ষার তেমন ব্যবস্থা নাই অথচ বড় বড় কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে ইহার প্রমাণ আমরা রাশিয়ায় পাইয়াছি। অতএব এভাবের যুক্তি না তোলাই ভালো। তবে চুপ করিয়া বসিয়া থাকা ভালো দেখায় না, সুতরাং শিক্ষাসংস্কারের চেষ্টাই না হয় করা যাক।

১৯৩০ হইতে ১৯৩৫ সালের মধ্যে যুক্তপ্রদেশ ও পাঞ্জাবে এই ধরণের শিক্ষা সংস্কারের কথা উঠিল। যুক্তপ্রদেশের গবর্মেণ্ট স্যর তেজ বাহাদুর সপ্রুর নেতৃত্বে বেকার-সমস্যাআলোচনার জন্য এক কমিটি নিয়োগ করেন। সেই সপ্রু-কমিটি প্রস্তাব করেন, শিক্ষাব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরের হেরফের করিয়া মাধ্যমিক স্তরে নানা ধরণের ব্যাবহারিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এখনকার দুইটি ইণ্টারমিডিয়েট ক্লাসের প্রথমটি ইস্কুলের সঙ্গে জুড়িয়া ইস্কুলের পাঠ্য এগারো বৎসরের করিতে হইবে এবং শেষেরটি বি.এ,র সহিত জুড়িয়া দিয়া বি.এ পরীক্ষার পাঠ্য তিন বৎসরের করিয়া দিতে হইবে। ইণ্টারমিডিয়েট বলিয়া আর কিছু থাকিবে না। ইস্কুলের এগারো বৎসরের দুইটা বড় ভাগ হইবে প্রাথমিক পাঁচ বৎসর ও মাধ্যমিক ছয় বৎসর। মাধ্যমিক ছয় বৎসরে আবার দুইটা ভাগ থাকিবে, নিম্ন-মাধ্যমিক তিন বৎসর ও উচ্চ-মাধ্যমিক তিন বৎসর। এই শেষ তিন বৎসর সাধারণ ছাড়া কৃষি, শিল্প যন্ত্র, ব্যবসায় ইত্যাদি নানাভাবের শিক্ষার আয়োজন করা হইবে। মোটামুটি ব্যবস্থাটা কতকটা এই ভাবের।

ভারত-সরকারের শিক্ষা বিষয়ে যে কেন্দ্রীয় পরামর্শ-সমিতি আছে তাহাতেও এই ধরণের প্রস্তাব করা হয়। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিদের লইয়া বিশ্ববিদ্যালয়সম্পর্কিত সমস্যাগুলির আলোচনার জন্য যে ইণ্টার-ইউনিভার্সিটি বোর্ড আছে তাহাও এই প্রস্তাব সমর্থন করেন।

কিন্তু এ পর্যন্ত এই প্রস্তাব অনুযায়ী শিক্ষাব্যবস্থা-সংস্কারের বিশেষ কোনো চেষ্টা হয় নাই। বাংলাদেশে তো এখন বাদবিতণ্ডা চলিয়াছে কে মাধ্যমিক শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ করিবে তাহাই লইয়া। তবে সম্প্রতি দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় আংশিকভাবে এই ব্যবস্থার প্রবর্তন করিয়াছে। সেখানে হায়ার সেকেণ্ডারি স্কুল (উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়) নামে এক নূতন ধরণের মাধ্যমিক বিদ্যালয় গঠিত হইয়াছে। সেখানে আমাদের হিসাবে

এগারো বৎসর শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইতেছে। দিল্লিতে এখন হইতে কলেজগুলি তিন বৎসর পড়াইয়া বি.এ. ডিগ্রি দিবে।

আর এক নূতন পরীক্ষা দিল্লিতে করা হইতেছে। সেখানে পলিটেকনিক নামে এক নূতন ধরণের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। সেখানে সাধারণ ও ব্যাবহারিক শিক্ষার সমন্বয় সাধনের চেষ্টা চলিয়াছে। পলিটেকনিকের আদর্শ এদেশে নূতন নহে; আমাদের বাংলাদেশেই পলিটেকনিক নামধেয় বিদ্যালয় আছে, সেখানে কিছু পরিমাণ যন্ত্রশিক্ষার আয়োজনও হয়তো আছে, কিন্তু সেগুলি নেহাত গৌণভাবে। সেখানে সাধারণ শিক্ষার উপরই জোর দেওয়া হইয়াছে।

পুরাতন যুগ গেল, আমরা আজ নূতন এক যুগে আসিলাম; তাহার বিশেষত্ব যন্ত্রের ব্যবহার। এই যন্ত্রযুগে যে নূতন সমন্বয়ের প্রয়োজন আমাদের বিদ্যালয়ে তাহার আয়োজন কোথায়, এই প্রশ্নই আজ উঠিয়াছে। যন্ত্রহীন পুরাতন যুগে আমরা ফিরিতে পারিব না, ফিরিব না; অথচ নূতন এই যন্ত্রযুগে যদি নূতনভাবে জীবন গড়িয়া না তুলিতে পারি তবে যে-যন্ত্র মানুষের দাস হইবার কথা তাহাই আমাদের প্রভু হইয়া উঠিবে এবং মানুষের সৃষ্টির কাছে মনুষ্যত্বের লাঞ্ছনা ও পরাজয় ঘটিবে। বর্তমান যুগের ইহাই সকলের চেয়ে বড় সমস্যা।

এ সমস্যার সমাধান শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে মুখ্যত নহে, ইহার সমাধান করিতে হইবে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে। সেখানে নূতন আদর্শে নূতন প্রেরণা লইয়া নূতন ভাবে চলিতে হইবে; শুধু এখানে একটু ওখানে একটু এইভাবে হেরফের করিয়া শিক্ষাসংস্কারের চেষ্টা করিলে সমস্যার সমাধান হইবে না; তাহার প্রকৃতিগত পরিবর্তন করিতে হইবে। কিন্তু ব্যাপকভাবে সেরূপ কোনো পরিবর্তনের চেষ্টা আমাদের দেশে আজও করা হয় নাই।

ওয়ার্ধা পরিকল্পনা ও বুনিয়াদি শিক্ষাপদ্ধতি

শিক্ষার প্রাথমিক স্তরেও মৌলিক পরিবর্তন করা প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে। এদেশে প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক করা সকলের আগে দরকার এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শিক্ষার প্রকৃতি বদলাইতে হইবে; প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের ও পাঠনারীতির পরিবর্তন করিতে হইবে; বিদ্যালয়গুলির মৌলিক রূপান্তর সাধন না করিতে পারিলে, শিক্ষার ভিত্তি নূতনভাবে গড়িয়া না তুলিতে পারিলে আমাদের জাতীয় জীবন নূতনভাবে গড়িয়া তোলা সম্ভব হইবে না।

এই উদ্দেশ্যে ১৯৩৭ সালে গান্ধীজী শিক্ষাসংস্কারের এক নূতন পরিকল্পনা রচনা করেন এবং ১৯৩৮ সালে তাঁহার অনুপ্রেরণায় বুনিয়াদি শিক্ষার (basic education) পরিকল্পনা রচিত হয়। ওয়ার্ধা পরিকল্পনা সম্বন্ধে অনেকের মনে ভুল ধারণা আছে; সুতরাং ইহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

বুনিয়াদি শিক্ষা-পরিকল্পনায় সাত হইতে চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত বয়সের ছেলেমেয়েদের জন্য সাত বৎসরের আবশ্যিক শিক্ষার কথা বলা হইয়াছে। সাত বৎসরের কমে কোনোমতে হয়তো লেখা ও পড়া শেখানো অর্থাৎ অক্ষরজ্ঞান দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহাতে প্রকৃত শিক্ষার ভিত্তি স্থাপিত করা চলে না। বিশেষ করিয়া কতকগুলি অবশ্যশিক্ষণীয় বিষয় আছে যেগুলি খুব ছোট বয়সে শেখানো যায় না।

আরও একটি কারণে চৌদ্দ বৎসর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের ইস্কুলে রাখার ব্যবস্থা করা দরকার। ইহার কিছু আগেই বয়ঃসন্ধিকাল গিয়াছে; সেটা জীবনের খুব সঙ্গীন সময়; সেই সময়টাতে ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয়ের আবহাওয়ার মধ্যে রাখিতে পারিলে অনেক লাভ হয়। সাধারণ ব্যবস্থায়

দশ-এগারো বৎসর বয়সেই আবশ্যিক শিক্ষা শেষ করা হয় ; এই যে কারণ উল্লেখ করিলাম তাহার জন্যই বর্তমান ব্যবস্থার পরিবর্তন করা উচিত।

বুনিয়াদি শিক্ষা পরিকল্পনায় পাঠ্যক্রমেরও প্রকৃতিগত কিছু হেরফের করা হইয়াছে। তাহাতে নানারকমের হাতে-কলমে কাজের এবং অন্যান্য সাধারণ বিষয়গুলি শিখাইবার ব্যবস্থা আছে। ইহাতে ইংরেজীর স্থান নাই, তাহার পরিবর্তে রাষ্ট্রভাষা হিন্দুস্থানী শিখাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহার সব চেয়ে বড় কথা, মাতৃভাষাকে আগাগোড়া শিক্ষার বাহনরূপে ব্যবহার। গান্ধীজী মনে করেন মাতৃভাষাকে বাহনরূপে ব্যবহার করিয়া এবং শিক্ষাপ্রণালীর সংস্কার করিয়া আমরা সাত বৎসরে যে জ্ঞান ছাত্রদের দিতে পারিব, তাহা বর্তমানে ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পাস করিয়া যাহা শেখে তাহার তুলনায় কম হইবে না, বরং কোনো কোনো বিষয়ে হয়তো বেশিই হইবে।

বুনিয়াদি শিক্ষা-দর্শনের গোড়াকার কথা, জীবনে প্রতিদ্বন্দ্বিতানীতির পরিবর্তে সহযোগিতানীতির প্রবর্তন এবং সহযোগের ভিত্তিতে সমাজের পুনর্গঠন। আমাদের বর্তমান সমাজব্যবস্থায় আমরা হিংসা ও হানাহানিকেই জীবনের মুখ্য প্রেরণা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছি। মানুষে মানুষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে, এ উহাকে পরাজয় করিয়া জয়ের ফলভোগ করিবে, যে পরাজিত হইবে সে পিছনে পড়িয়া থাকিবে, এই ব্যবস্থাকেই আমরা স্বাভাবিক মনে করিয়াছি এবং জীবনসংগ্রাম, যোগ্যতমের উদ্বর্তন এই বৈজ্ঞানিক মতবাদকে অভ্রান্ত ভাবিয়া প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়ম বলিয়া ধরিয়া লইয়াছি। এই নীতির ভিত্তিতে যে সমাজ গড়িয়া ওঠে স্বভাবতই তাহাতে যুদ্ধবিগ্রহ মারামারি হানাহানি চলে ; আমাদের সমাজেও তাই হইয়াছে। এ কথা সত্য পৃথিবীতে যোগ্যতমের উদ্বর্তন ঘটে; কিন্তু তাহাই একমাত্র সত্য নহে ; প্রাণীজগতে শুধু ভোগ বা সংগ্রামই একমাত্র নীতি

নহে, সেখানে ত্যাগ ও সহযোগিতা-নীতির লীলাও পাশাপাশি চলিতেছে ; মানুষে মানুষে মিলিয়া সমাজ গড়িতেছে, একে অপরের জন্য ত্যাগ করিতেছে, আত্মবিসর্জন করিতেছে। সুতরাং যদি জীবনে এই সহযোগিতার নীতিকে আমরা বড় করিয়া দেখিতে পারি, যদি ছেলে-মেয়েদের মনে এই নীতির অনুপ্রেরণা দিতে পারি, তাহা হইলে হয়তো এমন এক সমাজ একদিন গড়িয়া উঠিবে যেখানে মানুষ পরের সহিত মিলিয়া চলাকে, পরের জন্য ত্যাগ করাকেই জীবনের চরম প্রেয় বলিয়া মনে করিবে। তখন মানুষ অপরকে হিংসা না করিয়া ভালবাসিবে ; এবং সেদিন আমাদের পরস্পরের সম্বন্ধ প্রেমের ভিত্তিতে রচিত হইবে।

এই যে নূতন আদর্শের কথা বলিতেছি জীবনের প্রথম হইতেই ছেলেমেয়েদের সেই শিক্ষা দিতে হইবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়েই সেই শিক্ষা আরম্ভ করিতে হইবে। সেইখানেই ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের মনে এই সহযোগিতার আদর্শের বীজ বপন করিতে হইবে, ছোটবেলা হইতেই কাজে ও কথায় তাহাদের শিখাইতে হইবে সকলকে লইয়া সকলের সহিত মিলিয়া মিশিয়াই জীবনে চলিতে হয় এবং তাহাই জীবনের লক্ষ্য।

কর্ম ও চিন্তা উভয় ক্ষেত্রেই মানুষে মানুষে মিলন হইতে পারে ; কিন্তু মনোবিকাশের একটা স্তরে কর্মের ক্ষেত্রে মিলন সহজ ও প্রশস্ত। সুতরাং বিদ্যালয়-সমাজে একত্রে কর্ম করিবার সুযোগ দিতে হইবে। সেখানে ছাত্রছাত্রীগণ একত্রে কাজ করিবে, একত্রে খেলাধুলা আনন্দ-উৎসব করিবে। সেখানে কর্মকে কেন্দ্র করিয়া শিক্ষা চলিবে, শুধু পুঁথিকে আশ্রয় করিয়াই নহে। বস্তুত যে শিক্ষা আমরা অহরহ জীবনে প্রয়োগ করি তাহার বেশির ভাগ আমরা পাই কাজের ভিতর দিয়াই, পুঁথির ভিতর দিয়া নহে। যে বিদ্যা আমরা হাতেকলমে শিখি সেই

বিদ্যাই আমাদের জীবনে সব চেয়ে কার্যকরী হয়। সুতরাং বিদ্যালয়ে হাতেকলমে কাজের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

বুনিয়াদি শিক্ষার একটি বিশেষত্ব তাহাতে কোনো একটি বিশেষ শিল্পকে কেন্দ্র করিয়া শিক্ষার আয়োজন করা হইয়াছে। যেমন ধরা যাক চরকা ও তাঁতশিল্প, কৃষি বা কাঠের কাজ; ইহাদের মধ্যে যেটিকে নির্বাচন করা হইবে তাহাকে কেন্দ্র করিয়া অন্য সব শিক্ষা চলিবে। যদি চরকা ও তাঁতকে কেন্দ্রীয় শিল্পরূপে নির্বাচন করা যায় তাহা হইলে সেখানে প্রথম হইতেই ছেলেমেয়েরা বেশির ভাগ সময় চরকার কাজ শিখিবার জন্য দিবে এবং প্রধানত সেই উপলক্ষ্য করিয়াই সাহিত্য ভূগোল ইতিহাস অঙ্ক ইত্যাদি সকল বিষয় আলোচনা করিবে। এইভাবে যে অনেক কিছু শেখানো যায় তাহা পরীক্ষিত সত্য। অবশ্য যেটুকু এই উপায়ে শেখানো যাইবে না তাহার জন্য সাধারণভাবে পড়াইবার ব্যবস্থা থাকিবে। কিন্তু মোটের উপর শিল্পকেন্দ্রিক শিক্ষার উপরই জোর দেওয়া হইবে।

এ কথা হয়তো কেহ ভাবিতে পারেন, পুরাতন ব্যবস্থার সহিত একটা যে-কোনো বৃত্তিমূলক শিক্ষা জুড়িয়া দিলেই তো এইরূপ হইবে। বস্তুত কিন্তু তাহা নহে। পুরাতন ব্যবস্থায় শিল্পকে কেন্দ্রে স্থান দেওয়া হয় নাই; সেখানে পুঁথির প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ; সেখানে পুঁথিই মুখ্য এবং হাতের কাজ গৌণ স্থান পাইয়াছে।

এ কথা উঠিতে পারে যে বুনিয়াদি শিক্ষাব্যবস্থা বৃত্তিশিক্ষার রূপান্তর মাত্র; কিন্তু তাহা সত্য নহে; সকলকে তাঁতি বা ছুতোর করা ইহার লক্ষ্য নহে; কারণ দেশে তাঁতি ও ছুতোরের অভাব নাই। তাহাদেরই অন্ন জোটে না, তাহার উপর আরও তাঁতি ছুতোর তৈয়ারি করিলে পূর্বতনদের দুঃখও বাড়িবে, যাহারা নূতন শিখিবে তাহাদেরও অন্ন জুটিবে না।

এ কথা সত্য যে গান্ধীজী আশা করিয়াছিলেন যে এই ভাবে হাতের কাজ শিখাইয়া যে অর্থ উপার্জন হইবে তাহা হইতে বিদ্যালয়ের খরচ অনেকটা উঠিতে পারে। যে-দেশে অর্থের অভাবে শিক্ষার প্রসার হয় না সে-দেশে যদি কেহ বিদ্যালয়গুলিকে স্বাবলম্বী করিতে বলেন তাঁহাকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু নানাকারণে স্বাবলম্বনের এই আদর্শ শিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রহণীয় নহে। বস্তুত বুনিয়াদি শিক্ষার পূর্ণ পরিকল্পনায় হাতের কাজের ব্যাপারে স্বাবলম্বনের উপর মোটেই জোর দেওয়া হয় নাই। অনেকেই সে কথা জানেন না বলিয়া তাঁহাদের মনে এ বিষয়ে আজও ভুল ধারণা রহিয়া গিয়াছে।

হাতের কাজের একটা বিশেষ উপযোগিতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা এই প্রসঙ্গে প্রয়োজন; কারণ এই জন্যই বুনিয়াদি শিক্ষাব্যবস্থায় ইহাকে এতখানি প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে।

মনোবিদ্যায় বলে, মন ও ইন্দ্রিয়গুলির যোগ অতি ঘনিষ্ঠ এবং আমরা শুধু মন দিয়াই শিখি না, সব ইন্দ্রিয় দিয়া শিখি। আঙুলগুলি নিপুণ-ভাবে পরিচালনা করিতে শিখিলে সঙ্গে সঙ্গেই বুদ্ধির নৈপুণ্য লাভ হয়, মনের বিকাশ ঘটে। সুতরাং পুঁথিই বুদ্ধিবৃত্তি চর্চার একমাত্র উপায় নহে, অন্য উপায়ও আছে। এবং সে উপায়গুলিকে যত বেশি পরিমাণে প্রয়োগ করা যায়, বুদ্ধির বিকাশও তত বেশী হয়। সেইজন্যই বিদ্যালয়ে হাতের কাজের এবং নানারকম শিল্পশিক্ষার প্রয়োজন, শুধু বৃত্তি শিখাইবার জন্য নহে, মানসিক ভাব ও বৃত্তিগুলির অনুশীলনের জন্য।

তাহা ছাড়া আরও একটি কারণ আছে। মুখে আমরা যাহাই বলি-না কেন আমরা পুঁথিকে বড় ও হাতের কাজকে ছোট করিয়া দেখি। পুঁথির কৌলীন্যের বিচারে আমাদের সমাজকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করিয়াছি। যাহারা পুঁথি ও নিছক বুদ্ধির চর্চা করে, সেই বুদ্ধিজীবীরা একভাগে, আর

এক ভাগে যাহারা শ্রমজীবী, যাহারা হাতের কাজ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। এ কথা আজ জোর করিয়া বলা দরকার হইয়াছে যে সমাজদেহের এই ভাগ সামাজিক ঐক্যের পরিপন্থী ; ইহা দূর করিতে না পারিলে আমাদের কল্যাণ নাই। সেইজন্যই জাতীয় জীবনের সর্বত্র এবং বিশেষ করিয়া শিক্ষাব্যবস্থায় এই অন্যায় ভেদের প্রতিকার সাধনের চেষ্টা করিতে হইবে। বিদ্যালয়ব্যবস্থায় আমরা যদি প্রথম হইতেই হাতের কাজকে তাহার উপযুক্ত মর্যাদা দিতে পারি, যদি ছোটবেলা হইতেই ছেলে-মেয়েদের শিখাইতে পারি যে বুদ্ধিজীবী ও শ্রমজীবীর মধ্যে সম্মানের কোনো প্রভেদ নাই, সমাজে উভয়েরই প্রয়োজন আছে, তাহা হইলে হয়তো আজ সমাজে বুদ্ধিজীবী ও শ্রমজীবীর মধ্যে যে অন্যায় প্রভেদ আমরা করিয়াছি তাহা অনেক পরিমাণে দূর হইবে এবং উভয়ে উভয়কে বুঝিতে ও শ্রদ্ধা করিতে শিখিবে।

আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় পুঁথির বোঝা ক্রমশ বাড়িয়াই চলিয়াছে ; সে বোঝার চাপে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরিচালনা করার ক্ষমতা পিষ্ট ও নষ্ট হইযা যাইতেছে। হয়তো বুনিয়াদি শিক্ষাব্যবস্থায় হাতের কাজের ভিতরে ছেলেমেয়েরা স্বাধীনতার ও সৃষ্টি করিবার আনন্দের কিছু পরিমাণ আস্বাদ লাভ করিবে। মানুষের সহজাত ভাব, বৃত্তি ও শক্তিগুলির মধ্যে সৃষ্টি করিবার শক্তি অন্যতম। সকল মানুষই অল্পবিস্তর পরিমাণে এই শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং নানাভাবে তাহাকে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করে। প্রত্যেকের এই শক্তি বিকাশের পথ ও উপায় স্বতন্ত্র। সকলেই যে একই ভাবে একই রকমে সৃষ্টি করে এমন নহে। কেহ ছবি আঁকে, কেহ গান গায়, কেহ বা নূতন নূতন আবিষ্কারের নেশায় বিভোর হইয়া চলে; কেহ আবার এই শক্তিরই প্রেরণায় নূতন ভাবে মানুষ বা সমাজ গড়িবার কাজে নিজেকে উৎসর্গ

করে। ক্ষুদ্রতম শিশু হইতে প্রতিভাশালী শিল্পী বা কবি পর্যন্ত সকলেই আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজিতেছে এবং আপন আপন শক্তি ও সুযোগ অনুযায়ী নিজেকে প্রকাশ করিতেছে। ইহাই জীবনের ধর্ম। ইহাকেই আমরা ব্যক্তিত্বের বিকাশ বলি। জীবন এই বিকাশের সাধনা। এই বিকাশের সুযোগ পাইলে জীবনে আনন্দ ভরিয়া ওঠে। সে আনন্দ চারিদিকে উৎসারিত হইয়া ব্যক্তি ও সমাজকে ধন্য করে। আত্ম-প্রকাশের এই পথ অবরুদ্ধ হইলে ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশে বাধা ঘটে। শুধু তাহাই নহে, অবরুদ্ধ পুঞ্জীভূত ভাবগুলি সহজভাবে প্রকাশের পথ না পাইয়া মনোজগতে নানা বিপ্লবের সৃষ্টি করে এবং ফলে জীবনে অতৃপ্তি ও দুঃখতাপ ঘনীভূত হইয়া ওঠে। কিন্তু শুধু ব্যক্তির জীবনেই ইহার শেষ নহে, ইহার ফল শেষ পর্যন্ত সমাজদেহে সংক্রামিত হয় এবং অতৃপ্ত ক্ষুধিত মানবাত্মা সমাজকে হিংসাদ্বন্দ্বের পথে ধ্বংসের দিকে টানিয়া লইয়া যায়। এই জন্যই মানুষ যে সৃষ্টি করিবার শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, যাহার স্বাধীন প্রকাশে তাহার সকলের চেয়ে বড় তৃপ্তি ও আনন্দ, বিদ্যালয়-ব্যবস্থায় সেই শক্তি বিকাশের নানারূপ সুযোগ দিতে হইবে। নানারকম হাতের কাজের মধ্যে সেই শক্তির আত্মপ্রকাশের সুন্দর সুযোগ আছে। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার তুলনায় বুনিয়াদি শিক্ষাব্যবস্থায় হাতের কাজের অধিকতর সুযোগ আছে বলিয়াই ওয়ার্ধা-পরিকল্পনা সকলেব সমর্থন করা উচিত।

এই নূতন পরিকল্পনা লইয়া দেশে নানারূপ আলোচনা হইয়া গিয়াছে, একদল ইহার পক্ষে গিয়াছেন এবং আর একদল বিপক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু ভারত-সরকারের শিক্ষাবিষয়ক কেন্দ্রীয় পরামর্শ সমিতি এই পরিকল্পনার মূলনীতিগুলি প্রায় পুরাপুরিই সমর্থন করিয়াছেন। যখন কংগ্রেসী মন্ত্রীগণ মন্ত্রিত্ব করিতেছিলেন তখন কয়েকটি প্রদেশে

এই পরিকল্পনানুযায়ী কাজ আরম্ভ করা হয়। বোম্বাইয়ে বিহারে যুক্তপ্রদেশে এবং উড়িষ্যায় বহু বুনিয়াদি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, শিক্ষকদের শিক্ষা দিবার ব্যবস্থাও করা হয এবং সকলেই পরম উৎসাহে এই পরীক্ষায় যোগ দেয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব ছাড়িয়া দিবার পর এই উৎসাহ মন্দীভূত হইয়া যায়। তখন যাঁহারা দেশ-শাসনের ভার লন অনেক ক্ষেত্রেই তাঁহাদের এই পরিকল্পনার প্রতি শ্রদ্ধা ছিল না; সুতরাং বহু স্থানেই পরীক্ষা বন্ধ হইয়া যায় এবং পুরাতন ব্যবস্থা নূতন করিয়া শুরু হয়। ইহার চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কি হইতে পারে? নূতনভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার মত বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি এখনও আমাদের শাসনকর্তাদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না; গবেষণাগারে দীর্ঘদিন ধরিয়া পরীক্ষা করিয়া অবশেষে বৃহত্তর ক্ষেত্রে পরীক্ষিত সত্য প্রয়োগ করিবার মত ধৈর্য বিশ্বাস ও শক্তির আমাদের মধ্যে বড় অভাব। এইজন্যই আকস্মিক উৎসাহ ছাড়া শিক্ষা-সংস্কারের অন্য কোনো প্রেরণা আমাদের দেশে সম্ভব হয় না। তাই মনে হয়, যদি কোনোদিন জাতীয় জীবনে বিপ্লবের ফলে বা অন্য কোনো কারণে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা একেবারে নষ্ট হইয়া যায় তবেই হয়তো এদেশে শিক্ষাসংস্কার সম্ভব হইবে, নতুবা নহে।

আমাদের সমস্যা

আমাদের দেশের শিক্ষার ক্ষেত্রে সকলের চেয়ে বড় সমস্যা কি, যদি কেহ এই প্রশ্নের সংক্ষেপে উত্তর চান তাহা হইলে বলিব, এদেশে এখনও জাতীয় শিক্ষার পত্তন হয় নাই। জাতীয় শিক্ষার প্রধান লক্ষণ তিনটি। প্রথম লক্ষণ, এই ব্যবস্থায় দেশের সর্বশ্রেণীর সর্বলোকের প্রয়োজনমত শিক্ষার আয়োজন থাকে। শুধু একটা বিশেষ বয়সের বা বিশেষ ধরণের শিক্ষার

ব্যবস্থা থাকিলেই তাহাকে জাতীয় শিক্ষা বলা যায় না। প্রত্যেক মানুষের প্রকৃতি রুচি ও প্রয়োজন ভিন্ন, সেই প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন ধরণের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হয়। জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় তাই সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে যন্ত্র শিল্প কলা ইত্যাদি সকল প্রকার শিক্ষার, এবং বয়সভেদে শিশুশিক্ষা হইতে বয়স্কশিক্ষা পর্যন্ত সকল স্তরের শিক্ষার আয়োজন থাকে। যে-দেশে শতকরা দশজন লোকও অক্ষরজ্ঞান লাভ করে নাই সে-দেশে যে জাতীয়-শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে এ কথা বলা যায় না। অন্য দেশে যখন দুই-তিন বৎসরের শিশুরা নার্সারি বিদ্যালয়ে খেলা করিয়া নাচিয়া গান গাহিয়া শিক্ষার ও জীবনের বুনিয়াদ রচনা করিতেছে, যখন শ্রমিকেরা দিনের শেষে বিদ্যালয়ে উচ্চতর শিক্ষালাভ করিয়া নিজের ও সমাজের অধিকতর কল্যাণ সাধন করিতে শিখিতেছে, যখন সেখানে আবশ্যিক বিদ্যাশিক্ষার বয়স বাড়াইয়া ষোল বৎসর করার ব্যবস্থা হইতেছে তখন আমরা ছয় হইতে দশ বৎসর এই চার বৎসরের ছেলেদের শিক্ষাও আবশ্যিক করিতে পারিতেছি না, দেশের মেয়েদের লেখাপড়া শিখাইতে পারিতেছি না, দেশের বয়স্কদের শিক্ষার কোনো ব্যবস্থা করিতে পারিতেছি না। সুতরাং কেমন করিয়া বলিব, আমাদের জাতীয়-শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে? ইদানীং মেয়েদের শিক্ষার প্রতি কিছু পরিমাণ দৃষ্টি গিয়াছে সত্য; কিন্তু এখনও এদেশে শতকরা চারজন মেয়েও লেখাপড়া জানে না। এ অবস্থায় জাতীয়-শিক্ষার কথা না বলাই বোধ হয় ভাল।

মেয়েদের শিক্ষা সম্বন্ধে একটা বড় সমস্যার সমাধান এখনও আমরা করি নাই; তাহাদের কোন্ ধরণের শিক্ষা দিব, কি ভাবে লেখাপড়া শিখাইব, এ প্রশ্নের এখনও ঠিকমত উত্তর দেওয়া হয় নাই। এ বিষয়ে আমরা অন্ধভাবে আমাদের বিদেশী গুরুর অনুসরণ করিতেছি। অনুসরণ করা অবশ্য দূষণীয় নহে, যদি তাহা অন্ধ না হয়। আমাদের সমাজ-

ব্যবস্থায় মেয়েদের যে স্থান আমরা দিয়াছি বা দিব তাহাদের শিক্ষা তাহার অনুযায়ী হওয়া চাই। কিন্তু এই আদর্শের সহিত আমাদের ব্যবহারের বিশেষ মিল নাই। মেয়েদের আমরা লেখাপড়া শিখাইতেছি বটে, কিন্তু শ্রদ্ধার সহিত নহে, নেহাতই ফ্যাশনের খাতিরে বা কয়েকটা ব্যাপারে সুবিধা পাইবার জন্য। বস্তুত আমরা ছেলেদের শিক্ষাও যেমন জ্ঞানের জন্য নহে, অর্থলাভের জন্যই দিই, মেয়েদেরও তেমনি সুবিধারই জন্য বিদ্যালয়ে পাঠাই। জ্ঞানের প্রতি আমাদের লোভ নাই, শ্রদ্ধাও নাই; তাই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় পদে পদে এত ব্যর্থতা জমিয়া উঠিয়াছে।

সারা জীবন ধরিয়াই শিক্ষা চলে এবং বিদ্যালয়ের অঙ্গন ছাড়াইলেও জ্ঞান আহরণ শেষ হয় না, এ কথা এককালে এদেশের লোকে জানিত। তাহারা এ কথাও জানিত যে, লেখাপড়া শিখিলেই শিক্ষা শেষ হয় না; তাই তখন এদেশে লোকশিক্ষার জন্য যাত্রা কথকতা প্রভৃতি নানাপ্রকারের অনুষ্ঠান ছিল এবং সেগুলি সমাজ-জীবনের অপরিহার্য অঙ্গস্বরূপ ছিল। লোকশিক্ষার এই পুরাতন ব্যবস্থা নষ্টপ্রায় হইয়াছে অথচ তাহার স্থানে অন্য কোনো নূতন ব্যবস্থা এখনও করা হয় নাই। এই জন্যই বয়স্কশিক্ষাব্যবস্থার এত প্রয়োজন। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা দেশের অতি অল্প লোকেরই জন্য; দেশের বেশির ভাগ লোক শিক্ষার সে স্তরে গিয়া পৌঁছিবে না। তাহাদের জন্য প্রথম ও শেষ স্তরের শিক্ষা অর্থাৎ প্রাথমিক ও বয়স্ক শিক্ষাব্যবস্থার দরকার। সমাজের উন্নতি নির্ভর করিবে মুখ্যত ইহাদেরই উপর। মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক উচ্চশিক্ষিত হইলেও দেশের বাকি লোকে যদি অজ্ঞানের অন্ধকারে দিন কাটায় সে-দেশকে কেহ উন্নত ও শিক্ষিত বলিবে না।

এককালে লেখাপড়া না জানিলেও শিক্ষিত হওয়া যাইত; কিন্তু বর্তমান যুগ পুঁথির যুগ; এ যুগে তাই পুঁথির জ্ঞান দরকার। তাই বয়স্কশিক্ষার

প্রথম ধাপ লেখাপড়া ; কিন্তু তাহাই শেষ ধাপ নহে। বস্তুত লেখাপড়া শিখিলে তখন শিক্ষা শুরু হয় ; বয়স্কশিক্ষার লক্ষ্য শুধু লেখাপড়া নহে, তাহার চেয়ে অনেক বেশি। লেখাপড়া সাধনমাত্র, সাধ্য নহে। আমাদের জাতীয়-শিক্ষাব্যবস্থায় সেই শিক্ষার আয়োজন করিতে হইবে।

এতক্ষণ জাতীয়-শিক্ষার বিস্তারের কথাই বলিয়াছি। এইবার জাতীয়-শিক্ষার দ্বিতীয় লক্ষণ, ইহার প্রকৃতির কথা সংক্ষেপে বলিব। তাহার পূর্বে ভারত-সরকারের শিক্ষাবিষয়ক পরামর্শদাতা মিঃ সার্জেণ্ট সম্প্রতি যুদ্ধোত্তরকালের জন্য এদেশে শিক্ষাবিস্তারের যে পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন তাহার উল্লেখ করা প্রয়োজন।[১] ইহা লইয়া এদেশে নানাপ্রকার আলোচনা চলিতেছে।

এই প্রসঙ্গেই আরও দুইটি পরিকল্পনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু কয়েক বৎসর পূর্বে কংগ্রেসের তরফ হইতে যে ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটি করিয়াছিলেন শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ভারও সেই কমিটির উপর ছিল। সার্ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের নেতৃত্বে একটি শাখা-সমিতি সেই মতে একটি বিস্তারিত শিক্ষা পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন ; দুর্ভাগ্যক্রমে সে পরিকল্পনা সাধারণ্যে প্রকাশিত হয় নাই। নিখিল-ভারতীয় শিক্ষাসম্মেলনের কর্তৃপক্ষও একটি জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতেছেন তবে তাহা সার্জেণ্ট-পরিকল্পনার মত বিস্তারিত নহে।

সার্জেণ্টের পরিকল্পনায় জাতির সকল স্তরের জন্য শিক্ষার আয়োজন করিবার কথা বলা হইয়াছে। তাহার আরম্ভ আট বৎসর ব্যাপী আবশ্যিক

১ পরিকল্পনাটি বাস্তবিক পক্ষে সার্জেণ্টের নিজের তৈয়ারি নহে। গত কয়েক বৎসরে কেন্দ্রীয় পরামর্শদাতা সমিতির বিভিন্ন কমিটিতে যে সকল সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে সেইগুলি একত্র করিয়া এবং শূন্যস্থানগুলি পূর্ণ করিয়া সার্জেণ্ট এই পরিকল্পনাটি প্রস্তুত করিয়াছেন। কিন্তু তিনি পরামর্শদাতা না থাকিলে এই পরিকল্পনার জন্ম হইত কি না সন্দেহ।

প্রাথমিক শিক্ষায় (সে শিক্ষার প্রকৃতি অনেকটা মৌল শিক্ষার প্রকৃতির অনুরূপ) এবং পরিণতি বয়স্কশিক্ষাব্যবস্থায়। তাহাতে নানারকমের মাধ্যমিক শিক্ষা, নূতন ধরণের তিন বৎসরের কলেজের শিক্ষা, যন্ত্র ব্যবসায় কৃষি শিল্প ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের শিক্ষার ব্যবস্থাও আছে ; উপরন্তু শিশুশিক্ষা, ছাত্রগণের স্বাস্থ্য ও অবসরবিনোদন, অল্পবয়স্ক শ্রমশিল্পীদের কাজের সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা সময় শিক্ষাদান, শিক্ষকের শিক্ষা ও বেতন ইত্যাদি প্রশ্নেরও আলোচনা আছে। ইহাতে ছয় হইতে চৌদ্দ বৎসর বয়সের ছেলেমেয়েদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক করার কথা বলা হইয়াছে। শিক্ষারম্ভের পাঁচ বৎসর পরে ছাত্রদের বুদ্ধি ও শক্তি অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পাঠান হইবে। মাধ্যমিক বিদ্যালয় নানা শ্রেণীর হইবে ; কোথাও নানারকমের যন্ত্র শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে, কোথাও সাধারণ শিক্ষা দেওয়া হইবে। সাধারণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরা সতেরো বৎসর বয়স পর্যন্ত পড়িবে। বেশির ভাগ ছেলেমেয়ে সেইখানেই লেখাপড়া শেষ করিবে। অল্প যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে বা উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যোগ দিবে তাহারা আরও তিন-চার বৎসর শিক্ষালাভ করিবে। পরিকল্পনায় বলা হইয়াছে আমাদের শুধু যে আরও অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয় চাই তাহা নহে, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার জন্যও আরও অনেক বিদ্যালয়ের প্রয়োজন। তাহাদের সংখ্যাও বাড়াইতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে নূতন ধরণের শিক্ষায়তন স্থাপন করিতে হইবে। এই সরকারী পরিকল্পনাতেই এই প্রথম শিশুদের (অর্থাৎ পাঁচ বৎসরের কম বয়সের ছেলেমেয়েদের) জন্য নার্সারি ইস্কুলের কথা বলা হইয়াছে। বস্তুত এত ব্যাপকভাবে এদেশের সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার আলোচনা ইতিপূর্বে আর কখনও করা হয় নাই, আর এরূপ সর্বাঙ্গপূর্ণ পরিকল্পনাও আমরা ইতিপূর্বে পাই নাই। কিন্তু এ পরিকল্পনা মুখ্যত

শিক্ষার বিস্তার সম্বন্ধে, এক মাতৃভাষাকে মাধ্যমিক শিক্ষার বাহন করা ছাড়া শিক্ষার প্রকৃতি সম্বন্ধে ইহাতে অন্য বিশেষ কোনো আলোচনা নাই।

সার্জেণ্টের মতে শিক্ষকদের অবস্থার উন্নতি না করিতে পারিলে এদেশে শিক্ষার সংস্কার সম্ভব নয়। শিক্ষকদের অবস্থার উন্নতি করিতে হইলে তাহাদের আরও বেশি বেতন দিতে হইবে। বিভিন্ন স্তরের শিক্ষকদের বেতন কিরূপ হওয়া উচিত তাহার বিস্তারিত নির্দেশ তিনি দিয়াছেন। তাঁহার মতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকদের মাসিক বেতন ত্রিশ টাকা হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চাশ টাকা হওয়া দরকার। তাহার কমে উপযুক্ত লোকে এ কাজ স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিবে না।

সমগ্র দেশে আট বৎসরের আবশ্যিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইলে কত শিক্ষক দরকার তাহার হিসাব করিয়াছেন। সে হিসাবে শুধু প্রাথমিক শিক্ষার জন্যই প্রায় দুইশত কোটি টাকার দরকার হইবে। আর এতগুলি শিক্ষক একদিনেই তৈয়ারি করা যাইবে না, ধীরে ধীরে করিতে হইবে। সেইজন্যই সার্জেণ্ট চল্লিশ বৎসরের পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন; ইহার প্রথম পাঁচ বৎসর যাইবে আয়োজন করিতে; ততদিনে একদল শিক্ষক তৈয়ারি হইবে। তাহাদের লইয়া কাজ শুরু করিয়া দিতে হইবে। তাহার পর প্রতি বৎসর যেমন যেমন শিক্ষক তৈয়ারি হইবে তেমন তেমন অগ্রসর হইতে হইবে। চল্লিশ বৎসরের শেষে যখন শিক্ষাব্যবস্থা প্রায় পূর্ণাঙ্গ হইয়া উঠিবে তখন সমগ্র ব্যবস্থার জন্য বৎসরে তিনশত কোটি টাকা লাগিবে।[১] সার্জেণ্টের হিসাবে বাংলাদেশে এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যবস্থা করিতে বৎসরে সাতান্ন কোটি টাকা লাগিবে। ইহার মধ্যে চল্লিশ কোটি যাইবে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য; এই চল্লিশ কোটি টাকার মধ্যে

১ এই হিসাবে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির কথা ধরা হয় নাই; লোকসংখ্যা বাড়িলে, আর চল্লিশ বৎসরে লোকসংখ্যা নিশ্চয়ই বাড়িবে, খরচও বাড়িবে।

আটাশ কোটি টাকা যাইবে শিক্ষকদের বেতন বাবদ। প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখা ভালো যে, সারা বাংলাদেশে এখন আমরা প্রতিবৎসর অনুমান তিনকোটি টাকা শিক্ষা বাবদ ব্যয় করিয়া থাকি।

হঠাৎ মনে হয় বুঝি তিনশত কোটি টাকা চাহিয়া আমরা অসম্ভবের দাবি করিতেছি। কিন্তু ভুলিলে চলিবে না ভারতবর্ষে প্রায় চল্লিশ কোটি লোকের বাস। তাহাদের শিক্ষার জন্য তিনশত কোটি এমন কিছু বেশী নহে; তাহাতে মাথা পিছু দশটাকার কমই পড়িবে। একটা তুলনা দিলেই অবস্থাটা পরিষ্কার বোঝা যাইবে। ইংলণ্ডে আজ সেদেশের সমগ্র জন-সংখ্যার হিসাবে শিক্ষার জন্য মাথাপিছু পঞ্চাশ শিলিং খরচ করা হয়। আর সার্জেণ্ট-পরিকল্পনানুযায়ী কাজ করিলে আজ হইতে চল্লিশ বৎসর পরে আমরা এদেশে মাথা পিছু দশটাকারও কম খরচ করিব অর্থাৎ ইংলণ্ড আজ যাহা খরচ করে তাহার তিন ভাগের এক ভাগেরও কম খরচ করিব। সুতরাং কেমন করিয়া বলিব তিনশত কোটি টাকা চাওয়া অসম্ভব দাবি করা?

অনেকে ভাবেন অর্থের অভাবে প্রথমে নাহয় চার বৎসরের আবশ্যিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হোক, পরে অর্থ জুটিলে এক-এক বৎসর করিয়া বাড়াইলেই চলিবে। চার বৎসরে শিক্ষার ভিত্তি স্থায়ীভাবে গড়া যায় না, সুতরাং অধিকাংশ স্থলেই সে শিক্ষা ব্যর্থই হয়।[১] স্থায়ী শিক্ষা দিতে হইলে অন্তত আট বৎসর দরকার। সেইজন্য সার্জেণ্টের পরিকল্পনায় বলা হইয়াছে টাকা না থাকিলে সারা দেশে নূতন শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন না

১ চার বৎসরের শিক্ষার কথা প্রথম বলেন স্যর ফিলিপ হার্টগ। তাঁহার মতে চার বৎসর পাঠশালায় পড়াইলেই অক্ষরজ্ঞান স্থায়ী হয়। এই মতের সপক্ষে কোনো যুক্তি আছে কিনা জানা যায় না; কিন্তু এই ধারণা দেশে চলিত হইয়া গিয়াছে। বোধ করি আমাদের অর্থের অভাবই ইহার মূলে আছে।

করিয়া দেশের মাত্র একটা অংশেই কাজ আরম্ভ করিতে হইবে; টাকা জুটিলে বাকি অংশের কাজ আরম্ভ করা যাইবে।

সম্প্রতি বরোদায় কেন্দ্রীয় পরামর্শ সমিতির অধিবেশনে সার্জেণ্টের পরিকল্পনা লইয়া আলোচনা হইয়া গিয়াছে এবং সমিতি মোটামুটিভাবে সমগ্র পরিকল্পনাটি গ্রহণ করিয়াছেন। এখন তাঁহাদের প্রস্তাব ভারত-সরকারের যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন সমিতির বিবেচনাধীন। এ কথা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে যুদ্ধোত্তরকালে এদেশে শিক্ষাসংস্কারের ধারা মোটামুটি-ভাবে সার্জেণ্টের পরিকল্পনা অনুযায়ীই হইবে। বরোদার অধিবেশনে মূল পরিকল্পনার দুই-একটি প্রস্তাবের কিছু পরিবর্তন করা হইয়াছে, যেমন নার্সারি স্কুলের ছাত্রদের বয়স তিন হইতে ছয় করা হইয়াছে এবং আবশ্যিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে ছয় হইতে তেরো বৎসর বয়সের ছেলেমেয়েদের জন্য। মূল পরিকল্পনায় সাত হইতে চৌদ্দ পর্যন্ত বয়সের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা আবশ্যিক করার প্রস্তাব ছিল।

কিন্তু সমস্যা এই যে, এত টাকা আসিবে কোথা হইতে? আমরা এখন সমগ্র ভারতে প্রতি বৎসর প্রায় তেত্রিশ কোটি টাকা খরচ করি; সার্জেণ্ট-পরিকল্পনা অনুযায়ী পুরাপুরি কাজ করিতে হইলে অন্তত তিনশত কোটি টাকার দরকার হইবে। অবশ্য প্রথমেই যে এত টাকা পুরা লাগিবে তাহা নহে; তাহার অনেক কম টাকা লইয়াই আরম্ভ করা যাইতে পারে; কিন্তু সে টাকার পরিমাণও কম নহে। তাহার জন্য প্রতিবৎসর প্রায় যাট কোটি টাকা লাগিবে।

এত টাকা আমরা কোথায় পাইব? ইহার উত্তরে সার্জেণ্ট বলিয়াছেন, যুদ্ধের ব্যাপারে দেখা গিয়াছে প্রয়োজন প্রতিপন্ন করিতে পারিলে অর্থের অভাব হয় না। যদি আমরা সত্যসত্য মনে প্রাণে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করি তাহা হইলে অর্থের অভাব হইবে না।

তাঁহার এই আশা পূর্ণ হইবে কি না ভবিষ্যৎই শুধু বলিতে পারে। এই বাংলাদেশেই যুদ্ধের জন্য নূতন নূতন পথ বিমানঘাঁটি প্রভৃতি তৈয়ারি করিতে যে খরচ হইয়াছে এবং হইতেছে তাহা দিয়া এই প্রদেশের ছেলেমেয়েদের কত বৎসরের শিক্ষার ব্যবস্থা হইতে পারিত তাহার হিসাব কে করিবে?

সার্জেণ্ট-পরিকল্পনায় জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার কাঠামোটা মোটামুটি ঠিক করিয়া দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু বাকিটুকু ভরিয়া দেওয়া হয় নাই। কোনো আদর্শে, কিভাবে শিক্ষা দেওয়া যাইবে অর্থাৎ এক কথায় আমাদের জাতীয় শিক্ষার প্রকৃতি কিরূপ হইবে পরিকল্পনায় সে সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা নাই। অথচ তাহারই উপর জাতীয়-শিক্ষার স্বরূপ নির্ভর করে। এইজন্যই সেই সম্বন্ধে আলোচনা করা বিশেষ প্রয়োজন। এই যে প্রকৃতির কথা বলিতেছি ইহাই জাতীয়-শিক্ষার দ্বিতীয় লক্ষণ।

জাতীয়-শিক্ষার প্রকৃতি জাতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত। জাতীয়-শিক্ষা জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির পরিপোষক, জাতীয় সংস্কৃতি তাহার প্রধান বাহন এবং জাতীয় জীবনের আদর্শ তাহার মুখ্য উপজীব্য। মাতৃভাষা, জাতীয় সাহিত্য, ইতিহাস ইত্যাদিকে অবজ্ঞা করিয়া যে শিক্ষাব্যবস্থা রচিত হয় তাহাকে জাতীয় বলিতে পারি না। আজও আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় মাতৃভাষার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। আজও এই ব্যবস্থায় আমরা ইতিহাসের নামে স্বজাতির মিথ্যা কলঙ্ককাহিনী পাঠ করিতেছি, বিদেশীকে অযথা বড় করিয়া দেখিতে শিখিতেছি, তবু কি ইহাকে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা বলিব? মিথ্যা ইতিহাস, ভ্রান্ত অর্থনীতি, জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় স্থান পাইতে পারে না। যে শিক্ষা জাতির কল্যাণে নিয়োজিত নহে, যে-শিক্ষা দেশকে ভালোবাসিতে শিখায় না সে-শিক্ষাকে জাতীয় শিক্ষা বলিব না। কিন্তু দেশের

প্রতি অন্ধ ভক্তি শিখানোই জাতীয় শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য নহে; জাতীয় আদর্শকে উপলব্ধি করিতে সাহায্য করাই তাহার প্রধান এবং প্রথম উদ্দেশ্য। তাহার লক্ষ্য ভবিষ্যতের উপর নিবদ্ধ, শুধু অতীতকে লইয়াই তাহার দিন চলে না। আমরা যাহা হইতে চাই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা যদি তাহা না শিখায়, যদি সে-শিক্ষার ফলে আমাদের জাতীয় আদর্শকে মূর্ত করিয়া তুলিবার সুবিধা না হয় তাহা হইলে কেমন করিয়া তাহাকে জাতীয় শিক্ষা বলিয়া গ্রহণ করিব? জাতির সর্বাঙ্গীণ প্রয়োজন যে ব্যবস্থা মিটাইতে না পারে তাহাকে জাতীয় ব্যবস্থা বলা যায় না।

প্রশ্ন উঠিবে, ভারতের জাতীয় আদর্শ কি? এই লইয়া মতভেদ ঘটিবে, কিন্তু সে মতভেদ প্রধানত ছোটখাটো ব্যাপারে, জাতীয় আদর্শের মোটামুটি রূপ সম্বন্ধে আমাদের সকলেরই অল্পবিস্তর ধারণা আছে, এবং সে-বিষয়ে মতের অনৈক্য বিশেষ নাই। আমরা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা চাই। সে স্বাধীনতা সকলের স্বাধীনতা, দলবিশেষের বা সম্প্রদায়বিশেষের নহে। আমরা ঘরের বা বাহিরের কোনো প্রকারের শোষণই চাহি না, আমরা রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবন সাম্যের ভিত্তির উপর গড়িতে চাই, আমরা প্রত্যেকেই জীবনকে ভোগে ও সেবায় সার্থক করিয়া তুলিবার সুযোগ ও সুবিধা চাই— এই কথাগুলি বোধ করি রাজনৈতিক মত-নির্বিশেষে প্রায় সকলেই স্বীকার করিয়া লইবেন। এইটুকু ঐক্যের ভিত্তিতেই জাতীয় শিক্ষার আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা যাইতে পারে। তাহাতে এখানে ওখানে হয়তো কিছু পরিমাণ মতভেদের অবকাশ থাকিবে; কিন্তু উপায় নাই। সেটুকু স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। তাহা ছাড়া, জাতীয় আদর্শ প্রাণবান; ইহার ক্রমবিকাশ ও পরিণতি আছে; আজ আমরা যে আদর্শ অনুসরণ করিয়াছি কাল হয়তো সে লক্ষ্য অতিক্রম করিয়া আরও

দূরের কোনো লক্ষ্যকে উদ্দেশ্য করিয়া চলিব; আমাদের জাতীয় আদর্শের এইভাবে ক্রমবিকাশ ও রূপান্তর ঘটিবে; সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় শিক্ষার আদর্শের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হইয়া চলিতে থাকিবে। সুতরাং ইহা লইয়া চুলচেরা তর্ক বা মারামারি করা নিষ্ফল।

এই প্রসঙ্গেই বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষার কথা তুলি। এই লইয়া অনেক বাদবিতণ্ডা হইয়া গিয়াছে; ধর্মের অভাবে বর্তমান শিক্ষা কুশিক্ষায় পরিণত হইতেছে, ঈশ্বরহীন শিক্ষাব্যবস্থা দেশকে উচ্ছন্নের পথে টানিয়া লইয়া যাইতেছে, ধর্মভীরু লোকে এই ধরণের নানা রকম অভিযোগ করিতেছেন! তাঁহাদের মতে ধর্মকে বাদ দিয়া শিক্ষা দেওয়া চলে না, মানুষের মনকে শুধু শিক্ষা দেওয়া যায় না— সমগ্র মানুষকে শিক্ষা দিতে হয় এবং তাহা হইলেই বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষার আয়োজন করিতে হয়।

কথাটি ঠিকই, সমগ্র মানুষকেই শিক্ষা দিতে হইবে; কিন্তু তখন প্রশ্ন ওঠে, কোন্ ধর্ম শিক্ষা দিব, এবং সে শিক্ষা কেমন করিয়া ও কোথায় দিব? তাহার চেয়েও বড় কথা, ধর্ম কি অঙ্ক ও ভূগোলের মত শেখানো যায়? এ সকল প্রশ্নের উত্তর দিবার আগে গোড়ায় একটা কথা বলিয়া রাখা দরকার। ধর্ম একান্তই মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপার; মানুষ ও তাহার বিধাতাকে লইয়া তাহার কারবার। তাহার মধ্যে অন্য কোনো মানুষকে বা সমাজকে টানিয়া আনা শুধু অশোভন নয়, অন্যায়ও বটে। যেখানে এবং যখনই ধর্মকে রাষ্ট্র বা সমাজের সহিত অভিন্ন করিয়া দেখা হইয়াছে সেইখানেই অন্যায়ের সৃষ্টি হইয়াছে; ধর্মের নামে অধর্ম প্রশ্রয় পাইয়াছে। সেইখানেই ধর্মকে ছুতা করিয়া অত্যাচার-অবিচার করা হইয়াছে। স্পেনের ইনকুইজিশনের কথা অনেকে মনে করিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু এইরকম আরও কত ইনকুইজিশন অন্যত্র হইয়াছে তাহার সন্ধান কে দিবে?

এই জন্যই ধর্মের ভার রাষ্ট্রের উপর দিতে নাই, ধর্ম ও সমাজকে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিতে হয়। বস্তুত রাষ্ট্রের বা সমাজের তো কোনো ধর্ম নাই; তাহারা ধর্মাধর্মের অতীত। সুতরাং যাহা রাষ্ট্রের বা সমাজের সকলের সেবার ও ভোগের জন্য সেখানে ধর্মকে টানিয়া আনিলে চলিবে না, আনিলেই বিরোধ বাধিবে। রাষ্ট্রের অর্থে যে বিদ্যালয় চলিতেছে তাহা রাষ্ট্রের সকলের, সকল ধর্মের সকল সম্প্রদায়ের লোকের সাধারণ সম্পত্তি। সেখানে ধর্ম শিক্ষা দিবার চেষ্টা করিলে তখন কোন্ ধর্ম শিখাইব, কতখানি শিখাইব তাহাই লইয়া মারামারি বাধিবে। যদি সকলের ধর্মই শিখাইতে হয় আর প্রত্যেক ধর্মের সব কিছু শিখাইতে হয় তাহা হইলে সব সময়টুকুই তাহার জন্য দিতে হইবে, বিদ্যালয়ে অন্য কিছু শিখাইবার আর সময় থাকিবে না।

কথা উঠিবে, সকল ধর্মের মধ্যেই খানিকটা মিল আছে, সেইটুকুই না-হয় শেখানো যাক। প্রত্যেক ধর্মের দুইটি অংশ আছে, একটি তাহার অন্তর্নিহিত জীবনদর্শন, আর-একটি তাহার বাহ্য আচার-অনুষ্ঠান। এ কথা সত্য যে দর্শনের ভূমিকায় বিভিন্ন ধর্মমতের একটা সামঞ্জস্যের সন্ধান মেলে; কিন্তু ছোট ছেলেমেয়েদের কি সে দর্শন শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে? তাহাদের আমরা কয়েকটা শ্লোক মুখস্থ করাইয়া দিতে পারি, কয়েকটা বাহ্য আচার-অনুষ্ঠান শিখাইতে পারি বটে কিন্তু যেখানে বিভিন্ন ধর্মগুলির মধ্যে ঐক্যের সন্ধান পাওয়া যায় ছেলেমেয়েদের মনকে সেখানে লইয়া যাওয়া সম্ভব নহে। অকালে অসময়ে সে চেষ্টা করিলে ছেলেমেয়েরা ভাসাভাসাভাবে বড় বড় কথা বলিতে শেখে বটে কিন্তু তাহাতে তাহাদের বা সমাজের কাহারও কোনো কল্যাণ হয় না। তাহাকে ধর্মশিক্ষা বলিব না। আর যে আচার-অনুষ্ঠান ছেলেমেয়েদের সহজেই শেখানো যায় সেইগুলি লইয়াই তো যত গোল, সেইখানেই তো ধর্মে ধর্মে বিরোধ বিদ্বেষ জাগে, মতের মিল

৬

হয় না। সুতরাং সেগুলি শিখাইয়া লাভ কি? তাহাতে পরস্পরের মধ্যে ঐক্যের প্রতিষ্ঠা দূরে থাক বিরোধের সম্ভাবনাই বাড়িবে। অতএব যখন ধর্মশিক্ষা দিবার বাধা এত, যখন ধর্মশিক্ষা দেওয়ায় লাভের চেয়ে লোকসানের সম্ভাবনা বেশি তখন বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষা দিবার চেষ্টা না করাই ভাল।

বস্তুত ধর্ম তো শিক্ষণীয় বিষয় নহে, ইহা যে উপলব্ধির ব্যাপার। বৃক্ষ যেমন সংগোপনে আকাশ আলোক হইতে জীবনরস সংগ্রহ করে আমরা তেমনি বিশ্বে বাস করিয়া বিশ্ববিধাতার স্পর্শ অর্থাৎ ধর্ম উপলব্ধি করি। জীবনের প্রথম অবস্থায় যখন মনের পূর্ণবিকাশ হয় নাই তখন সে উপলব্ধি প্রধানত আসে দেখিয়া, শুনিয়া নহে। ধর্মের আবহাওয়ায় বাস করিয়া এবং ধর্মময় জীবনের স্পর্শে আসিয়া আমরা ধার্মিক হই, ধর্মের কথা শুনিয়া নহে। ধর্মের কথা শুনিয়া ধার্মিক হওয়ার সময় আসে অনেক পরে; সে অবস্থায় আসিবার আগে ধর্মকথা শুনাইতে গেলে মনে বিরূপতা জাগিতে পারে, ধর্মের প্রতি অনুরাগের পরিবর্তে বিরাগের সৃষ্টি হইতে পারে। এইজন্যই ছোটবেলায় সাক্ষাৎভাবে ধর্মশিক্ষা দিতে নাই। তাহাতে লাভের চেয়ে ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশি। তবে কি ধর্মকে জীবন হইতে একেবারে বাদ দিব? না, বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষা না দিলেই যে ধর্মকে জীবন হইতে বাদ দেওয়া হইল এমন তো নহে। বিদ্যালয়ে আমাদের ছেলেমেয়েদের জীবনের কতটুকু সময় কাটে? বস্তুত বিদ্যালয়ই তো আমাদের একমাত্র শিক্ষার ক্ষেত্র নহে; আমরা আরও অনেক স্থান হইতে নানাভাবে অহরহ শিক্ষালাভ করিতেছি এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষার তুলনায় সে শিক্ষার মূল্য কম নহে। উদাহরণস্বরূপ পারিবারিক জীবনের উল্লেখ করি; পরিবারে বাস করা, পারিবারিক জীবনে সহযোগিতা করা যে কতখানি শিক্ষাপ্রদ তাহা সকল সময়ে আমরা বুঝি না। সেখানে পিতামাতা

আত্মীয়বন্ধুর স্নেহস্পর্শে আমাদের অলক্ষ্যে যে-শিক্ষা আমরা প্রতিদিন লাভ করিতেছি তাহার প্রভাব বিদ্যালয়ে লব্ধ শিক্ষার প্রভাবের চেয়ে বেশি বই কম নহে।

আমার কথা, যদি ধর্মশিক্ষা দিতে হয় তবে পরিবারেই তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে, অন্যত্র কোথাও নহে। গৃহ এবং পরিবারই তো ধর্মশিক্ষা দিবার প্রশস্ততম অনুকূলতম ক্ষেত্র ; সেখানে পিতামাতার জীবনাদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহাদের স্নেহস্পর্শে সন্তান যেভাবে দীক্ষা লাভ করিবে তাহার চেয়ে ভালো ভাবে আর কোথায় সে শিক্ষা লাভ করিতে পারে?

বস্তুত এককালে তো সাধারণ পাঠশালায় আজ যেভাবে আমরা ধর্ম-শিক্ষা দিতে চাহিতেছি সেভাবের ধর্মশিক্ষা দেওয়া হইত না। তখন যে লোকে ধর্মকে কম শ্রদ্ধা করিত এমন নহে ; কিন্তু তখনকার পারিবারিক ও সামাজিক জীবন এমন সুসংবদ্ধ ও সংহত ছিল যে সেখানে বাস করিয়াই ছেলেমেয়েরা আপনা হইতেই ধর্মবিষয়ে শিক্ষা লাভ করিত। সুতরাং তখন পাঠশালায় ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা করিবার কোনো তাগিদ ছিল না।

আজ যখন বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষার কথা শুনি তখন মনে হয় বিদ্যালয়কে বড় বেশি অধিকার আমরা দিতেছি ; বিদ্যালয়কে এত ভার দেওয়া বিদ্যালয়ের পক্ষেও কল্যাণকর নহে, আমাদের পক্ষেও কল্যাণকর নহে। নিজেদের দায়িত্ব এড়াইয়া বিদ্যালয়ের উপর সে দায়িত্ব চাপাইয়া দিলে সাময়িক সুবিধা হইতে পারে বটে কিন্তু তাহাতে শেষ পর্যন্ত পরিবারের ও সমাজের সমূহ ক্ষতিই হইবে। সেইজন্যই আমি বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষা দিবার প্রস্তাবের বিরোধিতা করি।

জাতীয় শিক্ষার তৃতীয় লক্ষণ, শিক্ষাব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণের ভার থাকিবে জাতির প্রতিনিধিগণের উপর থাকে। জাতীয় আদর্শ অনুযায়ী সে

ব্যবস্থার পরিবর্তনের পূর্ণ অধিকার তাঁহাদের থাকিলে তবেই সে ব্যবস্থাকে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা বলিয়া স্বীকার করা যায়, নতুবা নহে।

যে লোক আমার ভাষা জানে না, আমার ঐতিহ্যের সহিত যাহার পরিচয় নাই, আমার সংস্কৃতিকে যে শ্রদ্ধা করে না, আমার জাতীয় আদর্শের প্রতি যাহার সহানুভূতি নাই সে যত ভাল লোকই হউক না কেন, যত সদুদ্দেশ্যপ্রণোদিত হউক না কেন, তাহার পরিচালিত শিক্ষাব্যবস্থা জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা হইতে পারে না। এ কথা বলিতেছি না যে তাহার সহায়তা আমরা চাই না; তাহার সাহায্যের, পরামর্শের, শুভেচ্ছার আমাদের বড় প্রয়োজন, কিন্তু তাই বলিয়া ইহার পরিচালনার ভার তাহার হাতে ছাড়িয়া দিতে পারি না। ইহাতে অবিশ্বাস বা অশ্রদ্ধার কোনো কথা নাই; তাহার পক্ষে যে ভার গ্রহণ করা সম্ভব নহে সে ভার তাহাকে দেওয়া তাহার উপর অবিচার করা; এই অন্যায় হইতে তাহাকেও মুক্তি দিতে হইবে আমাকেও মুক্তি পাইতে হইবে। ইহাই জাতীয় শিক্ষা নিয়ন্ত্রণের মূল নীতি।

স্বাধীন মানুষ গড়িতে হইলে স্বাধীন শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এদেশে আজও সেই স্বাধীন জাতীয় শিক্ষার পত্তন হয় নাই; কি করিয়া হইবে তাহাই আমাদের জাতীয় জীবনের সকলের চেয়ে বড় সমস্যা।

উপসংহার

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবার সঙ্গে সঙ্গে এদেশের ইতিহাসের নবপর্যায় শুরু হইল। জাতীয় জীবন গঠনের যে বড় অন্তরায় স্বাধীনতার অভাব, সে অভাব আজ দূর হইয়াছে; স্বাধীন জাতীয় শিক্ষার পত্তন এখন সম্ভব হইয়াছে। আমাদের জাতীয় সরকারও নানাভাবে জাতীয় জীবনের বিভিন্ন অংশে নূতন করিয়া

গড়িবার চেষ্টা করিতেছেন; প্রাচীন ভারতবর্ষের পল্লীপ্রধান ও কৃষিপ্রধান সভ্যতাকে রূপান্তরিত করিয়া কতকটা শিল্পপ্রধান আধুনিক সভ্যতায় পরিণত করার কাজ এখন চারিদিকে দ্রুতগতিতে চলিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যেও নানারকম পরিবর্তন ঘটিতেছে; প্রাথমিক মাধ্যমিক যান্ত্রিক ও উচ্চশিক্ষার সকল ক্ষেত্রেই নূতন নূতন প্রয়াস চলিয়াছে। কেন্দ্রে কেন্দ্রীয় সরকার ও বিভিন্ন প্রদেশে প্রাদেশিক সরকার নানারূপ পরিকল্পনা লইয়া কর্মে অগ্রসর হইতেছেন। তাহাদের কথা বলিতে গেলে একখানা নূতন গ্রন্থ লিখিতে হয়; সংক্ষেপে তাহাদের কথা বলাও সম্ভব নয়। সুতরাং সে চেষ্টা আর করিলাম না।

এখন আর উৎসাহের ও সুযোগের কোনো অভাব নাই, কিন্তু অন্তরায় হইয়াছে সমস্যার বিপুলতায়, আমাদের আর্থিক অসচ্ছলতায় ও অভিজ্ঞতার অভাবে। ফলে নানা দিকে নানারূপ ত্রুটি দেখা দিতেছে। নানাপ্রকার বিরুদ্ধ সমালোচনা শোনা যাইতেছে। ইদানীং কালের জনসংখ্যাবৃদ্ধিও সমস্যাগুলিকে জটিলতর করিয়া তুলিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টিচেষ্টা মাত্রেই যাহা অবশ্যম্ভাবী সেই বিরোধিতা নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। কিন্তু তাহাতে ভয় পাইবার কোনো কারণ নাই; স্বাধীন দেশ মাত্রেই এ ধরণের বাধা-বিপত্তির ভিতর দিয়া চলিতে হয়।

এখন আমাদের বড় সমস্যা হইল কেমন করিয়া আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় পাশ্চাত্যের ষোল আনা নকল না করিয়া ভারতীয় সংস্কৃতির মূল সুরটি অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারি। স্বাধীন ভারতবর্ষে শিক্ষার ক্ষেত্রে আগামী দিনে ইহাই আমাদের মুখ্য সমস্যা। এ সমস্যার সমাধানে সাময়িক চটকে ভুলিলে চলিবে না, বা রাতারাতি এ সমস্যার সমাধান

হইবে না। ইহার জন্য ভারতসরকারের ও সর্বসাধারণের অক্লান্ত চেষ্টা ও সদাজাগ্রত দৃষ্টির প্রয়োজন। তাহা হইলে একদিন-না-একদিন আমাদের আদর্শ রূপপরিগ্রহ করিবে। স্বাধীন দেশ মাত্রেই অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেশের শিক্ষাব্যবস্থারও রূপান্তরণ হয়, আমাদের দেশেও তাহাই ঘটিবে।

—

প্রকাশক শ্রীকানাই সামন্ত
বিশ্বভারতী। ৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

মুদ্রক শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বাগ
ব্রাহ্মমিশন প্রেস। ২১১ কর্ন্‌ওআলিস স্ট্রীট। কলিকাতা ৬

২'১

শিশুর মন

শ্রীসুধীরলাল ব্রহ্মচারী



বিশ্বভারতী
কলিকাতা

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ : ৫৯
প্রকাশ ফাল্গুন ১৩৫৩
পুনর্মুদ্রণ মাঘ ১৩৬০
মাঘ ১৩৭১ : ১৮৮৬ শক

প্রকাশক শ্রীকানাই সামন্ত
বিশ্বভারতী। ৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭
মুদ্রাকর শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড। ৫ চিন্তামণি দাস লেন। কলিকাতা ৯
২·১

শ্রদ্ধেয় শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের করকমলে
গ্রন্থখানি সমর্পিত হইল

ভূমিকা

শিশুদের লইয়া ব্যাপক আলোচনা এবং গবেষণা বর্তমান যুগে বিশেষভাবে চলিতেছে। প্রাচীন এবং মধ্যযুগের শাস্ত্রে ও পুঁথিতে অনেক জ্ঞানগর্ভ কথা আছে, কিন্তু শিশু কি ভাবে, কি করে, কি প্রকারে তাহার মানসিক শক্তির বিকাশ হয়, এ-সম্পর্কে আলোচনা পাওয়া যায় না। সমাজের গঠন বা সামাজিক সমস্যার বিচারে প্রাচীন পণ্ডিতগণ—কি য়ুরোপে কি ভারতে—শিশুর মনকে বাদ দিয়াই চিন্তা করিয়াছেন।

কিন্তু আজকাল মনোবিদ্যার অনুশীলনের ফলে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীতে পরিবর্তন আসিয়াছে। মনোবিদ্যা বলিতেছে, চোর বা অপরাধী কোনো ভিন্ন শ্রেণীর জীব নহে, সেও সাধারণ মানুষ, তবে তাহার মন বিকৃত। যাহাদের পাগল বলি, তাহারাও একপ্রকার মনের রোগে ভুগিতেছে। যে-সব সামাজিক কুসংস্কার দেখিতে পাই সেগুলি আমাদের অজ্ঞাতে আমাদেরই মনের ইচ্ছা পূরণ করিতেছে। ধর্মানুষ্ঠানের প্রচলিত প্রক্রিয়া বা প্রথা মনেরই গুপ্ত ইচ্ছার কারসাজি। শিক্ষাদান মারপিট করিয়া মুখস্থ করানো নয়, তাহাতে বাহ্যত ভালো ফল দেখিতে পাইলেও হিতে বিপরীত হয়, শিক্ষা দিতে হইলে জানিতে হইবে মানুষের মনের ভিতরকার মূর্তিটি—ব্যক্তিত্বের বিকাশই হইবে শিক্ষার লক্ষ্য। আধুনিক মনোবিদ্যা আরও বিশেষ করিয়া বলিতেছে যে শিশুর মন না জানিলে উপরের সমস্যাগুলির কোনোই সমাধান হইবে না, কারণ আমরা বড় হইলেও ছেলেবেলার অভিজ্ঞতার প্রভাব আমাদের উপর থাকিয়া যায়। যতই লেখাপড়া শিখি না কেন, শিশুকালে যাহা আমরা বিশ্বাস করিতাম, যাহা চাহিতাম, যাহা আমাদের ভয় ও ঘৃণার উদ্রেক করিত, তাহার অলক্ষিত ছায়া মনের গোপন ঘরে থাকিয়া যায় এবং আমাদের চরিত্র ও আচরণের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

তাই আজ শিক্ষাব্রতী বা সমাজসেবী শিশুমনস্তত্ত্ব অনুশীলন একান্ত আবশ্যক মনে করেন। কারণ শিশুর মনের মধ্যে তাহার ভবিষ্যৎ ব্যক্তিত্বের বীজ রহিয়াছে। ছেলেবেলায় যদি সেই বীজের যত্ন করা যায়, তাহার মনের ধারাটিকে উপযুক্ত খাতে বহাইয়া দেওয়া যায়, তবে পরে আর তাহার জন্য দুশ্চিন্তা করিতে হইবে না। সে স্বাভাবিকভাবেই বিকাশ লাভ করিবে। কিন্তু যদি শৈশবের শিক্ষায় ত্রুটি রহিয়া যায়, অযোগ্য শিক্ষক বা অভিভাবকের হস্তে তাহার বিকাশের পথ নিরুদ্ধ হয়, পরবর্তী জীবনে তাহার ফল ভালো হইতে পারে না। চোর, গুণ্ডা এবং অপরাধীদের জীবন বিশ্লেষণ করিয়া বহু পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত দেখাইয়াছেন যে ছেলেবেলায় ইহারা গৃহে সুশিক্ষা লাভ করে নাই, ইহাদের জীবনধারা সুপরিচালিত হয় নাই।

চিকিৎসকেরা আজ দেখিতেছেন যে অনেক প্রকারের রোগের সৃষ্টি—শুধু

মানসিক নয়, শারীরিক রোগেরও—মনের উত্তেজনা, চাঞ্চল্য বা অশান্তি হইতে। বিশ্লেষণ করিলে হয়তো দেখা যাইবে যে ছেলেবেলার মর্মন্তুদ কোনো অভিজ্ঞতা রোগীর মনকে আড়ষ্ট করিয়া শরীরকেও আক্রমণ করিতে বসিয়াছে; অথবা এমন কতকগুলি অমীমাংসিত সমস্যা শৈশব হইতে তাহার মনের মধ্যে জট পাকাইয়া রহিয়াছে যাহার দুঃসহ গুরুভারে সে রুগ্‌ণ হইয়া পড়িয়াছে। এমনও দেখা যায় যে কেহ মনে মনে চিরকাল অসহায় শিশুই থাকিয়া যায়, কোনও বিপদ আসিলেই কাতর হইয়া শয্যা গ্রহণ করে। শুধু তাহাই নয়, পাগল বা বাতিকগ্রস্ত লোকদের মন বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে ঐসব রোগের মূল তাহাদের শৈশব-জীবনে। ডাক্তার ফ্রয়েড (Freud) এই সম্পর্কে যুগান্তকারী আবিষ্কার করিয়াছেন।

শিক্ষাক্ষেত্রে আজ নানাপ্রকারের পদ্ধতির আবির্ভাব হইয়াছে। কারণ, মনোবিদ্‌গণ যে সত্যের উন্মোচন করিয়াছেন তাহার আলোকে দেখা যায় যে ঠিক প্রণালীতে মনকে নিয়ন্ত্রণ করিতে না পারিলে শিক্ষাদানের নামে অনেক শক্তির অপচয় হয়, লাভ কিছুই হয় না। আর, পুরাতন গতানুগতিক ভয় দেখাইয়া শিখানোর প্রণালী ছাড়া ভালো উপায় কি কিছু নাই? লেখাপড়া শিখিতে হইলে কি মাস্টার মহাশয়ের মার খাইতেই হইবে এবং স্কুলে যাইবার কথায় শিশুদের হৃৎকম্প উপস্থিত হইবে? হাসিমুখে কি বিদ্যালাভ করা যায় না? ইহা ছাড়া শুধু বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশেই শিক্ষা শেষ হয় না, সমগ্র ব্যক্তিত্বকে পরিস্ফুট করিতে হইবে। শিশুকাল হইতেই শিক্ষা আরম্ভ হইবে নানাপ্রকার সৃজনমূলক কাজের মধ্য দিয়া।

সামাজিক কুসংস্কার দূর করিতে হইলেও শিশুদের নূতনভাবে মানুষ করা দরকার। শিশু জাতিভেদ বোঝে না, বারো মাসে তেরো পার্বণ বোঝে না, ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান বোঝে না; আমরা যাহা বুঝাই তাহাই বোঝে। একবার যখন তাহার মনে অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার প্রবেশ করে, তখন উহা মনের মধ্যে গাঁথা হইয়া যায়, পরে কোনো প্রকার বক্তৃতা দিয়াই তাহা দূর করা যায় না। এই জন্যই সমাজ বা রাষ্ট্র গঠনের ব্যাপারেও শিশুকাল হইতে কাজ শুরু করিতে হইবে।

এ কাজ খুব সহজ নয়; গৃহে, বিদ্যালয়ে, সর্বত্র অভিভাবকদের বিচক্ষণতা ও সহিষ্ণুতার সহিত শিশুকে বিকাশ লাভের সুযোগ দিতে হইবে, শিশুর মনকে জানিতে হইবে।

শিশুমনের অভিব্যক্তি

বুদ্ধি ও চিন্তার ধারা

শিশুদের কথাবার্তা শুনিলে এবং ক্রিয়াকলাপ দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে উহারা প্রাণী ও অপ্রাণীর তফাত খুব ভালো করিয়া বোঝে না। চেয়ার-টেবিলের সঙ্গেই হয়তো কথাবার্তা বলিয়া চলিয়াছে। একটি পুতুলকে বলিয়া বসিল, "তোর মাকে বলিস, ভালো জামা কিনে দেবে।" মাটিতে আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেল, উঠিয়া মাটিকে ঘা কয়েক লাগাইয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "আর করবি? আমাকে ফেলবি?" সূর্য আকাশে উঠে, অর্থাৎ বাড়ি হইতে ভালো করিয়া খাইয়া-দাইয়া আকাশে ঘুরিয়া বেড়ায়। চাঁদ, তারা ইত্যাদি যখন যেমন খুশি চলাফেরা করিতে পারে, ইত্যাদি।

শুধু তাই নয়, শিশুর ধারণা—সব কিছুই মানুষের মতো; অর্থাৎ সব প্রাণী—পোকামাকড়, বাঘ, হাতী, গণ্ডার ইত্যাদি এবং সর্ববিধ বস্তু—থালা, গ্লাস, ঘটি, বাটি, দেশলাই, বই, জল, মেঘ, আকাশ মানুষের মতো জীবন যাপন করে। অর্থাৎ শিশু ভাবে, "আমি যেমন ভাবি, যেমন করি, যেমন দেখি, ওরাও তাই ভাবে, তাই করে এবং তাই দেখে।" শিশু প্রাকৃতিক নিয়ম বুঝিতে পারে না। তার বুদ্ধি তখনও সৃষ্টির বৈচিত্র্য বিশ্লেষণ করিতে পটু হয় নাই।

আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, শিশুরা মনে করে তাহারা যাহা ভাবিবে তাহাই হইবে, হইতে বাধ্য। যেমন, সে যদি বলে, "রেলগাড়ি থামো" অমনি রেলগাড়ি থামিবে। বড়াই করিয়া মাকে বলিবে, "জানো, আমি মোটর থামাতে পারি, বৃষ্টি নামাতে পারি, রোদ উঠাতে পারি।" যদি ক্রমশ সে দেখে যে তার ইচ্ছায় বিশেষ কিছুই হয় না এবং তাহার দম্ভের কোনো অর্থ হয় না, তখন সে বড়ো দুঃখ পায়। শিশু তাহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে ক্রমশ বুঝিতে পারে যে বস্তুসমূহ তাহাদের স্বভাবানুযায়ী চলে।

শিশুদের যদি প্রশ্ন করা যায়, "তোমরা কিসের গল্প শুনিবে?" সমস্বরে উত্তর হইবে "ভূত, ডাকাত, রাক্ষসের।" সর্বত্রই ছেলেপিলেদের ভূত-প্রেত-দৈত্য-রাক্ষস ইত্যাদি সম্পর্কে অপূর্ব কৌতূহল। শিশুমনের সঙ্গে বর্বর জাতির মনোবৃত্তির বিশেষ সাদৃশ্য আছে। বর্বরদের মানসিক শক্তি খুব বেশি বিকাশলাভ করে নাই, অনেকটা শিশুরই ন্যায়। ইভলিউশন (Evolution) মতানুযায়ী ইহাই দেখা যায় যে আমরা যখন সহস্র সহস্র বৎসর পূর্বে আদিম অধিবাসীদের ন্যায় ছিলাম, তখন তাহাদের সেই মনোবৃত্তি আমাদেরই শিশুমনের ভিতর জাগ্রত হইতেছে। যাহা মনুষ্যজাতির ভিতর ক্রমাবর্তনের সময় সংঘটিত হইয়াছিল তাহা একটি মানুষের জীবনেও ঘটিতে বাধ্য। অর্থাৎ, আদিম মানব প্রকৃতির নিয়ম বুঝিত না, বৈজ্ঞানিক

দৃষ্টি তাহার ছিল না, কাল্পনিক বিশ্বাসে তাহার মন পূর্ণ ছিল। ক্রমে অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধি চালনার দ্বারা আমাদের পূর্বপুরুষগণ প্রকৃতির নিয়ম আবিষ্কার করিতে লাগিলেন—কল্পনার স্থানে যুক্তি আসিল, তাঁহাদের চিন্তার ধারা শৃঙ্খলাবদ্ধ হইতে লাগিল। এখন মানবজাতির জীবনে যাহা হইয়াছে, একটি মনুষ্যবিশেষের জীবনেও তাহা হয় বলিয়া মনে হয়। যেমন, শিশু প্রথমত এলোমেলো চিন্তা করে, ভূত-প্রেত-ডাকিনীতে বিশ্বাস করে, পরে সে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে সমস্ত কিছু দেখিতে থাকে। এইরূপে আদিম মানবের মনের বিকাশ যে পর্যায়ে হইয়াছিল তাহারও মনের বিকাশ সেইভাবে হয়।

মোটামুটি কথা এই যে, ছেলেপিলেরা প্রথমে যে চিন্তা করে তাহাতে যুক্তি থাকে না, বিশ্লেষণ বা বিচার থাকে না। কল্পনাই তাহাদের কাছে বাস্তব; ভূতপ্রেত, তেপান্তরের মাঠ, রূপকথার রাজপুত্র, ক্ষীরসাগর, ব্যাঙগমা-ব্যাঙগমী সবই সত্য। পরে তাহাদের মন যখন সব তলাইয়া দেখে, বিচার করে এবং যখন তাহাদের ধারণাশক্তি বাড়ে, তখন আর ঐসব সেরকম ভালো লাগে না।

কথাবার্তা ছেলেরা জন্মিয়াই কোনো জাদুমন্ত্রে শিখে না। তাহারা প্রতি বস্তুর কার্যকলাপ লক্ষ্য করে এবং তদনুসারে তাহার একটা নাম দেয়। যেমন, বিড়াল দেখিয়া বলিল 'ম্যাও' আসিয়াছে। মোটরগাড়ি দেখিয়া বলিল 'পাম পাম'।

কোনো বস্তুর সহিত কোনো নাম বিজড়িত থাকিলে উহাদের শিখিতে সুবিধা হয়। যেমন এক বাটি দুধ শিশুর সামনে রাখিয়া বলিলাম—দুধ। শিশু দেখিল একটি সাদা তরল পদার্থ, পান করিয়া জিনিসটির স্বাদ বুঝিল। পরে 'দুধ' শব্দটি শুনিলেই উহার মনে ভাসিয়া উঠিবে উহার রূপ ও স্বাদ; সাদা তরল জিনিস দেখিলেই বলিবে 'দুধ'।

পাড়াপড়শী, মা, বাবা, কাকা, জ্যাঠা ইত্যাদির নিকট ক্রমাগত কথা শুনিতে শুনিতেও শিশুর শব্দশিক্ষা হয়। কোনো বাঙালী শিশু যদি রাশিয়ান বা জাপানী পরিবার ও সমাজে মানুষ হয় তবে সে রাশিয়ান বা জাপানী ভাষাই শিখিবে। অনেকে ভাবেন যে ইংরেজ-সন্তানের রক্তের মধ্যেই বুঝি ইংরেজী ভাষা আছে, বাঙালী-সন্তানের রক্তেই বাংলা ভাষা আছে। ইহা ভুল। রক্তে ভাষা থাকে না। ভাষা থাকে পরিবার ও সমাজে, যাহার মধ্যে সে বাস করে। একজন স্টেশনমাস্টারকে জানিতাম, তিনি পার্বত্য অঞ্চলে এক রেলওয়ে স্টেশনে কাজ করিতেন। তাঁহার একটি সন্তান কথা শুনিবার বা বলিবার বিশেষ সুযোগ পায় নাই। কারণ, তিনি বিপত্নীক, নিজে কাজে ব্যস্ত, আশেপাশে লোকের অভাব। এই সন্তানটিকে সকলে বোবা মনে করিত, তাহার মুখে কথা নাই। বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গেল কথা শোনার সুযোগ না পাইয়াই ছেলেটির অবস্থা এইরূপ।

ছেলেপিলেরা কোনো একটি নির্দিষ্ট বস্তু এবং বস্তুর শ্রেণী বুঝিতে পারে না। নিজের বাবাকে জানে—রাস্তা দিয়া যে কোনো মানুষকে দেখিয়া হয়তো বলিবে

'অবা, বাবা'। স্ত্রীলোক দেখিলেই অনেক সময় 'মা' বলে। বিড়াল দেখিলেই 'পুষি' বলে। অর্থাৎ একটি জাতিকে নিজেদের পরিচিত একটি উদাহরণ দিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করে। সমস্ত গাছ 'আম গাছ', সমস্ত কুকুর 'বাঘা'। ক্রমশ এই ভুল ভাঙিয়া যায় এবং জাতিবাচক শব্দের তাৎপর্য বুঝিতে পারে।

শিশুর বুদ্ধি সম্বন্ধে আরও কয়েকটি কথা বিশেষ করিয়া জানিবার আছে। জন্মিয়াই কেহ প্রখরবুদ্ধির পরিচয় দেয় না। আস্তে আস্তে বুদ্ধিবৃত্তি পরিস্ফুট হয়। সকলের বুদ্ধি কি সমান? মনোবিদ্‌গণ বলেন, মানুষ একটি নির্দিষ্ট বুদ্ধির মাত্রা লইয়া জন্মায়, তাহার বেশি সে আয়ত্ত করিতে পারে না। বৈজ্ঞানিক উপায়ে বুদ্ধি মাপিবার চেষ্টাও হইয়াছে। নানা প্রকারের মান বা টেস্ট্‌ (test) আছে। বিভিন্ন বয়সের বিভিন্ন টেস্ট্‌। এই পরীক্ষা-মানের দ্বারা বুঝা যায় কোন্‌ শিশুর কতটা সাধারণ বুদ্ধি, অর্থাৎ কে কতটা ধারণা, পর্যবেক্ষণ, বিচার, স্মরণ ও বিশ্লেষণ ইত্যাদি করিতে পারে। দেখা গিয়াছে যে এই জন্মগত বুদ্ধিশক্তি যতটা বাড়িবার তাহা ষোলো বা বড় জোর অঠারো বৎসরের ভিতরই বাড়িয়া ক্ষান্ত হয়। এই বয়সের পর বুদ্ধিশক্তি আর বাড়ে না।

একটি শিশুকে পরীক্ষা করিয়া তাহার বুদ্ধি নির্ণয় করা হইল। এখন কতটা তাহার বুদ্ধির মাত্রা বলিতে হইবে? Intelligence Quotient (সংক্ষেপে) I. Q. দ্বারা তাহা বুঝানো যায়। কাহারও আই. কিউ. (I. Q.) ১০০, কাহারও বা ১২০, কাহারও বা ৯০ কি ৬০। ১০০ আই. কিউ. হইলে বুঝিতে হইবে মোটামুটি চলনসই বুদ্ধি আছে, ইহার যত বেশি আই. কিউ. হইবে বুদ্ধি তত বেশি আছে ধরিয়া লইতে হইবে; আর ১০০ আই. কিউ. অপেক্ষা যত কম হয় মূর্খতার মাত্রা তত বেশি বুঝিতে হইবে।

কিন্তু একটি ভুল করিলে চলিবে না। বুদ্ধি এবং বুদ্ধির প্রয়োগ এক জিনিস নয়। আমার আই. কিউ. ১২০; কিন্তু খাটিব না, পড়িব না, আড্ডা গল্প করিয়া বেড়াইব, আমার লেখাপড়া হইবে কি করিয়া? অপর একটি বালকের আই. কিউ. মাত্র ১০০, কিন্তু সে খুব পরিশ্রমী, সে বেশি কৃতকার্য হইবে। মনোবিদ্‌রা বলেন যে আই. কিউ. যাহা বাড়িবার তাহা ১৬-১৮ বৎসরের ভিতরই বাড়িবে; কিন্তু তাঁহারা তো এ কথা বলেন না যে পরিশ্রম করার ক্ষমতা বা ইচ্ছাশক্তিও ঐ বয়সেই চরম সীমায় আসিয়া যায়। যত বেশি বুদ্ধি লইয়া জন্মগ্রহণ করি ততই ভালো, কিন্তু শুধু তাহার উপরই বড় হওয়া নির্ভর করে না। কৃতকার্য হইতে গেলে মোটামুটি বুদ্ধি ও তৎসহ মনের বল, সংকল্প ইত্যাদি থাকা চাই। আই. কিউ. খুব বেশি নয় বলিয়া কাহারও হতাশ হওয়ার কারণ নাই। অবশ্য অত্যন্ত কম আই. কিউ. হইলে বড় কিছু করা সম্ভব নয়। কারণ যে কোনো কাজ করিতে গেলেই বুদ্ধির প্রয়োগ চাই। সুতরাং সাধারণ মাত্রার বুদ্ধি অবশ্য চাই। তৎসহ প্রয়োজন তাহাকে চালনা করিবার মনোবল।

বড়দের ভিতর যেমন এক এক ব্যক্তির এক এক রকমের প্রতিভা থাকে, শিশুদের ভিতরও তেমনি লক্ষ্য করা যায়। একটু বড় হইলেই দেখা যায় একটি ছেলে গান খুব ভালোবাসে, আর-একটি কলকব্জা লইয়া কাজ করিতে ভালোবাসে। একটি অঙ্ক পছন্দ করে, আর-একটি তাহা করে না, তবে সাহিত্য ভালোবাসে। কাহার কোন্ দিকে বিশেষ প্রতিভা আছে, তাহার উপর জীবনের সাফল্য ও প্রতিষ্ঠা অনেক নির্ভর করে; শৈশবেই যাহার যে-দিকে প্রতিভা, তাহার আভাস পাওয়া যায় এবং বর্তমানে তাহা নির্ণয় করিবার বহু টেস্ট্ বা পরীক্ষার উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে।

মোটামুটি কথা এই যে, শিশুর মন ক্রমশ যুক্তি, বিচার করিতে শিখে, তাহার চিন্তার ধারা সুশৃঙ্খলগতিতে চলিতে থাকে এবং বিশেষ বিশেষ দিকে তাহার মনের ক্ষমতা ফুটিয়া উঠিতে থাকে।

নীতিজ্ঞান ও সামাজিক আদর্শগ্রহণ

অনেকে মনে করেন যে, ছেলেপিলেরা 'দেবশিশু' অর্থাৎ তাহারা সরল, দেবতার ন্যায় মহৎ, হিংসা-দ্বেষ তাহাদের নাই; আমাদের মতন পাষণ্ডদের পাল্লায় পড়িয়া ক্রমে তাহারা চালাকি শিখে এবং নষ্ট হইয়া যায়। এই প্রকারের ধারণা যে কত ভুল তাহা আমরা একটু বিশ্লেষণ করিলেই বুঝিব। কোনো ছেলের একটি পুতুল বা এক টুকরা কাঠ—যাহা তাহার সম্পত্তি—স্পর্শ করিলেই সে চীৎকার করিয়া উঠিবে, নয়তো মারিতে আসিবে পাছে তার জিনিস বেদখল হইয়া যায়। হাতে কয়েকখানি বিস্কুট রহিয়াছে—বলিলাম, "দাও না আমায় একখানা।" হাত বাড়াইয়াছি বিস্কুট পাইবার আশায়—হঠাৎ দেবশিশু এমন দংশন করিলেন যে আদিমযুগের নরখাদকদের কথা মনে পড়িয়া গেল।

জন্মিবার পরক্ষণেই কেহ বুদ্ধ বা চৈতন্য হয় না। অথবা আমরাই যে তাহাদের নষ্ট করিয়া দিই এ কথাও বলা চলে না। আসল কথা হইতেছে এই যে, শিশু নীতিজ্ঞান লইয়া জন্মে না। কোন্টা ভালো বা কোন্টা মন্দ এ-রকম কোনো বিচার তাহার থাকে না। একটু বয়স হইলেই যখন তাহার বোধশক্তি বাড়িতে থাকে তখন সে দেখে যে কতকগুলি কাজ তাহার বাবা মা পছন্দ করেন, আর কতকগুলি অপছন্দ করেন। যেমন একটি নবাগত অতিথির গায়ে চিমটি কাটিলে অভিভাবক শাস্তি দেন, আবার পড়াশুনা করিলে বাড়ির লোকেরা বেশ খুশি হন। বাবার পকেট হইতে সিকি আধুলি গোপনে বাহির করিয়া চীনাবাদাম খাইলে তিনি চটেন, কিন্তু তাঁহার হারানো চশমা বাহির করিয়া দিলে তিনি খুশি হন। সকাল হইল, একটি ছোট ছেলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, একবার চৌবাচ্চার জল ফেলিতেছে, একবার রান্নাঘরে আনাগোনা করিতেছে, একবার 'মিটসেফে'র জালের ভিতর দিয়া লুব্ধ নয়নে বন্দীকৃত ক্ষীর পায়েস ইত্যাদি দেখিতেছে। তখন মা বলিলেন, "যাও, বই পড়ো,

ভালো ছেলেরা সকালবেলা পড়ে।" শিশু ক্রমাগত শুনিতে পায় ভালো ছেলেরা মিথ্যা কথা বলে না, মায়ের কথা শোনে, যেখানকার জিনিস সেখানে রাখে, চুরি করে না, খাওয়ার সময় 'এটা দাও, সেটা দাও' বলে না। অর্থাৎ ভালো ছেলে হইতে গেলে যাহা যাহা করা দরকার তাহা তাহাকে বার বার বলা হইল। শিশু দেখে যে ভালো ছেলের মতো কাজ করিলে সুবিধা অনেক। লোকের প্রশংসা পাওয়া যায়, কানমলা খাওয়ার মাত্রা কমিয়া যায়। পুরস্কারস্বরূপ জামা-কাপড়, ভালো খাবার জিনিস পাওয়া যায়। আর মন্দ ছেলের মতন কাজকর্ম করিলে পেটে পিঠে উভয়ত কষ্ট পাইতে হইবে। স্কুলেও মাস্টার মহাশয় বলেন ভালো ছেলে হইতে। মন্দ ছেলের কি পরিণাম তাহাও সে দেখে। সর্বত্রই যেখানে সে যায় সেখানেই দেখে 'ভালো ছেলে'র আদর, আর 'মন্দ ছেলে'র অনাদর।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে এবং বাবা মা ও সমাজের অনুশাসন হইতে সে চেষ্টা করে ভালো ছেলে হইতে। ক্রমে সে ঐ সমস্ত অনুশাসন অন্তরস্থ করিয়া ফেলে—অর্থাৎ, নিজেই যেন নিজের নৈতিক শিক্ষক হইয়া দাঁড়ায়। যেমন, পরীক্ষার ঘরে নকল করিবার সুযোগ রহিয়াছে; একবার মনে হয় নকল করি, আবার তৎক্ষণাৎ নিজে নিজে ভাবি, "ছি, তুমি এ কি করিতেছ? না, না, নকল করা উচিত নয়।" মা ঘুমাইয়া আছেন, একবার তীব্র ইচ্ছা হইল, আঁচল হইতে চাবি লইয়া 'মিটসেফ' খুলিয়া কিছু সরানো যাক, তৎক্ষণাৎ কে যেন ভিতর হইতে বলিল, 'চুরি ক'রে খাওয়া কি ঠিক হবে?' আমরা দেখিতে পাই, প্রথমে যে-সব নীতিমূলক কথা বাবা মা দাদা দিদি শিক্ষক পুনঃ পুনঃ বলিতেন, তাহা পরে শিশুর মনে এমনভাবে গ্রথিত হয় যেন ঐগুলি শিশুরই নিজস্ব বৃত্তি। তখন এমন অবস্থা হয় যে সে তার ছোট ভাইবোনদের শাসায়, "কাঁদিস্ না, কাঁদলে বিস্কুট পাবি না", "চুরি ক'রে খাস না", "মিছে কথা বললে নরকে যাবি", "পড়াশুনো না করলে কপালে দুঃখু আছে।" এই যে শিশুর নীতিজ্ঞান বা বিবেক তাহাকে ফ্রয়েড নাম দিয়াছেন—সুপার ইগো (Super Ego) বা 'বড় আমি'। অর্থাৎ আমাকে কি করিতে হইবে, কি ভাবে চলিতে হইবে ইত্যাদি যে সমঝাইয়া বা নির্দেশ করিয়া দেয় সেই 'বড় আমি'।

শিশুদের বিবেক শৈশবেই গড়িয়া উঠে। যে যেমন পরিবারে বা সমাজে বাস করে তাহার নীতিজ্ঞানও তেমনি হয়। সাঁওতাল ছেলে শুনিয়াছে ভালো ছেলেরা চাষবাস করে, গোরু চরায়, ভূতপ্রেত বিশ্বাস করে। তাই লেখাপড়া না জানিলে উহাদের ছেলেরা মন্দ হয় না। আবার ভদ্রসমাজে লেখাপড়া না জানিলে 'বদ ছেলে' বনিতে হয়। অনেক পরিবারে বাপ মা ছেলেদের এক-আধটুকু চুরি বা পাঠে অনভ্যাস ইত্যাদি লইয়া মাথা ঘামান না। তার ফলে ঐসব ছেলের ভালো পথে যাইবার সম্ভাবনা কমিয়া যায়। কারণ, বাপ-মায়ের তাচ্ছিল্যে 'সুপার ইগো' সুগঠিত হয় নাই। ভালো শিক্ষা ও পরিচালনার ফলে শিশুদের ভালোমন্দ বিচার করিবার ক্ষমতা বাড়িয়া যায় এবং নীতিজ্ঞান সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, পরে নৈতিক আদর্শের জন্য তাহারা সর্বপ্রকার

কষ্ট বরণ এবং সমাজের উন্নতি সাধন করিতে পারে।

শিশুরা কি আজন্মই খুব মিশুক? একটি ছেলে কি অন্য ছেলেদের সঙ্গে আপনা হইতেই মিশে এবং দলসৃষ্টি করে? অনেকের ধারণা, ছেলেরা ছেলেদের সঙ্গে তো মিশিবেই। শিশুদের পর্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায়, প্রথম দিকটাতে তাহারা অত্যন্ত স্ব-প্রধান থাকিতে চায়। দুই-তিনটিতে খেলিতে আরম্ভ করিল। কেহ বলিল, "রাঁধা-বাড়া খেলব", কেহ বলিল, "হা-ডু-ডু-ডু খেলব"। কাহারও কথা কেহ শুনিবে না, তাহার পর হয়তো দেখা গেল, তিনটি মাথার চুলে ছয়টি হাতে আকর্ষণ-বিকর্ষণলীলা চলিতেছে।

শিশুরা সাধারণত অত্যন্ত অবিনীত এবং অহংকাবী থাকে এই রকম কথা সর্বদা শোনা যায়, "জানিস, আমার বই তোর থেকে ভালো?" "তোর জুতো বিশ্রী, আমার জুতো চমৎকার" "তোর থেকে আমার গায়ে জোর বেশি, আয় না একবার লড়তে।" একটি শিশু অন্য একটিকে দেখিলে প্রথমই ভাবে, কে বড়ো, কার কত বেশি পুতুল আছে, কার জামা কত সুন্দব! আড়াআড়ি ভাবটা খুব ভালো ভাবেই ধরা পড়ে। কোনো একটা কৃতিত্বের কাজ করিয়া আসিয়া আত্মতৃপ্তি লাভ করে এই বলিয়া—"মা, ও বাড়িব পটলা আমার মতন এ-কাজ পারবে?" জ্বর হইয়াছে, মা বলিলেন, "ভাত আজ পাবে না, তুমি তো ভালো ছেলে, যাও, শুয়ে থাকগে।" অমনি সে বলিবে, "দেখ মা, পটলা এমন পাজি, জ্বরগায়ে ভাত খায় লুকিয়ে, আমি ওর চেয়ে অনেক ভালো, না?" এই প্রতিদ্বন্দ্বী ভাব শিশুদের প্রথমবয়সে খুব থাকে।

তারপর বড় হইতে থাকিলে সে দেখে স্কুলে কত ছেলে। তাহাদের সঙ্গে মানাইয়া চলিতে হইবে—বেশি রাগারাগি করিলে বা হুমকি দিলে তাহারা বয়কট করিবে, খেলায় লইবে না। বিদ্যালয়ে নানা পরিবার হইতে নানা প্রকারের ছেলে-পিলে আসে। নীচের ক্লাসে মাস্টার মহাশয় "স্যার, দেখুন, সমীর আমার বই নিয়ে গেল", "স্যার, নরেশ আমাকে ভ্যাংচাচ্ছে" এই রকম অভিযোগ শুনিতে শুনিতে বিরক্ত হইযা যান। ক্রমশ একত্র থাকিতে থাকিতে এবং ঝগড়ার তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে তাহাদের মধ্যে অনেকটা একতা আসে। উচ্চশ্রেণীর ছেলেদের ভিতর ঝগড়া কম ইহা সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। ঝগড়ার ফল সুখপ্রদ নয়। কারণ অনেক মাস্টার বা অভিভাবক কোনো নালিশ শুনিলে দুই পক্ষকেই শাস্তি দেন। এ তো হইল উপরওয়ালাদের বিচার—তা ছাড়া নিজেদের ভিতরও বেশ দু-চার ঘা দেওয়া ও খাওয়া চলে।

এ ছাড়া, অনেক খেলা আছে যা একা খেলা যায় না। ভালো ভালো খেলা প্রায়ই অনেকে মিশিয়া খেলে। তাহাতে সম্ভাব থাকার প্রয়োজন। কাজেই মিল করিয়া চলিতেই হইবে। স্কুলে, সভা-সমিতিতে, বাড়িতে, খেলার মাঠে—সর্বত্রই একতা এবং সম্ভাবের প্রয়োজন। সংঘবদ্ধ হইয়া কাজ করিতে বড়োরা সব সময়ই পরামর্শ দেন এবং অনেক সময়ে জোর করিয়া করাইয়া নেন। এইভাবে প্রয়োজনের

খাপ খাওয়াইয়া মিল করিয়া সবার সঙ্গে কাজ করিতে হয় এবং 'সংঘ-মনে'র (Group Mind) উদ্ভব হয়। ফলত স্ব--প্রাধান্য লোপ পায়, বা ভিতরে ভিতরে চাপিয়া রাখিতে হয়। কারণ তাহা না করিলে সবাই শাস্তি দিবে এবং একা একা থাকিতে হইবে। 'বয়কট' জিনিসটি যে ছেলেদের কাছে কি ভয়ংকর তাহা সবাই জানেন।

শিশুরা প্রথমে আত্ম-প্রধান (Ego centric) থাকে। ক্রমশ পর-প্রধান বা সমাজ-অভিমুখী (Socio centric) হইতে থাকে। কেহ যেন মনে না করেন যে এই পরিবর্তন আপনা আপনি হয়। রীতিমত শিক্ষা দিয়া ছেলেদের মিশুক করাইতে হয়। উহারা যখন দেখে যে নিঃসঙ্গ থাকিলে অশেষ কষ্ট, সবার সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া থাকা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, তখনই সমাজানুরাগী হয়।

খেলাধুলা

শিশুরা খেলিতে ভালোবাসে, কতরকম খেলা তাহারা খেলে তাহার ইয়ত্তা নাই। কেন যে শিশুরা খেলে, খেলার ভিতর শিশুমনের কি অভিব্যক্তি, তাহা একটু বিশ্লেষণ করা উচিত। মনোবৈজ্ঞানিকগণ অনেক যত্নসহকারে শিশুদের খেলার ধরন-ধারণ পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন। এক-এক জন এক-এক মত প্রকাশ করিয়াছেন।

ছেলেপিলেরা মাটি কাদা ইত্যাদি জিনিস লইয়া খেলিতে ভালোবাসে, পশুপক্ষী ইত্যাদি লইয়া তাহারা মত্ত হইয়া খেলাধুলা করে। ইহাতে মনে হয় আমাদের পূর্ববর্তী আদিম অধিবাসীদের জীবনযাত্রা-প্রণালীর পুনরভিনয় চলিতেছে।

অনেকে ভাবেন, তা নয়, শিশুদের খেলাতে ঐ প্রকারের কোনো গূঢ় রহস্য নাই। ছেলেদের শরীর যখন ভালো থাকে, মন প্রফুল্ল থাকে তখন মানসিক শক্তির প্রাচুর্যবশত তাহারা যাহা পায় তাহাই লইয়া খেলে। শিশু অসুস্থ বা মনে মনে অসন্তুষ্ট থাকিলে খেলাধুলা করে না। যখন ভিতরে আনন্দের আবেগ আর ধরে না, মন উচ্ছ্বসিত হয়, তখনই খেলার দিকে তাহার মন যায়।

কিন্তু শুধু মনের উচ্ছ্বাসই খেলাধুলার কারণ এ কথা সঠিক বলা যায় না। অবশ্য উচ্ছ্বাস থাকা চাই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় খেলার ভিতর ছেলেপিলেরা বড়োদের অনুকরণ করে। যেমন, একজন বাবা সাজিল। এখন আপিসে যাইতে হইবে, রান্না হয় নাই, চাকরকে সে ধমক লাগাইল। মেয়েরা খেলাতে মা বা জ্যেঠিমা-ঠাকুমা হইয়া এটা ওটা করিতে থাকে আর বিড়বিড় করিয়া বকে—"নাঃ, এদের কিচ্ছু হবে না, কেউ কাজ করতে আসবে না, খালি চা আর গল্প, আমি আব পেরে উঠছি না, কবে যে মরণ হবে।" ছেলেরা ট্রাম, বাস, টেলিফোন, পোস্ট অফিস, স্কুল, কলেজ, বাজার—যাহা কিছু তাহাদের ভবিষ্যতে প্রয়োজন সেইসব লইয়া খেলে। মেয়েরা পুতুলের বিয়ে দেয়, 'মা' হয়—মনে হয় যেন ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য তৈয়ার হইতেছে। তাহা হইলে দেখা যায়, খেলাতে শুধু 'খেলা'ই থাকে না, তার ভিতর

অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত আছে, শিশুর খেলা ভবিষ্যৎ জীবননাট্যের রিহার্সেল।

মনোবিদ্ ফ্রয়েড দেখাইতেছেন যে, শিশুর খেলাতে শিশু নিজের অভিলাষ ব্যক্ত করে। ছেলেপিলেরা অনেক সময় খেলে খাওয়া-দাওয়া সম্পর্কীয় কিছু লইয়া। রসগোল্লা, মাংস, লুচি, ক্ষীর, দই, চপ, কাটলেটে পাতা ভরিয়া গিয়াছে। বিরাট ভোজ—যত চাও তত পাইবে। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে বর্তমানে দৈনন্দিন জীবনে শিশু আহার্যের ইচ্ছা অনেকটা দমন করিতে বাধ্য হয়। কারণ এই কন্ট্রোলের বাজারে প্রতিদিন অত সব খাওয়া সম্ভব নয়। নেহাৎ একটু ডাল বা মাছ চাহিলেও মা-দিদিরা ধমকান। মুড়ি গুড়—তাহারও পরিমাণ নির্ধারিত। তাই সেই ভোজনের অতৃপ্ত খাওয়ার ইচ্ছা খেলাতে অভিব্যক্ত। এবার আর দমন করার কেহ নাই। শিশু জানে, তাহার কথা কেহ শোনে না, পরিবারে তাহার কোনো প্রতিপত্তি নাই। তাই খেলাচ্ছলে সে 'বাবা' হইয়া বসিল—যাহাকে যাহা বলে, সে তাহাই করে, ঠাকুর চাকর প্রভৃতি থরথর-কম্পমান। এইভাবে শিশুর যাহা চাহিদা তাহা সে খেলাতে মিটাইয়া লয়, কারণ বাস্তব জীবনে তাহাকে অনেক ইচ্ছাই দমন করিতে হয়। মেয়েরা খেলিবার সময় ভালো ভালো 'গয়না' পরে, ভালো ভালো জামা গায়ে দেয়, শাড়ি পরে—সবই কল্পনায়, কিন্তু তাতেও সুখ। প্রত্যেকটি খেলাই একটি ইচ্ছাপূরণের উপায়। এই জন্যই মনোবিশ্লেষণের জন্য শিশুদের খেলা পর্যবেক্ষণ করা নিতান্ত প্রয়োজন।

খেলার সামগ্রী এবং খেলার ধরন—এই দুইটি জিনিস লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে বিভিন্ন বয়সের শিশুদের বিভিন্ন প্রকারের খেলা পছন্দ হয় এবং বিভিন্ন প্রকারের সামগ্রী প্রয়োজন হয়। খুব অল্পবয়স্ক যাহারা তাহারা শুধু জল, কাদা বা টিনের টুকরা, মারবল, ছুরি, কাঁচি ইত্যাদি লইয়া খেলে। খেলার আয়োজনটি খুব সহজ—যেমন রান্না-বাড়া, বন-ভোজন, গাড়িতে ভ্রমণ, ইত্যাদি। বড়ো ছেলেরা যখন খেলে তখন তাহাতে থাকে অনেক বুদ্ধির প্রয়োগ। কলকব্জা লইয়া হয়তো তাহারা মাতিয়া রহিয়াছে, অথবা একটি সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করিতেছে। তাহারা স্রেফ জলকাদা লইয়া খেলে না। দুই দলে যুদ্ধ লাগিয়াছে, কত কায়দা, কত কৌশল চলিতেছে—কেহ কাহাকেও পরাস্ত করিতে পারিতেছে না, যেন রুশ-জার্মানের লড়াই।

ছেলেপিলেদের বুদ্ধির বিকাশ আমরা খেলাতে দেখিতে পাই। যদি দেখি একটি দশ-বারো বছর বয়সের ছেলে নেহাৎ জলকাদা লইয়া তাহার অপেক্ষা অল্পবয়স্ক ছেলেদের সঙ্গে খেলে তবে বুঝিব তাহার আই. কিউ. কম। কি জিনিস দিয়া খেলে এবং কি খেলে তদ্দ্বারা বুদ্ধির পরিমাপ হয়। খেলাতে শিশুরা একটি সমস্যা বুদ্ধি খাটাইয়া পূরণ করার চেষ্টা করে। সুতরাং খেলাতে বুদ্ধির একটা 'এক্স্পেরিমেণ্ট' চলে।

আর-একটি জিনিস খেলাতে বিকাশ পায়—নতুন কিছু সৃষ্টি করার ক্ষমতা। খেলাচ্ছলে মাটি দিয়া পাহাড় তৈয়ার করিল, সুন্দর বাগানওয়ালা বাড়ি তৈয়ার করিল, জন্তু, মানুষ—কত রকমের জিনিস সৃষ্টি হইল। ছোটোখাটো টেবিল, টুল, ব্র্যাকেট

এসব অনেক ছেলে তৈয়ার করিয়া ফেলে; মেয়েরা পুতুলের জন্য বেশ ভালো ভালো জামা করে, মোজা বোনে রঙ-বেরঙের কাপড় দিয়া বা কাগজ দিয়া ফুল তৈয়ার করে। 'অভিনয়' খেলে, ড্রপসিন আঁকে, এমনি করিয়া খেলার ভিতর দিয়া সৌন্দর্য-সৃষ্টি করে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে শিশুদের ভিতর যে নূতন কিছু করার একান্ত কামনা তাহা খেলার ভিতর প্রকাশ পাইতেছে। সাধারণ জীবনে যে সুযোগ পাওয়া যায় না, তাহা খেলাতে পাওয়া যায়—ইচ্ছামতো অব্যাহতভাবে যাহা খুশি তাহা তৈয়ার করিয়া লওয়া যায়। খেলার প্রবৃত্তির উৎস এই সৃষ্টি করার ক্ষুধা।

খেলা শিশু-জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ। খেলে না এমন শিশু দেখা যায় না। উপরের আলোচনা হইতে দেখা গেল, খেলার ভিতর শিশুমনের কত বৈচিত্র্যময় অভিব্যক্তি। খেলার প্রণালীর ভিতর তাহার অন্তরের কথা ফুটিয়া বাহির হয়, বুদ্ধির বিকাশ হয়, সর্বতোভাবে মনের স্ফুরণ হয়।

আদিম প্রবৃত্তি

শিশুদের ভিতর কতকগুলি সহজাত প্রবৃত্তি দেখা যায়। এই প্রবৃত্তিগুলি তাহারা কাহারো নিকট শিখে না। যেমন, ধরা যাক, একটি শিশু বোতল হইতে দুধ খাইতেছে, আমি রগড় করিবার জন্য বোতলটি মুখ হইতে সরাইয়া দিলাম, সে খুব চেঁচাইবে। তারপর পুনরায় বোতলটি মুখে দিলাম এবং সরাইলাম। তখন বেচারা এমন চটিয়া যাইবে যে হাত পা ছুঁড়িয়া কাঁদিয়া অস্থির হইবে এবং বোতলটি আবার মুখের কাছে ধরিলেও হয়তো দুধ খাওয়ার ইচ্ছা দেখাইবে না। সে অত্যন্ত রাগিয়া গিয়াছে। খুব ক্ষুদ্র শিশুদের এইরূপ রাগ লক্ষ্য করা যায়। মা-ঠাকুরমা যাঁহারা সন্তান পালন করেন, তাঁহারা খুব সহজে বুঝিতে পারেন শিশুরা কখন চটিয়া যায়। বিছানায় শুইয়া শিশু ভাবে, মা আসিবেন; অপেক্ষা করিল, কিন্তু মা আসিলেন না, তখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কাঁদিতে থাকিবে। মুখ লাল হইয়া গিয়াছে—রাগের সর্বপ্রকার লক্ষণ দেখা গিয়াছে।

একটু বড় শিশুদের তো কথাই নাই। ইচ্ছার সামান্য এদিক-ওদিক হইলেই প্লেট ভাঙিয়া দাপাদাপি করিয়া অস্থির। একটি ছেলে খেলিতেছে, আপনি মজা করিবার জন্য তাহার পুতুলটি লুকাইয়া রাখিলেন, তখন দেখিবেন সে উন্মত্তের মতো ক্ষেপিয়া যাইবে। তাহার শিশু-হস্তের প্রহারও আপনাকে খাইতে হইবেই, উপরন্তু যদি সামনে ইট-পাটকেল বা লাঠি থাকে, তবে স্থানীয় ডাক্তারকে ডাকিবার প্রয়োজনও হইতে পারে। বাড়িতে দুইটি ভাই আছে; একটি পুরানো নিব লইয়া ঝগড়া বাধিল। এ বলে 'এটা আমার', ও বলে 'না, আমার'। তখন উভয় উভয়কে চিমটি কাটিয়া হয়তো ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া দিল। ছেলেদের মেজাজ একটু 'মিলিটারী' ধরনের থাকে।

যখন বড় হইতে থাকে, তখন শিশুর রাগ ক্রমশ কমিতে থাকে। বড় বড়

ছেলেরা কথায় কথায় রাগ করে না। মনে মনে রাগ হইলেও সে তাহা চাপিয়া রাখার চেষ্টা করে। সুশিক্ষা এবং ভালো পরিচালনার ফলে তাহারা সহিষ্ণু হইতে শিখে এবং মাথা ঠাণ্ডা রাখিয়া বিচার করিতে শিখে। আবার অনেকে এই শিক্ষা না পাইয়া "রগ-চটা" থাকিয়া যায়। ক্রোধ-দমন সর্ব দেশের শাস্ত্রেরই অনুজ্ঞা—এই প্রবৃত্তিটিকে লইয়া চিন্তাশীল লোকেরা অত্যন্ত মাথা ঘামাইয়াছেন। কারণ ইহা শৈশবে সংযত না হইলে পরিণামে প্রকৃত সামাজিক এবং ব্যক্তিগত ক্ষতির কারণ হইয়া দাঁড়ায়। মনোবিদ্‌গণ বলেন, শিক্ষার ফলে ক্রোধ ভালো দিকে চালাইতে পারা যায়। যেমন, কোনও শিশুর মনে উচ্চ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করা গেল। ন্যায়পরায়ণতা, দয়া, দেশপ্রেম, সমাজসেবা ইত্যাদি উচ্চ ধারণা তাহার ভিতর রহিয়াছে। সে দেখিল তাহার দেশের উপর কেহ অত্যাচার করিতেছে। তখন সে ক্রুদ্ধ হইয়া অত্যাচারীর উচ্ছেদ করিবে, এই পণ করিল। কোনও ব্যাপারে অবিচার দেখিল, নির্দয়তা দেখিল—তখন সে তাহার নিরাকরণে ব্যস্ত হইবে। এখানে ক্রোধ উপস্থিত হইলেও তাহা সৎকার্যের সহায়ক হইল। অর্থাৎ শিক্ষা ও সামাজিক আদর্শ গ্রহণের ফলে ক্রোধ সর্বনাশা না হইয়া উৎকৃষ্ট ভাব-প্রেরণার উৎস হইল।

সামান্য কারণে ভয় ক্ষুদ্র শিশুদের ভিতর দেখা যায়। জোরে শব্দ হইল, সে ভয়ে আঁৎকাইয়া উঠিল। বিড়াল বা পোকামাকড় দেখিয়া চিৎকার করিল। ছাদে উঠিতে সে ভয় পায়। উঁচু জায়গায় উঠিলে ভয়ে মাকে জড়াইয়া ধরে। সন্ধ্যাবেলা অন্ধকারে যখন সব কালো দেখায় শিশুরা অসহায়ের মতো মা-মাসীদের আঁকড়াইয়া ধরে। অনেক সময়ে কি দেখিয়া ভয় পায় বুঝিবার জো নাই। কোনও একটা জিনিস কল্পনা করিয়া পর্যন্ত ভয় পায়।

বড় হইলে যে মরণের ভয় কমিয়া যায়, তাহা নয়। অনেকের বাড়ে—আরসোলা, টিকটিকি, শুঁয়োপোকা দেখিয়া কেহ কেহ যেরূপ ভয় পান, তা ফ্লাইং বম্ দেখিয়াও অপরে পাইবে না। তবে কথা এই—ছেলেবেলাকার কাল্পনিক ভয়গুলি প্রায় সবই দূরীভূত হইয়া যায়। অন্তত ভয় পাইলেও চাপিয়া রাখিবার ক্ষমতা আমরা অর্জন করি। ক্রমশ বুদ্ধি ও যুক্তি দ্বারা ভয়ের কারণগুলি যে অর্থবিহীন তাহা ধরিয়া ফেলি। তবে বড়দের ভিতর ভয়টা অনেক সময় মঙ্গলকর হইয়া দাঁড়ায়। যেমন সাপের বা বাঘের বা কলেরা-বসন্ত প্রভৃতি রোগের ভয়। শিশুরা এইসব স্থলে ভয় নাও পাইতে পারে, ফলত বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে পারে (কারণ তাহাদের ভয় অনেকটা খাম-খেয়ালী রকমের—বাঘ, সাপ দেখিয়া ভয় পাইল না, কিন্তু ফড়িং দেখিয়া হার্টফেল হওয়ার অবস্থা!)। কিন্তু আমরা ভয় পাইয়া সাবধান হইব, এবং জীবনরক্ষার সহায়ক হইবে ভয়। পাপের ভয়, ভগবানের ভয় ইত্যাদি থাকাতে আমরা অনেক দুর্ভোগ হইতে নিজে বাঁচি, অপরকেও বাঁচাই।

শিশুদের ভয় অনেকটা শাসনের ফলেও কমিয়া যায়। মা ছেলেকে বলিলেন, "এখানে একটু বোস্, আমি চচ্চড়িটা নামিয়ে আসছি।" এক মিনিটের ভিতর

চীৎকার, "ওমা, এস, আমাকে খেয়ে ফেলছে।" মা তাড়াতাড়ি আসিয়া দেখিলেন, কিছুই না। ব্যাপারটা বুঝিয়া পিঠে চড় কষাইয়া বলিলেন, "ইয়ারকির জায়গা পাও না লক্ষ্মীছাড়া?" ভয় কাটাইবার এই একপ্রকার ঔষধ। সামাজিক শাসন ভয় কমাইয়া দেয়। কোনও মুন্সেফ প্রফেসার উকিল ডাক্তার ইত্যাদি যদি ভূতের ভয় পান বা ব্যাঙ-ফড়িং দর্শনে নিকটস্থ উড়ে মালী বা হিন্দুস্থানী চাকরকে জড়াইয়া ধরেন তবে খবরের কাগজে নাম না উঠিলেও পাড়ায় পাড়ায় ঠাট্টা-বিদ্রূপের চাপে প্রাণ অতিষ্ঠ হইবে। "ভীরু" নাম হউক—এটা কেহ চাহে না। ঐ নামটি যাহাতে না হয় তাহার জন্য সব ছেলেমেয়ে যথাসাধ্য 'সাহসী' হওয়ার চেষ্টা করে। ভীরু নাম রটিয়া গেলে সমাজে মুখ দেখানো ভার।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, আদিম ভয়-প্রবৃত্তি শিশুকালে খুব বেশি-মাত্রায় থাকে এবং ভয়ের কারণ অনেক সময়ে হয় অলীক; পরে জ্ঞানলাভ, বিচারশক্তির বিকাশ এবং সমাজের শাসনের ফলে মিথ্যা ভয় কমিয়া যায়, এবং যুক্তিসংগত ভয় জীবন ও সমাজ রক্ষার সহায়ক হয়।

ছেলেপিলেকে আদর করিলে তাহারা খুব আনন্দিত হয়। ভালোবাসা তাহারা স্বভাবত বোঝে, এই জন্যই মাকে শিশুরা ভালোবাসে। অনুরাগ প্রবৃত্তি তাহাদের মধ্যে প্রবল। মা-পিসী দূরে চলিয়া গেলে কাঁদিয়া আকুল হয়। অসুখ-বিসুখ হইলে মাকে কাছে পাইতে চায়। শোয়ার সময়, খাওয়াব সময় তাহার মাকে না হইলে চলে না।

কিন্তু যখন সে বড় হইয়া অন্যান্য ছেলেদের দলে ভিড়িয়া গেল বা খেলাধুলো লেখাপড়া লইয়া ব্যস্ত রহিল, তখন ক্রমশ মায়ের প্রতি অনুবাগ এবং তাঁহার সান্নিধ্য-কামনা কমিতে থাকে। অনেকে বরং বাড়িতে আসিতেই চাহে না। বাহিরের জীবন অনেক বেশি চিত্তাকর্ষক মনে হয়। শিক্ষা, জ্ঞান ইত্যাদি লাভের সহিত তাহার মন বৃহত্তর জগতের স্পর্শ পায় এবং মা-বাপের দিক হইতে অনুরাগ অনেকটা বাহিরের দিকে চলিয়া যায়। ইহাতে ফল ভালোই হয়। কারণ যদি শিশু শুধু 'মা মা' কিংবা 'বাবা বাবা' করিয়াই সারাজীবন কাটাইত তবে এ জগতে আপেক্ষিক-তত্ত্ব, ক্রমোন্নতি—এসবই বা কে আবিষ্কার করিত? আর মহাকাব্য, সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস—এসবই বা কে লিখিত? বুদ্ধ শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি মহামানবেরা মাতৃপ্রীতিকে বিশ্বপ্রীতিতে পরিণত করিয়া সেই প্রেমামৃত জগতে বিলাইযাছেন। শিশুকালে মানুষের যে অনুরাগ গৃহে মা-বাবা দাদা-দিদি প্রভৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, পরে তাহা বহির্জগতেব নানা ব্যক্তি ও বস্তুর অভিমুখে প্রসারিত হয়। কেহ বা জ্ঞান-বিজ্ঞান সাধনায় অথবা মনুষ্যজাতির উন্নতিপ্রচেষ্টায মনের সমস্ত অনুরাগ নিয়োজিত করেন, কেহ বা মজলিস-সিনেমা পান-দোক্তা বিড়ি-সিগারেট চর্চায় তাহা অকাতরে বিলাইয়া দেন।

যৌন-প্রবৃত্তি শিশুদের ভিতর দেখা যায় কি? অনেকে এ প্রশ্ন শুনিয়া

আঁতকাইয়া উঠিয়া বলিবেন, "ছি, সোনার বাছাদের নামে এ কি যা-নয়-তাই কথা?" কিন্তু কোনো পরিপোষিত ধারণার বশবর্তী না হইয়া যদি আমরা শিশুদের ব্যবহার, কথাবার্তা লক্ষ্য করি তবে দেখিব তাহাদের যৌন-ঔৎসুক্য আছে। ছেলেমেয়ের কি তফাত, ছেলে হয় কি করিয়া—এ সব প্রশ্ন তাহারা করিয়া বসে।

প্রফেসার ফ্রয়েড শৈশবে যৌন-জীবনের স্ফুরণ সম্পর্কে আশ্চর্যজনক কতগুলি কথা লিখিয়াছেন। তিনি বলেন—শিশুদের যৌনক্ষুধা প্রথমত মুখ দিয়া চুষিয়া তৃপ্তি পায়। অতি ক্ষুদ্র শিশু সব সময় মুখে আঙুল দিয়া চুষিতে থাকে। যাহা কিছু তাহাকে দেওয়া গেল তাহাই মুখে পুরিল এবং চুষিতে লাগিল। মুখ দিয়া চোষা এবং কামড়ানোয় তাহাদের বয়স্ক লোকেদের যৌনপরিতৃপ্তির মতোই আনন্দ লাভ হয়, এবং ইহাই তাহাদের প্রাথমিক যৌন-জীবনের বিকাশ।

কিছু বড় হইলে ছেলেপিলেরা নিজেদের শরীর হইতে নির্গত মল লইয়া খেলিতে ভালোবাসে। তাহাদের পরিষ্কার করিতে আসিলে বাধা দেয়, যেন উহা কত আদরের জিনিস। মলত্যাগ করার সময় তাহাদের খুব আনন্দ হয় এবং মল দর্শনে বিশেষ তৃপ্তি পরিলক্ষিত হয়। এই আনন্দ শিশুর কাছে যৌন-পরিতৃপ্তির আনন্দেরই তুল্য বলিয়া ফ্রয়েড মনে করেন।

তারপর আরও বড় হইলে যৌন-ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে তাহার কৌতূহল ও উৎসাহ জাগে। যৌন-ইন্দ্রিয় লক্ষ্য করা, তাহাকে মূল্যবান সামগ্রীর ন্যায় মনে করা শিশুদের ভিতর প্রায়ই দেখা যায়। মূত্র লইয়া নিজেদের ভিতর তাহারা খেলা করে, উল্লাস প্রকাশ করে। কে কত দূরে উহা নিক্ষেপ করে তাহা লইয়া আলোচনা হয়—যেন তাহা কত বড় আত্মপ্রসাদের বস্তু। ইহাতে মনে হয় যেন শিশু যৌনতৃপ্তি লাভ করিতেছে। পরে অবশ্য যৌন-ইন্দ্রিয় ক্রমশ পরিপুষ্ট হয়, যৌবন উপস্থিত হয় এবং স্বাভাবিক যৌনজীবনের বিকাশ দেখা যায়। পরবর্তী জীবনে পূর্বাচরিত ক্রিয়াকলাপ বিস্মৃত হয়।

ফ্রয়েড আরও বলেন যে শিশুরা প্রথমত নিজের শরীরকেই নাড়াচাড়া করিয়া যৌন-আনন্দ লাভ করে। আঙুল চুষিয়া, ঠোঁট কামড়াইয়া, নিজের যৌন-ইন্দ্রিয়ের দিকে চাহিয়া বা স্পর্শ করিয়া নিজেই তৃপ্ত। তাহার ইন্দ্রিয়-সুখের জন্য অন্য কোনও ব্যক্তির প্রয়োজন বোধ করে না। ইহাকে স্ব-যৌন অবস্থা বা Auto-sexual stage বলে।

পরে দেখা যায় একটি ছেলে অপর ছেলের সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব করিতেছে। ছেলেতে ছেলেতে খুব খাতির,—একজন আর একজন ভিন্ন থাকিতে পারে না। নিজের খাবার হইতে অর্ধেক তুলিয়া অপরকে দিতেছে। ইহারা মেয়েদের সঙ্গে মিশিবে না। আবার মেয়েরাও শুধু মেয়েদের সঙ্গেই মিশে। একটি মেয়ে অন্য একটির সঙ্গে 'সই' পাতায়। একটি আর-একটিকে না দেখিয়া থাকিতে পারে না, সইয়ের নিন্দা সহ্য হয় না। এই বাল্যবন্ধুত্বের পিছনে রহিয়াছে স্বজাতি-অভিমুখী যৌন-অবস্থা বা

Homo-sexual stage।

ক্রমশ যৌবন বিকাশ লাভ করে, তখন পুরুষ নারী এবং নারী পুরুষ কামনা করে। ইহা পরজাতি-অভিমুখী যৌন-অবস্থা বা Hetero-sexual stage। ইহাই স্বাভাবিক, পূর্বের বালসুলভ মনোভাব দূর হইয়া যায় এবং মানসিক বিকাশ অগ্রসর হয়।

এই যে ধাপে ধাপে শিশুর যৌন-অভিব্যক্তি হইতে থাকে, তাহাতে যদি বাধা পড়ে, তবে ব্যক্তির মানসিক ক্ষমতার পরিপুষ্টি হয় না। তাহারা বড় হইলেও নানা দিকে অপূর্ণ থাকিয়া যায়। ফ্রয়েড শিশুর যৌন-শিক্ষার উপর বিশেষ নজর দিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে যৌন-প্রবৃত্তির সহিত ব্যক্তির বহুপ্রকারের মানসিক শক্তি সংশ্লিষ্ট থাকে এবং যৌন-প্রবৃত্তি যথাযথ সুপরিচালনা না হইলে ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয় না। অবশ্য ফ্রয়েডের মতবাদ সবাই যে মানিয়া লইয়াছেন তাহা নহে, তবে বহু সত্যই তাঁহার অনুশীলনের ফলে উদ্ঘাটিত হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই।

উপরের আলোচনাতে দেখা গেল, শিশু কি লইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং তাহার মানসিক শক্তি কি প্রকারে অভিব্যক্ত হয়!

শিশুমনের বিকার

কি ভাবে শিশুর মন বিকাশ লাভ করে তাহা পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু প্রশ্ন এই—সব সময় তো যাহা চাই তাহাই হয় না, অপ্রত্যাশিত কোনও বাধা আসিয়া যদি মনের গতি ব্যাহত করে তবে তাহার কি ফল হইবে? এমন সব ছেলেপিলে দেখা যায় যাহাদের ধরন-ধারণ অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়, ইহারই বা কারণ কি? শিশুরা স্বাভাবিক ভাবে গড়িয়া না উঠিলে কী কী কুফল হয় এবং তাহাদের অবাঞ্ছনীয় ব্যবহারের কারণ কী, আমরা তাহাই এক্ষণে আলোচনা করিব।

প্রথমত একটি কথা বলিয়া রাখা প্রয়োজন। অনেক ছেলেপিলে বড় হইয়াও সম্যক্ মানসিক বিকাশ লাভ করে না। ইহা যে সব সময়ই শিশুর পরিচালনার বা তাহার নিজের দোষ, তাহা নয়। অনেকে চিরকাল নির্বোধ থাকিয়া যায়, কারণ তাহাদের জন্মগত মানসিক শক্তিই খুব কম থাকে। হাজার চেষ্টা-চরিত্র করিয়াও তাহাদের উন্নতিসাধন সম্ভব হয় না। চেহারা দেখিয়া ইহাদের বুদ্ধির মাত্রা বোঝা যায় না। কোনও সূক্ষ্ম কাজ-কর্ম করিতে দিলে বা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে ইহাদের নির্বুদ্ধিতা ধরা পড়ে। মনোবিদ্গণ বুদ্ধি-যাচাই-প্রণালী দ্বারা নির্বোধদের বাছিয়া বাহির করেন।

নানা প্রকারের মানসিক শক্তি পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে যে কাহারও কাহারও মনের শক্তি চিরদিন দুই বছর বয়সের শিশুর মতো থাকিয়া যায়। আর ইহা অপেক্ষা বাড়ে না। যেমন, হয়তো বয়স চল্লিশ বৎসর, কিন্তু এখনও সে নিজে নিজে

কাপড় পরিতে বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজ করিতে অক্ষম। ইহাদের 'ইডিয়ট' (Idiot) বলা হয়। অন্য কেহ তত্ত্বাবধান না করিলে ইহাদের বাঁচিয়া থাকা দুষ্কর।

বড় হইলেও যাহাদের মানসিক শক্তি সাত বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের মতো থাকিয়া যায় তাহাদের 'ইম্বেসিল' (Imbecile) বলে। যেমন, কোনও মধ্যবয়স্ক লোক সহজ কাজকর্ম সবই করিতে পারেন, লেখাপড়াও সামান্য কিছু জানেন কিন্তু কোনও সমস্যা সমাধান করিতে পারেন না বা বিবেচনাশক্তির অভাব দেখাইয়া থাকেন।

যাহাদের মনের শক্তি দশ বছরের শিশুর মতো থাকিয়া যায় তাহাদের 'মরোন' (Moron) বলা হয়। ইহারা মোটামুটি সমাজে বেশ চলিয়া যায়, কিন্তু কোনও বিষয়ে বিশেষ দক্ষতা দেখাইতে পারে না।

আর এক শ্রেণীর নির্বোধ দেখা যায় যাহাদের বলে 'বর্ডার লাইন'। অর্থাৎ ইহারা স্বাভাবিক লোকেদের অপেক্ষা একটু নিচুতে। ইহাদের মানসিক শক্তি চিরদিন বারো বৎসরের বালকের মতো থাকিয়া যায়। এই প্রকার লোকদের লইয়া খুব বেশি কষ্ট পাইতে হয় না। তবে বিশেষ কৌশলপূর্ণ কাজ বা দায়িত্বপূর্ণ কাজ ইহারা করিতে পারে না।

মনোবিদ্ হলিংওয়ার্থ (Hollingworth) বলেন যে, উক্ত প্রকারের নির্বুদ্ধিতা প্রায় ক্ষেত্রেই বংশানুক্রমিক বা জন্মগত। কিন্তু উহাদের লইয়া কি করিতে পারা যায়? চোর, গুণ্ডা, ডাকাত, বদ্‌মায়েস—ইহারা প্রায়ই 'মরোন' বা 'বর্ডার লাইন' হয়। ভালোমন্দ বুঝিতে না পারায় ইহারা পরের কথায় বিপথগামী হয় এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধি না থাকাতে কোন্ কাজের কী ফল তাহা বিশ্লেষণ করিতে পারে না। সুতরাং ইহাদের কোনও একটা ভালোপথে পরিচালনা করিতে না পারিলে সমাজের পক্ষে যথেষ্ট ক্ষতির সম্ভাবনা।

আমরা ইহাদের শিক্ষার জন্য কোনও বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারি। স্কুলে না পাঠাইয়া সহজ প্রণালীতে ইহাদের লেখাপড়া শিখাইবার আয়োজন করিলে ভালো হয়। ডিগ্রী না পাইলেও চেষ্টা করিলে ইহারা অনেকটা পড়াশুনা করিতে পারে।

আর একটি উপায় আছে। হাতের কাজ বা কলকব্জার ব্যবহার শিখাইলে ইহারা স্বাবলম্বী হইতে পারে, এবং কাজে নিযুক্ত থাকিলে বিপথগামী হওয়ার অবকাশ এবং সম্ভাবনা কমিয়া যায়। দড়ি পাকানো, ধোপার কাজ, রান্না-বান্না, মোটর চালানো, তাঁত বোনা, কলকারখানার সাধারণ কাজ ইত্যাদি একটা কিছু যদি ইহারা আয়ত্ত করে তবে সমাজেরও উপকার হয়, উহাদেরও জীবনযাত্রার সাহায্য হয়। বুদ্ধি অনুসারে বিভিন্ন প্রকারের বৃত্তি ইহাদের শিখানো উচিত। উক্ত হীনবুদ্ধিরা যখন নিজেদের উপযুক্ত কাজ খুঁজিয়া না পায়, তখনই অসৎসঙ্গে মিশিয়া সমাজের ক্ষতি করে।

এই গেল এক শ্রেণীর ছেলেপিলেদের কথা যাহাদের ভিতরকার মানসিক শক্তিরই

অত্যন্ত অভাব। কিন্তু এমন তো অনেক ছেলেমেয়ে দেখা যায় যাহারা বেশ বুদ্ধিমান, ভিতরে নানা রকমের প্রতিভারও আভাস পাওয়া যায়, অথচ "ইতোভ্রষ্টস্ততো নষ্টঃ" হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। এই সব 'লক্ষ্মীছাড়া' ছেলেদের সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা আবশ্যক।

পিছিয়ে-পড়া ছেলে বা Backward Boy

এমন এক রকমের ছেলে আছে যাহাদের বুদ্ধি যথেষ্ট আছে কিন্তু তাহারা লেখাপড়ায় মোটেই উন্নতি করিতে পারে না। ইহারাই ব্যাক্‌ওয়ার্ড বা পিছিয়ে-পড়া ছেলে। অনেক ছেলে আছে যাহারা নীচের ক্লাসে বা ছেলেবেলায় খুব তীক্ষ্ম থাকে, পরে ব্যাক্‌ওয়ার্ড হইয়া পড়ে। এই সব ছেলে বুদ্ধি-পরীক্ষায় উঁচু স্থান অধিকার করে, কিন্তু ক্লাসে শেষের বেঞ্চিতে বসে এবং ফেল করিতে থাকে। বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যায় যে, ইহারা পড়ে না, ধৈর্য ধরিয়া বেশিক্ষণ থাকিতে পারে না। কোনও উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা সংকল্প ইহাদের নাই। কিন্তু তাহাই বা কেন হয়? এক হইতে পারে যে শিশুর মনে কোনও আঘাত লাগিয়াছে তাহাতে তাহার পক্ষে কিছুতে মনোনিবেশ করা সম্ভব নয়। আমি একটি ছেলেকে জানিতাম। নিচু ক্লাসে সে খুব ভালো ছিল, প্রথমস্থান অধিকার করিত। পরে উঁচু ক্লাসে উঠিয়া ছেলেটি একেবারে যেন 'বোকা' হইয়া গেল। অবশেষে সে ফেল হইল। ইহাতে সবাই খুব আশ্চর্য হইয়া পড়েন। অনুসন্ধান করিয়া দেখা গেল—ছেলের মা মারা যান এবং অল্পকালের মধ্যেই তাহার একটি বিমাতা লাভ হয়। শিশুর মনে এত বড় আঘাত লাগিল যে তাহার মন ভাঙিয়া পড়িল এবং বুদ্ধি যেন জড়তাগ্রস্ত হইল। সে পিছিয়ে-পড়া ছেলেদের দলে ভিড়িয়া পড়িল।

অথবা এমনও হইতে পারে যে পরিবারে ভীষণ দুঃখ বা বিপদ উপস্থিত হইল, বাবা দেউলিয়া হইলেন, অথবা অভিভাবক অত্যন্ত মারধোর করেন, কিংবা ছেলে চায় ডাক্তার হইতে কিন্তু বাবা চায় তাহাকে এ. আর. পি.-তে ঢুকাইতে—এই রকম ক্ষেত্রে শিশুর মন আহত এবং হতাশ হইয়া পড়ে। তখন লেখাপড়াতে ছেলেপিলেদের অবনতি হয়। মনোবিদ্‌গণ, বিশেষত মনোবিশ্লেষকেরা (Psycho-analyst) বলেন যে, মানসিক আঘাতে যে শিশুরা 'বোকা' বনিয়া যায়, তাহাদের বুদ্ধির অপলাপ হয়। বাহ্যত তাহা বোঝা যায় না, বিশ্লেষণ করিয়া কারণ খুঁজিয়া বাহির করিতে হয় এবং শিশুর মনে পুনরায় আশা ও উৎসাহ আনিয়া দিলে তাহার উপকার হয়, উন্নতি অব্যাহত থাকে।

এমন অনেক ছাত্র পাওয়া যায় যাহারা ইংরেজীতে ভালো কিন্তু অঙ্কে অত্যন্ত খারাপ; ইতিহাসে ভালো, কিন্তু ভূগোলে খারাপ। যথেষ্ট বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও এমন হয় কেন? গবেষণা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ইহাদের ভিতর কতকগুলি

বিষয়ের প্রতি অত্যন্ত বিরাগ থাকে। যেমন, অঙ্ক পারে না, অর্থাৎ অঙ্ক ভালো লাগে না। তাই অংকেব জন্য খাটিতে ইচ্ছা করে না, ফলও ভালো হয় না। যদি এই ঔদাসীন্য কাটিয়া যায় এবং বিষয়ের প্রতি অনুরাগ আসে, তখন ঐ বিষয়েও তাহার অদ্ভুত উন্নতি দেখা যায়। কোনও একটি অংকের পণ্ডিতের কথা আমি জানি। তিনি স্কুলে একবার অংকে শূন্য পাইয়াছিলেন। একজন খুব ভালো শিক্ষক তাঁহার জন্য রাখা হইল। তিনি উঁহার মনে অংকের প্রতি অনুরাগ জন্মাইয়া দিলেন। তাহার পর অংকে তাঁহার প্রতিভা খুলিয়া গেল।

অনেক শিক্ষক নিজের অক্ষমতার জন্য শিশুর মনে বিষয়ের প্রতি অনুরাগ না জন্মাইয়া প্রায়ই অশ্রদ্ধা জন্মাইয়া থাকেন। দেখা গিয়াছে শিক্ষক পরিবর্তনের ফলে পাঠে অনেকের উন্নতি হইয়াছে। নতুন মাস্টার মহাশয়কে ছেলে ভালোবাসে, সুতরাং তিনি যাহা পড়ান তাহাও সে ভালোবাসে। এই ব্যক্তিত্বের জোর শিক্ষকের পরম সহায়।

অনেক সময় ছেলেরা জিদ্ করিয়া কোনও বিষয়ে তাচ্ছিল্য দেখায়। বাবা কি মা হয়তো বলেন, 'এই গাধা, দেখব ইংরেজীতে তুই কত নম্বর পাস।' ছেলেটি হয়তো আশানুরূপ ভালো করিতে পারিল না। তখন বাবা সব সময়ই টিপ্পনী কাটেন, "চাকরি ক'রে খেতে হবে না, যাও কুলীগিরি করগে", "রান্না-টান্না শেখ, রাঁধুনে বামুন হতে হবে যে।" ছেলে এবার সংকল্প করিল যাত্রার দলে ঢুকিতে হয় সেও ভালো, তবু ইংরেজীর জন্য একটুকুও সে খাটিবে না। বাড়িতে অত্যাচার, কটুকথা বা অভিভাবকের মারধোর এবং অপমানের শোধ তোলে সে বার্ষিক পরীক্ষার ঘরে বসিয়া।

একটি বিষয়ে খারাপ বলিয়া ছেলেরা ক্রমশ অন্য বিষয়েও খারাপ হইতে থাকে এবং আত্মবিশ্বাস হারাইয়া ফেলে। যথাশক্তি আমাদের এই সমস্যার সমাধান করা উচিত।

খাওয়ানোর সমস্যা

অনেক শিশু সহজে খায়, তাহাদের খাওয়াইতে বেগ পাইতে হয় না। কিন্তু অনেক ছেলেমেয়েকে খাওয়াইবার সময় দাঙ্গাহাঙ্গামার উপক্রম হয়। হাত পা ছুঁড়িয়া, বমি করিয়া, চিৎকার করিয়া, ঘামিয়া ইহারা অস্থির হয়। এসব ক্ষেত্রে কোনো মানসিক গোলমাল থাকে। অবশ্য শারীরিক কোনও রোগ যদি শিশুর থাকে তো অন্য কথা। বেশির ভাগ জায়গায় শিশু মনে মনে উত্তেজিত থাকায় ঐ রকম হয়। শিশু হয়তো মাকে অনেকক্ষণ চাহিয়াছিল, পায় নাই; বা অন্য কিছু খাইতে চাহিয়াছিল, তাহা তাহাকে দেওয়া হয় নাই। অনেক মা-মাসী-পিসী আছেন যাঁহারা জোর করিয়া ছেলেকে খাওয়াইতে চান—সে চাউক বা না চাউক। শিশুর আর খাইবার ইচ্ছা নাই, তবু তাহাকে মোটা হইবার জন্য খাইতেই হইবে। অথবা বাড়িতে দিনরাত্রি অত্যধিক বাঁধা-বাঁধি কড়াকড়ি চলিতেছে। এসব ক্ষেত্রে শিশু তাহার আপত্তি বা

অসম্মতি ঐভাবে জানায়।

অনেক ছেলেপিলে অত্যন্ত ধীরে ধীরে খায়। হয়তো বারোটায় ঠাকুরমা খাওয়াইতে বসিলেন, বেলা দুইটা পর্যন্ত ঐ পর্ব চলিল। ছেলে একবার একটু খায়, তারপর খেলে, তারপর দৌড়াদৌড়ি করে, কাঁদে—এইভাবে তামাশা চলিতে থাকে। ইহার কারণ সহজ—অত্যধিক আদর। শিশু দেখে তাহার খাওয়া সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। এই ভাবে প্রশ্রয় পাইতে পাইতে সে রগড়ের মাত্রা বাড়াইয়া দেয়। তখন অভিভাবকের ধৈর্যের সীমাও অতিক্রান্ত হয়।

আর-এক দলের ছেলেপিলে দেখা যায় যাহারা খাইয়াই চলিয়াছে—'না' কখনও বলে না। কখন থামিতে হইবে তা-ও জানে না বা থামিবার মতলবও নাই। ঐ অভ্যাস সাধারণত নির্বোধ বা ক্ষীণবুদ্ধি (Sub-normal) শিশুদের ভিতর দেখা যায়। 'ওজন বুঝিয়া ভোজন করা' ইহাদের শিখানো হয় নাই। আদর দিয়া বেশি খাওয়ানোর ফলে তাহাদের ঐরকম অস্বাভাবিক 'বৃকোদরত্ব' লাভ হয়।

নিদ্রা-সমস্যা

রাত্রি যতই বাড়িয়া চলুক, একপ্রকারের ছেলেমেয়ে আছে তাহাদের চোখে ঘুম নাই। বড় কর্তারা ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, কিন্তু উহারা জাগিয়া আছে। আমি একটি গ্রাম্য পরিবার জানিতাম। ঐ পরিবারের ছেলেরা রাত বারোটার সময় লণ্ঠন জ্বালাইয়া 'হা-ডু-ডু' খেলিত। অনেক সময় দেখা যায় শিশু ঘুমাইয়াছে, কিন্তু প্রায়ই অস্থির হইয়া এপাশ ওপাশ করিতেছে বা অস্বস্তি বোধ করিতেছে। কিছুতেই সুনিদ্রা হইতেছে না অথবা স্বপ্ন দেখিয়া ভয়ে আঁতকাইয়া উঠিতেছে, কখনও বা বকবক করিয়া কথা বলিতেছে। আবার এমনও দেখা যায় যে কোনো কোনো শিশু যেন জাগিয়া থাকিতে কষ্টবোধ করে। পড়িবার সময় ইহারা ঘুমায়, খেলিবার সময় ঢুলুঢুলু নেত্র, সব সময়ই ঝিমাইতে অভ্যস্ত। কুম্ভকর্ণের জাতি না হইয়াও ইহারা সে অভাগাকে ছাড়াইয়া যায়।

অস্বাভাবিক নিদ্রার কারণ কোনও শারীরিক ব্যাধি হইতে পারে। কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই ঐ কারণ থাকে না। অনেক ছেলেমেয়ে ঘুমাইতে চাহে না, ভাবে—ঘুমাইলে কি যেন মজা দেখিতে পাইবে না। অথবা অজানা ভয়ে উহারা অস্থির হয়। স্বপ্নে কিম্ভূতকিমাকার প্রাণীদের দেখিয়া তাহারা অত্যন্ত ভয় পায় এবং ঘুমাইলে পাছে ঐসব দেখিতে হয় সেই ভয়ে ঘুমাইতে চায় না। যেসব ছেলেপিলে 'অসুখী' অর্থাৎ যাহাদের স্নেহ করিবার কেহ নাই, বা মা-বাবা নির্যাতন করেন, তাহারা ঘুমের ভিতরও চঞ্চলতা প্রকাশ করে। কারণ, মনে একটা উদ্বেগ থাকাতে তাহাদের ভালো ঘুম হয় না। ঘুমের পূর্বে যদি কোনও উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনা ঘটে বা বাড়িতে অথবা আশেপাশে হুলস্থূল চলিতে থাকে তাহাতেও ছেলেপিলেদের ঘুমাইতে দেরি

হয়। ঘুমাইতে দেওয়ার প্রয়োজন, নহিলে দুপুররাতেও তাহারা ঘুমাইবে না। এ-বিষয়েও মা-বাবার বিশেষ যত্নবান হওয়া উচিত। যে-সব ছেলে সারাদিন ঝিমায় তাহাদের রাত্রিতে হয়তো কম ঘুম হয়, বা ভালো খাওয়া-পরা জোটে না, শরীর অত্যন্ত দুর্বল। হীনশক্তি শ্রেণীর (Sub-normal) শিশুদের ভিতর ঝিমানো রোগটা একটু বেশি; কারণ, তাহারা কোনো বিষয় ভালোভাবে গ্রহণ করিতে পারে না, কিছুতেই তাহাদের মন লাগিয়া থাকে না। তাহাদের দেখিবার, শুনিবার, বুঝিবার বিশেষ কিছু নাই। সুতরাং ঝিমাইয়া কাটানো ছাড়া উপায় কি?

বদমেজাজ

শৈশবে ছেলেপিলেরা যত সহজে চটে এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সাহায্যে রাগ জাহির করে, পরে আর তাহা করে না। ছেলেপিলেদের রাগ আমরা কী করিয়া বুঝি? দু প্রকারে তাহার অভিব্যক্তি হয়।

প্রথমত শিশু চটিয়া গিয়া কাহাকেও মারপিট্ করে, জিনিস ভাঙে, কামড়ায়—অর্থাৎ শরীরের কসরৎ দেখায়। শুধু তাই নয়, তারস্বরে চিৎকার করে এবং দুই-চারটি 'আন্‌পার্লামেণ্টারি' বুলি ছাড়ে। পাড়ার লোকেরা টের পায়। রাস্তায় লোক জমিয়া যায়, মহা হুলস্থুল কাণ্ড! অভিভাবকদের প্রাণান্ত অবস্থা। বাধা দিতে গেলে ফল ভয়াবহ হয়, কারণ তাহা হইলে শিশু জিনিসপত্র ভাঙিয়া শেষ করিবে। ক্রমে যখন শক্তিতে আর কুলায় না তখন শিশুর মেজাজ ঠাণ্ডা হইতে থাকে।

দ্বিতীয়ত অনেক শিশুর রাগ ভাষা বা অঙ্গচালনায় অভিব্যক্ত হয় না, নীরবতা এবং নিষ্ক্রিয়তায় প্রকাশ হয়, এই শ্রেণীর ছেলেপিলেরা চটিয়াছে কি-না সহজে বুঝিবার জো নাই। চুপচাপ গম্ভীর মুখে এক-কোণে বসিয়া আছে—মনে মনে কিন্তু চটিয়া আগুন। ইহারা বড় বেশি কিছু অন্যের ক্ষতি করে না। বিমর্ষ হইয়া থাকিতে থাকিতে পরে মানসিক রোগগ্রস্ত হইতে পারে—এই যা ভয়।

যে সব ছেলেপিলে তাহাদের কাজকর্মে বেশি বাধা পায় তাহাদেরই এরূপ ক্রোধের অভিব্যক্তি দেখা যায়। শিশু যাহা করে তাহাই খারাপ এরূপ মনে করিলে সেও চটিয়া থাকে। যাহা চায় তাহা কখনও পায় না—সে অত্যন্ত বিরক্ত হইতে থাকে। তারপর হঠাৎ রাগিয়া গেলে আর সহজে থামে না—অনেক দিনের বিফলতায় প্রতিশোধ তুলিতে চায়। আদুরে ছেলেপিলেরা অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করার এবং জিনিস আদায়ের জন্যও অনেক সময় এই 'পলিসি' গ্রহণ করে। চেঁচাইলে বা জিনিসপত্র ভাঙিবার হুমকি দেখাইলে অনেক চাহিদা নিশ্চয়ই মিটিবে, কিংবা মা-মাসী-ঠাকুরমা নিশ্চয়ই দৌড়াইয়া আসিবেন এবং নানাবিধ উপহার দিবেন যাহাতে খোকাবাবু দয়া করিয়া চুপ করেন।

হিংসুক ছেলেরাও অনেক সময় ঐ রকম কাণ্ড করে। ছোটো ভাই বা অন্য

কাহারও উপর তীব্র হিংসা, তাহার খাওয়া-পরা কাপড়-জামা সব অসহ্য মনে হয় এবং সর্বদাই এইরূপ উত্তেজনা পোষণ করার ফলে তাহাদের মেজাজ অত্যন্ত খারাপ হইয়া পড়ে। বাড়িতে যদি বাবা, মা বা অন্য কেহ খুব রাগী থাকেন তবে ছেলে-মেয়েরাও তাহার নকল করে। বাবা হয়তো রাগিয়া প্লেট ভাঙেন, দোয়াত ছুঁড়িয়া ফেলেন—সন্তানরাও বাবার মতো হইতে চেষ্টা করে। কোনো কোনো মহিলা রাগিয়া চুল ছিঁড়েন, চিৎকার করেন, গয়না ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেন—এই রকম পরিবারের ছেলেমেয়েরা অত্যন্ত বদ্‌মেজাজী হয়।

মিথ্যাবাদিতা

অনেকের ধারণা, শিশুরা দেবতার মতো নির্দোষ, কখনও মিছা কথা বলে না। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই শিশুরা বক্‌বক করিয়া ঝুড়ি ঝুড়ি মিছা কথা বলে—অবশ্য সব সময় যে ঠকাইবার জন্য বলে তা নয়। হার্টসর্ন্ এবং মে (Hartshorne & May) গবেষণা করিয়া দেখিয়াছেন যে, মিথ্যুক ছেলে-পিলেদের একটু বেশি কল্পনা করার অভ্যাস, কোনো কিছু তলাইয়া দেখার ইচ্ছা তাহাদের নাই। উঁহারা আরও বলিয়াছেন যে, মিথ্যাবাদী ছেলেরা বুদ্ধিতে একটু কাঁচা। প্রফেসার বার্ট্ (Burt) অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন, ছেলেমেয়েদের মিছা কথা বলার অনেক উদ্দেশ্য থাকিতে পারে। একটি ছেলে আসিয়া বলিল, "মা, দেখ, আমাদের কুকুরটার সঙ্গে প্রকাণ্ড একটা গাধা খেলা করছে।" এখানে ছেলেটি নেহাত মজা করিবার জন্য একটু রঙ ফলাইয়া কথা বলিয়াছে।

অথবা নিজের বীরত্ব প্রকাশ করিবার জন্য একটা জলজ্যান্ত মিথ্যা গল্প রচনা করিয়া বসে। 'জানো মা, আমি দুটো চোরকে ধ'রে পুলিসে দিয়ে এসেছি', 'একটা বাঘ গুলি ক'রে মেরেছি'—এই রকম বীরত্বব্যঞ্জক কথা তাহাদের মুখে অনেক শোনা যায়।

কাহারও প্রতি ঈর্ষা থাকিলে ছেলেরা অনেক মিথ্যা কথা তাহার নামে লাগায়। শিক্ষক মহাশয়েরা খুব ভালো করিয়াই জানেন যে, ছাত্রদের মধ্যে দলাদলি থাকিলে দুই পক্ষ হইতেই কত কাল্পনিক অভিযোগ আসিতে থাকে। বাড়িতেও ভাই-বোনদের ভিতর হিংসা থাকিলে বাবা আপিস হইতে আসিবামাত্র তাঁহাকে অজস্র নালিশ শুনিতে হয়। অভিযোগের ভিতর সত্য অনেক সময়ে কমই থাকে।

মিথ্যা কথা বলিয়া ঠকানো—এও যথেষ্ট দেখা যায়। মাস্টারমহাশয়কে, বাবাকে, কাকাবাবুকে—অনেক ছেলে প্রায়ই 'বোকা' বানাইয়া দেয়। মিছা কথা বলিয়া টাকা আদায়, দুষ্কর্ম করা অহরহ চলিতে থাকে।

দেখা গিয়াছে যে, মিথ্যুক ছেলেমেয়েরা বেশির্ ভাগ এমন সব পরিবার হইতে আসে্ যেখানে নৈতিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। মিথ্যুক ছেলেমেয়েদের বাপ-মা

অনেক সময় নিজেরাই মিথ্যুক। অথবা, সামান্য অপরাধের জন্য উহারা এমন শাস্তি পায় যে ভয়ে মিথ্যা কথা বলিয়া শাস্তি এড়াইতে চায়। অনিচ্ছাসত্ত্বেও একটা জিনিস ভাঙিয়া ফেলিয়াছে, এখন কি উপায়? যদি বাবা জানেন? স্রেফ অস্বীকার করাই ভালো। আত্মরক্ষার উপায় হিসাবে অসহায় শিশু অনেক সময় মিথ্যা কথা বলে। আমাদের প্রথমত অনুসন্ধান করা উচিত, শিশু কেন মিথ্যা কথা বলে? কি তাহার সমস্যা? ভালো করিয়া তলাইয়া দেখিয়া বিচার করা উচিত এবং এমনভাবে তাহাদের পরিচালনা করা উচিত যেন শিশুর মিথ্যা কথা বলিবার কোনও প্রয়োজনই না হয়।

হীনম্মন্যতা বা আত্মলাঘব (Inferiority Complex)

অনেক ছেলেপিলে কোনো কাজেই অগ্রসর হয় না—প্রশ্ন করিলে বলে, 'না, আমি পারব না।' খেলায় যোগ দেয় না, ক্লাসে একেবারে শেষের বেঞ্চিতে বসিয়া থাকে। লোকজন দেখিলে পলাইয়া যায়। কথা বলিবার সাহস নাই এবং সব সময়ই ভাবে 'আমার কিছু হইবে না' 'আমার চেহারা খারাপ' 'আমি গরিব'। নিজেকে কীটাণু-কীট মনে করে। এই রকম ছেলেদের গড়িয়া তোলা অত্যন্ত কঠিন, আর এই মনোভাবকে প্রফেসার অ্যাডলার (Adler) নাম দিয়াছেন, ইন্‌ফিরিয়রিটি কম্‌প্লেক্স। এই ধরনের লোকেরা বলিবে, 'আমি সুযোগ পাই নাই, তাই কিছু করিতে পারি নাই।' অন্য ছেলেদের অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত ঈর্ষা প্রকাশ করে এবং ভাবে 'ওদের গাড়ি আছে, আমার কিছু নেই'। এই কথা ভাবিতে ভাবিতেই দিন কাটে, খাটিয়া যে সেও কিছু হইতে পারে এমন বিশ্বাস নাই। ইহারা কোনও নূতন কাজ বা নূতন বিদ্যা অভ্যাস করিবে না, পাছে 'না পারে'। "পারিব না বলিয়া মুখ ভার" করিয়াই আছে। খেলাধুলাতে কোনও প্রকার উৎসাহ দেখায় না বলিয়া সবাই ইহাদিগকে 'কুনো' ছেলে বলে। শারীরিক ও মানসিক দিক হইতে এরূপ মনোভাব অত্যন্ত ক্ষতিকর। এই সব শিশু বাস্তব জগতে বিফল হওয়াতে একটা কল্পনার রাজ্য গড়িয়া সেখানেই বিচরণ করে। মনে মনে দিবাস্বপ্ন দেখে: সে এক 'ফুটবল টিম' গড়িয়া তুলিয়াছে, দেশ-বিদেশ হইতে তাহার আমন্ত্রণ আসিতেছে। লেখাপড়া শিখিয়া এমন বিদ্বান হইল যে ভারতবর্ষে কেহই তাহার সঙ্গে কথা বলিবার উপযুক্ত নয়।—কল্পনাতেই সে সফলতার আনন্দ লাভ করে।

এই প্রকার মনোভাব যে গড়িয়া উঠে তাহার অনেক কারণ। যে সব অভিভাবক ছেলেমেয়েদের কাছে অনেক বেশি কিছু আশা করেন তাঁহারা প্রায়ই এই মনোবিকারের জন্য দায়ী। ছেলেকে আই. সি. এস. হইতেই হইবে, মেয়েটি সর্বগুণান্বিতা হইবে—খুব বেশি চাপের ফলে কিছুই হয় না। বরং হিতে বিপরীত হয়—আত্মবিশ্বাস নষ্ট হইয়া যায়। আমাদের স্বীকার করা উচিত যে, সব ছেলের সব

কিছু হয় না। আমরা যদি তাহাকে সব সময় খোঁটা দিয়া বলি, 'তোর কিছু হবে না'—বেচারা তখন কি করিবে? চূড়ান্ত চেষ্টা করিয়াও যদি আশানুরূপ ফললাভ না হয় তখন তাহাকে আর ঠাট্টা করা উচিত নয়। করিলে সে ক্রমশ একেবারে হাল ছাড়িয়া দিবে এবং জীবনে বিফল হইবে। শিশু যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া নিজ ক্ষমতানুসারে যেটুকু সাফল্য অর্জন করিতে পারে, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। নতুবা তাহাকে অপমান করিলে অথবা তাহার প্রতিকার্যে নৈরাশ্য এবং অসন্তোষ প্রকাশ করিলে তাহার মনের বিশ্বাস একেবারে চলিয়া যাইবে এবং সে নিজেকে সর্বক্ষেত্রেই শক্তিহীন বা অক্ষম বলিয়া মনে করিবে।

অত্যধিক আদর দিলেও ঐ রকম হীনম্মন্যতা বা আত্মলাঘবের ভাব জন্মে। আদুরে ছেলেমেয়েরা বাপ-মা বা অন্য ব্যক্তির উপর অত্যন্ত বেশি নির্ভর করে। কারণ, তাহারা নিজেরা কিছুই করে না, দাদা-দিদিরা তাহার করিবার পূর্বেই সব-কিছু করিয়া দেন। স্বাধীন চেষ্টার কখনও প্রয়োজন হয় না বলিয়া তাহার ইচ্ছাও আর থাকে না। অন্যের উপর নির্ভর করিতে গিয়া তাহারা অসহায় হইয়া পড়ে। পরীক্ষার হলে বা খেলার মাঠে পিসী-মাসীরা তো আসিয়া উদ্ধার করিবেন না, তাই বেচারীরা বিফলতার ভয়ে কোনো কাজে অগ্রসর হয় না। তাহাদের মনে 'আত্ম-লাঘব' স্থায়ী হইয়া দাঁড়ায়। সুচিন্তিত প্রণালীতে শিশুদের শিক্ষা না দিলে এইরূপ বিভ্রাট উপস্থিত হইয়া জীবন পণ্ড করে।

তোতলামি

তোতলা ছেলেরা আমাদের একটি বড় সমস্যা। বড় হইয়া উহারা অত্যন্ত লজ্জিত থাকে এবং লোকের সঙ্গে কথাবার্তা বলা এড়াইয়া চলে। অনেকের ধারণা জিভের দোষের জন্য ঐরূপ হয়। মনোবিদ্‌গণ দেখিয়াছেন যে, মানসিক গণ্ডগোলের জন্যই শিশুরা তোতলামি প্রকাশ করে। ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া শিশু যখন অভিভাবকদের সামনে উপস্থিত হয় তখন তোতলামি বাড়িয়া যায়।

অনেক শিশু স্পষ্টভাবে কথা বলার অভ্যাস না করায় তোতলা থাকিয়া যায়। নূতন কথা শিখিবার সময় ভালো উচ্চারণ করে নাই, বা রগড় করিয়া তোতলাইয়া কথা বলিত; ফলে তোতলামি অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে; অথবা হয়তো, তোতলা ব্যক্তিকে অনুকরণ করিতে গিয়া সে আপন উচ্চারণ বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে।

অনেকে চিন্তা না করিয়া তাড়াতাড়ি কথা বলিতে যাইয়া বিপদে পড়ে, তাহাদের কথা জড়াইয়া যায়। অথবা কোন স্থানে কি ভাবে কথা বলিতে হইবে বুঝিতে না পারিয়া তোতলাইতে থাকে। যে-সব ছেলেপিলে নিজেদের খুব অসহায় মনে করে এবং যাহাদের 'লঘুত্ববোধ' অত্যন্ত বেশি তাহারাও তোতলামি অভ্যাস করিয়া বসে, কারণ কথা বলিতে যাইয়া ভাবে 'হয়তো ঠিক করিয়া বলিতে পারিব না'।

ট্রেভিস্‌ নামক এক মনোবিদ্‌ গবেষণা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, প্রায় ছয় শত তোতলা ছেলের আত্মীয় কেহ-না-কেহ তোতলা ছিল। তিনি মনে করেন, ইহা বংশগত।

কিন্তু ইহা সত্য যে, তোতলামি দূর করা যায়। নূতন ভাবে কথা বলার অভ্যাস শিক্ষা দিতে হইবে। আর শিশুর মনে কোনও ভয় বা আতঙ্ক বা লঘুত্ববোধ যেন না থাকে। মানসিক শান্তি এবং আত্মবিশ্বাস শিশুর ভিতর থাকিলে অভ্যাস-পরিবর্তন কঠিন হইবে না। মনে রাখিতে হইবে ঐ বদ অভ্যাস শৈশবে জন্মে। ওয়ালিন (Wallin) দেখিয়াছেন, প্রায় শতকরা ৮১টি শিশু স্কুলে আসার পূর্বে তোতলামি করিত। শৈশবেই দোষটি দূর করিতে হইবে।

বদ ছেলে

যে-সব ছেলে সমাজের আদর্শ মানিয়া চলে না এবং নিজের ও দশের অহিত করে তাহাদের আমরা 'বদ ছেলে' আখ্যা দিই। মোটামুটি কতকগুলি অপরাধের নাম করা যাইতে পারে, যাহা এই শ্রেণীর ছেলেপিলেরা করিয়া থাকে।—

চুরি, গুন্ডামি, অশ্লীল ব্যবহার, বাড়ি হইতে পলায়ন ইত্যাদি।

এখন ইহাদের মতিগতি এইরূপ কেন হয় তাহার আলোচনা করা যাক। লম্ব্রসো (Lombroso) বলিয়াছেন যে, অপরাধী ছেলেরা একটা আলাদা শ্রেণীর মানুষ—তাহাদের চেহারাতেই ধরা পড়ে। এই মত অনেকেই মানিয়া লন নাই, গবেষণা করিয়া দেখা যায় যে 'বদ ছেলে' বলিয়া কোনও বিশিষ্ট জীব নাই— বিশেষ কোনও কিম্ভূত-কিমাকার চেহারাও তাহাদের নাই। ভদ্রলোকের মতো যাহাদের চেহারা, তাহারাও গুন্ডা হইতে পারে, আবার বদ চেহারার লোকও ভালো হইতে পারে।

বদ ছেলেদের বুদ্ধি কি রকমের? একারসন্‌ (Ackerson) দেখিয়াছেন যে, কতকগুলি অপরাধ খুব বেশি বুদ্ধিমান ছেলেমেয়েরা করিয়া থাকে, আর কতকগুলি অল্পবুদ্ধি শিশুরা করিয়া থাকে। ইহা সহজেই অনুমেয়। কারণ, বজ্জাতি করিতেও কূটবুদ্ধির দরকার। যে-সব ছেলের বুদ্ধি অত্যন্ত বেশি অথচ বুদ্ধির চালনা সম্ভাবে হয় নাই তাহারা চুরি গুন্ডামিতে অদ্বিতীয় হয়। ধরুন, একটি বস্তির ছেলে— অসাধারণ তার বুদ্ধি, 'আই. কিউ.' খুব উঁচু, সঙ্গ ভালো পায় নাই, শিক্ষার সুযোগ পায় নাই, বাড়িতে কোনও আকর্ষণ নাই, সে জানালা ভাঙিয়া গৃহপ্রবেশ করিতে বা বাস-ট্রামের বাবুদের সর্বনাশ করিতে নিশ্চয়ই পটু হইবে। বেশি বুদ্ধিমান ছেলে এই সব 'ডিপার্টমেণ্টে' ঢুকিলে পুলিস কমিশনার এবং দারোগাবাবুদের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠে। ডিটেক্‌টিভ নভেলে আমরা তাহার পরিচয় পাই। আবার বুদ্ধি খুব কম থাকিলে হিতাহিতজ্ঞানটাও কম থাকে, কিসের কি পরিণাম— বালকেরা বোঝে না, ফলে, অসৎসঙ্গে পড়িয়া দলকর্তাদের কথা প্রাণপণে পালন করে এবং

ধরা পড়িবার সময় এই মূর্খ হতভাগারাই ধরা পড়ে, চতুর দলপতিরা সরিয়া পড়ে।

গুন্ডামি ইত্যাদির একটি কারণ ইহাও বলা যায় যে, যে-সব ছেলেপিলে স্কুলে, খেলার মাঠে কোথাও স্থান পায় না, যাহাদের কেহ গ্রাহ্য করে না, তাহারা নিজেদের এই হীনতা ঘুচাইবার জন্য এমন একটা কিছু করিয়া বসে যাহাতে তাহার প্রতিষ্ঠা লাভ হয়, ভাবে—সুনাম যখন করিতে পারিলাম না তখন দুর্নাম করিয়াই বা বিখ্যাত কেন হইব না? এ-সব ছেলে মনে করে, 'সবাই দেখুক, আমি কি করিতে পারি!'—নিজেকে জাহির করার উপায় হইতেছে গুন্ডামি। এই মনোবৃত্তি 'ইন্‌ফিরিয়রিটি কম্‌প্লেক্স্' হইতে আসে—অবশ্য উল্টা ভাবে। অর্থাৎ ইহারা ভিতরে ভিতরে টের পায় যে ইহাদের কোথাও কোনো স্থান নাই। সেই অভাব পূরণ করার সম্ভাবনা সদুপায়ে নাই, সুতরাং সমাজবিরুদ্ধ কাজ করিয়াই বুঝাইয়া দেওয়া যাক্—'আমি কম নই।' স্কুল-কলেজের 'অসভ্য' ছেলেদের বেশির ভাগই লেখাপড়াতে খারাপ। গ্লুয়েক্স্ (Gluecks) প্রায় এক হাজার বদ ছেলেমেয়ে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, শতকরা ৮৪টিই লেখাপড়াতে খারাপ। ইহারা বিদ্যালয় হইতে পলায়ন বা মাস্টার মশায়দের সঙ্গে ঝগড়া ইত্যাদিতে অভ্যস্ত। গুন্ডামি ভিন্ন অন্য কোনও রাস্তাতে ইহারা আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না বলিয়াই ঐ রকম কাজ করিয়া থাকে।

একটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার ব্যাপার এই যে, বদ ছেলেরা প্রায়ই দলবদ্ধ থাকে এবং অপরাধও দলবদ্ধ হইয়া করে। ইহাদের গুপ্ত বৈঠক বসে কোনও গাছতলায় বা ভাঙা বাড়ির ভিতর। সেখানে আলোচনা হয়, কী প্রোগ্রাম অনুসরণ করিতে হইবে! এই রকম ছেলেদের ভিতর একতা খুবই থাকে, একজন অপর জনকে সব সময়ই রক্ষা করে। লোক জোগাড় করার ভঙ্গীও কৌশলপূর্ণ। গলির মোড়ে শিস্ দিতেই একটি ছেলে নামিয়া আসিল, পরে আরও আসিল। ইহাদের সাঙ্কেতিক ভাষা থাকে, যাহা বুঝিবার জো নাই। আর একটি সর্দারও থাকে যাহাকে সব সময়েই দলের সকলে মানিয়া চলে। পাড়ার লোকেরা ইহাদের অনেক সময়ে ভয় করিয়া চলে—তাহাতে ইহাদের আত্মতৃপ্তি। বেনামা চিঠি লেখা, হুমকি দেওয়া, মেয়েদের প্রতি অশ্লীল আচরণ প্রভৃতি ইহাদের অভ্যাস।

বদ ছেলেদের অপরাধ নয় বা দশ বৎসরের পূর্বে দেখা যায় না। ইহা হইতেই বোঝা যায় যে শৈশবে এই সমস্যার সমাধান করা উচিত।

অনেকে বলেন 'অভাবে স্বভাব নষ্ট', সুতরাং যে-সব ছেলেপিলে অর্থকষ্ট পায় তাহারাই বিপথে যায়। কিন্তু এ কথা কি সত্য যে, গরিব হইলেই ছেলেরা চুরি করে? কত লক্ষপতির ছেলেমেয়েরা চুরি করে তাহা শিক্ষকমাত্রই জানেন। আমাদের দেশে দারিদ্র্য সত্ত্বেও চাষীর ছেলেপিলেরা খুব কমই চোর হয়। হিলি (Healy) দেখাইয়াছেন যে, ৮২৩টি ছেলেপিলেদের ভিতর মাত্র ৪টি ক্ষেত্রে দারিদ্র্য সোজাসুজি কারণ। সে যাহা হউক, ইহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, দারিদ্র্যের জন্য ভালো শিক্ষার সুযোগ মেলে না, হয়তো কুপল্লীতে থাকিয়া ছেলেপিলেরা নষ্ট হইয়া

যায়। তাহা ছাড়া, গরিব বাপ-মা সব সময়ই খাটিতেছে, ছেলেমেয়ের দিকে নজর দিবার তাহাদের অবকাশ নাই। অভিভাবকদের অবহেলাতে ছেলেমেয়েরা যা-খুশি তাই করিয়া বেড়ায় এবং ক্রমশ বিপথে যায়। গরিবের ছেলেমেয়েরা ভালো বই পায় না, দেশভ্রমণ বা নানা রকম শিক্ষা লাভের সুযোগ তাহারা পায় না। অতএব, বলিতে পারি যে গরিব বলিয়াই কেহ চোর হইবে এমন নয়, তবে গরিব হইলে শিক্ষা ও সুপরিচালনার অভাবে অনেক শিশু নষ্ট হইয়া যায়। দারিদ্র্য সত্ত্বেও সুপরিচালনায় ও সুশিক্ষায় ছেলে খুব ভালো হইতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি।

পারিবারিক প্রভাব লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, শিশুর নৈতিক চরিত্র মা-বাপ ভাই-বোন ইত্যাদির প্রভাবে গড়িয়া উঠে। গ্লুয়েক্স্ (Gluecks) দেখিয়াছেন যে, প্রায় শতকরা নব্বই স্থানেই বদ ছেলেদের আত্মীয়রা কেহ-না-কেহ কয়েদী ছিল। যাঁহারা এই সমস্যা লইয়া গবেষণা করিয়াছেন তাঁহারা সবাই দেখিয়াছেন যে পরিবার খারাপ হইলে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয় যে শিশুমন বিকৃত হইয়া পড়ে। বাপ-মায়ের ভিতর যদি দিনরাত ঝগড়া চলিতে থাকে বা বাড়িতে চিত্তাকর্ষক কিছু না থাকে তবেই শিশুরা বাহিরে থাকিতে চাহে এবং অসৎসঙ্গে মিশিবার সুযোগ পায়। শিশুকে যদি কেহ স্নেহ করিবার না থাকে তবে শিশু নিশ্চয়ই পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করিবে এবং হয়তো কুসঙ্গে পড়িবে। আবার অনেক সময় দেখা যায় যে অতিরিক্ত আদরে ছেলে খারাপ হইয়া যায়। কোনও শাসন বাড়িতে নাই; যাহা চায় খোকাবাবু তাহাই পায়, খোকাবাবু যাহা করে তাহাই ভালো, খোকাবাবুকে ধমকাইতে অভিভাবকেরা ভয় পান, পাছে খোকাবাবু কষ্ট পায় বা কাঁদিয়া আকুল হয়। শেষে এমন অবস্থা হয় যে মায়ের আঁচল হইতে চাবি খুলিয়া টাকা লইয়া যায়, বাধা দিলে বলে 'টাকা না পেলে সুইসাইড করব'—খোকাবাবুর অমূল্য-জীবন রক্ষার জন্য সবাই সব-কিছু মানিয়া লইতে প্রস্তুত। এইভাবে গুণ্ডার সৃষ্টি হয়।

এ-সব বদ ছেলেকে 'ভালো' করিবার জন্য অনেক প্রতিষ্ঠান পৃথিবীর সভ্য দেশে রহিয়াছে। আমরা 'গুণ্ডা' 'পাজী' 'বদ্মায়েস' বলিয়া ছাড়িয়া দিলেই বা ঘা দুইয়েক লাগাইলেই তো সমস্যার সমাধান হইবে না। হতভাগ্যদের জীবনের মোড় ফিরাইয়া দিতে হইবে—সমাজের তাহারা যেন কল্যাণ করিতে পারে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। এক রকম প্রতিষ্ঠান আছে (Borstal Institution) যেখানে এ রকম ছেলেদের একসঙ্গে রাখিয়া সুশিক্ষার বন্দোবস্ত করা হয়। তাহাতে অনেক সময় উপকার হয়।

এই সব ছেলের জন্য আলাদা বিচারালয় (Juvenile Court) থাকা উচিত। মনোবিদগণ বিচারের ভার লইবেন। কোথায় কাহাকে পাঠাইতে হইবে বা বাড়িতে অভিভাবকদের কি করিতে হইবে এ সমস্ত তাঁহারা ঠিক করিয়া দিবেন। মনে রাখিতে হইবে 'বদ ছেলে' সাধারণ ছেলেরই মতো, সে কোনও বিশিষ্ট জীব নয় (যা লম্ব্রসো বলেন), শুধু শৈশবের পরিচালনার দোষেই এমন হইয়াছে। আর বংশানুক্রমিকত্বও

এমন ভয়ংকর কিছু নয়। চোরের ছেলে জন্মিয়াই চোর হয় না। যদি ঐ ছেলেকে অন্য বাড়িতে বা অন্য প্রতিষ্ঠানে রাখা যায়, সে নিশ্চয়ই চোর হইবে না। কুঅভ্যাস বা বদমায়েসি দুরারোগ্য ব্যাধি নয়, ইহা শুধু সংগদোষ ও কুশিক্ষার ফল। ছেলে-মেয়েরা যদি দেখে কাকাবাবু একটি প্রকাণ্ড রুই মাছ চুরি করিয়া বাড়ি ঢুকিলেন, বাবা কোনও হতভাগ্য অফিসের বাবুর পকেট হইতে তাঁহার মাসিক বেতনটি চুপিচুপি তুলিয়া আনিলেন, মা নিকটস্থ মহিলা-একজিবিশন হইতে দু-গাছি সোনার বালা লইয়া ফিরিলেন, তাহা হইলে বেচারাদের নিকট হইতে আমরা আর অন্য কি আশা করিতে পারি? বদ ছেলে বদ পরিবারেই বেশি হয় এবং পারিবারিক আবহাওয়া ভালো করিলে ছেলে সৎপথে যাইতে পারে এ কথা আমরা বিনাদ্বিধায় বলিতে পারি। অভি-ভাবকদের এই কথা মনে রাখিয়া নিজেদের দোষ সামলাইতে হইবে। ছেলেপিলেকে শুধু তীব্র প্রহার করিয়া ভালো করা যায় না, নিজেদেরও ভালো হইতে হইবে। পরিবারের ভিতর বাদ-বিসংবাদ বা অন্য কোনও অশ্লীলতা থাকিলে তাহা দূর করিতে হইবে। ছেলেদের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া দিলেই চলিবে না। বাপ-মার দায়িত্ব খুব বেশি। আর শিশু পরিচালনার প্রণালী প্রতি পরিবারেই গুরুজনদের ভালোভাবে জানা উচিত।

বর্তমানে মনোবিদগণ অপরাধী বা বদ-ছেলেদের মানসিক রোগগ্রস্ত বলিয়া মনে করেন। তাহাদের পুনরায় ঠিকপথে আনিবার জন্য এবং মনের বিকৃত অবস্থা পরিবর্তনের জন্য শিশু-পরিচালনাগার (ChiId Guidance Clinic) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহাতে ছেলেদের পর্যবেক্ষণ করা হয়, তাহাদের মন বিশ্লেষণ করিয়া মনোবিকারের কারণ অন্বেষণ করা হয়, তারপর অভিভাবকদের কর্তব্য বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া হয়। এই ক্লিনিকগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ইহাতে কত ছেলে যে উপকৃত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। তোতলামি, পিছিয়ে-পড়া, অস্থিরতা, অপরাধপ্রবণতা ইত্যাদি শিশুমনের সর্বপ্রকার সমস্যা সমাধানের চেষ্টা এইসব ক্লিনিকে করা হয়। ভারতবর্ষে ইহার বিশেষ অভাব।

শিশু-পরিচালনার মূল সূত্র

পূর্বের আলোচনার পর আমাদের মনে স্বতই এ প্রশ্নের উদয় হয়, কি করিয়া শিশুমনের স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে হইবে? কি প্রণালীতে শিশুদের তত্ত্বাবধান করিলে তাহারা বিপথগামী না হইয়া পূর্ণব্যক্তিত্ব গঠন করিতে পারিবে? বাংলাদেশে এ সমস্যা লইয়া খুব বেশি চিন্তা করিতে আমরা এখনও শিখি নাই। কি শিক্ষিত, কি অশিক্ষিত, সবাই আপন খেয়ালমতো শিশুদের চালনা করি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী-ধারণ করিয়াও অনেক মহিলা সন্তান-পরিচালনায় এমন মূর্খতার পরিচয় দেন যে, দেখিয়া স্তম্ভিত হইতে হয়। যাহারা দেশের ভবিষ্যৎ তাহারা আমাদের দোষে পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে না, ফলে আমাদের জাতীয় চরিত্র অতি নিম্নস্তরে

থাকিয়া যায়। অনেকে বলেন, 'আমরা গরিব দেশের লোক, শিশু-শিক্ষার সুযোগ দেওয়া আমাদের সম্ভব নয়'; উত্তরে বলা যাইতে পারে, শিশু-পরিচালনার জন্য লাখ লাখ টাকা বা সোনা-রূপার দরকার হয় না, শুধু বাপ-মা, শিক্ষক ও সমাজের লোকেরা যদি একটু যত্ন এবং ধৈর্যসহকারে শিশুকে সাহায্য করেন, তবেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। ইহার জন্য চাই শিশুর প্রতি দরদ, দায়িত্বজ্ঞান, সহিষ্ণুতা এবং আদর্শবাদ। পৃথিবীতে যাঁহারা চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন, তাঁহারা অনেকেই গরিবের কুটীরে জন্মিয়াছিলেন। পয়সা-কড়ি যাঁহাদের আছে, তাঁহারাই যে শিশু-পরিচালনায় উৎসাহ দেখান এমন নয়। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু তাঁহার আত্ম-জীবনচরিতে বলিয়াছেন, ভারতবর্ষে বড়-লোকের ছেলে হইয়া জন্মানো সৌভাগ্য না হইয়া দুর্ভাগ্যও হইতে পারে। অর্থাৎ আমাদের দেশের লোকেদের আর্থিক অবস্থা যত ভালো, ছেলেপিলে আদর পাইয়া তত অপদার্থ হওয়ার সুযোগ পায়।

শিশুকে জন্মদান করিয়া তাহাকে যদি আমরা যথাযথ শিক্ষা দিতে না পারি তবে তাহা বড়ই দুঃখের বিষয়। সুপরিচালনার অভাবে শিশুরা অনেক সময়ে নষ্ট হইয়া যায় এবং বড় হইয়া সমাজ ও জাতির সর্বনাশ করে। পরিবারের দায়িত্ব এই ব্যাপারে খুবই বেশি। অভিভাবকদের কর্তব্য শিশুর মন বুঝিয়া তাহাকে চালানো। দুর্ভাগ্যবশত দেশের সর্বত্র যে সব 'হীরের টুকরো'র নমুনা পাওয়া যায় তাহাতে সন্দেহ হয়, আমরা আমাদের কর্তব্য করিতেছি কি? পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতির লোকেরা কি ভাবে শিশু-পরিচালনা করে এবং তাহাদের সন্তানরা কিরূপে গড়িয়া উঠে, তাহা আমাদের একবার চোখ মেলিয়া দেখা উচিত। আমরা এখনও সেই মনুস্মৃতি অনুসরণ করিতেছি: 'লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি, দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ'। অর্থাৎ প্রথম কয়েক বছর আদর দিয়া মাথায় তোল, তারপর যখন ছেলেপিলে বেয়াড়া হইয়া উঠিবে, তখন চাবকাইয়া নামাও। কিন্তু অধুনা মনোবিদ্যা বলিতেছে যে, শিশুর মন প্রথম পাঁচ বছরেই গড়িয়া উঠে, ঐ সময়ে কঠোরতার সহিত তাহার শিক্ষায় যত্নবান হইতে হইবে, কোলে তুলিয়া নাচানাচি করিলে, সোনার বালা পরাইলে বা প্রচুর পরিমাণে মিষ্টি খাওয়াইলে চলিবে না। শিশুর জন্মের পর হইতেই তাহার শিক্ষা আরম্ভ হইল, তাহার পরিচালনার দায়িত্ব তখন হইতেই লইতে হইবে, ভবিষ্যতের জন্য তুলিয়া রাখিলে চলিবে না।

এখন আমরা কতকগুলি অত্যাবশ্যক শিশু-পরিচালনার নীতি আলোচনা করিব।

খাওয়াদাওয়া

বাঙালী-পরিবারে শিশুকে প্রায়ই ভোজনবিলাসী করিয়া তোলা হয়। খাওয়ার কোনও আইন-কানুন নাই, ডাক্তারের পরামর্শের ধার কেহই ধারেন না। এইমাত্র শিশু খাইয়া উঠিয়াছে, মামাবাবু খাইতে বসিয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া খাওয়াইলেন।

তারপর একবার মা'র সংগে, একবার ঠাকুমা'র সংগে সারাদিন ধরিয়া এই পর্ব চলিতে থাকে। এই রকম লোভী ছেলে পৃথিবীর অন্য দেশে কোথাও দেখা যায় না। ইহা আমাদেরই দোষ। আমরা কোনও নির্দিষ্ট সময়ে শিশুকে খাইতে দিই না, আদর করিয়া ডাকিয়া পাতে খাওয়াই—ঐ বেচারার কি দোষ? আমরা যদি প্রথম হইতে তাহার আহার নিয়ন্ত্রিত করি, তবে নিশ্চয়ই শিশু প্রত্যেকের সংগে খাইবার জন্য লুব্ধ হইয়া উঠিবে না। আর একটি মজা এই—এ দেশে শিশুর আহার ও বড়দের আহার বিভিন্ন নয়। মাংস পায়েস বাটি বাটি শিশুও খাইতেছে, তাহার বাবাও খাইতেছেন,—একই প্রণালীতে দুষ্পাচ্য করিয়া উভয়ের জন্য রাঁধা হইয়াছে। অনেকে খাদ্যদ্রব্য ঘুষ দিয়া শিশুকে শান্ত করেন। শিশু কাঁদিতেছে, মা দুটি রসগোল্লা কিনিয়া তাহাকে দিলেন। মন্ত্রবৎ কাজ হইল, শিশু চুপ। কিন্তু যেইমাত্র সেই নশ্বর রসগোল্লা ফুরাইল, পুনরায় শিশু আরও কিছু পাইবার লোভে কাঁদিয়া উঠিল। এইভাবে শিশু কান্নাকাটি অভ্যাস করিয়া লয়, কারণ তাহাতে লাভ অনেক। ক্রমশ একটি 'কাঁদুনে' এবং পেটুক বঙ্গসন্তান চন্দ্রকলার ন্যায় বাড়িয়া উঠে।

আমাদের আর একটি জাতীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, আমরা ছেলেপিলেদের প্রতি ভালোবাসা দেখাই তাহাদের খাওয়াইয়া। কাকাবাবু, মামাবাবু ইত্যাদির আগমনের অর্থই প্রচুর মিষ্টি বা দই-ক্ষীর মিলিবে। অনেক মা-বাবা আছেন যাঁহাদের সন্তানদের কিছু খাইতে না দিলে তাঁহারা বিরক্ত হন এবং বলেন, "যত আদর শুধু শুধু মুখে মুখেই।" খুব উচ্চশিক্ষিত পরিবারেও এই মনোভাব দেখা যায়। কোন প্রিয়জন বা বন্ধুবান্ধব আসিলেই শিশুরা কাঙালের মতো খাদ্যলোলুপ হইয়া তাকাইয়া থাকে। ইহারা কোনও দিন আর লোভ সামলাইতে শিখিবে না। এই কু-অভ্যাসবশত আমাদের দেশের যুবক, প্রৌঢ় আর বৃদ্ধেরাও ভোজনবিলাসী হইয়া পড়েন এবং রোগজীর্ণ দেহ লইয়া কোনও প্রকারে বাঁচিয়া থাকেন।

খাওয়া সম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করার উদ্দেশ্য হইতেছে এই যে, অতিবিক্ত ও অনিয়ন্ত্রিত আহারে শুধু শরীর খারাপ হয় না, মনেরও বিশেষ ক্ষতি হয়। যদি শিশু সর্বদাই 'কি খাব, কি খাব' ভাবে, তবে তাহার মনের উৎকর্ষ হইবে কি করিয়া? লোভ সংযত না হইলে মন উচ্চতর বিষয়ে নিবিষ্ট হইবে না,—মানসিক ক্ষমতাগুলি অংকুরেই বিনষ্ট হইয়া যাইবে। খাওয়ার লোভে পড়িয়া বহু ছেলে চুরি করিতে এবং মিছা কথা বলিতে শিখে, পরে ক্রমশ অধঃপাতে যাইতে থাকে। বাঙালীরা বড় হইয়াও খাওয়া সম্বন্ধে অত্যন্ত ছেলেমানুষির পরিচয় দেয়। নিমন্ত্রণে কে কত লুচি খাইল, একটি পাঁঠা কে খাইতে পারে, বৃহদাকার কাঁঠাল কে কয়টি খাইতে অভ্যস্ত, ইত্যাদি আমাদের খুব মুখরোচক গল্পের বিষয়। আর পাতে বসাইয়া 'খাও বাবা, খাও' বলিয়া জবরদস্তি করিয়া খাওয়াইয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করি। ইহার যে কি পরিণাম তাহা আজও অনেকে ভাবিতে শিখেন নাই। দুর্বল শরীর ও তদপেক্ষা দুর্বল মন লইয়া বাঙালীর ছেলেরা জগতের অন্যান্য জাতির কাছে হাস্যাস্পদ হইয়া

দাঁড়ায়। প্রথম হইতেই শিশুদের খাওয়াদাওয়া বিষয়ে ডাক্তারদের পরামর্শমতো কাজ করা উচিত। নির্দিষ্ট সময়ে আবশ্যক পরিমাণে তাহাকে খাওয়াইতে এবং সংযম অভ্যাস করাইতে হইবে। তাহাদের দৃষ্টি যেন এই সকল ক্ষুদ্র বিষয়ে আবদ্ধ না থাকিয়া বৃহত্তর বিষয়ে আকৃষ্ট হয়।

শিষ্টাচার

আদব-কায়দা, ভদ্রতা ইত্যাদি ছেলেবেলা হইতেই শিখাইতে হইবে। অনেকে ভাবেন, ছেলেপিলে বড় হইলে নিজেরাই 'ভদ্র' বনিয়া যাইবে। তাহারা কোন্‌টা শিষ্টতা, কোন্‌টা অশিষ্টতা কিছুই জানে না। যাহা দেখে তাহাই শিখে। বাবু চাকরকে গালাগালি দিলেন, শিশু কৌতূহলের সহিত শুনিল। পরে সেই শব্দটি বাবার বা দাদার প্রতি প্রয়োগ করিল। সবাই শিশুমুখের ভাঙা ভাঙা কথা শুনিয়া হাসিয়া অস্থির, যেন কতবড় তামাশা। এই অদূরদর্শী অভিভাবকেরা জানেন না যে, এরূপ করিলে ভবিষ্যতে ছেলে সভ্যতা-ভব্যতা কোনো জন্মেও শিখিবে না। আদব-কায়দা ইত্যাদি ভাল করিয়া শিখাইতে হইবে। অনেক সময় শিশুরা অবাধ্যতা করিবে, তখন শাস্তি দিয়াও ভদ্র ব্যবহার শিখানো আবশ্যক। আমাদের দেশের লোকেদের শিষ্টাচারজ্ঞান কম বলিয়া কুখ্যাতি আছে, তাহার কারণ আর কিছুই নয়, ছেলেবেলাতে শিষ্টাচার যত্নসহকারে শিখানো হয় নাই। সভা-সমিতিতে হট্টগোল লাগিয়াই আছে, বক্তা বলিয়া যাইতেছেন, আমরা আপন মনে গল্প করিয়া যাইতেছি। সাধারণ ভদ্রতার বিন্দুমাত্র জ্ঞান দেখা যায় না। মজার ব্যাপার এই যে এডুকেশন কনফারেন্সে শিক্ষা-ব্রতীরা নিজেরাও এই অশোভন দৃষ্টান্ত দেখান। আমাদের দেশে দু-চারজন লোক একসঙ্গে একটা আলোচনা করিতে গেলেই তুমুল গোলমালের সৃষ্টি করে। একজন কথা বলিলে যে চুপ করিয়া আগে তাহার কথা শুনিতে হয়, এ সৌজন্যজ্ঞান খুব কম লোকেরই আছে। এক সঙ্গে সবাই তারস্বরে কথা বলে, কেহই কাহারও কথা শোনে না। আচ্ছা, ছেলেবেলায় স্কুলে বা গৃহে কি করিয়া আলোচনা করিতে হয়, বা সভা-সমিতিতে কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, তাহা কি শিক্ষা দেওয়া হয়? ভদ্রলোক ভুঁইফোড় হইয়া জন্মে না, ভদ্রলোক তৈয়ার করিতে হয়। এম. এ., বি. এ. পাস করিয়াও যে আমরা সৌজন্যের অভাব দেখাই, তাহার কারণ শৈশবে যত্নসহকারে ঐ বিষয়ে শিক্ষা আমাদের দেওয়া হয় না।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিতেও শৈশবে শিখাইতে হইবে। একবার নোংরামি অভ্যাস হইয়া গেলে, তাহা মুছিয়া ফেলা কঠিন। ইউরোপীয়দের ঘরবাড়ি কত

পরিষ্কার। উহাদের ছেলেপিলেরা কত পরিচ্ছন্ন। অনেকে বলেন, উহারা বড়লোক, আমরা গরিব, তাই পারিয়া উঠি না। ইহা কি ঠিক? পয়সা থাকিলে কিছু বেশি জামা কাপড় আসবাবপত্র কেনা যায়, কিন্তু তাহাতেই পরিচ্ছন্নতা আসে না। কত গরিব লোকের বাড়িঘব সুন্দর। আবার বড়লোকের বাড়িঘর এলোমেলো। গরিব সাঁওতালদের ঘরবাড়ি, বাসনপত্র দেখিয়া চক্ষু জুড়ায়; গরিব জাপানীদের ঘরবাড়িও পরিপাটী। আমরা ছেলেবেলায় পরিচ্ছন্নতা অভ্যাস করাইব না, শুধু কর্তব্য এড়াইবার জন্য বলিব 'ও টাকা ছাড়া হয় না, স্টেটের সাহায্য ছাড়া হয় না।' শিক্ষিত উচ্চপদস্থ বাঙালীরা যেখানে সেখানে থুথু এবং পানের পিক্ ফেলেন, তাঁহাদের বাড়িতে ডাস্টবিনের ব্যবহার নাই, আসবাবপত্র যেখানে সেখানে ছড়ানো থাকে, ধুলায় ধূসরিত হইয়া বাসনপত্র পড়িয়া থাকে— ঐসব বাড়ির শিশুরা কি করিযা 'পরিচ্ছন্নতা' শিখিবে? নিজেরা পরিষ্কার থাকিয়া প্রত্যেক জিনিস যথাস্থানে রাখিয়া উহাদেরও ঐরূপ করিতে শিখাইতে হইবে। প্রত্যহ মুখ ধোয়া, জুতা পরিষ্কার, ঘর-বাড়িতে ধুলা বা মাকড়সা থাকিলে তাহা পরিষ্কার করা, ছেলেমেয়েদের এ সকল অভ্যাস করানো কঠিন নহে, অথচ একান্ত প্রয়োজনীয়। উহাদের সৌন্দর্যজ্ঞান জাগাইয়া তুলিতে হইবে। সেজন্য গোড়ায় একটু কঠোর হইতে হইলেও উপায় নাই। বাঙালী-বাড়িতে শিশু অপরিষ্কার থাকিলে বা কোনও জিনিস অপরিষ্কার করিলে বড় জোর দুই-একবার ধমক খাইতে হয। আর শিশুরা যখন দেখে, বড়রাও ঐ দোষে দোষী, তখন তাহাদের মনে আসে আলস্য বা শৈথিল্য। এমনি করিয়া অপরিষ্কার থাকার স্বভাব তাহাদের বদ্ধমূল হইয়া যায়। ফলত আমাদের স্কুল, কলেজ, হোস্টেল, বাড়ি-ঘর প্রায় কুৎসিত। শৈশব হইতে পরিচ্ছন্নতা না শিখাইলে পরে আর অভ্যাস করানো যায় না। কদর্যভাবে থাকাব অভ্যাস কেবল নিজের নহে, প্রতিবেশীদের পক্ষেও অনিষ্টকর— এ জ্ঞান্ আমাদের নাই। জাতীয় চরিত্র উন্নত করিতে হইলে এই কু-অভ্যাস দূর করিতেই হইবে।

স্বাবলম্বন

আমাদের দেশের ছেলেদের আদর দিয়া অনেক সময়ে অকর্মণ্য করিয়া তোলা হয়। ছেলে আপন মনে খেলিতেছে; ঠাকুমা দিদিমা বা পাড়ার পাতানো সম্পর্কের মাসীমা আসিয়া জোর করিয়া ছেলেকে কোলে তুলিবেন— ভালো বাসেন যে। সক্ষম ছেলেকে স্নান করাইয়া, কাপড় পরাইয়া কি অদ্ভুত আত্মতৃপ্তি! ছেলেরা নিজেরা কাজ করুক, ইহা আমরা শিখাইতে চাই না। নিজেদের ভাববিলাসিতাকে তৃপ্ত করিবার জন্য উহাদের কাজ করিয়া দিই। 'মা' 'মা' করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেই মা মাসী পিসী বাহিনী মার্চ করিয়া আসেন, কি করিবেন ঠিক পান না। অনেক বাড়িতে শিশুকে কখনও কোল হইতে নামানো হয় না, মাটিতে বসাইলে নাকি

বংশের মর্যাদা হানি হয়। সর্বদা কোলে রাখিতে রাখিতে ছেলেমেয়েরাও পাইয়া বসে, পায়ে আর হাঁটিতে চায় না এবং অত্যন্ত পরনির্ভরশীল হইয়া পড়ে। ইহাতে স্বাস্থ্যের হানি হয়, আর মন হয় দুর্বল। বাড়িতে অত্যধিক আদরে এবং নিজের কাজ নিজে না করিতে শিখায় বাঙালী ছেলে পরে 'ঘরমুখো' হয়। কোনও প্রতিষ্ঠান নিজে গড়িয়া তোলা বা স্বাবলম্বী হইয়া দুঃখকষ্ট সহ্য করিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য করা—ইত্যাদিতে তাহার কোনও উৎসাহ থাকে না। অত ঝামেলায় কি দরকার! কেরানীগিরির রাজপথ উন্মুক্ত আছে তো! মায়ের-আঁচলে-বাঁধা ছেলেদের আর কি হইতে পারে?

বর্তমান মনোবিদ্যা বলিতেছে, শৈশবে ছেলের যে মনোবৃত্তি গঠিত হইবে, তাহাই পরবর্তী কালে তাহার চরিত্রের ভিত্তি হইবে। মায়ের আঁচলে-বাঁধা আদুরে বাঙালীর ছেলে মা-দিদিমার উপর নির্ভরশীল, উহার বিন্দুমাত্র কষ্ট হইলে তাঁহারা দৌড়াইয়া আসেন—ফলত কষ্টসহিষ্ণু হওয়া তাহার পক্ষে সম্ভব নয়। স্বাবলম্বী হইতে দেওয়া হয় না বলিয়াই সে স্বাবলম্বী হয় না। বেচারা নোট পড়িয়া বা প্রাইভেট টিচার রাখিয়া বড় জোর পাস করিয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহার দৌড় ঐ পর্যন্তই। কারণ মাসীদের অতিরিক্ত আদরে শিশুর মনের গভীরতম প্রদেশে যে পরনির্ভরশীলতা এবং অসহায়তা বোধ ঢুকিয়াছে, তাহা সারা জীবন ধরিয়া চলিবে এবং সর্বপ্রকার বৃহৎকর্মের পরিপন্থী হইয়া দাঁড়াইবে। ফ্রয়েড্ প্রভৃতি বর্তমান মনোবিদ্‌গণের ইহাই অভিমত।

ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, আমাদের গৃহের আবেষ্টনই অনেক সময়ে সন্তানগণের উন্নতি-সম্ভাবনার সমাধি রচনা করে। উচ্চাকাঙ্ক্ষা আমাদেরও নাই এবং ছেলেপিলেরা বড় হউক ইহা আমরা সর্বান্তঃকরণে চাহি না। পূজা-পার্বণে ছেলে বাড়ি আসিবে, চাকুরি করিবে, বেশ ভাল ঘরে অর্থাৎ ইম্পিরিয়াল বা প্রভিন্সিয়াল গ্রেডের চাকুরের মেয়েকে বাড়ির বউ করিবে এবং এই প্রকারে 'সুখে' থাকিবে—বাস্। বাপ-মায়ের বোঝা উচিত যে, ছেলেমেয়ে আমাদের খেলার সামগ্রী নয়, তাহাদের ভাল কিসে হয়, কিসে তাহারা পূর্ণব্যক্তিত্ব গঠন করিয়া দেশ ও সমাজকে উন্নত করিতে পারে, স্বাবলম্বী হইতে পারে, তাহাই আমাদের শিক্ষা দেওয়া উচিত। বাড়িতে বসিয়া 'মা' 'মা' 'বাবা' 'বাবা' মন্ত্র জপ করিলে চিরকালের জন্য তাহারা 'খোকাবাবু' বা 'খুকিমণি' থাকিয়া যাইবে। বাড়িতে অতিরিক্ত দাসদাসী থাকাও এক ভয়ের কারণ। ছেলেমেয়ে তাহাতে অত্যন্ত আরামপ্রিয় হইয়া যায়। সুতরাং দেখা উচিত যেন শিশু যথাসাধ্য তাহার নিজের কাজ নিজেই করে। স্নান করা, কাপড়-জামা পরা, খাওয়া-দাওয়া, বই-পত্র গুছানো, কাপড়-চোপড় পরিষ্কার—ইত্যাদি সব নিজে করিবে। দাস-দাসী যেন তাহা না করে। অনেক বাড়ির ছেলেমেয়ে-দের সঙ্গে দারোয়ান বা চাকর স্কুলে যায় তাহাদের বই বহন করিয়া। মা-সরস্বতী এই প্রকারের শিষ্য-শিষ্যাদের কি চোখে দেখেন জানি না তবে মনে হয়, যাহারা বইয়ের 'বোঝা' বহন করিতে পারে না, তাহারা মিছামিছি কেন উহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করার

চেষ্টা করে? পল্লীগ্রামে কত ছেলে মাইলের পর মাইল হাঁটিয়া স্কুলে আসে, হাজার হাজার ছেলেমেয়ে (যাহাদের চাকর নাই) নিজেরাই বই লইয়া ক্লাসে আসে। কিন্তু এই ধরনের ছেলেমেয়েদের কেন এমন অলস ও পঙ্গু করিয়া রাখা হয়?

সময়ানুবর্তিতা ও সত্যবাদিতা

সময়ানুবর্তিতা ও সত্যবাদিতাও গৃহে শৈশবের শিক্ষার বিষয়। নেহাৎ মেল ট্রেন আমাদের কেয়ার না করিয়া চলিয়া যায়, তাই আমরা ট্রেনের সময় মানিয়া চলি, কিন্তু তাহা ছাড়া সর্বদাই লেট্ হই। কেহ-বা মীটিং কি থিয়েটার শেষ হইবার পূর্বে বিন্দুমাত্র লজ্জার চিহ্নও না দেখাইয়া প্রবেশ করেন। যদি অল্প বয়স হইতে আমরা ছেলেদের নির্দিষ্ট সময় মানিয়া চলার অভ্যাস করাই এবং নিজেরাও মানিয়া চলি, তবে নিশ্চয়ই এ বদ অভ্যাস দূর হয়। মুখে মুখে লেকচার দিয়া কিছু হয় না, কারণ শৈশব হইতে যদি তাহারা দেখে যে অভিভাবকেরা সময় রাখিতে যত্নবান নন, তাহা হইলে নিজেরাও কোন গরজ অনুভব করে না। সেই যে সময় সম্বন্ধে একটা গাফিলাতি আসিয়া যায় তাহা মনের নিভৃত কোণে থাকিয়া যায় এবং কখনও দূর হয় না। একটি ইংরেজ ছেলে জানে নির্দিষ্ট সময়ে বাড়ি না পৌঁছিলে তাহার খাবার মিলিবে না, হাজার কান্নাকাটি করিলেও না। তাই সে সময় রাখিতে বাধ্য হয়। সময়ানুবর্তিতা সম্বন্ধে পৃথিবীর অন্য সর্বত্র কড়াকড়ি নিয়ম, কেবল আমাদের দেশ ছাড়া। দুপুরের নিমন্ত্রণ খাইতে কেহ বিকালে, কেহ-বা সন্ধ্যায়ও আসেন। কাজেই সে সমাজে শিশুদেরই বা সময় রাখিবার গরজ থাকিবে কেন?

আমরা ছেলেপিলেদের ধমকাই—'বল্, শিগগির সত্যি কথা বল্'; কিন্তু নিজেরা কি করি? বাহিরে কেহ ডাকিতেছে, বাবা ছেলেকে বলিলেন, 'যা বল্গে, আমি বাড়ি নেই।' ছেলে কাঁদিয়া অস্থির। কিছুতেই তাহাকে শান্ত করা যায় না, কাকাবাবু বলিলেন 'বাবা, চুপ কর্, আপিস-ফেরত কাল তোকে হুইসেল কিনে দেব'। কিন্তু কত কাল চলিয়া গেল, সেই প্রতিজ্ঞা আর কাকাবাবু রাখেন নাই। মিথ্যা আশা দিয়া, মিথ্যা কথা বলাইয়া আমাদের নিজেদের মিথ্যা ব্যবহার দ্বারা শিশুর নৈতিক চরিত্র আমরা ভাঙিয়া দিই। বড় হইয়া তাহারা হাজার তীর্থ-ভ্রমণ করিয়া, দর্শন পড়িয়া বা ধর্মগ্রন্থ আলোচনা করিয়াও মনোবৃত্তি বদলাইতে পারে না। উদাহরণ খুঁজিতে দূরে যাইতে হয় না। উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোকেরাও 'কাল আপনার ওখানে আসব' বলিয়া আর আসেন না, 'যথাসম্ভব সাহায্য করব' বলিয়া করেন না। মিথ্যা আমাদের মনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। বৈদেশিকেরা আমাদের কথা বিশ্বাস করে না, আমরাও আমাদের কথা বিশ্বাস করি না। জাতীয় চরিত্র এতই দুর্বল যে, আমরা যাহা করিতে চাই তাহাতেই আমাদের ভণ্ডামি প্রকাশ পায়। ইহার কারণ, শৈশবে কি গৃহে কি বিদ্যালয়ে সত্য পালনের শিক্ষা পাই না। আমরা

জানি যে, মিথ্যা কথা সবাই বলে এবং দরকার হইলে আমরাও বলিতে পারি, শুধু ধরা যেন না পড়ি। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার গবেষণাতে দেখাইয়াছিলাম যে, শিশুরা নৈতিক আদর্শ মা-বাবা হইতে শিখে। তাই মা-বাবা নিজেরা সত্যবাদী হইয়া যদি বাল্যে আমাদের সত্যবাদিতা শিখান, তবেই জাতীয় চরিত্র উন্নত হইতে পারে।

শাস্তির প্রণালী

অনেকে আধুনিক মনোবিদ্যার উপদেশ ভুল বুঝিয়া থাকেন—ভাবেন যে, শিশুদিগকে সব সময়ই যাহা-ইচ্ছা তাহাই করিতে দিতে হইবে। ঐ প্রকারে ছেলেপিলেদের ছাড়িয়া দিলে তাহারা অদ্ভুত জীব হইয়া উঠিবে এবং সমাজের শৃঙ্খলা ও সভ্যতার আদর্শ তিরোহিত হইবে। 'যে যাহা খুশি তাই করিবে' বলার অর্থ জঙ্গলের অধিবাসীদের অনুসরণ করা। শিশুর ইচ্ছা কখনও তাহাকে ধ্বংসের দিকে লইয়া যাইতে পারে, তখন অবশ্য তাহাকে দমন করিতে হইবে। শাস্তি দেওয়ার প্রয়োজন যে-কোনও সময় হইতে পারে। শারীরিক শাস্তিরও দরকার মাঝে মাঝে হইতে পারে। যখন শাস্তির প্রয়োজন তখন শাস্তি না দেওয়াতে শিশুর প্রতি অবিচার করা হয়।

শিশু বারে বারে পরের বাড়ির একটি ছেলেকে মারিতেছে এবং খুব তৃপ্তির সহিত হাসিতেছে। তখন তাহাকে এমন শাস্তি দিতে হইবে যেন অসহায় ছেলেটিকে মারিয়া সে যে আনন্দ পাইতেছিল, তাহার অপেক্ষা অনেক বেশি কষ্ট পায়। অনেক ছেলের চিমটি কাটার অভ্যাস, তখন যদি তাহাকে বড় আকারের একটি চিমটি কাটা যায় তবে বদ অভ্যাস দূর হয়। যখন সে বুঝিবে যে, পরকে মার-পিট্ করা মোটেই স্ফূর্তির ব্যাপার নয়, তখনই ঠাণ্ডা হইবে। অনেকে ধমক দেন 'মেরে হাড় গুঁড়ো ক'রে দেব', কিন্তু কখনও তা করেন না, এবং শিশুও জানে তাহা করা সম্ভব হইবে না। তখন সে শাস্তির হুমকিকে মোটেই গ্রাহ্য করিবে না। অভিভাবকদের এ বিষয়টা ভাল করিয়া স্মরণ রাখা উচিত। যদি শাস্তি না দেন, দিবেন না। কিন্তু হুমকি দেখাইবেন অথচ কার্যত কিছুই করিবেন না—এ বড় অন্যায়। ইহাতে শিশু শাসনের উপর আস্থা রাখিবে না এবং অভিভাবককে ভয় না করিয়া দুর্দান্ত হইবে।

অপরাধ করা মাত্রই শাস্তি দেওয়া উচিত। 'আচ্ছা, আবার করলে পিঠে লাঠি ভাঙব' এই রকম না বলিয়া তৎক্ষণাৎ যথোচিত শাস্তি দেওয়া উচিত। তাহা না হইলে শিশু ক্রমাগত অপরাধ করিতে থাকিবে এবং পরে তাহাকে দমন করা কঠিন হইবে। আর শাস্তি যেন দোষানুযায়ী হয়। সামান্য দোষে গুরুতর শাস্তি দিলে শিশু মনে মনে অভিভাবককে অশ্রদ্ধা করিবে। এবং পরে বেয়াড়া হইয়া যাইবে। অপরাধ করিলে প্রথমে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হইবে, কি ধরনের অপরাধ করিয়াছে। শিশুকে এক গ্লাস জল আনিতে বলিলাম। সে গ্লাসটি ভাঙিয়া ফেলিল। যদি

শিশুর হাত হইতে হঠাৎ গ্লাসটি পড়িয়া গিয়া থাকে, তবে তাহাকে মারধোর করা অন্যায় হইবে। আর যদি শিশু নিজের অপরাধ বুঝিতে পারিয়া লজ্জিত হয়, তাহা হইলেও শাস্তি দেওয়া অনুচিত। উহাতে আঘাত পাইয়া তাহার মন বাঁকিয়া বসিবে। মনে রাখিতে হইবে শাস্তির উদ্দেশ্য প্রতিহিংসা গ্রহণ করা নয়, অনিষ্টমূলক কাজ হইতে শিশুকে বিরত করা। শাস্তির ফলে সে যেন নিজের অপরাধ বুঝিতে পারে এবং তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে সে যেন ভবিষ্যতে আর এরূপ কাজ না করে। ইহা প্রকৃতপক্ষে শিশুর মঙ্গলের জন্য। অনেকে বাড়াবাড়ি করিয়া এমন মারধোর করেন, মনে হয় চোর বা ডাকাত শায়েস্তা করিতেছেন। ইহাতে শিশুর মন অত্যন্ত আঘাত পায় এবং শাস্তির ফল ব্যর্থ হয়। শিশু ভাবে 'বড় হইয়া শোধ তুলিব।' বেশি মার খাইয়া শিশুরা বেয়াড়া হইয়া যায় এবং আর কখনও শাস্তির ভয় করে না এবং অভিভাবককে মনে মনে ঘৃণা করে এবং পরে নিজেরা হিংস্রপ্রবৃত্তির বশীভূত হয়।

শারীরিক শাস্তি যথাসাধ্য কম দেওয়া উচিত। নেহাৎ প্রয়োজন না হইলে উহা দেওয়া ঠিক নয়।। আর সবাই ঐ শাস্তি দিবার উপযুক্ত নয়। নিজে রাগিয়া গেলে তাহার শাস্তি দিবার অধিকার নাই, কারণ উন্মত্ত অবস্থায় হয়তো শাস্তির পরিমাণ বেশি হইয়া যাইবে।

মানসিক শাস্তি বহু স্থলে কার্যকরী হয়। উহার প্রয়োগে অনেক সমস্যার সমাধান হইতে পারে। খাইতে না দেওয়া একটি মূল্যবান অস্ত্র। ইহাতে মারধোরের মতো দানবীয় ভাব নাই, অথচ ফল হয় চমৎকার। না খাইলে চলিবে না, সুতরাং শিশু বাধ্য হইয়া কথা শোনে এবং অপরাধ হইতে বিরত হয়। তবে অনেক মা-মাসী ইহা করিতে পারেন না, মুখে ভয় দেখান 'আজ ভাত পাবে না', কিন্তু শীঘ্রই 'বাছাদের' করুণ মুখ দেখিয়া বরং একটু বেশি যত্ন করিয়াই খাওয়ান। একটু যদি ধৈর্য ধরিয়া থাকিতেন, তবেই উহার সুফল দেখিতে পাইতেন। আর একটি ভাল উপায় বয়কট করা। অর্থাৎ বাড়িতে কেহই তাহার সহিত কথা বলিবে না। ইহাতে শিশু জব্দ হয়, কারণ কেহ কথা না বলিলে সে অত্যন্ত অসহায় বোধ করে। শীঘ্রই অনুতপ্ত হইয়া আর অপরাধ করিবে না বলিয়া সে প্রতিজ্ঞা করিবে। কিন্তু মুশকিল এই যে, পরিবারের সবাই একভাবে কাজ করেন না। মা হয়তো বলিলেন 'ভাত পাবে না', জ্যেঠিমা তৎক্ষণাৎ জেদ করিয়া পায়েস খাওয়াইয়া দিলেন। শিশু বুঝিল, শাস্তির ভয় নাই। দুই-একজন শিশুর সঙ্গে কথা বলিল না, আবার তিন-চারজন দৌড়াইয়া গিয়া শিশুকে আদর করিতে লাগিল এবং তাহার সঙ্গে গল্প জুড়িয়া দিল। পরিবারের সকলে একমত হইয়া শাস্তি না দিলে কোনই অর্থ হইবে না। ছেলেপিলেদের কথা দ্বারা লজ্জা দিলেও খুব সুফল হয়। যেমন, ছেলে পড়ার সময় গোলমাল করিতেছে। তখন তাহাকে যদি বলা যায়—'এ, ছি! তোমার মতো ভালো ছেলে এমন করবে, তা তো ভাবিনি'। শিশুদের আত্মসম্মানে ঘা দিলে তাহারা খুব লজ্জিত হয় এবং অপরাধ হইতে বিরত হয়।

একটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে, যেন শাস্তি দিবার পর আর শিশুর অপরাধ লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করা না হয়। অপরাধ শাস্তি অনুশোচনা; তারপরই সম্ভাব পুনঃস্থাপিত হওয়া উচিত। আবার হাসি-খুশি হইয়া শিশু যখন আসিবে তখনই তাহার সহিত মিশিতে হইবে যেন কিছুই হয় নাই। অনেকে শিশু অনুতপ্ত হওয়ার পরও ঘ্যান্‌ঘ্যান প্যান্‌প্যান করিয়া শিশুকে উত্ত্যক্ত করেন, ফলে তাহারা চটিয়া বলিয়া বসে 'বেশ করেছি, আরও করব'। গোলমাল মিটিয়া গেলেই আর সে বিষয়ে কথা বলা উচিত নয়, বরং প্রফুল্লচিত্তে শিশুর সঙ্গে ভাল-ব্যবহার করা কর্তব্য।

যৌনশিক্ষা

শিশুরা মোটেই তথাকথিত 'নির্দোষ' নয়। তাহাদের যৌন-ঔৎসুক্য যথেষ্ট পরিমাণে আছে। অনেক সময় আসিয়া মাকে প্রশ্ন করে 'মা, আমি কি করিয়া হইয়াছি?' নরনারীর যৌনজ্ঞান সম্পর্কে অনেক প্রশ্নই তাহাদের শিশুমনে জাগে। এখন তাহারা মা-বাবার কাছে উত্তর চাহিতে আসে। কিন্তু আমাদের সংস্কারবশত আমরা শিশুকে ধমকাইয়া দিই। কিন্তু ইহাতে শিশুর ঔৎসুক্য না কমিয়া বরং বাড়িবে এবং অভিভাবকের নিকট ধমক খাইয়া পাড়ার ছেলের কাছে উত্তর শুনিতে যাইবে; ফলে হয়তো খারাপ ছেলের সঙ্গে মিশিবে, কারণ তাহাদের কাছে অনেক মজার মজার কথা শোনা যাইতে পারে।

আমরা এক পরম সঙ্কটে পড়িয়াছি। একদিকে বুঝিতে পারি যে 'ঢাক ঢাক, চুপ চুপ' নীতি ভাল নয়, আবার লজ্জা আসিয়া বাধা দেয়। ছেলেপিলেরা পত্রিকা ও খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন হইতে কত কি মাথামুণ্ড পড়িয়া কাল্পনিক ভয়ে আড়ষ্ট হইতেছে, কত কি ভুল জিনিস শিখিতেছে, কত বাজে বখাটে ছেলেদের নিকট আদি-রসাত্মক গল্প শুনিতেছে—তাহা দেখিয়া শুনিয়াও কি আমরা নিশ্চেষ্ট থাকিব? যৌন-শিক্ষা না হইলে পরে অত্যন্ত গুরুতর ক্ষতি হইতে পারে। যৌন-ব্যাপারে অজ্ঞতাও ভাল নয়, ভবিষ্যৎ জীবনে তাহাতে সমূহ বিপদ হইতে পারে, বিবাহিত জীবন ব্যর্থ হইতে পারে। ফ্রয়েডের কথাতে অন্তত এইটুকু সত্য নিহিত আছে যে, যৌনপ্রবৃত্তির যথাযথ সুপরিচালনা না হইলে ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশ হয় না এবং মনের বিকার উপস্থিত হইতে পারে। অতিরিক্ত যৌন-ঔৎসুক্য এবং উৎসাহ যেমন শিশুর মনকে বিচলিত করিয়া তাহার উৎকর্ষে বাধা দেয়, তেমন ইচ্ছাকৃত অজ্ঞতাও মনকে অস্বাভাবিক করিয়া অগ্রগতিতে বাধা দেয়।

শিশুদিগকে সুচিন্তিত প্রণালীতে যৌন-শিক্ষা দিতে হইবে এবং শিক্ষা দিবেন বাবা-মা বা অন্য কোনও অভিভাবক, যাঁহার উপর শিশুর শ্রদ্ধা আছে। শিশু যদি তাহার প্রশ্নের উত্তর বাড়িতেই পায়, তবে আর বখাটে ছেলেদের কাছে যাইবে না। শিশুর যে কোন যৌনসমস্যা আসিবে, যদি তাহার মা-বাবা বা অন্য কেহ সমাধান

করিয়া দেন তবে সে কৃতজ্ঞ থাকিবে এবং তাহার মন বিচলিত হইবে না। বর্তমানে আমরা এ বিষয় তুচ্ছ করাতে শিশুর মন বিকৃতভাবে আত্মপ্রকাশ করে। স্কুল-কলেজের পাইখানাতে, দেয়ালে, বেঞ্চিতে, পাবলিক পার্কে সে সব অশ্লীলতার পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, শিশুদের যৌনশিক্ষা দেওয়া হয় নাই।

বাপ-মার কখনও ছেলেপিলেদের সঙ্গে এক বিছানায় শোওয়া উচিত নয়। এক বছর বয়স হইলেই শিশুকে আলাদা শোয়ানো উচিত, কারণ, তাহার মনে অকালেই যৌন-ঔৎসুক্য জন্মিতে পারে। এ বিষয়ে আমাদের অনেকেরই কোনও চৈতন্য নাই। এক বিছানায় পাঁচ ছয় বছরের শিশুদের লইয়াও বাবা-মা শয়ন করেন। ইহা অত্যন্ত গর্হিত।

খেলাধুলা, লেখাপড়া, বেড়ানো, অভিনয়—নানাপ্রকার কাজে শিশুকে মত্ত রাখিতে হয়, তাহা হইলে সে যৌন-দুশ্চিন্তা হইতে মুক্তি পায় এবং উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে। কোনও কাজকর্ম না থাকিলেই ছেলেমেয়েরা চিন্তা করে। এমন ভাবে শিশুকে পরিচালনা করিতে হইবে যেন তাহার যৌনপ্রবৃত্তি নিম্নাভিমুখী না হইয়া নানাপ্রকার উচ্চতর কাজে নিয়োজিত হয় ((Sublimation)। শিশুরা যদি ঠিক-মতো যৌনশিক্ষা পায় তাহা হইলে অযথা তাহারা উহা লইয়া মাথা ঘামাইবে না, অন্য কাজে মনোযোগ দিবে; কিন্তু যদি বাধা পায়, তবেই খারাপ পথ ধরিতে পারে।

শিশুদের যৌনশিক্ষা ধাপে ধাপে দিতে হইবে। যে যেমন তাহাকে সেই ভাবে শিখাইতে হইবে। বয়স, বুদ্ধি, ঔৎসুক্য অনুসারে শিক্ষার পদ্ধতি ঠিক করিতে হইবে। মিথ্যা কথা একেবারে বর্জন করা উচিত, কারণ শিশু তাহা ধরিয়া ফেলে। আর একটি কথা মনে রাখা উচিত, শিশু প্রশ্ন করার পূর্বেই তাহাকে প্রয়োজনীয় তথ্য বলিয়া দেওয়া ভালো। তাহা হইলে অভিভাবকের প্রতি তাহার আস্থা বাড়িয়া যায় এবং দুশ্চিন্তা কমিয়া যায়। শিশুকে যৌন-শিক্ষা দেওয়ার সময় শিক্ষক নিজে অবিচলিত হইয়া লজ্জা না করিয়া সহজ ভাবে তথ্য বুঝাইয়া দিবেন। শিশু যদি কোন অবৈধ আচরণ প্রকাশ করে, তবে তাহাকে শাস্তি না দিয়া সহানুভূতির সহিত আত্মসংযমে সহায়তা করিতে হইবে। ইহাও মা-বাবাই ভাল করিতে পারেন। তাঁহারাই সন্তানের সর্বাপেক্ষা বড় বন্ধু এবং সন্তান বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া তাঁহাদের সাহায্য পাইলে চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকিবে। অযথা ভয় দেখানো অত্যন্ত অন্যায়, তাহাতে অনেক ছেলেপিলের মনের রোগ হয়, তাহারা বিমর্ষ হইয়া থাকে এবং আত্মবিশ্বাস নষ্ট হইয়া যায়।

ছেলেপিলের মন যেন যৌন-ব্যাপারটিকে স্বাভাবিক দৃষ্টিতে দেখে, তাহাদের মন যেন বিচলিত না হয় এবং অশ্লীলতার দিকে না যাইয়া নানাবিধ কল্যাণকর্মে ব্যাপৃত থাকে। বর্তমানে সিনেমা শিশুর মনের পক্ষে অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর প্রভাব বিস্তার করিতেছে। হয় শিশুদের জন্য আলাদা সিনেমা হউক, নয়তো তাহারা যেন এ সিনেমা না দেখে। অকালপরিপক্বতা ছেলেদের মধ্যে সিনেমার দৌলতেই হইয়াছে। অনেক অভিভাবক যে কোন ফিল্মে ছেলেমেয়েদের লইয়া যান বা তাঁহারা

কি ফিল্ম দেখে না-দেখে তাহার কোনও খোঁজখবর রাখেন না। দুর্ভাগ্যবশতঃ বর্তমানে আমাদের দেশের চলচ্চিত্র 'লভ', মোটরগাড়ি, সুট্, কাল্পনিক পল্লীগ্রাম ইত্যাদি কতকগুলি উদ্ভট জিনিসে ভরপুর—তাহাতে ছেলেমেয়েদের মনে ব্যক্তিত্ব-গঠনের কোনও উপকরণই থাকে না, বরং অকালে শিশুর মনে অস্বাস্থ্যকর কৌতূহল জন্মে। বর্তমানে মেয়েদের নাচের স্কুল অলিতে গলিতে হইয়াছে। সুরুচিসম্পন্ন নৃত্য নিশ্চয়ই সৌন্দর্যানুভূতি আনিয়া দেয়, মনের উৎকর্ষলাভে সহায়তা করে। কিন্তু অনেক নাচের বিষয় শিশুদের পক্ষে অহিতকর—রাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় নৃত্য আদিরসাত্মক এবং ছেলেমেয়েদের ভিতর তাহার প্রবর্তন করা অন্যায়। তাহাদের জন্য নির্দোষ সরল সহজ নৃত্যশিক্ষার বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে।

বাঙালী-সমাজে বিবাহের সময় কতকগুলি স্ত্রী-আচার আছে, যাহা ছেলেমেয়ে সবার সামনেই পালন করা হয়। খুব সুরুচির পরিচয় যে অনেকগুলি প্রথাতে নাই তাহা সবাই জানেন। এমন ঠাট্টা ইয়ার্কি করা হয় যাহা অশ্লীল এবং ছেলেপিলেদের সামনে ঐ অভিনয় অতি-আধুনিক শিক্ষিত পরিবারেও চলে। শিশুরা ঐ সব দেখিয়া অত্যন্ত কৌতূহল প্রকাশ করে। অর্ধেক বুঝিয়া এবং অর্ধেক না বুঝিয়া তাহারা বিচলিত হয়, এবং পাড়ার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আলোচনা করিয়া 'পাকামি' শিখে। যৌন শিক্ষার পক্ষে ইহা মস্ত এক বাধা। শিশুদের সামনে বড়দের খুব সংযত থাকিতে হইবে। বর্ষীয়সী মহিলাদের গুপ্ত আলোচনায় যেন ছেলেমেয়েরা উপস্থিত না থাকে, তাহারা 'বোকা' নয়। আমরা শিশুকে অশ্লীলতা হইতে মুক্ত রাখিব। তাহার মনে কোন দ্বিধা থাকিবে না, অসঙ্কোচে সে মা-বাবার কাছে তাহার সমস্যা ব্যক্ত করিবে। আমরা বৈজ্ঞানিক মনোভাব লইয়া তাহার সমাধান করিব, তাহাকে সাহায্য করিব এবং প্রয়োজনানুসারে যৌন-শিক্ষা দিব। কত ছেলে যে একটুমাত্র পরিচালনার অভাবে কুসঙ্গে মিশিয়া ভয়ঙ্কর ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়, নিজের জীবন ছারখার করিয়া ফেলে, তাহার হিসাব কে রাখে? মা-বাবা যদি এ বিষয়ে যত্নবান হন, তবে অনেক বিপদ হইতে সন্তান বাঁচিয়া যাইবে। যৌন-শিক্ষা দিতে তাঁহাদের এত লজ্জাই বা হইবে কেন? আর সত্য অস্বীকার করিয়া কি লাভ? শিশুর মনে যৌন-কৌতূহল হইবেই, উপযুক্ত ব্যক্তিরা তাহাকে পরিচালনা না করিলে বাজে বখাটে ছেলে, ঝি-চাকর তাহাদের শিক্ষক হইবে। কোন্‌টা ভাল সহজেই অনুমেয়।

বিশেষ ক্ষমতা

সব ছেলেমেয়ে কখনও সমান নয়। এক এক জনের মানসিক শক্তি এক এক দিকে বেশি পরিস্ফুট হয়। কেহ লেখাপড়ায়, কেহ গান-বাজনায়, শিল্পকলায়, কেহ কলকব্জার কাজে অন্য সকলের অপেক্ষা বেশি কৃতিত্ব অর্জন করে। মনোবিদ্‌গণ দেখিয়াছেন, শৈশবে

হইতেই শিশুদের বিশেষ ক্ষমতা টের পাওয়া যায়। কোন কোন ছেলে একটি টিনের চাক্‌তি, পুরানো ঘড়ির স্প্রিং, ভাঙা সাইকেল ইত্যাদি লইয়া কত কি তৈয়ার করে। আবার অন্য কেহ ছেলেবেলা হইতেই বই লইয়া মত্ত থাকে। কেহ গানের প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পায়, কেহ-বা ছবি আঁকাতে প্রতিভার পরিচয় দেয়। আশ্চর্য ব্যাপার এই, অল্পবুদ্ধি ছেলেদেরও কোন-না-কোন দিকে কিঞ্চিৎ পটুত্ব থাকে। যেমন সুযোগ না পাইলে প্রতিভার বিকাশ হয় না, তেমনি ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, সবার ভিতর সব রকম প্রতিভা থাকে না এবং সবার সব কিছু হয় না।

আমাদের বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করা উচিত শিশুদের কোন্‌ দিকে প্রতিভা আছে। বর্তমানে মনোবিদ্‌গণ অনেক পরীক্ষা করিয়া ঠিক করিতে পারেন, কাহার কোন্‌ দিকে বিশেষ ক্ষমতা আছে। কোনও বাবা-মা ভাবিয়া রাখিয়াছেন, ছেলেকে ডেপুটি করিতে হইবে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই বেচারার মানসিক শক্তি যা আছে তাহাতে তাহার টিকেট-কালেক্টার হওয়াই মানায়। এখানে বৃথা তাহাকে গঞ্জনা দিয়া, প্রাইভেট টিউটারকে টাকা খাওয়াইয়া বা মাস্টার মহাশয় ও ইউনিভার্সিটিকে অযথা গালাগালি দিয়া কি লাভ? যাহার ভিতর কলকব্জার কাজের প্রতি অনুরাগ ও ক্ষমতা আছে তাহাকে সেই লাইনের জন্য তৈয়ার করিতে হইবে। প্রত্যেক ছাত্রেরই তাহার বিশিষ্ট ক্ষমতানুযায়ী পেশা গ্রহণ করার জন্য তৈয়ারি হওয়া উচিত। যার কর্ম তারে সাজে, অন্যলোকে লাঠি বাজে—কথাটি মিথ্যা নয়। সন্তানদের সম্বন্ধে অভিভাবকদের কত ভুল ধারণা থাকে, তাহার ইয়ত্তা নাই। ফলে অনেকে মনঃকষ্টে দিন কাটান এবং ছেলেদের জীবনও মাটি হয়। ছেলেদের কাহার বিশেষ ক্ষমতা কোন্‌ দিকে এবং কে কি হইবে, এই সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা রাখিলে ভালো হয়।

অনেক ছেলেকে জিজ্ঞাসা করা হইল 'তুমি আই. এ. পড়িবে, কি আই. এস-সি. পড়িবে?' উত্তর হইল : 'আজ্ঞে, মামাবাবু জানেন।' উহারা কিছুই দৃঢ়ভাবে করিতে চাহে না। উহাদের অভিভাবক যাহা বলিবে তাহাই করিবে। কিন্তু সবার কি সব হয়? অনেক ডাক্তার চাহেন, ছেলে ডাক্তার হইবে। কিন্তু ছেলের বিশেষ প্রতিভা রহিয়াছে গান-বাজনার দিকে। তাহার উপরে জোর করিলে ফল হইবে মেডিকেল কলেজের কর্তৃপক্ষের মস্তিষ্কবিকার। যে সব লোক তাহাদের পছন্দসই কাজকর্ম করিবার সুযোগ পায় না, তাহাদের মনে কখনও শান্তি থাকে না এবং শক্তির অপচয় অত্যন্ত বেশি হয়। ইহা বর্তমানে আমাদের দেশের সর্বত্রই দেখা যায়। যাঁ[illegible] হওয়া উচিত ছিল এন্‌জিনীয়ার তিনি হন হোমিওপ্যাথ্‌ এবং গলির [illegible] শিয়ার্টিক হোমিও হল' স্থাপন করিয়া পান দোক্তা চা সিগারে[illegible] চনা করেন। ইহার জন্য দায়ী তাঁহার অভিভাব[illegible] লক্ষ্য করিয়া যে যে বৃত্তির উপযুক্ত, তাহাকে [illegible] বিপর্যয় উপস্থিত হইবে।

শিশু-পরিচালনায় পরিবারের কর্তব্য

বাবা-মার মনে রাখিতে হইবে, শিশু তাঁহাদের অতিথি, কিছু সময়ের জন্য সে তাঁহাদের সঙ্গে থাকিবে। সুপরিচালনার দ্বারা তাহার ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট করিয়া তাহাকে সমাজের কল্যাণের জন্য, দেশের মঙ্গলের জন্য ছাড়িয়া দিতে হইবে। শিশুর ভবিষ্যৎ কর্মক্ষেত্র বৃহত্তর জগৎ—ক্ষুদ্র পরিবার নয়। মায়ের আঁচল-বাঁধা হইয়া থাকিলে চলিবে না, শিশুকে 'ঘরমুখো' করিয়া রাখিলে চলিবে না। বাবা-মার বুঝিতে হইবে যে, ছেলেকে ভালোবাসিতে হইবে ছেলের ভালোর জন্য, প্রকৃত মনুষ্যত্ব-লাভে সহায়তাব জন্য,—আত্মতৃপ্তির জন্য নয়। বর্তমানে আমাদের দেশে অভিভাবকেরা চান ছেলে লেখাপড়া শিখিয়া চাকুরি করিবে, কিন্তু তাহাকে সমস্ত ব্যাপারেই পরিবারের মতানুসারে চলিতে হইবে। কত সাহিত্য পড়িল, রবীন্দ্রনাথের কবিতা মুখস্থ করিল, কিন্তু ঐ পর্যন্তই। পরিবারের গতানুগতিক রীতিনীতি সব কিছুই তাহাকে মানিয়া লইতে হইবে। ব্যক্তিত্বের গঠন বাঙালী মা-বাবা চান না, তাঁহারা চান 'আমাদের খোকা চিরকাল খোকা'ই থাকিবে। প্রত্যেক শিশুর ভিতরে উচ্চ আদর্শ স্থাপন করিতে হইবে ছেলেবেলা হইতেই। বিদ্যার ভাণ্ডারে, জ্ঞানের ভাণ্ডারে যেন সে কিছু দিতে পারে, দেশের ও দশের সে যেন কিছু ভাল করিতে পারে, এমন অনুপ্রেরণা শৈশব হইতে দিতে হইবে। শৈশবের এই শিক্ষা পর্বতের মতো দৃঢ় হইয়া তাহাকে ভাবী জীবনে রক্ষা করিবে।

গৃহ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কম নয়। শিশু এইখানেই প্রথম আবির্ভূত হয় এবং তাহার প্রথম শিক্ষা এইখানেই হয়। ঠিকমতো শিক্ষা-দীক্ষা পরিচালনা না হইলে গৃহ তাহার মানসিক জীবনের সমাধিক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইবে। আজ আমাদের দেশকে গঠন করিয়া বিশ্বসভায় সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। ইহা কঠিন কার্য এবং এই কার্যের গোড়াপত্তন করিতে হইবে ঘরে ঘরে শিশুদের লইয়া। বাবা-মা যদি এই কাজে সাহায্য না করেন, তবে বাঙালী 'বাঙালী'ই থাকিয়া যাইবে। বাংলাদেশের মেয়েদের শিশু-পরিচালনার বিদ্যা ভাল করিয়া আয়ত্ত করিতে হইবে। তাঁহাদের উপরই সন্তানের ভবিষ্যৎ প্রধানত নির্ভর করে। রাষ্ট্রের সাহায্য প্রয়োজন সন্দেহ নাই। তথাপি আমাদের যেটুকু ক্ষমতা তাহার প্রযোগে যেন আমরা আলস্য না করি। মানুষ তৈয়ারির শিল্পালয়ে পরিবারের স্থান খুবই উচ্চে। আমরা সেই দিনের অপেক্ষায় আছি, যে দিন দেখিব বাঙালী শিশুরা জগতের [illegible]-সমাজে দয়ার পাত্র নয়, পরিহাসের পাত্র নয়, পরন্তু আদর্শস্থানীয়।

শিক্ষাপ্রকল্প

শ্রী[illegible] রায়



বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা

বৈশাখ ১৩৫৫

মূল্য আট আনা

মুদ্রাকর শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, ৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা

ভূমিকা

সাতাইশ বৎসর পূর্বে "শিক্ষার বীজ" নামক প্রস্তাব ও ত্রিশ বৎসর পূর্বে "দেশে জ্ঞানপ্রচার" নামক প্রস্তাব লিখিয়াছিলাম। শিক্ষা সম্বন্ধে পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পূর্বে যে অভাব দেখিয়াছিলাম, এখন তাহা দেখিতেছি। সত্য বটে, এই এক পুরুষ কালের মধ্যে সহস্র সহস্র বালকবালিকা মাতৃকা পরীক্ষা পাস হইয়াছে, বি-এ, এম-এ উপাধিধারী বাড়িয়াছে। সংবাদপত্রের পাঠক বাড়িয়াছে, বাংলা বই বাড়িয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালীর আয়ুষ্কাল বাড়ে নাই, দারিদ্র্য হ্রাস হয় নাই, বাঙ্গালী চরিত্রের গুণ বাড়ে নাই, চরিত্রের দোষ বাড়িয়াছে। পূর্বে এত অসত্য, এত প্রবঞ্চনা ছিল না। যুদ্ধকাল হইতে অর্থ-লালসা এত বাড়িয়াছে যে, চুরি করিতে কিছুমাত্র আত্মগ্লানি ও লজ্জা দেখা যায় না। শিক্ষা দ্বারা এই দোষ নাশ করিতে পারা যায়। টাকার দাম পূর্ববৎ না হইলে অভাবের পীড়না হ্রাস হইবে না, অর্থ-লালসারও হ্রাস হইবে না।

জগজ্জননীর কৃপায় এখন আমরা শিক্ষণীয় বিষয় ও শিক্ষার পদ্ধতি যথেচ্ছ নির্ধারণ করিতে পারি। পশ্চিমবঙ্গরাজ এই বিষয় চিন্তা করিতেছেন। আদ্যশিক্ষা অবশ্যক হইবে, জ্ঞানশিক্ষার ব্যবস্থা হইবে। এই সময়ে আমার প্রস্তাবদ্বয় শিক্ষানীতির অন্বেষণে সাহায্য হইতে পারে।

বাঁকুড়া
১৩৫৫। বৈশাখ

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়

প্রথম খণ্ড

পাঠশালায় শিক্ষা

শিক্ষার বীজ

দেশের অভ্যুদয়ের কারণত্রয়।

দেশের অভ্যুদয়ের কারণ তিনটি,—(১) মানুষ অর্থাৎ লোকের সত্ত্ব, (২) দেশ, (৩) শিক্ষা।

(১) মানুষ।

সকল মানুষ সমান শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করে না। শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিতে দুইটি মানুষ সমান হয় না। ইহা যেমন সত্য, তেমনই সত্য—শিক্ষা দ্বারা নিঃসত্ত্বকে সত্ত্ববান্ করিতে পারা যায় না। যে স্বভাবতঃ দুর্বল, তাহাকে ব্যায়াম করাও, সুপথ্য ভোজন করাও, আর স্বাস্থ্যকর দেশে বাস করাও, কিছুতেই তাহাকে সবলের সমান করিতে পারা যায় না। এইরূপ, দুর্বলচিত্তকে শিক্ষা দ্বারা সবল করিতে পারা যায় না। খর-লোম তৈল-সিক্ত করিয়া অশ্ব-লোমের তুল্য চিক্কণ করিতে পারা যায়, কিন্তু তাহাতে খরতা বাহিরে প্রকাশিত না হইলেও ভিতর হইতে লুপ্ত হয় না; সুযোগ পাইলেই তাহা বাহিরে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। যখন প্রকাশিত হইয়া পড়ে, তখন আমরা আশ্চর্য হই; বলি, বকধার্মিক, ভণ্ডতপস্বী, ধর্মধ্বজী, ইত্যাদি। এইরূপ দৈত্যকুলে প্রহ্লাদও জন্মগ্রহণ করেন; আমরা তখনও আশ্চর্য হই। জাপানের অভ্যুদয়ের মূলে কেবল বিলাতী শিক্ষা নহে। সে জাতির মধ্যে এমন কিছু আছে, যাহা শিক্ষিত হইয়া জাতিটাকে নূতন মার্গে চালিত করিয়াছে। ইহাকেই সত্ত্ব (inherent character) বলিতেছি। ইহার উৎপত্তি কি, কিসে বা ইহার পরিবর্তন হয়, সে-সব গুরুতর প্রশ্নের বিচার এখানে নিষ্প্রয়োজন।

(২) দেশ।

দেশের গুণে মানুষের দেহের ও মনের ও আত্মার, এক কথায় মনুষ্যত্বের ইতর-বিশেষ হয়, এক-একটা জাতির চরিত্র চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। জাপানীকে যদি তিব্বতে বাস করিতে হইত, আমেরিকার রাজ্য-যুতি যদি সাইবেরিয়ায় বসানা যাইত, তাহাদের বর্তমান গৌরব হইত কি? দেশের কোন্ গুণে অধিবাসীর কোন্ গুণ, কিংবা কোন্ কর্ম তাহার সহজ হয়, তাহার বিচারও গুরুতর, এবং এখানে নিষ্প্রয়োজন। 'দেশ' (environment), একটা ব্যাপক সংজ্ঞা; মানুষের সত্ত্ব যেমন অ-দৃষ্ট, দেশেরও অধিকাংশ বিষয় অ-দৃষ্ট। শিক্ষার (culture, training) ফল কিন্তু দৃষ্ট; এই কারণে আমরা শিক্ষার আশ্রয় লইতে এত ব্যগ্র।

(৩) কালোপযোগী শিক্ষা।

এই শিক্ষা কিন্তু দেশ কাল ও পাত্র,—এই তিন উত্তমরূপে চিন্তা করিয়া তদুপযোগী করিতে হইবে। কি উদ্দেশ্য-সিদ্ধির, কি কার্য-সিদ্ধির নিমিত্ত শিক্ষা চাও, তাহা শিক্ষা-পদ্ধতির গোড়ায় বাঁধিয়া রাখিতে হইবে। পাত্র ও দেশ ভগবদ্-দত্ত; পরিবর্তনের উপায় নাই। কাল কিন্তু নিত্যপরিবর্তনশীল। ইংরেজ যদি এদেশে না আসিত, যদি বণিক্-জাতি না হইত, যদি ঐহিক সুখ-ভোগ একান্ত জ্ঞান না করিত, তাহা হইলে আমাদেরও কাল ভিন্নরূপ হইত। জাপানে বিদেশী, পশ্চিমদিগ্বাসী না আসিলে তাহার কাল যেমন চলিতেছিল তেমনই চলিত। বিদেশের একএকটা প্রবল ধাক্কা আসে, দেশের কালের কপাট হঠাৎ খুলিয়া যায়। কখনও কখনও অজ্ঞাত কারণে দেশের চিত্ত নড়িয়া উঠে। কালের স্রোত একটানা বহিতেছিল, বুদ্ধদেব ও চৈতন্যমহাপ্রভুর স্কন্ধে দেবতা ভর করিলেন, কালের স্রোত উজান বহিতে লাগিল। গৌড়নগর ধনধান্যে পরিপূর্ণ ছিল, লোকে বলে কি এক রোগের ভূত আসিয়া তাহাকে শ্মশানভূমি করিয়া দিয়াছিল। অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টি দেবতার মার; মেলেরিয়া ও কলেরা, বোধ হয়, ভূতের মার। পড়িয়া পড়িয়া কত মার খাইতেছি; আর বুক ফুলাইয়া কোঁচা দোলাইয়া বলিতেছি, 'লাগে নাই', 'বেশ আছি।' প্রকৃতির শেষ প্রবোধন (warning) যে বেদনা, তাহাও হারাইতে বসিয়াছি।

প্রাণ ও মনের নিমিত্ত শিক্ষা।

এমন দুরন্ত কালে শিক্ষাকেও দুরন্ত হইতে হইবে। আজি (১৯২০ খ্রিষ্টাব্দ) না হয়, ইয়ুরোপের প্রলয়কাণ্ডে আমাদের অন্ন-বস্ত্রের কষ্ট ঘটিয়াছে। কিন্তু দুই পুরুষ কাল,—দুই পুরুষকাল!—মেলেরিয়া রাক্ষসী থানা পাতিয়া বসিয়াছে; সরিয়া যাইবার কোনও লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। কত লোককে যে খাইয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। যাহারা গ্রাস হইতে খসিয়া পড়িয়াছে, তাহারা বাঁচিয়া আছে, কি মরিয়াছে, সহজে বুঝিতে পারা যায় না। এত বড় ঘটনা, যাহাতে দেশকে-দেশ হীনবীর্য হইয়া পড়িয়াছে, সে দেশ আর দাঁড়াইতে পারিবে কি? দেশের নূতন আইনে যে বাঙ্গালী অমাত্য নিযুক্ত হইবেন, দেখিতেছি তাহাঁকে অসাধ্য সাধন করিতে হইবে। মহামারী হইতে দেশকে মুক্ত করিতে হইবে, অন্ন-বস্ত্র দিয়া বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে, আর শিক্ষা দিয়া এই দুইএর প্রতিষেধ কল্পনা করিতে হইবে।

শিক্ষা এক সংস্কার।

শিক্ষা একটা উপায়, একটা বড় সং-স্কা-র; এদেশেই এই সংস্কার-প্রাপ্ত ব্যক্তিকে দ্বি-জ বলা হইত। ব্রাহ্মণ-কুলে জন্ম হইলেই দ্বি-জ হইত না; যাহার উপনয়ন না হইত, সে দ্বিজ হইত না। আর সেকালে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের পুত্রের উপনয়ন না হইলে সে শূদ্র বলিয়া গণ্য হইত। ইদানী আমরা মনে করিতেছি, শিক্ষা দেশময় অবশ্যক (compulsory) করিতে বলিয়া একটা নূতন কিছু করিতে বলিতেছি। মোটেই না। যে শিক্ষা অবশ্যক ছিল, তাহাকে কালোপ-যোগী করিয়া পুনঃ প্রবর্তিত করিতে বলিতেছি, নর-নারী-নির্বিশেষে দেশোপযোগী করিতে বলিতেছি।

এখনও ব্রাহ্মণকুমারের উপনয়ন হইতেছে; তাহার স্কন্ধে উপবীত লম্বিত হইতেছে, কর্ণে সাবিত্রী উচ্চারিত হইতেছে, কিন্তু যে উপনয়নের কথা বলিতেছি, ইহা সে উপনয়ন নহে। সে উপনয়ন তিন দিনে সমাপ্ত হইত না, চতুর্থ দিনে গুরুগৃহ হইতে সমাবর্তনও হইত না।

একালে সে উপনয়ন আর চলিবে না। কিন্তু তাহার ভাব যথাসাধ্য রক্ষা করিয়া শিক্ষা-ক্ষেত্রে প্রবাহিত করিতে বলি। বঙ্গে ব্রাহ্মণ মাত্র সাড়ে বার লক্ষ; দুই কোটি হিন্দুর বাকি সব শূদ্র।

যদি বা অন্য বর্ণ আছেন, তাহা নগণ্য। বঙ্গের অধিকাংশ মুসলমানের পূর্বপুরুষ হিন্দু ছিলেন, বোধ হয় অধিকাংশ শূদ্র ছিলেন। বহুকাল দ্বি-জের সেবা করিয়া হউক, বঙ্গভূমি বৌদ্ধধর্মের ও শক্তি-তন্ত্রের লীলা-নিকেতন বলিয়া হউক, সেদেশে মহাপ্রভু চৈতন্যের আবির্ভাব-বশেই হউক, বঙ্গের শূদ্র প্রাচীনকালের শূদ্র আর নাই। বঙ্গে কেন, বহু প্রদেশে নাই। এই শূদ্র শিব-শক্তির বা রাধাকৃষ্ণের তত্ত্ব অক্লেশে বুঝিতে পারে। ইহা জ্ঞান-বিস্তারে অল্প সৌভাগ্যের কথা নহে। পাত্র আছে; আস্তিক্যের বীজ গ্রহণের শক্তি আছে। ইহাদিগকে একালের দ্বিজ করিয়া লওয়া কঠিন নহে। কারণ শিক্ষা দ্বারা মানুষের কতকগুলা দোষ শোধ্‌রাইতে পারা যায়; বিশেষতঃ যে-সব গুণের বীজ থাকে, সে-সব বীজকে অঙ্কুরিত, বর্ধিত ও ফল-প্রসূ করিতে পারা যায়। এই কারণেই উপনয়ন একটা প্রধান সংস্কার গণ্য হইত।

কন্যা-শিক্ষা।

বিবাহ আরও বড় সংস্কার। শুধু সেকালের হিন্দু স্মার্তা-চার্যের নিকট বড় ছিল না; একালের সমাজতত্ত্বদর্শীর নিকটও বড়। কিন্তু লোকে জানে না, বিবাহ একটা সংস্কার। না জানিলেও সংস্কার সংস্কারই থাকে। কিন্তু জানিলে নিজের ও সমাজের হিত-সাধন হইত। বিবাহ একপুরুষের সংস্কার নহে; যে বিবাহ করে কেবল তাহাকেই দোষ গুণ ভুগিতে হয় এমন নহে, পরিবারবর্গও ছাড়িয়া দিই; পুত্র-পৌত্রাদি ক্রমে অন্ততঃ তিনচারি পুরুষ সে বিবাহের ফল ভোগ করে। লোকে বোঝে না, বিবাহ পুত্রার্থে, কামার্থে নহে। এই জ্ঞান জন্মিলে দেশে কন্যা-শিক্ষা প্রসারিত হইবে; পুত্রের তুল্য যত্নে কন্যা পালিত ও শিক্ষিত হইতে থাকিবে। তখন বর-পণ গিয়া হয়ত কন্যাপণ আসিবে। কারণ যাহাকে সহধর্মিণী করা যাইবে, যাহাকে পুত্রার্থে লাভ করিতে হইবে, তাহাকে ঘটকের দোকানে হঠাৎ পাওয়া যাইবে না; তাহাকে নিশ্চয়ই সমাদরে গ্রহণ করিতে ও সমাদরে রক্ষা করিতে হইবে। ইস্কুল-কলেজের শিক্ষিতেরা সামাজিক অনুষ্ঠান-বিষয়ে নিতান্ত অজ্ঞ। তাহারা এসব বিষয়ের উপদেশ পায় না; বর্তমান 'সমাজ-ব্যতিরিক্ত শিক্ষার দোষই এই।

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রয়োজন।

আমাদের দেশের পক্ষে এই শিক্ষার প্রয়োজন ছিল। সমাজের বাহিরে থাকাতে তাহার দোষ গুণ সহজে চোখে পড়িতেছে। অপর সমাজের তুলনায় নিজের সমাজের কোন্ অংগে বিকার জন্মিয়াছে, তাহা সহজে ধরিতে পারা যায়, প্রতিকার তত সোজা না হইলেও লক্ষ্য থাকে। কালে কতক লোক বিদ্রোহী হইয়া উঠে, তাহারা নিজেদের জীবনে ফলাফল ভোগ করিয়া গণের পথপ্রদর্শক হয়। এইরূপে বিদ্রোহী মাত্রেই চোখে আঙ্গুল দিয়া দেশের ক্ষত দেখাইতে থাকে, এবং কালে তাহার আরোগ্যেরও সূচনা করে। এই যে 'অস্পৃশ্য জাতি', 'অনুন্নত জাতি' নামে হিন্দু সমাজে একটা বিষম ব্যাধি বহুকাল হইতে নালী-ক্ষতে পরিণত হইয়া আছে, সমাজের ভিতর হইতে তাহার শোধন হইত কি না, সন্দেহ। যে কারণে সে জাতি অস্পৃশ্য ছিল, যে কারণে অন্য এক জাতির স্পৃষ্ট জল অমেধ্য বিবেচিত হইত, এখন সে কারণ আর নাই! আমরা বুঝিয়াছি দেহের ও চিত্তের শুচিতা-রক্ষার নিমিত্ত যত্নবান্ হইতে হইবে; এবং কদাচার ও অসৎ কর্ম দ্বারা সে শুচিতা রক্ষা পাইতে পারে না। হোটেলে ভোজনের আশঙ্কাও ত এই। অপরদিকে উনানের চারিদিকে জলের রেখা টানিয়া যে আত্মতুষ্টি, তাহা হিন্দুস্মৃতিশাস্ত্রের ভাবার্থ বিস্মরণের ফল। ব্রাহ্মণ-বংশে জন্ম হইলে ভ্রষ্টাচার ও অসৎমার্গাবলম্বের দোষ যায় না। এরূপ ব্রাহ্মণের প্রদত্ত জলও অপেয়। কুলধর্ম অগ্রাহ্য নহে; কিন্তু সদাচার ও সদ্‌ব্যবহার দ্বারা নিষ্কুলীনকে কুলীন করা এদেশে অজ্ঞাত নহে। মধ্যশিক্ষা ও অন্ত্যশিক্ষা -সময়ে ছাত্রদিগকে গুরুকুলে বাস করিতে হইবে। তখন তাহাদিগের যে শৌচ অভ্যাস হইয়া যাইবে, তাহার ফল সহজে নষ্ট হইবে না।

পাশ্চাত্য শিক্ষায় স্মৃতির হ্রাস।

একালের পাশ্চাত্য শিক্ষা নূতন মার্গে ধাবিত হইয়াছে, বুদ্ধির বিকাশকেই এক কাম্য করিয়া ধরিয়াছে। ফলে স্মৃতিশক্তি, যে শক্তি নইলে সংসারে একদিন টিকিতে পারা যায় না, সে শক্তি ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। এখন রব উঠিয়াছে, মুখস্থ করিও না, বুঝিয়া রাখ। কিন্তু রাখার নামই ত স্মৃতি। বুদ্ধির বিকাশ চাই; কিন্তু তা বলিয়া স্মৃতির ধ্বংস চাই না। টোলে-পড়া পণ্ডিত মহাশয়দিগের স্মৃতি

দেখিলে আশ্চর্য হইতে হয়। তাহাঁরা না পড়িয়া পণ্ডিত নহেন না বুঝে পণ্ডিতও নহেন। আমরা আবৃত্তির নামে ডরাই, ছেলেরা আরও ডরায়। একই পদ বা বাক্য যাহা পড়িতে ভাল লাগিতেছে না, মনে রাখিতে পারা যাইতেছে না, তাহাকে কণ্ঠে ধারণ করিতে হইবে,— ইহা শুনিলেই সন্তাপ ও ক্রোধ জন্মে। আমি বলি, এই কারণেই স্মৃতির অভ্যাস, শারীরিক ব্যায়ামের তুল্য, হিতকর। কষ্টকর ত্যাগ করিতে করিতে কেবল সুখ, কেবল আহ্লাদ, কেবল ইচ্ছা, কর্মের প্রবর্তক হইয়া দাঁড়ায়। তখন শিক্ষার আর কি থাকে?

ইচ্ছা-শক্তির হ্রাস।

যাহা প্রথমে অসাধ্য মনে হয়, তাহাকে সাধ্য করিয়া তোলা, ষোল আনা না হউক অন্ততঃ বার আনায় সিদ্ধিলাভ করা, শিক্ষার প্রধান ফল। চেষ্টা কর, চেষ্টা কর— লোকে এই উপদেশ দেন। কিন্তু চেষ্টার গোড়ায় যে ইচ্ছাশক্তি, তাহার চালনা না হইলে উপদেশ পালনই অসাধ্য। আমরা ব্রত-গ্রহণের, ব্রত-আচরণের উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়াছি; মনে করিয়াছি, সে-সব কুসংস্কার। কিন্তু ইহার ফলেব নিমিত্ত পরকালের দিকে তাকাইতে হইবে না, ইহার ফল ইহকালেই প্রত্যক্ষ হয়। আমরা ইংরেজী অনুবাদ করিয়া বলি, বিদ্যার পথ রাজপথ নহে; অথচ সে পথে রাজভোগের ব্যবস্থা হইতেছে। এত ভোগে (যদিও দরিদ্র ভারতবাসীর পক্ষে দুঃখভোগ) থাকিয়া চিত্ত নির্মল ও দৃঢ় হইতে পারে না। আমরা জ্ঞানের শক্তি মানি, ক্রিয়ার শক্তি আবও মানি; মানি না ইচ্ছার শক্তি! যে বাঙ্গালীর ভীরুতা-অপবাদ ছিল, সেই বাঙ্গালীর সুকুমার পুত্রেরা কিসের বলে ইয়ুরোপের রণক্ষেত্রে বীরের পরিচয় দিয়াছে? তাহারা কখনও কোনও কষ্টকর ব্রত গ্রহণ করে নাই। গুরুকুলে দৃষ্টান্ত পাইলে আমাদের পুত্রেরা কি না করিতে পারে? ছোট ছোট, কিন্তু অনভ্যস্ত ও কষ্টকর কাজ করিতে করিতে যে চিত্তবল জন্মে, সংসারে সে বলের নিকট অপর বল পরাস্ত হয়। "আমি ব্রাহ্ম মুহূর্তে শয্যা ত্যাগ করিব", "আমি বিনা পাদুকায় এক বৎসর যাপনা করিব", "আমি গল্প করিতে ভালবাসি, কিন্তু এক বৎসর মৌনী থাকিব",—ইত্যাদি সহস্র কর্ম দ্বারা ইচ্ছা-শক্তি প্রবল করিতে পারা যায়। আমার প্রয়োজন নাই, তথাপি ছয়মাস প্রত্যহ, কি মাসে মাসে এক কি দুই নির্দিষ্ট

দিনে এই কর্ম করিব, শুভকামনায় এইরূপ প্রতিজ্ঞা পালন দ্বারা মনে বল আসে। আমি পারি, অন্যের কষ্টকর হউক, আমি পারি, এই আত্মশক্তি জাগাইবার নিমিত্ত ব্রতগ্রহণ একান্ত কর্তব্য। ইষ্টদেবের নামে ব্রত পালন করিলে তিনিই ব্রতীকে পালনের কষ্ট হইতে রক্ষা করেন। বালকের পক্ষে ব্রহ্মচর্য এইরূপ ব্রত। কঠিন বলিয়াই ইহা যথাসাধ্য পালন করিতে হইবে। আচার অভ্যাসের গৌণ ফলও তাই। বিদ্যার জাহাজ, ও জ্ঞানের ভাণ্ডার হওয়া অপেক্ষা সুচরিত-অভ্যাস লক্ষগুণে শ্রেয়ঃ, সদাচার ও সদ্ব্যবহার যাবতীয় ধর্মের মূল। হিন্দুর নিকট ধর্মই এই।

সমাজ-ব্যতিরিক্ত শিক্ষায় অকল্যাণ

কিন্তু শিক্ষার যে প্রস্তাব করিতে যাইতেছি, তাহা কেবল হিন্দুর নিমিত্ত নহে। আমি মুসলমান ধর্মের কিছু জানি না। কিন্তু সে ধর্মেও উপবাস আছে. হয়ত ব্রতগ্রহণও আছে। কারণ ইন্দ্রিয়-সুখে রত থাকিয়া আধ্যাত্মিক সাধন হইতে পারে না। তথাপি হিন্দুর পর্ব পূজা, ব্রত উপবাস, প্রভৃতি হিন্দুর পুত্রের শিক্ষার পক্ষে যেমন মূল্যবান, অন্যের পক্ষে তেমন হইতে পারে না। অথচ এসব বাদ দিয়া পুত্রকে দ্বীপান্তরে নির্বাসিত করিতে পারা যায় না। এখন ধরিয়া রাখা হইয়াছে, পুত্রের আধ্যাত্মিক শিক্ষা তাহার বাড়ীতে হইতেছে। যদি বাড়ীর সহিত ইস্কুলের যোগ থাকিত, যদি দুই-ই এক শরীরের দুই অংগ হইত, তাহা হইলে কর্ম-বিভাগে ক্ষতি হইত না; ইস্কুলে বুদ্ধির, বাড়ীতে দেহ ও আত্মার বিকাশের চেষ্টা থাকিত। কিন্তু ইস্কুলের শিক্ষা সমাজ-ব্যতিরিক্ত শিক্ষা। কেবল তাহা নহে, সে শিক্ষা পাশ্চাত্য সভ্যতা ও পাশ্চাত্য ধর্মব্যতিকীর্ণ শিক্ষা। এই ব্যবস্থায় হিন্দুর ছেলে ও মুসলমানের ছেলে সে সভ্যতার প্রতি লোলুপ হইতেছে। বড় হইয়া জ্ঞানবান্ হইয়া সে ধর্মান্তর গ্রহণ করুক, কিন্তু তাহার কাঁচা বয়সে তাহাকে মাতাপিতার ধর্মে পালিত হইতেই হইবে। কেহ সে ধর্মকে কুসংস্কার বলুক, অন্ধবিশ্বাস বলুক, সে বিচার তাহার মাতাপিতার, পুত্রকন্যার নহে, রাজারও নহে।

ধর্মশিক্ষা।

বর্তমান শিক্ষা যে সর্বাংগীন হইতেছে না, তাহা সবাই বুঝিতেছি। কেন হইতেছে না, তাহাও বুঝি। রাজা বিধর্মী;

দেশের প্রজাও একধর্মী নহে, ব্যাপক অর্থে (কেবল religion অর্থে নহে) ধর্ম শব্দ প্রয়োগ করিতেছি। আচার-ব্যবহার সমাজের লিঙ্গ (distinguishing mark)। নিজের সম্বন্ধে যাহা করি, তাহা আচার। ইষ্টদেবের পূজা, পিতৃপুরুষের তর্পণ; বিবাহও ইহার অন্তর্গত। পরের সম্বন্ধে যাহা করি, তাহা ব্যবহার। ব্যবহার আইনের অন্তর্গত। রাজা প্রজার ব্যবহার নিয়মিত করেন; ব্যবহার-ভঙ্গে দণ্ড বিধান করেন, এবং ব্যবহারাভিজ্ঞ ব্যবহারাজীবের সাহায্যে ব্যবহারের বিচার করেন। রাজা বিধর্মী হওয়াতে প্রজার ব্যবহার ধর্মের বহির্ভূত হইয়া পড়িয়াছে। বর্তমান বিচারালয় আর ধর্মাধি-করণ বলিতে পারা যায় না। অথচ শাস্ত্র চাই; কারণ, শাস্ত্রহীন সমাজ ও রাজশাসনহীন রাজ্য, কর্ণহীন নৌকার তুল্য প্রমাদের অতল জলে নিমগ্ন হয়। আর, এ কথাও কি সত্য নয়, গর্ভচ্যুত শিশু নিজে নিজে পণ্ডিত হয় না?

শাস্ত্রশিক্ষা।

লোকে শাস্ত্র শব্দের অর্থ জানে না। এখন ইহার প্রতি বিদ্বেষভাব জন্মিয়াছে। তাহারা মনে করে যে শাস্ত্র শাস্ত্র, ধর্ম ধর্ম, করিয়া দেশটা অধঃপাতে গিয়াছে, এই মরণ-বাঁচনের দিনে পুত্র-কন্যাকে সেই শাস্ত্রের সেই ধর্মের দাসত্ব শিখাইতে হইবে? আমি বলি, ধর্ম চাই, শাস্ত্র চাই; হৈ হৈ রৈ রৈ শব্দে লাফাইয়া বেড়াইলে হাত-পা ভাঙিতে থাকিবে, পতনই চলিতে থাকিবে, উত্থান হইবে না। কার বলে সমাজকে বলবান্ করিবে, ভারতের চব্বিশ কোটি হিন্দুর দ্বিজত্ব ঘটিতে পারিবে? অর্থ চাই, অর্থকরী শিক্ষা চাই বলিয়া মানুষগুলাকে কলে পরিণত করিতে চাও কি? রজতমুদ্রা যদি পরমার্থ হয়, তাহা হইলেও আত্মহীন কলের মুখ দিয়া সে রজত বমিত হইতে থাকিবে না। মরাকে বাঁচাইতে চাও; অথচ মৃতসঞ্জীবনী সুরা পান করিতে দিবে না? ধর্মের ও শাস্ত্রের, বিশেষতঃ স্মৃতি-শাস্ত্রের প্রয়োজন আছে কি না, ভাবিয়া দেখ। নানা মুনির নানা মত দেখিয়া স্থির চিন্তা হইতে পলায়ন করিলে চলিবে কি? জাপানও ফাঁপরে পড়িয়াছিল এবং হযবরল করিয়া কথাটা চাপা দিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু প্রাচীন বাঁধন ভরসা করিয়া বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে নূতন ধর্ম (morals) শিক্ষা দিতেছে, তাহা ত পর্যাপ্ত হয় নাই। চল্লিশ পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই

দ্বিতীয় জর্মানী হইয়া লোলুপ দৃষ্টিতে আত্মতুষ্টি খুজিতেছে। জাপান ফাঁপরে পড়িয়া বিলাতী সভ্যতার অনুবর্তী হইয়াছে। কিন্তু আমাদের স্মৃতিশাস্ত্রে ও শক্তিতন্ত্রে সনাতন বলিয়া কিছু আছে। দ্বেষরাগাদিহীন (unbiassed) সৎ ও বিদ্বান্ যে বিধি নিত্য পালন করেন এবং যাহা তাহাঁর হৃদয় শ্রেয়ঃ বলিয়া অনুমোদন করে, এমন শাস্ত্র নিশ্চয় সনাতন। এখন দেখি, ইস্কুলে good conduct জন্য prize দেওয়া হয়। যে ছেলেরা পাঁচ ছয় ঘণ্টা বোবার মতন চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, যাহারা হাঁ-তে থাকে না, না-তেও থাকে না, কিন্তু ছেলেয় ছেলেয় দুষ্টামি করিলে শিক্ষকের নিকট গোয়েন্দাগিরি করে, তাহারা good conductএর prize পায়। কিন্তু আমি যে শিক্ষাশালার কথা বলিতেছি তাহাতে "প্রাইজ" থাকিবে না, ছেলেরা বোবা হইবে না, বালক-বিশেষকে চর করা হইবে না, কেহ অনুচিত দুষ্টুও হইবে না। আচার ও ব্যবহার অভ্যাস করাইয়া, মুখে বলিয়া নহে, কাজে করাইয়া শিক্ষার অঙ্গ করিতে চাই।

আচার ও ব্যবহার শিক্ষা।

এখানে আর-একটা কথা বোঝাপড়া হইয়া যাউক। পুত্রকন্যা-শিক্ষা অবশ্যক (compulsory) করিতে চান; কোন্ অধিকারে? সে অধিকারে বিনা বেতনে শিক্ষা দিতে হইবে। কারণ, সে শিক্ষা পিতা বা অন্য অভিরক্ষিতার (guardian) স্বেচ্ছাধীন থাকিবে না। অতএব এমন শিক্ষা দিতে হইবে যাহাতে পুত্রকন্যা 'মানুষ' হয়। মানুষ করিতে গেলেই ধর্মশিক্ষাও অবশ্যক করিতে হইবে। বলা বাহুল্য, আচার ও ব্যবহার-শিক্ষাই ধর্মশিক্ষার আদি।

এই শিক্ষা বাড়ীর উপরে ছাড়িয়া দিলে বর্তমান অবস্থায় চলিয়া আসিব। ইহার দুই কারণ। (১) যাহারা ইংরেজী-শিক্ষিত হইয়াছেন, তাহাঁরা সনাতন-ধর্ম-শিক্ষার প্রায় কিছুই জানেন না। (২) যাহারা অশিক্ষিত, তাহারা ধর্মশিক্ষা দিতে গিয়া আচারকেই বড় করিয়া তুলিবে, কিংবা কুলাচার ও দেশাচারকেই আচার মনে করিবে। অবশ্য একথা সত্য, প্রচলিত যুক্তিহীন আচার অধিককাল টিকিবে না। ট্রামে ও রেলে ও ষ্টীমারে জন্মগত জাতির লঘু-গুরু-ভেদ ঘুচাইয়া দিতেছে, কুলীন ব্রাহ্মণের পাশে একাসনে অবনত অকুলীন বসিয়া যাইতেছে। রাজদণ্ডের ভয়ে ম্লেচ্ছ বিচারকের বিচার মানিতে হইতেছে। তাহাঁকে

(সেলাম নামে) নমস্কারও করিতে হইতেছে। প্রায় আটশত বৎসর, চৌদ্দপুরুষ নয়, বত্রিশ পুরুষ, এই দুরদৃষ্ট ঘটিয়াছে। কাজেই ঘরে বাহিরে সংগতি রাখিয়া চলিতে গেলে যাহা নিত্যাচার, যাহা নিত্য ব্যবহার, তাহা আশ্রয় করিতে হইবে। সকলের বাড়ীতে এই শিক্ষা হইবে কি না সন্দেহ।

গুরুকুলে শিক্ষা।

নিত্যাচার ও নিত্য-ব্যবহার শিক্ষা সকলের বাড়ীতে সেকালেও হইত না। তাই শিষ্যকে গুরুকুলে (কুল=গৃহ) থাকিতে হইত। বিহারও বৃহৎ গুরুকুল। মঠ শব্দের অর্থ ছাত্রনিবাস। এখানেই আচার, বিনয় (discipline), বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা (fame), বৃত্তি (occupation), নিষ্ঠা (devotion to work), তপঃ (moral virtue), প্রভৃতি কুলীনের কাম্যগুণ জন্মিতে পারে। বাড়ীর শিক্ষা, ব্যক্তির শিক্ষা; গুরুগৃহে শিক্ষা, সমূহের শিক্ষা। দ্বিবিধ শিক্ষার মধ্যে, গুরুকুলে শিক্ষাই ভাল। এখন একা একা তিষ্ঠিবার জো নাই। এই বুঝিয়াই বিধি হইতেছে, আদ্যশিক্ষা সকলকেই পাইতে হইবে। মাতাপিতার মতামত-জিজ্ঞাসা নাই; ছেলে তাহাঁদের হইলেও রাজ্যের। যে ছেলে রাজ্যের, সে ছেলের শিক্ষা-দীক্ষা রাজার হাতে। অতএব তাহার শিক্ষা, সমূহের শিক্ষা হইলেই রাজ্যের মঙ্গল। গুরুকুলে এই শিক্ষার যেমন সুবিধা, বাড়ীতে তেমন হইতে পারে না; গুরুকুলে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যে ঘণ্টায় যে আচরণ, সে ঘণ্টায় সে আচরণ ঘড়ীর কাঁটার মতন চলিতে থাকে। ব্রাহ্মমুহূর্তে শয্যা-ত্যাগ; সে সময়ের নিদ্রালস্য সতীর্থের উত্থানে পলায়ন করে। আরও সুবিধা, গুরুগৃহের যাবতীয় কর্ম ছাত্র কিংবা ছাত্রীকেই করিতে হইবে। কারণ, ভৃত্য নাই। ঘর-দুয়ার ঝাঁটানা, নিকানা, বাসন-কোশন মাজাধোয়া, নদী হইতে জল আনা, হাট করা, রান্না-বান্না প্রভৃতি যাবতীয় কর্ম বাল্যকাল হইতে করিতে করিতে একদিকে ছাত্র ও ছাত্রীর দেহ শ্রম-ক্ষম হইতে থাকিবে, অন্যদিকে এসব নিত্যকর্মে হেয়ত্বজ্ঞান বা লজ্জা-বোধ জন্মিতে পারিবে না। এক এক গৃহে আটদশ জনের অধিক থাকিবে না। ইহাদের পরস্পর সখ্য দ্বারা, পরস্পর সাহচর্য দ্বারা সমূহের ইষ্টানিষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইতে থাকিবে। কুলপতির আজ্ঞাধীনে থাকিয়া এক শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া কর্মে অভ্যাস জন্মিলে পরে বড় হইয়া নেতার অধীনে কর্ম করিবার প্রবৃত্তি

সহজে আসিতে পারিবে। বিশেষতঃ যে ব্যায়াম ও আহার না করাইলে বাঙ্গালী জাতির পুত্রকন্যার কল্যাণ নাই, তাহা এইরূপ গুরুকুল ব্যতীত বাড়ীতে হইতে পারিবে না। ইংরেজ জাতির কৃপায় রবিবারে ছুটি, গ্রীষ্মকালে ছুটি, বিদ্যালয়ের বালকবালিকারা এখন ভোগ করিতেছে। মধ্যে মধ্যে নিত্যকর্মের পরিবর্তন চাই; কিন্তু সেটা পর্বে পর্বে হইলে, গ্রীষ্মে না হইয়া বর্ষাকালে হইলে, একদিকে পর্বের মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম হইবে, অন্যদিকে বর্ষাকালের দুর্যোগ-হেতু শিক্ষার ব্যাঘাত ঘটিতে পারিবে না। নয় বৎসর বয়স পর্যন্ত বালকবালিকা অবশ্য বাড়ীতে থাকিবে। তারপর গুরুকুলে বাস যত হয়, ততই ভাল। সর্বত্র এই নিয়ম চলিতে পারিবে না; কিন্তু এখানে মানস বর্ণনা করা যাইতেছে।

বাঙ্গালীর দোষ গুণ।

পূর্বে দেখা গিয়াছে, এমন শিক্ষা চাই, যদ্দ্বারা বাঙ্গালীজাতির দোষ যথাসাধ্য শোধিত হইতে পারিবে, এবং গুণ বিকসিত হইয়া সর্বাঙ্গপূর্ণ হইতে পারিবে। কিন্তু বাঙ্গালী হইয়া বাঙ্গালীর দোষ গুণ ঠিক ধরিতে পারিব কি না, সন্দেহ। না ধরিলে শিক্ষার বিষয় ও ক্রমও ঠিক হইতে পারিবে না। অতএব ভুলের শঙ্কা থাকিলেও চেষ্টা করিতেছি।

(১) দেহ।

বাঙ্গালী শীর্ণ ও খর্বদেহ; বাঙ্গালী দুর্বল। ইহার কারণ জানা চাই, কিন্তু জানা কঠিন। মেলেরিয়া, পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব, ব্যায়ামাভাব বা দেশের উষ্ণ আর্দ্র বায়ু, বোধ হয় সব মিলিয়া জাতির দৈহিক অবনতি ঘটাইয়াছে। অবশ্য আদি বংশের দোষও থাকিতে পারে। তথাপি মনে পড়ে, পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে বাঙ্গালী এত হীনবীর্য ছিল না। জাপানীও আকারে বাঙ্গালীর তুল্য, তাহার অন্নও বাঙ্গালীর তুল্য। কিন্তু প্রভেদ—তাহার দেশে মেলেরিয়া নাই, পুষ্টিকর বলকর অন্নও অপ্রচুর হয় নাই; আর প্রভেদ, তাহারা পুত্র-কন্যাকে রীতিমত ব্যায়াম না করাইয়া ছাড়ে না। দুর্বল বলিয়া বাঙ্গালী কার্যবিমুখ হইয়া পড়ে। আহার ও ব্যায়াম এই রোগের ঔষধ।

(২) চিত্ত।

বাঙ্গালী সহসা প্রবৃত্ত, সহসা নিবৃত্ত হয়। অর্থাৎ তাল-পাতার তুল্য ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গে দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, কিন্তু পরে নিবিয়া যায়। ভাবিয়া-চিন্তিয়া ধরে না, ভাবিয়া-চিন্তিয়া ছাড়ে না। অর্থাৎ বাঙ্গালী হুজুগে মাতে। এই দোষ-হেতু বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠান স্থায়ী হয় না। জাপানী জাতিটাও নাকি বাঙ্গালীর তুল্য চলচিত্ত ছিল, কিন্তু আপনাকে বাগাইয়া আনিয়াছে। এই দোষের প্রতিকার বড় সহজ নহে। বোধ হয় নিত্য ক্লেশকর কর্ম (drudgery) করিতে করিতে ও ইচ্ছাশক্তির বিকাশে চলচিত্ততার প্রতিষেধ হইতে পারে। দেখা যায়, গ্রামের লোক সহজে হুজুগে মাতে না। তাহারা স্বভাবতঃ রক্ষাশীল। কাজেই ফলাফল স্পষ্ট বুঝিতে না পারিলে নূতন কাজে হাত দেয় না। কেহ কেহ বলেন, আমাদের যুবকেরা ভাব-প্রবণ। ইহা অসাধারণ নহে। যৌবনের চাঞ্চল্য সর্বজনবিদিত। ভাব-প্রবণ না হইলে বরং দোষের হইত। যৌবনে ভোগ-লালসা যেমন প্রবল হয়, ত্যাগ, এমন কি আত্মত্যাগও তেমন সহজ। এই দুই বিরুদ্ধ গুণের সমাবেশেই যৌবন মহনীয় হইয়াছে। তথাপি বাঙ্গালী যুবার ভাব-প্রবণতা অধিক হইতে দেওয়া কর্তব্য নহে। কাঁচা বয়সে দর্শন-পাঠ ঠিক মনে হয় না। বিশেষতঃ ইদানীর ইয়ুরোপী বিশৃঙ্খলবৃত্তি নায়ক-নায়িকার উপন্যাস বিষবৎ পরিবর্জন কর্তব্য।

(৩) আত্ম-সম্মান।

বাঙ্গালী অভিমানী। ইহা একটা বড় গুণ বটে, কিন্তু অতিবোধে দর্প ও ঔদ্ধত্য আসে। অশিষ্টের দর্প-হেতু বাঙ্গালী তাহার প্রতিবেশীর বিরাগভাজন হইয়াছে। তথাপি বাঙ্গালী যাহা 'ছোট কাজ', হেয় কাজ মনে করে, সে কাজ সহজে করে না। বাঙ্গালী কুলী হয় না। ঘরে অন্ন আছে বলিয়া নহে; কোন্ বাঙ্গালীকে খাটিতে না হয়? গ্রাম-সম্বন্ধ চলিয়া যাইতেছে বলিয়া বাঙ্গালী বাড়ীর চাকর হইতেছে না। পঞ্জাবের শিখ কলিকাতায় 'মোটর' রথের সারথি হইতেছে; বেতন অল্প নয়; কিন্তু বাঙ্গালী কয়জন? ইদানী কিছু কিছু হইতেছে বটে, কিন্তু আমার বিশ্বাস এই কর্মে তাহারা লজ্জা বোধ করে। বাঙ্গালীর কেরাণী হইবার কারণও তাই। কেরাণী প্রাচীনকালের 'করণিক' (officer); দাস (menial

servant) নহে। তা ছাড়া, যিনি যাহাই বলুন, বেতন লইয়া পরের কাজে দেহ খাটাইয়া কে কোথায় সুখ অনুভব করে? দেহের কর্ম চিরদিনই হেয়, বুদ্ধির কর্ম চিরদিনই শ্রেয় বিবেচিত হইয়া আসিতেছে। আমেরিকা নূতন রাজ্য; সেখানে পরে কি দাঁড়ায় কে জানে। আমি দৈহিক শ্রমের নিন্দা করিতেছি না; বাঙ্গালীর কেরাণী হইবার প্রবৃত্তির মূল খুঁজিতেছি। আমরা একটা কথা ভুলিয়া যাই। যাহার দেহ ও মন মাত্র পুঁজি, তাহাকে ভবের হাটে এই দুই লইয়াই ব্যাপার করিতে হইবে। কেরাণী ও মাষ্টারি, ওকালতি ও ডাক্তারি, ইত্যাদি কর্মে মানুষটি থাকিলেই চলে। লোকে বলে ব্যবসা কর, বাণিজ্য কর, বৈজ্ঞানিক চাষ কর। কিন্তু এসব কর্ম, চাকরির তুল্য একপাদ নহে, প্রায়ই ত্রিপাদ কি চতুষ্পাদ।

অভিমান প্রকৃত বস্তুতে আরোপিত হইলে চিত্তবলের সঙ্গে সঙ্গে কর্মশক্তি প্রকাশ করে। সংবাদপত্রে দেখি, প্রায় দেড় হাজার যুবা রাজদ্বেষী সন্দেহে কারারুদ্ধ হইয়াছিল। ইহারা ধন চায় নাই, মান চায় নাই। কি অভিমানে মরিতে গিয়াছিল? যে বাঙ্গালী কখনও অস্ত্রের মুখ দেখে নাই, কোন্ সাহসে ইয়ুরোপের রণক্ষেত্রে গোলার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল? নির্বোধের সাহস ত নয়। অভিমানের ভালর দিকে এই। মন্দের দিকে, সাহেব সাজিবার চেষ্টা। সাহেবে মান পায়; অন্য উপায় না দেখিয়া মানী বাঙ্গালী সাহেবের অনুপযুক্ত পরিচ্ছদ ও রীতি নীতি অনুকরিতেছে। বড়র অনুকরণ মানুষ মাত্রেই স্বাভাবিক; কারণ তাহাই শিক্ষার উপায়। কিন্তু বাহ্য আবরণ অপেক্ষা বড় কিছু আছে, বাল্যাবধি তাহার আভাস পাইলে বাঙ্গালী মানুষ হইয়া উঠিবে। এক অন্তরীয় ও এক উত্তরীয় পরিলেও হিন্দুর গর্ব করিবার অনেক আছে, বাঙ্গালীরও আছে। দুঃখের বিষয়, এই ইতিহাস, প্রাচীন অবদানের ইতিহাস, এখনও রচিত হয় নাই, কর্ম-প্রবৃত্তির নির্মল ও প্রাণকর উৎস এখনও অদৃশ্য হইয়া আছে।

(৪) উদারতা।

বাঙ্গালী নির্ভীক ও উদার। দেহের বলে কুলায় না বলিয়া তাহার ভীরু অপবাদ রটিয়াছে। যেদিন দেহে বল আসিবে, সেদিন তাহার মনের বল আরও প্রকাশিত হইবে। ঐশ্বর্য, বলবানের

লক্ষণ, কাপুরুষের নহে। বাঙ্গালী নূতন পথে চলিতে ডরায় না। শক্তি-তন্ত্রের উপাসক হইয়া মহাশক্তিকে জগতের অম্বা জ্ঞান করে, অসুর-মর্দিনী সিংহবাহিনীকে কন্যারূপে অর্চনা করে। তাই তাহারই কণ্ঠে বন্দে মাতরম্ উচ্চারণ সহজ হইয়াছে। বাঙ্গালী গাঁয়ে গাঁয়ে পাড়ায় পাড়ায় দলাদলি করে; কিন্তু যে জাতিভেদের প্রচণ্ড উত্তাপে ভারতের অপর প্রদেশ শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, বঙ্গে সে উত্তাপ কত মৃদু তাহা দেশভ্রমণ না করিলে বুঝিতে পারা যায় না। উদার বলিয়া বাঙ্গালী গুণের আদর করে, এবং বিদেশী বিধর্মী হইলেও তাহাব অনুরক্ত হইয়া পড়ে।

(৫) বুদ্ধি।

বাঙ্গালী বুদ্ধিমান্। কিন্তু ইহাতে দোষও হইয়াছে, বুদ্ধির জোবে কেল্লা ফতে কবিবার প্রবৃত্তি দমন করিতে পারে না। অল্পদর্শী মনে করে, ইংরেজের সংসর্গে বহুকাল আছে বলিয়া বাঙ্গালীর বুদ্ধি খুলিয়াছে। কিন্তু খোলা বুদ্ধির লক্ষণ আর-এক প্রকার। আরও আগে হইতে মাদ্রাজী ইংরেজের সংসর্গে আসিয়াছে। বাঙ্গালী ইংরেজের বুদ্ধি পাইলে বড় হইয়া উঠিত। ইংরেজ বণিকের সংসর্গে অন্ততঃ অর্থে বড় হইতে পারিত। অনুকরণে দক্ষ হইলে রাজধানী কলিকাতায়, যেখানে বিদেশী বণিকের বৃহৎ অট্টালিকা তাহার বাণিজ্য ঘোষণা করিতেছে, কল-কারখানার চিমনীর ধূম সর্বদা নির্গত হইতেছে, এবং যেখানে শত শত বাঙ্গালী কাজ করিতেছে, সেখানে এত দেখিয়াও অনুকরণ কই? বাঙ্গালী সুখাভিলাষী; কিন্তু পৃথিবীর কোন্ জাতি নয়?

আর একটা কথা ভাবিবার আছে। বাঙ্গালী যদি বুদ্ধিমান্, তাহা হইলে তাহার সর্জনা (originality) তাহার উদ্ভাবনা (inventiveness) শক্তির পরিচয় কই? আমার বিশ্বাস, ইংরেজী পড়ার চাপে এই দুই শক্তি চাপা পড়িয়াছে। এ বিষয় পরে দেখাইতেছি। আরও কারণ আছে। বাঙ্গালীর বুদ্ধি বিশ্লেষণে উন্মুখ, সংশ্লেষণে বিমুখ। পরের যুক্তি খণ্ডন করিতে ধাবিত হয়, কিন্তু নিজের প্রতিজ্ঞা পূরণ করে না। নানা ব্যাপারে বাঙ্গালীর বিশ্লেষণী বুদ্ধির লক্ষণ পাওয়া যায়। বাঙ্গালী 'নেই-আঁকড়ো', ন্যায়শাস্ত্রের তর্ক আঁকড়াইয়া থাকে, কিছুতেই পরাজয় স্বীকার করে

না। এই কারণে চলিত কথায় বলে,—হিক্‌মতে চীন, হুজ্জুতে বাঙ্গালী। এই দোষেই বাঙ্গালী মজিয়াছে ও মজিতেছে। তাহার সহিত তর্কে আঁটিয়া উঠিতে পারা যায় না। সেই দোষেই বাঙ্গালী কাহারও আজ্ঞাধীন হইয়া কাজ করিতে পারে না, একত্র মিলিত হইতে পারে না; প্রত্যেকে মনে করে সে যেমন বুঝিয়াছে আর কেহ তেমন বোঝে না। বিশ্লেষণী বুদ্ধিতে সমগ্র দেখিতে দেয় না। এই হেতু বাঙ্গালী বৃহৎ কলা বা বাণিজ্য চালাইতে পারে না, কর্মের ব্যবস্থাপক (organiser) হইতে পারে না। ব্যাপারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় উত্তম বুঝিতে, করিতে, চালাইতে পারে; কিন্তু সেসব একত্র করিতে হইলে সে দিশাহারা হইয়া পড়ে। বাঙ্গালীর কুশাগ্রবুদ্ধির নিকট অভেদ্য কিছু নাই; কিন্তু স্থূলের নিকট কুশ পরাজিত হয়; আর সংসারে ভেদন অপেক্ষা যোজন অধিক লাগে। কারণ বিশ্লেষণী শক্তি ভঞ্জন-শক্তি; সংশ্লেষণী, নির্মাণ-শক্তি। আশ্চর্যের কথা, বঙ্গদেশে অদ্যাপি অর্থ-নীতিবিৎ জন্মগ্রহণ করেন নাই! কারণ পরিসংখ্যানের (statistics) পরে যে ব্যাপক দৃষ্টি চাই, তাহার অভাব ঘটে। অবশ্য খণ্ডদৃষ্টিই সহজ, কিন্তু অখণ্ডদৃষ্টি-লাভের নিমিত্ত একাগ্রতা ও অভ্যাস চাই। ইহা এক প্রকার যোগ (concentration of mind), এ চলচিত্ততার অসাধ্য।

ইংরেজী ভাষায় শিক্ষার দোষ।

ইংরেজী ভাষা দ্বারা বিদ্যা ও জ্ঞান লাভ করিতে গিয়া কি ক্ষতি হইতেছে, তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি। প্রত্যহ দেখিতেছি বলিয়া ইহার পরিমাণ পাইতেছি না।

(১) শক্তিহানি।

দেখি, বালক ও যুবক কাতারে কাতারে ইংরেজী ইস্কুল ও কলেজের পথে ব্যাকুলভাবে ছুটিয়াছে, বার-চৌদ্দ-ষোল-বর্ষব্যাপী তপস্যায় বসিয়া গিয়াছে। অর্থ ও কামের নিমিত্ত ব্যগ্রতা বুঝিতে পারি; কিন্তু যাহার অর্থফল অনিশ্চিত তাহার প্রতি এমন আসক্তি অন্য দেশে দুর্লভ। শুনিয়াছি, জর্মানী ও ইদানী জাপান ছাড়া ইহার তুলনা নাই। কিন্তু তাহাদের পথ সোজা; আমাদের পথ কাঁটার বেড়া দিয়া ঘেরা। পূর্বকালে সমস্থানীয় দুর্গ বেউড়-বাঁশের বেষ্টনে

দুর্ভেদ্য করা হইত। ধন্য আমাদের ধীরত্ব ও বীরত্ব; আমরা সুকুমার বালক ও বালিকাকেও নির্বিকার চিত্তে সেই কাঁটার বনে নিক্ষেপ করিতেছি। ধন্য তাহারা, যে, মরি-বাঁচি পণ করিয়া, সিদ্ধ তপস্বীর ন্যায়, শরীর দিয়া কাঁটার অগ্র ভগ্ন করিতেছে! দেশের মধ্যশ্রেণীর কি প্রভূত শক্তি এইরূপে অপব্যয়িত হইতেছে, তাহা দেখিয়াও দেখিতেছি না! চাই বিদ্যা, চাই জ্ঞান। কিন্তু এ কি বিড়ম্বনা, অন্যের ভাষা দিয়া তাহা লাভ করিতে হইবে? হয়ত ভবিষ্যৎ প্রত্নবেত্তা পুরাতন জীর্ণ নিবন্ধ ঘাঁটিয়া আবিষ্কার করিবেন, চাপ্‌কোন কাটিয়া কোট করিতে গিয়া তাহাদের পিতামহগণের মতি-ভ্রম ঘটিয়াছিল। কারণ, শুনিতে পাই, পাশ্চাত্য বিদ্যার প্রচার কামনায় ইংরেজী-শেখার বিধি হয় নাই।

ফলও প্রত্যক্ষ হইতেছে। মহাভারতে পঞ্চপাণ্ডব বহুকাল রাজ্যসুখ সম্ভোগের পর স্বর্গারোহণে কৃত-সঙ্কল্প হইলেন। দ্রৌপদীও সঙ্গে চলিলেন। কিন্তু হিমালয়ের বন্ধুর শৈলে, হিমানীর অসহ্য শীতে, কিছুদূর চড়িতে না চড়িতে পথে পতিত হইলেন, আর উঠিলেন না। আমাদের বালিকা বিদ্যালয়ে যে বালিকা চড়িতে যাইতেছে, তাহারও দশা দ্রৌপদীর তুল্য হইতেছে, শরীর ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। হিমালয়ে চড়িতে গিয়া কোমলদেহ কনিষ্ঠ পাণ্ডবদ্বয়ও যে গতায়ু হইবেন, তাহাতে আশ্চর্য কি? পরাক্রমশালী ভীমার্জুনেরও নিষ্কৃতি হয় নাই। মহাভারতে আছে, একা যুধিষ্ঠির, বোধ হয় সংযমগুণে, স্বশরীরে স্বর্গে পহুঁছিতে পারিয়াছিলেন। ইংরেজী ভাষায় শিক্ষা দ্বারা এইটি প্রথম ফল। বোধ হয় তিন জনের মধ্যে দুই জন অকাল-বৃদ্ধ হইয়া পড়িতেছে। কত জনের দৃষ্টি ক্ষীণ হইতেছে, ভাবিয়া দেখুন।

(২) জ্ঞানহানি।

দ্বিতীয় ফল আরও ভয়ানক। বিদ্যার পরিপাক দূরে থাক, ভক্ষিত বিদ্যা কণ্ঠদেশ ছাড়িয়া অন্ননালীতেও পড়িতেছে না। বিদ্যার ফল জ্ঞান। এমন জ্ঞান, যে জ্ঞানে দিবাকে দিন বলিয়া বিশ্বাস করি, এবং সেই অনুসারে কাজ করি। কানে শোনা কথা নহে, কেতাবী বয়দ্‌ নহে; এমন জ্ঞান যাহাতে সুঘ্রাণ সুদৃশ্য অন্নে বিষ আছে জানিলে ক্ষুধার্তও সে অন্ন বর্জন করে। যে জ্ঞান কর্মের প্রবর্তক

না হয়, সে জ্ঞান মিথ্যা। ইহার একমাত্র কারণ, বিদ্যার্থীকে দেশে না রাখিয়া বিদেশে বিচরণ করিতে পাঠাইতেছি, এক কাল্পনিক প্রাণীতে পরিণত করিতেছি। ফলে, সংসারের এক আঁচড়ে তাহার লক্ষজ্ঞান অদৃশ্য হইতেছে। ইংরেজী-শিক্ষিত জনকয়েক ছাড়া আর কেহ ইংরেজী লেখা-পড়ার ধার দিয়া যায় না, পনর-ষোল বৎসরের কঠোর তপস্যা সব ভুলিয়া যায়। কেহ বা বুভুক্ষিত তৃষিত জনের ন্যায় মাতৃস্তন্যের নিমিত্ত ব্যাকুল হয়, হয়ত পায় না; পাইলেও দেশী-বিলাতীর মিল করিতে পারে না।

(৩) আত্মহানি।

তৃতীয় ফল আরও ভয়ানক। দিবারাত্র বৎসরের পর বৎসর ইংরেজী ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে তাহার দেহে ফিরিঙ্গীর ভূত প্রবেশ করে। তাহার সত্তা লুপ্ত হয়; সে মনে করে, সে ফিরিঙ্গী। তাহার আচারে ও ব্যবহারে, তাহার চিন্তায়, নিজে আর থাকে না। যিনি ভূতে-পাওয়া রোগী দেখিয়াছেন, তিনি বুঝিবেন ইচ্ছাশক্তি কি অদম্য বলে ভূতের ইচ্ছাতে পরিণত হয়। ভাষাশিক্ষা মাত্রেই অন্যের অনুকরণ। ইহার আদ্যে মুখস্থ, মধ্যে মুখস্থ, অন্তে মুখস্থ। ভাষার শব্দ মুখস্থ, অর্থ মুখস্থ, রচনা মুখস্থ, রীতি মুখস্থ, এমন কি ভাবও মুখস্থ না করিলে সে ভাষা বুঝিতে ও লিখিতে পারা যায় না। অর্থাৎ নিজের করিয়া লইতে হইলে পরের দিকে তাকাইয়া থাকিতে হয়। অনুকরণে এই যে অভ্যাস হয়, তাহার ফল ভয়ানক। কোথায় বা সর্জনা, কোথায় বা উদ্ভাবনা, কোথায় বা স্বাধীনচিন্তা। চিত্তের দাসত্বের তুল্য শোচনীয় কি আছে? এই যে দশা হইয়াছে, তাহা হইতে মুক্তির উপায় কি?

উপায় চিন্তা। শিক্ষাপদ্ধতি

অর্থকরী শিক্ষা আবশ্যক।

যে দুঃসময় পড়িয়াছে, দেশের ধনের রক্ষা ও বৃদ্ধি ব্যতীত বাঁচিবার উপায় নাই। যদি লোকে উৎপন্ন বৃদ্ধি করিতে পারে, চাষে দশ মণের জায়গায় পনর মণ ফলাইতে পারে, এইরূপ অন্যান্য জীবিকায় পারে, তবেই রক্ষা। কিন্তু পারিবে কি?

দেশে ধনাগমের তিন উপায়—কর্ষণ, কলা, ক্রয়। আমরা বলিতেছি, চাষ কর, বৈজ্ঞানিক কৃষি প্রবর্তিত কর। ভূমি হইতে ধাতু কর্ষণ কর, আকর-কর্ম শেখ। বিশ্বকর্মশালা কর, কলা-বিদ্যালয় খোল, বাণিজ্য শেখাও।

চেষ্টাও কিছু কিছু হইতেছে। কয়েকটা জেলায় 'বৈজ্ঞানিক' কৃষির আদর্শ রাখা হইয়াছে। বঙ্গের সন্নিকটে কৃষি-বিদ্যালয় আছে; ঢাকাতে আর-একটা প্রতিষ্ঠিত হইতে যাইতেছে। শিবপুরে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ আছে; সেখানে আকরবিদ্যা ও যন্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। ঢাকাতেও আর-একটা বিদ্যালয় খুলিবার উদ্‌যোগ হইতেছে; কলিকাতায় কলাশিল্পশালা স্থাপনের কথা উঠিয়াছে। কলিকাতা বিদ্যামহাপীঠে বাণিজ্যবিদ্যা শিখাইবারও প্রস্তাব হইয়াছে। কাশিমবাজারের চিরবদান্য মহারাজা ইতিমধ্যে কলিকাতায় বিশ্বকর্মশালা (polytechnic) খুলিয়াছেন, বহরমপুরে তাঁহার কলেজে বাণিজ্যবিদ্যা আরম্ভ করিয়াছেন। স্যর রাসবিহারী ঘোষ মহাশয় মূর্তবিজ্ঞান (applied science) শিখাইবার নিমিত্ত প্রচুর অর্থদান করিয়াছেন। বেঙ্গল টেক্‌নিকাল ইনষ্টিটিউট অনেক দিন কলা শিক্ষা দিতেছেন। ইত্যাদি ইত্যাদি প্রয়াসে কিছু-না-কিছু ফল হইতেছে। কিন্তু কত জনের শিক্ষা হইতেছে, কত জনের বা হইবে? কত কালেই বা হইবে? এদিকে এক এক বৎসর যাইতেছে, মনে হইতেছে যেন এক এক যুগ চলিয়া যাইতেছে। উনানে হাঁড়ী চড়াইয়া ঘরে চাল নাই দেখিয়া বাজারে দৌড়াইলে যে হাস্যকর দশা ঘটে, সে দশায় আমরা পড়িয়াছি।

সমাজের নিম্নাঙ্গের শিক্ষা।

বিশেষ চিন্তা, উপরি-উক্ত প্রয়াস সমাজের উচ্চাঙ্গে, যে অঙ্গ সহজে চোখে পড়ে। যে নিম্নাঙ্গ অসাড় নির্জীবপ্রায় হইয়া রহিয়াছে, যাহাকে ভর করিয়া কোটি কোটি প্রজা দাঁড়াইয়া আছে, সে দিকে তেমন দৃষ্টি কই? যদি দশটা কৃষিবিদ্যালয়, পাঁচটা কলাবিদ্যালয় ও তিনটা বাণিজ্যবিদ্যালয় খুলিলে বঙ্গের সাড়ে চারি কোটি লোকের অন্নবস্ত্রের অভাব দূর হইবে বলিয়া বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে এতদিন টাকা কর্জ করিয়াও সে-সব খুলিতে পারা যাইত না কি? আমার বিশ্বাস, এ-সব গোষ্পদের পানিতে দেশের শুষ্ক ভূমি সিক্ত

হইবে না; ভূরি বর্ষণ চাই, জলের ছিটায় কর্ম নয়। শিক্ষা-নীতির আমূল সংস্কার চাই, গ্রামের কুটীর হইতে নগরের সৌধ সুরচিত শিক্ষা-জালে ঘেরা চাই। জালের সূত্র কেমন হইবে, "শিক্ষার বীজ" প্রসঙ্গে পূর্বে তাহার আভাস দিয়াছি।

কর্ষণ, বর্ষণ ও রক্ষণ।

শিক্ষার তারতম্যে জাতি উন্নত কিংবা অবনত হয়। এই কথা আমরা এত বুঝিয়াছি যে, দেশের রাষ্ট্রনীতির উল্লেখ করিতে গেলেই শিক্ষাবিস্তার করিতে বলি, আদ্য শিক্ষা অবশ্যক (compulsory) করিতে বলি, এবং বর্তমান দৈন্যের কারণ, শিক্ষার অল্পতা বিবেচনা করি। উত্তম কর্ষণ না পাইলে ভূমি উর্বরা হয় না; আমাদের চিত্তও হয় না। কিন্তু কেবল কর্ষণ হইলেই শস্য জন্মে না; এক দিকে যথাকালে যথাপরিমাণে বর্ষণ চাই, অন্য দিকে মূষিক ও খগ ও পতঙ্গ প্রভৃতি অভ্যাপাত হইতে রক্ষণ চাই। জমিন্ ত মানবের; কর্ষণও যেন হইল; কিন্তু বর্ষণ ও রক্ষণ যে ইন্দ্রের হাতে। তা ছাড়া, রোগের নিদান আবিষ্কার এক কথা, চিকিৎসা আর-এক কথা।

কর্ষণের পূর্বে বর্ষণ।

প্রচুর বর্ষণ চাই; কতক বৃষ্টি যে খালে ও নদীতে পড়িবে না, এমন নহে। সে আশঙ্কায় অর্থব্যয়ে কৃপণ হইলে যে-ভূমি কর্ষণের ও ফলনের যোগ্য তাহাও রসসিক্ত হইতে পারিবে না। দেশকে মানুষ করিবার নিমিত্ত যে ব্যয়, সেটা ত ব্যয় নহে, সেটা পুনরাবর্তক ধন। সেটাই ব্যয়, যেটার বৃদ্ধি হয় না। যে ব্যয়ে ধন বাড়ে, সে ব্যয় খাতার ডাইন্ পাশে দেখা গেলেও, বাঁয়ে ধরা কর্তব্য। মহাজন ধান কিনিয়া রাখিবার সময় মনে করে না, টাকা নষ্ট হইয়া গেল। সে ধন তাহার মূলধন, যাহা বাড়িয়া বাড়িয়া দ্বিগুণ ত্রিগুণ হইতে থাকে। প্রকৃত শিক্ষায় যে ব্যয়, যাহাতে দেশের আয়ু ও আরোগ্য, শক্তি ও সামর্থ্য বাড়িয়া চলে, তাহাই ত দেশের মূলধন। অতএব আপাতব্যয়ের কাল্পনিক তর্কে ভুলিলে চলিবে না। গোড়াপত্তন ভাল করিতে হইবে; তার পর অট্টালিকা উঠাও। জানি, আমরা বীজাঙ্কুর-ন্যায়ে পড়িয়াছি; বীজ নইলে অঙ্কুর জন্মে না, অঙ্কুর নইলে বীজ হয় না। কিন্তু বীজ বিনা অন্য উপায় কই? বীজ যোগাড় করিতেই হইবে;

নতুবা মানব-জমির আবাদ দূরে থাক, জমিটাই শূন্যে মিলাইয়া যাইবে।

শিক্ষা শব্দের অর্থ।

কিন্তু শিক্ষা শিক্ষা রব করিলেই, মানব-কৃষ্টি (culture) শতবার উচ্চারণ করিলেই, তাহার ক্রিয়াপরিপাটি বুঝিতে পারা যায় না। 'শিক্ষা' বলিতে ইংরেজী শিক্ষা বুঝাইতেছে; টোলের বৃদ্ধ অধ্যাপক ও গ্রামের প্রবীণ মুখ্য 'শিক্ষিত' নহেন, কারণ তাঁহারা ইংরেজী ভাষা শেখেন নাই। 'শিক্ষিত' শব্দের এই অপপ্রয়োগে বুঝি, আমরা বস্তুটা চিনিতে পারি নাই, একটা ছায়ার অনুসরণ করিতেছি। অথচ জানি, যার নাম শে-খা, তারই নাম শি-ক্ষা। ইহাও জানি, অভ্যাস দ্বারা অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ করিয়া, কর্ম শিখি। মানুষের এই যে শক্তি, যে শক্তি দ্বারা কর্ম অভ্যাস হইয়া যায়, দেহের বৃত্তিবিশেষে পরিণত হয়, যে কর্ম ইচ্ছাপূর্বক যত্নপূর্বক করিতে করিতে অনিচ্ছাকৃত অযত্নকৃত হইয়া পড়ে, সে শক্তি-হেতু মানুষ পশুকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে।

কোনও কর্ম করিতে শিখিলেই যে, সে কর্ম জা-না হয়, এমন নহে। পাচক ব্যঞ্জন রাঁধিতে শিখিয়াছে, কি মাত্রায় কি উপকরণ-যোগে কোন ব্যঞ্জন স্বাদু হয়, তাহা জানিয়াছে, ভূয়োদর্শন দ্বারা জানিয়াছে: তাহার পাককর্ম শিক্ষা হইয়াছে। কিন্তু সে জানে না, সে সে উপকরণ একত্র পাক করিলে, সে সে মাত্রায় যোগ করিলে, ব্যঞ্জন কেন সুস্বাদু হয়। এই জ্ঞানের অভাবে, তাহাকে প্রত্যেক ব্যঞ্জনের যুক্তি (recipe) পৃথক্ মনে রাখিতে হয়। তাহার জ্ঞান বিক্ষিপ্ত। সে পাককর্ম জানে, জানেও না। সে পাককর্মের সূত্র পায় নাই। পূর্বকালে জ্ঞানের সূত্রকে বিদ্যা (science) বলা হইত। ইদানী আমরা বিজ্ঞান বলিতেছি। কারণ, বিজ্ঞানে কলাকর্মও কিছু শিখিতে হয়।

অতএব দেখিতেছি, প্রথমে শিক্ষার অর্থাৎ কর্ম-অভ্যাসের প্রয়োজন। ইহার নিমিত্ত, মস্তিষ্কের যত না হউক, চোখ-কানের হাত-পায়ের নিয়ন্ত্রিত কর্ম আবশ্যক। দেশের যাহারা কারু (artisan), যাহারা কৃষক, যাহারা বণিক্, তাহারা স্ব স্ব বৃত্তি এইভাবে পিতা বা খুড়া বা মামা প্রভৃতির নিকট শেখে। পাঠশালায় পাঠ পড়ে, ভালই; পাঠ শেখা গৌণ, কর্ম শেখাই মুখ্য; কারণ, জীবিকার তুল্য চিন্তনীয় আর কিছুই নাই। আগে অন্ন, তার পর বস্ত্র, তার পর

সুখভোগ ও আনন্দ। যে কারুর ভূয়োদর্শন হইয়াছে এবং যাহার মনন-শক্তি বিকশিত হইয়াছে, সে কলা-কর্ম জানিয়াছে, সে কলাবান্ হইয়াছে। পুনঃ পুনঃ দেখিয়া, করিয়া দেখিয়া, ভূয়োদর্শন হয়। ইহার নিমিত্ত তাহার প্রবৃত্তি থাকা চাই, এবং তাহার মনন-শক্তিও থাকা চাই। দর্শনের ও মননের শক্তি কতকটা স্বভাব বা জন্ম হইতে প্রাপ্ত, কিছু শিক্ষাব দ্বারা অর্জিত। কতখানি জন্মগত, কতখানি শিক্ষা-সাপেক্ষ, তাহা মাপিবার উপায় নাই। যেমন করিযা হউক, যাহাদের আছে বা জন্মিয়াছে, তাহারা পরে শিল্পী হইয়া উঠে। শিল্পী সর্বত্র দুর্লভ। কিন্তু ইহারই প্রসাদে কলাবানের কলাবত্তা। কলাবানের শিষ্য কারু। কারুর অধীনে কার্মিকেরা (worker, labour) কাজ করে।

শঙ্করাচার্য বি-দ্যা শব্দের অর্থভেদ বুঝাইয়া দিয়াছেন। বিদ্যা সম্যক্ বাচিক কর্ম। অর্থাৎ বাঙ্‌ময়ী। এই হেতু মূক ব্যক্তি বিদ্বান হইতে পারে না, কিন্তু স্বচ্ছন্দে কলাবান্ হইতে পাবে। বিদ্যা, সমস্তই মুখস্থ বিদ্যা হইতে হইবে, এমন কথা নাই। বিজ্ঞানে ভূয়োদর্শনলব্ধ সূত্র থাকে। যদি ছাত্র স্বয়ং ভূযোদর্শন না করিয়া অন্যের ভূয়োদর্শনলব্ধ জ্ঞানে তৃপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহার স্বয়ং-জ্ঞান জন্মে না। সে বিদ্যা অর্জন করিয়াছে, পরের বাচনিক; কিন্তু বিজ্ঞান পায় নাই। এইরূপ ভূয়োদর্শনের ন্যূনাধিক্যে পঞ্চভূতবিষয়ক জ্ঞান, ভৌতিক বিদ্যা কিংবা ভৌতিক বিজ্ঞান বলা যাইতে পারে। বিদ্যা হউক, বিজ্ঞান হউক, দুই দিক্ হইতে শেখা যাইতে পারে। প্রযোগ প্রধান লক্ষ্য হইলে তাহা মূর্ত বিজ্ঞান (applied science) আর জ্ঞান প্রধান হইলে অমূর্ত বিজ্ঞান বলা হয়। অতএব দেখা যাইতেছে, জ্ঞানের যেমন অন্ত নাই, কলারও তেমন নাই, বিদ্যাবও নাই। আরও দেখা যাইতেছে, এক দিকে কলা, অন্য দিকে বিদ্যা; মাঝে মূর্ত বিদ্যা বা মূর্ত বিজ্ঞান। বিজ্ঞানশালার মূর্ত বিজ্ঞান কলাশালায মূর্তিমান হইলে অর্থ আকর্ষণ করে। মূর্ত বিজ্ঞান শিখিলেই অর্থ উপার্জন করিতে পারা যায় না; কারণ, কর্মে অভ্যাস ব্যতীত কোনও কর্ম সফল হয় না। তথাপি দেখা যাইতেছে, বিদ্যা দ্বারা বাচিক কর্মের যোগ্যতা হইতে পারে, যেমন মাষ্টারি ও ওকালতি; অমূর্ত বিজ্ঞান দ্বারা মাষ্টারি ব্যতীত অন্য কোনও কর্মের যোগ্যতা হয় না। আমরা এই বিজ্ঞান শিখিতেছি।

দেশে জ্ঞানপ্রচার।

এখন একবার দেশের শিক্ষার দিকে তাকাই। দেখিতেছি, দেশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত শিক্ষা চলিতেছে; এবং লোকে শিক্ষিত হইতেছে বলিয়াই বিপুল মানবপরিবারের জীবনপ্রবাহ চলিতেছে। কিন্তু আমরা ইদানী এই শিক্ষা অগ্রাহ্য করিয়া পাঠশালায়, কি বিদ্যালয়ে, কি ইস্কুলে ও কলেজে শিক্ষাই শিক্ষা মনে করিতেছি। আমার বিবেচনায়, এই মস্ত ভুলের দরুণ আমরা এতদিন কিছু করিতে পারি নাই। পাঠশালায় বসিবার, কিংবা বিদ্যালয়ে ঢুকিবার বয়স যাহাদের উত্তীর্ণ হইয়াছে, সে-সব অসংখ্য নর-নারী একেবারে বাদ দিয়া তাহাদের শিশুর দিকে তাকাইয়া আছি। ইহারা 'মানুষ' হইবে, শিক্ষিত হইবে, তার পর দেশ জাগিবে! কিন্তু এ যে বিশ বৎসরের কথা! এই বিশ বৎসর নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকিলে পরে কত বিশ বৎসর মৃতবৎ কাটাইতে হইবে, তাহা দেখিতেছি না। মনে করিতেছি, যে কয়েকজন ইংরেজী-শিক্ষিত হইতেছেন, তাহাঁরাই মাথা দিয়া দেশটা ধরিয়া রাখিতে পারিবেন। দেশ দেশ করিয়া বেড়াই, কিন্তু দুর্ভিক্ষের সময় সে দেশ এক-একবার দেখা দিয়া অদৃশ্য হয়। দেশের বুভুক্ষিত দেহের মনের ও আত্মার ভোজ্য কই? লেখা-পড়া-গণা না শিখাইয়াও জ্ঞানের প্রবাহ চালাইতে পারা যায়, যে প্রবাহ গ্রামের পাড়ায় পাড়ায় প্রসারিত হইয়া বাল-বৃদ্ধ, নর-নারী, ব্রাহ্মণ-শূদ্র, সকলের দ্বারে দ্বারে অমৃতের কণিকা বিতরণ করিতে পারিত। কৃষি ও শিল্পের 'প্রদর্শনী' নয়, 'নৈশ বিদ্যালয়'ও নয়; চাই জ্ঞানের আলো। একটু আলো দেখাও, একটু কথা কও, একটু হাত ধর; লোকের ধৈর্য আসুক; তাহারা ভাল মন্দ বুঝুক; তাহারা যে মানুষ, এই বোধ জন্মুক।

নিজ-জ্ঞান ও দেশ-জ্ঞান

কিন্তু কিসের জ্ঞান? জ্ঞানের বিষয় দুইটি। আমি ভোক্তা; এবং আমি ছাড়া আর যাহা কিছু আছে, তাহা আমার ভোগ্য। ভোক্তা ও ভোগ্য, জ্ঞানের দুই বিষয়। দুই বটে, কিন্তু ভোগ্য ছাড়িয়া ভোক্তা নাই, ভোক্তা ছাড়িয়া ভোগ্যও নাই। আমি বাঁচিয়া থাকিতে চাই,- আমি কোনও দেশে কোনও কালে বাঁচিয়া থাকিতে চাই। আমি-র জ্ঞান নিজ-জ্ঞান। দেশ-বৃত্তে দেশ-জ্ঞান, এবং ইতিবৃত্তে কাল-জ্ঞান বর্ণিত হয়। এই দুই পরস্পর জড়িত। এই হেতু সংক্ষেপে

এক নাম, 'দেশ-জ্ঞান' বলিতে পারা যায়। দেহ, মন, ও আত্মা, এই তিন লইয়া আমি ভোক্তা। এই তিনেরই জ্ঞান চাই, নতুবা আমার বাঁচা অসম্ভব। এই তিনের জ্ঞান কিছুমাত্র নাই, এমন মানুষ নাই। সকলেরই কিছু কিছু আছে বলিয়া প্রাণধারণ করিতে পারিতেছে। তেমনই, দেশ-জ্ঞান কিছুমাত্র নাই, এমন মানুষ নাই। কিছু কিছু আছে বলিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারিতেছে। এই জ্ঞানের সহিত শিক্ষাও কিছু কিছু পাইয়াছে। নিজ-জ্ঞানে জানি, অন্ন বিনা প্রাণরক্ষা হয় না; দেশ-জ্ঞানে জানি, এই দেশে এই কালে অন্ন উৎপন্ন হইতে পারে। কিন্তু এইরূপ জ্ঞান, কেবল জ্ঞান। যাহাকে আমরা অকর্মণ্য বলি, সে যে জানে না, এমন নহে; সে করিতে পারে না বলিয়াই অকর্মণ্য।

শিক্ষার ধারা কি হইবে?

আমরা মনে করি, লিখিতে-পড়িতে-গণিতে শেখার নাম জ্ঞানলাভ করা; আর জ্ঞানলাভের নিমিত্ত এই ত্রিকর্ম শেখা চাই। যিনি বলেন, আমাদের দেশের লোকের শিক্ষা নাই, তিনি এই ত্রিকর্মের শিক্ষা মনে করেন। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। দেশ বিদ্যাহীন, দেশ আধুনিক কলাজ্ঞান-হীন, দেশ পশ্চিমদেশের অর্থকরী শিক্ষা-হীন। আমি বলি, যাহা আছে, তাহা ধরিয়া নাই-র দিকে হাত বাড়াইতে হইবে। নাই-র দিকে একা-এক হাত বাড়াইলে ফলপ্রাপ্তি না হইতে পারে। গাঁয়ে গাঁয়ে পাঠশালা বসাইয়া মনে করুন, দেশের ছেলে-মেয়েকে ত্রিকর্ম শেখাইয়া ছাড়িয়া দেওয়া গেল। সে বিদ্যা টিঁকিবে কি? টেঁকে, যদি রসের যোগান্ বরাবর পাইতে থাকে। এই রস এক-রকমের নয়, তাই ত দেশের শিক্ষা ব্যাপার, একা একা তোমার আমার কর্ম নয়। যদি 'রাজা' অর্থে প্রজার বিক্ষিপ্ত ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়ার আধার হয়, সে রাজাই আবশ্যক রসের যোগান্ দিতে পারেন। ভবের হাট এত বড় যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ব্যাপার চলিতেছে। মানুষই ব্যাপারী। যাহার যে ব্যাপার, তাহার খোজ লইয়া ঠাঁই করিয়া দেওয়া যেমন-তেমন কর্ম নয়। ব্যাপার অগণ্য; শিক্ষার ধারাও অগণ্য।

আদ্যশিক্ষায় অগণ্য ধারা ধরিতে হয় না; ইহা অল্প সুবিধা নহে। এই শিক্ষা বিনা-বেতনে শিক্ষা, মাতাপিতার ইচ্ছাধীন নয়, অবশ্যক। অতএব রাজাকে মাতাপিতা হইতে হইবে। ইহার রূপ কি

হইবে, সীমা কোথায় টানা যাইবে? সাধারণ মত এই বোধ হয়, বাঙ্গালা ভাষা লিখিতে ও পড়িতে, এবং সোজা সোজা অঙ্ক কষিতে পারিলেই আদ্যশিক্ষা সমাপ্ত। বোধ হয়, শিশুর নয় দশ বছর বয়সেই এই শিক্ষার ইতি হইবে। আরও কল্পনা করিতেছি, গাঁয়ে গাঁয়ে পাঠশালা বসিবে, হয়ত গাঁয়ে গাঁয়ে বাড়ী তৈয়ার হইবে, এবং পাঁচ ছয় বছরের শিশুকে সেই কারায় চারি পাঁচ ঘণ্টা বসাইয়া লেখা-পড়া-গণা অভ্যাস করাইয়া করাইয়া তাহার শৈশব দুঃখময় করিয়া তোলা হইবে। আমি জানি, বহুর বিবেচনায়, এই ক্রমে লেখা পড়া শিখিয়া দেশে বড় বড় লোকের উদয় হইয়াছে। এই যুক্তি নানা সময়ে নানা স্থানে শুনিয়া থাকি। যখনই কোনও ক্রমের কোনও ব্যবস্থার দোষ দেখাইবে, তখনই বিরুদ্ধ দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে। এই-সব তার্কিকের চিত্ত কখনও অপ্রসন্ন হয় না: কারণ, ইহাঁরা 'আশঙ্কা' বলিয়া কিছু জানেন না, 'সম্ভাবনা' বলিয়া কিছু জানেন না। ইহাঁরা দেখেন না, যদি এক দুই তিন চারি জনের হিত হইযাছে, পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ জনের হিত হয় নাই। যদি গুরুমশায়ের ঠেঙ্গা খাইয়া পাটোয়ারী দুই জন হইযাছে, দশ জন পাটা-চুবি শিখিয়াছে, আর দশ জন যেমন গাধা তেমনই গাধা বহিয়া গিয়াছে। পাঠশালায় ইস্কুলে কলেজেও এমন শিক্ষক দেখিয়াছি, যিনি ছেলেদের সঙ্গে মন খুলিয়া কথা কহিতে পারেন না, হাসিতে পারেন না। এই কঠোর শাসনে তাহাঁরাই অবশ্য অধিক শাস্তি পান এবং বৃত্তির ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া নিরুৎসাহে অকাল জরায় দিনপাত করেন।

শিক্ষাকাল-বিভাগ

আমি যে শিক্ষার প্রস্তাব করিতেছি, সে শিক্ষা ইহাঁদের দ্বারা চলিবে না। কি রকম শিক্ষক চাই, বিশেষতঃ আদ্যশিক্ষায়, তাহা পরে বলিতেছি। প্রথমে শিক্ষাকাল ভাগ করি। একুশ বৎসর বয়স পর্যন্ত এই কাল ধরা যাইতে পারে। তার পর সংসারধর্ম-পালন আছে। আরম্ভ, পাঁচ উত্তীর্ণ হইলে। অতএব সমগ্র শিক্ষাকাল ষোল বৎসর। ইহাকে চারি ভাগে (stages) ভাগ করিলে প্রথম সাত বৎসরে আদ্য-শিক্ষা, দ্বিতীয় তিন বৎসরে মধ্যশিক্ষা, তৃতীয় তিন বৎসরে অন্ত্যশিক্ষা এবং শেষ তিন বৎসরে অধিশিক্ষা,—এই এই নাম দেওয়া যাইতে পারে। অধিশিক্ষা, যেমন বিদ্যা-মহাপীঠে শিক্ষা, সকলের ভাগ্যে ঘটিবে না,

অন্ত্যশিক্ষাও অনেকের ভাগ্যে ঘটিবে না। তথাপি ইহাকেই লক্ষ্য করিতে হইবে। আঠার বৎসর বয়সে এই শিক্ষার শেষ। মধ্যশিক্ষা, পনর বছর বয়সে শেষ হইবে। আদ্য প্রথম চারি বৎসর ও দ্বিতীয় তিন বৎসর লইয়া যে সাত বৎসরের শিক্ষা, সেই শিক্ষা দেশময় ব্যাপ্ত হইতে দেখিতে চাই। চারি বৎসর ছেলেমেয়েকে দুই-চারিখানা বই পড়াইয়া তাড়াইয়া দিলে আদ্যশিক্ষা ব্যর্থ হইবে। আদ্যশিক্ষা অবশ্য শিক্ষা-প্রধান হইবে; মধ্যশিক্ষায় তদুপরি কিঞ্চিৎ বিদ্যার যোগ ঘটিবে। অন্ত্যশিক্ষায় কিছু পূর্ণতা পাইবে। আদ্য-শিক্ষিত বালক ইংরেজী ইস্কুলে যাইতে পারিবে এবং সেখান হইতে ক্রমে ক্রমে বিদ্যা-মহাপীঠে প্রবেশ করিতে পারিবে। বিদ্যা না চাহিলে সে অন্ত্যশিক্ষাশালায় যাইবে এবং লক্ষ্মীর উপাসক হইয়াও সরস্বতীকে সমাদর করিতে শিখিবে। শিক্ষা বহুমুখী চাই, বিদ্যাও বহুমুখী চাই। নতুবা সমাজ-কলের চাকায় চাকায় ঘষা-ঘষিতে শক্তির অপচয় হয়, শিক্ষারও উপযোগিতা হ্রাস পায়।

কেহ মনে করিবেন না, আমি লেখা-পড়া-গণা শেখার নিন্দা করিতেছি। এত বড় একটা কৌশল, যাহার আবিষ্কারে মানুষ এত বড় হইয়াছে, পশুকে দূরে ফেলিয়া আকাশে উড্ডীন হইতেছে, জ্ঞানের বর্তিকায় যুগ-যুগান্তরের অন্ধকার ভেদ করিতেছে, তাহার নিন্দা কে কোথায় করিতে পারে? তবে স্বভাব নাকি ম'লেও যায় না; তাই লেখা-পড়া হাজার শিখিয়াও কৃতবিদ্য ও শাস্ত্রজ্ঞ হইয়াও এক এক মানুষ দানব হইয়া থাকিতেছে।

আদ্যশিক্ষা। শিশুশিক্ষা।

বক্তব্য একটু বিস্তার করিতেছি। শিশু অল্পে অল্পে দেখিয়া শুনিয়া, নাড়িয়া চাড়িয়া, ভাঙ্গিয়া জুড়িয়া, বিজ্ঞানশালায় বিজ্ঞানার্থী যেমন পরীক্ষা করে তেমন পরীক্ষা করিয়া, দ্রব্যের গুণ আবিষ্কার করে, পুনঃ পুনঃ দেখিয়া ভূয়োদর্শন লাভ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে কার্য-কারণ-সম্বন্ধ নির্ণয় করে। পদে পদে ভুল করে, পদে পদে ঠকে। ভুল করুক, কে না ভুল করে? কিন্তু এই ভুলেই যে শিক্ষা হয়, সেই পাকা শিক্ষা। কথা শুনিয়া, বই পড়িয়া সে শিক্ষা অসম্ভব। চারি পাঁচ ছয় বছরের শিশুকে এই শিক্ষা দিতে চাই; তাহাকে লইয়া এখানে-সেখানে বেড়াইতে চাই; সে দেখুক, শুনুক, ভূয়োদর্শন

লাভ করুক। তাহাকে বিজ্ঞানার্থী পরীক্ষক করিতে চাই। তাহার নিকটে নানাবিধ খেলার সামগ্রী রাখিব; সে খেলিবে, সে সবের ক্রিয়া ও গুণ দেখিতে থাকিবে। শিক্ষাশালার গুরুমশায় প্রায় সাক্ষীগোপাল হইয়া থাকিবেন। "প্রায়" বলিতেছি; কারণ, তিনি দৃশ্যতঃ সাক্ষী হইলেও মূলে যন্ত্রী। শিশু তাঁহার যন্ত্রস্বরূপ হইবে।

পাঠশালা ও শিক্ষাশালা।

কেহ কেহ বলিবেন, ইহা আর নূতন কথা কি। আমি নূতন কিছু করিতে বা বলিতে বসি নাই। যিনি শিশুচরিত লক্ষ্য করিয়াছেন, তিনিই শিশু-শিক্ষাও জানিয়াছেন। দুঃখের কথা এই, যাহা জানা তাহা করা হইতেছে না। বিদ্যাকরী শিক্ষার নিমিত্ত পাঠশালা আছে; জ্ঞানকরী শিক্ষার নিমিত্ত শিক্ষাশালা চাই। ইস্কুল ও কলেজের শিক্ষক লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, গ্রামের ছেলেরা যাহারা গ্রামে পালিত হইয়াছে এবং গ্রামে ছুটির সময় কাটায়, তাহাদের ভূয়োদর্শন যত, নগরের ছেলেদের তত নয়। গ্রামের ছেলের উপস্থিত-বুদ্ধি যত, নগরের ছেলের তত নয়। এই প্রভেদের কারণ স্পষ্ট। বিনা যত্নে, বিনা চেষ্টায়, যাহা অজ্ঞাতভাবে ঘটিতেছে, তাহা জ্ঞাতসারে করাইতে হইবে। গ্রামে কৃষি, কলা, ব্যবসায়, বাণিজ্য, পূজা, পার্বণ, যাত্রা, উৎসব যাহা কিছু হইয়া থাকে, শিশুকে সব দেখাইতে হইবে, এবং সুবিধা হইলে তাহাকে দিয়া করাইতে হইবে। গ্রামের পুকুর, নদী, খাল, বিল, মাঠ, বাগান, পথঘাট, গাছপালা, পশুপক্ষী প্রভৃতি তাহার কিছুই অচেনা থাকিবে না। ডাক শুনিয়া পাখীর নাম, গন্ধ শুঁকিয়া ফুলের নাম, চিত্র দেখিয়া তালগাছ কি খেজুরগাছ বলিতে পারিবে। হাটে যাইবে, সুবিধা হইলে সে নিজে কিছু কিছু কিনিবে, কখনও বা কিছু বেচিবে। শোনা গেল, পুকুরে মাছ ধরা হইতেছে, গুরুমশায় ছেলেদিকে লইয়া পুকুর-পাড়ে শিক্ষাশালা করিলেন। অমুকের বাড়ীতে বিবাহ, ছেলে সঙ্গে গুরুমশায় সে বাড়ীতে নিশ্চয় উপস্থিত। এইরূপ, শিক্ষার অগণ্য ক্ষেত্র আছে। বর্তমানকালের শিক্ষা বাড়ীর কুঠরীতে শিক্ষা, সংসার-বিরাগীর শিক্ষা। সেখানে বই-কাগজ-কলম লইয়া শিক্ষা। কদাচিৎ বাগান থাকে; কিন্তু একে ছোট, তাহাও ছেলেদের নয়, যেখানে তাহারা যা ইচ্ছা তা রুইতে বসাইতে পারে। এত কৃত্রিম আয়োজনের মাঝে থাকিয়া শিক্ষা-লোলুপ

শিশুর মন কৃত্রিম পরিখায় ঘুরিয়া বেড়ায়। হায়, সে কিছুই দেখিল না, কিছুই শুনিল না, কিছুই করিল না; কেবল লেখা-পড়া-গণা শিখিল! এই ক্রমে সে বিদ্বান হইতে পারে, কিন্তু কাজের লোক হইতে পারে না।

দেশ-ভ্রমণ ব্যতীত দেশজ্ঞান জন্মে না। শিশুর দেশ, তাহার গ্রাম। নয় বৎসর বয়সে আদ্য প্রথম শিক্ষা শেষ হইবার কথা। চারি বৎসরে যদি শিশু তাহার গ্রামখানির জ্ঞান সঞ্চয় করিতে পারে, আমি মনে করি, যথেষ্ট শিখিয়াছে। তাহার বিকাশোন্মুখ চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক্, বাগিন্দ্রিয় ও হস্তপদ স্ব স্ব কর্মে অভ্যস্ত হইয়াছে, তাহার ইচ্ছার আয়ত্ত হইয়াছে এবং যন্ত্রবৎ চালিত হইবার যোগ্য হইয়াছে। চিত্র লিখিতে শিখিয়াছে, ইচ্ছা করিলে গ্রামের রাস্তাগুলি লিখিয়া দিতে পারে। এমন চেঁচাইতে পারে যে, বহু দূর হইতে শুনিতে পাওয়া যায়। চলিয়া চলিয়া, প্রায়ই শুধু পায়ে, শুধু গায়ে, শুধু মাথায়, তাহার দেহ কষ্টসহ হইয়াছে। গাছে চড়িয়া মনে সাহস জন্মিয়াছে, জলে ঝাঁপাইয়া আনন্দ বুঝিয়াছে। এমন 'দুষ্টু' হইয়াছে যে, মা ছেলের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারে না। একদিন ছেলের মা আসিয়া বলিল,

'বাবা, ঝণ্টিকে ইস্কুলে ভর্তি করে' দেও।'

'কেন, কি হয়েছে?'

'ভারি দুষ্টু হয়েছে, একটি কথা শোনে না।'

'এই কারণে জেলখানায় পাঠাবে?'

'এই দুপর বেলা, কি রোদ! একটু শোবে না, কামরাঙ্গা গাছের তলায় ছুটাছুটি করে, গাছে ঢিল ছোঁড়ে, গাছে চ'ড়্‌তে যায়।'

'বোধ হয় কামরাঙ্গা খাবার ইচ্ছা। ওকে কামরাঙ্গা দিলেই হয়।'

'কামরাঙ্গা খেলে পেট কাম্‌ড়ায়। এখন তাও পাকে নাই।'

'শুধু কামরাঙ্গা খাবার ইচ্ছা নয়, গাছে চড়্‌বারও ইচ্ছা। কামরাঙ্গা গাছে চ'ড়্‌তে পারবে না। পাঁচীরের ধারে যে পেয়ারা গাছ আছে, তাতে চ'ড়্‌তে ব'লো।'

'তা হ'লে আর রক্ষা থাক্‌বে? গাছে দিনরাত ব'সে থাক্‌বে, আর কাঁচা পেয়ারা খাবে।'

'কিছুই ক'র্তে দিবে না? কেমন ক'রে বাঁচ্‌বে, বাড়্‌বে?'

আর একদিন কন্যা আসিয়া বলিল, 'বাবা, ঝণ্টিকে ইস্কুলে না দিলে আর রাখ্‌তে পারা যাবে না।'

'কেন, কি করেছে?'

'দুপর বেলা চৌকীর উপর টুল রেখে তাকের ওষুধের বোতল খুলে ওষুধ ঢেলে সব একাকার করেছে। বিষ ওষুধ খেয়েছে কি না, জানি না।'

'বোতলে কি আছে, দেখাও নাই বুঝি?'

'ওষুধ আর দেখাব কি?'

ইত্যাদি। এই রূপ, দুষ্টু দৌহিত্রের বিরুদ্ধে মাতামহকে বহু অভিযোগ শুনিতে হইত। শিশুকে শিষ্ট শান্ত করিতে করিতে দেশটাই শান্ত হইয়া গিয়াছে! শান্ত ছেলে পণ্ডিত হইতে পারে, কিন্তু "কাজের লোক" হইতে পারে না।

কিন্তু ছেলেরা লেখাপড়া শিখিবে না? নিশ্চয়ই শিখিবে। চারি বৎসর, হারাহারি প্রত্যহ দুই ঘণ্টা শিখিলে যথেষ্ট। সোজা সোজা বই পড়িতে ও বুঝিতে, সোজা সোজা কথা জুড়িয়া বলিতে, স্পষ্টাক্ষরে লিখিতে ও সোজা সোজা অঙ্ক কষিতে শিখিতে প্রত্যহ দুই ঘণ্টা পর্যাপ্ত। চাণক্য-শ্লোক বোঝে না, কিন্তু শুদ্ধ ও স্পষ্ট করিয়া আওড়াইতে পারিবে; নামতা রচিতে পারে না, কিন্তু অনর্গল বলিয়া যাইতে পারিবে। শিশুকে বিদ্বান্ করিবার প্রয়াসে তাহাকে ভাষা শেখানা হয় না; 'শেখানা' হয়, সাহিত্য; (কেহ কেহ নাম রাখিয়াছেন শিশু-সাহিত্য, যদিও বুড়া শিশু)। তেমনই যে সংখ্যাজ্ঞানে বড় বড় গৃহস্থেরও সংসারযাত্রা নির্বাহ হয়, তাহা না শিখাইয়া মনঃকল্পিত ঘড়ীর কাঁটার দৌড়, লঘিষ্ঠ গরিষ্ঠ গুণনীয়ক প্রভৃতি গরিষ্ঠ কুপথ্য দ্বারা শিশুর মস্তক পূর্ণ করা হয়। উদর পূর্ণ হইলে তাহা প্রবাহিত হইয়া যাইত, কিন্তু মস্তিষ্ক হইতে প্রবাহের পথ নাই।

আচার-ব্যবহার-শিক্ষা।

লেখা-পড়া-গণা অপেক্ষাও প্রয়োজনীয় শিক্ষা আছে। সেটা আচার ও ব্যবহার-শিক্ষা। যে আচার নিত্যাচার নামে খ্যাত, তাহা শিখিতে হয়। তাহা পূর্বজন্মের স্মৃতি (instinct)-বশে বুভুক্ষা ও পিপাসার তুল্য আপনি আসে না। ইহার অপর নাম দিন-চর্যা। ইহা কেবল স্বাস্থ্যরক্ষা বা শরীরপালন নহে; মনের পালন ও দমনও ইহার

লক্ষ্য। দেশাচারও উপেক্ষার বিষয় নহে। বড় হইয়া, জ্ঞানবান্ হইয়া, কেহ দেশাচার কিংবা কুলাচার মানিবে কি ভাঙিবে, তাহার আশঙ্কা লইয়া শিশুশিক্ষা চলিতে পারে না। শৈশবকাল শিক্ষার কাল, ক্রিয়া-অভ্যাসের কাল। কেমন করিয়া চলিতে হয়, দাঁড়াইতে হয়, কাপড় পরিতে হয়, দাঁত মাজিতে হয়, খাইতে বসিতে শুইতে হয়,—এ সবের শিক্ষা বাড়ীর উপর বরাত দিলে চলিবে না। তেমনই, কেমন করিয়া কখন ইষ্টদেবের পূজা করিতে হয়, তাহারও অভ্যাস করাইতে হইবে। বাড়ীর ভরসা নাই বলিয়াই শিশুশিক্ষা এত কঠিন হইয়াছে। আচার সমাজগত; আচারে কেহ হিন্দু, কেহ মুসলমান, কেহ খ্রীষ্টান; কেহ বঙ্গের হিন্দু, কেহ পঞ্জাবের, ইত্যাদি। আচারতত্ত্বে না গিয়া বলা যাইতে পারে, যাহার যে সমাজ (বা ধর্ম), তাহার পক্ষে সে সমাজের (বা ধর্মের) আচার শ্রেষ্ঠ। ব্যবহারও দ্বিবিধ। নিত্য ব্যবহার, অর্থাৎ শিষ্ট ও সাধু ব্যবহার, সকল সমাজের প্রায় এক। কিন্তু দেশ-ব্যবহারও আছে। গুরুজনের নিকটে কি ভাবে দাঁড়াইতে হয়, তাহাঁদের সহিত কি ভাবে কথা কহিতে হয়, কি ভাবে তাহাঁদের পূজা করিতে হয়, ইত্যাদি না শিখাইলে শিশু অবিনীত হইয়া বড় হইবে। শিক্ষার দ্বারা বি-ন-য় অভ্যাস হয়; বেতের ভয় কি জরিমানার ভয়, এমন কি পুরস্কারের উৎকোচ দ্বারা শিক্ষা অর্থাৎ অভ্যাস জন্মিতে পারে না। নিষেধ নহে, বিধি চাই। নিষেধের সঙ্গে বিধি প্রচ্ছন্ন থাকে বটে, কিন্তু এত ঘুরাইয়া, উল্‌টা বুঝাইয়া, বিনয় শিক্ষা শিশুর পক্ষে সহজ হয় না। সকল শিশু একত্র হইয়া এই নয়াভ্যাস করিতে আমোদ বোধ করিবে।

আদ্যশিক্ষক।

শিশু-রূপ উপাদান লইয়া তাহাকে যন্ত্রবৎ করিয়া তোলার নাম শিশু-শিক্ষা। দেশে সে যন্ত্রী কই, তেমন গুরু কই? একজন দুইজন নহে, যত গ্রাম তত গুরু চাই। এ দিকে, আজ্ঞামাত্র গুরু জন্মে না। কিন্তু কোনও বুদ্ধিমান্ বলে কি, যেহেতু দেশে ইট নাই, অতএব শূন্য মাঠে পড়িয়া থাকা কর্তব্য? মাটির কাঁথে খড়ের চালাও হইতে পারে। প্রথম প্রথম কাঁচি ঘরই তুলিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে গুরু-শিক্ষার আয়োজন চলিতে থাকিবে। আদ্যশিক্ষায় যে অফুরন্ত ধৈর্য, অফুরন্ত উৎসাহ, ও শিশুবাৎসল্য চাই, সে তিন গুণ সুলভ নহে। কিন্তু রক্ষা এই, বিদ্বান্ চাই না, 'পণ্ডিত' প্রৌঢ় কিংবা বৃদ্ধ আদৌ চাই না। যুবা

গুরুর অভিজ্ঞতা থাকে না; ছেলেমি থাকিতে পারে, অন্য তিন গুণও থাকিতে পারে। বিশেষতঃ এই গুরুকে শিখাইয়া লইতে পারা যায়; পাকা গুরুকে কাঁচাইতে পারা যায় না। মনে রাখিতে হইবে, পাঠশালা নয়, শিক্ষা-শালা চাহিতেছি। পাঠশালার পণ্ডিত, আর শিক্ষাশালার শিক্ষক এক নহেন। এই রূপ, যে-সব পাঠশালা-নীক্ষক (inspector) আছেন, তাহাঁদেরও কর্তব্য সম্পূর্ণ পরিবর্তন করিতে হইবে। বিদ্যা অল্প হউক, যাহাঁরা উত্তম শিক্ষক, তাহাঁরাই নীক্ষক পদের যোগ্য।

সর্বাপেক্ষা ভাবনার কথা, আমাদের দেশে শিক্ষা সম্বন্ধে যে সংস্কার আছে, সে সংস্কার এক দিনে পরিবর্তিত হইবে না। দেখা গিয়াছে, 'শিক্ষিত' পিতামাতাও ছেলের পড়া বহির পাতা গণিয়া তাহার শিক্ষার পরিমাণ করেন। পাঠশালা কিংবা বিদ্যালয়ে বিদ্যার পরিমাণ করা হইয়া থাকে, সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষারও না হয়, তাহা নহে; কিন্তু প্রথম হইতেই শিক্ষাশালার লক্ষ্য স্থির রাখিলে গোলে হরিবোল হইবে না।

মধ্য ও অন্ত্য শিক্ষা

আদ্যশিক্ষার মূল।

কেহ কেহ বলিবেন, শিক্ষার যে আদর্শ ধরিতেছি তাহা উত্তম বটে, কিন্তু কোথায় পাইব। দেশ দরিদ্র; টাকা কোথায়? সে শিক্ষক কোথায়? এমন প্রস্তাব চাই, যাহা দেশের পক্ষে সম্ভব। আমি বলি, প্রথমে মানস (ideal) স্পষ্ট করি, তাহার পর বাস্তব। এক বৎসরে, দশ বৎসরেও এই মানস পূর্ণ হইবে না। ইহার পরিবর্তনও উত্তরোত্তর অনুভূত হইবে। তথাপি বাস্তুকর্ম আরম্ভের পূর্বে যেমন তাহার একটা মানসচিত্র রচিতে হয়, নতুবা পরে তাহার সমুদয় অংশের প্রয়োজনের মিল থাকে না, তেমনই শিক্ষা-সৌধের অঙ্গ-পরম্পরা একত্র না দেখিলে গুরু-লঘু যোগ্য-অযোগ্য বুঝিতে পারা যায় না। এখন দেখিতেছি, শিক্ষাসৌধের পোত শীর্ণ, মাথা ভারী হইয়া পড়িয়াছে, গাছের ডগা হইতে শিকড়ে রস নামিতে হইতেছে। প্রথম প্রথম এইরূপ হওয়া আবশ্যক ছিল। কারণ তখন দেশ-শিক্ষার কথা উঠে নাই; উঠিলেও অসাড় দেশে কথাটা কানে প্রবেশ করিত না। এখন সে দশা গিয়াছে, নিম্ন হইতে উন্নত সোপান রচিবার সময় হইয়াছে।

বর্তমান বিদ্যালয় ইংরেজী ধরণের।

শিক্ষা, বিদ্যা, বিজ্ঞান প্রভৃতি শব্দের অর্থ ধরা হইয়াছে। আরও বিশেষ করিবার নিমিত্ত 'আলয়' ও 'শালা' শব্দদ্বয় একটু পৃথক পৃথক পথে প্রয়োগ করা যাইতেছে। যেখানে কর্ম প্রধান সেখানে 'শালা' এবং যেখানে পাঠ প্রধান সেখানে 'আলয়' শব্দ যোগ করা হইতেছে। প্রচলিত নামের মধ্যে 'পাঠশালা' নামটিতেও এই ভাব প্রচ্ছন্ন আছে। পূর্বকালের গ্রামের পাঠশালায় পঠন অল্প হইত, শিক্ষা—কর্মে অভ্যাস—অধিক হইত। প্রথমে লেখা, পরে পড়া। ইহাই ঠিক কর্ম। এখন প্রথমে বই ধরে, পরে লেখা শেখে। যে-সব 'বিদ্যালয়' হইয়াছে, 'বঙ্গ বিদ্যালয়' হউক, 'ইংরেজী বিদ্যালয়' হউক, —সে-সবে পাঠশালার ক্রিয়াভ্যাস হ্রাস পাইয়াছে। বিদ্যালয়ে ১০টা হইতে ৪টা পঠনাদি হয়। রবিবারে রবিবারে বিশ্রাম হয়। সেখানে বেঞ্চ চেয়ার টেবিল অনেক, এবং সাধারণতঃ 'শিক্ষক' বলিলেও বুঝি বঙ্গ বিদ্যালয়ে 'পণ্ডিত', এবং ইংরেজী বিদ্যালয়ে 'মাষ্টার' 'লেকচারার' 'প্রোফেসর' প্রভৃতি বিদ্যা অর্পণ করেন। অর্থাৎ 'আলয়'গুলিতে ইংরেজী ধরণ স্পষ্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

শিক্ষাশালা দেশীয় হইবে।

ইংরেজী ধরণের সবই মন্দ, তা বলি না। কিন্তু দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া দেশীয় ধরণ যত রাখিতে পারা যায়, তত ভাল মনে করি। দেশীয় ভাব আমাদের সাত্ম্য হইয়া গিয়াছে; ইহাকে হঠাৎ পরিবর্তন করিলে দেশের প্রাণরক্ষা বিপদসঙ্কুল হইয়া পড়িবে। পশ্চিমদেশের উত্তম জ্ঞান চাই; কিন্তু ইহার অর্থ এমন নহে যে, পশ্চিমদেশীয় পাত্রে সে জ্ঞান-বারি পান না করিলে ফল পাওয়া যাইবে না। দুই দিক দিয়া এই মন্তব্য বুঝিতে হইবে,—(১) আন্তর, (২) বাহ্য। দেশ হইতে যে বিদ্যা, বিজ্ঞান, বা শিক্ষা লাভ হয়, সেটি দেশীয়। এটি সহজে সাত্ম্য হয়। আমরা বলি, বালক-বালিকারা চারি পাশে যাহা দেখে, তাহা ধরিয়া জ্ঞানবৃদ্ধি করা প্রশস্ত। কাজে কিন্তু প্রায়ই বিপরীত দেখি। বহির লেখা দেখিয়া দেশে দৃষ্টান্ত খুজি! ক্রিয়াটা আন্তর হইতে বাহ্যে চলিয়া যায়। নির্ধারিত পাঠ্য পুস্তক হইতে ইহার ভূরি ভূরি উদাহরণ দিতে পারা যায়। পুস্তক-লেখক নিজে যে ভাবে শিখিয়াছেন, হাজার সতর্ক হইলেও তাহার কৃত

পুস্তকেও সে ভাব চলিয়া আসে। এমন 'ভূগোলবিবরণ' দেখি নাই যাহার আরম্ভে ভূ যে গোলাকার, তাহার চতুর্বিধ প্রমাণ লিখিত হয় নাই; এমন 'পাটীগণিত' দেখি নাই যাহার আরম্ভে 'সংখ্যা' ও 'একক' ও 'গণিত' সংজ্ঞা ব্যাখ্যা করা হয় নাই। (তবে, 'পাটী' কেন বলে তাহার ব্যাখ্যা দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হইতেছে না। বোধ হয়, ইংরেজী arithmetic শব্দের মধ্যে 'পাটী' আবিষ্কৃত হয় নাই।) সে যাহা হউক, বিদ্যালয়ে যাহা চলুক, শিক্ষাশালায় এই বিধি একেবারে অসংগত হইবে। ইতিহাসে ও বিজ্ঞানে, কলা ও বার্তায়, সকল বিষয়ে ভোক্তা বা 'আমি'র প্রয়োজন প্রধান লক্ষ্য হইবে। যে বিদ্যায়, যে জ্ঞানে 'আমার' প্রত্যক্ষ প্রয়োজন নাই, তাহা শিক্ষাশালায় বর্জন করিতে হইবে।

সবাই জানি, ইংরেজী পাঠের এমন গুণ যে, ছেলেমেয়েরা 'বাবু' হইয়া পড়ে। ছেলেকে জুতা চাই, জামা চাই, ছাতা চাই; মেয়েকেও কিছু কিছু মেম সাজিতে হয়। কেন হয়, কে জানে। কিন্তু শৈশব হইতে নূতন পরিচ্ছদে সাজিতে সাজিতে অভ্যাস বদ্ধমূল হইয়া যায়, এবং যৌবনের চাপল্যের সহিত যুক্ত হইয়া দেশের সমক্ষে উপহাস মনে হয়। এখন দেখি, বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার অর্থ অট্টালিকা-নির্মাণ, চেয়ার-বেঞ্চি-টুল প্রভৃতি পশ্চিমদেশের নানাবিধ গৃহোপকরণের সমাবেশ। এমন ক্ষেত্রে পালিত হইলে কোন্ ছেলে তাহার অনুরক্ত না হইয়া পড়িবে? আমাদের দেশের পক্ষে, বিদ্যামন্দিরের এই আদর্শ, বিদ্যা-সেবকের সভ্য আদর্শ, সম্পূর্ণ নূতন। আমরা বাড়ীতে জামা গায়ে জুতা পায়ে টেবিলের ধারে চেয়ার বা বেঞ্চিতে বসি না, আমাদের সুধা-ধবলিত অট্টালিকাও নাই। সরস্বতীর মন্দিরে লক্ষ্মীর ঐশ্বর্য স্পৃহণীয় কি না, তাহাও বলিতে পারা যায় না। কিন্তু ইহা ঠিক, ধনশালী জাতি আমাদের শিক্ষাবিধাতা না হইলে আমরা হয়ত দো-চালায় তুষ্ট হইতাম, এবং অট্টালিকা-নির্মাণের পয়সা দিয়া ছাত্র পালন করিতাম। কিশোর ও যুবার পক্ষে কঠোর ব্রহ্মচর্য ও কৃচ্ছ্র-সাধন, দেশের হিতজনক হইত। গোবর-নিকানা ঘরে যাহাকে বাস করিতে হইবে, গামছা কাঁধে ধুতি পরিয়া যাহার দিন কাটিবে, তাহার পক্ষে এই নূতন আদর্শ সমুদয় শিক্ষাকে কৃত্রিম করিয়া ফেলিতেছে। শিক্ষা দীক্ষা যেন বাহিরের কিছু; নিত্য-নৈমিত্তিকের কিছু নহে। পোষাক পরিয়া আফিসে যাই; বাড়ীতে পোষাক খুলিয়া স্বস্তি বোধ

করি। কারণ আফিসটা আমাদের নয়। গ্রামে জমীদারী কাছারিতে, কিংবা গ্রামের 'ডাকে' (সভায়), সভ্য হইয়া যাইতে হয়, এক-ছোটে যাইবার জো নাই; কিন্তু দো-ছোট-টি নূতন নহে, হয় গামছা নয় চাদর। অথচ সেসব সভার গাম্ভীর্যের ও সম্মানের কিছুমাত্র হানি হয় না। শিক্ষাশালায় কেহ আসিয়া তামুক খাইয়া গেল; যাউক না, কোনও ক্ষতি নাই। কারণ গ্রামে তামুক এত চলিত যে, তাহা নূতন দেখা হইবে না। কিন্তু জামা গায়ে গিয়া বসাই নূতন। তা ছাড়া, ছেলে-বেলা হইতে গায়ে রোদ জল বাতাস, চোখে আলো লাগাইয়া, দেহ দৃঢ় না করিলে বাঙ্গালী জাতি কোমলাঙ্গ হইয়া পড়িবে, কষ্টকর অর্থকরী কর্মের যোগ্য হইবে না। মধ্যাহ্নে বিশ্রাম; সকালে কিম্বা বিকালে শিক্ষাশালা খুলিলে জাতিটা অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণ রোগ হইতে রক্ষা পাইবে।

আদ্য দ্বিতীয় শিক্ষাকালে বালকবালিকা শিক্ষাশালায় সকালটা দিতে পারিবে না। মায়ের সঙ্গে মেয়ে ঘরকন্নার কাজ করে,—ইহাই ত শিক্ষা; বাপের সঙ্গে ছেলে চাষে খাটে, কলাকর্ম করে, কিম্বা দোকান-পাট দেখে—শিক্ষাই ত পায়। শিক্ষাশালার অর্ধেক শিক্ষা বাড়ীতে পায়; কাজেই ছেলে মেয়ে দুই বেলাই শিক্ষা পায়।

ব্যায়াম-অভ্যাস

শিক্ষার দ্বারা মানসিক বৃত্তির পূরণ হইতে পারে কি না, কে জানে। তথাপি এমন শিক্ষা বাঙ্গালীর চাই যাহাতে বুদ্ধির সহিত ক্রিয়ার যোগ ঘটে, অভিমান ও নির্ভীকতা দ্বারা সত্যবাদিতা ও সত্যকারিতা দৃঢ় হয়, দেহের বল ও শ্রমশীলতা বাড়িতে পারে।

দেহের বল-বৃদ্ধি ও জড়তা-হ্রাস আশু কর্তব্য হইয়াছে। বাঙ্গালীর অন্নের কিছু পরিবর্তন আবশ্যক। শৈশবের ব্যায়াম, খেলা ও ছুটাছুটি, লাফালাফি ও অন্যান্য দুরন্তপনা। কিন্তু নয় বর্ষ বয়সের পর হইতে একটু একটু ব্যায়াম আরম্ভ করিয়া যৌবনে তাহা পূর্ণভাবে করিতে হইবে। বিনা উপকরণে ব্যায়াম সর্বত্র সুলভ। মোটের উপর এই ব্যায়ামই ভাল। বলা বাহুল্য, হাঁটা-হাঁটি, দৌড়া-দৌড়ি, কিংবা খেলার একঘেয়ে অঙ্গ-কুঞ্চন ও প্রসারণ ব্যায়াম নহে। খেলার প্রয়োজন আছে, কিন্তু সে প্রয়োজন ও ব্যায়ামের প্রয়োজন এক নহে। রণাভ্যাস (drill) উত্তম; কিন্তু দেহের বল ও পুষ্টি, অঙ্গের

নমনীয়তা ও দৃঢ়তা সম্পাদন করিতে আনুক্রমিক ব্যায়াম আবশ্যক। কেবল ব্যায়াম নহে; আত্মরক্ষার উপযোগী লাঠিখেলা ও তরবার-চালনা, বাঁটুল-ছোঁড়া শিক্ষাও চাই।

উদ্‌ভাবনা-শিক্ষা

শিক্ষার দ্বারা উদ্ভাবনা বৃদ্ধি করিতে পারা যায়। চিত্রলিখন ও শয়শিক্ষা (শয়=হস্ত; manual training) ইহার আদি। চিত্র-লিখন দ্বারা উপকল্পনা আকৃতি প্রাপ্ত হয়, শয়শিক্ষা দ্বারা তাহার জড়মূর্তি করিতে পারা যায়। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের বহু শিক্ষক চিত্রশিক্ষা ও শয়শিক্ষার প্রতি প্রসন্ন নহেন। তাঁহারা মনে করেন, সময়ের অপব্যয়। সে সময়ে দুইটা অঙ্ক কষিলে, কিংবা দুই পাত পড়িলে ছেলের উপকার হইত। মনে আছে যখন বঙ্গ বিদ্যালয়ে শয়শিক্ষা প্রথম প্রবর্তিত হয়, তখন অনেক গণ্যমান্য দেশহিতৈষী ইহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। ছেলে কি ধুচনী বুনিতে শিখিবে? আমি বলি, শুধু ধুচনী নহে, তালপাতা বা খেজুরপাতার চাটাই বুনিবে, বাখারী দিয়া খেলা-ঘর গড়িবে, কাগজের ঘুড়ী করিয়া উড়াইবে, ইত্যাদি ইত্যাদি যথাসাধ্য সবই করিবে। আদ্য শিক্ষাকালে যে শয়শিক্ষা আরম্ভ হইবে, তাহা বাড়িয়া বাড়িয়া ক্রমে অভিপ্রায়-কল্পনা (designing) ও মূর্তিনির্মাণে (modelling) দাঁড়াইবে। প্রথম প্রথম অনুকরণ চাই; মন ও চোখ ও হাতের একটু সহযোগিতা অভ্যাস হইলে আর অনুকরণ থাকিবে না, নির্মাণ চলিতে থাকিবে। চতুর শিক্ষক জানেন, অনুকরণের সঙ্গে সঙ্গে নির্মাণ অভ্যাস হইতে পারে। আর নির্মাণে যে ছেলের রতি জন্মিয়াছে, সে কাজের লোকও হইয়াছে। অভিরতি ও অভিনিবেশ দুই ভাই, যেন রাম ও লক্ষ্মণ। তখন চৌদ্দবৎসর বনবাস কিছু নয়, আর গাছ পাথর দিয়া সমুদ্রে সেতুবন্ধনও কিছু নয়। তর্জন করিলে, বেত দেখাইলে অভিনিবেশ অবিলম্বে অন্তর্হিত হয়; অভিরতি জন্মিলে অভিনিবেশ আপনি আসে, আর নির্মাতা হইতে দিলে অভিরতিও চলিয়া আসে। যাহার অভিনিবেশ জন্মিয়াছে, তাহার শিক্ষার পথও খুলিয়া গিয়াছে। দুঃখ হয় আমরা ছেলেগুলাকে বাঁধিয়া পিষিয়া মারিতেছি। বড় হইলে বলি, 'তাইত, ইস্কুল কলেজ এতকাল খোলা হইয়াছে, দেশে উদ্‌ভাবনার চিহ্ন দেখা গেল না।' আমি বলি, অনেক কাল দোড়ী বাঁধিয়া রাখা

গিয়াছে; এখন দোড়ী কাটিয়া একটু ছাড়িয়া দিয়া দেখা হউক না। দোঁড়ীর গুণ নাই এমন নহে; অনুকরণও শিক্ষার সহায়। তথাপি দৌড়াইতেও দেওয়া চাই। কোন্ দিকে কতদূর দেওয়া ভাল, দুঃখের বিষয়, তাহার লেখাপড়া করিতে পারা যায় না।

নীক্ষক ও পাঠ্য পুস্তক।

যদি বা শিক্ষক পাই, তাহাঁর নীক্ষকের (Inspector) উৎসাহ পাই না; নীক্ষকই বা কি করিবেন, তাহাঁকে শিক্ষাধিকারের (Education Department) ঘর পূরণ করিতেই হইবে। ইহাও সত্য, ঘরপূরণ ব্যাপার না থাকিলে হয়ত অনেক শিক্ষক ও নীক্ষক নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িতেন। কারণ, দেশের লোক শিক্ষা-বিষয়ে প্রায়ই উদাসীন, কিংবা কল্পনা-হীন। তথাপি মনে হয়, ইস্কুলের (ও কলেজের) ঘর মাপা ও বেঞ্চি গঠা কিংবা শিক্ষকের ও কর্তৃপক্ষের দোষ ধরা কম হইলে শিক্ষার তেজ মন্দা হইত না। যে সময় নীক্ষক মহাশয় বালক-বালিকার বিদ্যা পরীক্ষা করেন, সে সময় তাহাদিগকে পড়াইয়া দেখাইলে শিক্ষকের দোষ সহজে সংশোধিত হইত। বঙ্গবিদ্যালয় ও ইংরেজী ইস্কুলে যে যে পুস্তক পাঠ্য ধার্য হয়, এবং বালক-বালিকার অভিরক্ষিতার নিকট অনুপযুক্ত বিবেচিত হয়, নীক্ষক মহাশয় স্বয়ং পড়াইয়া দেখাইয়া লোকের বিরুদ্ধ সমালোচনা অনায়াসে খণ্ডন করিতে পারিতেন। পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনে দোষ ঘটে না, এমন নহে। সে দোষ নিবারণের এই উপায় আছে। অন্য উত্তম উপায়ও আছে। পাঠগ্রন্থলেখককে ইস্কুলে লইয়া গিয়া পড়াইতে বলা। এই বিধি হইলে কাণ্ডজ্ঞানহীন লেখক সাবধান হইতেন, অন্যকে দিয়া তাহাঁর বই লেখানা বন্ধ হইত, এবং শিক্ষাধিকারও অপবাদ হইতে নিষ্কৃতি পাইতেন।

মানুষের চারি বর্ণ।

বালকবালিকাদিগকে চারি ভাগে ভাগ করিতে পারা যায়। বক্তব্য-লাঘব-নিমিত্ত, 'ভাগ' না বলিয়া 'বর্ণ' বলি। কেহ ব্রাহ্মণ বর্ণ, কেহ ক্ষত্রিয় বর্ণ, কেহ বৈশ্যবর্ণ, কেহ শূদ্রবর্ণ। মিশ্রবর্ণ অনেক আছে, কিন্তু পঞ্চম বর্ণ নাই। আদ্যশিক্ষাকালে বালকের গুণাগুণ প্রকাশ হইতে থাকে। কোন্ বালক কোন্ বর্ণের তাহা বিচক্ষণ পিতা বিশেষতঃ শিক্ষক অনায়াসে বুঝিতে পারেন। বর্তমান শিক্ষানীতির দোষ এই,

স্বাভাবিক বর্ণভেদ অস্বীকার করিয়া দেশের যাবতীয় বালককে ব্রাহ্মণ বর্ণের মনে করিয়া এক বিদ্যালয়ের এক রাঁধা পথে চালিত করিতেছে। এক বর্ণ লইয়া কোনও দেশ চলিতে পারে না; কোনও দেশে সকল বালক এক বর্ণেরও হইতে পারে না। দুঃখের কথা, দেশে ক্ষত্রিয় বর্ণের উপজীবিকা নাই। তাই কেহ ডাকাত হইতেছে, কেহ বা গ্রামে ও নগরে দুর্দান্ত পশুর ন্যায় বিচরণ করিতেছে। অন্য দিকে কেহ প্রকৃষ্ট ব্রাহ্মণ বর্ণের হইলেও দাস্যবৃত্তি গ্রহণ করিতেছে। যে শূদ্রবর্ণের, সে দাসত্ব করিলে তাহার পক্ষে ভাল, দেশের পক্ষেও ভাল। বৈশ্যবর্ণের শিক্ষা দেশে যাহা ছিল, তাহাই চলিতেছে। এই বর্ণের শিক্ষাই, অর্থকরী শিক্ষা। এই শিক্ষার অর্থ এরূপ নহে যে, বিদ্যার সহিত সম্পর্ক থাকিবে না। আমার বিশ্বাস, অর্থকরী শিক্ষা হইতে বিদ্যা বিসর্জন করাতেই দেশের নূতন নূতন কারুশিক্ষা-শালায় (Industrial School) শিক্ষার্থী জোটে না। বিদ্বান্ চাই; জাতিধর্ম-নির্বিশেষে বিদ্বান্ উৎপাদন করিতেই হইবে। বিদ্যার গ্লানি, ধর্মের গ্লানির তুল্য, দেশের মৃত্যুর লক্ষণ। বিদ্যাকে প্রধান লক্ষ্য রাখিয়া বিদ্যাকরী শিক্ষা, এবং বার্তা বা কলা বা বাণিজ্য, এমন কি প্রজাসেবা রাজসেবা প্রধান লক্ষ্য রাখিয়া অর্থকরী শিক্ষা।

গুরুর শিষ্যত্ব।

পূর্বকালে ছিল, গুরুর শিষ্য না হইলে বিদ্যা হইত না। একালে সে সত্য খণ্ডিত হয় নাই, শিষ্যত্ব স্বীকার ব্যতীত কর্মজ্ঞান জন্মে না। বিদ্যালয়ে বিদ্যালাভ হইতে পারে; কিন্তু গুরু ব্যতীত শিক্ষিত হইবার উপায় নাই। অর্থকরী শিক্ষায় গুরু অবশ্য চাই। কাজ যত তুচ্ছ মনে হউক, শিষ্য হইতেই হইবে। কলা-বিদ্যালয়ে শিক্ষিত হইয়া আসিলেই কলা-প্রতিষ্ঠার সামর্থ্য জন্মে না। ইয়ুরোপ ও আমেরিকা দেশে কলাতে দীক্ষিত করিবার বহু আয়োজন আছে, বিদ্যালয়ের যুবকদের অজানা কিছু থাকে না। তথাপি কোনও কলাস্বামী কলাবিদ্যালয়-সমাবৃত্ত যুবককে নিজের স্থানে বসাইতে সাহসী হয় না। কর্ম না করিলে কর্মশিক্ষা হয় না। সে শিক্ষা বিজ্ঞান-শালায় হয় না, কলা-শিক্ষাশালায় হয় না। বাণিজ্য সম্বন্ধেও এই কথা। কলেজে বাণিজ্য-বিদ্যা শিখিয়া বণিক্ হইতে পারা যায় না। ইহাও মনে রাখা কর্তব্য, বিদ্যাকরী শিক্ষায় গুরু পাওয়া যত সোজা,

অর্থকরী শিক্ষায় তত সোজা নহে। কারণ, বিদ্যা "যতই করিবে দান তত যায় বেড়ে"; আর কলা ও বাণিজ্য-জ্ঞান, "যতই করিবে দান তত যায় কমে।" কৃষিবার্তায় এরূপ নহে; আমার ভূমিতে দশ মণ জন্মিলে তোমার ভূমির উৎপন্ন কম হয় না। এই যে শিষ্যত্ব বলিতেছি, তাহা সম্পূর্ণ শিষ্যত্ব, নীচের ধাপ হইতে শিষ্যত্ব—যে ধাপে কুলী মজুর কাজ করে। বিদ্যার গরিমা মাথায় থাকিলে এইরূপ শিষ্যত্ব স্বীকার সহজ হইবে না। এই কারণে প্রস্তাবিত শিক্ষাশালায় বাল্যকাল হইতেই বালককে কুলীর কর্ম করাইতে হইবে।

বর্তমান ইংরেজী-শিক্ষিতের দশা।

বিদ্যামহাপীঠের সমাবৃত্ত যুবকদের সাফল্যের আশা অল্প। ইহার প্রধান কারণ, যে যত পড়িয়াছে সে নিজেকে তত ভুলিয়াছে, যে যত পড়ে সে তত অজ্ঞ হয়। তাহার মস্তিষ্কের কুঠরীগুলি পরের বিদ্যায় এমন পরিপূর্ণ থাকে যে চিন্তার স্থান থাকে না। তাহার সর্জনা ও উদ্‌ভাবনা লুপ্ত হয়, সে কলের পুতুল হইয়া যাহা পড়িয়াছে তাহা আওড়ায়। পঞ্চতন্ত্রে যে পণ্ডিত-মূর্খের উপাখ্যান আছে, তাহা মিথ্যা নয়। তর্ক ও বিতর্কের আবর্তে পড়িয়া জ্ঞানের নৌকা ডুবিয়া যায়। কর্ণধারের ভূয়োদর্শন ও স্বয়ং-জ্ঞান অর্থকরী নৌকাকে রক্ষা করে। এই কারণে বলি, যদি বিদ্বান্ হইতে না চান, যদি বিদ্যামহা-পীঠের উচ্চ সোপানে উঠিবার সামর্থ্য না থাকে, যদি অর্থই কাম্য হয়, তাহা হইলে বি-এ এম্-এ পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়া কালব্যয় ও অর্থব্যয় করিবেন না। ব্যবসায়ীর (ব্যবসায়=industry) শিষ্যত্বে সে সময় সে অর্থ প্রয়োগ করুন। বেতন দিতে হইলে বেতন দিয়া,—লইয়া নহে, সরকার হউন। বি-এ এম-এ হইতে পারিলেন না বলিয়া দুঃখিত হইবেন না। উপাধির মোহ দুই দিনে কাটিয়া যায়; কিন্তু অধিকাংশের পক্ষে প্রাণরক্ষার উপায় অন্বেষণ স্বাভাবিক। প্রাণরক্ষার পর ধনসঞ্চয়ও স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। সমুদয় পৃথিবী পড়িয়া আছে, আপনার স্থান আপনাকেই করিয়া লইতে হইবে। ইহাও সত্য, তারা অগণ্য, চন্দ্র একটি। কিন্তু তারা হইয়াও মানব-জমীন্ আবাদে বাধা নাই। এই আবাদ ছাড়িলেই তারা নিবিয়া যায়, চন্দ্রেরও শশ-লাঞ্ছন বিকট আকার ধারণ করে।

বিজ্ঞান-মহাপীঠ চাই।

কলিকাতা বিদ্যামহাপীঠে প্রবেশ না করিয়াও দেশ-পূজ্য প্রাতঃস্মরণীয় লোকের আবির্ভাব হইয়াছে। অবশ্য ইহাঁরা ক্ষণজন্মা পুরুষ। ইহার বিপরীত শত শত দৃষ্টান্ত আছে। তবে দুঃখ হয়, যখনই নূতন বিদ্যামহাপীঠ স্থাপিত হইতেছে তখনই কলিকাতা বিদ্যা-মহাপীঠের দ্বিতীয় সংস্করণ হইতেছে। আদিপীঠ ব্যর্থ হয় নাই: এই পীঠ অবশ্য রক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু তা বলিয়া নূতন উদ্দেশ্য ও সমাজের প্রয়োজন -সাধনোপযোগী অন্য মহাপীঠ স্থাপনে ক্ষতি কি? মূর্ত বিজ্ঞান শিখাইবার নিমিত্ত মহাপীঠ চাই। ঢাকায় যে নূতন বিদ্যামহাপীঠ হইবে, তাহাকে মূর্তবিজ্ঞান-মহাপীঠ করিলে দেশের একটা বড় অভাব দূর হইত। দেশে টাকা নাই; তাহাতে একই উদ্দেশ্যে একেরই বহু টাকার টানাটানিতে কোনটাই প্রসারিত হইতে পারিবে না। কেহ কেহ বলেন, কলিকাতা বিদ্যামহাপীঠে এত কার্যবাহুল্য ঘটিয়াছে যে, বেড়া দিয়া ছোট করিয়া ফেলা আবশ্যক। এই তর্ক ঠিক হইলে এত বড় ভারতবর্ষে এক বড়লাটের শাসন সুন্দরভাবে চলিতে পারিত না। আসল কথা, আমরা নিজের স্বার্থ বুঝিতে পারি না, ঈর্ষানলে পুড়িতে জানি। সে যাহা হউক, অর্থকরী শিক্ষার এক উচ্চাঙ্গে মূর্ত বিজ্ঞান আছে; তাহা আধিশিক্ষার আধার। যদি অন্ত্য শিক্ষার আয়োজন হয়, তাহা হইলে আধিশিক্ষারও হইবে।

গুরুকুল।

আদ্য শিক্ষার সময় ছেলে-মেয়েরা অবশ্য বাড়ীতে থাকিবে। মেয়েদের মধ্যশিক্ষার কাল তাহাদের বাড়ীতে না হইলে চলিবে না। কিন্তু ছেলেদের পক্ষে গুরুগৃহ ভাল। এইরূপ অন্ত্যশিক্ষা ও আধিশিক্ষার সময় গুরুগৃহ আরও ভাল। এই এই কালে গুরু-গৃহে না থাকিলে ছাত্রেরা শিক্ষার সময় কুলাইয়া উঠিতে পারিবে না, হয় শিক্ষার নয় স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত ঘটিবে। গুরুগৃহ কিংবা গুরুকুল নামে ডরাইবেন না, কিংবা প্রাচীনকালের গুরুকুলও মানসনেত্রে দেখিবেন না। এখন ইস্কুল-কলেজের সঙ্গে boarding house, hostel, mess আছে। এ-সব গুরুকুল বই আর কি, যদিও কুলপতি (superintendent) গুরু না হইয়া প্রায়ই রক্ষী মাত্র। গুরু ও শিক্ষকের মধ্যে একটু প্রভেদ আছে। গুরুর আসন বহু উচ্চে, যেখানে

মাতা-পিতার আসন। শিক্ষকের আসন নিম্নে। শিষ্যকে গুরু মানুষ করিয়া দিবেন, ছাত্রকে শিক্ষক অভীপ্সিত বৃত্তিলাভের যোগ্য করিয়া তুলিবেন। গুরু পিতৃস্থানীয়, শিক্ষক মিত্রস্থানীয়। এই গুরুর অগাধ পাণ্ডিত্য থাকিতে হইবে, এমন নহে। কিন্তু তাহাঁর দয়া ও দাক্ষিণ্য, সত্যতা ও ত্যাগিতা দ্বারা শিষ্যের চিত্ত আকৃষ্ট হইবে, এবং তাহাঁর চরণে শিষ্যের মস্তক ভক্তিভরে নত হইবে। গুরুকে ধর্মপিতা বলিলে চলে। ইহাঁর স্থান যে সে লইতে পারেন না।

শিক্ষার ব্যয়-নির্বাহ।

এই গুরু কোথায় পাওয়া যাইবে, এত শিক্ষক কোথায় পাওয়া যাইবে; শিক্ষার ব্যয়, গুরুকুলের ব্যয় কে যোগাইবে? প্রশ্নে নৈরাশ্য আছে; কিন্তু উত্তর স্পষ্ট,—যাহার মাথাব্যথা তাহাকেই বৈদ্য খুঁজিতে হইবে, ঔষধ ও পথ্য তাহাকেই সংগ্রহ করিতে হইবে। আমার মাথা-ব্যথায় তোমার বেদনা হইবে না। যদি শিক্ষাই একান্ত আবশ্যক মনে কর, অন্য ব্যয়-সঙ্কোচ করিয়া অন্ততঃ বছর কতক চোখ-কান বুজাইয়া শিক্ষাকল চালাইয়া দেও। কারণ কথাটা অপ্রিয় হইলেও, 'না' হইতে কদাচ কুত্রাপি 'হাঁ' হয় নাই।

কাশিমবাজারের মহারাজার বিশ্বকর্মশালার অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত পেটাবেল সাহেব টাকার একটা উপায় দেখাইয়াছেন। আমি তাহা অনুমোদন করি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে উপায় দেশশিক্ষার আদ্যন্ত চলিবে না, স্থানবিশেষে বৃত্তিশিক্ষাবিশেষে উত্তম চলিতে পারে। তাহাঁর প্রস্তাবে ছাত্রেরা শিক্ষার ব্যয় নিজে নিজে উপার্জন করিবে। ছাত্রেরা নিজের হাতে চাষ করিবে, অন্নের যোগাড় হইবে; নিজের হাতে কাপড় বুনিবে, বস্ত্রের যোগাড় হইবে। কিংবা অন্য কিছু উৎপাদন করিয়া তাহার মূল্যে খাওয়া-পরা চালাইবে। কিন্তু দেশটা এতই দরিদ্র যে ইহাদের উৎপন্ন না পাইলে মাতাপিতা, ভাই-বহিন খাইতে পান না। পূর্বেই বলিয়াছি, দেশময় শিক্ষা বিস্তার করিতে হইলে ছাত্রদিগকে প্রত্যহ ৬ ঘণ্টা বিদ্যালয়ে বা শিক্ষাশালায় ধরিয়া রাখা চলিবে না। তাহাদিগকে এক বেলা, বিকাল বেলা পাওয়া যাইবে। সারাদিন পরিশ্রমের পর রাত্রে ধরিয়া রাখায় নিষ্ঠুরতা হইবে, ছাত্রদিগের আয়ু ও আরোগ্য নষ্ট হইবে। অতএব যে-সব ছাত্রকে মাতাপিতার সংসারে সাহায্য করিতে হয় না, কেবল তাহারা পেটাবেল সাহেবের কল্পিত শিক্ষার ব্যয় কিয়দংশ

যোগাইতে পারিবে। কিন্তু এরূপ ছাত্র হাজারে পাঁচজন পাওয়া যাইবে কিনা, সন্দেহ। যে দেশ দারিদ্র্যের পঙ্কে নিমগ্ন, তাহার উঠিবার শক্তি ও উপায় -আবিষ্কার আদৌ সোজা নহে। আদ্যশিক্ষাকালে বালক-বালিকারা তেমন কিছু উপার্জন করে না; কারণ তখন তাহাদের শক্তি থাকে না।

শিক্ষক।

শিক্ষকশিক্ষাও অল্পব্যয়সাধ্য হইবে না। এই শিক্ষক দুই প্রকার চাই; গ্রামে গ্রামে জ্ঞানপ্রচার-নিমিত্ত প্রদর্শক এবং শিক্ষাশালায় শিক্ষক। বরং শিক্ষকের কর্ম সহজ, প্রদর্শকের কর্ম গুরুতর। গ্রামে গ্রামে হাটে হাটে নিজ-জ্ঞান ও দেশ-জ্ঞান বিলাইতে হইবে, লোকে গ্রহণ করুক আর নাই করুক। যাহাঁর আচারে ও ব্যবহারে সংযম অভ্যাস হইয়াছে, অথচ যিনি স্বদেশ-অভিমানী, এইরূপ লোককে কার্য (duties) শিখাইয়া দিয়া প্রদর্শক করিতে হইবে। এ বিষয় দ্বিতীয় খণ্ডে বিস্তার করা যাইবে। প্রদর্শক দুই প্রকার; কেহ অটমান (itinerant), গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিয়া লোকের দ্বারে দ্বারে বাক্য দ্বারা, গীত দ্বারা, দ্রব্যপ্রদর্শন দ্বারা, চিত্র দ্বারা, যে জ্ঞান যাহাতে সুবিধা তাহাতে উপস্থিত করিবেন। কেহ দেশের হৃদয়স্থ হইয়া সাপ্তাহিক পত্র পাঠাইয়া গ্রামে গ্রামে জীবন-রস সঞ্চারিত করিতে থাকিবেন। এই-সকল প্রদর্শক ও গ্রামের ও নগরের শিক্ষকদিগের মধ্যে নাড়ীর যোগ রাখিতে হইবে। নতুবা একদিকে প্রদর্শকের কর্মে বিঘ্ন হইবে, অন্যদিকে রসের অভাবে শিক্ষকের জীবন শুখাইতে থাকিবে। শিক্ষকদিগের মধ্য হইতেই নীক্ষক নির্বাচিত হইবেন; কিন্তু নীক্ষক চিরদিন নীক্ষক থাকিবেন না, তাহাঁকে মাপ--জোখের কলে পরিণত হইতে দেওয়া হইবে না। কর্মের পরিবর্তন চাই; শিক্ষক কখনও নীক্ষক, নীক্ষক কখনও শিক্ষক, কদাচিৎ প্রদর্শক, কখনও গুরুকুলপতি হইবেন। দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ব্যায়াম যেমন দেহের স্বাস্থ্যের অনুকূল, চিত্তের বি-আয়াম তেমন চিত্তের সরসতার অনুকূল। বর্তমানে নীক্ষকের আগমনে শিক্ষকের দুশ্চিন্তা বাড়িয়া যায়, অথচ উভয়ের পরস্পর সাহচর্য একান্ত আবশ্যক। শাসনের আধিক্যে পালন অন্তর্হিত হইলে অন্তরাত্মা শুখাইয়া যায়।

মধ্যশিক্ষিত যুবক ছয় মাস শিক্ষক-শিক্ষা পাইলে আদ্যশিক্ষক

হইতে পারিবেন। এইরূপ, অন্ত্যশিক্ষিত যুবক শিক্ষক-শিক্ষা পাইলে মধ্যশিক্ষক হইতে পারিবেন। এইরূপ অর্ধশিক্ষিত হইতে অন্ত্যশিক্ষক শিখাইয়া লইতে হইবে। ইহা পরের কথা। এখন বঙ্গ ও ইংরেজী বিদ্যালয় হইতে, পণ্ডিত-শিক্ষালয় হইতে, শিক্ষক নীক্ষক প্রদর্শক বাছিয়া লইয়া কাজ আরম্ভ করিতে হইবে। ইদানীর শিক্ষাপ্রাপ্ত পণ্ডিত শিক্ষাশালার সকল কর্মের যোগ্য হইবেন না। তাহাঁর পাণ্ডিত্য থাকিতে পারে, তাহাঁর শিক্ষা-কলা-জ্ঞানও থাকিতে পারে; কিন্তু,তিনি যে ভাবে শিক্ষিত হইয়াছেন, তাহাঁর কর্মস্থানে সে ভাব পাইবেন না। ইহাতে অসন্তোষ জন্মিবে এবং হয়ত দেশের পুত্রকন্যাকে সে অসন্তোষের ফল ভোগ করিতে হইবে। এই হেতু, ইহাঁকেও কিছুদিন নূতন শিক্ষায় দীক্ষিত হইতে হইবে। ইংরেজী ইস্কুলের ও কলেজের লব্ধ-বিদ্যের উৎসাহ থাকিলে, ছয় মাসে শিক্ষকের কর্মের যোগ্য হইতে পারিবেন। পাঠশালায় ও বিদ্যালয়ে ও ইস্কুলে ও কলেজে যে-সকল শিক্ষক আছেন, তাহাঁদের অনেকের দ্বারা কাজ আরম্ভ হইতে পারিবে। ইহাঁদিগকে শিখাইবার নিমিত্ত বই লিখিতে হইবে, বৎসরে দুইবার এক এক স্থানে আনাইয়া উপদেশ দিতে হইবে। যে পাঠক এতদূর পর্যন্ত পড়িয়া আসিয়াছেন, তিনি বুঝিয়াছেন, শিক্ষানীতি বলি, পদ্ধতি বলি, কিছুতেই প্রকৃত গুরু বা শিক্ষকের স্থান লইতে পারে না। গুরুই শিক্ষাশালার প্রাণ। এই প্রাণপ্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অকাতরে অর্থব্যয় করিতেই হইবে।

গুরুকুলে থাকিয়া শিক্ষিত হইবার সময় উত্তম ছাত্র ভাবী শিক্ষকের নিমিত্ত বাছিয়া রাখিতে হইবে। ইহারা বিনা ব্যয়ে শিক্ষা পাইবে এবং পরে গ্রাসাচ্ছাদন লইয়া চারি কি পাঁচ বৎসর বিনাবেতনে শিক্ষক হইবে। এইরূপ, শিক্ষকশিক্ষা পাইবার সময় ভাল ভাল ছাত্র বাছিয়া এবং বিনা ব্যয়ে শিখিতে দিয়া ভাবী শিক্ষক সংগ্রহ করিতে হইবে। এইরূপ, নানা উপায় আছে; কিন্তু এমন কোনও উপায় আবিষ্কৃত হয় নাই, যাহাতে অর্থব্যয় নাই।

মধ্যশিক্ষায় চিন্তা।

আদ্যশিক্ষার সুযোগ অবশ্য সকলকেই দিতে হইবে। কারণ, তাহা না দিলে দেশের জন্মলব্ধশক্তি ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির তুল্য গুপ্ত থাকিবে। একদিকে আদ্যশিক্ষা অবশ্য দাতব্য, অন্যদিকে অতিশয় কঠিন, অতিশয় ব্যয়সাধ্য। কারণ যোগ্যাযোগ্য-নির্বিচারে দেশের

যাবতীয় পুত্রকন্যাকে দিতে হইবে। দুঃখের বিষয় এই থাকিবে, সকলের পক্ষে সমান ক্ষেত্র রচনা অসম্ভব। সকলের বাড়ী, সঙ্গ, সমাজ, আর্থিক অবস্থা সমান নয়। কাজেই অসমক্ষেত্র-পালিত বৃক্ষের ন্যায় অসমক্ষেত্র-পালিত শিশুও পুষ্টিতে ও বুদ্ধিতে অসমান হইয়া পড়িবেই পড়িবে। বোধ হয় বৈষম্যরক্ষাই বিধাতার ইচ্ছা।

অথচ চেষ্টা করিতে হইবে। সে চেষ্টা বহুমুখী হইলেই বহুর মঙ্গল। মধ্যশিক্ষা-আরম্ভে কতকগুলি ভেদ মানিতে হইবে। (১) বঙ্গ-দেশেও অন্য দেশের ন্যায় বহু সমাজ-ভেদ আছে। যাবতীয় সমাজের পক্ষে মধ্যশিক্ষা এক করা বাতুলের কর্ম। অবশ্য সকলের পক্ষে নিজজ্ঞান ও দেশজ্ঞান অত্যাবশ্যক; কারণ, সকলকেই বাঁচিতে হইবে, সুখে স্বচ্ছন্দে বাঁচিতে হইবে। প্রভেদ এই, সকল সমাজের বা সকল লোকের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের বোধ এক নহে। (২) দেশভেদেও শিক্ষার বিষয়ের ভেদ কিছু করিতে হইবে। নদীবহুল কি সমুদ্রতটবর্তী লোকের পক্ষে নৌচালন শিক্ষা যেমন আবশ্যক, উচ্চভূমি প্রস্তরময় প্রদেশের পক্ষে তেমন নহে। (৩) পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে যে কাল ছিল, এখন সে কাল আর নাই। এখন অর্থকরী বিদ্যা কিছুই না জানিলে অধিকাংশ প্রজাকে মরিতে হইবে। যে পারে সে বিদ্যা লইয়া থাকিবে; হয় লক্ষ্মী ও সরস্বতীর বিরোধ ভঞ্জন করিবে, কিংবা সরস্বতীরই উপাসক হইয়া থাকিবে। (৪) আর্থিক অবস্থাভেদ শিক্ষাবৈষম্যের এক গুরুতর কারণ। মধ্যশিক্ষা ও অন্ত্যশিক্ষা কিংবা অধিশিক্ষা দাতব্য হইবে না। কতজনকে বৃত্তি দিয়া এই শিক্ষার সুযোগ দেওয়া যাইতে পারিবে? ফলে দাঁড়াইয়াছে ও দাঁড়াইবে, অর্থ থাকিলে পণ্ডিত হইতে পারিবে, ধনার্জনবৃত্তি শিখিতে পারিবে; না থাকিলে মূর্খ থাকিবে, আরও দরিদ্র হইবে। কিন্তু মূর্খেরও ক্ষুধাতৃষ্ণা থাকে, বস্ত্রাভাবে শীতে শরীর কাঁপে এবং ইনফ্লুঞ্জার এক ফুৎকারে প্রাণবায়ু দেহপিঞ্জর পরিত্যাগ করে। (৫) দশ-বার বৎসর বয়সে নর-নারীর ভেদ আরম্ভ হয়। অতএব আমাদের দেশে বালকবালিকার আদ্য দ্বিতীয় শিক্ষা একত্র এক ভাবে হইতে পারিবে না। (৬) বয়সভেদে শিক্ষার ভেদ অবশ্যকর্তব্য। যে শিশু আদ্যশিক্ষা পায় নাই, যে বালকবালিকা বিনা শিক্ষায় বড় হইয়াছে, এবং অপরে যে স্ব স্ব বৃত্তিতে নিযুক্ত হইয়া কোনও ক্রমে জীবনধারণ করিতেছে, সে-সবেরও শিক্ষা চাই। এই ষড় ভেদ স্মরণ করিলে দেশে আপামর নরনারীর শিক্ষা-বিস্তার অতিশয় কঠিন বোধ হইবে। আদ্য-

শিক্ষা বরং সোজা, অপরাপর শিক্ষার আয়োজন সকলের পক্ষে সমান করা অসম্ভব।

শিক্ষা-পরিপাটি-চিন্তার পূর্বে দুইটি প্রশ্নের সমাধান করিতে হইবে। (১) ভারত ও বঙ্গ প্রায় স্বাধীন হইয়াছে। ইংরেজী ভাষাজ্ঞানের প্রয়োজন হ্রাস পাইয়াছে, যাহাঁরা উচ্চাঙ্গের বিজ্ঞানচর্চা করিবেন, আর যাহাঁরা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ও পৃথিবীর দেশ বিদেশের বার্তা বহন করিবেন, তাহাঁরা ইংরেজী ভাষা উত্তমরূপ শিখিবেন। ইহাঁদের সংখ্যা অতি অল্প। যে গুরুভারে বালকবালিকারা পীড়িত হইতেছিল, চরিত্রে যাহার কুফল ফলিতেছিল, তাহা অপসারিত হইল। (২) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমান কালোপযোগী শিক্ষনীয় বিষয় অবশ্য চিন্তা করিবেন। যাহাতে লব্ধজ্ঞান পুঁথিগত না থাকিয়া দিনযাত্রায় আসিতে পারে তাহাও চিন্তা করিবেন। সমাজে বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন অল্প। সকলে সামান্যজ্ঞ হইলে দেশ উঠিতে থাকে। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ধারিত পাঠ্য চিন্তা করিলে মনে হয় অল্প বয়স হইতে বালকদিকে বিশেষজ্ঞ করিবার ইচ্ছা। কেহ সাহিত্য কেহ বিজ্ঞান অনুশীলন করিবে, এই ব্যবস্থায় একাঙ্গ বৃদ্ধি হইয়া মানুষকে কদাকার করে। বি এ, বি এস-সি পরীক্ষার পূর্বে সকল ছাত্রকে সমান বিবেচনা করিলে এই দোষ হইতে পায় না। সাহিত্যের ছাত্র ভূতবিদ্যা. বিজ্ঞানের ছাত্র তর্কবিদ্যা অবশ্য শিখিবে।

নিম্নে প্রদত্ত শিক্ষা-পরিপাটিতে এই নীতি অনুসৃত হইয়াছে। তথাপি বোধ হয় কিছু কিছু অপূর্ণতা রহিয়া গেল। বিষয়টি গুরুতর।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত কলেজে ছাত্রেরা যাহা শিখিতেছে তাহা অবশ্যই চাই। রোগচিকিৎসা বিদ্যা, কৃষিবিদ্যা, যন্ত্রবিদ্যা (ইঞ্জিনীয়ারিং), ভূবিদ্যা প্রভৃতির অতিরিক্ত যাহার প্রয়োজন বোধ হইতেছে কেবল তাহা এখানে পরিকল্পিত হইল।

শিক্ষা-পরিপাটি।

এখানে শিক্ষা-পরিপাটির স্থূল আভাস দেওয়া যাইতেছে।

আদ্য শিক্ষা প্রথম।

সকালী পাঠশালা। ৭টা—১০টা। বয়স ৬—৯ বৎসর। চারি বৎসর নয়াভ্যাস, ক্রীড়া-ব্যায়াম, শয়শিক্ষা, চিত্রলিখন। বাঙ্গলা ভাষায়

পাঠ,—নিজজ্ঞান, দেশজ্ঞান, সামান্য গণিত (টাকা আনা পয়সা, মণ সের ছটাক তোলা) কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কথামালা। (আদ্য শিক্ষার কোন পাঠ্যপুস্তকে ক্রিয়াপদের মৌখিক রূপ থাকিবে না। মধ্য শিক্ষাতেও এই বিধি পালন কর্তব্য। আমার প্রবর্তিত যুক্তাক্ষর শিখাইলে শিশু তিন মাসে সোজা সোজা শব্দ লিখিতে ও পড়িতে পারে। সে অক্ষরে বই ছাপাইতে হইবে।)

আদ্য শিক্ষা দ্বিতীয়।

বিকালী পাঠশালা। ২টা—৬টা। বয়স ১০—১২ বৎসর। এই বয়সের গ্রামের অসংখ্য বালক বালিকা পাঠশালায় আসিতে পারিবে না। বলপ্রয়োগ কর্তব্য হইবে না। বিশেষতঃ বালিকাদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ ও বিচ্ছিন্ন হইবেই হইবে। যাহারা স্বেচ্ছায় পাঠশালায় আসিবে তাহাদের লইয়া তুষ্ট থাকিতে হইবে। নগরে বালক ও বালিকাদের বিকালী পাঠশালা পৃথক হইবে। শিক্ষণীয়—নয়াভ্যাস, ক্রীড়া-ব্যায়াম, শয়শিক্ষা চিত্র-লিখন। নিজজ্ঞান, দেহজ্ঞান, স্বদেশ বৃত্তান্ত, প্রাণী বৃত্তান্ত, বৃক্ষ বৃত্তান্ত। ক্ষেত্রমিতি, শুভঙ্করী, ত্রৈরাশিক। বালক-বালিকারা সংবাদপত্র পড়িতে ও বুঝিতে পারিবে। বালকদের ক্ষেত্রমিতি, বালিকাদের সোজা সেলাই।

সান্ধ্য পাঠশালা।

গ্রাম ও নগরে যেসকল বালক ও যুবক পাঠশালায় আসিতে পারিবে না, তাহারা সন্ধ্যা ৭টা—৯টা প্রত্যহ দুই ঘণ্টা অভ্যাস করিলে দশপনর দিনে আমার প্রবর্তিত অক্ষর যোজনা দ্বারা বাঙগলা শব্দ লিখিতে ও পড়িতে পারিবে। সে অক্ষরে বই ছাপাইতে হইবে, পরে এক মাসের মধ্যে প্রচলিত ছাপার অক্ষর পড়িতে পারিবে। প্রথমে অক্ষর লেখা, পরে পড়া, পরে গণা। পাঠ্যপুস্তকে ধর্মের প্রশংসা, হিতোপদেশ, সাধুচরিত, দণ্ডনীতি, দেশবৃত্তান্ত, স্বাস্থ্যরক্ষার নিমিত্ত দেহের, গৃহের ও গ্রামের শৌচরক্ষা, ইত্যাদি বিষয় জানিবে। শিক্ষার্থী অনুসারে চিত্রলিখন ও বৃত্তির মূল সূত্র ধরিয়া শিক্ষা দিতে হইবে। একটা উদাহরণ দিতেছি। দেশে শিক্ষিত রাজমিস্ত্রীর অভাব আছে। বাঁকুড়ায় বাউরী ও অন্য জাতি রাজমিস্ত্রির কাজ করে। কিন্তু তাহারা নিজে দেখিয়া যাহা শিখিতে পারে, কেহ শিখায় না। তাহারা

শিক্ষার্থী হইলে ইটের দৈর্ঘ্য প্রস্থ বেধ মাপ, ঘনইঞ্চ, ঘনফুট গণনা করা, ইটের বিভিন্ন গাঁথনি, খিলান, চিত্রলিখন দ্বারা গৃহের স্থান আকার উচ্চতা নির্দেশ ইত্যাদি, ইটের মাটি, মাটির দোষ গুণ, পোড়াইবার বিধি, পাঁজা নির্মাণ, পাঁজার ঘন মাপ দ্বারা সংখ্যা, সুরকি, বালি, পাথুরে চূণ, ঘষিমের চূণ, সিমেণ্ট ইত্যাদি বিষয়ক ছোট বই লিখিতে হইবে। তাহারা পড়িবে। বুদ্ধিমান হইলে এক বৎসরে শিক্ষিত হইতে পারিবে। কেন শিখিতে আসিবে?—শিখিয়া অর্থ আনিতে পারিবে, মান হইবে, রামায়ণ পড়িতে পারিবে। তথাপি প্রথম প্রথম জনকয়েককে মাসে মাসে কিছু জলপানি দিতে হইবে।

মধ্যশিক্ষা।

বয়স ১৩—১৫ বৎসর। তিন বৎসর। ১০৷৷টা--৪টা সময়। কেহ বিদ্যালয়ে, কেহ শিক্ষালয়ে আসিবে। বালক বালিকার পৃথক। বর্তমান উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে মাতৃকা পরীক্ষার নিমিত্ত পাঠ্যের আড়ম্বর কমাইতে হইবে। তখন বিদ্যালয়ে ও শিক্ষালয়ে বালক ও বালিকাদের শিক্ষণীয়—রণাভ্যাস (drill), ব্যায়াম, চিত্রলিখন। পাঠ্য-পুস্তকে ২৫০ পৃষ্ঠা থাকিবে। ঈশ্বর-ভক্তি, সত্য, অহিংসা, দয়া, পরোপকারিতা, সংহতি, শৌর্য, সদাচার, দিনচর্যা, ঋতুচর্যা। পদ্য ৫০ পৃষ্ঠা। ব্যাকরণ ৫০ পৃষ্ঠা। সংস্কৃত ভাষা, চাণক্য শ্লোক ২০টি। হিতোপদেশ শ্লোক ২০টি। ভারতের ও বঙ্গের ইতিহাস; ইংলণ্ডের বর্তমান্ রাজ্যশাসন (১৫০ পৃষ্ঠা)। ভূগোল বৃত্তান্ত (৫০ পৃষ্ঠা)। দেশজ্ঞান—মাটির স্থূল উপাদান; পাথর, কর্মশিলা ও অকর্মশিলা, পাথরিয়া কয়লা, কেরোসিন, ধাতু। জল, বায়ু, বাষ্প, নদী, কূপ, পুষ্করিণী ও বৃষ্টিজলের উৎপত্তি। তাপ ও উষ্মা, তাপের পরিচালন, আলোক পরাবর্তন। দিক্‌নির্ণয়। ধ্রুব-মৎস্য, সপ্তর্ষি, কালপুরুষ, অগস্ত্য। পৃথিবীর দৈনিক গতি। উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ন, শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা। প্রাণীবৃত্তান্ত—প্রাণীর প্রধান বিভাগ, চারিটি প্রাণীর বৃত্তান্ত। উদ্ভিদ বৃত্তান্ত—উদ্ভিদের প্রধান বিভাগ, চারিটি উদ্ভিদের বৃত্তান্ত। বস্ত্রের চতুর্বিধ উৎপত্তি (২৫০ পৃঃ)।

বালিকা বিদ্যালয়ে—গৃহস্থালী। চরকার প্রয়োজনীয়তা, কার্পাস তুলার পাইট, চরকায় সুতাকাটা, সেলাই। বালক শিক্ষালয়ে—

জ্যামিতি প্রয়োগ, যন্ত্র প্রয়োগ, কাষ্ঠকর্ম। অথবা বালক বালিকার শিক্ষালয়ে উদ্যান কর্ম, বীজ বপন হইতে বীজ উৎপাদন।

অন্ত্যশিক্ষা।

বয়স ১৬—১৮ বৎসর। তিন বৎসরে বি-এস-সি তুল্য জ্ঞানলাভ অভিপ্রেত। শিক্ষণীয় বিষয়—রণাভ্যাস, ব্যায়াম। বাঙ্গলা সাহিত্য, ভারত রাষ্ট্র রচনা (constitution), বঙ্গরাজ্য রচনা, আইনের মূল সূত্র, তর্ক বিদ্যা। বালকদের ইংরেজী ভাষা, মূর্ত বিজ্ঞান (applied science and mechanics)। বালিকাদের গৃহস্থালীর প্রত্যেক কর্মের হেতু ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা, আয়ুর্বেদ হইতে দ্রব্যগুণ, মুষ্টিযোগ, রোগীর সেবা।

অধিশিক্ষা।

বয়স ১৯ বৎসর হইতে। অন্ত্য শিক্ষায় যুবক যন্ত্র প্রয়োগের জ্ঞান পাইয়াছে। এখন কলা ধরিয়া সে জ্ঞান কার্যকারী করিতে হইবে। কলা ও দ্রব্য নির্মাণ (manufacture) অসংখ্য, কিন্তু অধিকাংশ কলায় যন্ত্র-প্রয়োগ আবশ্যক। কলা শব্দ হইতে কল শব্দ আসিয়াছে। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের নিমিত্ত ছাত্র সুপ্রতিষ্ঠিত কলাশালায় ও কারখানায় শিক্ষার্থী হইবে। কেহ যান্ত্রিক (Mechanical Engineer), কেহ তাড়িত যান্ত্রিক (Electrical Engineer) হইবে। অধিশিক্ষালয়ে গবেষণা চালাইতে হইবে। যেমন—গ্রামে পুষ্করিণী দেশী পানা ও বিলাতী পানায় আচ্ছাদিত হইয়াছে। তদ্দ্বারা কাগজ হইতে পারে না কি? গ্রামে নূতন কোন্ কলা চলিতে পারে? অধিশিক্ষালয়ে এইরূপ প্রশ্ন উঠিবে। ছাত্র নূতন নূতন দিক দেখিতে পাইবে।

দ্বিতীয় খণ্ড

দেশে জ্ঞান-প্রচার

(Mass Education)

দেশ-সম্বন্ধে কয়েকটা কথা কয়েক বৎসর সর্বদা শোনা যাইতেছে। কেহ বলিতেছেন, আমরা রোগে জর্জরিত হইতেছি; কেহ বলিতেছেন, দারিদ্র্যে নিষ্পীড়িত হইতেছি; এবং কদাচিৎ কেহ বা ধর্মের গ্লানি দেখিয়া সন্তপ্ত হইতেছি। কথাগুলা আদি কালের; কেবল এদেশে নয়, সব দেশের সবাই দীর্ঘায়ু হইতে চায় ধনশালী হইতে চায়, এবং কখন-কখনও বস্তুতঃ ধার্মিকও হইতে চায়। ধন নইলে জীবনরক্ষা হয় না, জীবন নইলে ধর্মও থাকে না। অতএব আদি যে ধন, তাহার উপায়-চিন্তা চলিতেছে। এদেশের এক নীতি-কার ধনার্জনের চারি উপায় নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন,—বাণিজ্য, কৃষি, রাজসেবা ও ভিক্ষা। তিনি কলাকে বাণিজ্যের অন্তর্গত করিয়াছেন। ভিক্ষা অনিশ্চিত ও নিন্দিত, রাজসেবা বা চাকরি দুর্লভ; অতএব ধনের পথ তিনটি, কৃষি, কলা ও বাণিজ্য। ধন, প্রাণ, ধর্ম, এই তিন লাভের এক উপায় নির্দিষ্ট হইয়াছে। সে উপায় শিক্ষা। অতএব গোড়ায় শিক্ষা আসিয়া পড়িতেছে। এই সকল কথা পূর্বে এক ক্ষেত্রে কলেজের তর্কসভার বিচারের মতন করিয়া বলা গিয়াছে। চিত্ত জাগাইবার উদ্দেশ্যে তেমন করিয়া প্রত্যেক মতের যৎসামান্য সমালোচনাও করা গিয়াছে।

সমালোচনার প্রয়োজন আছে; কিন্তু দোষ দেখাইলেই শ্রেয় পথ আবিষ্কৃত হয় না। এটা না, সেটা না; এটায় এই দোষ, সেটায় সেই দোষ; ইত্যাদি বলিয়া দিলে উপকার হয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু আদেশ না করিয়া কেবল নিষেধ করিলে উপদেশ-পালন দুষ্কর হয়, পা বাড়াইতে শঙ্কা হয়।

রাজা উদাসীন থাকিতে পারেন না। তিনি নানা উপায় দেখিতেছেন। স্বাস্থ্য-বিভাগ, কৃষি-বিভাগ, কলা-বিভাগ, শিক্ষা-বিভাগ প্রভৃতি নানা বিভাগে নানা লোক নিযুক্ত করিয়াছেন। অধ্যক্ষেরা পাঠ-শালায় গোড়াপত্তন করিতে বলিতেছেন। স্বাস্থ্যাধ্যক্ষ পাঠশালায়

স্বাস্থ্যরক্ষার বই ধরাইতেছেন; কৃষি-অধ্যক্ষ কৃষিতত্ত্ব শিখাইতে বলিতেছেন; শিক্ষাধ্যক্ষ nature study, moral training, manual training দিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। তথাপি আমরা রোগা ছেলের মতন খুঁৎ-খুঁৎ করিতেছি; বলিতেছি, এ কি শিক্ষা, কতজনের বা শিক্ষা হইতেছে।

কিন্তু কি শিক্ষা চাই, এবং কেমন করিয়া সে শিক্ষা হইতে পারে, হইলে কি লাভ হইবে, তাহা বলিতে পারি কি না, সন্দেহ। সমাজ ছাড়িয়া ত শিক্ষা নয়; সমাজের হিতার্থেই শিক্ষা। সে সমাজ ইয়ুরোপের আদর্শে গড়িতে হইলে শিক্ষার যে পথ ধরিতে হইবে, তাহা স্পষ্ট দেখিতেছি। ভারতের আদর্শে গড়িতে হইলে পথ দেখিতে পাই না। সে আদর্শ ভাঙ্গনের মুখে পড়িয়াছে; কোথায় কি আকারে কতখানি থাকিবে, তাহা ভাবিয়া পাই না। আমরা ভারতের খানিকটা চাই, ইয়ুরোপেরও খানিকটা চাই। এই দুই জুড়িয়া এক করিতে পারা, এক চতুরস্র-শোভী সৌধ গড়িতে পারা, এক বিশ্বকর্মা ছাড়া কাহারও কর্ম নয়।

তথাপি একটা মোটা আদরা (model) আঁকায় দোষ নাই। শিক্ষা দ্বারা জ্ঞানলাভ হয়; জ্ঞানই কাম্য, শিক্ষা উপায়। সে জ্ঞান, দেখিয়া, শুনিয়া, বই পড়িয়া, জন্মিতে পারে। আমরা বই পড়িয়া জ্ঞান-লাভের দিকে অধিক হেলিয়া পড়িয়াছি। 'শিক্ষা' আর 'শেখা' একই কথা। কিন্তু 'শিক্ষা' বলিলে 'ক খ' কিংবা 'এ বি' লিখিতে ও পড়িতে শেখা মনে করি কেন? education=শিক্ষা, ঠিক। কিন্তু education=পাণ্ডিত্য, মনে করি কেন? আমরা যাহাঁকে educated বলি, তিনি বিদ্বান্, ইংরেজী লেখা-পড়া কর্মে শিক্ষিত (trained)। কিন্তু হাজার হাজার নরনারী আছে, যাহারা 'এ বি' দূরে থাক, 'ক খ'ও লিখিতে ও পড়িতে পারে না। তাহারা সবাই অ-শিক্ষিত (uneducated) বলিতে পারা যায় কি? শিক্ষা উত্তম না হউক, আমাদের মনের মতন না হউক, কিছু শিক্ষা পাইয়াছে, প্রায়ই প্রত্যক্ষ করিয়া পাইয়াছে, এবং পাইয়াছে বলিয়াই সংসার চলিতেছে। দেশের শতকে ৮৫ জন লিখিতে ও পড়িতে জানে না। কিন্তু ইহাও সত্য, লেখা-পড়া জানা ১৫ জন দ্বারা দেশ চলিতেছে না। সে ৮৫ জন আরও শিক্ষিত হইলে দেশ ভাল চলিত। অতএব তাহারা যে শিক্ষা পাইয়াছে, কিংবা পাইয়া থাকে, তাহার উপরে ভিত্তি

তুলিতে হইবে। গোড়ার এই কথা, শিক্ষা শব্দের অর্থ গোলে হরিবোল দিয়া ঢাকিয়া না ফেলিয়া দেশকে ধরিয়া, জ্ঞানপ্রচার করিতে হইবে।

যে কাজ যে করিতে চায়, তাহাকে সে কাজের যোগ্য করা শিক্ষা-দান বা শেখাবার উদ্দেশ্য। পাঠশালায়, কিংবা বংগ-বিদ্যালয়ে, কিংবা ইংরেজী ইস্কুলে, ছেলেরা যে শিক্ষা পাইতেছে, তাহাতে লেখা-পড়ার চাকরি করিবার যোগ্যতা হইতেছে। এই চাকরিতে মান আছে, টাকা আছে, অথচ আয়ের ক্ষতির আশংকা নাই। কতক লোককে চাকরি করিতে হইবেই। তাহারা করিতে ইচ্ছুক না থাকিলে ভুলাইয়া করাইতে হইবে। অতএব দুইটা বল আমাদিগকে চাকরির দিকে টানিতেছে। একটা টান, অপরটা ঠেল।* এমন দুই বল ঠেলিয়া দিয়া অন্য পথে চলা, লক্ষে একজন পারে কিনা সন্দেহ। কে পারে? যাহার আত্মপ্রত্যয় কিংবা ধর্মে মতি হইয়াছে, সে পারে।

---

* ইংলণ্ডেও নাকি এই অবস্থা। সে দেশেও পণ্ডিত ও কেরাণী করিবার যোগ্য শিক্ষা প্রচলিত ছিল। ইয়ুরোপের প্রথম মহাযুদ্ধের পর 'গোড়া দেখ' ডাক পড়িয়াছে। যুদ্ধে প্রত্যহ ৯ কোটি টাকা খরচের দিনেও শিক্ষার নিমিত্ত অতিরিক্ত ৬ কোটি বরাদ্দ হইয়াছে। ছিল ৩০ কোটি, এখন হইয়াছে ৩৬ কোটি। শিক্ষার গতিক ভাল নয়, একথা যুদ্ধের পূর্বেও শোনা যাইতেছিল। এ বিষয়ে কয়েকটা মত A Policy of Rural Education. By S. H. Fremantle C.I.E. Printed at the Pioneer Press, Allahabad, 1915. এই পুস্তিকা হইতে উদ্ধার করিতেছি। Sir John Gorst said in 1911: "We are spending millions...on what is called education; ...the greater part of this money is, under the present system, wasted and might as well, so far as education is concerned, be thrown into the sea." Mr. E. Holmes, the Chief Inspector of Elementary Schools, does not stop at declaring the education to be useless: he declares that it is positively harmful. Another witness, Alexander Paterson, says: "At our elementary schools we seem to aim at producing a nation of clerks, for it is only to a clerk that the perfection of writing and spelling attained is a necessary training." The poor Law Commissioners say, "Our expensive Elementary Education System (costing £20,000,000 annually) is having no effect on poverty; it is not developing self-reliance or forethought in the characters of the children and is in fact persuading them to be clerks rather than artisans."

এখানে এ বিষয় সম্যক্ আলোচনার স্থান হইবে না। তবে দেখা যায়, পাঠশালা হইতে কলেজ পর্যন্ত যে শিক্ষা হয়, তাহা প্রায়ই দেশ-ছাড়া শিক্ষা; যেন আমরা বিদেশী, দিন কয়েকের তরে প্রবাসে আসিয়াছি। ঘরে কি আছে, কি হইতেছে; বাড়ীর পাশে কি আছে, কি হইতেছে; এই জ্ঞান জন্মিলে আত্মপ্রত্যয় জন্মিতে পারিত। পাঠ্য-বিষয়ের মধ্যে এক ভূগোল আছে, যাহা হইতে দেশ-জ্ঞান কিছু জন্মিতে পারিত। কিন্তু 'ভূগোল'-সংজ্ঞা সঙ্কীর্ণ করা হইয়াছে, পঠনও অনাদৃত রহিয়াছে। ইস্কুলে অনাদৃত, কলেজেও অনাদৃত। কলেজে কলেজে বিজ্ঞান শিখাইবার আয়োজন হইয়াছে, কিন্তু অমূর্ত (theoretical) বিজ্ঞান,—যাহার সহিত দেশ-কাল-পাত্রের সম্বন্ধ নাই, যাহা এদেশে না শিখাইয়া অন্য দ্বীপে শিখাইলেও চলিত। নানা-কারণে রাজা ধর্মশিক্ষার ভার লইতে পারেন নাই। সে ভার, আমাদের উপরেই আছে। কিন্তু আমরা উদাসীন। রাজার উপর সব ভার দিয়া এমন জড়ভরত হইয়া পড়িয়াছি যে, আমাদের নিজেদের কর্তব্য ভুলিয়া গিয়াছি। তিনি আমাদের সমাজ-বিধিতেও হাত দিতে পারেন না, অথচ সমাজই প্রধান শিক্ষা-ক্ষেত্র। বুদ্ধি মার্জিত হইলে কি হইবে; সমাজ যে বুদ্ধি-প্রয়োগের ক্ষেত্র। অতএব বর্তমান দেশ-কাল-পাত্র-নিরপেক্ষ জ্ঞান দ্বারা পাণ্ডিত্য জন্মিতেছে, নাস্তিক্য প্রসারিত হইতেছে, সন্তোষ অদৃশ্য হইতেছে, সুখে শান্তিতে সংসারযাত্রা-নির্বাহের সামর্থ্য হ্রাস হইতেছে। জনসাধারণের অর্থ চাই, বলাই বাহুল্য। কিন্তু ধর্মও চাই। ইহাই আমাদের শিক্ষার নীতি। ধর্ম, অর্থ, কাম,—এই তিনের লাভ আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য, আমাদের পুরুষার্থ। কিন্তু ত্রিবর্গের প্রথমে ধর্ম। কারণ ধর্মব্যতিরিক্ত অর্থ, অকল্যাণের হেতু; ধর্মব্যতিরিক্ত কাম, স্বেচ্ছাচারী করে; আর, ধর্মব্যতিরিক্ত শিক্ষা দ্বারা পাঁজির ব্যতিপাত-যোগের সম্ভাবনা। যোগের অশুভ ফল ঘটিতেও আরম্ভ হইয়াছে। এখন সাবধান না হইলে, গন্তব্য উত্তমরূপে স্থির না করিলে, ধর্মকে কর্ণধার না করিলে, কখন্ কোন্ আবর্ত-কূপের টানে পড়িয়া অতল-গর্ভে নিমজ্জিত হইব, কে জানে। কালস্রোত রোধের সাধ্য নাই; কিন্তু স্রোত ধরিয়া গন্তব্যেও উপস্থিত হইতে পারি।

এই ভূমিকার পর শিক্ষার কয়েকটা সূত্র অন্বেষণ করি। কথোপকথনক্রমে বলিলে, বোধ হয়, কথাটা স্পষ্ট হইবে। অতএব গণেশ ও প্রমথ, দুই জন কি বলে, শুনি।

প্রমথ॥ দেশে যে নানা অভাব। প্রথমে কোন্ অভাব দূর করা উচিত।

গণেশ॥ এই যে অভাব-বোধ, এই বোধ জন্মানা প্রথম কর্তব্য। তুমি আমি কাগজে কলমে বোধ করিলেই, অভাব দূর করিতে পারিবে না। যাহারা দেশ, তাহারা অভাব বোধ করে কি?

প্রমথ॥ অভাব বোধ করে না? এই গ্রীষ্মকাল পড়িয়াছে, অমনই খাবার জলের অভাবে লোকে কি করিবে খুঁজিয়া পাইতেছে না।

গণেশ॥ কষ্টবোধ-টা বাস্তবিক কি? বাস্তবিক হইলে কষ্ট দূর করিতে পারিত না কি? কষ্টে পড়িলে লোকে মন্ত্রণা করে, মন্ত্রণা হইতে কর্ম আসে। কিসে কি হয়, লোকে জানে না। এই জ্ঞান দেওয়াই প্রথম কর্তব্য।

প্রমথ॥ তাহা হইলে ত গ্রামে-গ্রামে পাঠশালা বসাইতে হয়।

গণেশ॥ পাঠশালায় পাঠ পড়াইয়া যে জ্ঞান জন্মাইবে, সেটা কেতাবী জ্ঞান। শোনাইয়া, দেখাইয়া জ্ঞান জন্মাও। সে জ্ঞান হইতে প্রয়োগ (application) আসিবে এবং প্রয়োগ হইতে আত্মবত্তা (self-reliance) আসিবে।

প্রমথ॥ কিসের জ্ঞান? কি জ্ঞান?

গণেশ॥ নিজ-জ্ঞান ও দেশ-জ্ঞান। নিজ-জ্ঞান দুই ভাগ করিতে পার; দেহ-জ্ঞান ও আত্ম-জ্ঞান। আমরা আছি,—এই কথা বলিলে বুঝি আমাদের দেহ আছে, আর সুখ-দুঃখ ভোক্তা আত্মা আছে। কি করিলে দেহের কি হয়, এক কথায় দেহের স্বাস্থ্যরক্ষার জ্ঞান চাই। সঙ্গে সঙ্গে আত্মার স্বাস্থ্যরক্ষার জ্ঞানও চাই। দেহ রক্ষিত, কিন্তু অসুখী, এমন লোক প্রত্যহ দেখিতেছ। আত্ম-জ্ঞান, একটা বৃহৎ কথা। সেটা না বলিয়া ধর্মজ্ঞান বলিতে পার। এখানে ধর্ম সদাচার (right conduct)। দেহজ্ঞান ও ধর্মজ্ঞান পৃথক করিতে পারা যায় না। একারণ আয়ুর্বেদে ও ধর্মশাস্ত্রে দুইই একত্র বর্ণিত হইয়াছে। আমাদের ধর্ম শব্দে ইংরেজী religion বুঝিবে না। একবার, একবার কেন, ইংরেজী ১৯০১ সনের লোকসংখ্যান-সময়ে সংখ্যাকারী এক পাড়ায় গিয়া একজনকে জিজ্ঞাসা করিতেছিল, "তোমার ধর্ম কি?" আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। যাহাকে প্রশ্ন হইল, সে উত্তর করিতে পারিল না; এক বৃদ্ধকে ডাকিয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ গা, আমার ধর্ম কি?" বৃদ্ধ মাথা চুলকাইয়া খানিক ভাবিয়া বলিল, "তোমার ধর্ম তোমার।" সংখ্যাকারী ফাঁপরে

পড়িয়া গেল। কারণ, ফার্মের কাগজে ধর্ম শব্দের নীচে 'তোমার' লিখিবার আদেশ ছিল না। বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার ধর্ম কি?" "আমার ধর্ম আমার, একথা আবার কি জিজ্ঞাসিতেছ?" তখন সংখ্যাকারীও অধীর হইয়া পড়িয়াছে; জিজ্ঞাসিল, "তুমি হিন্দু, না মুসলমান?" বৃদ্ধও অধীর হইয়া বলিল, "তাই বল না! আর, আমি যে হিন্দু, তা আমার গলায় মালা দেখিয়া বুঝিতে পারিতেছ না?" উত্তর-প্রত্যুত্তর শুনিয়া আমি হাসিলাম বটে, কিন্তু বুঝিলাম, বৃদ্ধই ঠিক। যখন লোকে রাগিয়া বলে, 'তোমার ধর্মে যা আছে কর', তখন বলে না বেদে কোরাণে কি বাইবেলে যা আছে। এখানে ধর্ম sense of justice। নিজজ্ঞান দিতে গেলেই দেশজ্ঞান দিতে হইবে। আমি আছি, কোনও দেশে আছি, কোনও কালে আছি। সে দেশ কেমন, সে কাল কেমন, তাহা না জানিলে নিজকে রক্ষা করা অসম্ভব। দেশ বলিতে কেবল মাটি নহে; আমাকে বেড়িয়া যা কিছু আছে, সব। মাটি জল বায়ু অন্তরীক্ষ, গাছপালা জীবজন্তু, মানুষ প্রভৃতি যাহাদের মাঝে আছি, সেটা আমার 'দেশ'। ইংরেজীতে environment। কিন্তু আমার 'দেশ' দশ বছর আগে যেমন ছিল, আজি তেমন নাই; কালি যেমন ছিল, আজি তেমন নাই; আমি যেমন ছিলাম, এখন আমিও তেমন নাই। এই যে অবিরাম পরিবর্তন-স্রোত, সেটা 'কাল'। লোকে বলে, 'সে কাল আর নাই'। নাইই ত; যে ঘটনা-পরম্পরা ছিল, তাহা এখন নাই, থাকিতে পারে না। অতএব যদি আমাকে সুস্থদেহে সুস্থচিত্তে থাকিতে হয়, তাহা হইলে আমাকে দেশ জানিতে হইবে, কালও জানিতে হইবে। আমি আছি; আমার থাকা যাহাদের উপর নির্ভর করিতেছে, তাহাদের 'দেশ' বলিতেছি। ইহার মধ্যে 'কাল'ও আনিতেছি। 'দেশ' আমার ধর্মের অনুকূল কি প্রতিকূল, দেশের 'ধর্ম' কি, এই জ্ঞান দেশ-জ্ঞান। ভূগোল ও ইতিহাস, এই জ্ঞান দিতে রচিত হয়। দেখিতে গেলে ভূগোলেই ইতিহাস, সমাজনীতি, রাজনীতি, বাণিজ্য, ব্যবসায় (industry), বার্তা (occupation) প্রভৃতি আমার জীবন-ধারণের নিমিত্ত আবশ্যক দেশ-জ্ঞান, সব পাইবার কথা। অথচ পাঠশালা, কি উচ্চ বিদ্যালয়ে, এই দেশ-জ্ঞান অনাদৃত রহিয়াছে। রামায়ণ মহাভারত পুরাণ পাঠ, যাত্রাগান ও নিত্য নৈমিত্তিক পূজা পার্বণ দ্বারা ধর্মজ্ঞান কিছু জন্মিয়া থাকে; কিন্তু দেহ-জ্ঞান ও দেশ-জ্ঞান জন্মাইবার উপায় প্রচলিত নাই। যাহাঁরা কবিরাজ কি ডাক্তার, কেবল তাহাঁরাই দেহ-জ্ঞান

লাভ করেন। অথচ সকলেরই কিছু না কিছু পাওয়া আবশ্যক। যাহাঁরা "শিক্ষিত" তাহাঁদেরও সকলের দেশ-জ্ঞান নাই।

প্রমথ॥ তবেই ত পাঠশালা চাই।

গণেশ॥ পাঠশালা নিশ্চয়ই চাই। কিন্তু পাঠশালা দ্বারা নিজ-জ্ঞান ও দেশ-জ্ঞান দেশময় ব্যাপ্ত করিতে বহুকাল লাগিবে। এখন বঙ্গদেশে ৩৬ হাজার পাঠশালা আছে। ৪৷৷০ কোটি লোকের ⁄১০ আনা যদি পাঠশালা যাইবার বালক ও বালিকা ধরা যায় এবং ৩০টির তরে একটা পাঠশালা দরকার হয়, তাহা হইলে ২ লক্ষের উপর পাঠশালা চাই। কেবল বালকদিগের নিমিত্ত ১ লক্ষ পাঠশালা বসাইতেও ত বহুকাল যাইবে। তা ছাড়া, আর যে বার-তের আনা, যাহারা পাঠ-শালার মুখ দেখে নাই, তাহারা ত ছেলে সাজিয়া পাঠশালায় আসিতে পারিবে না।

প্রমথ॥ পাঠশালায় আসিতে পারিলেই বা কি ফল হইত?

গণেশ॥ বিশেষ কিছুই না। আসিতে পারিলে 'কখ" লিখিতে ও পড়িতে পারিত। কিন্তু যে অন্ন চায়, তাহাকে 'অন্ন' বানান করিতে শিখাইয়া বিদায় করা, উপহাস করার তুল্য। তা ছাড়া, পাঠশালা ছাড়ার পর লেখা-পড়ার অভ্যাস রাখিতে না পারিলে পাঠশালায় আসাই অকারণ। ইহাদের বোধগম্য করিয়া বই লিখিতে হইবে, ইহাদের অর্থ-গম্য করিয়া বেচিতে হইবে। এমন একখানাও বই দেখি না, যাহা স্বল্পাক্ষর পড়িতে পারে, পড়িয়া নিজ-জ্ঞান ও দেশ-জ্ঞান লাভ করিতে পারে। রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি যাহা আছে, তাহা আপনা-আপনি আছে, কেহ ভাবিয়া চিন্তিয়া ইহাদের হিতার্থে ছাপায় নাই। দামও বেশী; এক আনা দুই আনায় পাওয়া যায় না।

প্রমথ॥ তাহা হইলে উপায়?

গণেশ॥ ছেলে হইতে বুড়া পর্যন্ত, সকলের শিক্ষার নিমিত্ত এক উপায় হইতে পারে না। আমরা এক উপায়, পাঠশালার দিকে তাকাইয়া বসিয়া আছি। মনে কর, যেন দেশের সব ছেলে-মেয়েকে পাঠশালায় টানিয়া আনা গেল। ইহারা মানুষ হইতে অন্ততঃ দশ-বার বৎসর লাগিবে। এই দশ-বার বৎসর কি চুপ করিয়া বসিয়া থাকা উচিত? "শিক্ষা-বিস্তার" বল, আর জ্ঞান-প্রচার বল, একটা স্রোত চালাইতে না পারিলে সে জল স্বাদু ও হিতকর হইবে না। নানা উপায়ে সে স্রোত রক্ষা করিতেই হইবে। ছেলে-মেয়েদের তরে পাঠশালা কর, স্বল্পাক্ষরের

তরে নানাবিধ কাজের বই লেখ, নিরক্ষরের তরে কথকতা কর। সকলের তরেই কথকতা চাই, প্রদর্শন চাই। শোনাইয়া, দেখাইয়া জ্ঞান-প্রচার সহজে হয়, শীঘ্র হয়। একথা পরে হইবে। প্রথমে পাঠশালা ধর। পঞ্চম বর্ষে হাতে খড়ী দিতে পার; কিন্তু জানিবে দশম বর্ষে পাঠশালা ছাড়িলে লেখা-পড়া-শেখা বৃথা হইবে, শেখা পাকা হইবে না, থাকিবে না। ১১।১২ বৎসব বয়স হইতে ১৪।১৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত যাহা শিখিবে, সেটা বরং থাকিবে। কিন্তু ১০।১২ বৎসর বয়স হইলেই পুত্র পিতার সঙ্গে কাজ করিতে শিখিতে আরম্ভ করে, কাজ করিবার কিছু জ্ঞানও জন্মে। এই বয়সে কন্যার বিবাহ আছে, ঘরকন্নার কাজ আছে। কন্যার শিক্ষা-সমস্যা ভারি কঠিন, বধূর শিক্ষা আরও কঠিন। সম্প্রতি ইহাদের ১০ বছর বয়সে পাঠশালার পাঠ সমাপ্ত মনে করিতে হইবে। কিন্তু পাঠশালা ছাড়িয়া বধূ হইয়াও যাহাতে লেখাপড়ার অভ্যাস থাকে, তাহার উপায় করিতে হইবে। ইহার এক উপায়, বধূ ও গৃহিণীর যোগ্য জ্ঞান-পূর্ণ বই লেখা ও সস্তায় বেচা।

প্রমথ। যত রাজ্যের গল্পের বই বধূরা পড়ে। গল্পের মতন গল্প হইলে বরং কিছু উপকার হইত। এমন গল্প, যাহা পড়িলে সংসার-ধর্মে অবসাদ, গৃহকর্মে ক্লান্তি আসে, এবং পরীর রাজ্যে স্বচ্ছন্দে উড়িয়া বেড়াইবার বাসনা জন্মে।

গণেশ॥ কেবল বধূদের দোষ দেওয়া কেন, যুবারাও গল্পের কুহক এড়াইতে পারে না। তাহারাই কিনিয়া দেয়। কতকটা বয়সের ধর্ম; আর কতকটা দেশের অভাগ্য, ভাল বই নাই। আরও অভাগ্য কেহ কেহ একটা ইংরেজী কথা, 'আর্ট' (art) নামের কুহকে মুগ্ধ হইয়াছেন; 'আর্ট'-জন্য মানুষ, কি মানুষ-জন্য 'আর্ট', বিচারে দিশা-হারা হইয়া পড়িতেছেন। উপরের জল নীচে গড়ায়, যাহা 'বড়'লোকে করে, তাহা 'ছোট'লোকও করিতে চায়। 'শিক্ষা' শব্দের অর্থ সঙ্কীর্ণ করিয়া, সমাজের শিক্ষা চাপা দিয়া রাখিয়াছি। শিক্ষার ক্ষেত্র পাঠশালা নয়, সমাজ। বুড়া বয়সে বিবাহ করিয়া, বিবাহ করিতে বর কিনিয়া, সমাজ নিজের বধূকে যে শিক্ষা দিতেছে, তাহা প্রত্যক্ষ। পাঁচখানা বই পড়াইয়া, দশটা কবিতা লেখাইয়া প্রত্যক্ষ শিক্ষার দোষ কাটাইতে পারা যায় না। এই কারণে পূর্বে বলিয়াছি, বধূ-শিক্ষা অতিশয় কঠিন।

প্রমথ॥ গ্রামের সব ছেলে পাঠশালায় আসিবে কি?

গণেশ॥ সব পাঠশালা এক রকম হইলে আসিবে না। ১০ বছর বয়স পর্যন্ত বালক-বালিকা, ধনী-দরিদ্র, গ্রাম ও নগরে সকলের শিক্ষা সমান হইবে। ইহাদের নিমিত্ত কেবল সকালে পাঠশালা বসিলে ভাল। ইহাদিগকে দুইবেলা পাঠ পড়ানার চেষ্টা না করাই ভাল। গ্রাম ছোট হইলে একটি; বড় হইলে পাড়ায় পাড়ায় পাঠশালা চাই, নতুবা সব ছেলে-মেয়ে পাইবে না, ১০।১২ জনের অধিক হইলে গুরুমশায়ও পড়াইতে পারিবেন না। এই সকালী পাঠশালার পড়া সাঙ্গ হইলে, কেহ বিকালী পাঠশালায় যাইবে, কেহ বা 'বঙ্গবিদ্যালয়ে' যাইবে। 'বঙ্গবিদ্যালয়ে' কি বিদ্যা শিখিবে, তাহা এখন ভাবিবার দরকার নাই। এখন জনশিক্ষার কথা হইতেছে। বিকালী পাঠশালা কেবল বিকালে বসিবে। এখানে ছেলেরা ১৪।১৫ বছর বয়স পর্যন্ত আসিতে পারিবে। সকালে ইহারা পিতার কাজ, কি ঘরে কাজ করিবে, বার্তা শিখিবে। বিকালী পাঠশালা দুই রকমের হইবে। যে গ্রামে সকালী পাঠশালায় ছেলেরা ১০।১১ বৎসর পর্যন্ত কিছু শিখিয়াছে তাহাদের পক্ষে যে পাঠ, যাহারা পাঠশালা মাড়ায় নাই তাহাদের পক্ষে সে পাঠ হইতে পারে না। দুই-তিন গ্রামের মধ্যে একটা বিকালী পাঠশালা থাকিলেই চলিবে। বিকালী পাঠশালায় বাঙ্গালা ভাষা, সাহিত্য নয় ভাষা, শিখিবে; আবশ্যক অঙ্ক দেশীয় রীতিতে শিখিবে; অক্ষর-লেখা ও চিত্র-লেখা শিখিবে। বই একখানি পাইবে; তাহা হইতে ভাষা, এবং নিজ-জ্ঞান ও দেশ-জ্ঞানের আভাস পাইবে। তাহাতে সূচনা থাকিবে, গুরুমশায় সেই সূচনা ধরিয়া মুখে-মুখে জ্ঞান জন্মাইতে চেষ্টা করিবেন। এক প্রহর সময়ের মধ্যে অধিক আশা করা যাইতে পারে না। মুখে-মুখে শিক্ষা না পাইলে সময়ে কুলাইবে না, জ্ঞানও পাকা হইবে না।

প্রমথ॥ এমন গুরুমশায় কোথায়?

গণেশ॥ ইহাই দারুণ চিন্তা। কিন্তু দারুণ ভাবিয়া নিশ্চেষ্ট হইলেও চলিবে না। গুরুমশায় করিয়া লইতে হইবে। ইহাঁদের শিক্ষার নিমিত্ত বিদ্যালয় করিয়া সেখানে শিক্ষা দিয়া গ্রামে-গ্রামে পাঠশালা বসাইতে হইলে এক যুগ লাগিবে। যাহাঁরা সেখানে শিক্ষিত হইবেন, তাহাঁরা বরং পরিদর্শক হইতে পারিবেন। তাহাঁরা, এবং এখন যাহাঁরা পরিদর্শক আছেন তাহাঁরা, গুরুমশায়দিগকে গ্রামে গ্রামে শিখাইয়া বেড়াইতে পারিবেন। তাহাঁরা চারি-পাঁচ-খানা গ্রামের

গুরুমশায়কে এক পাঠশালায় আনাইয়া নিজেরা দুই তিন দিন গুরু-মশায়ি করিয়া দেখাইবেন। যে দেশ-জ্ঞান প্রচারের কথা বলিতেছি, সে সবের কথক ও প্রদর্শকের নিকট হইতেও গুরুমশায়েরা কিছু কিছু শিখিতে পারিবেন। পাঠশালার পরিবর্তে 'বিদ্যালয়', এবং গুরুমশায়ের পরিবর্তে 'পণ্ডিত মহাশয়' বলিও না। 'গুরু'-এতবড় মানের কাছে, 'পণ্ডিত' নাম ছোট। কিন্তু সব ছেলেকে এক ছাঁচে ঢালা ঠিক হইবে না। বিকালী পাঠশালায় নানা ছাঁচ রাখিতে হইবে। কেবল বাটী, কেবল ঘটী দিয়া ছোট সংসারও চলে না।

প্রমথ॥ তাহা হইলে ত খরচের অন্ত থাকিবে না।

গণেশ॥ তবে আর খরচ কিসে? তুমি দেশটাকে শিক্ষিত করিতে চাও, বার্তা ও কলায় ও ধর্মে শিক্ষিত করিতে চাও। পাঠ-শালায় দুই তিন ঘণ্টায় কিসের কতটুকু শিখাইতে পারিবে? যদি নানা বিষয়ের ছোট ছোট কিন্তু সুন্দর সুন্দর বই ছাপাইয়া গ্রামে গ্রামে ⁄০ দামে বেচিয়া বেড়াইতে পার তাহা হইলেও সে-সব বই পড়াইতে পারিবে না। পাঠশালা ছাড়িতে না ছাড়িতে দ্বিতীয় শিক্ষায় প্রবেশ করাইতে হইবে। এই শিক্ষা জ্ঞান-প্রচারের অন্তর্গত হইবে। জ্ঞান-লাভের নানা পথ আছে; একটা পথ বই পড়িয়া। কিন্তু এ পথ সকলের পক্ষে সোজা নয়; সে পথে চলা যাহাদের অভ্যাস নাই, তাহারা দুই পা যাইতে না যাইতে হাঁপাইয়া পড়ে। যাহারা বিকালী পাঠশালায় পড়িয়াছে, এবং যাহারা না পড়িয়াছে, সকলকেই এই পথে আনিতে হইবে। পথটা সুন্দর সুগম করিতে হইবে। সাধারণ লোক সদ্য ফলই বোঝে; কারণ অজ্ঞানের তিমিরে দূরে ঝাপসা ঠেকে।

প্রমথ॥ সে কাজ সোজা হইবে না। সদ্য সদ্য কি ফল দেখাইতে পারা যাইবে?

গণেশ॥ সোজা ত নহেই। সকলকেই অর্থ-ফল দেখাইতে হইবে না। এখন সে আর কুয়ার বেং নয়; পাশে বিপুল পৃথিবী আছে, যেখানে ইচ্ছা সেখানেই সে যাইতে পারে। এই যে আত্ম-শক্তি সেই শক্তি জাগাইতে পার। ইহার আদি আকাঙ্ক্ষা। আকাঙ্ক্ষা আপনি জাগে, যদি উদাহরণ দেখাইতে পার। এ নিমিত্ত,

(১) গ্রাম তোমার নিকট আসিবে না; তোমাকে গ্রামে যাইতে হইবে।

(২) গ্রামে গ্রামে জ্ঞান বিতরণ কর। বিতরণ নহে, দান ত নহেই, বিলাও। কোথাও কেহ শুনিবে মানিবে, কোথাও কেহ শুনিবে না, শুনিলেও মানিবে না। তুমি ধৈর্য ধরিয়া বিলাইতে থাক।

(৩) শুধু কান দিয়া শোনানা নহে, চোখে দেখাও। চোখ দিয়া দেখিলে, হাত দিয়া নাড়িলে যে জ্ঞান জন্মে, সেটাই পাকা।

প্রথম॥ দেখাইব কি?

গণেশ॥ দেশের কোথায় কি আছে, কিসে কি হইতেছে, কিংবা হইতে পারে, তাহা কোনও দ্রব্য হইলে বহিয়া লইয়া গিয়া দেখাইবে: তাহা না হইলে, কর্ম কিংবা গুণ হইলে, ছায়াচিত্র (magic lantern slides) দ্বারা বুঝাইবে। তাহার সাহায্যে জ্ঞানটা স্পষ্ট করিবে। দেহ-জ্ঞান বিলাইলে লোকে স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে জানিবে, আত্ম-জ্ঞান জন্মিলে মানুষ হইবে, আর দেশ-জ্ঞান পাইলে নির্বিঘ্নে জীবন ধারণ করিতে পারিবে। আমি যাহা তিনভাগে ভাগ করিয়াছি, প্রাচীনেরা তাহা চারিভাগ করিতেন। চাণক্য বলিতেন, বিদ্যা, যাহা জানিতে হইবে, চারিটি,—আন্বীক্ষিকী, ত্রয়ী, বার্তা ও দণ্ডনীতি। আন্বীক্ষিকী—অনু পশ্চাৎ ঈক্ষণ দর্শন, জগতের কার্যকারণ দর্শন (Logic); ত্রয়ী—তিন বেদ, যাহা হইতে ধর্মশাস্ত্রের উৎপত্তি; বার্তা—জীবিকা, যাহা করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারা যায়; দণ্ডনীতি—দেশের আইন। ইহার একটিও বাদ দিতে পারা যায় না। বিপদে ও অভ্যুদয়ে বুদ্ধিকে স্থির রাখিতে পারে, এক দর্শন। ধর্মশাস্ত্রে আচার ব্যবহার শেখায়। আচার দ্বারা দেহের ও মনের স্বাস্থ্য নিষ্পন্ন হয়; ব্যবহার দ্বারা সমাজে তিষ্ঠিতে পারা যায়। আমাদের সমাজে যে ব্যবহার আছে, অন্য সমাজে ঠিক সেরূপ নাই। যে ব্যবহার উত্তম বলিয়া সমাজে বিবেচিত হয়, তাহা ন্যায়। অতএব ধর্মশাস্ত্রে ধর্মাধর্ম, ন্যায়ান্যায় শেখায়।

প্রমথ॥ দেহ-জ্ঞান কই? সাধারণ লোককে দর্শন শিখাইতে হইবে?

গণেশ॥ ধর্মশব্দে religion (a system of faith and worship) মনে করিতেছ কেন? ধর্মশাস্ত্রে শারীরধর্ম-পালনের সূত্রও আছে। আয়ুর্বেদে দেহজ্ঞান ও আত্মজ্ঞান, দুইই আছে। দর্শনের নামে চমকাইলে কেন? জন্মান্তর ও কর্মফলে বিশ্বাস কোন্ হিন্দুর না আছে? যদি কাহারও না থাকে, সে জানে না। পূর্বজন্মের

ফলে এ জন্মে সুখ-দুঃখ ভোগ করি এবং এ জন্মের সুকর্ম ও দুষ্কর্মের ফল পরজন্মে ভোগ করিতেই হইবে। এই বিশ্বাসেই হিন্দু সমাজ টিঁকিয়া আছে। কর্মফলে বিশ্বাস করিতে গেলেই জন্মান্তরে বিশ্বাস করিতে হইবে। রামায়ণ মহাভারত পুরাণ, দেশের যাবতীয় ধর্মগ্রন্থে এই কথা পুনঃ-পুনঃ পাইবে।

প্রমথ॥ সে সব তো উপাখ্যান, গল্প।

গণেশ॥ গল্প বলিও না; শাস্ত্র না বল, ইতিহাস বল। ইতিহাস হইতে যদি দুরূহ দর্শন পর্যন্ত শিখিতে পার, যে দর্শন তর্কাতর্কি নয়, তোমার চরিত্রের মন্ত্রী হইবে, সে ত উত্তম ইতিহাস। তুমি ইস্কুলে ইস্কুলে moral training দিতে চাও; কিন্তু কি করিয়া training দিবে, ভাবিয়া পাইতেছ না। ইহার একটা কারণ, এই সব গ্রন্থ গল্পের বই মনে করিয়াছ; আর একটা কারণ, moral trainingএর বাঙ্গালা "নীতিশিক্ষা" করিয়াছ। সেকালের লোকে এবং একালেরও শতকে অন্ততঃ ৯২ জন moral training বা "নীতিশিক্ষা" বুঝিবে না। তাহারা ইহাকে ধর্মের অন্তর্গত করে। ধর্ম=religion মনে করিয়া অনেক অনর্থ হইতেছে। ধর্ম ও কর্মে ভেদ করিতে গিয়া নীতির অবলম্বন হারাইয়া ফেলিতেছ। এক আখ্যায়িকা শোন। অনেককাল হইল বর্ধমানের আদালতে এক বাঙ্গালা-শিক্ষিত ভদ্রলোক চাকরি করিতেন। বেতন অল্প। একদিন এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাহাঁর বাসায় আসিয়া কন্যাদায় জানাইলেন। শুনিবামাত্র তিনি দুইটি টাকা দান করিলেন। আমি আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসিলাম, "শুনিয়াছি আপনি আদালতে কাহাকেও ৵০ আনা পয়সাও ছাড়িয়া দেন না। আর এই ভিক্ষুক, ব্রাহ্মণ কি না কে জানে, কন্যাদায় কি না কে জানে, ইহাকে বিনাবিচারে দুই টাকা দিলেন; এ কি নীতি?" তিনি গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "সেখানে চাকরি, এখানে ত চাকরি নয়। ব্রাহ্মণ মিথ্যা বলিয়া থাকেন, তাহাঁর পাপ; তা বলিয়া আমি কন্যাদায়ে যথাসাধ্য দান না করিয়া থাকিতে পারি কি?" আর একটি শোন। এক মালী বৃদ্ধ হইয়াছিল, কথায় কথায় স্মরণ করিত, তিন-কুড়ি সাত বৎসর পার হইয়াছে, এখন প্রভুর ইচ্ছা। কাজ-আরম্ভে জগন্নাথ, মাঝে জগন্নাথ, শেষে জগন্নাথ, নাম উচ্চারণ করিত। পাড়ার শঠেরা তাহার ধর্মভাব দেখিয়া কখনও কলা, কখনও মূলা, কখনও শাগ, কখনও পাতা এমন লইত যে যাহাঁর বাগান তাহাঁর ভোগে আসিত না। মালী বলিত, লোকের দরকারে যদি কিছুই

করিতে না পারি, তাহা হইলে তিন-কুড়ি সাত বৎসর বাঁচিয়া ফল কি?

প্রমথ॥ এসব ভণ্ডামি, গোরু মেরে জুতা দান।

গণেশ॥ কিন্তু, বল ত, যাহাঁদিগের চরিত দেখিয়া গ্রাম্য জন নিজের চরিত সংশোধন করিবে, তাহাঁরা গোরু মেরে জুতা দান করিলে কোন্ নীতির প্রচার হইবে? duty honorary বলিয়া অবহেলা করা কোন্ নীতি? যেখানে সাক্ষাৎ ধর্ম, যাহার নাম ধর্মাধিকরণ, সেখানে কি না হইতেছে? পুত্রকন্যাকে, জনসাধারণকে অসত্যের মাঝে বসাইয়া বলিতেছে, "সদা সত্য কথা কহিবে!" শিক্ষা-কল কত টিপিবে? রামায়ণ-মহাভারত কত ছাপাইবে? মানুষ ধর্মাধর্ম-সংযুক্ত; এক কাজে ধার্মিক, অন্য কাজে অধার্মিক; তথাপি বাল্যকাল হইতে ধর্মের (right conduct, duty) দিকে, ধর্মকর্মের দিকে, মতি চালিত করিতে পারিলে ধর্মেকর্মে অভ্যাস জন্মাইতে পারিলে, ব্যবহারের সময় বিচার করিতে হইবে না। ধর্ম-উপদেশে যত না হউক, ধর্মআচরণে একটা সৎ অভ্যাস দাঁড়াইয়া যায়। পুত্রকন্যা প্রাতে মাতাপিতা, অপর গুরুজন ও ঠাকুর প্রণাম করিবে; তাহাঁরা আশীর্বাদ করিবেন। শুধু এইটুকুর অভ্যাস জন্মাইয়া দাও, দেখিবে ধর্মের পোত পড়িয়াছে।

প্রমথ॥ গুরুজনকে প্রণাম করিতে পারে, কারণ তাহাঁরা লালন-পালন করেন। কিন্তু ঠাকুর-পূজা করিবে?

গণেশ॥ এইখানে দেশী ও বিদেশী ধর্মের বিস্তীর্ণ প্রভেদ। মাতাপিতা লালন-পালন করেন, কিংবা ঠাকুর আশীর্বাদ করিবেন ভাবিয়া আমরা মাতাপিতা ও ঠাকুর-দেবতার পূজা করি না। আমাদের ধর্ম এই, আমরা পূজা করি। কেন এমন ধর্ম, সে অনেক কথা। সে কারণে আমরা গোকে ভগবতী জ্ঞান করি, ভূমিকে ধাত্রী মনে করি। সে কারণে কেহ সরস্বতী, কেহ লক্ষ্মী, কেহ দুর্গা, কেহ শিব, কেহ কৃষ্ণ, কেহ শালগ্রাম, কেহ বা বিশ্বকর্মার পূজা করি। মানুষের যে আশ্রয় ছিল, তাহা নষ্ট হইতেছে; হিংসা, অসত্য, অসূয়া, নৃশংসত্ব বৃদ্ধি পাইতেছে। যে নামই কর, একটা শরণ্য রাখ। এই শিক্ষা বাল্যকাল হইতে না দিলে পরে সংশয়ে জীবন কাটাইতে হইবে। তবে, যিনি কাল, যিনি শিব, যিনি শঙ্কর, যিনি যোগ (combination of events) দ্বারা জগতের ক্ষেম (well-being) সিদ্ধ করিতেছেন, তিনি

নিদ্রিত নাই। তাহাঁর কর্ম তিনি করিতেছেন। আমরা কর্মের সহিত ধর্মের এবং ধর্মের সহিত কর্মের যোগ ঘটাইতে চেষ্টা করি। পারিব কি না, তিনিই জানেন। "কেন এই কর্ম করিতেছ?"—উত্তর হইবে, কারণ ধর্মই বড়। "কেন এই ধর্ম করিতেছ?" কারণ কর্মই বড়। এখনও এদেশ ধর্মহীন হয় নাই। দেখ, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর সময় অন্য দেশে অধর্মের অত্যাচার যত হয়, এদেশে তত হয় না। বছরে বছরে যত বই ছাপা হয়, বোধ হয় তাহার চৌদ্দ আনা ধর্মগ্রন্থ। দেশ-কাল-পাত্র উপেক্ষা করিয়া যে শিক্ষাই দাও, সেটা কুশিক্ষা হইবে। আমাদের দেশের ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা কোন্ দেশে আছে? কোন্ গুণে এত ধৈর্য?

প্রমথ॥ ধৈর্য একটু কম হইলে ভাল ছিল। অনাবৃষ্টিতে মাঠের ধান শুখাইয়া যাইতেছে, পুকুরের জল খোলায় করিয়া সেঁচিতেছে! একটা কাঠ কুঁদিতে হইবে; একজন টানিবে, আর একজন থামিয়া থামিয়া কুঁদিবে! ধন্য ধৈর্য!

গণেশ॥ তুমি হইলে কি করিতে?

প্রমথ॥ কেন, 'পম্প' বসাইয়া হড়্-হড়্ করিয়া জল তুলিয়া পাঁচ দিনের কাজ একদিনে শেষ করিতাম। একটা 'লেদ' (lathe) দিয়া কাঠখানা একাই কুঁদিয়া ফেলিতাম। একটু উদ্যম (enterprise) থাকিলে কি না হইত।

গণেশ॥ তুমি 'পম্প' ও 'লেদ' দেখিয়াছ, তাহাদের নিন্দা করিতেছ। তাহারা কখনও দেখিয়াছে কি, কিংবা তাহাদের কিনিবার পয়সা আছে কি? দেখে নাই বলিয়াই ত দেখাইতে বলিতেছি। তুমি বিদ্যা শিখিয়াছ, দেশের লোককে একটু দান করিতে বলিতেছি। কিন্তু খোলায় করিয়া জল তুলিতে দেখিয়াও কি বলিতে পার উদ্যম নাই? কোন্ উদ্যমে শুখ্‌না মাটিতে ধার-করা ধান বুনিয়া দেয়, কোন উদ্যমে ক্ষেতে গিয়া রোদে বর্ষায় দিনের পর দিন খাটে? এত দেখিয়াও বল, উদ্যম নাই? তোমার উদ্যমে অনিশ্চয় অল্প; আটঘাট ভাবিয়া উদ্যম। আর ইহাদের উদ্যমে সবই অনিশ্চয়! বর্ষা, যথাসময়ে বর্ষা হইতে পারে, নাও হইতে পারে; ঝড় হইতে পারে, পোকা লাগিতে পারে। এত অনিশ্চয়ের মধ্যে যে বুক বাঁধিয়া কাজ করে, তাহাকে উদ্যম-হীন বলিতে পার কি?

প্রমথ॥ এমন উদ্যম আছে। কিন্তু পুরাতনকে এমন ধরিয়াছে যে,

নূতনের নামে শিহরিয়া উঠে। নূতন কিছু করিতে বলা যাক, অমনই পিছাইয়া পড়িবে।

গণেশ॥ পুরাতন নিশ্চিত, নূতন যে সব অনিশ্চিত। নূতন লইয়া তুমি খেলা করিতে পার; তোমার কিছুই আসে যায় না। তাহারা খেলা করিতে পারে কি? যে ধানের আশায়, তাহার একার নহে, তাহার স্ত্রী-পুত্র-কন্যার প্রাণ নির্ভর করিতেছে, সে ধান লইয়া সে খেলা করিতে পারে কি? তুমি বলিতেছ, জমিতে হাড়-গুঁড়া ছড়াও। তুমি তাহার ভালর তরে বলিতেছ। কিন্তু হাড়-গুঁড়ায় যদি ধান মরিয়া যায়, যত ফলিবার তত যদি না ফলে? তখন তুমি তাহার ক্ষতি-পূরণ করিবে কি? তাহার পাশের জমিতে হাড় গুঁড়া ছড়াইয়া দুই-তিন বছর দেখাও, কেমন বেশী ধান হয়; তখন তাহাকে আর বলিতে হইবে না, তাহাকে পুরাতনের ভক্ত বলিয়া গালি দিতে হইবে না। তখন দেখিবে, সে তোমার উপরে উঠিয়াছে, তুমি যাহা পার নাই সে পারিয়াছে। কারণ, তোমার মাত্র সদিচ্ছা, আর তাহার মরণ-বাঁচনের কথা। তুমি এত জান, এত লেখা-পড়া শিখিয়াছ, এই সামান্য কথাটায় অধীর হইয়া পড়িতেছ! বলিতেছ এদেশের লোকগুলা এত নির্বোধ, নিজের স্বার্থও বুঝিতে পারে না! দেখ, সকল বিষয়েই তিন অবস্থা আছে, ক্ষয় (decline), স্থিতি (stationary condition) আর বৃদ্ধি (growth or rise)। আমাদের দেশের কৃষকেরা বৃদ্ধি করিতে না পারুক, ক্ষয় করিতেছে না। যে জ্ঞান ছিল, বরং তাহা বাড়াইয়াছে, কমায় নাই। সে সময় তুমি উপদেষ্টা ছিলে না। আমরা উদ্যমহীন, আমরা পুরাতন-প্রিয়, এই দুই অপবাদে অনেক অনিষ্ট হইয়াছে। কেবল কৃষিতে নহে, আমরা যখনই কিছু না করি, তখনই এই দুই অপবাদের বোঝা মাথায় চাপাইয়া ঢাক-ঢোল পেটা হয়।

প্রমথ॥ এ যেন হ'ল; চাষের সঙ্গে ধর্মের কি সম্বন্ধ? তাঁতী তাঁত বুনিতেছে, ছুতার কাঠ চিরিতেছে, কামার লোহা পিটিতেছে, ধর্ম কোথায়?

গণেশ॥ তাহারা কার কর্ম করিতেছে? "তোমার কর্ম তুমি কর মা, লোকে বলে আমি করি"—এই গান কেবল বঙ্গদেশের গ্রামে নয়, ভারতবর্ষের যেখানে যত গ্রাম আছে, সব গ্রামের লোক শুনিয়াছে। বেদে কোরাণে বাইবেলে সব শাস্ত্রেই লেখা আছে। ক্ষেতে কৃষক লাঙ্গল

করিতেছে, কার তরে করিতেছে? নিজের তরে? সেই যে দেবী যিনি সর্বভূতে বিষ্ণুমায়া, দয়া, তুষ্টি, বৃত্তি, মাতৃ রূপে সংস্থিতা হইয়া জগৎ-যন্ত্র ঘূর্ণিত করিতেছেন, তিনিই জানেন। এই উক্তি হিন্দু কি, মুসলমান কি, শোনে নাই?

প্রমথ॥ যদি শুনিয়া থাকে, তবে আবার শোনাইয়া ফল কি?

গণেশ॥ শোনে, কিন্তু ভুলিয়া যায়। সেই পুরানা গানই কর্মে প্রয়োগ করিতে বল, নিরানন্দ স্থানে আনন্দ আসিবে। এখন কর্মের প্রবর্তক, আমি ও আমার। তখন মনে হইবে, আমি না করিলে কে করিবে? এখন পুরানা পুকুরের পাঁক উঠিতেছে না। তখন দেখিবে নূতন দীঘি কাটা হইতেছে। এই যে ভুবনেশ্বরের মনোহর মন্দির; কোন্ শিল্পী মন ঢালিয়া গড়িয়া গিয়াছে! সে কে, তাহার নামধাম সন-তারিখ কোথাও ক্ষোদা আছে কি? সাধ্য কি, সে নিজের নাম ক্ষুদিবে। মনে কর কি, পয়সা দিয়া নির্মিত হইয়াছিল? প্রবল রাজার বেত্রাঘাতে পাথর উঠিয়াছিল? পুরীতে নাকি ৫২ মঠ (সে কালের residential college) আছে; কত দেশ-দেশান্তরের কে বিষয় সম্পত্তি দিয়া গিয়াছে, তাহাদের নাম-ধাম কোথায়? যশের তাড়নায় মঠ স্থাপন করিলে পাথরে পাথরে নাম লেখা দেখিতে, পাথরে পাথরে প্রতিমূর্তিও দেখিতে পাইতে।

প্রমথ॥ এখন দেখি পাঁচশত টাকা দান করিলে পাথরে নাম ক্ষুদিতে একশত টাকা খরচ হয়। আগে নাকি জয়ঢাক অপরে বাজাইত, এখন নিজের ঢাক নিজে বাজাইতেছে। সে মতি গেল কেন?

গণেশ॥ কাল মতি দিয়াছিলেন, কাল সংহার করিয়াছেন। আবার নিশ্চয়ই অন্য আকারে দিবেন। কি সে আকার, আমরা চিনিতে পারিতেছি না। বোধ হয়, সেকালের লোকেও চিনিতে পারিত না। রহস্য এই, যে কিছু দেয়, সে জানে না। যে কিছু নেয়, সেও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। তোমার পুষ্করিণীর জল আমি খাইলে তোমার পুণ্য, আমার কিছু নহে; তোমার বাড়ীতে অতিথি আসিলে তুমি ভাগ্যবান্, অতিথির কি। এই কারণে তুমি পাদ্য অর্ঘ্য আসন দিয়া অতিথির পূজা করিবে; অতিথির পরিতোষে তোমার পরিতোষ। ইহাতে বাধ্যবাধকতা কি আছে। গৃহস্থ স্বকর্ম দ্বারা জীবিকা সংগ্রহ করিয়া দেব, পিতৃ, অতিথি, ভৃত্যকে দিয়া যাহা থাকিত, তাহা মাত্র ভোগ করিত।

প্রমথ॥ সেদিন আর আসিবে না। এখন পুরাতনের উদাহরণ দিয়া লোক-শিক্ষার চেষ্টা বৃথা।

গণেশ॥ একবারে বৃথা নহে; উত্তম যেখানে পাইবে, তাহাই গ্রহণ করিবে, লোককে শোনাইবে। কেবল এদেশের নহে, পৃথিবীর মধ্যে যাহা কিছু পাইবে, তোমার দেশের ধর্মানুমোদিত হইলে বলিবে, দেখাইবার হইলে দেখাইবে। তথাপি দেশের উদাহরণ অধিক লইবে, কারণ লোকে সহজে গ্রহণ করিতে পারিবে। লোককে তুলনা করিতে দিবে। তুলনা করিতে করিতে লোকেও গ্রহণ করিবে। শ্রোতা নিরক্ষর হইতে পারে কিন্তু নির্বোধ নয়। অসম্ভব কিছু বলিবে না, সত্যের বাহিরে যাইবে না, নিন্দা করিবে না, বাহুল্য করিবে না। মনে কর, এক গ্রামে এক সামান্য গৃহস্থের বাড়ী আছে। ছোট, কিন্তু পরিষ্কার ঝর্-ঝরা। উঠানটি ছোট, কিন্তু তাহারই এক পাশে তুলসী গাছ ও অন্য দুই একটা ফুলগাছ আছে; আঁস্তাকুড় বাহিরে এমন স্থানে আছে, যেখান হইতে গন্ধ আসে না। আঁস্তাকুড়ও পরিষ্কার। বাড়ীর পাশের পুকুরটি ছোট, একটা ডোবা বলিলেই হয়। ডোবাটি হয় ত তাহারও নয়, কিন্তু সে নিজের ভাবিয়া জল নির্মল রাখিয়াছে, গাছ-পালা জন্মিলে নিজে পরিষ্কার করে। ডোবাটি হয় ত তাহার; জল কেমন তক্-তক করিতেছে! ডোবার পাড়ে দুই এক ঝাড় কলা-গাছ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু সেখানেও পরিষ্কার; শুখনা পাতা ছিঁড়িয়া ঝুলিয়া অসুন্দর হয় নাই। লক্ষ্মীবার (বৃহস্পতিবার) কি না, ঘর-দুয়ার উঠান সব নিকান হইয়াছে, আলিপনা পড়িয়াছে। বাড়ীখানি দেখিলেই মনে হয় লক্ষ্মী বাস্তবিক আছেন। অথচ যৎসামান্য গৃহস্থ, হয় ত দিন খাটিয়া দিন খায়। অন্য গ্রামের আর এক গৃহস্থের বাড়ী দেখ। নিকটে যাইতেও ইচ্ছা হইতেছে না। প্রত্যহ এক টাকা উপার্জন করে, কিন্তু চালের খড় উড়িতেছে। পরণের কাপড়খানা ময়লা, ঘর-দ্বারে ঝাঁটও পড়ে নাই। এখানে কাঁথি ভাঙ্গা, ওখানে ইন্দুরমাটি। দেখিলেই লক্ষ্মীছাড়া মনে হয়। লোককে এই দুই বাড়ীর ছায়া-চিত্র দেখাও। তাহারা আপনা-আপনি শৌচের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িবে। এই জ্ঞান পাঁচখানা বই পড়াইয়া দিতে পারিতে না। প্রত্যক্ষ-জ্ঞান ও পঠিত-জ্ঞানে এত প্রভেদ।

প্রমথ॥ বাড়ীতে ফুলবাগান করিবে, আলিপনা দিবে?

গণেশ॥ নিশ্চয়। সৌন্দর্য-জ্ঞানের সহিত পবিত্রতা জড়িত। বাড়ীখানি সুন্দর করিবার প্রয়াসেই মনও সুন্দর হইয়া পড়ে। যে বাড়ীতে তুলসী গাছ আছে, ফুলগাছ আছে, সেখানে লক্ষ্মী আবির্ভূতা হন। সেখানে দেবভাব ও শান্তিরস মিশ্রিত হইয়াছে। জানিবে, গৃহস্থ বেলাফুলের মালা গাঁথিয়া নিজে গলায় পরে না, ঠাকুরকে নিবেদন করে। যদি বা পরে, আগে ঠাকুরকে দিয়া, পরে। যে কৃষক লক্ষ্মী ভাবিয়া বীজ রাখে, সে নিশ্চয়ই বীজ বাছিয়া রাখে। ক্ষেতে লক্ষ্মীও ফলেন। এইরূপ, সকলেই কত জানে, জানেও না, ভুলিয়া যায়। তাহাদের কানের কাছে পুনঃ পুনঃ মন্ত্র আওড়াইয়া, সিদ্ধি দেখাইয়া, সংশয় দূর কর। সংশয় থাকিতে বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা হয় না, কর্ম আসে না।

প্রমথ॥ সময়ে সময়ে কৃষি-প্রদর্শনী হইয়া থাকে। একবার দেখিয়াছি, একজন খুব বড় এক কাঁদি কলা দিয়াছিল, পুরস্কার পাইয়াছিল। যখন যেখানে মেলা বসে, তখন সেখানে এইরূপ প্রদর্শনী করিলে দেশের শিক্ষা হইতে পারে।

গণেশ॥ মেলাতে অনেক লোক জড় হয়, কিন্তু চিত্তও বিক্ষিপ্ত হয়। কলা-কাঁদি দেখিয়া যদি পুরস্কার দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা হইলে অপকার করা হইয়াছে। বুদ্ধি ও যত্ন, অর্থাৎ মানুষের চেষ্টার পুরস্কার দেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু যে কাঁদি আপনি বড় হইয়াছিল, তাহাতে মানুষের কৃতিত্ব কোথায়? আমি হইলে মাটি ও কলার চারাকে পুরস্কার দিতাম।

প্রমথ॥ অপকার করা হইয়াছে?

গণেশ॥ হাঁ। সে এবং অন্যে বুঝিয়াছে, মানুষের হাত নাই. দৈবই বলবান। দৈবে কি হইতে পারে, তাহা প্রদর্শনের উদ্দেশ্য হইলে কিছু ফল হইয়াছে। কিন্তু সিদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সাধন বুঝাইয়া না দিলে সিদ্ধিটা শোনা কথায় দাঁড়ায়। এত বড় কাঁদি হইতে পারে, এরূপ জ্ঞানের প্রয়োজন আছে; কিন্তু যখনই মনে হইবে, দৈবে হইয়াছে, তখনই চেষ্টা অদৃশ্য হইবে। দৈব হইতে যে জ্ঞান লব্ধ হয়, তাহার প্রয়োগের সামর্থ্য কৃষকের নাই।

প্রমথ॥ কলাজাত দ্রব্যের প্রদর্শনী করা যাইতে পারে; তাহাতে দেশের কোথায় কি দ্রব্য কেমন হইতেছে, তাহার জ্ঞান সহজে পাওয়া যাইবে।

গণেশ॥ সেই কথা বলিতেছি। প্রভেদ এই, তোমাকে সে সব দ্রব্য গ্রামে গ্রামে প্রদর্শন করিয়া বেড়াইতে হইবে। লোকে দেখিয়া কিনিবে, এ কারণ নয়; লোকে দেখিয়া জানিবে। অনেক বিষয়ে আমাদের রুচি পরিবর্তিত হইয়াছে, কারু জানে না। তাহাকে এই নূতন রুচি দেখাও। কলার নিমিত্ত উপকরণ (materials), করণ (implements or tools), জ্ঞান, এবং অর্থ, এই চারি চাই। চাকরিতে এক জ্ঞান সম্বল করিয়া চলিতে পারা যায়। এইরূপ, ওকালতি, ডাক্তারী, মাষ্টারী প্রভৃতি রূপ সেবায় সেবা-জ্ঞান থাকিলেই চলে। বাণিজ্যে উপকরণ বা পণ্য এবং জ্ঞান, এই দুই চাই। গবাদি পশুপালনে করণ ব্যতীত অপর তিন চাই। কৃষি ও কলায় চারি-ই চাই। আমরা কৃষকের নিকট উত্তম বীজ, উত্তম ফল, উত্তম করণ, উত্তম জ্ঞান কিছু কিছু ধরিতে পারি। কারুর নিকট উত্তম উপকরণ, উত্তম করণ, উত্তম পণ্য, উত্তম জ্ঞানও ধরিতে পারি। উত্তম যন্ত্রের অভাবে কত কারু যে কত সময় ক্ষেপ করে, তাহা দেখিয়া থাকিবে। সে যন্ত্র সব যে বহুমূল্য এমন নয়। যন্ত্রের বাহুল্য দেখাইবে না; দেখাইলে আমাদের কারু দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিবে। বাছিয়া বাছিয়া দেখাইবে। এইরূপ, বাছিতে পারিলে তোমাকে বহু দ্রব্য বহিয়া বেড়াইতে হইবে না।

প্রমথ॥ বিনা অর্থে কিছুই হইতে পারে না।

গণেশ॥ বিনা অর্থে ধর্ম ও কাম, কোনটা হইতে পারে না। দুঃখী দরিদ্রের পক্ষে দান সাধ্য নয়। কিন্তু এমন ধর্মও আছে, যাহা ধনী পারে, নির্ধনও পারে। কাম অর্থে যাহা অভিলাষ করি (object of desire)। অতএব কৃষি কিংবা কলা অর্থ বিনা হইতে পারে না, আমরা দিতেও পারি না। কিন্তু এমন এক জ্ঞান দিতে পারি, যাহাতে অর্থ আসিতে পারে। ভারতবর্ষে এমন নগর নাই, যেখানে মারোআড়ী বণিক নাই। কেমন করিয়া মারোআড়ী বাণিজ্য শেখে, ও একজন হইতে ক্রমে ক্রমে দশজন আসিয়া জোটে, তাহা দেখিয়াছ কি? পরিপণ (stock) নাই, কিন্তু পণ্য বেচে। সহকারিতায় (co-operation) অনেক হয়। দুর্বলের পক্ষে সহকারিতা এক বল। একথা এদেশে নূতন নয়। নূতন হইলে প্রচলন কঠিন হইত। কৃষিতে গ্রন্থি (clubbing) অদ্যাপি গাঁতা নামে খ্যাত। গাঁতা করিয়া চাষ গ্রামে গ্রামে দেখিতে পাইবে। কাহারও গোরু আছে, কাহারও

লাঙ্গল আছে, কাহারও বীজ আছে, কাহারও মুনিষ আছে। একজনের অভাব অন্য দ্বারা পূরণ হয়। এইরূপ, পূর্বকালে কারু (artisan) -দিগের 'শ্রেণী' (trade guilds) ছিল। তাহারা 'নিক্ষেপ' (deposit) রাখিত এবং বিপত্তিকালে সেই 'নিক্ষেপ' প্রয়োজনমত গ্রহণ করিত। অদ্যাপি অনেক কারু ও বণিক স্থানে 'বৃত্তি' নামে কিছু কিছু টাকা 'নিক্ষেপ' করা হয়। কিন্তু শেষে বারোআরীতে সে টাকা ব্যয় হয়। কিন্তু সমস্ত টাকা বারোআরীতে ব্যয় না করিয়া এবং বৎসরের আয়ের কিয়দংশ 'নিক্ষেপ' করিয়া প্রত্যেক 'শ্রেণী'র 'নীবি' বা মূলধন (capital) বাড়াইতে পারা যায়। এই যে "সমবায় উদ্ধার সমিতি" (co-operative credit society) স্থাপিত হইয়াছে, তাহা হইতে বহু প্রত্যাশা করিতেছি। এই সকল সমিতিতে বিচক্ষণ সৎ দেশজ্ঞ মুখ্য নিযুক্ত হইলে দেশের কৃষি ও কলার বিশেষ উপকার হইবে। সবই এই সকল মুখ্যের উপর নির্ভর। কৃষক ও কারুর লভ্যের যতখানি গুড় দালাল, আড়ৎদার, ব্যাপারী প্রভৃতি মধ্যপুরুষের (middle man) উদরে যাইতেছে, তাহারা পাইলে বাঁচিয়া যাইত। কৃষক ক্ষেতে প্রচুর আলু জন্মাইয়াছে, যথা সময়ের পূর্বেই জন্মাইয়াছে; কিন্তু কাহাকে কোথায় বিক্রী করিবে? তাঁতী দিন-রাত খাটিয়া প্রত্যহ একখানা ধুতি বুনিতেছে; কিন্তু কে তৎক্ষণাৎ কিনিয়া দাম দিবে? এখন 'মহাজন'কে বেচিতে হইতেছে। কিন্তু মহাজন আর একজনকে বেচে, সে আর একজনকে। এইরূপে তিন চারি হাত ঘুরিয়া গ্রাহকের হাতে যায়। ধুতির দাম অল্পে অল্পে বাড়িয়া উঠে। গ্রাহক দাম দেয়: কিন্তু সমুদয়, কারু যে তাঁতী, সে পায় না। অথচ সে পাইলে বাঁচিয়া যাইত।

প্রমথ॥ মহাজনই দেশের সর্বনাশ করিতেছে।

গণেশ॥ এক নিশ্বাসে 'রায়' প্রকাশ করিও না। মহাজন ভাল আছে, মন্দ আছে; সুজন আছে, দুর্জন আছে। কিন্তু কোন্ ব্যবসায়ে দুর্জন নাই? বিদ্বান্, উত্তম শিক্ষিতদিগের মধ্যে দুর্জন নাই?

প্রমথ॥ আমি শুদখোর মহাজনের কথা বলিতেছি। টাকায় এক আনা শুদ কষিয়া কষিয়া খাতকের রক্ত শুষিয়া খায়।

গণেশ॥ যদি টাকায় বছরে ৸৹ আনা বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে গ্রামের সবাই মহাজনি করে না কেন? এত লভ্য ত আর কিছুতে নাই। কিন্তু মহাজনের কত টাকা ডুবিয়া যায়, তাহার হিসাব

দেখিয়াছ কি? খাতক টাকায় এক আনা শুদ দিতে স্বীকার, যখনই শুনিবে, তখনই জানিবে সে খাতককে তোমরা এক পয়সাও ধার দিতে না। কোনও 'বেঙ্ক' দিত না, নিশ্চয়। "সমবায়-উদ্ধার-সমিতি"ও দিত না। এমন খাতকের বিপত্তির সময় যে মহাজন টাকা দেয়, সে মহৎ জনই বটে। শুদ কেন চড়া, তা না ভাবিয়া উপকারী মহাজনের দোষ দিলে অধর্ম হইবে। দোষটা দেশের; দেশটা এত দরিদ্র যে এক আনা শুদ দিতে হয়। মহাজন শব্দের প্রাচীন অর্থ কি, জান? বহুজন,—মহাজন (a multitude of men)। এই বহুজনের মধ্যে যে প্রধান হইত, ব্যবসায়ে বড় হইত, সে ক্রমে মহাজন নাম পাইত। বোধ হয়, প্রথমে 'শ্রেণী' ছিল; সেই শ্রেণীর যে প্রধান, সে মহাজন। অতএব কৃষক ধর, কি কারু 'শ্রেণী' ধর, মহাজন তাহাদেরই একজন, এক প্রতিনিধি। সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে তাহাদেরই। ধর্মদাসের ঘরের চাল ঝড়ে উড়িয়া গিয়াছে; বর্ষাকালে বেচারীর দাঁড়াইবার স্থান নাই। অর্থ সঞ্চয় দূরে থাক, যাহা প্রত্যহ আনে, তাহাতে খাইতেও কুলায় না। মহাজনের দ্বার ভিন্ন তাহার কি গতি আছে? এমন লোককে মহাজন বাঁচাইতে পারে; কারণ টাকা তাহার একার। সমিতি পারে না, কারণ সমিতির টাকা দশজনের। শ্রেণীর মহাজন শ্রেণীর প্রত্যেককে বাঁচাইতে পারে। আমাদের দেশের জাতিবন্ধনের মূল এই শ্রেণী। পরস্পরের হিতসাধনই উদ্দেশ্য। জাতিবিভাগের অন্য কারণ যাহাই থাক, বন্ধনের কারণ সমবায়ে (Ccmbination) হিতেচ্ছা। এখন মূল উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়াছি। পুরাতন শ্রেণীর ভাব জাগাইতে পারিলে কৃষক ও কারুর অর্থাভাব কিছু কমিতে পারে। মনে করিও না, সমাজভেদ উঠাইয়া দিতে পারিবে। সেই ভেদ অন্য নামে—সমাজ, সভা, সমিতি প্রভৃতি নামে থাকিবেই থাকিবে। সমবায়ে বল-সংগ্রহ, সকলেরই উদ্দেশ্য।

প্রমথ॥ আমাদের দেশের লোকগুলাও নির্বোধ; আয়ের অতিরিক্ত ব্যয় করে, শেষে মহাজনের দ্বারস্থ হয়।

গণেশ॥ দেখ, আর যাহা বল, অতিব্যয়ী বলিও না। অকস্মাৎ বিপদ না ঘটিলে কেহ অন্যের নিকট ঋণী হয় না। অর্থ সঞ্চয় করিবার পর বিবাহ করা চলে; কিন্তু সে নীতি পিতৃদায়, মাতৃদায়, কন্যাদায় মানে না। 'দায়' অর্থে দান (gift)—পিতামাতার শ্রাদ্ধে দান করিতেই হইবে। যাহার যেমন সমাজ, তাহাকে সে সমাজের

তেমন মর্যাদা (propriety of conduct) রক্ষা করিতে হয়। গ্রামে দেখিবে, অবস্থা বিবেচনা করিয়া সমাজই মর্যাদা স্থির করিয়া দেয়। একজন শত্রু হইতে পারে, পাঁচজনই পারে না। পাঁচজনে বসিয়া কর্তব্য স্থির করিয়া দেয়, যথাসাধ্য সাহায্যও করে। আর, কন্যাদায় যাহা বলিতেছ, তাহা কতকটা তোমাদের সৃষ্টি। তোমরা কত নূতন নূতন সৃষ্টি করিতেছ, তাহা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? সাধারণ লোকে তোমাদিগকে আদর্শ জ্ঞান করে; কারণ তোমরা বিদ্বান্ ও সমাজের হিতাহিত বিবেচক। কিন্তু তোমরা যাহা পার না, তাহারা পারে। একবার এক গ্রামের প্রায় পঞ্চাশঘর দোলিয়া (দোলাবাহী) একদিনে মদ্য ত্যাগ করিয়াছিল, অদ্যাবধি স্পর্শ করে নাই। কর্ম-সামর্থ্যই পুরুষ-সামর্থ্য। গর্হিত বুঝাইয়া দিলে তাহারা মানে। তোমরা মান কি? তোমরা স্বাধীন-চিন্তা চাও; কিন্তু চিন্তাকে স্ব-এর অধীন রাখিয়াছ কি? লোকশিক্ষা স্বাধীন-চিন্তায় চলিবে না! যাহা আছে, তাহার উপর ভিৎ তুলিতে হইবে। গড়িতে না পারিলে ভাঙিবে না। দেশটি কি রকম হইলে সন্তুষ্ট হইতে পারিবে, তাহা মনে মনে, আদি-অন্ত, শাখা-প্রশাখা -সহিত, শিল্পীর ন্যায় রচনা করিবে। বৈষম্যে যতই কষ্ট বোধ কর, দূর করিতে পারিবে না; কারণ বৈষম্যেই সৃষ্টি। সাম্য একটা অসম্ভব কল্পনা। অতএব দেশের কর্মের অনুবন্ধ (motive) ধ্যান করিবে, বিরোধ ভাঙিতে চেষ্টা করিবে, তারপর লোক শিখাইতে বাহির হইবে। কারণ শিক্ষা দ্বারা কেবল বুদ্ধির উৎকর্ষ নহে, প্রজ্ঞাবৃদ্ধি হইবে। যিনি কর্ম ও জ্ঞান যোগ করিয়া শিখাইতে পারেন, তিনিই সাধক, তিনি ধন্য, তাহাঁর ভক্তিও ধন্য। পুরাতন সবই পবিত্র নহে, নূতন সবই নিন্দিত নহে। যেমন শিখাইবে, সমাজ তেমন হইবে। শিক্ষার শিকড় সমাজের উপর হইতে নিম্নতলে গিয়া ঠেকে।

প্রমথ॥ এমনি সব দেখাইয়া দেখাইয়া বলিয়া বলিয়া বেড়াইলে দেশের শিক্ষা হইবে?

গণেশ॥ এমনি কি? শিখাইবার অন্ত আছে কি? মনে কর, এক গ্রামে গিয়া আমাদের তীর্থ-স্থান কহিতে গিয়াছ। গ্রামের লোক যত মূর্খ হউক, যে বার্তাই করুক, কতকগুলা নাম নিশ্চয় শুনিয়াছে। ছায়া-পটে ভারতবর্ষের মানচিত্র দেখাও, কোথায় কি তীর্থ, সে তীর্থে কি ঠাকুর, কেমন মন্দির, সে দেশের লোক কেমন, তাহাদের কাপড়-

চোপড় কেমন, ঘরকন্না কেমন, সেখানে যাইবার পথ কি, ইত্যাদি ইত্যাদি ধরিয়া একটা নূতন পৃথিবী, তোমার শ্রোতার পৃথিবী অপেক্ষা হাজার কি লক্ষ গুণে বৃহৎ পৃথিবী, চোখের সামনে ধরিবে। তীর্থের কাহিনী কয়দিনে শেষ করিতে পারিবে? আর, কত বিষয় কত অল্প সময়ে জানাইতে পারিবে? দেশ-জ্ঞান জন্মাইবার এমন সহজ উপায় কোথায় পাইবে? রামায়ণী কথা ধর। এই এক কথা ধরিয়া দিনের পর দিন কত কথা বলিতে পারিবে; চিত্র দ্বারা বাস্তব করিবে; কোথায় অযোধ্যা, কোথায় সরযূ, কোথায় মিথিলা, কোথায় দণ্ডকারণ্য, কোথায় লঙ্কা প্রভৃতি দেখাইতে দেখাইতে দশরথের সত্যপালন, রামের পিতৃভক্তি, ভরত ও লক্ষ্মণের সৌভ্রাত্র, সীতার পাতিব্রত্য প্রভৃতি ধর্ম জীবন্ত হইয়া উঠিবে। একালের ডাকঘর ধর। কি বিশাল ব্যবস্থা, পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ, এক করিয়া ফেলিয়াছে; দুইটি কি চারিটি পয়সার বদলে দূর-দূরান্তরের বন্ধুর সংবাদ আনিয়া দিতেছে!

প্রমথ॥ এমন সব ধরিলে কথকতা অফুরন্ত বটে। একখানি কাপড় ধরিয়া আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত দিয়া গেলে শত বিষয়ের জ্ঞানসঞ্চার করিতে পারা যায়। কিন্তু শুধু জ্ঞানে কি হইবে, কর্ম চাই। সম্প্রতি যে "গৃহশিল্প-সমিতি" স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে অনেক কর্ম হইতে পারিবে।

গণেশ॥ কর্ম হউক না হউক, যেটা যা নয় সেটাকে তা বলিও না। কারণ আসলটা Home Industry। Home মানে স্বদেশ এবং Industry মানে ব্যবসায় বুঝি। বহুলোক কোনও উৎপাদনে নিযুক্ত থাকিলেই Industry। ইংরেজীতে কৃষিও একটা Industry। কৃষিকর্মকে "গৃহ-শিল্প", "কুটীর-শিল্প" বলিতে শুনিলে হা-হতোস্মি করিতে ইচ্ছা হয়। "গৃহ-শিল্প", "কুটীর-শিল্প" বলিলে বুঝি গৃহনির্মাণ-শিল্প (art of building)। ময়দানব শিল্পী ছিলেন, যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-সভা নির্মাণ করিয়াছিলেন। বিশ্বকর্মা দেবতাদিগের শিল্পী। এ কারণ দেশের কারু বিশ্বকর্মার পূজা করে; যেন তাহার কলায় নূতন নূতন 'অভিপ্রায়' (design) ব্যক্ত হয়। 'স্বচিত্ত-কারু',—যে কারু নিজের মন হইতে গড়ে, সে শিল্পী। যে নিজের মন হইতে

গড়ে না, সে কারু (artisan) মাত্র। শিল্পী, কারু-শ্রেষ্ঠ (master artisan) বরং স্রষ্টা (master artist)।

প্রমথ॥ নামে কি আসে ? কথাটা বুঝিলেই হইল।

গণেশ॥ নামে খুব আসে যায়। জ্যোৎস্নায় গাছের ডালের ছায়া পড়িয়াছে। ভূত-প্রেত নাম শুনিলে ভয় জন্মিবে, ডালের ছায়া শুনিলে জন্মিবে না। একটা নামের সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা ইতিহাস মনে আসে। Technical education=কলা-শিক্ষা। কলা-শিক্ষা বল, দেশের হাজার হাজার কলার সঙ্গে মিশিয়া যাইবে। তখন মনে হইবে, অদ্ভুত কিছুর শিক্ষা নয়। যদি নূতন কিছু হয়, যেটা এদেশে নাই, তখন 'বিলাতী কলাশিক্ষা' বল, কলা স্পষ্ট হইয়া পড়িবে। পাঠ-শালা নাম ছাড়িয়া 'বিদ্যালয়' বল; মনে হইবে একটা কিছু নূতন। তখন দেশের সঙ্গে মিশিতে সময় লাগিবে। যাহা কিছু আমরা শ্রেয় বলিয়া বিদেশ হইতে গ্রহণ করিব, সে সব যত দেশী করিয়া ফেলিবে, ততই সুবিধা। কুটীরশিল্প বলিলে এই অর্থ আসে না। দেশের সমুদয় কল্প Cottage industry, কাপড় বোনা, হাঁড়ী গড়া ইত্যাদি। নূতন কোথায়? অতএব যদি নাম চাও, তাহা হইলে গ্রাম্যকলা বলা চলে। 'কলা' মানে কলনা করা, গড়া। বঙ্গদেশের গত লোক-সংখ্যান (Statistics) হইতে জানা যায়, শতকে ৭৮ জন কৃষিবার্তায়, ৭ জন কলায়, ৫ জন বাণিজ্যে, ৩ জন পণ্যবহনে, ৩ জন সেবায় এবং ৫ জন ভিক্ষা প্রভৃতি কর্মে নিযুক্ত থাকিয়া জীবিকা করিতেছে। ইহা মনে রাখিয়া, কোথায় কি জ্ঞান জন্মাইলে উপকার হইবে, তাহা বিবেচনা করিয়া, কর্মের সহিত ধর্মের সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য রাখিয়া, জনশিক্ষায় প্রবৃত্ত হও।

প্রমথ॥ এখন প্রদর্শক কোথায়?

গণেশ॥ এখন নাই, কিন্তু সুশীল, সুভাষী, ধার্মিক ও জ্ঞানী প্রদর্শক শিখাইয়া লইতে হইবে। তিনি সুদর্শন, অল্প স্বল্প গীতজ্ঞ হইবেন। বঙ্গদেশে প্রায় লক্ষ গ্রাম আছে। প্রতি ১০ খানা গ্রামে একটা হাট ধরিলে প্রদর্শকের ১০ হাজার 'স্থান' হইবে। বৎসরে চাতুর্মাস্য বাদ দিলে ৮ মাস থাকে। প্রত্যেক 'স্থানে' দুই দিন ধরিলে এক এক প্রদর্শক ৮০ স্থান বেড়াইতে পারিবে। অতএব এক বঙ্গ-দেশের তরে ১০০ প্রদর্শক আবশ্যক। পাঁচ জন পাইলে কাজ আরম্ভ করিতে পার। দুইজন কৃষি, একজন কলা, দুইজন স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হইবে। ভৃত্যসহ পাঁচজনের নিমিত্ত বছরে পাঁচ হাজার

টাকা ব্যয় ধরিতে পার। রেল-ভাডা ষ্টীমার-ভাড়া প্রায় লাগিবে না। কারণ একেবারে বহুদূরে যাইতে হইবে না। প্রবাসব্যয়ও প্রায় পাড়িবে না। যে গ্রামে হাট বসে, সে গ্রামে কিংবা নিকটবর্তী গ্রামে এমন উদ্যোগী সংকারশীল লোক পাইবে যাহার বাড়ীতে ভৃত্যসহ তিন দিন থাকিতে পারিবে। চেষ্টা সফল হইলে দেখিবে, গ্রামের লোকে প্রদর্শককে সাদরে নিমন্ত্রণ করিতেছে। প্রথম প্রথম লোকে জিজ্ঞাসা করিবে, তুমি কেন আসিয়াছ? অর্থাৎ তোমার কি স্বার্থ আছে? তোমার ব্যবহারে যদি উত্তর না পায়, তাহা হইলে তুমি অযোগ্য। হাত ধরিয়া তুলিবে, কিন্তু গলাধরা-ধরি করিবে না। চাতুর্মাস্যের দেড়মাস ছুটি, তোমাদের আড়াই মাস সাধনার সময় হইবে। সে সময় যথা-কর্তব্য নিরূপণ করিবে, দেশ-জ্ঞান সঞ্চয় করিবে, কথা রচনা করিবে, প্রদর্শনের দ্রব্য, ছায়াচিত্র প্রভৃতি সংগ্রহ করিবে। কলিকাতায় কিংবা অন্য স্থানে দেশ-হিতৈষী সৎকর্মশীল বিজ্ঞ ৫ জনের 'দেশ-পঞ্চক' থাকিবে। ইহাঁরা 'অবৈতনিক'। ইহাঁদিগের উপর সমস্ত নীতি নির্ভর করিবে। ইহাঁরা অর্থ-সংগ্রহ করিবেন, কর্মের ব্যবস্থা ও আয়োজন করিবেন, ইহাঁরা এক পয়সা দামের এক এক কৃষির, এক এক কলার, এক এক বার্তার, স্বাস্থ্যরক্ষার ছোট ছোট পুস্তিকা লেখাইয়া প্রকাশ করিবেন। এক পয়সা দামের সাপ্তাহিক পত্র প্রচার করিবেন। হাটে হাটে সাপ্তাহিক পত্র যাইবে; প্রদর্শক গ্রামে পুস্তিকা লইয়া যাইবে। পুস্তিকা কিংবা সাপ্তাহিক পত্রের সব দাম পাইবে না, বেচিয়া লাভও করিতে বসিবে না। এক একটা ছায়া-যন্ত্র কিনিতে ধর ১০০৲ টাকা, প্রতি কাচপট করিতে ৪৲। প্রত্যেক প্রদর্শকের নিকটে অন্ততঃ ৫০ খানা। অতএব পাঁচটা সংযোগ (set) করিতে অন্ততঃ ১৫০০৲ টাকা পড়িবে। একজন প্রদর্শক ফটোগ্রাফ তুলিতে ও কাচপট করিতে জানিবে। যেখানে উত্তম কিছু দেখিবে, তাহা উদাহরণ হইতে পারিবে। বছর বছর নূতন নূতন জ্ঞান জন্মিবে, নূতন নূতন আয়োজনও করিতে হইবে। বোধ হয় পঞ্চকের হাতে বৎসরে ৫০০০৲ টাকা থাকা আবশ্যক হইবে। বৎসরে ১০,০০০৲ টাকা কত দিকে উড়িয়া যাইতেছে। সংকল্প সফল হইলে কর্ম বাড়াইতে পারিবে। তখন দেখিবে আমরা বুড়ারাও তোমাদেরই কথা শুনিবার নিমিত্তে লালায়িত হইতেছি। ধর্ম ও সমাজের যোগ সাধন নিমিত্ত কথক বা প্রদর্শক নিযুক্ত করিতেই হইবে।

টীপ।

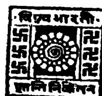
ত্রিশ বৎসর পূর্বে বঙ্গের অবস্থা চিন্তা করিয়া 'শিক্ষাপ্রকল্পে'র প্রবন্ধদ্বয় লিখিত হইয়াছিল। এক্ষণে সে বঙ্গ নাই। পূর্বকালের বঙ্গের মাত্র তৃতীয়াংশ রহিয়াছে। এখন জনসংখ্যা প্রায় আড়াই কোটি এবং গ্রামসংখ্যা ত্রিশ হাজার দাঁড়াইয়াছে। এখন রাজা বিদেশী শাসক নয়; আমাদের নিজেদের রাজা, নিজেদের মন্ত্রী দেশপালন করিতেছেন। এক্ষণে আমরা নির্ভয়ে 'স্বদেশী' গান গাহিতে পারি। 'জয় ভারতের জয়', 'জয় ধর্মের জয়' বলিয়া বেড়াইতে শঙ্কা নাই। এক্ষণে এইরূপ গীত শিক্ষানীতির অন্তর্গত করিতে হইবে।

কিন্তু অর্থব্যয় অধিক করিতে হইবে। এখন টাকার মূল্য একচতুর্থাংশ হইয়াছে, শিক্ষা বিস্তারের ব্যয় চতুর্গুণ বাড়িয়াছে। জনসংখ্যা একশত হইলে পাঠশালার উপযুক্ত বয়সের বালক বালিকা ১৫ জন ধরা যাইতে পারে। তদনুসারে পশ্চিমবঙ্গে ত্রিশলক্ষ বালক বালিকার জন্য পাঠশালা চাই। এইরূপে দেখিতেছি একলক্ষ পাঠশালা এবং অন্ততঃ দুইলক্ষ শিক্ষক চাই। দেশে জ্ঞান-প্রচারের নিমিত্ত সম্প্রতি পাঁচজন প্রদর্শক লইয়া কাজ আরম্ভ করা যাইতে পারে। উপযুক্ত প্রদর্শকের বেতন অল্প হইবে না। এক ভৃত্যের বেতনও অল্প নয়। অতএব বোধহয় প্রত্যেকের নিমিত্ত বৎসরে ২৪০০৲ টাকা এবং পাঁচজনের নিমিত্ত ১২০০০৲ টাকা লাগিবে। পুস্তিকা লেখাইতে উপযুক্ত লেখক বাছিতে হইবে। ইদানীর গল্প-লেখকের কর্ম নয়। গল্পের ভাষা ও ভঙ্গি চলিবে না। ভাষায় মাধুর্য ও গাম্ভীর্য থাকিবে। গ্রামে গ্রামে প্রচারের নিমিত্ত সাপ্তাহিক পত্র চাই। নাম হইবে, 'সাপ্তাহিক সমাচার'। দাম এক পয়সা। প্রদর্শক ছায়া-চিত্র (Magic Lantern Slides) দেখাইবেন, 'সিনেমা' নয়। সিনেমায় আড়ম্বর যত, ফল তাহার শতাংশ। কারণ, দর্শকেরা সিনেমা দেখিতে আগ্রহ করিবে, বিষয় গ্রহণ করিতে ভুলিয়া যাইবে।

বাংলার স্ত্রীশিক্ষা

১৮০০-১৮৫৬

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল



বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা

১৩৫৭ অগ্রহায়ণ

মূল্য আট আনা

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা
মুদ্রাকর শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস
প্রবাসী প্রেস, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা
৩·১

বিষয়সূচী

চিত্রসূচী

উপক্রমণিকা

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে বঙ্গীয় সমাজে স্ত্রীজাতির অবস্থা বিশেষ উন্নত ছিল না। সতী বা সহমরণ প্রথার দরুন শিক্ষার অভাবে তাঁহাদের দুর্দশার একশেষ হয়। ভারতবাসীদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায়ও সর্বপ্রথম সতীপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। সমাজে ও রাষ্ট্রে নারীর অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে সর্বাগ্রে তাহার শিক্ষার আয়োজন করা দরকার, এ কথাও তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছিলেন। রক্ষণশীল রাজা রাধাকান্ত দেবও স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্রগ্রন্থাদি হইতে প্রাচীন হিন্দু নারীদের শিক্ষার উন্নতির বহু নজির সংগ্রহ করিয়া দিয়া তিনি পণ্ডিত গৌরমোহন বিদ্যালংকারকে 'স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক' রচনায় সাহায্য করিয়াছিলেন।[১] এই পুস্তকে যে শোভাবাজার-রাজপরিবারের উল্লেখ আছে তাহা এই রাধাকান্ত দেবেরই পরিবার। জোড়াসাঁকো ও পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরপরিবার, পোস্তার রাজা বৈদ্যনাথ রায়ের পরিবার প্রভৃতিতেও স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন ছিল। বাহির হইতে শিক্ষয়িত্রীরা আসিয়া এইসকল পরিবারের মেয়েদের লেখাপড়া শিখাইতেন। হিন্দু কলেজের ছাত্র এবং 'আলালের ঘরের দুলাল'-প্রণেতা প্যারীচাঁদ মিত্র নিজ 'আধ্যাত্মিকা' পুস্তকের ইংরেজি ভূমিকায় এই মর্মে লিখিয়াছেন যে, তিনি ১৮১৪ সনে জন্মগ্রহণ করেন, এবং শৈশবে যখন পাঠশালায় পড়েন তখন দেখিয়াছেন তাঁহার পিতামহী মাতৃদেবী এবং খুড়িপিসিগণ সকলেই বাংলা পুস্তক পড়িতে অভ্যস্ত; তাঁহারা বাংলা লিখিতে এবং বাংলায় হিসাব রাখিতে পারিতেন। কিন্তু মেয়েদের জন্য তখনও কোনো প্রকাশ্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। তবে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকেই এ বিষয়ে চেষ্টা আরম্ভ হয়।

ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট তথা গবর্নমেণ্টের নিকট হইতে ১৮১৩ সনে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি যে নূতন সনন্দ লাভ করে তাহাতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এই দুইটিও ধার্য হয়, ১. শিক্ষাখাতে ভারত গবর্নমেণ্টের রাজস্ব হইতে প্রতি বৎসর এক লক্ষ টাকা ব্যয়, এবং ২. এ দেশে খৃস্টান পাদ্রীদের অবাধ গতিবিধি। প্রথমটির দ্বারা স্ত্রীশিক্ষার প্রসারে কোনো সুবিধা হয় নাই; দ্বিতীয়টির ফলে খৃস্টান মিশনরীদের চেষ্টায় কলিকাতায় ও মফস্বলে বহু শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে। তাঁহারাও কিন্তু প্রথমে সাক্ষাৎভাবে স্ত্রীবিদ্যালয়স্থাপনে অগ্রণী হন নাই, অগ্রণী হইয়াছিলেন তাঁহাদের স্ত্রীগণ এবং অন্যান্য ইউরোপীয় মহিলারা। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা বিভিন্ন খৃস্টান সম্প্রদায়ের অধীনে, কখনো বা স্বতন্ত্রভাবে সোসাইটি বা সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। এইসকল সোসাইটির মারফত তাঁহারা অবৈতনিক বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করিতে লাগিলেন। এই প্রসঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, রাজা রাধাকান্ত দেব, রাজা বৈদ্যনাথ রায় প্রমুখ হিন্দু প্রধানগণ প্রথম প্রথম তাঁহাদের কার্যে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন।

ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি

অবৈতনিক বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দ্বারা স্ত্রীশিক্ষার প্রসারে প্রথম অগ্রসর হন ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি। এই সোসাইটি ১৮১৯ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার পুরা নাম 'The Female Juvenile Society for the Establishment and Support of Bengali Female Schools'। ইহা স্থাপনের ইতিহাস এইরূপ: কলিকাতাস্থ ব্যাপটিস্ট মিশনের পাদ্রীগণ ১৮১৯ সনের এপ্রিল মাসে মিসেস পীয়ার্স এবং মিসেস লসনের বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীগণকে বাঙালি বালিকাদের শিক্ষাদানকল্পে শিক্ষালয়প্রতিষ্ঠার জন্য সংঘবদ্ধ হইতে অনুরোধ

করেন। ইহার দুই-এক মাসের মধ্যেই শিক্ষয়িত্রীগণ অন্যান্য মহিলা ও মিশনরীদের সহায়তায় উক্ত সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হন। কলিকাতা স্কুল সোসাইটির সম্পাদক, ব্যাপটিস্ট মিশনের পাদ্রী ডবলিউ. এইচ. পীয়ার্স ইহার সভাপতি হইলেন। সোসাইটির নিয়মাবলীও সঙ্গেসঙ্গে রচিত হইল। মাসিক বা বাৎসরিক চাঁদা দিলে যে-কেহ ইহার সভ্য হইতে পারিতেন। সভাপতি এবং চৌদ্দজন মহিলা লইয়া কার্য-নির্বাহক সমিতি গঠিত হইল। ইঁহাদের মধ্যে ছিলেন একজন কোষাধ্যক্ষ, দুইজন সম্পাদক এবং একজন চাঁদা-সংগ্রাহক। বৎসরে একবার সাধারণ সভা আহ্বানের কথা উক্ত নিয়মাবলীতে উল্লিখিত হয়।[২]

কলিকাতার গৌরীবাড়িতে বাঙালি মেয়েদের জন্য ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটির প্রথম বালিকাবিদ্যালয় স্থাপিত হয় ১৮১৯ সনের মে-জুন মাস নাগাদ। এই বিদ্যালয়টির নাম দেওয়া হয় জুভেনাইল স্কুল। প্রথমে এদেশীয় শিক্ষয়িত্রী না পাওয়ায় বিদ্যালয়ের কার্য অতি মন্থর গতিতে চলিতে থাকে। বৎসরের শেষ পর্যন্ত মাত্র আটটি ছাত্রী এখানে পড়াশুনা করিতে আসে। ১৮২০ সনের এপ্রিল মাসে একজন দেশীয় শিক্ষয়িত্রী পাওয়া গেলে ছাত্রীসংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়িতে থাকে। সোসাইটির দ্বিতীয় বার্ষিক কার্যবিবরণীতে (১৪ ডিসেম্বর ১৮২১) প্রকাশ, তখন ইহার ছাত্রী-সংখ্যা বত্রিশে দাঁড়ায়। এই ছাত্রীদের মধ্যে কয়েকজন বয়স্ক, এবং ব্রাহ্মণ কায়স্থ বাগদি বৈষ্ণব ও চণ্ডাল জাতীয়া। মিশনরী বা সরকারী বিদ্যালয়সমূহের মত এখানে জাতিভেদের লক্ষণ আদৌ পরিলক্ষিত হইত না।

উক্ত বিবরণীতে আরও প্রকাশ, মূল বিদ্যালয় ব্যতীত কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে আরও কয়েকটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাদের নামেরও কতকটা বৈশিষ্ট্য ছিল। যে যে স্থানের মহিলাদের অর্থে বিদ্যালয় স্থাপিত

হইত তাঁহাদের নাম ইহার সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া হইত ; যেমন, লিভারপুল স্কুল, সালেম স্কুল ও বার্মিংহাম স্কুল। এই সময় বিদ্যালয়গুলির মোট ছাত্রীসংখ্যা ছিল উনআশি জন। প্রথম বার্ষিক রিপোর্টে মাত্র একুশ জনের উল্লেখ ছিল। এই ছাত্রীসংখ্যার মধ্যে ছিয়াত্তর জনই শিক্ষয়িত্রীদের নিকট পাঠ লইত।[৩]

হিন্দুপ্রধানেরা প্রকাশ্য বালিকাবিদ্যালয়ে নিজ নিজ পরিবারের কন্যাদের না পাঠাইলেও তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ জুভেনাইল সোসাইটির বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করিতেন। রাধাকান্ত দেব কলিকাতা স্কুল সোসাইটির দেশীয় সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার শোভাবাজার রাজবাটিতে ছাত্রদের ত্রৈমাসিক ও বাৎসরিক পরীক্ষা লওয়া হইত। ১৮২১ এবং ১৮২২ সনে ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটির বিদ্যালয় হইতে ছাত্রীরাও এই পরীক্ষা দিতে আসিত, ইহার বিবরণ পাওয়া যায়। দ্বিতীয় বারে পরীক্ষায় সোসাইটির দুইটি বিদ্যালয় হইতে চল্লিশ জন ছাত্রী উপস্থিত হয়। দুই বারেই তাহাদের পাঠোৎকর্ষ দেখিয়া উপস্থিত দেশী-বিদেশী ভদ্রমণ্ডলী প্রীতিলাভ করেন।[৪] ইহার পর আর বাৎসরিক পরীক্ষায় ছেলেদের সঙ্গে সোসাইটির মেয়েদের পরীক্ষা দিতে দেখি না।

এই সময়ে, ১৮২২ সনের প্রথমে, পণ্ডিত গৌরমোহন বিদ্যালংকারের 'স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক' প্রকাশিত হইলে তাহাতে স্ত্রীশিক্ষাপ্রসারে বিশেষ সহায়তা হইয়াছিল। কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটি এই পুস্তকখানির দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির করিয়া পাঁচ শত খণ্ড বিনামূল্যে বিতরণ করিয়াছিলেন। সোসাইটির বিদ্যালয়সমূহে ইহার অংশবিশেষ পঠিত হইত।

১৮২৩ সনে সোসাইটির বিদ্যালয় ছিল সংখ্যায় আটটি। এই বৎসরের মধ্যেই ইহা 'বেঙ্গল ক্রিশ্চিয়ান স্কুল সোসাইটি'র মহিলাবিভাগে

পরিণত হয়। এই বারে ১৯ ডিসেম্বর তারিখে কলিকাতার গৌরী-বাড়িতে সোসাইটির স্কুলের ছাত্রীবৃন্দের একটি সাধারণ পরীক্ষা হয়। তাহাতে এক শত চল্লিশ জনের উপরে হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রী যোগদান করে। সে যুগে এই ধরনের পরীক্ষাকালে সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ এবং সংবাদপত্রসম্পাদকেরা নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত থাকিতেন। পাদ্রী উইলিয়ম কেরী, উইলসন, জেটার ও অন্যান্য বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিগণ ছাত্রীদের লিখনপঠন ও বর্ণবিন্যাসের পরীক্ষা লইতেন। ছাত্রীদের ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। প্রত্যেক শ্রেণীর পরীক্ষার বিষয় হইতে পাঠ্য-তালিকা সম্বন্ধেও কথঞ্চিৎ ধারণা করিতে পারা যায়। প্রথমশ্রেণীতে বর্ণমালা, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীতে জেটারের স্পেলিং বা বর্ণবিন্যাসের বই, চতুর্থশ্রেণীতে মাতা ও কন্যার কথোপকথন ও পীয়ার্সনের স্পেলিং বই, পঞ্চমশ্রেণীতে মাতা ও কন্যার কথোপকথন, নীতিকথা প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ এবং পীয়ার্সনের স্পেলিং বই আর ষষ্ঠশ্রেণীতে পীয়ার্সনের 'মাতা ও কন্যার কথোপকথন', স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক, পীয়ার্সের ভূগোল প্রভৃতি পড়ানো হইত; পরীক্ষাকালে ছাত্রীগণের পাঠে উৎকর্ষ দেখিয়া সকলেই আনন্দ প্রকাশ করেন।

ইহার পূর্ব বৎসর হইতে বিদ্যালয়ের ছাত্রীদিগকে সূচীশিল্প শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। এক বৎসরের শিক্ষার ফলেই তাহারা ইহাতে যেরূপ নৈপুণ্য প্রদর্শন করে তাহাতে উপস্থিত সকলেই বিস্ময় প্রকাশ করেন। মিসেস কোলম্যানের সাক্ষাৎ-পরিচালনার ফলে বিদ্যালয়গুলি এতাদৃশ উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন। সোসাইটির আটটি বিদ্যালয় হইতে ছাত্রীগণ আসিয়া এই পরীক্ষা দেয়। এই আটটি বিদ্যালয় ব্যতীত সোসাইটি কর্তৃক আরও দুইটি বিদ্যালয় এই বৎসরেই প্রতিষ্ঠিত হইল। গৌরীবাড়ি তখন কলিকাতার প্রান্তভাগে অবস্থিত থাকায় নিমন্ত্রিত ভদ্রবৃন্দের তথায়

যাতায়াত সম্ভব ছিল না, এ কারণ কলিকাতার মধ্যস্থলে এইরকম পরীক্ষা গ্রহণের জন্য 'গবর্নমেণ্ট গেজেট'-সম্পাদক পরামর্শ দেন।

বেঙ্গল ক্রিশ্চিয়ান সোসাইটির অঙ্গীভূত হইবার পর জুভেনাইল সোসাইটির কার্য কলিকাতার অভ্যন্তরে এবং মফস্বলেও দ্রুত প্রসার লাভ করে। উক্ত বাৎসরিক পরীক্ষার (১৮২৩) তিন বৎসর পরে ১৮২৬ সনের ১৬ জানুয়ারি তারিখে গৃহীত আর-একটি সাধারণ পরীক্ষার বিবরণ পাওয়া যায়। শুধু কলিকাতার উত্তর বিভাগীয় বিদ্যালয়সমূহ হইতে প্রায় একশত জন ছাত্রী বেনাভোলেণ্ট ইন্স্টিটিউশনে আসিয়া এই পরীক্ষা দেয়। ইয়েটস্, পীয়ার্স ও পিকার্ডের সাহায্যে পাদ্রী উইলসন ছাত্রীদের পরীক্ষা গ্রহণ করিলেন। এই পরীক্ষার বিবরণও সমসাময়িক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। গবর্নমেণ্ট গেজেটের ২৬ জানুয়ারি ১৮২৬ সংখ্যায় পূর্ব বারের মত এবারকার পরীক্ষারও একটি বিবরণ পাওয়া যায়। ইহাতেও দেখিতে পাই ছাত্রীগণ ছয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন বিষয়ে বাংলা ভাষার মাধ্যমে পরীক্ষা দিতেছে। এবার কিন্তু পাঠ্যতালিকায় একটি বিষয় নূতন দেখা যাইতেছে। পূর্ব হইতেই হয়তো ইহার শিক্ষাদান আরম্ভ হয়। উচ্চতর তিন শ্রেণীতে বাইবেলের অংশবিশেষ এবং খৃস্টধর্ম সংক্রান্ত অন্যান্য পুস্তক হইতেও নানা প্রশ্ন তুলিয়া পরীক্ষকগণ ছাত্রীদের পরীক্ষা করিলেন। উত্তর বিভাগের মত কলিকাতার দক্ষিণ বিভাগের ছাত্রীদের খিদিরপুরে পরীক্ষা গ্রহণের প্রস্তাব হয়, কিন্তু ইহার বিবরণ পাওয়া যায় নাই। ইতিমধ্যে কলিকাতায় লেডিজ সোসাইটি নামে আর-একটি শ্বেতাঙ্গ মহিলা সঙ্ঘ ঐ একই উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয় এবং বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে আরম্ভ করে। গবর্নমেণ্ট গেজেট উক্ত পরীক্ষার বিবরণদান-প্রসঙ্গে এ কথারও উল্লেখ করেন।

জুভেনাইল সোসাইটির বিদ্যালয়সংখ্যা ১৮২৯ সনে কুড়িটিতে দাঁড়ায়।

১৮৩২ সন নাগাদ দেখা যায়, নাম পরিবর্তিত হইয়া ইহা 'ক্যালকাটা ব্যাপটিস্ট ফিমেল স্কুল সোসাইটি' নাম পরিগ্রহ করিয়াছে। এই বৎসরে প্রকাশিত সোসাইটির একাদশ কার্যবিবরণীর একটি সংক্ষিপ্তসার ১৮৩২ সনের ডিসেম্বর মাসের 'দি ক্যালকাটা ক্রিশ্চিয়ান অব্জার্ভার' প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা হইতে উক্ত নূতন নাম পাওয়া যাইতেছে। 'অব্জার্ভার' বলেন যে, স্ত্রীশিক্ষায় অগ্রদূত হিসাবে সোসাইটি তখনও ইহার প্রসারকার্যে ব্যাপৃত। কলিকাতা ও অন্যান্য কেন্দ্রের বালিকাবিদ্যালয়গুলি সম্বন্ধেও এইরূপ জানা যাইতেছে : কলিকাতায় ও উপকণ্ঠে সোসাইটির তখন সাতটি স্কুল ছিল। মিসেস ডব্লিউ. এইচ. পীয়ার্স, মিসেস ইয়েট্স, মিসেস পেন্সী এবং মিসেস টমাস এ সমুদয়ের তত্ত্বাবধান করিতেন। এই সাতটি স্কুলের ছাত্রীসংখ্যা ছিল দেড় শত। চিৎপুরে মিসেস জি. পীয়ার্সের তত্ত্বাবধানে একটি সেণ্ট্রাল বা কেন্দ্রীয় স্কুল ছিল; এখনকার ছাত্রীসংখ্যা এক শত কুড়ি জন। কাটোয়ার কেন্দ্রীয় স্কুল পরিচালিত হয় মিসেস ডব্লিউ কেরীর দ্বারা; এখানকার ছাত্রীসংখ্যা দুই শত। বীরভূমের চারিটি স্কুলে মোট ছাত্রী ষাট জন, এবং তত্ত্বাবধায়ক মিসেস উইলিয়মসন। পূর্বে বিভিন্ন স্থলে যেসব বিদ্যালয় ছিল তৎসমুদয় একটি কেন্দ্রীয় স্কুলে একত্র করার দরুন ছাত্রীদের উপস্থিতি যেমন নিয়মিত করা হয়, তাহাদের পাঠোৎকর্ষও তেমনি বাড়িয়া যায়।

এতক্ষণ দেখা গেল, ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটির স্কুলসমূহের ছাত্রীদিগকে বাংলার মাধ্যমে অবেতনে শিক্ষা দেওয়া হইত। ইংরেজি শিক্ষা এইসকল বিদ্যালয়ে আদৌ দেওয়া হইত না। ক্রমে খৃস্টতত্ত্ব শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইলে উচ্চবর্ণের দরিদ্র হিন্দুকন্যারাও এসব স্কুলে পড়া ছাড়িয়া দেয়। তথা-কথিত নিম্নশ্রেণীর ছাত্রীরাই এখানে আসিয়া ভিড় করিত। সে যাহা হউক, প্রকাশ্য স্ত্রীবিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠায় ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটিই পথপ্রদর্শক।

লেডিজ সোসাইটি

লেডিজ সোসাইটির পুরা ইংরেজি নাম 'Ladies' Society for Native Female Education in Calcutta and its Vicinity'। এই সোসাইটি ১৮২৪ সনে চার্চ মিশনরী সোসাইটির আনুকূল্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা কিরূপে স্থাপিত হইল তাহার একটু আনুপূর্বিক ইতিহাস দেওয়া দরকার। দেশে-বিদেশে শিক্ষাবিস্তারের উদ্দেশ্যে লণ্ডনে ব্রিটিশ অ্যাণ্ড ফরেন স্কুল সোসাইটি নামে একটি সংঘ ছিল। কলিকাতা স্কুল সোসাইটিকে সাহায্য করিবার জন্য এই সোসাইটি ১৮২১ সনের নবেম্বর মাসে কুমারী মেরী অ্যান্ কুককে কলিকাতায় প্রেরণ করেন। আমরা দেখিয়াছি, তখন সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েদের প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে শিক্ষা দানের রীতি ছিল না! এ কারণ কলিকাতা স্কুল সোসাইটির কর্ণধারগণ কুমারী কুকের সাহায্য গ্রহণ করিতে পারিলেন না। তবে ইহার দেশীয় সম্পাদক রাধাকান্ত দেবের পরামর্শে চার্চ মিশনরী সোসাইটি তাহাদের পূর্বপ্রকাশিত বিদ্যালয়সমূহের জন্য তাঁহাকে নিযুক্ত করিলেন।

চার্চ মিশনরী সোসাইটির সহায়তায় কুমারী কুক ঠন্‌ঠনিয়া মির্জাপুর শোভাবাজার কৃষ্ণবাজার মল্লিকবাজার ও কুমারটুলিতে কয়েকটি নূতন অবৈতনিক স্ত্রীবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইলেন। স্থানীয় অধিবাসীরাও তাঁহাকে সাহায্য করেন। ১৮২২ সনের এপ্রিল মাস নাগাদ আটটি বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ছাত্রীসংখ্যা হয় কিঞ্চিদধিক দুই শত। এক বৎসরের মধ্যেই বিদ্যালয়সংখ্যা দাঁড়ায় পনরোটিতে এবং এগারোটির জন্য আলাদা বাড়িও তৈরি হয়। তিন শতাধিক ছাত্রী এই বিদ্যালয়গুলিতে অধ্যয়ন করিতে থাকে। প্রথমে ছাত্রীদের লিখন ও পঠন শিখানো হইত। যখনই কয়েকটি বালিকার অক্ষরজ্ঞান হইত তখনই তাহাদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া নীতিকথা ও অন্যান্য বাংলা পুস্তক পড়ানো

হইত, সঙ্গেসঙ্গে সীবনকার্যও শিখানো হইত। ছয়টি বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা বহু ঝাড়ন প্রস্তুত করে। কোনো কোনো ছাত্রী সূক্ষ্ম সূচীকর্মেও পটু হয়। এই ধরনের কাজের জন্য ছাত্রীদিগকে যথাযথ পারিশ্রমিকও দেওয়া হইত। কয়েকটি স্কুলে ছাত্রীরা বুননকার্য শিখিতে আরম্ভ করে। বিদ্যালয়সংখ্যা ক্রমশ বাড়িতে থাকে। কিন্তু হিন্দু সম্ভ্রান্ত ঘরের মাত্র একজন বিধবা তখন পর্যন্ত পাওয়া যায়। তাঁহার উপর একটি বিদ্যালয়ের শিক্ষাদানের ভার অর্পিত হইল। তিন জন যুবতী তখন শিক্ষয়িত্রীর কাজের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন।

আমরা এইসকল তথ্য পাই চার্চ মিশনরী সোসাইটির পাদ্রী আর্চডিকন করীর একখানি আবেদনপত্র হইতে। কলিকাতার কেন্দ্রস্থলে বালিকাদের জন্য একটি সেণ্ট্রাল বা কেন্দ্রীয় স্কুল স্থাপন-উদ্দেশ্যে সাধারণের নিকট তাঁহার এই আবেদন। ১৮২৩ সনের ৬ মার্চ তারিখের 'গবর্নমেণ্ট গেজেটে'র অতিরিক্ত সংখ্যায় ইহা প্রকাশিত হয়। এই আবেদনপত্রে তিনি লেখেন যে, বিদ্যালয়ের সংখ্যা দ্রুত বাড়িয়া যাওয়ায় এবং দূরে দূরে এগুলি প্রতিষ্ঠিত থাকায় কুমারী কুককে প্রত্যহ ঐসকল স্থানে যাইয়া একই বিষয় পুনরাবৃত্তি করার দরুন অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হইতেছে। কেন্দ্রস্থলে একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হইলে সেখানে উচ্চশ্রেণীর বালিকারা সমবেত হইয়া কুক মহোদয়ার নিকট হইতে একই সময়ে পাঠ লইতে পারিবে। ইহার দ্বারা এক দিকে যেমন তাঁহার শ্রম লাঘব হইবে অন্য দিকে তেমনই ছাত্রীদের দ্রুত পাঠোন্নতিও ঘটিবে।

ইতিমধ্যে সোসাইটির পাদ্রী আইজাক উইলসনের সঙ্গে কুমারী কুকের বিবাহ হয়। কুমারী কুক অতঃপর মিসেস উইলসন নামে পরিচিত হইলেন। ১৮২৪ সনের আরম্ভে বালিকাবিদ্যালয় চব্বিশটিতে দাড়ায়। তখন চার্চ মিশনরী সোসাইটি সাক্ষাৎভাবে এ সমুদয়ের পরিচালনভার নিজেদের

হাতে না রাখিয়া তাঁহাদেরই অধীনে মহিলাদের দ্বারা গঠিত একটি সোসাইটিকে অর্পণ করেন। এই সোসাইটি ১৮২৪ সনের ২৫ মার্চ তারিখে প্রতিষ্ঠিত হইয়া লেডিজ সোসাইটি নামে আখ্যাত হয়। ইহার কাজ হইল উক্ত বিদ্যালয়সমূহ পরিচালনা বাদে একটি সেণ্ট্রাল স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগ-আয়োজন করা। তদানীন্তন বড়লাটপত্নী লেডী আমহার্স্ট সোসাইটির 'পেট্রনেস' বা পৃষ্ঠপোষক হইলেন, সহকারী পৃষ্ঠ-পোষক হইলেন আট জন। তেরো জন শ্বেতাঙ্গ মহিলা লইয়া সোসাইটির কমিটি গঠিত হয়। সোসাইটির সম্পাদিকা মিসেস এলারটন এবং তত্ত্বাবধায়ক মিসেস উইলসন উক্ত সভার সদস্য হইলেন। লেডিজ সোসাইটি অতি তৎপরতার সহিত কার্য আরম্ভ করিলেন। তবে এ কথা স্থির হইল যে, লেডিজ সোসাইটি উঠিয়া গেলে স্কুলগুলি স্বতঃই চার্চ মিশনরী সোসাইটির হাতে আসিবে। বাৎসরিক বত্রিশ টাকা চাঁদা দিতে পারিলে লেডিজ সোসাইটির সাধারণ সদস্য হওয়া যাইত।[৬] প্যারীচাঁদ মিত্র বলেন, চাঁদা-দাতাদের মধ্যে হিন্দুর সংখ্যাও কম ছিল না।[৭] তাঁহারা সোসাইটির কার্যে বিশেষ উৎসাহ দেখাইতেন।

চব্বিশটি বিদ্যালয় এবং চারি শত ছাত্রী লইয়া লেডিজ সোসাইটি কার্য শুরু করিয়া দেন। পণ্ডিত গৌরমোহন বিদ্যালংকার ১৮২৪ সনে 'স্ত্রীশিক্ষা-বিধায়কে'র তৃতীয় সংস্করণে লেখেন যে, ঐ সময় কলিকাতায় অন্তত পঞ্চাশটি বালিকা বিদ্যালয় বিদ্যমান ছিল এবং প্রত্যেক বিদ্যালয়ে গড়ে ষোলোটি ছাত্রী ধরিলে মোট ছাত্রীসংখ্যা ছিল তখন আট শত। ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি ও লেডিজ সোসাইটির স্কুল ও ছাত্রীদের কথাই এখানে বলা হইতেছে। লেডিজ সোসাইটির কার্যবিবরণ পাওয়া যায় না। তবে ইহার বার্ষিক সভা, বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের বাৎসরিক পরীক্ষা প্রভৃতির বিবরণ সমসাময়িক সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হইত।

এইসকল হইতে ইহার কার্যকলাপ সম্বন্ধে বেশ একটা আঁচ করা যায়। ১৮২২ হইতে ১৮২৭ সন পর্যন্ত সোসাইটির স্কুল, ছাত্রী এবং পরীক্ষায় উপস্থিত ছাত্রীদের সংখ্যা মোটামুটি এইরূপ ছিল—

সন	বালিকা বিদ্যালয়	ছাত্রীসংখ্যা	যাহাদের পরীক্ষা লওয়া হইয়াছে
১৮২২	৮	২০০	-
১৮২৩	১৫	৩০০	১১০
১৮২৪	২৪	৩০০	১০০
১৮২৫	৩০	৫০০	
১৮২৬		৫৪০	২০০
১৮২৭		৬০০	১৭০

লেডিজ সোসাইটির উদ্বোধন-সভায় একটি প্রস্তাবে বলা হয় যে, কলিকাতার উচ্চশ্রেণীর সম্ভ্রান্ত ও সম্পন্ন ব্যক্তিরাও তাঁহাদের কন্যাগণকে এইসকল বিদ্যালয়ে অধ্যয়নার্থ পাঠাইতেছেন এবং পাঠ্য বিষয়াদি তাঁহাদের মনোনীত হইয়াছে। ছাত্রীদের বাৎসরিক পরীক্ষায় যেসব হিন্দুপ্রধান উপস্থিত হইতেন তাঁহাদের মধ্যে রাজা রাধাকান্ত দেব, রাজা বৈদ্যনাথ রায়, রাজা শিবকৃষ্ণ, নীলমণি দাস, কৃষ্ণসখা ঘোষ এবং কাশীনাথ ঘোষালের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা ছাত্রীদিগকে নানাভাবে উৎসাহ দিতেন, কেহ কেহ ইউরোপীয় মহিলা ও ভদ্রমহোদয়দের সঙ্গে একযোগে তাহাদের পরীক্ষাও লইতেন। এইসব বিবরণ হইতে আরও জানা যায় যে, ছাত্রীরা ইতিহাস ভূগোল গণিত প্রভৃতি বিষয় বাংলার মাধ্যমে শিক্ষা করিত।

উচ্চশ্রেণীতে 'স্ত্রীশিক্ষাবিধায়কে'র কোনো কোনো অধ্যায়ও পঠিত হইত ও সীবনকর্মও শিক্ষা দেওয়া হইত। উৎকৃষ্ট ছাত্রীরা পুরস্কারস্বরূপ সিকি আধুলি ও শাড়ি পাইত।[৮]

১৮২৭ সনের ১৪ ডিসেম্বরে গৃহীত পরীক্ষায় ছাত্রীদের তিনটি বিভাগে ভাগ করিয়া পরীক্ষা লওয়া হয় এবং প্রত্যেক শ্রেণীর ছাত্রী উক্ত বিষয়সমূহ ব্যতীত বাইবেল ও খৃস্টতত্ত্বমূলক পুস্তকাবলীর কিয়দংশেরও ভালো ভাবে পরীক্ষা দেয়।[৯] ইহা হইতে মনে হয়, ১৮২৭ সনের দুই-এক বৎসর পূর্ব হইতেই স্কুলসমূহে খৃস্টতত্ত্ব অবশ্যপাঠ্য করা হয়।

এখন লেডিজ সোসাইটি প্রতিষ্ঠার অন্য প্রধান উদ্দেশ্য কলিকাতায় একটি সেণ্ট্রাল বা কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা বলা যাক। লেডিজ সোসাইটি এই উদ্দেশ্যে একটি ভাণ্ডার খুলিয়া কলিকাতা বোম্বাই ও লণ্ডনে চাঁদা তুলিবার ব্যবস্থা করিলেন। প্রতি বৎসরই পরীক্ষাকালে শখের জিনিসের একটি প্রদর্শনী হইত। উপস্থিত মহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ অতিরিক্ত মূল্যে ঐসকল দ্রব্য ক্রয় করিতেন; মূল্য বাবদ আদায়ের টাকা উক্ত ভাণ্ডারে প্রদত্ত হইত। এই প্রসঙ্গে রাজা বৈদ্যনাথ রায়ের নাম বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিতে হয়। কেননা তিনি সেণ্ট্রাল ফিমেল স্কুল আশু প্রতিষ্ঠাকল্পে সোসাইটির হস্তে ইহার গৃহনির্মাণের জন্য এককালীন কুড়ি হাজার টাকা দান করেন। সোসাইটির মহিলাবৃন্দ পূর্বেই তাঁহার এই দানের কথা জানিতে পারিয়াছিলেন। ১৮২৫ সনের ২৩ ডিসেম্বর ছাত্রীদের যে বাৎসরিক পরীক্ষা হয় তাহাতে উক্ত মহিলাবৃন্দ একখানি সাদা কাপড়ের উপর এই কথা-কয়টি লেখেন MAY EVERY BLESSING ATTEND THE GENEROUS RAJAH BAIDYANATH। রেশম সূতায় তুলিয়া বিশপ হেবার দ্বারা ইহা রাজা বৈদ্যনাথকে উপহার দেওয়াইলেন।[১০] এখানে আর-একটি কথাও বলা আবশ্যক। রাজা বৈদ্যনাথ রায়ের রানী স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। বাটীতে বসিয়া মিসেস উইলসনের নিকট তিনি ইংরেজি শিখিতেন। তিনিও এই সেণ্ট্রাল স্কুল প্রতিষ্ঠায় উৎসাহী ছিলেন এবং প্রতিষ্ঠা হইবার পর বহু দিন সেখানে যাতায়াত করিতেন।

যথোপযুক্ত অর্থ সংগৃহীত হইলে সোসাইটি হেদুয়ার পূর্ব পার্শ্বে ভূমি ক্রয় করিলেন। এই অঞ্চল তখন কলিকাতার জনাকীর্ণ কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত বলিয়া বিবেচিত হইত। ইহারই সন্নিকটে রাজা রামমোহন রায়ের বিখ্যাত অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান স্কুল ছিল। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ইহার পঁচিশ বৎসর পরে হেদুয়ার পশ্চিম পার্শ্বে উক্ত কারণেই বেথুন সাহেব বেথুন বালিকাবিদ্যালয়ের জন্য ভূমি সংগ্রহ করেন। প্রারম্ভিক আয়োজনাদি সম্পূর্ণ হইলে বড়লাটপত্নী আমহার্স্ট ১৮২৬ সনের ১৮ মে মহাসমারোহে কলিকাতা সেণ্ট্রাল ফিমেল স্কুলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করিলেন।[১১]

সেণ্ট্রাল ফিমেল স্কুলভবনের নির্মাণকার্য ১৮২৭ সনের মাঝামাঝি নাগাদ অনেকটা অগ্রসর হয়। এই সময় সোসাইটির বিদ্যালয়গুলির ছাত্রীসংখ্যা ছিল ছয় শত। প্রতিদিন গড়ে চারি শত ছাত্রী উপস্থিত হইত। এইসকল ছাত্রীর মধ্যে একটি অন্ধ ছাত্রী পড়াশুনায় সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয়। সেণ্ট্রাল ফিমেল স্কুলের গৃহনির্মাণ শেষ হইবার পূর্ব হইতেই মিসেস উইলসন উক্ত ভবনের নিকটবর্তী একটি গৃহে ছাত্রীদের একত্র করিয়া পড়াইতেছিলেন। ইহাতে তাঁহার অনেক সময় বাঁচিত, শ্রমও অনেকটা লাঘব হইত।[১২]

সোসাইটির চতুর্থ বার্ষিক সভা হয় ১৮২৮ সনের ১৭ জুন তারিখে। সভায় এক শত শ্বেতাঙ্গ মহিলা, কলিকাতার লর্ড বিশপ, সুপ্রিম কোর্টের (পরে, কলিকাতা হাইকোর্ট) প্রধান বিচারপতি, রাজা বৈদ্যনাথ রায়, কাশীনাথ মল্লিক এবং আরও মান্যগণ্য দেশীয় বহু ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। সেণ্ট্রাল ফিমেল স্কুলগৃহের নির্মাণকার্য ইতিপূর্বেই শেষ হইয়া যায়। ১৮২৮ সনের ১ এপ্রিল তারিখে মিসেস উইলসন কর্তৃক ইহার দ্বার উন্মোচিত হয়। উক্ত বার্ষিক সভায় পূর্ব বৎসরের যে কার্যবিবরণী প্রদত্ত হইল তাহা পাঠে জানা যাইতেছে যে, ঐ বৎসরে সোসাইটির বিদ্যালয়গুলির

পুনর্গঠনকার্যও সম্পন্ন হয়। ইহা সংক্ষেপে এইরূপ : সোসাইটির অধীনে ঊনত্রিশটি বিদ্যালয় ছিল, এই বিদ্যালয়গুলিকে সেণ্ট্রাল স্কুল হইতে সমদূরবর্তী করিয়া চারিটি ভাগে ভাগ করা হয়; সেণ্ট্রাল স্কুলে প্রত্যহ ছাত্রীদের উপস্থিতি সংখ্যা সত্তর, শ্যামবাজার বিভাগে আশি এবং অন্য তিনটি বিভাগীয় স্কুলের প্রত্যেকটিতে ত্রিশ জন; মোট দুই শত চল্লিশ জন। নূতন ব্যবস্থায় ছাত্রীসংখ্যা কমিয়া গেলেও মিসেস উইলসনের পক্ষে প্রত্যহ তত্ত্বাবধান করা সহজ হয় এবং পাঠে উৎকর্ষও দ্রুত হইতে থাকে। এই বিবরণী হইতে আরও জানিতে পারা যায় যে, বর্ধমানে মিসেস ডিয়ারের তত্ত্বাবধানে চারিটি বালিকাবিদ্যালয় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়, ইহাতে মোট ছাত্রীসংখ্যা এক শত জন।[১৩] এই বার্ষিক সভাতেও সোসাইটির জন্য অর্থ সংগৃহীত হইল। উপস্থিত ভারতবাসীরাই দিলেন দুই হাজার টাকা।[১৪]

এই পুনর্গঠিত স্কুলগুলির বালিকাদের প্রথম প্রকাশ্য বার্ষিক পরীক্ষা হয় ১৮২৮ সনের ১৭ ডিসেম্বর। এইসকল বিদ্যালয় হইতে বাছাই-করা একশতটি ছাত্রী চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পরীক্ষা দিল। পাঠ্যতালিকায় বাইবেল ও খৃস্টতত্ত্বমূলক্ কাহিনীসকল পূর্বের ন্যায় বলবৎ ছিল। বালিকারা সকলেই অল্পবয়স্ক হইলেও পাঠে বেশ উন্নতি দেখায়।[১৫] বলা বাহুল্য, বাংলাভাষার মাধ্যমেই সকল বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইত। সেণ্ট্রাল ফিমেল স্কুলে মনিটর বা শিক্ষয়িত্রীদের একটি নূতন শ্রেণী খোলা হয়। তাঁহারাও এবারে প্রথম এই পরীক্ষা দেন। এই শ্রেণীর ছাত্রীদের সম্বন্ধে পাদ্রী লঙ্ বলেন, তাঁহারা তরুণী বিধবা ও স্বামীপরিত্যক্তা। তাঁহারা পূর্বে সোসাইটির স্কুলসমূহে পড়িতেন। পরে তাঁহারা আসিয়া মিসেস উইলসনের আশ্রয় লন। তাঁহারা এই শ্রেণীতে থাকিয়া শিক্ষাদান সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করিতেন। এই শ্রেণীটিতেই পরবর্তীকালের স্ত্রী-নর্মাল বিদ্যালয়ের গোড়াপত্তন হয়।[১৬]

১৮২৯ সনের ৪ নবেম্বর তারিখে পরবর্তী বাৎসরিক পরীক্ষা হইল। এ বৎসর সোসাইটির স্কুলসমূহে গড়ে এক শত সত্তর জন ছাত্রী উপস্থিত হয়, এবং আশি জন বাছাই-করা ছাত্রী পরীক্ষা দেয়। পর বৎসরেও যথারীতি পরীক্ষা হয়। ছাত্রীরা পাঠে বেশ উন্নতি করিতে থাকে। লেডিজ সোসাইটির অষ্টম বার্ষিক সভা হয় ১৮৩১ সনের ১০ আগস্ট। সোসাইটির কার্য এলাহাবাদ পর্যন্ত প্রসারিত হয়। কলিকাতার সেণ্ট্রাল স্কুল বাদে মির্জাপুর বর্ধমান কালনা পাটনা বারানসী এবং এলাহাবাদের স্কুলগুলির অবস্থাও এবারকার কার্যবিবরণী পাঠে বিশদভাবে জানা গেল। এইসকল স্কুলে পাঁচ শতের উপর ছাত্রী পড়াশুনায় লিপ্ত ছিল।[১৭]

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, এইসকল বিদ্যালয়ের খৃস্টতত্ত্ব অধ্যয়ন পাঠ্য তালিকার একটি বিশেষ অঙ্গ ছিল। ইহার উদ্দেশ্য ছিল, অল্পবয়স্ক ছাত্রীদের কোমল হৃদয়ে খৃস্টধর্মের কথা গাঁথিয়া দেওয়া, যাহাতে তাহারা পাঠ-সমাপনান্তে নিজ নিজ গৃহে ইহার ভাব প্রচার করিতে পারে। কিন্তু এই আসল উদ্দেশ্যটি সিদ্ধ না হওয়াতে সোসাইটির উদ্যোক্তারা অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মতে হিন্দু পিতামাতাদের সংস্কার গোঁড়ামি এবং অজ্ঞতার দরুনই ছাত্রীদের শিক্ষা সংস্কার কার্যে মোটেই সমর্থ হয় নাই।[১৮] লেডিজ সোসাইটির মনোগত অভিপ্রায়ের বিষয় জানিতে পারিয়া সম্ভ্রান্ত হিন্দুগণ ইহার উপর বিরূপ হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা পূর্বের ন্যায় ইহার প্রতি আর সহানুভূতিসম্পন্ন থাকিতে পারেন নাই। ১৮৩১ সনের ১৪ ডিসেম্বর সোসাইটির স্কুলগুলির ছাত্রীদের পুনরায় বাৎসরিক পরীক্ষা হইল। পরবর্তী ১৯ ডিসেম্বর তারিখে প্রসন্নকুমার ঠাকুর তদীয় 'দি রিফর্মার' নামক ইংরেজি সাপ্তাহিকে এই উপলক্ষ্যে লেখেন: ছাত্রীগণ শিক্ষা লাভ করিয়া সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েদের বাড়িতে বসিয়া শিক্ষা দিবেন ইহাই এ সকল বিদ্যালয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু ইহার পক্ষে দুইটি

বিষম বাধা রহিয়াছে। একটি হইল শিক্ষালাভান্তে নিম্নশ্রেণীর বালিকাদের সম্ভ্রান্ত পরিবারে প্রেরণ করিলে সেখানে তাহারা কচিৎ প্রবেশের অনুমতি পায়; দ্বিতীয়টি এবং অধিকতর মারাত্মক বাধা হইল, ছাত্রীদের খৃস্টান শাস্ত্র পড়িতে বাধ্য করানো। হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষগণ যদি ইহার প্রতিষ্ঠাকালে সাধারণকে এই আশ্বাস না দিতেন যে, এখানে কোনো ধর্ম বিষয়ই শিক্ষা দেওয়া হইবে না, তাহা হইলে কি আর ইহার এত উন্নতি হইতে পারিত? ইহার পরে তিনি সোসাইটির কর্তৃপক্ষকে এই পরামর্শ দিলেন যে, বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষার ভিত্তি আরও দৃঢ়ীভূত ও উদারতর করা আবশ্যক। শিক্ষার্থিনী ছাত্রীদের জাতীয় সংস্কারের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। তাহা হইলেই বর্তমান ব্যবস্থা কার্যকরী হইতে পারিবে এবং হিন্দু কলেজ যেমন পুরুষদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে সমর্থ হইয়াছে এখানকার শিক্ষাব্যবস্থা দ্বারাও সেইরূপ নারীদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইবে।

'রিফর্মার' মারফত প্রসন্নকুমার ঠাকুরের এই উপদেশ সোসাইটি কর্তৃক গৃহীত হয় নাই, যদিও ইহার কর্তৃপক্ষ শিক্ষার ফলাফল দেখিয়া বিশেষ আশান্বিত হইতে পারিলেন না। কোনো কোনো পত্রিকা ছাত্রীদের শিক্ষার উন্নতি দেখিয়া কিন্তু প্রশংসাই করেন। 'দি ক্যালকাটা ক্রিশ্চিয়ান অবজার্ভার' ১৮৩২ সনের ডিসেম্বর সংখ্যায় ৭ ডিসেম্বরে গৃহীত দশম বাৎসরিক পরীক্ষার বিবরণে প্রকাশ, সেণ্ট্রাল ফিমেল স্কুলের সঙ্গে যুক্ত বিদ্যালয়সমূহ হইতে সেণ্ট্রাল ফিমেল স্কুল ভবনে তিন শত জন ছাত্রী এই পরীক্ষায় যোগদান করেন। বাইবেল ও খৃস্টধর্ম সম্বন্ধীয় অন্যান্য পুস্তক ছাত্রীদের নিয়মিত পড়ানো হইত এবং পরীক্ষা কালে এতৎসমুদয় হইতে তাহাদের পরীক্ষাও লওয়া হইত।

দক্ষিণবঙ্গে ১৮৩৩ সনে ভীষণ জলপ্লাবন এবং পর বৎসর যুক্তপ্রদেশে

একটা বড় রকমের দুর্ভিক্ষ হয়। উভয় কারণেই বহু শিশু পিতৃমাতৃহীন হইয়া পড়ে। মিসেস উইলসন জলপ্লাবনের পরেই অনেক পিতৃমাতৃহীন শিশুকে আশ্রয় দেন ও সেণ্ট্রাল ফিমেল স্কুলে একটি শিশুশ্রেণী খুলেন। তাহাদের শিক্ষার ভার মিসেস উইলসন স্বয়ং গ্রহণ করেন। ১৮৩৩ সনের ডিসেম্বর মাসে তৎকালীন বড়লাটপত্নী লেডী বেন্টিঙ্কের উপস্থিতিতে ছাত্রীদের পরীক্ষা গৃহীত হইল। শিশুশ্রেণীর ছাত্রীদের পাঠে উন্নতি দেখিয়া বড়লাটপত্নী বিশেষ তৃপ্তিলাভ করেন। অন্যান্য শ্রেণীর ছাত্রীরা কেহই একাদিক্রমে দুই বৎসরের অধিককাল স্কুলে পড়িতে পাইত না। কিন্তু এই শিশুশ্রেণীর ছাত্রীদের একসঙ্গে বহুদিন পড়াশুনা করিবার সুবিধা ছিল। তাহারা সেণ্ট্রাল ফিমেল স্কুলের মধ্যেই থাকিত।[১৯]

মিসেস উইলসন ১৮৩৬ সনের অক্টোবর মাস পর্যন্ত সোসাইটির কার্যে লিপ্ত ছিলেন। তাঁহার আশ্রিত পিতৃমাতৃহীন শিশুদের জন্য একটি প্রতিষ্ঠানের অভাব বোধ করিতেছিলেন। তাঁহারই চেষ্টাযত্নে আগরপাড়ায় একটি অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইল। তিনি ১৮৩৬, ২১ অক্টোবর এই আশ্রম পরিচালনার ভার লইলেন। মিসেস উইলসন ১৮৪২ সনের জানুয়ারি নাগাদ আগরপাড়ায় অনাথাশ্রমের (orphanage) কাজে লিপ্ত ছিলেন।[২০] তাঁহার ধর্মসম্বন্ধীয় মত পরিবর্তিত হইলে তিনি আগরপাড়া পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসেন। এখান হইতে ১৮৪৫ সনের জুন মাসের প্রথমে তিনি 'প্রিকার্সর' জাহাজে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।[২১] এ দেশে স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারে মিসেস উইলসনের কৃতিত্ব কখনো ভুলিবার নয়।

মিসেস উইলসনের পর ১৮৩৭ সনে সেণ্ট্রাল ফিমেল স্কুল তত্ত্বাবধানের ভার মিসেস টমসন এবং মিসেস হোয়াইট গ্রহণ করেন। এই বিদ্যালয়টি দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া এ দেশে স্ত্রীশিক্ষাপ্রসারে বিশেষ সহায়তা করে।

লেডিস সোসাইটি ১৮৪০ সনে সেণ্ট্রাল ফিমেল স্কুল ব্যতীত আরও তিনটি স্কুল পরিচালনা করিতেন। এ তিনটি হইতেছে মির্জাপুর স্কুল, সারকুলার রোড স্কুল এবং হাওড়া স্কুল। মোট এই চারিটি স্কুলের ছাত্রীসংখ্যা ছিল প্রায় পাঁচ শত। দেশীয় খৃস্টানদের কন্যারাই এসব বিদ্যালয়ে বেশি পড়িত।[২২] লেডিস সোসাইটির কার্য ক্রমেই সংকুচিত হইয়া আসে। ১৮৫২ সনে কলিকাতায় ইহার এই সেণ্ট্রাল ফিমেল স্কুলটি মাত্র ছিল। তবে কৃষ্ণনগর কেন্দ্রে ইহা দ্বারা আরও ছয়টি স্কুল পরিচালিত হইত। এই-সব বিদ্যালয়ে বিভিন্ন ধর্ম ও জাতির মেয়েরা একত্র বসিয়া পড়াশুনা করিত। বাংলা লিখনপঠন, ইতিহাস, ভূগোল ও গণিতের সাধারণ জ্ঞান এবং সেলাইয়ের কাজ ছাত্রীদের শিখানো হইত। খৃস্টান ধর্মগ্রন্থাদি যে পড়ানো হইত তাহা বলাই বাহুল্য। খৃস্টান মেয়েরা বোর্ডিঙে থাকিয়া সেণ্ট্রাল ফিমেল স্কুলে অধ্যয়ন করিত, সেইজন্য ইহা একটি বোর্ডিং-স্কুলের পর্যায়ে পড়ে।[২৩]

পূর্বে বলা হইয়াছে, এই বিদ্যালয়টিতে শিক্ষয়িত্রী সংগঠনের ব্যবস্থা ছিল। ১৮৫২ সনের ২৫ ফেব্রুয়ারি একটি পুরাপুরি নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইল। তখন হইতেই সেণ্ট্রাল ফিমেল স্কুলের সঙ্গে ইহাকে মিলিত করার প্রস্তাব হয়। কিন্তু ইহা কার্যকরী হইতে আরও কয়েক বৎসর লাগিয়াছিল। ১৮৫৭ সনে উভয়ই মিলিত হইয়া একটি নর্মাল স্কুল গঠিত হইল। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পুত্রবধূ স্বল্পবয়সে পরলোকগতা বিদুষী বালসুন্দরী ঠাকুরের জীবনীকার পাদ্রী এড্‌ওয়ার্ড স্টরো *Our Indian Sisters* পুস্তকে এই মর্মে লিখিয়াছেন, বালিকাবিদ্যালয়গুলির জন্য এবং সম্ভ্রান্ত লোকদের পরিবারে নারীগণের শিক্ষাদান উদ্দেশ্যে যোগ্য শিক্ষয়িত্রীর অভাব বিশেষ অনুভূত হইল। ইহার ফলেই 'Normal School for the Training of Christian Female

'Teachers' নামক একটি নর্মাল স্কুলের প্রতিষ্ঠা হয়। সেণ্ট্রাল ফিমেল স্কুলেরও আংশিক উদ্দেশ্য এইরূপই ছিল। ১৮৫৭ সনে দুইটি বিদ্যালয় একীভূত হইল এবং নাম পরিগ্রহ করিল—"Normal, Central and Branch Schools"। ইহার পরেই সম্ভবত লেডিজ সোসাইটির কার্যের পরিসমাপ্তি ঘটে। সেণ্ট্রাল ফিমেল স্কুল ভবনটি হেদুয়ার দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অদ্যাপি বর্তমান।

লেডিজ অ্যাসোসিয়েশন

পূর্বোক্ত সোসাইটি দুইটির মত লেডিজ অ্যাসোসিয়েশনও স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারে কম কার্য করে নাই। ইহার পুরা নাম 'Calcutta Ladies' Association for Native Female Education'। ১৮২৫ সনের ১৪ই জানুয়ারি কয়েকজন ইউরোপীয় মহিলা এই অ্যাসোসিয়েশন বা সভা প্রতিষ্ঠা করেন। দুইটি মাত্র উদ্দেশ্য লইয়া ইহা প্রথমত প্রতিষ্ঠিত হয়, যথা, ১. লেডিজ সোসাইটির আনুকূল্যে প্রস্তাবিত সেণ্ট্রাল ফিমেল স্কুলের জন্য অর্থসংগ্রহ, এবং ২. লেডিজ সোসাইটির স্কুল যে যে অঞ্চলে ছিল না সেসব স্থলে বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। ইহা হইতে এই অ্যাসোসিয়েশনকে লেডিজ সোসাইটির আনুষঙ্গিক সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠানও বলা যায়। মিসেস উইলসন এই সভার অধিনেত্রী হইলেন। ইহার কার্য পরিচালনের জন্য প্রধানত চাঁদাদাতাদের মধ্য হইতে একটি পরিচালকসভা গঠিত হইল।

লেডিজ অ্যাসোসিয়েশনেরও কতকগুলি নিয়মকানুন রচিত হইল। বৎসরে বারো টাকা চাঁদা দিলেই ইহার সভ্য হওয়া যাইত। যাঁহারা অ্যাসোসিয়েশনের স্কুলগুলির তত্ত্বাবধান করিবেন তাঁহাদের এই চাঁদা হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইল। পূর্বোক্ত সোসাইটি দুইটির ন্যায় প্রতি বৎসর ইহারও একটি সাধারণ সভার অধিবেশন হইবার কথা থাকে। উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া অ্যাসোসিয়েশনের চাঁদা ও দান এইরূপে দুই

ভাগে ভাগ করিয়া রাখার কথা হইল : ১. সেণ্ট্রাল স্কুলের জন্য এবং ২. কলিকাতা লেডিস অ্যাসোসিয়েশনের অধীন বালিকা-বিদ্যালয়গুলির জন্য। অ্যাসোসিয়েশনের বিষয় ১৮২৫, ২৮ জানুয়ারি তারিখে অনুষ্ঠিত একটি সাধারণ সভায় সকলকে বুঝাইয়া দেওয়া হইল। এখানে এ কথা পরিষ্কার করিয়া বলা হইল যে, লেডিজ সোসাইটির কার্য-প্রসারোদ্দেশ্যেই ইহা স্থাপিত হইয়াছে।

এই অ্যাসোসিয়েশনটি প্রকৃত প্রস্তাবে লেডিজ সোসাইটিরই একটি অঙ্গ ছিল, প্রারম্ভেই এ কথা বলা হইয়াছে। ইহার কার্যও বেশি ব্যাপক ছিল না। একারণ ইহার কার্যকলাপের বিষয় অধিক প্রচারিত হইতে দেখি না। এমন কি ১৮৪৮ সনে প্রকাশিত পাদ্রী লঙের ***Hand-Book of Bengal Missions*** গ্রন্থে ইহার সামান্যই উল্লেখ পাই। সমসাময়িক সংবাদপত্র না পাইলে ইহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যাইত না। কলিকাতা লেডিজ অ্যাসোসিয়েশনের প্রথম বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন হয় ১৮২৬ সনের ১৩ ফেব্রুয়ারি তারিখে। ১৮২৬এর ২০ ফেব্রুয়ারি তারিখের গবর্নমেণ্ট-গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় ইহার বিবরণ বাহির হইয়াছিল। ইহা হইতে জানা যায়, লেডিজ সোসাইটির স্কুল হইতে দূরে দূরে অ্যাসোসিয়েশন ছয়টি বালিকাবিদ্যালয় খুলিতে সমর্থ হয়। ঐসব অঞ্চলের মহিলারাই ইহাদের তত্ত্বাবধান করিতেন। প্রথম বৎসরে অ্যাসোসিয়েশন দুই হাজার টাকা তুলিতে সমর্থ হয় এবং উদ্দেশ্য অনুযায়ী ইহার অর্ধেক এক হাজার টাকা সেণ্ট্রাল ফিমেল স্কুলের জন্য দান করে।

অ্যাসোসিয়েশনের দ্বিতীয় বার্ষিক সভা হয় ১৮২৭ সনের ২৯ জানুয়ারি। দ্বিতীয় বৎসরে ইহা আরও ছয়টি বিদ্যালয় স্থাপন করে। কুমারী হেব্রন নাম্নী একজন মহিলাকে ইহার বেতনভোগী তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু বৎসরের মধ্যেই তাঁহাকে কলিকাতা ত্যাগ করিতে হওয়ায় আট জন

মহিলা স্বেচ্ছায় এই ভার গ্রহণ করেন। তাঁহারা পালা করিয়া বিদ্যালয়সমূহ পরিদর্শন করিতেন। সেক্রেটারী পাদ্রী আইজাক উইলসন প্রদত্ত কার্য-বিবরণী হইতে জানিতে পারা যায়, বারোটি স্কুলই অ্যাসোসিয়েশন দ্বারা পরিচালিত হইতেছিল, কিন্তু শেষে দুইটি উঠিয়া যায়। অবশিষ্ট দশটি বিদ্যালয়ের ছাত্রীসংখ্যা ছিল এক শত ষাট জন। ছাত্রীদের অধিকাংশই মুসলমান-কন্যা; হিন্দুদের অপেক্ষা ইহারা অতি অল্প দিনই স্কুলে লেখাপড়া করে। শ্রেণীভেদে খৃস্টতত্ত্ববিষয়ক বিভিন্ন পুস্তকও পড়ানো হইত। এই বিবরণী হইতে বিদ্যালয়সমূহের ছাত্রীদের ১৮২৬ সনের ৪ ডিসেম্বরে গৃহীত দ্বিতীয় বার্ষিক পরীক্ষার কথাও আমরা জানিতে পারি। ছাত্রীদের পাঠোৎকর্ষে সকলেই মুগ্ধ হন। ইটালী স্কুলে এই বৎসর নিয়মিত ভাবে মাসিক পরীক্ষাও লওয়া হইত।[২৪]

ইটালী ও জানবাজার অঞ্চলেই অ্যাসোসিয়েশনের অধিকাংশ স্কুল প্রতিষ্ঠিত ছিল। অর্থের অভাবে এতগুলি স্কুল রক্ষা করা ইহার পক্ষে সম্ভব হইল না। তৃতীয় বৎসরে ইহাকে নূতন ব্যবস্থা করিতে হইল। তৃতীয় কার্যবিবরণীতে বলা হয় যে, পূর্ব বৎসরের দশটি স্কুলের মধ্যে কয়েকটি উঠিয়া যায়, অবশিষ্টগুলি মিলাইয়া দুইটি বড় স্কুল গঠিত হয়, একটি বেনেটোলায় এবং অপরটি চাঁপাতলায়। প্রথমটিতে চল্লিশ জন এবং অপরটিতে প্রায় পঁচিশ জন ছাত্রী প্রত্যহ হাজির হইত। এই বৎসরে সাত জন শ্বেতাঙ্গ মহিলা স্বেচ্ছায় ইহাদের তত্ত্বাবধানের ভার লইলেন। তাঁহারা পর্যায়ক্রমে ছাত্রীদিগকে বাংলার মাধ্যমে পড়াইতেন। কয়েক জন ছাত্রী সীবনকর্মও শিক্ষা করে।[২৫] তৃতীয় বাৎসরিক পরীক্ষা গৃহীত হয় ১৮২৭ সনের নবেম্বর মাসে। ছাত্রীরা পূর্বের মতই কৃতিত্বের সহিত ইহাতে উত্তীর্ণ হয়।

১৮২৮ সন হইতে ১৮৩২ সন পর্যন্ত অ্যাসোসিয়েশনের কার্যকলাপ

জানা যায় নাই। তবে ১৮৩৩ সনের ১৯ মার্চ ইহার অধীন ছাত্রীদের একটি বাৎসরিক পরীক্ষার কথা হইতে জানা যাইতেছে। তখন অ্যাসোসিয়েশন সার্কুলার রোডে একটিমাত্র স্কুল পরিচালনা করিতেন। বাইবেলের খুঁটিনাটি যাবতীয় বিষয়ই ছাত্রীদের পড়ানো হইত। কাজেই ইহাকে একটি 'বাইবেল-স্কুল'ও বলা যাইতে পারিত।[২৬]

পাদ্রী লঙ্ যে তাঁহার পুস্তকে ইহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন তাহার কথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। স্কুলটির শিক্ষক, শিক্ষাদানপদ্ধতি, ছাত্রী প্রভৃতি সংক্রান্ত কিছু কিছু তথ্য বিবরণের মধ্যে পাই। স্কুলগুলি সব উঠিয়া গিয়া যে একটি কেন্দ্রীয় স্কুলে পর্যবসিত হয় তাহার কথা লঙ্ সাহেবও বলিয়াছেন। শিক্ষকগণ ছাত্রীদের পড়াইতেন। এক খৃস্টান দম্পতির উপর ইহার শিক্ষার ভার দেওয়া হয়। এক জন বর্ষীয়সী খৃস্টান মহিলা এবং উপরের শ্রেণীর তিন জন ছাত্রী তাঁহাদের শিক্ষাদান কার্যে সাহায্য করিতেন। এই অ্যাসোসিয়েশন দশ বৎসর চলিয়া ১৮৩৪ সনে উঠিয়া যায়।

শ্রীরামপুর মিশন

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশনের স্ত্রীশিক্ষা-প্রচেষ্টার কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। উইলিয়াম কেরী, জোসুয়া মার্শম্যান ও উইলিয়ম ওয়ার্ড— তিন জনে মিলিয়া ১৮০০ সনে শ্রীরামপুরে এই মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। জোসুয়া মার্শম্যান এদেশবাসীদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের বিষয় বিশেষভাবে চিন্তা করেন। তিনি মিশন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলির রক্ষণাবেক্ষণ ও শিক্ষার ব্যবস্থা সম্বন্ধে একটি সুচিন্তিত প্রস্তাব লিখিয়া ১৮১৪ সনেই বিলাতে প্রেরণ করেন। পরবর্তী দুই বৎসরের অধিকতর অভিজ্ঞতার ফলে তিনি তাঁহার প্রস্তাব

সংশোধন ও পরিবর্ধনপূর্বক *Hints to Native Schools, etc.* নামে ১৮১৬ সনে একখানি পুস্তক লেখেন। ইহাতে মাতৃভাষা বাংলার মাধ্যমেই যে বঙ্গসন্তানদের শিক্ষাদান আবশ্যক এ কথা তিনি অতি জোরের সঙ্গে বলিয়াছেন। শ্রীরামপুরকে কেন্দ্র করিয়া তখন চারিদিকে বিস্তর বালক-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সাধারণের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারকল্পে বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অয়োজন হয় ইহার কয়েক বৎসর পরে।

ওয়ার্ড ইতিমধ্যে একবার বিলাত যান এবং ১৮২১ সনের নবেম্বর মাসে শ্রীরামপুরে ফিরিয়া আসেন। তাঁহার সঙ্গে একই জাহাজে কুমারী মেরি অ্যান কুক আসিয়াছিলেন। তাঁহার বিষয় আমরা ইতিপূর্বেই জানিতে পারিয়াছি। শ্রীরামপুরের পাদ্রীগণের এই বিশ্বাস ছিল যে, দেশীয় খৃস্টানদের মধ্যে খৃস্টতত্ত্ব বদ্ধমূল করার পক্ষে মাতাকে সুশিক্ষিত করা অগ্রে আবশ্যক। এইজন্য তাঁহারা পূর্বে দেশীয় খৃস্টান বালিকাদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ওয়ার্ড ফিরিয়া আসিলে ইহাকে আরও ব্যাপকতর করার জন্য যত্নপর হইলেন। ওয়ার্ড স্বয়ং স্ত্রীশিক্ষা বিভাগটি হাতে লইয়া শ্রীরামপুরের চতুর্দিকে বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি অল্পদিন পরেই ১৮২৩ সনের ৭ মার্চ মৃত্যুমুখে পতিত হন। তথাপি এ বিভাগের কাজ কিন্তু দ্রুত চলিতে লাগিল।

শ্রীরামপুরের হিন্দুপ্রধানেরাও স্ত্রীশিক্ষায় বিশেষ উৎসাহ দেখাইতে থাকেন। বালকবিদ্যালয়গুলির মত বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তাঁহারা মিশনরীদের বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। শ্রীরামপুর বালিকাবিদ্যালয়-গুলির ছাত্রীদের একটি পরীক্ষা হয় ১৮২৪ সনের ৫ এপ্রিল। পরবর্তী ১০ এপ্রিলের 'সমাচার দর্পণ' বালিকাদের উক্ত পরীক্ষার এই বিবরণ দিয়াছেন—

'পরীক্ষা।—৫ এপ্রিল সোমবার দিবা দশ ঘণ্টার সময় শহর শ্রীরাম-পুরের কাছারি-বাটীর সম্মুখস্থ বাবু গোপাল মল্লিকের বাটিতে শ্রীরামপুরের

ও তৎচতুর্দিকস্থ গ্রামের পাঠশালার বালিকাদের বিদ্যার পরীক্ষা হইয়াছে তাহাতে সাহেব লোক ও বিবি লোক অনেকে আসিয়াছিলেন। ঐ স্থানে তেরটা পাঠশালার সর্বসুদ্ধা দুই শত ত্রিশ বালিকা একত্র হইয়াছিল। ইহারদের মধ্যে পঞ্চাশ জন শব্দ পাঠ করিয়া ও পঁয়ত্রিশ জন নানাপ্রকার ক্ষুদ্র২ পুস্তক পাঠ করিয়া সকলকে পরমাপ্যায়িত করিল ও অবশিষ্ট বালিকারা কথা বানান ইত্যাদি পড়িল। পরে বিবি মার্শমন উঠিয়া বালিকারদিগকে বস্ত্র ও শিকি ও পয়সা ও ছবি ইত্যাদি পারিতোষিক দিলেন, অপর সকলে সন্দেশ পাইয়া সন্তুষ্টা হইয়া স্বস্বস্থানে প্রস্থান করিল। দুই প্রহরের পর পরীক্ষা সমাপ্তা হইলে রিবরেণ্ড শ্রীযুত জন মাক সাহেব ঐ সকল পাঠশালার বিবরণ পাঠ করিলেন তাহা শুনিয়া সাহেব লোকের তুষ্টি হইল। অপর বালিকারা যেসকল শিল্পকর্ম অর্থাৎ মোজা ও রুমাল ও থলিয়া প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়াছিল তাহা দেখিয়া সকলে অধিক সন্তুষ্ট হইলেন।'

বিদ্যালয়সংখ্যা ১৮২৫ সনে আরও বাড়িয়া গিয়াছিল মনে হয়। কারণ কেরী মার্শম্যান ওয়ার্ডের জীবনীকার জন ক্লার্ক মার্শম্যান (ইনি জোসুয়া মার্শম্যানের পুত্র) লেখেন যে, শ্রীরামপুর কলেজহলে তিন শতাধিক ছাত্রী পরীক্ষা দিতে আসে এবং তাহাদের পাঠে উন্নতি দেখিয়া উপস্থিত সকলেই আনন্দিত হন।[২৭] শ্রীরামপুর মিশনের স্কুল ও ছাত্রী-সংখ্যা ক্রমশ বাড়িয়া চলিতেছিল। তবে ইহার পরবর্তী ১৮২৬ ও ১৮২৭ সনের কোনো বিবরণ না পাওয়ায় উন্নতির ক্রম ধরা সম্ভব নয়।

১৮২৮ সনের ফেব্রুয়ারি সংখ্যা ***Missionary Intelligence*** মাসিকে শ্রীরামপুর মিশনকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বালিকাবিদ্যালয়গুলির একটি বিস্তৃত বিবরণ বাহির হয়। মিশন তখন এলাহাবাদ হইতে আরাকান পর্যন্ত বিভিন্ন কেন্দ্রে বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই বিবরণে উক্ত বিদ্যালয়-

গুলির চতুর্থ বাৎসরিক পরীক্ষার কথাও সংক্ষেপে দেওয়া হইয়াছে। ইহা হইতে জানা যায়, পূর্ব পূর্ব সোসাইটির স্কুলগুলির মত এই সময় এখানকার বিদ্যালয়গুলিতেও ইতিহাস ভূগোল গণিত প্রভৃতির সঙ্গে বিভিন্ন শ্রেণীতে বাইবেল ও খৃস্টতত্ত্ববিষয়ক বিভিন্ন পুস্তক পড়ানো হইত। বীরভূম ঢাকা চট্টগ্রাম যশোহর আরাকান কাশী ও এলাহাবাদের বিদ্যালয়গুলির বিষয়ও আমরা ইহাতে কিছু কিছু জানিতে পারি। শ্রীরামপুরের বালিকা-বিদ্যালয়গুলির নামেও কিঞ্চিৎ বৈশিষ্ট্য ছিল। ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটির স্কুলের মত ইহাদের নামও চাঁদাদাতাদের বাসস্থানের নামানুসারে রাখা হয়। ১৮২৮ সনের জানুয়ারি পর্যন্ত বিভিন্ন কেন্দ্রে বালিকাবিদ্যালয়, ছাত্রী প্রভৃতির সংখ্যাও নিম্নরূপ পাইতেছি :

শ্রীরামপুরের বালিকাবিদ্যালয়

স্কুলের নাম	ছাত্রীসংখ্যা	গড়পড়তা উপস্থিতি
লিভারপুল স্কুল	১৮	১৭
চ্যাথাম ইউনিয়ন (বল্লভপুর)	৩১	২৩
উইলিয়ম্‌স স্কুল (ধুলিয়াপাড়া)	১৪	১২
রস স্কুল (মালপাড়া)	১৪	১২
কার্ডিক স্কুল (বর্গীবাগান)	২০	১৬
পূর্বতলা স্কুল	১৪	১০
চেল্টেনহাম স্কুল (১নং মহেশ)	২০	১৪
গ্লাস্‌গো স্কুল (২নং মহেশ)	২২	১৮
ডানকানি লাইন স্কুল (১নং ইসেরা)	১৬	১৪
স্টার্লিং স্কুল (২নং ইসেরা)	২০	১৬
এডিন্‌বরা স্কুল (নবগ্রাম)	২৬	২২
এক্সিটার স্কুল (চাতরা)	২২	১৯
খৃস্টান বালিকা	১৩	১৩
	২৫০	২০৬

বীরভূমের বালিকাবিদ্যালয়

স্কুলের নাম	ছাত্রীসংখ্যা
ক্রিশ্চিয়ান প্রিসেপ্টরি	১০
সিউরি স্কুল	১০
তিলপাড়া স্কুল	৬
তেহারা স্কুল	৭
আনন্দপুর স্কুল	৬
হুসেনাবাদ স্কুল	৫
	৪৪

ঢাকার বালিকাবিদ্যালয়

নরান্দিয়া	২০
রামগঞ্জ	২০
দয়াগঞ্জ	২০
জিঞ্জিরা	২৪
বানিয়ানগর স্কুল	১৬
	১০০

চট্টগ্রামের বালিকাবিদ্যালয়

মাদারবাড়ি স্কুল	৩৫
ভুলুয়া দীঘি স্কুল	৩০
মুরাদপুর স্কুল	১২
	৭৭

এতদ্ব্যতীত যশোহর আকিয়াব কাশী ও এলাহাবাদে একটি করিয়া বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।[২৮] ইহার পরে আর কোনো বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় নাই। জন ক্লার্ক মার্শম্যান লিখিয়াছেন যে, ১৮৩১ সনে মিশনের অধীনে যেসব বালিকাবিদ্যালয় ছিল তাহাদের মধ্যে

শ্রীরামপুরের বিদ্যালয়টিই খুব উন্নতি করে। ছাত্রীসংখ্যাও ছিল চুরাশি জন। ঢাকায় এই সময় সাতটি স্কুল ছিল, ছাত্রীসংখ্যা দুই শত নয় জন; এবং চট্টগ্রামে ছিল পাঁচটি স্কুল, ছাত্রীসংখ্যা এক শত উনত্রিশ জন। অন্যান্য কেন্দ্রে একটি করিয়াই স্কুল ছিল। সর্বসাকুল্যে ছাত্রীসংখ্যা ছিল চারি শত চুরাশি জন। উইলিয়ম অ্যাডাম তাঁহার এডুকেশন রিপোর্টের প্রথম খণ্ডে ১৮৩৫ সনে লিখিয়াছিলেন যে, মিশনের তখন দুইটি মাত্র বিদ্যালয় ছিল, একটিতে ছাত্রীসংখ্যা ছিল এক শত আটত্রিশ জন এবং আর-একটিতে ছিল চৌদ্দ জন।[২৯]

মিশনের কার্য ক্রমে নানা কারণে সংকুচিত হইয়া যায়। শিক্ষাপ্রসার-প্রচেষ্টাও বন্ধ করিয়া দিতে মিশন বাধ্য হইলেন।

স্ত্রীশিক্ষাপ্রচেষ্টার ফলাফল

স্ত্রীশিক্ষাপ্রসারকল্পে অন্যবিধ প্রচেষ্টার কথা বলিবার পূর্বে এই-সকল মহিলাসংঘ ও মিশনরীদের কার্যকলাপ কতটা ফলপ্রদ হইতে পারিয়াছিল তাহা একবার দেখা যাক। খৃস্টান পাদ্রীদের আনুকূল্যে ইউরোপীয় মহিলারা কলিকাতায় ও মফস্বলে বালিকাবিদ্যালয়প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী হন এবং স্থানীয় হিন্দুগণ তাঁহাদের এই কার্যে নানা ভাবে সাহায্য করেন। ছাত্রীদের মধ্যে ব্রাহ্মণ কায়স্থ চণ্ডাল মুসলমান থাকায় বুঝা যায়, সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েরা এইরূপ প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে প্রেরিত না হইলেও তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর দরিদ্র লোকেরা কন্যাদের এখানে পড়াইতে দ্বিধাবোধ করিতেন না। রাজা রাধাকান্ত দেব, রাজা বৈদ্যনাথ রায়, পণ্ডিত গৌরমোহন বিদ্যালংকার প্রভৃতির সাহায্যও আমাদের স্মরণীয়। কিন্তু ক্রমে এইসকল সংঘের স্ত্রীশিক্ষাপ্রচেষ্টার মূল উদ্দেশ্য সাধারণের নিকট প্রকট হইয়া পড়ে। পাঠ্যতালিকায় বাইবেল ও খৃস্টধর্ম সংক্রান্ত

পুস্তকাদি স্থান পাইল। এসকল পাঠ আবশ্যিক হইল, পরীক্ষাকালে ইহারও পরীক্ষা দিতে হইত। এ কারণ হিন্দুপ্রধানগণ উক্ত প্রচেষ্টা হইতে সরিয়া দাঁড়াইলেন, উচ্চশ্রেণীর দরিদ্র হিন্দুরাও তাঁহাদের কন্যাদের আর এখানে পাঠাইতেন না।

১৮৪০ সন নাগাদ লেডিজ সোসাইটির সেণ্ট্রাল ফিমেল স্কুল খৃস্টান ছাত্রীদের দ্বারা পূর্ণ হইয়া যায়। প্রিশিলা চ্যাপমান নাম্নী এক মহিলার *Hindu Female Education* শীর্ষক পুস্তক ১৮৩৯ সনে প্রকাশিত হয়। ইহাতে তিনি লিখিয়াছেন, সেণ্ট্রাল স্কুল এবং অনাথাশ্রম দুইই পবিত্র খৃস্টানি মতে পরিচালিত হইতেছিল। ডক্টর টমাস স্মিথ নামক আর-একজন পাদ্রী পরিষ্কারই বলিয়াছেন, আমরা এ কথা কোনোমতেই গোপন রাখিতে পারি না যে, আমাদের হৃদ্গত বাসনা ভারতবর্ষ সম্পূর্ণরূপে খৃস্টধর্মাক্রান্ত হয়, আর স্ত্রীশিক্ষাকে আমরা ইহার একটি প্রকৃষ্ট উপায় করিয়া লইয়াছি।[৩০] যেখানে মূল উদ্দেশ্য এইপ্রকার সেখানে ইহা কিরূপে সফল হইতে পারে? তাই দেখিতেছি, চুঁচুড়া হইতে এক ভদ্রলোক সমাচার দর্পণে (১৮৩৮, ৩ মার্চ) লিখিতেছেন—

'কএকজন হিতৈষি সাহেব লোক ও বিবি সাহেবেরা স্ত্রীলোকেরদের বিদ্যাশিক্ষার্থে পাঠশালা স্থাপনার্থ উদ্যোগী হইয়াছেন কিন্তু দুই এক স্থানে অতি নীচ জাতীয় কএক জন বালিকা বস্ত্র ও অন্যান্য পারিতোষিকের নিমিত্ত তাঁহারদের পাঠশালাতে গমন করে কিন্তু অন্যান্য স্থানে তাঁহারদের উদ্যোগ বিফলই হইয়াছে।'

মহিলাসংঘ দ্বারা যে উদ্দেশ্যে স্ত্রীশিক্ষার প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হইয়াছিলেন তাহা চরিতার্থ হইতেছে না দেখিয়া তৃতীয় দশকেই পাদ্রীগণ আক্ষেপ প্রকাশ করিতে থাকেন। তখন হইতে অন্য কি উপায়ে সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েদের মিশনরীগণের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে টানিয়া আনা যায় তাহার

বিষয় ভাবিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা গৃহে গৃহে শ্বেতাঙ্গ মহিলাদের পাঠাইয়া লিখনপঠন শিখাইবার এবং তদ্ব্যপদেশে খৃস্ট-মাহাত্ম্য প্রচার করার ব্যবস্থা করিতে তৎপর হন। এই পদ্ধতিতে যে কতখানি সাফল্য লাভ করা যাইতে পারে, সেই প্রসঙ্গে ১৮৪১ সনে স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ক ইংরেজি পুস্তকে পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পরলোকগতা কন্যার কথা দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করেন।[৩১] কৃষ্ণমোহন নব্যবঙ্গের প্রগতিশীল নেতা। এই ব্যাপারে সরকারী কর্মচারীদের ঔদাসীন্যের তীব্র নিন্দা করিয়া বলিয়াছিলেন, তাঁহারা **'Birds of Passage'** বা 'যাযাবর পক্ষী' হইলেও দীর্ঘকাল যেখানকার নিমক খাইতেছেন সেখানকার মঙ্গলের জন্য অর্জিত বিপুল অর্থের একটি সামান্য অংশও ব্যয় করা উচিত।[৩২] যাহা হউক, সব দিক বিবেচনা করিয়া দেখিলে বলিতে হয়, মিশনরীদের উক্ত প্রচেষ্টা আদৌ আশানুরূপ সাফল্যলাভ করিতে পারে নাই। তথাপি প্রাথমিক প্রচেষ্টা হিসাবে তাহাদের কার্য প্রশংসনীয়। বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ায় ইহারও কথঞ্চিৎ উন্নতি হয়।

স্ত্রীশিক্ষা ও নব্যবঙ্গ

স্ত্রীশিক্ষার প্রসারে প্রাচীনপন্থী রাজা রাধাকান্ত দেব প্রমুখ হিন্দু-প্রধানদের কথা আমরা জানিয়াছি। হিন্দু কলেজের প্রথম দিককার ছাত্র প্রসন্নকুমার ঠাকুর তদীয় 'রিফর্মার' নামক ইংরেজি সাপ্তাহিকে মিশনরীদের স্ত্রীশিক্ষাব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করিয়া কিরূপে ইহার সংস্কারসাধন করা যায় তাহারও নির্দেশ দেন। ঐ সময়কার 'সমাচার দর্পণ' প্রভৃতি বাংলা সংবাদপত্রেও স্ত্রীশিক্ষার সপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি প্রদর্শনপূর্বক আলোচনা বাহির হয়। উক্ত পত্রিকায় এমন কথাও পাই যে, যখন পুরুষেরা বিপত্নীক হইলে পুনরায় দারপরিগ্রহ করে, তখন স্বামীর মৃত্যু

হইলে স্ত্রীর পুনরায় বিবাহ হইবে না কেন। সমাজে নারীর আর্থিক অবস্থার উন্নতির বিষয়ও এইসব সংবাদপত্রে আলোচিত হইতে দেখি।

হিন্দু কলেজের দ্বিতীয় যুগের ছাত্রেরা নব্যবঙ্গ নামে পরিচিত হন। ডিরোজিওর শিক্ষায় তাঁহারা সকল বিষয়েই স্বাধীন প্রগতিশীল মত পোষণ করিতে আরম্ভ করেন। হিন্দু কলেজের উচ্চশ্রেণীর ছাত্রবৃন্দ ১৮২৮ সনে 'পার্থেনন' নামক একখানা ইংরেজি সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন। তখনকার পক্ষে বিপ্লবী মতবাদ লিপিবদ্ধ হওয়ায় কলেজ-কর্তৃপক্ষ প্রথম সংখ্যা বাহির হইবার পরই এই পত্রিকাখানি বন্ধ করিয়া দেন। এই সংখ্যায়ই কলেজের ছাত্রগণ স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে একটি রচনা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই ছাত্রগণ পরবর্তী যুগে স্ত্রীশিক্ষাপ্রসারে কিরূপ অগ্রণী হইয়াছিলেন একটু পরেই তাহা আমরা জানিতে পারিব।

ধনী-প্রধান মতিলাল শীলও স্ত্রীজাতির উন্নতি বিষয়ে বিশেষ অবহিত ছিলেন। তিনি ১৮৩৭ সনেই হলধর মল্লিকের সহযোগে এমন একটি সংঘ স্থাপনের প্রস্তাব করিলেন যাহার উদ্দেশ্য হইবে হিন্দু সমাজে বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন এবং নারীদের মধ্যে উদার শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলন।[৩৩] প্রথম বিধবাবিবাহকারীকে দশ হাজার টাকা পুরস্কার দিবেন, মতিলাল পরে এরূপ কথাও বলিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার কোনো প্রস্তাব কার্যে পরিণত হইয়াছে বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না। স্কুলের উচ্চশ্রেণীর ছাত্র এবং শিক্ষকদের মধ্যেও স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা সম্পর্কে আলোচনা চলিতে-ছিল। ১৮৪০ সনে গৌরমোহন আঢ্যের ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীর বার্ষিক পরীক্ষাকালে উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীর সম্মুখে ছাত্রদের দ্বারা এই দুইটি ইংরেজি রচনা পঠিত হয়: ১. বিবাহ, এবং ২. স্ত্রীশিক্ষা। এই দুইটিই পরে 'অ্যাডভোকেট' নামক সংবাদপত্রে মুদ্রিত হইয়াছিল।[৩৪]

রামগোপাল ঘোষ নব্যবঙ্গের একজন প্রধান নেতা ছিলেন। তিনি

বরাবর স্ত্রীশিক্ষায় উৎসাহ প্রকাশ করিয়া আসিয়াছেন। ১৮৪২ সনে তিনি হিন্দু কলেজের প্রথম দুই শ্রেণীর ছাত্রদের 'স্ত্রীশিক্ষা' বিষয়ের উপর উৎকৃষ্টতম প্রথম দুইটি ইংরেজি রচনার জন্য একটি স্বর্ণ এবং একটি রৌপ্য পদক পুরস্কার ঘোষণা করেন। মাত্র দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রগণ এই প্রতি-যোগিতায় যোগ দেন। ইহাতে মধুসূদন দত্ত প্রথম পদক ও ভূদেব মুখোপাধ্যায় দ্বিতীয় পদক লাভ করিয়াছিলেন।[৩৫]

নব্যবঙ্গের নেতৃবৃন্দ স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারে সবিশেষ তৎপর হইলেন। বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি (প্রতিষ্ঠাকাল ২০ এপ্রিল, ১৮৪৩) মূলত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হইলেও সমাজ-সংস্কারেও কম মনোযোগী ছিলেন না। রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ স্বনামখ্যাত ব্যক্তিগণ উক্ত সোসাইটির কর্ণধার ছিলেন। ১৮৪৫ সনের ৫ মে তারিখে উহার দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি-মহোদয় বক্তৃতা প্রসঙ্গে ঐ বিষয়ে, বিশেষত স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে, সদস্যদের চেষ্টা-যত্নের উল্লেখ করেন। হিন্দুসমাজে বিধবাবিবাহ প্রচলন এবং বহুবিবাহ নিবারণ সম্বন্ধে তাঁহারা সচেষ্ট হন। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যে তাঁহারা হাত দিয়াছিলেন। স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে সভ্যগণের তৎপরতা দেখিয়া সভাপতি বলেন, এ বিষয়ে একটি পরিকল্পনা শীঘ্রই রচিত হইবার সম্ভাবনা।[৩৬]

কিন্তু তাঁহাদের এই পরিকল্পনা আদৌ রচিত হইয়াছিল কি না জানা যায় না। তবে উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ভ্রাতৃদ্বয় এই ১৮৪৫ সনেই শিক্ষা-সমাজের (Council of Education) নিকট একটি বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় সাহায্যের জন্য আবেদন করেন। তাঁহারা পরে ১৮৪৯ সনের আগস্ট মাসে শিক্ষা সমাজের নিকট এই মর্মে একটি পরিকল্পনা পেশ করেন যে, নিজেরা

প্রস্তাবিত বালিকাবিদ্যালয়ের গৃহ নির্মাণের নিমিত্ত অর্ধেক ব্যয় বহন করিবেন এবং প্রতি মাসের খরচারও অর্ধেক দিতে তাঁহারা সম্মত, বাকী অর্ধাংশ শিক্ষা-সমাজকে দিতে হইবে। শিক্ষা-সমাজ অর্থাভাবের অজুহাতে প্রস্তাবটি নাকচ করিয়া দেন। উপরন্তু বলেন যে, যখন কলিকাতায় পরীক্ষামূলক ভাবে একটি বালিকাবিদ্যালয়ের কার্য শুরু হইয়াছে তখন ইহার ফল কিরূপ দাঁড়ায় তাহাই অগ্রে দেখিতে হইবে।[৩৭] এই বিদ্যালয়টির কথাই বিশেষভাবে পরে বলিতেছি, কারণ ইহা হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে বালিকাদের ধর্মনিরপেক্ষ উদার শিক্ষার সূত্রপাত হয়।

এ বিষয় বলিবার পূর্বে নব্যবঙ্গের আরও কয়েকটি প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করা দরকার। ভারতহিতৈষী ডেভিড হেয়ারের মৃত্যুর (১৮৪২, ১লা জুন) পর তাঁহার স্মৃতিরক্ষাকল্পে প্রতি বৎসর মৃত্যুদিনে একটি জনসভা হইত। স্ত্রীশিক্ষার প্রসারোদ্দেশ্যে এবং সমাজে ইহার অনুকূলে মত গঠন করিবার জন্য ১৮৪৪ সনে 'হেয়ার প্রাইজ-ফণ্ড' নামে একটি ভাণ্ডারও খোলা হয়। স্মৃতিসভায় স্ত্রীশিক্ষার উপকারিতা সম্বন্ধেও আলোচনা হইত। হেয়ার প্রাইজ-ফণ্ড হইতে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ-লেখকদের পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। ১৮৪৯ সনে সংস্কৃত কলেজের ছাত্র তারাশঙ্কর শর্মা 'ভারতবর্ষীয় নারীগণের শিক্ষা' শীর্ষক প্রবন্ধ লিখিয়া এই ফণ্ড হইতে পুরস্কার লাভ করেন। ১৮৬৪ সনে পুরস্কার দান প্রথার পরিবর্তে এই ভাণ্ডার হইতে বাংলা ভাষায় স্ত্রীপাঠ্য পুস্তক প্রকাশ আরম্ভ হয়। ফণ্ডের পরিচালকদের মধ্যে নব্যবঙ্গের এইসব কর্ণধারের নাম উল্লেখযোগ্য, যেমন, রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবচন্দ্র দেব এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।[৩৮] ১৮৫৪ সনের আগস্ট মাস হইতে প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার একযোগে 'মাসিক পত্র' নামক একখানি এক আনা মূল্যের সহজ স্ত্রীপাঠ্য মাসিক প্রকাশ করিয়াছিলেন।

'ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল' বা কলিকাতা বালিকাবিদ্যালয়

উপরে কলিকাতাস্থ পরীক্ষামূলক যে বালিকাবিদ্যালয়ের উল্লেখ শিক্ষা-সমাজ করিয়াছিলেন, সেটি আর কিছুই নয়, এই 'ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল' বা কলিকাতা বালিকাবিদ্যালয়। কলিকাতার অদূরে বারাসতে ইহার পূর্বেই একটি অবৈতনিক বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু কলিকাতায় জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন কর্তৃক স্থাপিত এই বালিকা-বিদ্যালয়টিই সর্বপ্রথম সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতে আরম্ভ হয়। বঙ্গে স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারে এই বিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠা হইতে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইল। ধর্মপ্রচারের পরিবর্তে নিছক বিদ্যাশিক্ষা দানোদ্দেশ্যেই এই বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়, একারণ ভদ্র সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যাদের এখানে প্রেরণে আপত্তির কারণ তিরোহিত হইল। বস্তুত এই শ্রেণীর কন্যারা প্রথমে এই প্রকাশ্য বিদ্যালয়েই বিদ্যাভ্যাস করিতে শুরু করেন। এ সময়ে বোম্বাইয়ে দাদাভাই নৌরজীর চেষ্টায়, এবং মাদ্রাজেও, বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু সে কথা এখানে আলোচ্য নহে।

বেথুন সাহেব কেম্‌ব্রিজের একজন প্রখ্যাত ছাত্র ছিলেন। ব্যবহার-শাস্ত্র অধ্যয়নান্তে তিনি আইন-ব্যবসা আরম্ভ করেন। বিলাতের হোম আপিসের উকীলরূপে তিনি সুনাম অর্জন করিয়াছিলেন। ভারতের বড়লাটের শাসন-পরিষদে ব্যবহার-সচিবের কার্যে নিযুক্ত হইলে তিনি উহা ত্যাগ করেন। বেথুন ছিলেন চিরকুমার। তাঁহার অবসর সময় পড়াশুনায় অতিবাহিত হইত। তিনি কবি বলিয়াও সে যুগে পরিচিত হন। বিলাতে অবস্থানকালেই ভারতবর্ষের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হইলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষা

কিরূপ দ্রুত প্রসারিত হইয়া বঙ্গসমাজকে সেই ভাবে ভাবুক করিয়া তুলিতেছিল, সরকারী শিক্ষা-বিবরণী এবং অন্যান্য পুস্তক-পুস্তিকা পাঠে তিনি তাহা অবগত হইয়াছিলেন। কিন্তু সমাজের অর্ধেক লোকের মনে তখনও শিক্ষার আলোক প্রবেশ করে নাই। তিনি বুঝিয়াছিলেন—নারীজাতিকে শিক্ষিত করিয়া না তুলিলে এদেশবাসীর মঙ্গল নাই।

বেথুন ১৮৪৮ সনের এপ্রিল মাসে ভারতবর্ষে আগমন করেন। স্বীয় পদাধিকার বলে তিনি Council of Education বা শিক্ষা-সমাজের সভাপতি হইলেন। নব্যবঙ্গের মুখপাত্র রামগোপাল ঘোষও এই বৎসরে শিক্ষা-সমাজের সদস্য-পদে নিযুক্ত হন। বেথুন কলিকাতায় একটি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপনের অভিপ্রায় রামগোপালের নিকট ব্যক্ত করেন। ইহার পর এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকল্পে যেসব আয়োজন শুরু হয় তৎসম্পর্কে প্রগতিশীল মতবাদের সমর্থক এবং নব্যদলের অন্তরঙ্গ পণ্ডিত গৌরীশংকর ভট্টাচার্য নিজ 'সম্বাদ ভাস্কর' ১৮৪৯, ১০ই মে সংখ্যায় লেখেন :

'বুদ্ধিনিপুণ বেথুন সাহেব ১২ বৈশাখ [২৩ এপ্রিল] সোমবারে তথায় সাধারণ বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু রামগোপাল ঘোষ মহাশয়কে অনুরোধ করিলেন ঘোষ বাবু স্বদেশস্থ বান্ধবদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া এই বিষয়ের সহায়তা করেন, তাহাতে বাবু রামগোপাল ঘোষ মহাশয় আত্মীয়গণের সহিত পরামর্শপূর্ব্বক স্বীকৃত হইলেন তাঁহারদিগের বালিকাগণকে বিদ্যালয়ে পাঠাইবেন এবং তৎপর সোমবারে [৩০ এপ্রিল] ঐসকল আত্মীয়গণকে লইয়া যাইয়া বেথুন সাহেবের সাক্ষাতেও বান্ধবগণকে এই বিষয় স্বীকার করাইলেন, তৎসময়ে শ্রীযুত বেথুন সাহেব ঐসকল ব্যক্তিকে সমাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই কালে পরামর্শ ধার্য করিয়া গত সোমবার [৭ মে] বালিকাগণকে বিদ্যালয়ে দিয়াছেন· ·।'

দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় বেথুন সাহেবের এই কার্যে বিশেষ সহায় হইলেন।[৮] 'সম্বাদ ভাস্কর' ১২ মে ১৮৪৯ তারিখে লেখেন :

'দক্ষিণ বাবু কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বাবুর প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছিলেন হিন্দু বালিকাদিগের বিত্তালয় করণার্থ বেথুন সাহেব বাবু রামগোপাল ঘোষের সহিত একত্র হইয়া আসিয়া তাঁহার শিমূলার বৈঠকখানা দেখিয়া গিয়াছেন, ইহাতেই নির্ম্মলহৃদয় দক্ষিণ বাবুর মনে উদয় হইল তাঁহার সৎস্বভাব প্রকাশের উপযুক্ত সময় প্রাপ্ত হইয়াছেন, সময় গেলে আর আসিবেক না, অতএব আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া বেথুন সাহেবের নিকট গমন করিলেন, এবং বেথুন সাহেব যে এতদ্দেশীয় হিন্দু বালিকাগণকে বিত্তাদানের উত্তোগ করিয়াছেন তদর্থে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া কহিলেন তাঁহার বাগানের বৈঠকখানা অমনি দিলেন, বালিকাদিগের উপযুক্ত শিক্ষালয় যতকালে প্রস্তুত না হয় ততকাল বালিকারা ঐ বৈঠকখানায় বিত্তাভ্যাস করিবে তিনি লইবেন না, এবং ৯০০০ সহস্র টাকায় মৃজাপুরে যে ভূমিখণ্ড ক্রয় করিয়াছেন বালিকাদিগের বিত্তালয় করণার্থ তাহা দান করিলেন, এতদ্ভিন্ন বিত্তালয় প্রস্তুতকরণ কালে এক সহস্র টাকা দিবেন, আর ঐ বিদ্যাগারের জন্য পুস্তক যাহার মূল্য ৫০০০ সহস্র টাকার ন্যূন নহে তাহাও দিতে স্বীকার করিলেন, · ·সাহেবের সহিত কথোপকথনান্তর বাটীতে আসিয়া এক পত্র মধ্যে এই সকল বিষয় লিখিয়া বেথুন সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন, এবং সাহেবও লিখিয়াছেন তিনি সন্তোষপূর্ব্বক এই সকল দান গ্রহণ করিলেন। · ·'

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ হইল। 'সংবাদ প্রভাকর'-সম্পাদক কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ও বেথুন সাহেবের বিদ্যালয় স্থাপন প্রচেষ্টার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। বিদ্যালয় সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া সংবাদ প্রভাকর ৭ মে, ১৮৪৯ তারিখে বিদ্যালয়ের কার্যারম্ভের পূর্বেই লিখিলেন :

'স্ত্রীবিদ্যা।• •ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক তথা বিদ্যাধ্যাপনীয় সমাজের অধিপতি করুণাময় ড্রিঙ্কওয়াটার বেথিউনি সাহেব বাঙ্গালি জাতির বালিকাবর্গের বঙ্গভাষায় অনুশীলন নিমিত্ত বিপুল বিত্ত ব্যয় ব্যসনপূর্ব্বক 'বিক্টরিয়া বাঙ্গালা বিদ্যালয়' নামক এক অভিনব স্ত্রীবিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন, অদ্য প্রাতে তাহার কর্ম্মারম্ভ হইবেক। আপাততঃ সিমুলার অন্তঃপাতি সুকিএস ষ্ট্রীট মধ্যে দয়ার্দ্রচিত্ত বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বৈঠকখানাবাটিতে কর্ম্ম সম্পন্ন হইবেক, পরে তাহার জন্য স্বতন্ত্র স্থানে এক স্বতন্ত্র বাটী নির্ম্মাণ করা যাইবেক· ·।

'উক্ত 'বিক্টরিয়া বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে' আপাততঃ অতি সম্ভ্রান্ত ভদ্র বংশের প্রায় বিংশতি বালিকা অধ্যয়নার্থ নিযুক্তা হইয়াছে, একজন সুপণ্ডিত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাহারদিগকে বঙ্গভাষার উপদেশ এবং একজন সুনিপুণ বিবি সূচের কর্ম্মাদি শিল্পবিদ্যার শিক্ষা প্রদান করিবেন, প্রাতে সাত ঘণ্টা অবধি নয় ঘণ্টা পর্য্যন্ত পাঠশালার কর্ম্ম চলিবেক, বিশিষ্ট পরিবারের মধ্যে যাঁহারা সঙ্গতিশূন্য, তাঁহারদিগের কন্যাগণের গমনাগমনার্থ ইহার পর গাড়ী নিয়োজিত হইবেক এমত কল্পনা আছে· ·।'

বেথুন-প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা বালিকাবিদ্যালয়ের সঙ্গে 'ভিক্টোরিয়া' নামটি যুক্ত হইয়াছিল—'সংবাদ প্রভাকরে'র উদ্ধৃতি হইতে এইরূপ মনে হইতে পারে, কিন্তু কার্যত তাহা হয় নাই। বেথুন ১৮৪৯, ৭ মে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকালীন বক্তৃতায় ইহাকে 'ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল' বা কলিকাতা বালিকাবিদ্যালয় নামেই উল্লেখ করিয়াছেন। বিদ্যালয়টির প্রথম দিককার নাম সম্পর্কে বিশদ আলোচনা প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৫৭ পৃ. ৪৫৯-৬১ দ্রষ্টব্য।

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকালে একটি দীর্ঘ বক্তৃতায় বেথুন এদেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে তাঁহার মনোযোগের হেতু, পুরাকালে হিন্দু নারীদের পরা ও

অপরা বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি এবং আধুনিক শিক্ষাদান উদ্দেশ্যে নব্যশিক্ষিতদের কর্তব্য সম্বন্ধে প্রথমেই উল্লেখ করেন। তিনি বিদ্যালয় পরিচালনের ব্যয়ভার নিজেই বহন করিতে উদ্যত হইয়াছেন কেন সে সম্পর্কে বলেন যে, ভারত সরকার তথা কোর্ট অব ডিরেক্টর্সের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় অসম্ভব রকম বিলম্ব ঘটিত এবং শেষ পর্যন্ত নিজ ইচ্ছানুরূপ পরিচালনা-কার্য সম্ভব হইত কি না তাহাও সন্দেহস্থল। তিনি প্রাচীনপন্থী অথচ স্ত্রীবিদ্যানুরাগী রাজা রাধাকান্ত দেব প্রমুখ সমাজপতিদেরও আহ্বান করেন নাই বা পূর্বে তাঁহাদের মতামত লন নাই। তিনি বলেন, ইহা করিতে গেলেও হয়ত নানারূপ বিঘ্নের সৃষ্টি হইত। ইউরোপীয় বন্ধুদেরও তিনি নিমন্ত্রণ করেন নাই, কারণ তাহাতে বিশেষ সমারোহ হইবার সম্ভাবনা ছিল। বিদ্যালয়ে পঠিতব্য বিষয়াদি সম্বন্ধে অতঃপর বেথুন যাহা বলেন তাহার মর্ম 'সম্বাদ ভাস্কর' (১০ মে, ১৮৪৯) হইতে এখানে দেওয়া গেল :

'প্রস্তাব সমাপন পূর্ব্বে এখানে কি প্রকার বিদ্যাশিক্ষা হইবে আমার তাহাও প্রকাশ করা উচিত, গবর্নমেণ্ট সংক্রান্ত স্কুল সকলে যেমত কোন ধর্ম্মচর্চ্চা হয় না এখানেও সেই প্রথা প্রচলিত হইবেক, আমি জানি অনেকে স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষা উপলক্ষে উপহাস করিবেন, বিশেষ তাঁহারা এখানে কিরূপ শিক্ষা হইবেক তাহা অনুমান করিয়া কৌতুক করিতে পারেন, এবং তাহা আমারও উপহাস্যজনক হইতে পারে, কিন্তু বঙ্গদেশীয় বালকগণের বিদ্যাভ্যাস বিষয় যাহা আমি সর্ব্বদা বলিয়া থাকি তাহা যদি তোমরা কেহ শ্রবণ করিয়া থাক তবেই বুঝিবে দেশীয় ভাষানুশীলনে বালকগণের অধিক যত্নকরণ আমার নিতান্ত মানস তবে ইংরাজী বিদ্যার শ্রেষ্ঠতা হেতুয় তাহার চর্চ্চা কর্তব্য বলি এবং ইহাও প্রত্যাশা করি অবিলম্ব কালে বিদ্যার্থিবর্গ আমার-

দিগের ভাষাতে যাহা শিক্ষা করিয়াছেন তাহা স্বভাষায় অনুবাদ করেন, অতএব অঙ্গনাগণ যাহারা কেবল আপন পরিবারে শিক্ষা প্রদান করিতে পারিবে তাহারদিগের প্রতি তদন্যথায় আমি উক্ত বিদ্রূপকারীগণের অপেক্ষাও অধিক বৈরক্ত্য প্রকাশ করিব, বঙ্গভাষানুশীলনই এখানকার মূল শিক্ষা হইবেক তবে গরিষ্ঠ গুণ বিবেচনায় বিশেষত পিতা-মাতার সম্মতিক্রমে ইহার পর ইংরাজী শিক্ষা হইতে পারিবেক এতদ্ভিন্ন অন্য সহস্র প্রকার শিল্পবিদ্যাদি যাহা আমা অপেক্ষা আমার বন্ধু বিবি রিড্সডেল ব্যাখ্যা করিতে পারেন তিনিই তত্তাবতের উপদেশ দিবেন এই বিদ্যাশিক্ষায় তোমারদিগের বালিকাগণ আপনারদিগের গৃহ শোভা এবং উত্তমরূপে কাল সম্বরণ করিতে পারিবেন, প্রাচীন বাণী আছে 'আলস্য সকল পাপের জননী' কিন্তু প্রকৃত আলস্য পৃথিবী মধ্যে অত্যল্প আছে তবে প্রয়োজনীয় ও সৎকার্য্যে সতত প্রবর্ত্ত না থাকিলে অসৎ কর্ম্মে রত হইতে হয়।'

এখানে বেথুন সাহেব বালিকাদের বাংলা শিক্ষার উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন। তিনি বরাবর এদেশীয়দের মাতৃভাষা চর্চায় বিশেষ উৎসাহ দান করিতেন। শিক্ষা-সমাজের সভাপতিরূপে তিনি হিন্দু কলেজ, হুগলী কলেজ, ঢাকা কলেজ ও কৃষ্ণনগর কলেজ পরিদর্শনে গিয়া ছাত্রদের বাংলা ভাষা শিক্ষার আবশ্যকতা সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন। তাঁহারই উপদেশে কবিবর মধুসূদন দত্ত ইংরেজী কাব্যের পরিবর্তে বাংলা কাব্য রচনায় অনুপ্রাণিত হন। সুতরাং বেথুন বালিকাদের বাংলা শিক্ষার যে বিশেষ পক্ষপাতী হইবেন তাহা আর আশ্চর্যের বিষয় কি।

বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। ছাত্রীদের নিকট হইতে বেতন লওয়া হইত না। পুস্তকাদিও তাহাদিগকে বিনামূল্যে দেওয়া হইত। বেথুন স্বয়ং বিদ্যালয় পরিচালনার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিতেন।

ইহাতে প্রতি মাসে তাঁহার আট শত টাকা করিয়া ব্যয় হইত। তিনি স্বয়ং বিদ্যালয়ে যাইতেন এবং মেয়েদের পড়াশুনা পরীক্ষা করিতেন। বেথুনকে বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় যাঁহারা বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে রামগোপাল ঘোষ এবং দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের বিষয় আমরা জানিতে পারিয়াছি। আর-একজনও তাঁহাকে অনুরূপ সাহায্য করিয়াছিলেন— তিনি হইলেন সংস্কৃত কলেজের অন্যতম অধ্যাপক পণ্ডিতবর মদনমোহন তর্কালংকার। বিদ্যালয় খোলার দিনে যে একুশটি বালিকা উপস্থিত হন তাঁহাদের মধ্যে ভুবনমালা ও কুন্দমালা নাম্নী দুই জন ছাত্রী মদনমোহন তর্কালংকারের কন্যা। মদনমোহন বিদ্যালয়ে কন্যাদের প্রেরণ করিয়াই কর্তব্য শেষ করেন নাই। তিনি কিছুকাল যাবৎ রীতিমত বিদ্যালয়ে গিয়া মেয়েদের পড়াইতেন। তাঁহাদের পাঠোপযোগী বাংলা পাঠ্যপুস্তকও রচনা করিতে আরম্ভ করেন।[৩৯] প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে পণ্ডিত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার স্ত্রীশিক্ষাকে জনপ্রিয় করিবার জন্য যেমন পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, মদনমোহনও সমসময়ের পত্রিকার মাধ্যমে স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা প্রতিপাদন করিয়া প্রবন্ধাদি লিখিয়াছিলেন।[৪০]

বিদ্যালয়ের কার্য শুরু হইল বটে, কিন্তু সমাজের এক দল গোঁড়া লোক ইহার বিরুদ্ধে এমন প্রচারকার্য আরম্ভ করিয়া দিল যে, শীঘ্রই ছাত্রীসংখ্যা একুশ হইতে কমিয়া মাত্র সাত জনে দাঁড়াইল। কিন্তু এই বিরুদ্ধাচরণ বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। প্রথম বৎসরের শেষে দেখা গেল ছাত্রীসংখ্যা পুনরায় বাড়িয়া চৌত্রিশ জনে দাঁড়াইয়াছে। বেথুনের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পনর দিনের মধ্যেই স্ত্রীশিক্ষায় উৎসাহী রাজা রাধাকান্ত দেব নিজ ভবনে একটি বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করেন। বারাসতের বালিকাবিদ্যালয়টি কলিকাতার বিদ্যালয়টির আদর্শে পুনর্গঠিত

হইল। উত্তরপাড়া, নিবধুই, সুখসাগর প্রভৃতি স্থানে বালিকাবিদ্যালয় স্থাপিত হইল। কিন্তু সরকার কোনো বিদ্যালয়েই কপর্দকমাত্রও অর্থ সাহায্য করিতেন না। প্রত্যেক স্থলেই বালিকাদের প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে প্রেরণের বিরোধী এক দল লোক ছিল। সরকারের ঔদাসীন্য দেখিয়া তাহারা প্রচার করিতে লাগিল যে, শাসন-কর্তৃপক্ষও এরূপ বিদ্যালয়ের বিরোধী। বারাসতের বালিকাবিদ্যালয়ের পরিচালকগণের উপর অত্যাচার-উৎপীড়নও হইতে থাকে। এসব অত্যাচার-উৎপীড়ন ও বিরোধিতা লক্ষ্য করিয়া বেথুনের অনুরোধে ভারত-সরকার বাংলা-সরকারকে দিয়া এই মর্মে একটি বিজ্ঞপ্তিপত্র প্রচার করাইলেন যে, গবর্নমেণ্ট স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী আদৌ নহেন, তাঁহারা ইহার প্রতি সহানুভূতিশীল এবং যেখানেই এরূপ প্রচেষ্টা হইতেছে সেখানেই ম্যাজিস্ট্রেট প্রমুখ স্থানীয় শাসকবর্গ আর্থিক ঝুঁকি না লইয়া ইহাকে সাধ্যমত সাহায্য করিবেন এবং শিক্ষা-সমাজ এ সকলের পর্যবেক্ষণের ভার লইবেন। চক্রান্তকারীদের বিরোধিতা ইহার পর অনেকটা কমিয়া গেল।

বেথুন প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের স্থায়ী বাসগৃহের জন্য দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রদত্ত মির্জাপুরের ভূমিখণ্ডের কথা বলিয়াছি। বেথুন স্বয়ং দশ হাজার টাকা ব্যয়ে ইহার সংলগ্ন আর-এক খণ্ড ভূমি ক্রয় করেন। কিন্তু মির্জাপুর তখন নগরীর প্রান্তভাগে অবস্থিত ছিল। ভদ্রঘরের মেয়েদের সেখানে গিয়া পড়াশুনা করায় বিশেষ অসুবিধা হইবার সম্ভাবনা। তখন হেদুয়া পুষ্করিণীর পশ্চিম পার্শ্বে বাংলা-সরকারের জমি ছিল। বেথুনের নির্বন্ধাতিশয়ে মির্জাপুরের জমির পরিবর্তে এই ভূমিখণ্ড দিতে তাঁহারা সম্মত হইলেন। এই ভূমিখণ্ড পূর্বোক্ত জমির চেয়ে আয়তনে বড় এবং শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত।

প্রারম্ভিক উদ্যোগ-আয়োজনের পর ১৮৫০ সনের ৬ই নবেম্বর এই ভূমির উপর বিদ্যালয়-ভবনের ভিত্তি-প্রস্তর-স্থাপনোৎসব সম্পন্ন হইল। এই দিনে প্রকাশ্য ভাবে সাধারণের সমক্ষে ভূমি-হস্তান্তর কার্যও সমাধা হয়। বঙ্গের ডেপুটি গবর্নর সার জন হাণ্টার লিট্‌লার ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপনোৎসবে পৌরোহিত্য করেন। ভিত্তি-প্রস্তরের সঙ্গে যে তাম্র-ফলক প্রোথিত করা হয় এবং যে রৌপ্য কর্ণিকের সাহায্যে ভিত্তি-প্রস্তর গাঁথা হয় তাহার উপরে অন্যান্য কথার মধ্যে বিদ্যালয়টির নাম 'Hindu Female School' রূপে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে, বেথুন-প্রতিষ্ঠিত ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল 'হিন্দু ফিমেল স্কুল' আখ্যাও লাভ করিয়াছিল।

সে যুগে ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন উৎসব 'মেসন' (Mason) সম্প্রদায়ের সহায়তায় পাশ্চাত্য মতে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইত। হিন্দু (বা সংস্কৃত) কলেজ, হিন্দু কলেজ পাঠশালা, মিশনরীদের সেণ্ট্রাল ফিমেল স্কুল, মেট্‌কাফ হল, কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল বা অনুরূপ সাধারণ প্রতিষ্ঠানাদির বাটীর ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন একটা মহা সমারোহের ব্যাপার ছিল। ক্যালকাটা ফিমেল স্কুলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনও সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইল। বঙ্গের ডেপুটি গবর্নর লিট্‌লার গ্র্যাণ্ড মেসনের সাহায্যে ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করিলেন। গ্র্যাণ্ড মেসন, সার জন লিট্‌লার এবং বেথুন সাহেব স্বয়ং পর পর বক্তৃতা করেন।

এদিনকার উৎসবের একটি প্রধান অঙ্গ — উক্ত ভূমিখণ্ড আদান-প্রদান। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এটর্নি ভূমি-হস্তান্তর সম্পর্কিত একখানি দলিল বেথুন এবং দক্ষিণারঞ্জনের হস্তে অর্পণ করিলেন। ভূমি-হস্তান্তর কার্যের প্রতীক স্বরূপ একটি অশোক বৃক্ষও দলিলের সঙ্গে

প্রদত্ত হইল। বেথুনের অনুরোধে ডেপুটিগবর্নর-পত্নী লেডী লিট্লার এই ভূমিখণ্ডের প্রান্তভাগে অশোক বৃক্ষটি রোপণ করেন। বেথুন সাহেব যে বক্তৃতা[৪১] দেন তাহার একটি প্রধান অংশই ছিল এই ভূমি-হস্তান্তর সম্পর্কে। তিনি এ প্রসঙ্গে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের ভূয়সা প্রশংসা করিয়া বলেন :

'For myself and for my friend Duckinarunjun Mookerjea. I make answer before these witnesses, that we accept the gift and assurance of this land according to the form and tenure of this same deed : and further for myself I promise and undertake in the presence of this company, that, if life and ability be granted to me, I will build upon this spot a school for the education of Hindu girls, which with the blessings of God, I trust may be destined hereafter to produce effects worthily entitling it to have a name in the annals of the land.

'It is probable, Sir, that there are many persons present who do not know that the ceremony through which we have just gone, for giving us the ownership of this land, is the most ancient and honorable form of conveyance of land known to the English law. It has been selected on this occasion, not merely for that reason, not merely because of the remarkable analogy which it bears to the simple forms that have been immemorially used in Eastern countries, but also, and especially, because it has given me an opportunity of publicly associating with myself, and now enables me openly to proclaim my gratitude to. the enlightened man who stands near me to whom jointly with myself, the land has been conveyed. Duckinarunjun Mookerjea was an utter stranger to me : I had never before heard his name, when he introduced himself to me a year and a half ago, for the purpose of letting me know that he had heard of my intention of founding a female school for the benefit of his country : that he could not bear the thought that it should be said hereafter of his countrymen that they had all stood idly looking on, without offering any help in furtherance of the good work : and in short without further preface, that he was the proprietor of a piece of ground in Calcutta, valued, as I have since learned, at about twelve thousand rupees, which he placed freely and unconditionally at my disposal for the use of the school. It was a noble gift, and nobly given. I subsequently was

enabled to possess myself of some adjoining slips of land, until at last we became proprietors of the whole of that which by the munificent liberality of the Government of Bengal, exercised, as I was in substance told, in the letter announcing their decision, expressly to testify their approval of my design, we were permitted to exchange for this more valuable and far more eligible site on which we are now met. It is due to Duckinarunjun Mookerjea that his name should be had in perpetual remembrance in connexion with the foundation of the school.'

গৃহনির্মাণের ব্যয়ভার বেথুন স্বয়ং বহন করিবেন, প্রথমে এই মর্মে বলিয়া, দক্ষিণারঞ্জনের সহিত তাঁহার প্রথম পরিচয়, তাঁহার ভূমিদান, ইহার পার্শ্বে বেথুন কর্তৃক ভূমিক্রয়, পরে এই উভয় ভূমিখণ্ডের বিনিময়ে বাংলা সরকারের হেতুয়া সংলগ্ন প্রশস্ততর ভূমিখণ্ড দানে সম্মতি প্রভৃতির বিষয় পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ করেন। তিনি ইহার পর ভূমি-হস্তান্তর কার্যের প্রতীকৃস্বরূপ অশোক বৃক্ষ দান প্রসঙ্গে বলেন যে, এরূপ স্থলে প্রতীকৃস্বরূপ তরু দান হিন্দুদের চিরাচরিত প্রথা। এ ক্ষেত্রে অশোক তরু মনোনীত করার কারণ হিন্দু নারীগণ ইহার প্রতি বড়ই অনুরাগী। তাঁহাদের বিশ্বাস, ইহার মূল ভক্ষণ করিলে সন্তানের কল্যাণ হয়। অতঃপর অশোক তরু স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার প্রতীকরূপে সর্ব্বত্র গ্রাহ্য হউক, বেথুন এই প্রার্থনা জানাইলেন।

বিদ্যালয় সুচারুরূপে পরিচালিত হইতে লাগিল। রক্ষণশীল সমাজের নেতা রাজা রাধাকান্ত দেব বিরোধী দলের নিন্দাবাদে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া এতাদৃশ মহৎ কার্য অনুশীলন করিতে বেথুনকে পত্রদ্বারা অনুরোধ জানাইলেন। এরূপ একটি মহোপকারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে নিন্দাচর্চাকে রাধাকান্ত কলুষিত মনের ঘৃণিত অভিব্যক্তি বলিয়া আখ্যাত করেন।[৪২] শিক্ষা-সমাজের সভাপতি রূপে বেথুন পণ্ডিত ঈশ্বর-

চন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিষয়ও অবগত ছিলেন। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ১৮৫০ সনের ডিসেম্বর মাসে বালিকাবিদ্যালয়ের অবৈতনিক সম্পাদিক নিযুক্ত করেন।[৪৩] বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুজ এবং তদীয় জীবনীকার পণ্ডিত শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন বলেন, বিদ্যাসাগর বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে নিজ নিজ কন্যাদের এই বিদ্যালয়ে পাঠাইতে সম্মত করান। বিদ্যারত্ন আরও বলেন যে, হেদুয়ার পশ্চিম পার্শ্বে নব-নির্মিত নিজ গৃহে বিদ্যালয়টি উঠিয়া যাইবার পূর্ব্বে কিছুকাল গোলদীঘির দক্ষিণ-পূর্ব- কোণে একটি বাড়ীতে ইহা স্থানান্তরিত হয়।[৪৪] এই বাড়ীতে পূর্বে হেয়ার সাহেবের পটলডাঙ্গা স্কুল বসিত।

'ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল' বা কলিকাতা বালিকাবিদ্যালয় ক্রমে অন্যান্য বহু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরও সমর্থন লাভ করে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার প্রথমা কন্যা সৌদামিনী দেবীকে ১৮৫১ সনের জুলাই মাসে এখানে ভর্তি করিয়া দেন। তিনি ১৮৫১, ৮ জুলাই মেদিনীপুরে রাজনারায়ণ বসুকে এক পত্রে লেখেন, 'আমি বেথুন সাহেবের বালিকাবিদ্যালয়ে সৌদামিনীকে প্রেরণ করিয়াছি, দেখি এ দৃষ্টান্তে কি ফল হয়।'[৪৫] বিদ্যালয়ের ছাত্রীসংখ্যা এই সময়ে আশী জনে দাঁড়ায়। রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর বিদ্যালয়ের পরিচালক-সভার সভাপতি পদে বৃত হইলেন। ১৮৫১, আগষ্ট সংখ্যা *The Calcutta Christian Observer* (পৃ. ৩৭৪) এইসকল বিষয়ের উল্লেখ করিয়া লেখেন :

'One of the most influential natives of Calcutta, Debendranath Tagore, has added his own daughter to the long list of eighty female children already receiving instruction in this Institution, and the Raja Kali Krishna Bahadur, who occupies the most prominent position in Hindu Society in the metropolis has accepted the office of its president.'

বেথুন বিদ্যালয়-ভবন নির্মাণ সম্পূর্ণ হওয়া দেখিয়া যাইতে পারেন

নাই। তিনি ১৮৫১ সনের ১২ আগস্ট ইহধাম ত্যাগ করেন। তিনি উইল বা চরম ইচ্ছাপত্রে বিদ্যালয়ের জন্য স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তিতে ত্রিশ হাজার টাকা দান করিয়া যান। তৎকালীন বড়লাট লর্ড ডালহৌসি এবং তদীয় পত্নী লেডী ডালহৌসী বিদ্যালয়টির প্রতি বিশেষ সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। লেডী ডালহৌসী স্বেচ্ছায় মধ্যে মধ্যে বিদ্যালয়টি পরিদর্শন করিতে যাইতেন। বেথুনের মৃত্যুর পর বড়লাট স্বয়ং ইহার ব্যয়ভার বহন করিতে আরম্ভ করেন। প্রতি মাসে ব্যয় নির্বাহার্থ তাঁহাকে সাত শত টাকার মত খরচ করিতে হইত। ডালহৌসীর সুপারিশে কোর্ট অফ ডিরেক্টর্স ১৮৫৩, ৯ নবেম্বর একখানি পত্রে বিদ্যালয় পরিচালনা-ভার গ্রহণ করিতে সম্মত হন, কিন্তু সঙ্গেসঙ্গে ছাত্রীদের নিকট হইতে বেতন আদায়ের কথাও বলেন।[৪৬] ডালহৌসী শেষোক্ত প্রস্তাব সমীচীন বোধ করেন নাই। তিনি ইহার পর যত দিন ভারতবর্ষে ছিলেন নিজেই ইহার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিতেন। ডালহৌসী ১৮৫৬, ৬ মার্চ ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করেন। ইহার পর পূর্ববাবস্থানুযায়ী বেথুন-প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা বালিকাবিদ্যালয়ের পরিচালনাভার গবর্নমেণ্ট স্বয়ং গ্রহণ করেন।

স্ত্রীশিক্ষা ও গবর্নমেণ্ট

এতদিন কিন্তু গবর্নমেণ্ট স্ত্রীশিক্ষার জন্য সাক্ষাৎভাবে কিছুই করেন নাই। ১৮৫০ সনের বিজ্ঞপ্তিতে তাঁহারা বেসরকারী প্রচেষ্টার প্রতি সহানুভূতি ও মৌখিক সমর্থন জানাইয়াই ক্ষান্ত ছিলেন। বেথুন স্কুলের সঙ্গে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, মায় বড়লাট লর্ড ডালহৌসির আন্তরিক যোগ লক্ষ্য করিয়া এবং তাঁহাদেরও আগ্রহাতিশয়ে বিলাতের কোর্ট অব্ ডিরেক্টর্স যে ইহার ব্যয়ভার বহনে সম্মত হইয়াছিলেন একটু পূর্বেই তাহা বলা হইয়াছে। কোর্ট শিক্ষাবিষয়ক একটি প্রস্তাব বা ডেস্প্যাচ ১৮৫৪

সনের ১৯ জুলাই ভারত গবর্নমেণ্টের নিকট প্রেরণ করেন। ইহার মধ্য হইতে স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ক অনুচ্ছেদটি এখানে প্রদত্ত হইল :

'83. The importance of female education in India can not be over estimated; and we have observed with pleasure the evidence which is now afforded of an increased desire on the part of many of the natives of India to give a good education to their daughters. By this means a far greater proportional impulse is imported to the educational and moral tone of the people than by the education of men. We have already observed that schools for females are included among those to which greater in in-aid may be given; and we cannot refrain from expressing our cordial sympathy with the efforts which are being made in this direction. Our Governor-General in Council has declared, in a communication to the Government of Bengal, that the Government ought to give the native female education in India its frank and cordial support; in this we heartily concur, and we especially approve of the bestowed of marks of honour upon such native gentlemen as Rao Bahadur Maganbhai Karramchand, who devoted 20,000 rupees to the foundation of two native female schools in Ahmedabad, as by such means our desire for the extension of female education becomes generally known.'

অর্থাৎ, বিলাতের কর্তৃপক্ষ স্ত্রীশিক্ষার গুরুত্ব স্বীকার করিয়া এই মর্মে লেখেন যে, ভারতবাসীরা নিজ কন্যাদের শিক্ষাদানে ক্রমশ উদ্বুদ্ধ হওয়ায় তাঁহারা বিশেষ আনন্দিত। পুরুষের শিক্ষাদান অপেক্ষা নারীকে সুশিক্ষিত করিতে পারিলেই সমাজের নৈতিক অবস্থার দ্রুত উন্নতি হইতে পারে। সরকারী সাহায্য যেসব স্কুলে দেওয়া যাইতে পারে তাহাদের তালিকায় বালিকাবিদ্যালয়সমূহও ভুক্ত করা হইয়াছে। এবিষয়ে যেসকল আয়োজন হইতেছে তাহার প্রতি তাঁহারা আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করেন। তাঁহারা ভারত-গবর্নমেণ্টের পূর্বোক্ত বিজ্ঞপ্তির কথা উল্লেখ করিয়া তাহার সঙ্গেও তাঁহাদের পূর্ণ ঐকমত্যের বিষয় লিখিলেন। রাও বাহাদুর মগনভাই করমচাঁদ আহ্মেদাবাদে দুইটি বালিকাবিদ্যালয়

প্রতিষ্ঠার জন্য বিশ হাজার টাকা দান করেন। কর্তৃপক্ষ উক্ত প্রস্তাবে এই বিষয় সম্পর্কে বলেন যে, ইঁহাকে সম্মান চিহ্নস্বরূপ যাহা কিছু দেওয়া হইবে তাহাতেই আমাদের অনুমোদন আছে। কর্তৃপক্ষের স্ত্রীশিক্ষা-প্রসারে ঐকান্তিক বাসনার কথা জনসাধারণের মধ্যে এইসকল উপায়ে প্রচারিত হইবে।॰

॰ এই ডেস্‌প্যাচ অনুযায়ী কাজ হইতে আরও তিন বৎসর লাগিয়াছিল। ১৮৫৭ সনের প্রথম দিকে বাংলার ছোটলাট সার ফ্রেডারিক হ্যালিডে ইহার নিরিখে বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী হন। তাঁহারই অনুরোধে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বিভিন্ন অঞ্চলে অবৈতনিক আদর্শ বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করিতে আরম্ভ করেন।

ইতিমধ্যে বেথুন বালিকাবিদ্যালয় সম্পর্কেই গবর্নমেণ্ট যাহা-কিছু অবহিত হইয়াছিলেন। পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী লর্ড ডালহৌসির ভারত-ত্যাগের পর গবর্নমেণ্ট ইহার পরিচালনা-ভার গ্রহণ করিলেন। ভারত গবর্নমেণ্টের অন্যতম সেক্রেটারী সার সিসিল বিডনের উপর এই কার্য ন্যস্ত হইল। বড়লাট ক্যানিং এবং তদীয় পত্নী বেথুন বিদ্যালয়টির প্রতি আকৃষ্ট হন। এদেশীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ যাহাতে নিজ নিজ কন্যা এখানে অধিক সংখ্যায় প্রেরণ করেন সেই মর্মে বড়লাট-পত্নী ১৮৫৬ সনের জুন মাসে তাঁহাদের নিকট আবেদন জানান। বিডন সাহেবও বিদ্যালয়টির উন্নতি-মূলক কয়েকটি প্রস্তাব ১৮৫৬, ১২ আগষ্ট তারিখে গবর্নমেণ্টের নিকট পেশ করিলেন। নেতৃস্থানীয় হিন্দুদের লইয়া একটি ম্যানেজিং কমিটি বা পরিচালক সভা গঠনের কথাও ইহার মধ্যে ছিল।[৪৭] ভারত-গবর্নমেণ্ট বিডনের প্রস্তাব গ্রহণপূর্বক পরবর্তী ২০ সেপ্টেম্বরের কলিকাতা গেজেটে নিম্নলিখিত হিন্দু-প্রধানদের লইয়া বেথুনের বালিকাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ-সভা গঠনের কথা বিজ্ঞাপিত করিলেন :

সভাপতি— সার সিসিল বীডন ; সদস্যবর্গ— রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রায় হরচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর, অমৃতলাল মিত্র, রায় প্রাণনাথ চৌধুরী, রামরত্ন রায়, রাজেন্দ্র দত্ত, ভবানীপ্রসাদ দত্ত, রমা-প্রসাদ রায়, কাশীপ্রসাদ ঘোষ ; অবৈতনিক সম্পাদক— পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।[৪৮]

নূতন অধ্যক্ষ-সভা গঠিত হইবার পর এই বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ও শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পর্কে সাধারণের নিকট একটি বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হয়। ১৮৫৭ সনের ১৩ই জানুয়ারীর 'সংবাদ প্রভাকর' হইতে এই বিজ্ঞপ্তিটির কিয়দংশ এখানে দেওয়া গেল :

'কলিকাতা ও তন্নিকটবাসী হিন্দুবর্গের প্রতি বিজ্ঞাপন।

'বীটন [বেথুন] প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয় সংক্রান্ত সমুদায় কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন।

'ভদ্রজাতি ও ভদ্রবংশের বালিকারা এই বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইতে পারে তদ্ব্যতীত আর কেহই পারে না।

'পুস্তকপাঠ, হাতের লেখা, পাটীগণিত, পদার্থজ্ঞান, ভূগোল ও সূচীকর্ম্ম এই সকল বিষয়ে বালিকারা শিক্ষা পাইয়া থাকে। সকল বালিকাই বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করে। আর যাহাদের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা ইংরাজী শিখাইতে ইচ্ছা করেন তাহারা ইংরাজীও শিখে। বালিকাদিগকে বিনাবেতনে শিক্ষা ও বিনামূল্যে পুস্তক দেওয়া হইয়া থাকে। আর যাহাদের দূরে বাড়ী, এবং স্বয়ং গাড়ী অথবা পাল্‌কী করিয়া আসিতে অসমর্থ তাহাদিগকে বিদ্যালয়ে আসিবার এবং বিদ্যালয় হইতে লইয়া যাইবার নিমিত্ত গাড়ী ও পাল্‌কী নিযুক্ত আছে।

'সিসিল বিডন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। সম্পাদক। কলিকাতা বালিকাবিদ্যালয়।'

বিজ্ঞপ্তিটির মূল বিষয় বেথুন-প্রবর্তিত ব্যবস্থারই অনুগ। স্ত্রীশিক্ষা জনপ্রিয় করার জন্য গাড়ী ও পাল্‌কীর গায়ে বাহিরের দিকে লেখা থাকিত— 'কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ'। নবনিযুক্ত অধ্যক্ষ-সভা, বিশেষত সম্পাদক পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টা-যত্নে এই বিদ্যালয়টি সুপরিচালিত হইতে থাকে। এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয়। উক্ত বিজ্ঞপ্তিটিতে 'কলিকাতা বালিকাবিদ্যালয়' নামটিই পাওয়া যাইতেছে। পূর্বাপর এই নামেই বিদ্যালয়টি পরিচিত হইত নিঃসন্দেহ। বেথুন সাহেবের নাম পরবর্তীকালে ইহার সঙ্গে যুক্ত হয়।

কলিকাতা বালিকাবিদ্যালয়টিকে কেন্দ্র করিয়া কলিকাতায় ও মফস্বলে প্রায় সাত বৎসর যাবৎ বেসরকারী ভাবে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের চেষ্টা চলিতে থাকে। গবর্নমেণ্ট সর্বপ্রথম ১৮৫৬ সনে কলিকাতা বালিকা-বিদ্যালয়ের ব্যয় ও পরিচালনা ভার গ্রহণ করেন। ভারতবর্ষে পরবর্তী কালে নারীজাগরণের যে সূচনা হয়, শিক্ষায় সাহিত্য চর্চায় কৃতিত্ব প্রদর্শন এবং ক্রমে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রেও অপরিসীম সাহস ও বুদ্ধি প্রকাশ পায়— এ সকলেরই মূল অনেকটা ঐ বিদ্যালয়টির মধ্যে আমরা লক্ষ্য করি। একদিকে গবর্নমেণ্ট কর্তৃক এই বিদ্যালয়টির পরিচালনা-ভার গ্রহণ এবং পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রমে মফস্বলে আদর্শ বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন, অন্যদিকে ইহার কিঞ্চিৎ পরে ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার প্রবর্তন, স্ত্রীবিদ্যালয় স্থাপন, উত্তরপাড়া হিতকরী সভা দ্বারা স্ত্রীশিক্ষা-প্রসারের আয়োজন— এইরূপ সরকারী ও বেসরকারী চেষ্টায় স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার লাভ করিতে থাকে। যাঁহারা একদা ইহার বিরোধী ছিলেন তাঁহারাও অনেকেই পরে সুফল দৃষ্টে ইহার সপক্ষতা করেন। মিশনরী ও হিন্দু, সরকারী ও বেসরকারী সকল রকম প্রচেষ্টাই সে যুগে নারীচিত্তের বিকাশসাধনে নিয়োজিত হইয়াছিল।

পরিশিষ্ট

১ কলিকাতা সেণ্ট্রাল ফিমেল স্কুল

কলিকাতা সেণ্ট্রাল ফিমেল স্কুলের ভিত্তি-প্রস্তরের সঙ্গে একখানি পিত্তল-ফলকও প্রোথিত করা হয়। ফলকের উপরকার লিপি হইতে ইহার প্রতিষ্ঠা ও নির্ম্মাণ-ইতিহাস সংক্ষেপে জানা যায়। লিপিটি এই .

Central School

FOR THE

EDUCATION OF NATIVE FEMALES,

FOUNDED BY SOCIETY OF LADIES,

WHICH

WAS ESTABLISHED ON MARCH 25, 1824,

PATRONESS :

THE RIGHT HON LADY AMHERST

GEORGE BAILLARD, ESQ , TREASURER.

MRS.HANNA ELLERTON, SECRETARY.

MRS. MARY ANN WILSON, SUPERINTENDENT

THIS WORK WAS GREATLY ASSISTED BY A LIBERAL

DONATION OF SICCA RUPEES 20,000

FROM RAJAH BOIDONAUTH ROY BAHADUR.

THE FOUNDATION STONE WAS LAID ON THE

18TH MAY, 1826, IN THE SEVENTH YEAR OF THE REIGN OF

HIS MAJESTY KING GEORGE IV.

THE RIGHT HON. WM. PITT. LORD AMHERST,

GOVERNOR-GENERAL OF INDIA.

C K. ROBINSON, ESQ., GRATUITOUS ARCHITECT.[১]

২ 'ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল' বা কলিকাতা বালিকাবিদ্যালয়

এই বিদ্যালয়-ভবনের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন উৎসবের কথা যথাস্থলে বলা হইয়াছে। ভিত্তি-প্রস্তরের সঙ্গে একখানি তাম্র-ফলকও প্রোথিত হয়। তাম্র-ফলকে এই কথাগুলি উৎকীর্ণ ছিল :

IN THE REIGN OF
HER MOST GRACIOUS MAJESTY
VICTORIA,
THE FOUNDATION STONE
OF THE
HINDU FEMALE SCHOOL
IN
CORNWALLIS SQUARE CALCUTTA,
WAS LAID WITH MASONIC HONOURS
BY
MAJOR GENERAL THE HONOURABLE SIR JOHN
HUNTER LITTLER, G.C.B.,
DEPUTY GOVERNOR OF BENGAL
ASSISTED BY
THE OFFICIATING DEPUTY GRAND
MASTER OF BENGAL,
SUPPORTED BY A NUMEROUS AND RESPECTABLE
CONVOCATION OF THE CRAFT
AND A LARGE ASSEMBLY OF THE
INHABITANTS OF CALCUTTA.
ON WEDNESDAY THE SIXTH DAY OF NOVEMBER,
A.D. MDCCCL. A.L. VDCCCL.

Wisdom exalteth her children, and layeth hold of them that seek her: he that loveth her loveth life, and they that seek to her early shall be filled with joy.—Ecclesiasticus, IV, 11, 12.

বেথুন প্রদত্ত রৌপ্য কর্ণিকে (Trowell) এই কথা কয়টি লেখা হয়। তাম্র-ফলকের উপর ইহা দ্বারা চূর্ণ-সুরকির প্রলেপ লাগাইয়া দেওয়া হয়।

PRESENTED BY
THE HONORABLE J. E. D. BETHUNE OF BALFOUR,
MEMBER OF THE SUPREME COUNCIL OF INDIA :
AND PRESIDENT OF THE COUNCIL OF
EDUCATION,
To
MAJOR GENERAL
THE HONORABLE SIR JOHN HUNTER LITTLER, G.C.B.,
DEPUTY GOVERNOR OF BENGAL.

Being the Trowel used in laying
THE FOUNDATION STONE
OF THE

Hindu Female School

A.D. MDCCCL. 6th Nov. A.L. VDCCCL.

Who can find a virtuous woman? For her price is far above rubies. She openeth her mouth with wisdom: and in her tongue is the Law of Kindness. Her children arise up and call her blessed; her husband also, and he praiseth her.

—Prov. xxxi, 10, 26, 28.

[On the Reverse]

Elevation of the Building with Masonic emblems.[৫]

পাদটীকা

১ *Beginnings of Modern Education in Bengal* : *Women's Education* by Jogesh C. Bagal. *Vide* Appendix, p. 70: Radhakanta Deb's Letter to J. E. D. Bethune.

২ C. Lushington's *History, Design, and Present State of the Religious, Benevolent and Charitable Institutions, Founded by the British in Calcutta and its Vicinity*, 1824.

এই পুস্তকে সম্পূর্ণ নিয়মাবলী দ্রষ্টব্য। পরে এই পুস্তকখানি শুধু *Lushington* বলিয়া উল্লিখিত হইবে।

৩ *The Calcutta Journal*, March 11, 1822.

৪ *Proceedings* of the Calcutta School Society (1818-1831). Unpublished.

৫ *The Government Gazette* (Supplement), December 22, 1823.

৬ *Lushington*, op. cit.

৭ *A Biographical Sketch of David Hare* by Peary Chand Mitra, p. 56.

৮ *Beginnings of Modern Education in Bengal* : *Women's Education*, pp. 19, 20.

৯ *Missionary Intelligence* for December 1827.

১০ *Ibid* for December 1825.

১১ *John Bull*, May 26, 1826.

১২ সমাচার দর্পণ, ২৮শে জুলাই ১৮২১। শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮। সমাচার দর্পণের উদ্ধৃতিগুলি উক্ত পুস্তক (১ম ও ২য় খণ্ড) হইতে গৃহীত।

১৩ *The Government Gazette*. Quoted in *The Asiatic Journal* (London) for January 1829: Asiatic Intelligence, Calcutta, p. 89.

১৪ সমাচার দর্পণ, ২৮ জুন, ১৮২৮।

১৫ *The Government Gazette*, December 18 and *John Bull*, December 19, 1828.

১৬ *Hand-Book of Bengal Missions* (1848) by The Rev. James Long, p. 429.

১৭ *John Bull*, November 4, 1829. cp. *The Asiatic Journal* for April, 1829 : Asiatic Intelligence, Calcutta.

১৮ *The Asiatic Journal* for February, 1832.

১৯ *The Calcutta Christian Observer* for January, 1834.

২০ *Ibid* for February, 1842.

২১ *Ibid.* for June 1845.

২২ *Ibid.*, for February 1840: "Ladies' Society's Schools," p. 101.

২৩ *The Friend of India*, April 28, 1852.

২৪ *Missionary Intelligence* for January 1827.

২৫ *Ibid.* for February, 1828.

২৬ *The Calcutta Christian Observer* for April 1833.

২৭ *The Life and Times of Carey, Marshman and Ward*, etc., Vol. II, p. 303.

২৮ *Missionary Intelligence* for February, 1828.

২৯ *First Report on the State of Education in Bengal* by W. Adam, p. 18. Calcutta University.

৩০ *The Calcutta Review* for July-September, 1855 : "Native Female Education."

৩১ *Native Female Education* by K. M. Banerjea, pp. 114-5.

৩২ *The Calcutta Christian Observer* for March, 1840.

৩৩ সমাচার দর্পণ, ২৯ এপ্রিল, ১৮৩৭ ।

৩৪ *The Calcutta Christian Observer* for April, 1840.

৩৫ *Report of the General Committee of Public Instruction, etc.*, for 1842-43 (Hindoo College Annual Report for 1842. Appendix K., p. lxxiii).

৩৬ *The Friend of India,* May 15, 1845.

৩৭ *General Report of the Committee of Public Instruction,* etc., from 1st May, 1848 to 1st October, 1849, p. xxx.

৩৮ *A Biographical Sketch of David Hare,* pp. 107-9.

৩৯ লর্ড ডালহৌসীকে লেখা বেথুনের পত্র। *Cf. Beginnings of Modern Education in Bengal; Women's Elucation,* Appendix, পৃ. ১৩-৮।

৪০ 'জয়গোপাল তর্কালঙ্কার', 'মদনমোহন তর্কালংকার'—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

৪১ *The Bengal Hurkaru and India Gazette,* November 9, 1850.

৪২ *Beginnings of Modern Education in Bengal : Women's Education,* Appendix, pp. 69, 70.

৪৩ *Journal of the Asiatic Society of Bengal, N.S. XXIII,* 1927, No. 3 : "Ishwarchandra Vidyasagar as a Promoter of Female Education of Bengal," by Brajendranath Banerjee.

৪৪ বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত, —শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন, পৃ ৮৫-৬

৪৫ পত্রাবলী, ৩০ নং পত্র, পৃ ৪০

৪৬ *Selections from Educational Records,* Part II, by J. A. Richie, p. 61.

৪৭ সংবাদ প্রভাকর, ২৬ জুলাই ১৮৫৬

৪৮ ঐ, ২৩ সেপ্টেম্বর ১৮৫৬

৪৯ *Beginnings of Modern Education in Bengal : Women's Education,* p. 24.

৫০ *The Bengal Hurkaru and India Gazette,* November 8, 1850.

৫১ *Ibid.*

মনস্তত্ত্বের গোড়ার কথা

শ্রীসমীরণ চট্টোপাধ্যায়



বি শ্ব ভা র তী
কলিকাতা

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ : ৯৫

প্রকাশ চৈত্র ১৩৫৮

পুনর্মুদ্রণ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭২ : ১৮৮৭ শক

প্রকাশক শ্রীকানাই সামন্ত

বিশ্বভারতী। ৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা-৭

মুদ্রাকর শ্রীবাণেশ্বর মুখোপাধ্যায়

কালিকা প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড। ২৫ ডি. এল. রায় স্ট্রীট। কলিকাতা-৬

২'১

বিজ্ঞপ্তি

এই পুস্তিকায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃক প্রকাশিত পরিভাষাই অধিকাংশ স্থানে গৃহীত হইলেও কিছু কিছু নূতন পরিভাষাও ব্যবহার করা হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে— 'behaviour'এর পরিভাষা 'আচরণ' করা হইয়াছে, কারণ 'behaviour'এর 'bodily changes' বা 'movement or change of movement'এর দিকটি সুস্পষ্ট করিবার জন্য 'চর' ধাতু সুবিধাজনক বোধ হইল। 'engram'এর আলোচনার সহিত 'অভিজ্ঞতা' অপেক্ষা 'অভিজ্ঞা'র যোগ বেশি আছে বোধ হওয়ায় 'experience'এর পরিভাষা 'অভিজ্ঞা' ব্যবহৃত হইয়াছে। 'horme' ও 'mneme'এর পরিভাষাও নূতন করা হইয়াছে— 'horme'র ভাব 'প্রৈতি' কথাটিতে বেশ প্রকাশ করা যায় এবং 'mneme'র অর্থ 'ধৃতি' করিলে খারাপ হয় না।

নূতন পরিভাষাগুলি গ্রহণ করিবার সময় শ্রীকানাই সামন্ত মহাশয় সর্বপ্রকারে সাহায্য করেন। তিনি এ বিষয়ে প্রয়োজনবোধে কখনো কখনো শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী মহাশয়ের পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বিষয়সূচী

১

মনঃ-প্রকল্প (The Mental Hypothesis)

মনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনোরূপ সন্দেহ থাকিতে পারে ইহা যেন ভাবা যায় না। 'মন বলিয়া কিছু নাই' ইহা অনেকটা প্রলাপোক্তির মতো শোনায়। কিন্তু কোনো কোনো বৈজ্ঞানিক-দৃষ্টি-সম্পন্ন চিন্তাশীল ব্যক্তি মনের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে চাহেন না। তাঁহাদের মতে জীব মনোবিশিষ্ট কিছু নহে, প্রত্যেক জীব এক-একটি যন্ত্র, বিশেষ প্রকারের জটিল যন্ত্র, যন্ত্রের অতিরিক্ত কিছু নহে। মানুষ নানারূপ জটিল যন্ত্র উদ্‌ভাবন করিয়াছে বটে তথাপি মানুষ নিজেই জটিলতম যন্ত্র। কোনো যন্ত্রকে রসায়ন, গণিত, পদার্থ-বিদ্যা প্রভৃতির দ্বারা বুঝিতে পারা যায়, নিয়ন্ত্রিত করা যায়। এই-সকল বিদ্যায় জ্ঞান যথোপযুক্ত হইলেই জীব-যন্ত্রকেও যান্ত্রিক নিয়মে বুঝিতে পারা যাইবে, পরিচালিত করা যাইবে। আমাদের নিকট বেতার-যন্ত্র যন্ত্র ব্যতীত কিছু নহে; কিন্তু আফ্রিকার অরণ্যবাসীর নিকট শব্দায়মান বেতার-যন্ত্র প্রাণী বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। সেই অরণ্যবাসীর জ্ঞান উপযুক্তভাবে প্রসারিত হইলে বেতার-যন্ত্রের যন্ত্রত্ব ধরা পড়িবে, তখন আর প্রাণী বলিয়া ভুল হইবে না। জ্ঞানের অল্পতা-হেতুই আমরা জীবজগতে মনকে টানিয়া আনি, জ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি হইলে মনের বালাই ঘুচিয়া যাইবে, তখন আমরা সমস্ত জীবকে এবং নিজেদিগকে যন্ত্র বলিয়াই বুঝিতে পারিব। তখন আমাদের এত উন্নতি হইবে যে পুত্র-শোকাতুরা জননীর আর্তনাদকে মনের বেদনা বলিয়া ভুল করিব না, তাঁহার ক্রন্দনকে পেটা ঘড়ির ঢং ঢং শব্দের সমশ্রেণী বলিয়া মনে করিব।

এইরূপে মনের অস্তিত্ব উড়াইয়া দিলে বহু বিষয় অবোধ্য হইয়া যায়, বহু বিষয়ে ব্যাখ্যা মেলে না। যন্ত্রজগৎ সম্পূর্ণভাবে নিয়মের জগৎ।

যে ক্রিয়ার যে প্রতিক্রিয়া তাহা কঠিন নিয়মে বাঁধা। শুষ্ক বারুদে অগ্নি সংযোগ করিলে বিস্ফোরণ ঘটে— ইহা যে-সকল অবস্থায় একবার সত্য হইয়াছে সেই-সকল অবস্থায় ইহা সকল স্থানে সকল সময়ে সত্য হইবে। বারুদের অন্তর্নিহিত এমন কোনো শক্তি নাই যাহার দ্বারা বারুদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার নিয়ম-লঙ্ঘন ঘটিতে পারে। কিন্তু এইরূপ বিশ্বাস জীবজগতে অমূলক; একই অবস্থায় বার বার একই আচরণ জীবের ক্ষেত্রে আশা করা যায় না। কোনো বালককে একবার তিরস্কার করিয়া সুফল পাওয়া গিয়াছে বলিয়া যে বারবার তিরস্কার করিয়া ভালো ফল লাভ করা যাইবে তাহা নহে, এবং একটি বালকের ক্ষেত্রে তিরস্কার শুভ-ফলপ্রসূ হইয়াছে বলিয়া যে সকল বালকের বেলায় সেইরূপ হইবে, এমন কোনো কথা নাই। ইহা মানুষের ক্ষেত্রে যেমন সত্য, অপর সকল জীব-শ্রেণীতেও তেমনি সত্য। বিজ্ঞানীরা দেখিয়াছেন যে, এক-কোষ-বিশিষ্ট নিম্নতম জীবও বারে বারে একই রূপ অবস্থায় পড়িলে একই রূপ আচরণ করে তাহা নহে, সম-অবস্থায় একাধিক ভাবে আচরণ করে। জীবজগতে যেন একটু খেয়ালের ভাব আছে, জীবের যেন খেয়ালী হইবার অধিকার আছে। জড়-জগতের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার তুলনায় জীবের অবস্থা ও আচরণের মধ্যে অনিশ্চয়তা রহিয়াছে। এই অনিশ্চয়তাকে, জীবের এই খেয়াল-ভাবকে তো গণিত, রসায়ন বা পদার্থ-বিদ্যার দ্বারা বুঝিতে পারা যায় না। জীবের এমন একটা কিছু আছে যাহা ঐ-সকল বিদ্যার আয়ত্তের বাহিরে, যাহা যন্ত্রত্বের অতিরিক্ত। মনের অস্তিত্ব স্বীকার করিলে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব হয়, জীবের অ-যান্ত্রিকতার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এইজন্য আমরা বলিতে পারি মনঃ-প্রকল্প মনো-বিদ্যার ভিত্তিস্বরূপ।

মনঃ-প্রকল্প স্বীকৃত হইলেও প্রশ্ন থাকিয়া গেল—জীবের দেহ বলিয়া যে বস্তুটি রহিয়াছে তাহার সহিত মনের সম্বন্ধ কী। এই সম্বন্ধ লইয়া একাধিক মতের সৃষ্টি হইয়াছে। দেহ অসুস্থ থাকিলে মন অবসন্ন হইয়া পড়ে, মন বেদনাক্লিষ্ট হইলে শরীরও ক্লান্ত হয়। এই অভিজ্ঞতা হইতে কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করেন দেহই প্রধান, মন আজ্ঞাধীন। কেহ বলেন মন প্রধান, দেহ আজ্ঞাকারী। কাহারও মতে দেহ ও মন একত্র থাকিলেও দুইটির সত্তা পৃথক, তাহারা একই ভাবে চলে মাত্র। আবার কেহ দেহ ও মনের পারস্পরিক প্রভাবের উপর জোর দেন। অনেকে দেহ ও মন একই বলিয়া থাকেন। কেহ বলেন সবই মানসিক, আবার কেহ কেহ জীবক্রিয়ার দৈহিক ব্যাখ্যাই যথেষ্ট মনে করেন। এইখানেই মতামতের শেষ নহে। কিন্তু ইহা মূলতঃ দর্শন শাস্ত্রের আলোচ্য। আমরা এই-সকল মতামতের গোলমালে না গিয়া জীব সম্বন্ধে একটি কার্যকর সিদ্ধান্তে আসিতে পারি। কোনো জীব দেহ ও মন-নামক দুইটি পৃথক্ জিনিসের মিলন নহে। দেহ-যুক্ত মন বা মন-যুক্ত দেহ বলিয়া জীবকে না ভাবিয়া জীবকে দেহ-মন বা মন-দেহ বলিয়া দেখা যাইতে পারে। দেহ-যুক্ত মন বলিলে একটি যান্ত্রিক যোগ বুঝাইবে; 'দেহ-মন' কথাটিতে অযান্ত্রিক, জৈব সম্বন্ধ সূচিত হইবে। আলোচনার জন্য আমরা দেহ ও মনের পৃথক্ পৃথক্ সত্তা কল্পনা করিতে পারি কিন্তু বাস্তবে দেহ-মন পরস্পর অবিচ্ছেদ্য। একের অবর্তমানে অপরটির অস্তিত্ব থাকে না ইহাই আমাদের অভিজ্ঞতা। দেহ নাই, শুধু মন আছে, ইহা যেমন অবাস্তব তেমনি মন নাই অথচ জীব-দেহ রহিয়াছে, ইহা শুধু বুঝিবার ভুল। মনোহীন জীব-দেহ দেহ নহে, কতকগুলি বস্তু দিয়া নির্মিত অর্থহীন দেহ-রূপ মাত্র।

জীবের কোনো অংশই স্বয়ংপূর্ণ নহে। দেহ-মনের মন বা দেহ

অথবা দেহের চোখ, কান, নাক প্রভৃতি অংশগুলি পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীল, পরস্পরের প্রভাবাধীন এবং পরস্পর হইতে অবিচ্ছেদ্য। এইরূপ পারস্পরিক অবিচ্ছেদ্যতা জৈব সম্বন্ধের বৈশিষ্ট্য। কাহারও চোখে যদি আঘাত লাগে তাহা হইলে সেই আঘাত কেবলমাত্র চোখের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না; প্রত্যক্ষ ভাবে চোখটিই ক্ষতিগ্রস্ত হয় বটে তথাপি সেই আঘাত সমগ্র দেহ-মনে প্রতিফলিত হয়। চোখে না লাগিয়া আঘাত যদি চশমায় লাগে তাহা হইলে ফল অন্যরূপ হইবে। চশমার সহিত চশমার অধিকারীর জৈব সম্বন্ধ নাই, যান্ত্রিক যোগ আছে মাত্র। দেহ হইতে বিচ্যুত হইলে চশমা চশমাই থাকিবে; কিন্তু চোখ যদি উপড়াইয়া ফেলা যায়, চোখের চক্ষুত্ব থাকে না: চশমার উপর আঘাতকে কেবলমাত্র চশমাতেই আঘাত বলিলে ভুল হইবে না; অথচ চোখের আঘাত সমগ্র দেহ-মনে আঘাত।

দেহের বিভিন্ন অংশ ও মনের বিভিন্ন ক্রিয়া যে কিরূপে পরস্পরের সম্পূরক তাহা একটি উপমার সাহায্যে বিশদভাবে বুঝা যাইতে পারে। ধরা যাক, ফুটবল খেলা চলিতেছে; হঠাৎ একটি খেলোয়াড় আহত হওয়ায় মাঠের বাহিরে চলিয়া গেলেন; তখনই দেখা যাইবে অন্যান্য খেলোয়াড়রা তাঁহাদের খেলার পদ্ধতির পরিবর্তন করিবেন। হয়তো গোলরক্ষক বল ধরিবার জন্য এক পার্শ্বে অগ্রসর হইলেন, অমনি অন্যান্য খেলোয়াড়রা তাঁহাদের স্থান পরিবর্তন করিলেন। এইরূপে প্রতিক্ষণে যে-কোনো খেলোয়াড়ের খেলা পরিবর্তিত হইলে, অপর সকল খেলোয়াড়ের খেলাই বদলাইয়া যাইবে এবং সমগ্র দলটির খেলায় পরিবর্তন ঘটিবে। খেলোয়াড়রা যেন প্রত্যেকে এক-একটি জৈব অংশ এবং ক্রীড়ারত সমগ্র দলটি যেন একটি ক্রিয়াশীল জীব। জৈব অংশের ন্যায় প্রত্যেকে পরস্পরের প্রভাবাধীন, পরস্পরের সম্পূরক।

স্বাতন্ত্র্য (Autonomy) ও
আভিপ্রায়িকতা (Purposiveness)

উপরোক্ত উপমা অসম্পূর্ণ হইলেও ইহা হইতে আরও দুইটি বিষয় বুঝিতে সুবিধা হয়। ক্রীড়ারত দলের প্রত্যেকের খেলার দায়িত্ব ভিন্ন ভিন্ন, গোল-রক্ষকের কর্তব্য ও 'ব্যাক'-এর দায়িত্ব এক নহে, অগ্রগামী খেলোয়াড়দের খেলা গোল-রক্ষক ও 'ব্যাক'এর খেলা হইতে পৃথক। প্রত্যেক খেলোয়াড় তাঁহার নিজ দায়িত্ব ভালো ভাবে পালন করিলে সমগ্র দলের খেলা ভালো হইবে। ব্যক্তিগতভাবে খেলোয়াড়রা নিজ নিজ কৌশল খাটাইতে পারেন, নানা ভঙ্গীতে ইচ্ছামত খেলিতে পারেন। এই-সকল স্বাধীনতা প্রতি খেলোয়াড়েরই আছে। দলের সকলেরই নির্দিষ্ট কর্তব্য আছে এবং কর্তব্যপালনের স্বাধীনতাও আছে।

ইহার সহিত দেহ-মনের বিভিন্ন ক্রিয়ার তুলনা করা যাইতে পারে।

চোখ, কান, জিহ্বা প্রভৃতি দেহাংশের পৃথক পৃথক কর্তব্য আছে। চোখ আলোক-তরঙ্গ গ্রহণ করিবে, কান তাহা পারিবে না; কান শব্দ-তরঙ্গে সাড়া দিবে, চোখ তাহা পারিবে না। এইরূপে দেহের ক্রিয়া ও মনের ক্রিয়ার ভেদ আছে। আবার মনের স্মৃতি-শক্তি ও ধী-শক্তি এক নহে; স্মৃতির কার্য বুদ্ধির দ্বারা সাধিত হইবে না। ইহাদের ক্ষেত্র পৃথক্, কার্য ভিন্ন ভিন্ন। নিজের নিজের ক্ষেত্রে নিজের নিজের কর্তব্যে সকল অংশ সকল শক্তি স্বাতন্ত্র্যপরায়ণ। চোখ চোখের বৈশিষ্ট্য লইয়া কার্য করিবে, স্মৃতি আপন প্রখরতা-অনুসারে অভিজ্ঞতাকে ধারণ করিবে। কিন্তু চোখ, কান, স্মৃতি, বুদ্ধি প্রভৃতির স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও সব মিলাইয়া একটি সমগ্র জীব।

জৈব অংশগুলির স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিলে আর-একটি বিষয় অবশ্য-স্বীকার্য হইয়া পড়ে, ইহাকে আভিপ্রায়িকতা বলা যায়। জীবের

প্রতি ক্রিয়ার পশ্চাতে, স্পষ্টই হউক আর অস্পষ্টই হউক, কোনো না কোনো অভিপ্রায় থাকে। এমন-কি বিজ্ঞানীদের মতে জৈব অংশগুলিও যেন একাধিক উদ্দেশ্যের দ্বারা সক্রিয় হয়। একটি উদাহরণ লওয়া যাক। অধ্যাপক রবীন্দ্র-কাব্য পড়িতেছেন, উদ্দেশ্য কাব্যরস উপভোগ করা। চোখ নিজেকে সংকুচিত বা স্ফীত করিয়া আপন কার্য সুসম্পন্ন করিতেছে; হাত কাব্যগ্রন্থটিকে চোখ হইতে সুবিধাজনক দূরত্বে রাখিয়া চোখকে সাহায্য করিতেছে; স্মৃতি, বুদ্ধি, কল্পনা— সবই সক্রিয় হইয়া আছে; দেহের স্নায়ু ও মাংসপেশীগুলি নিজের নিজের কার্য করিতেছে। এইরূপে বিভিন্ন ক্রিয়ার সমন্বয়ে মূল ক্রিয়া সম্পন্ন হইতেছে— অধ্যাপকের কাব্য-রসাস্বাদন চলিতেছে। চোখ, হাত, স্নায়ু, মাংসপেশী, মন প্রভৃতি যেন নিজ নিজ অভিপ্রায়-অনুসারে সক্রিয় হইতেছে। জৈব অংশগুলির বিভিন্ন ক্রিয়ার পশ্চাতে খণ্ড খণ্ড উদ্দেশ্য আছে— এরূপ ভাবা যাইতে পারে এবং এই-সকল খণ্ড উদ্দেশ্য সমন্বিত হইয়া মূল, সমগ্র উদ্দেশ্যটি সিদ্ধ হইতেছে বলা যায়।

ক্রিয়ার আভিপ্রায়িকতা জীবকে বিশেষিত করিয়াছে। অ-জীবের গতির মূলে কোনো উদ্দেশ্য নাই। মানুষ নিজের উদ্দেশ্যসাধনের জন্য অত্যন্ত জটিল যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছে। যন্ত্র এমন ভাবে কাজও করিতে পারে যে মনে হয়, যন্ত্রেরও বুঝি বুদ্ধি জন্মিয়াছে। কিন্তু শত হইলেও যন্ত্র যন্ত্র ছাড়া আর-কিছু নহে, জটিলতম যন্ত্রও আভিপ্রায়িকতা-হীন। অপর পক্ষে নিম্নতম জীবও উদ্দেশ্যহীন নহে। এক-কোষ-বিশিষ্ট জীব হইতে মানুষ পর্যন্ত সকলেরই আভিপ্রায়িকতা রহিয়াছে। যে জীব যত উন্নত তাহার আচরণের মূলে অভিপ্রায় তত স্পষ্ট। কীট-পতঙ্গাদি নিম্নশ্রেণীর জীবের আভিপ্রায়িকতা এত অস্পষ্ট যে ইহারা যান্ত্রিকতার কাছাকাছি রহিয়া গিয়াছে বলা চলে।

ভেদ (Difference) ও সূত্র (Law)

আভিপ্রায়িকতা সকল শ্রেণীর জীবের ভিতর একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হিসাবে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে ; কিন্তু এই বিশেষ মিলের সহিত জীবজগতে অমিলও রহিয়াছে। জীবজগতে শ্রেণীগত ভেদ যেমন স্পষ্ট, শ্রেণীর ভিতরে ব্যক্তিগত পার্থক্যও তেমনি স্বতঃপ্রমাণ। প্রজাপতি হইতে পাখি কতদূর পৃথক্ ; পাখি হইতে পশুর প্রভেদ ততোধিক ; পশু হইতে মানুষের অন্তর অতি শিশুরাও বুঝিতে পারে। আবার একটু ভালো করিয়া দেখিলেই দেখা যাইবে যে-কোনো দুইটি প্রজাপতি পরস্পরের অবিকল নকল নহে ; কাক ও কোকিলের পার্থক্যে সন্দেহের অবকাশ নাই ; মানুষের ভিতর যমজ ভ্রাতাদেরও অমিল সুস্পষ্ট। যে-কোনো জীব অপর একটি জীব হইতে বহুপ্রকারে পৃথক্ ; অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম প্রভেদের সমষ্টি এই শ্রেণীগত ও ব্যক্তিগত ভেদের সৃষ্টি করে। এই ভেদ যে কেবল আকৃতিগত তাহা নহে, সংস্কার ও অন্তঃশক্তির তারতম্যই শ্রেণীগত ও ব্যক্তিগত ভেদের মূল। জন্মগত পার্থক্য যত অল্পই হউক না কেন, ইহা কোনো উপায়ে সম্পূর্ণ দূর করা যায় না, কোনো উপায়েই সকলকে সব দিক দিয়া সমান করা যায় না। জন্মগত সাম্য কল্পনা-বিলাস মাত্র ; তাহার বৈজ্ঞানিক সম্ভাবনা নাই। পরিবেশের সংস্পর্শে ভেদের বহুরূপ পরিবর্তন হয় বটে, এমন-কি যথেষ্ট মিল স্থাপন করাও যায় তথাপি ব্যক্তিগত ভেদ ও শ্রেণীগত ভেদ কম বেশি থাকিয়াই যায়। জন্ম হইতেই ভেদাভেদ বর্তমান থাকায় একই অবস্থায় বিভিন্ন জীব বিভিন্নভাবে আচরণশীল হয়, বিভিন্নভাবে আত্মগঠন করে। সুতরাং একই পরিবেশে রাখিয়া সংস্কার ও অন্তঃশক্তির প্রভেদ দূর করার আশা অমূলক। যে অবস্থায় বা পরিবেশে থাকিয়া রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ

হইয়াছেন সেই পরিবেশে যে-কোনো ব্যক্তি থাকিতে পারিলেই যে তিনিও একটি রবীন্দ্রনাথ হইবেন— ইহা আশা করা হাস্যকর ও অবৈজ্ঞানিক। অতএব যে-কোনো সমাজ-ব্যবস্থা শিক্ষা-ব্যবস্থা এই ব্যক্তিগত ভেদাভেদকে স্বীকার করিয়া লইবে, নচেৎ কোনো ব্যবস্থা শুভপ্রসূ হইতে পারিবে না।

জীবজগতে সাধারণ সূত্রগুলি আবিষ্কার করিতে হইলে জীবের শ্রেণীগত ও ব্যক্তিগত ভেদাভেদের কথা বিচার করিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে যে একই অবস্থায় বিভিন্ন শ্রেণীর জীব বা একই শ্রেণীর বিভিন্ন জীব একই ভাবে আচরণ করে না। ইহাও ভুলিলে চলিবে না যে, কোনো জীব একই অবস্থায় বার বার একই আচরণ করিবে তাহার নিশ্চয়তা নাই। জীবের এই অবশ্যম্ভাবী ভেদ ও আচরণের খেয়াল লক্ষ্য করিলে মনে হয় জীবজগতে কোনোরূপ সাধারণ সূত্র অসম্ভব। একটি ছাগল-ছানা তাড়া খাইয়া পলাইয়া গেল। কিন্তু একবার পলাইল বলিয়া যে তাড়া খাইলেই সে পলাইবে তাহা তো নহে; কারণ সে নিজের অভিপ্রায় বা খেয়াল-অনুসারে আচরণ করিবে, সে তো যন্ত্র নহে; আবার ছাগল-ছানাটি পলাইয়াছিল বলিয়া 'লম্বকর্ণ'-জাতীয় ছাগল পলাইবে না, সে বরং ঢুঁ মারিতে আসিবে এবং হনুমান হইলে দাঁত খিঁচাইবে। অতএব 'তাড়া খাওয়া' ও 'পলায়ন' এই দুইটির ভিতর নিয়ম কই, সাধারণ সূত্র কই? 'তাড়া খাওয়া' নামক অবস্থা ও 'পলায়ন'-রূপ আচরণ— ইহাদের মধ্যে যান্ত্রিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার অনুরূপ কোনো সম্বন্ধ তো নাই।

তথাপি জীব বা অজীব নিয়মের সম্পূর্ণ বাহিরে থাকিতে পারে না, অতএব জীবজগতেও সাধারণ সূত্র সুনিশ্চিত। দৃষ্টান্তের সাহায্য লওয়া যাক। খাদ্য না পাইলে যথাসময়ে ক্ষুধা পাইবে, যথামাত্রায় ক্ষুধা পাইলে

খাদ্যের সন্ধান আরম্ভ হইবে— ইহা ছাগল-ছানাটির ক্ষেত্রে যেমন সত্য লম্বকর্ণের বেলাতেও সেইরূপ এবং ইহা সমগ্র জীবজগতে প্রযোজ্য একটি সাধারণ সূত্র। খাদ্যের অনুসন্ধান কিভাবে চলিবে তাহা নির্ভর করিবে জীবের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের উপর। নিরীহ ছাগল-ছানাটি হয়তো চীৎকার করিয়া তাহার মাকে খুঁজিতে থাকিবে, লম্বকর্ণ বেড়া ভাঙিয়া বাগানে প্রবেশ করিবে। সম-অবস্থায় ব্যক্তিগত আচরণের পার্থক্য থাকিতে পারে কিন্তু তাহার সহিত ক্ষুধা ও খাদ্যান্বেষণের সাধারণ সূত্রও বর্তমান। ছাগল-ছানা যতবার তাড়া খাইয়া ভয় পাইবে ততবারই পলাইবে। লম্বকর্ণকেও যদি ঠিকমত তাড়া দিয়া ভয় পাওয়াইয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে সেও পলাইবে। যে ভাবের তাড়া ছাগল-ছানার পক্ষে ভয়ানক তাহা লম্বকর্ণের পক্ষে ভয়ানক না হইতে পারে, কারণ ব্যক্তিগত ভেদ রহিয়াছে। তথাপি ভয়ানক ভাবে তাডা দিলে জীব ভয় পাইবে এবং ভয় পাইলেই পলায়নোদ্যত হইবে। এইরূপে ভয়ানক তাড়া, ভয় ও পলায়ন— এই লইয়া একটি সূত্র পাওয়া গেল। অতএব আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে শ্রেণীগত বা ব্যক্তিগত ভেদ থাকা সত্ত্বেও শ্রেণীগতভাবে বা সমগ্র জীব-জগতে প্রযোজ্য সাধারণ সূত্রাবলীও বর্তমান।

অ-জীব হইতে জীবের গুণগত প্রভেদ আছে তথাপি জীব জড়-জগৎকে এবং জড়-জগতের নিয়মকে অস্বীকার করিতে পারে না। কারণ, জীবদেহে জড়জগতের বহু পদার্থ রহিয়াছে; দেহ-মনের দেহাংশ এই-সকল রাসায়নিক পদার্থের দ্বারাই গঠিত। দেহের কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন প্রভৃতি রাসায়নিক পদার্থ রাসায়নিক নিয়মে নিয়ন্ত্রিত হইবে— ইহাই স্বাভাবিক। আগুনে হাত দিলে হাত পুড়িবে, রসায়নশাস্ত্রানুসারে হাতের চামড়া, শিরা, মাংস প্রভৃতি যৌগিক পদার্থ আগুনের তাপে রাসায়নিক উপায়ে পরিবর্তিত হইবে। হাত জীবের অংশ বলিয়া যে

রসায়নশাস্ত্রের বাহিরে থাকিবে তাহা নহে। পরন্তু হাতের দহন-রূপ যে রাসায়নিক পরিবর্তন তাহার ফল ভোগ করিবে সমগ্র জীব, সমগ্র দেহ-মন— চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িবে, সারা দেহে জ্বরভাব দেখা দিবে, মন দমিয়া যাইবে। দেহ-মন জড়ের অতিরিক্ত তথাপি জড়ের নিয়ম হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে নাই।

ইহার সহিত আর-এক দিক আলোচ্য। পোড়া হাতের জ্বালা নিবারণ করিতে হইলে অথবা ক্ষত স্থানকে সুস্থ করিতে হইলে ক্ষতস্থানে ঔষধের প্রলেপ দরকার এবং ঔষধসেবনও ফলপ্রদ। হাত জৈব অংশ, সুতরাং ঔষধসেবনও হাতের ক্ষতে সাহায্য করিবে। কিন্তু পোড়া ক্ষতে পোড়া ক্ষতেরই ঔষধ দিতে হইবে, চক্ষুপীড়ার বা দন্তশূলের ঔষধ নহে। এই কারণে পোড়া ক্ষত সম্বন্ধে চামড়া মাংস শিরা প্রভৃতি সম্বন্ধে যথোপযুক্ত জ্ঞান চাই। যাঁহার এই-সকল বিষয়ে জ্ঞান যথেষ্ট নহে তাঁহার অভিজ্ঞতা দন্তশূল সম্বন্ধে প্রচুর হইলেও পোড়া হাতের কোনো সাহায্য তিনি করিতে পারিবেন না। এইজন্য যাহা প্রত্যক্ষভাবে মনের বিষয় বলিয়া আমরা বুঝিয়া থাকি তাহা মন-বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পরিচালিত, নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত এবং যাহা দেহের বিষয় তাহা দেহ-বিদ্‌দের হাতে থাকা ভালো। দেহের সাধারণ সূত্রাবলী মনের ক্ষেত্রে এবং মনের সাধারণ সূত্রগুলি দেহের বিষয়ে সার্থক হইবে না। মনের ক্রিয়াকে সাহায্য করিতে হইলে মনের সাধারণ সূত্র আবিষ্কার করা দরকার এবং দেহকে উন্নত করিতে হইলে দেহ-বিষয়ক সূত্র বাহির করা চাই। কিন্তু আবার স্মরণ রাখা কর্তব্য যে যদিও দৈহিক ও মানসিক সূত্রাবলী যথাক্রমে দেহের ও মনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য তথাপি তাহারা পরস্পর সম্পূরক।

মনোবিদ্যা ও শিক্ষা

শিক্ষা প্রধানতঃ মনের বিষয়। শিক্ষাকে 'প্রধানতঃ' মনের বিষয় না বলিয়া 'কেবলমাত্র' মনের বিষয় বলিলে ভুল হয়; শিক্ষার দৈহিক ভিত্তি অস্বীকার করা চলিবে না, কারণ 'কেবলমাত্র' মন বলিয়া কিছু নাই, দেহ-মনকে সমন্বিত করিয়াই একক (unit) ধরিতে হইবে। তথাপি জ্ঞানার্জন দেহ-মনের মানসিক সক্রিয়তা, ইহা অত্যুক্তি নহে।

শিক্ষা এইভাবে প্রধানতঃ মানসিক বলিয়া বিবেচিত হইলে শিক্ষা ও মনোবিদ্যার সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হইয়া পড়ে। শিক্ষাকার্যকে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করিতে হইলে মনের তত্ত্ব জানা আবশ্যক; মনের ক্রিয়াকে সাহায্য দিতে হইলে দেহ-বিদ্যা তো ফলপ্রসূ নহে।

বলা যাইতে পারে যে কাহারও সাহায্য না পাইলেও শিক্ষালাভ সম্ভব। যে কোনো বালক, যে কোনো প্রাণী তাহার দেহ-মনের বহিঃস্থিত পরিবেশের সংস্পর্শে আসিয়া নানাভাবে শিক্ষা-সঞ্চয় করিতে পারিবে। অতএব স্বাভাবিক শিক্ষার সহিত মনোবিদ্যার হাঙ্গামা অনাবশ্যক।

শিক্ষার এইরূপ ব্যাখ্যা যে হইতে পারে তাহা নিশ্চয়। তথাপি কাহারও সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইয়া কোনো বালকই যে বেশিদূর শিখিতে পারিবে না, এ কথাও ততোধিক সত্য। যাহার যতদূর শিখিবার শক্তি আছে, যত দিক সে জানিতে সক্ষম, তত দিক দিয়া ততদূর অগ্রসর হইতে সে পারিবে না, যদি সে অপরের সাহায্য না পায়, যদি সে আপনা-আপনি ঠেকিয়া ঠেকিয়া শেখার উপর নির্ভর করে। শিক্ষাকার্যে অন্যের সাহায্য একান্ত প্রয়োজন, নহিলে শিক্ষাশক্তি ও সময়ের সম্পূর্ণ ব্যবহার করা যাইবে না। মানুষের ক্রমোন্নতির সহিত শিক্ষার ক্ষেত্র ক্রমশই বিস্তৃত হইতেছে। সুদূর অতীত হইতেই স্বয়ংশিক্ষার অনুপযুক্ততা

যেন ধরা পড়িয়াছে। ইতিহাসের গোড়া হইতেই শিক্ষার্থীকে জ্ঞাতসারে ও প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষাদান আরম্ভ হইয়াছে। যেদিন শিক্ষাকে সাহায্য-সাপেক্ষ করা হইয়াছে সেইদিনই মনোবিদ্যার সহিত শিক্ষার সম্বন্ধ-স্থাপনের সূচনা বলা যায়।

প্রথম প্রথম মনোবিদ্যাকে কোনো তত্ত্ব বলিয়া বুঝিতে পারা যায় নাই এবং শিক্ষায় মনোবিদ্যার সম্ভাব্য দান সম্বন্ধে স্পষ্ট উপলব্ধি হয় নাই। তথাপি, শিক্ষার মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি বুঝিতে না পারিলেও মানুষ দৈনন্দিন কার্যে মনোবিদ্যার ব্যবহার করিয়াছে, পরস্পর পরস্পরের মন জানিবার চেষ্টা করিয়াছে। কাহাকেও কিছু শিখাইবার বা বুঝাইবার সময়, কাহাকেও দিয়া কোনো কাজ করাইবার সময়, জিনিসপত্র ক্রয়-বিক্রয়ে,সান্ত্বনাদানে, ভীতিপ্রদর্শনে— অতিদূর অতীত হইতে এই মন-বুঝা-বুঝি চলিয়া আসিতেছে। ক্রমশ মানুষ জানিয়াছে যে মন-বুঝাবুঝির ভিতর কতকগুলি ধারা আছে, যেন কতকগুলি নিয়ম আছে। মনের ব্যাপারে এইরূপ সাধারণ সূত্র সম্ভব বোধ হওয়ায় মনেরও একটি বিজ্ঞান জন্মলাভ করিল; মনোবিদ্যা বিজ্ঞানসম্মত বলিয়া গৃহীত হইল। কিন্তু তখনও ইহার ব্যবহারিক দিকটি স্পষ্ট নজরে পড়ে নাই; শিক্ষায় মনোবিদ্যার ব্যবহার থাকিতে পারে, ইহা বুঝা যায় নাই। কালক্রমে তাহাও বিশ্বাসের বিষয় হইল এবং শিক্ষণকার্যে মনোবিদ্যার ব্যবহারের চেষ্টা চলিল। মনোবিদ্যার এই দশায় বয়স্কদের নিজেদের মনঃ-পর্যবেক্ষণের দ্বারা, নিজেদের বয়স্ক মনের চিন্তা, উপলব্ধি, স্মৃতি, বুদ্ধি প্রভৃতির দ্বারা, যে-সকল সাধারণ সূত্র আবিষ্কৃত হইয়াছিল তাহারই উপর মনোবিদ্যার ভিত্তি রচিত হইল। বয়স্কদের অন্তর্দর্শনের দ্বারা প্রাপ্ত সূত্রাবলী শিশুদের শিক্ষণ-কার্যে ব্যবহার আরম্ভ হইল। কিন্তু অনতিবিলম্বে দেখা গেল তদানীন্তন মনোবিদ্যা শিশুশিক্ষায় আশানুরূপ কার্যকরী নহে। ফলে

কোনো কোনো মনোবিদ্ শিক্ষা-বিষয়ে মনোবিদ্যার দান সম্পর্কে নিরাশ হইয়া পড়িলেন। তথাপি গবেষণা থামিল না : মনোবিদ্যা বিজ্ঞানসম্মত বলিয়া বিবেচিত, অথচ সমগ্র মানব-শ্রেণীতে কেন ইহা প্রযোজ্য নহে, এই লইয়া অনুসন্ধান চলিল। অবশেষে মনোবিদ্যাই বলিয়া দিল যে, বয়স্কদের মন ও শিশু-মনের মধ্যে বহু দিক দিয়া গুণগত পার্থক্য আছে। শিশু হইতে বয়স্কদের প্রভেদ কেবলমাত্র পারিমাণিক নহে। তজ্জন্য ছোটোদের শিক্ষণকার্যে বড়োদের অন্তর্দর্শন হইতে পাওয়া সূত্রাবলী সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে। শিশু হইতে বয়স্কদের গুণগত প্রভেদের তত্ত্বটি যখন জানা গেল তখন হইতে শিক্ষার সহিত মনোবিদ্যার সম্বন্ধ আবার নিকট হইয়া পড়িল। বর্তমানে শিক্ষা-শক্তি ও সময়ের সর্বাধিক ব্যবহার করিতে হইলে শিক্ষাকে মনোবিদ্যার সাহায্য লইতে হইবে— এই বিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছে। শিক্ষণ-প্রণালী বয়স্ক মনের যুক্তির উপর নির্ভর করিবে না, শিক্ষার্থীর ও অংশতঃ শিক্ষকের মনের উপর তাহার সার্থকতা নির্ভর করিতেছে।

শিক্ষার মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি স্বীকৃত হইলেও শিক্ষার আদর্শ সম্বন্ধে মনোবিদ্যা বিচারক নহে। কোনো বিজ্ঞানই উচিত অনুচিত সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারে না। আণবিক বোমা আণবিক শক্তি সম্বন্ধে গবেষণার ফল। আণবিক শক্তি বোমার মাধ্যমে ধ্বংসকার্যে ব্যবহৃত হইবে, না, মানব-কল্যাণে নিযুক্ত হইবে, তাহা বিজ্ঞানের আলোচনার বাহিরে। সেইরূপ মনোবিদ্যাও শিক্ষার উদ্দেশ্য কিরূপ হওয়া উচিত তাহা বলিতে পারে না। মনোবিদ্যা হইতে জানা যায় যে, কোনো শিক্ষার্থীকে যদি শৈশব হইতে এমন পরিবেশের মধ্যে রাখা যায় যে সে কোনো স্নেহ-দয়ার কথা শুনিবে না, কোমল-হৃদয়ের কোনো কাজ দেখিবে না, করিবে না— বরং নিষ্ঠুর কার্যের খ্যাতি শুনিবে, নিষ্ঠুর কার্য দেখিবে, করিবে— তাহা হইলে

সে অত্যন্ত নিষ্ঠুর হইয়া উঠিবে। মনোবিদ্যা এইটুকু বলিয়া ক্ষান্ত হইবে ; বালক-বালিকাকে নিষ্ঠুর করিয়া তোলা উচিত কিনা তাহা হয়তো সমাজ-নীতি বা রাষ্ট্রনীতির বিচার্য, মনোবিদ্যার নহে।

শিক্ষার আদর্শ সম্বন্ধে নীরব থাকিলেও মনোবিদ্যা বহু দিক দিয়া মূল্যবান ইঙ্গিত দিয়া থাকে। কোন্ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে, কী পারে না ; তাহা মনোবিজ্ঞান বলিবে, রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে সকল শিক্ষার্থীকে সম্পূর্ণ একই ছাঁচে গড়িবার কল্পনা যে ব্যর্থ হইবে তাহা মনোবিদ্যার ব্যক্তিগত ভেদের সূত্র হইতে পূর্ব হইতেই জানা যাইবে। মনোবিদ্যা হইতে শিক্ষাদানের বিবিধ প্রণালী সম্বন্ধেও এইরূপ নির্দেশ পাওয়া যায়। আমরা জানিতে পারি যে শিশুদের শিক্ষা ভিন্ন বয়সে ভিন্ন রূপ হওয়া চাই, নহিলে সময় ও শক্তির অপব্যবহার হইবে। কোন্ বয়সে মনঃ-শক্তির কিরূপ স্ফূরণ হইবে তাহাও জানা যাইবে। জন্মগত শক্তি কতটুকু, কোন্ দিকে সম্ভাবনা কতখানি, পরিবেশের নিয়ন্ত্রণ দ্বারা কী ফল পাওয়া যাইবে, শিক্ষা কতখানি গভীর হইয়াছে— এ-সকলই এই বিজ্ঞানের অন্তর্গত। শিক্ষার্থীর ব্যর্থতার মূল কোথায় তাহারও সংকেত মিলিবে।

সংক্ষেপে, মনোবিদ্যা শিক্ষার্থীর অন্তঃশক্তির প্রকৃতি ও সীমা নিরূপণ করিবে ; শিক্ষাপ্রাপ্তি ও শিক্ষাদান সম্বন্ধে সাধারণ সূত্র আবিষ্কার করিবে ; বিশেষ বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয়ে যে বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয় তাহা পরীক্ষিত হইবে। অন্যান্য বিজ্ঞানের ন্যায় মনোবিদ্যাও নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষা এবং কার্য-কারণ-সম্বন্ধের উপর প্রতিষ্ঠিত। অন্যান্য বিজ্ঞানের ন্যায় ইহারও সূত্রগুলি বিবিধ প্রকল্প হইতে গৃহীত। বিবিধ জড়বিজ্ঞান হইতে ইহার পার্থক্য এই যে, ইহা জৈববিজ্ঞান বলিয়াই আরও দুরবগাহ ও বিচিত্র।

২

অন্তর্দর্শন (Introspection)

মনোবিদ্যার সাধারণ সূত্র বাহির করিতে হইলে অন্তর্দর্শনের পন্থাই স্বাভাবিক ভাবে গৃহীত হইবে, হইয়াওছিল তাই। মনোবিদ্‌রা নিজের নিজের মন পর্যবেক্ষণ করিয়া, বিশ্লেষণ করিয়া, সূত্র অনুমান করিতেন এবং এইরূপ অন্তর্দর্শনের অভিজ্ঞতা হইতে অপরের আচরণের মানসিক ব্যাখ্যা দিতেন। অ-বস্তু মন বস্তুর মতো ধরা-ছোঁওয়া দেয় না। মনকে জানিতে হইলে চোখ, কান প্রভৃতির সহযোগে মনই যেন প্রধান জ্ঞানেন্দ্রিয়-রূপে ব্যবহৃত হইবে। রামের ক্রুদ্ধ মনের অবস্থা বাহিরে প্রকাশিত দৈহিক লক্ষণ হইতে অনুমান করা যায় বটে, তবে রামের ক্রোধ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষভাবে যতটুকু জানা যাইবে তাহা রামেরই মন জানিবে; নহিলে অপরে নিজ নিজ মনের রঙে রঙিন করিয়া রামের ক্রোধকে দেখিবে। এই-সকল দিক্ বিবেচনা করিয়া অন্তর্দর্শনই মনোবিদ্যার শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল।

অন্তর্দর্শন কম বেশি সকল বয়স্ক মনের পক্ষেই সম্ভব এবং অনুশীলন দ্বারা অন্তর্দর্শনে নিপুণতা লাভ করা যায়। নিপুণ অন্তর্দর্শক বিশদভাবে আপন ক্রুদ্ধ অবস্থার বিবরণ দিতে পারিবেন। বহু অন্তর্দর্শকের নিকট হইতে ক্রুদ্ধ অবস্থার বিস্তারিত বর্ণনা সংগ্রহ করিয়া সাধারণ সূত্র বাহির করা যাইবে আশা করা যায়। কারণ, জীব-শ্রেণী হিসাবে সকল মানুষই এক বলিয়া সকল মানুষের অন্তর্দর্শনের অভিজ্ঞতা একরূপ হইবার কথা। অতএব মনোবিদ্‌রা প্রথম প্রথম অন্তর্দর্শনকেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বলিয়া বিশ্বাস করিতেন এবং এইরূপ অন্তর্দর্শনলব্ধ সূত্রাবলী সকল ব্যক্তির ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য ভাবিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন। কিন্তু অভিজ্ঞতা অন্যরূপ হইল, বয়স্কদের অন্তর্দর্শন বহু ক্ষেত্রে ব্যর্থ হইল। মানব-শিশু

মানব-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইলেও বয়স্ক ব্যক্তি হইতে গুণগতভাবে পৃথক বলা চলে; তজ্জন্য বয়স্কদের অন্তর্দর্শনের জ্ঞান শিশুদের পরিচালনায় সার্থক নহে। বয়স্কদের মধ্যে যাহারা জড়ধী বা যাহাদের মন বয়সের সহিত স্বাভাবিকভাবে স্ফূরিত হয় নাই, তাহাদের ক্ষেত্রেও অন্তর্দর্শনের সূত্র কার্যকর নহে।

এই ত্রুটি ছাড়াও অন্তর্দর্শন অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বলিয়া অভিযোগ আসে। ক্রুদ্ধ রাম তাহার নিজের মন দিয়াই যখন তাহার ক্রুদ্ধ অবস্থা বিশ্লেষণ করিতে লাগিল তখন তাহার মন যেন দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া গেল—এক ভাগ বিচারক, অপর ভাগ বিচার্য। যে মুহূর্তে রাম তাহার ক্রোধকে মন দিয়া দেখিতে আরম্ভ করিল সেই মুহূর্ত হইতেই তাহার ক্রোধ হ্রাস পাইতে লাগিল। অন্তর্দর্শনকালে যে ক্রোধ, ভয়, দুঃখ প্রভৃতি মানসিক অবস্থার তীব্রতা হ্রাস পাইতে থাকে তাহা অতি সাধারণ অভিজ্ঞতা। অবশ্য, অন্তর্দর্শনকালে মনের বিচার্য অবস্থার পরিবর্তন অন্তর্দর্শন দ্বারাই জানা যায়; তথাপি রামের অন্তর্দর্শন রামের ঠিক ক্রুদ্ধ অবস্থাকে জানিতে পারে না, ক্রোধ মন্দীভূত হইতেছে এমন অবস্থায় সে নিজের মনকে দর্শন করে। ক্রোধের স্মৃতির উপর খানিকটা নির্ভর করিতে হয়। মনের যে অবস্থা দর্শন করিতে চাই তাহার পরিবর্তন ধীর হইলে অন্তর্দর্শনের দ্বারা এই পরিবর্তন বুঝা যাইতে পারে। কিন্তু যখন কেহ কোনো পুস্তক পংক্তির পর পংক্তি পাঠ করিতেছেন, তাঁহার মনের অবস্থাও পংক্তিপরম্পরায় দ্রুত পরিবর্তিত হইতেছে; অন্তর্দর্শন এইরূপ দ্রুত পরিবর্তন বুঝিতে পারে না, পাঠরত দ্রুতপরিবর্তনশীল মনকে অন্তর্দর্শন দ্বারা বিশ্লেষণ করা যায় না। ইহা ব্যতীত বহু দৈহিক ক্রিয়া অন্তর্দর্শনের বাহিরে প্রতিনিয়ত চলিতেছে। এমন-কি, চেতনার অন্তরালে অবচেতন মনের ক্রিয়া অন্তর্দর্শনের দ্বারা জানা যাইবে না।

চেষ্টিতবাদ বা আচরণবাদ (Behaviourism)

মনোবিদ্যাকে অন্তর্দর্শনের ত্রুটি হইতে মুক্ত করিবার জন্য নূতন পন্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। সম্প্রতি এই নূতন বাদ একমাত্র পন্থা বলিয়া গৃহীত না হইলেও মনোবিদ্যায় ইহা যুগান্তরকারী সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহাতে অন্তর্দর্শনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ত্যাগ করা হইয়াছে ; কারণ, অন্তর্দর্শনের অভিজ্ঞতার সত্যতা অপর কাহারও দ্বারা নির্ণয় করা যায় না। রামের অন্তর্দর্শনের উপর কোনো মন্তব্য করা সমীচীন নহে ; কিন্তু রামের আচরণ সম্বন্ধে মন্তব্য করা চলে, উহা যাচাই করা চলে। সকল জীবই আচরণশীল ; বাঁচিতে হইলে প্রতি মুহূর্তে জীবকে আচরণশীল হইতে হইবে। জীবের প্রত্যেক আচরণ বা চেষ্টিত অপরে লক্ষ্য করিতে পারে, বিশ্লেষণ করিতে পারে। কোনো জীবকে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় রাখিয়া, অবস্থা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে নিয়ন্ত্রণ করিয়া, তাহার আচরণ বা চেষ্টিত লক্ষ্য করা যায়। নানা ভাবে অবস্থার পরিবর্তন ও নিয়ন্ত্রণ দ্বারা জীবের যে বিচিত্র আচরণ লক্ষ্য করা যায় তাহা যথোপযুক্ত-ভাবে সাজাইয়া, বিশ্লেষণ করিয়া, কার্য-কারণ-সম্বন্ধ নির্ণয় করা যাইতে পারে। অবশ্য, জীবের সকল প্রকার চেষ্টিত বা আচরণ সাধারণভাবে লক্ষ্য করা যায় না ; বহু আচরণ লক্ষ্য করিতে হইলে কৌশল অবলম্বন করা প্রয়োজন, যন্ত্রাদির সাহায্যে অপরিহার্য। দুঃখিত বা ক্রুদ্ধ ব্যক্তিকে সাধারণভাবে দেখিলেই বুঝা যায় কে দুঃখিত, কে ক্রুদ্ধ। কিন্তু ক্রুদ্ধ বা দুঃখিত হইলে দেহের অভ্যন্তরে দেহগ্রন্থি (gland) প্রভৃতির সাধারণ ক্রিয়া বা অবস্থার যে পরিবর্তন ঘটে বলিয়া জানা গিয়াছে তাহা যন্ত্রাদির দ্বারাই বুঝা যায়, সাধারণ পর্যবেক্ষণ এ ক্ষেত্রে অসমর্থ। এই প্রসঙ্গে স্পষ্ট করিয়া বলা দরকার যে, চেষ্টিতবাদে কেবলমাত্র সমগ্র দেহের চলা-

ফেরা প্রভৃতি অবস্থার পরিবর্তনকেই চেষ্টিত বা আচরণ বলা হয় তাহা নহে, দেহের যে-কোনো অংশের অবস্থার বা ক্রিয়ার পরিবর্তনকেও আচরণ বলিয়া ধরা হয়। অবস্থানুসারে জীবের দেহের চালনাকে আচরণ বলা যাইতে পারে।

যন্ত্রাদির সাহায্য লওয়া হউক আর নাই হউক, জীবের আচরণকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে নানা ভাবে লক্ষ্য করা যায় এবং এই-সকল পর্যবেক্ষণ হইতে বিবিধ সূত্র আবিষ্কার করা যায়। এইরূপে নির্ধারিত সূত্রাবলী বিবিধ ব্যক্তির দ্বারা একাধিক ক্ষেত্রে বারে বারে যাচাই করিয়া দেখা চলে এবং এই-সকল ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত অনুমান ও অভিজ্ঞতার প্রভাব ন্যূনতম। কোনো কোনো চেষ্টিতবাদী মনের অস্তিত্বই স্বীকার করিতে চাহেন না, কেহ কেহ মন আছে কি নাই তাহা লইয়া মাথা ঘামাইতে চাহেন না। সকল চেষ্টিতবাদীই মনোবিদ্যাকে অধ্যাত্মীয়তা (subjectivity) হইতে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে অন্তর্দর্শন ত্যাগ করিয়াছেন।

উদ্দীপক (Stimulus) ও সাড়া (Response)

বিজ্ঞানের মতে প্রতি কার্যের কোনো না কোনো কারণ আছে। সেইরূপ, প্রতি আচরণের মূলে কোনো না কোনো অবস্থা কারণস্বরূপ হইয়া থাকে। অবস্থা কেবলই পরিবর্তিত হইতেছে, অবস্থানুসারে জীবের আচরণও পরিবর্তিত হইতেছে। আচরণের কারণ-স্বরূপ অবস্থাসমূহের অধিকাংশই জীবের বহির্জগৎ হইতে উদ্‌ভূত। ক্ষুধা তৃষ্ণা ও কাম-জাতীয় আচরণের প্রত্যক্ষ কারণ দেহের ভিতরেই নিহিত, বহির্জগতে নহে। অথচ ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কাম দেহজনিত হইলেও বহির্জগৎ ইহাদের প্রকাশকে নিয়ন্ত্রিত করে। এই দিক দিয়া দেখিলে জীবের প্রত্যেক আচরণের মূল বহির্জগতে বর্তমান। বহির্জগৎ জীবকে উদ্দীপিত

করিতেছে ; জীব নানারূপ আচরণের দ্বারা বহির্জগতের সহিত উপযোজন (adjustment) সাধন করিতেছে। জীবের নিকট বহির্জগৎ অসংখ্য উদ্দীপকের সমষ্টি, জীবের আচরণ এই-সকল উদ্দীপকের বিচিত্র সাড়া মাত্র। উদ্দীপকের সাড়া-সমূহকে আমরা জীবের আচরণ বা চেষ্টিত-রূপে দেখি। একাশ্রিক উদ্দীপকের শ্রেণীকে পৃথক্‌ভাবে বিবেচনা করিয়া আমরা 'অবস্থা' (situation) নাম দিয়া থাকি এবং উদ্দীপক-শ্রেণীর বিবিধ সাড়াকে সমষ্টিগতভাবে আচরণ বা চেষ্টিত (behaviour) বলি।

প্রতি ক্রিয়ার পশ্চাতে অবস্থা কারণরূপে বর্তমান, প্রতি সাড়ার পশ্চাতে উদ্দীপক রহিয়াছে। বহুবিধ পতঙ্গ আলোকের দ্বারা আকৃষ্ট হয় ; এই ক্ষেত্রে আলোক উদ্দীপক, পতঙ্গের আলোকাভিমুখী গতি ঐ উদ্দীপকের সাড়া। শিক্ষক পড়াইতেছেন, ছাত্র পড়িতেছে ; শিক্ষক ও শিক্ষার্থী ক্ষণে ক্ষণে নূতন নূতন ভাবে আচরণ করিতেছেন, এই-সকল আচরণের মূলে নূতন নূতন অবস্থা রহিয়াছে। পাঠে মন লাগিতেছে না, বুঝিতে হইবে অধ্যাপনার বাহিরে কোনো প্রবল উদ্দীপক ইহার জন্য দায়ী। অধ্যাপনায় ছাত্র তন্ময় হইয়া গিয়াছে, তখন অধ্যাপনার বিষয়ই যথাযথভাবে উদ্দীপকের কার্য করিতেছে। জীবের সকল আচরণকে উদ্দীপক-সাড়ার ছাঁচে বিশ্লেষণ করা সহজ নহে। পতঙ্গাদির আলোকাভিমুখ্য (light-tropism) বা সূর্যাভিমুখ্য সহজেই এই ছাঁচে পড়ে ; কিন্তু সূর্যোদয়ে কবির আনন্দকে উদ্দীপক-সাড়ার দ্বারা সহজে ব্যাখ্যা করা যায় না। আচরণবাদ তথাপি জীবের জটিলতম আচরণকেও বিশ্লেষণ করিয়া উদ্দীপক-সাড়ার সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে চাহে, ইহার কোনো ব্যতিক্রম স্বীকার করে না।

উদ্দীপক ও সাড়ার তত্ত্বটি যে কেবলমাত্র আচরণবাদীরা গ্রহণ

করিয়াছেন, তাহা নহে। যাঁহারা মনের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন তাঁহারাও ইহাকে ভিত্তিস্বরূপ বিবেচনা করেন। মনোবাদীরা অন্তর্দর্শনকে একেবারে ত্যাগ করেন নাই, আচরণবাদীরা করিয়াছেন এবং আচরণ-বাদে সকল আচরণেরই উদ্দীপক-সাড়ার ছাঁচে দৈহিক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়—এইমাত্র।

উদ্দীপক-সাড়ার প্রথম কথা—সমশ্রেণীর জীব একই রূপ অবস্থায় পড়িলে মোটামুটি একই ভাবে আচরণ করিবে। যে শ্রেণীর পতঙ্গ আলো দেখিলেই ছুটিয়া আসে সেই শ্রেণীর সকল পতঙ্গই প্রায় একই ভাবে আলোকাভিমুখ্য প্রদর্শন করিবে। কিন্তু এই-সকল পতঙ্গের ন্যায় পাখিরাও যে আলোকাভিমুখী হইবে এমন কোনো কথা নাই। তবে যে শ্রেণীর পাখিরা সূর্যোদয়ে সাড়া দিয়া থাকে, সেই শ্রেণীর সকল পাখিই প্রতিদিনই সূর্যোদয়ে সাড়া দিবে, একই রূপ আচরণ করিবে। অপর পক্ষে, রাত্রে ঘুমাইতে ঘুমাইতে পাখির ডাক শুনিলে আমরা অনুমান করি প্রভাত হইয়াছে। কারণ, সূর্যোদয়ের সহিত পাখির ডাকের সূত্রটি আমাদের জানা আছে। রাত্রে পাখির ডাকাডাকি শুনিলেই আমরা বুঝিতে পারি কোন্ 'অবস্থা' পাখির ঐরূপ আচরণের জন্য দায়ী। সকল শ্রেণীর জীবের উদ্দীপক-সাড়ার সূত্রাবলী জানা থাকিলে আমরা আচরণ দেখিয়া তাহার কারণ-স্বরূপ অবস্থার কথা বলিতে পারিব এবং অবস্থা জানিতে পারিলে জীব কী ধরণের আচরণ করিবে তাহা পূর্ব হইতে বুঝিতে পারিব।

অবস্থানুসারে আচরণের ঐক্য দেখা যাইতেছে; কিন্তু এই ঐক্যের মধ্যেও একই অবস্থায় আচরণে ব্যক্তিগত ভেদও বর্তমান। কেবল, ব্যক্তিগত প্রভেদ সীমাবদ্ধ; প্রভেদের সীমা অতিক্রম করিলে সেই জীব তাহার শ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া বিবেচিত হয় না। সাধারণ বয়স্কদের

আনন্দ হইলে তাঁহারা যে ভাবে আচরণ করেন প্রাপ্তবয়স্ক জড়ধী (idiot) সেরূপ আচরণ করিবে না, সে হয়তো শিশুর মতো নাচিতে লাফাইতে থাকিবে। সাধারণ বয়স্ক হইতে জড়ধী বয়স্ক ব্যক্তির আচরণ এত পৃথক যে জড়ধী কোনোদিন সাধারণ বয়স্ক-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না, জড়ধী-শ্রেণীর সূত্রই তাহাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

দেখা গিয়াছে, যে জীব-শ্রেণীর দৈহিক গঠন যত জটিল তাহার আচরণও তত জটিল, তত বিচিত্র। পোকা-মাকড়ের আচরণের সহিত মানুষের আচরণের তুলনা করিলেই ইহা স্বত-প্রমাণ বলিয়া বোধ হইবে—বাঁশির সুরে পোকা-মাকড় সাড়া দিবে না, অথচ মানুষের ক্ষেত্রে বংশীস্বর একটি প্রবল উদ্দীপক। দৈহিক গঠন জটিল হইলে জীবের উদ্দীপন-প্রবণতা বাড়ে, ফলে আচরণও বিচিত্র ও জটিল হয়। আচরণের বৈচিত্র্য ও জটিলতা জীবের বয়সের উপর নির্ভর করে, নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত বয়োবৃদ্ধির সহিত বাড়িতে থাকে।

দেহের বিভিন্ন অংশে নিশ্বাস-প্রশ্বাস, পুষ্টি, রক্তসংবহন, পরিপাক প্রভৃতি ক্রিয়া অবিরাম চলিতেছে। ইহাদিগকে শারীরাচরণ (physiological behaviour) বলা যায়। ইহারা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে শারীরবৃত্তের (Physiology) আলোচ্য। কিন্তু পৃথক পৃথক শারীরাচরণকে সমন্বিত (co-ordinated) করিয়া জীব যে সাড়া দেয়, সেই সমগ্র আচরণ মনোবিদ্যার বিবেচ্য। রক্তসংবহন প্রভৃতি কী কী দৈহিক কারণে চোখ লাল হয়, হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়, তাহা শারীরবৃত্ত হইতে জানা যাইবে; অথচ, চোখ লাল করিয়া যদি কেহ ঘুষি তুলে তাহা হইলে এই আচরণ কোনো ক্রোধোদ্দীপকের সাড়া, এ কথা মনোবিদ্যা বলিয়া দিবে।

উদ্দীপকে সাড়া দিবার, অর্থাৎ অবস্থানুসারে আচরণ করিবার নির্দিষ্ট ক্ষমতা লইয়া জীব জন্মগ্রহণ করে। জন্ম হইতেই কোন্ কোন্ উদ্দীপকে

সাড়া দিতে সমর্থ, কী কী রূপে সাড়া দিতে পারিবে—এই আচরণ-ছাঁদ (behaviour pattern) লইয়াই বহির্জগতের সহিত জীবের উপযোজন (adjustment) শুরু হয়। বিভিন্ন শ্রেণীর জীবের আচরণ-ছাঁদ বিভিন্ন—হাঁসের ছানা জলে নামিলেই সহজে সাঁতার দিতে পারিবে, অথচ মানবশিশু ডুবিয়া যাইবে। পোকা-মাকড়ের ন্যায় নিম্নশ্রেণীর জীব মাত্র কয়েক-প্রকার উদ্দীপকে সাড়া দিতে পারে; যাহাদের দেহযন্ত্র যত জটিল তাহাদের আচরণ-ছাঁদ তত বিচিত্র। জন্মমুহূর্তে আচরণ-ছাঁদ নির্দিষ্ট থাকিলেও অধিকাংশ জীবই ইহা কম-বেশি পরিবর্তিত করিতে পারে। নিম্নশ্রেণীর জীবের আচরণ-ছাঁদ বদ্ধপ্রায়, তজ্জন্য পরিবেশের, এমন-কি আবহাওয়ারও বিশেষ পরিবর্তন হইলে ইহারা উপযোজন সাধন করিতে অক্ষম; অথচ হঠাৎ তুষারপাত হইলেও মানুষ নানা কৌশলে আত্মরক্ষা করে।

জন্মগত আচরণ-ছাঁদের পরিবর্তন-ক্ষমতা শিক্ষা-শক্তিরই নামান্তর। আচরণ-ছাঁদ পরিবর্তন করিয়া নূতন নূতন উদ্দীপকে সাড়া দেওয়া, একই রূপ উদ্দীপকে একাধিক উপায়ে সাড়া দিতে পারা, নূতন নূতন অবস্থায় নানা ভাবে আচরণ করা—ইহাই শিক্ষার মূল কথা। পতঙ্গের আচরণ-ছাঁদ বদ্ধপ্রায়, তজ্জন্য তাহার আলোকাভিমুখ্য দূর করা অসাধ্য; অথচ মানবশিশু প্রথম প্রথম আগুন ধরিতে চাহিলেও, তাহার এই আচরণ-ছাঁদ পরিবর্তন করিয়া আগুন দেখিলে পলাইয়া যাইবে, এরূপ শিখানো যায়।

জীব যখন নূতন নূতন অবস্থায় নূতন নূতন আচরণ করে, তখন বুঝিতে হইবে উদ্দীপক-সাড়ার সংযোগ (bond) নূতন ভাবে স্থাপিত হইয়াছে। যে শিশু বিশেষ কোনো বাদ্য শুনিলে ভয়ে সরিয়া যাইত সে যদি এখন মনোযোগ-সহকারে সেই বাদ্য শুনিতে থাকে, তাহা হইলে

ঐ বাদ্যের সহিত তাহার ভীতিমূলক আচরণের সংযোগ ভঙ্গ হইয়াছে এবং নূতন সংযোগ স্থাপিত হইয়াছে বুঝা যাইবে। ক্রমশ হয়তো শিশু ঐ বাদ্যের সহিত তাল দিতে আরম্ভ করিবে, পূর্ব সংযোগ বিচিত্র হইবে। এইরূপে উদ্দীপক-সাড়ার সংযোগ পরিবর্তন করিয়া, নূতন উদ্দীপকের সহিত বা নূতন ধরণের সাড়ার সহিত সংযোগ স্থাপন করিয়াই শিক্ষা অগ্রসর হয়। উদ্দীপক-সাড়ার সংযোগকে কেহ কেহ অনুষঙ্গ (association) বলেন।

জন্মগত আচরণ-ছাঁদ ও নানা কৌশলে উদ্দীপক-সাড়ার নব নব সংযোগস্থাপনের সম্পর্কে মনোবিদ্ প্যাবলভ (I. P. Pavlov) খ্যাতনামা হইয়া গিয়াছেন। তিনি কুকুর লইয়া নানাবিধ পরীক্ষা করিয়া জীবের অনুষঙ্গ সম্বন্ধে কতকগুলি সাধারণ সূত্রের সন্ধান পাইয়াছিলেন। শিশুদের ভয়, ক্রোধ, ভালোবাসা প্রভৃতির আচরণ-ছাঁদের পরিবর্তন ও নূতন অনুষঙ্গ-স্থাপন ব্যাপারে আচরণবাদী ওয়াট্‌সন (J. B. Watson) অত্যন্ত মূল্যবান্ গবেষণা করিয়াছেন। এখন অনেক আচরণবাদী এই পথে পরীক্ষা চালাইয়া যাইতেছেন।

যে-সকল জীব সম অবস্থায় বিচিত্র ভাবে সাড়া দিতে পারে তাহাদেরও কতকগুলি আচরণ-ছাঁদ বদ্ধপ্রায় থাকে, কতকগুলি ব্যাপারে সব অবস্থায় বার বার একরূপ আচরণই করিতে দেখা যায়। এইরূপ বদ্ধপ্রায় আচরণের মধ্যে শারীরাচরণই প্রধান। হৃদ্‌যন্ত্র, ফুস্‌ফুস্ প্রভৃতিকে সম অবস্থায় বিচিত্রভাবে ক্রিয়াশীল করা অসাধ্য। হঠযোগীরা তাহাও পারেন শুনা যায়, কিন্তু হঠযোগ এখনও গবেষণার বিষয় হইয়া আছে। শারীরাচরণের পরই প্রতিবর্তী ক্রিয়াগুলির (reflex action) উল্লেখ করা যায়। হঠাৎ শব্দ শুনিয়া চমকাইয়া উঠা, চোখে আঘাত লাগিবার উপক্রম হইলেই আপনি চোখের পাতা বন্ধ হওয়া, হাঁচা, হাস্য করা, কাতুকুতু লাগা, বসা,

দাঁড়ানো— এইগুলি প্রতিবর্তী ক্রিয়ার উদাহরণ। কতকগুলি প্রতিবর্তী ক্রিয়া জন্ম হইতেই প্রস্তুত থাকে— চমকানো, হাঁচি, হাসি ইহাদের অন্যতম। কতকগুলি ক্রমশ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়— পাশ ফেরা, বসা, দাঁড়ানো এই দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত। দেখা গিয়াছে নির্দিষ্ট উদ্দীপকের দ্বারা প্রতিষঙ্গী (corresponding) প্রতিবর্তী আচরণ উদ্দীপিত হয়ই— বন্দুকের শব্দে অভ্যস্ত থাকিলেও অপ্রত্যাশিত ভাবে হঠাৎ বন্দুকের শব্দ শুনিলে যে-কেহ চমকিয়া উঠিবেন এবং অকস্মাৎ কর্কশ শব্দের সহিত চমকানোর সংযোগ বা অনুষঙ্গ ভঙ্গ করা যাইবে না। কতকগুলি প্রতিবর্তী আচরণের ক্ষেত্রে তাহাদের নির্দিষ্ট উদ্দীপকের সহিত সংযোগ ভঙ্গ করা কখনো কখনো সম্ভব হয় ; নূতন অনুষঙ্গস্থাপন করাও যায়। যেমন, কেহ কেহ কাতুকুতুতে না হাসিয়া থাকিতে পারেন, হাসির পরিবর্তে শরীরটাকে একটু কঠিন করিয়া কাতুকুতু-উদ্দীপকে সাড়া দিতে পারেন ; অর্থাৎ, কাতুকুতু ও হাসির অনুষঙ্গ ভঙ্গ করিয়া কাতুকুতু ও দৈহিক কাঠিন্যের সংযোগ স্থাপন করিতে পারেন।

কতকগুলি প্রতিবর্তী আচরণ উহাদের সংযোগ-বৈচিত্র্যের জন্য একটু পৃথক ভাবে বিবেচিত হয়। আচরণবাদে ইহারা প্রতিবর্তীক্রিয়ার অন্তর্গত হইলেও মনোবাদীরা ইহাদিগকে অন্যজাতীয় আচরণ বলিয়া মনে করেন ; সহজ-প্রবৃত্তি (instinct) নামে ইহারা বর্ণিত হয়। পলায়ন, আক্রমণ, কামের আকর্ষণ, ক্রন্দন, খাদ্যান্বেষণ প্রভৃতি 'সহজ-প্রবৃত্তি' চেষ্টিতবাদে একাধিক প্রতিবর্তীক্রিয়ার দ্বারা গঠিত অভ্যাস বা জটিল আচরণ-ছাঁদ হিসাবে বিবেচিত হয়। একমাত্র বয়সের গুণে কোনো নির্দিষ্ট পন্থায় ইহাদের ক্রমবিকাশ ঘটে না বলিয়াই আচরণ-বাদীরা বিশ্বাস করেন ; ইহাদের বিকাশ পরিবেশের উদ্দীপকের উপর নির্ভর করে, উপযুক্ত উদ্দীপক থাকিলেই উপযুক্ত দৈহিক অবস্থায় জীবের

'সহজ-প্রবৃত্তি' উদ্দীপিত হইবে। উপযুক্ত পরিবেশের অভাবে এই শ্রেণীর জটিল প্রতিবর্তী-আচরণ অব্যক্ত (potential) অবস্থায় থাকে। ইহাদের সংখ্যা এখনও সঠিক জানা যায় নাই, ইহাদের সংখ্যা ও প্রকৃতি লইয়া বহু বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছে। তবে ইহাদের সম্বন্ধে একটি বিষয়ে সকলের মতৈক্য আছে, সে ইহাদের সহজ অনুষঙ্গক্ষমতা। ইহারা সহজেই নানা ভাবে নানা অবস্থার সহিত অনুষঙ্গিত হইতে পারে, তজ্জন্য জীব এই শ্রেণীর আচরণ দ্বারা বিচিত্রভাবে পরিবেশের সহিত উপযোজন-সাধন করিতে পারে। শিশু প্রথমে হয়তো নূতন লোক দেখিয়া সরিয়া আসে, অথচ সাপ দেখিলে পলায়ন করে না। কিন্তু অতি সহজেই শিশুর 'পলায়ন' রূপ আচরণের সহিত 'সাপ দেখা' রূপ অবস্থার অনুষঙ্গ স্থাপন করা যায়, শিশু সহজেই 'সাপ দেখিলেই পলায়ন করিবে' এরূপ শিখিতে পারিবে।

সহজ-প্রবৃত্তির সহিত মনোবাদের 'প্রক্ষোভ'-গুলির (emotion) সম্পর্ক অতি নিকট। ক্রোধ, ভয়, প্রেম, আনন্দ, স্নেহ, সৌন্দর্যবোধ ভক্তি প্রভৃতি প্রক্ষোভের সংখ্যাও জানা নাই। আচরণবাদে এই-সকল প্রক্ষোভ সহজাত কাম, ক্রোধ ও ভয়ের নানারূপ যৌগিক (compound) আচরণ বলিয়া বিবেচিত। কাম, ক্রোধ, ভয়— এই তিনটিই জন্মগত 'প্রক্ষোভ'-জাতীয় আচরণ, অপরাপর প্রক্ষোভ এই তিনটির দ্বারা সৃষ্ট। সহজ-প্রবৃত্তির ন্যায় ইহারাও অতি সহজে নানাভাবে অনুষঙ্গিত হয় এবং উপযোজন-সাধনে 'প্রক্ষোভ' আচরণকে প্রধান অবলম্বন বলা চলে। শিশুকে জন্ম হইতেই কোনো না কোনো ক্ষেত্রে ভয় পাইতে দেখা যায় বটে, তথাপি কোনো শিশু জন্ম হইতে ভূতের ভয় পায় না। কিন্তু শিশুর 'ভয়'কে অতি সহজে 'ভূত' কথাটির সহিত অনুষঙ্গিত করিয়া দেওয়া যায়। শিশুকে ক্রোধী বা ভীতু করিয়া তোলা সহজ; কারণ

ক্রোধ বা ভয়ের অনুষঙ্গক্ষমতা যথেষ্ট।

সহজ-প্রবৃত্তি হইতে প্রক্ষোভের প্রভেদ এই যে, প্রক্ষোভ জীবদেহে নানাবিধ লক্ষণ-রূপে প্রকাশ পায়; আমরা লক্ষণ দেখিয়াই বুঝিতে পারি কোনো ব্যক্তি ক্রুদ্ধ, কি ভীত। প্রক্ষোভ উদ্দীপিত হইলে রক্ত-সংবহন, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস, গ্রন্থিরস-নিঃসরণ, মাংসপেশীর সঞ্চলন ও দৈহিক শক্তির পরিবর্তন ঘটে। অতি অপরিণত শৈশব হইতে মৃত্যু-কাল পর্যন্ত প্রক্ষোভ উদ্দীপিত হইতে দেখা যায়। ইহার আরও একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রক্ষোভ একবার উদ্দীপিত হইলে উদ্দীপক-অবস্থার অবসান ঘটিলে সেই প্রক্ষোভ কিছুক্ষণ টিকিয়া থাকে। শিশু যাহা দেখিয়া ভয় পাইয়াছে তাহা যদি শিশুর দৃষ্টির বাহিরে সরিয়াও যায়, তবু কিছুক্ষণ ধরিয়া শিশু ভয় পাইতে থাকিবে।

প্রক্ষোভ সম্পর্কে আচরণবাদী জেম্‌স্ (W. James) সাহেবের মত এক আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিল। আমরা বলিয়া থাকি যে, দুঃখ পাই বলিয়া কাঁদি, ভয় পাই বলিয়া পলায়ন করি, রাগ হয় বলিয়া আঘাত করি। জেম্‌স্ বলেন, আমাদের এ ধারণা ভুল; বৈজ্ঞানিক সত্য হইতেছে— আমরা কাঁদি বলিয়া দুঃখ পাই, পলায়ন করি বলিয়া ভয় পাই, আঘাত করি বলিয়া রাগ বোধ করি। তাঁহার মতে কোনো উদ্দীপকের দ্বারা আমাদের মাংসপেশী-কুঞ্চন, গ্রন্থিরস-নিঃসরণ প্রভৃতির যে পরিবর্তন ঘটে তাহাই প্রক্ষোভের কারণ। দৈহিক পরিবর্তন আগে, তাহার পর পরিবর্তন-বোধ এবং এই দৈহিক পরিবর্তনের বোধই প্রক্ষোভ।

উল্লিখিত জন্মগত আচরণ-ছাঁদ জীবের সকল আচরণের ভিত্তি। সকল-প্রকার আচরণ-ছাঁদই যে জন্ম হইতে ব্যক্ত হয় তাহা নহে; উপযুক্ত পরিবেশের দ্বারা উদ্দীপিত হইয়া অব্যক্ত মৌলিক আচরণ-ছাঁদসমূহ ব্যক্ত হইয়া পড়ে। সরল আচরণ-ছাঁদের মধ্যে নানাভাবে

অন্বয় ঘটিয়া জটিল আচরণ সৃষ্ট হয়। তদুপরি অনুষঙ্গক্ষম আচরণসমূহ কালক্রমে বিভিন্ন অবস্থার সহিত বহু প্রকারে অনুষঙ্গিত হইয়া উন্নত জীবকে অসংখ্য ও বিচিত্র আচরণের অধিকারী করিয়া তোলে। এইজন্য শিক্ষার্থীর অব্যক্ত আচরণ-ছাঁদকে ব্যক্ত করিবার উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা দিতে হইবে এবং ব্যক্ত আচরণ-ছাঁদ যাহাতে বাঞ্ছিত ভাবে অনুষঙ্গিত হইতে থাকে তজ্জন্য পরিবেশকে নিয়ন্ত্রিত করা দরকার হইবে।

জীবের আচরণের সংযোগ-ক্ষমতা জীবের ধী-শক্তির উপর নির্ভর করে। যে জীব যত ধীমান তাহার আচরণ তত বিচিত্রভাবে সংযুক্ত হইতে পারিবে। এইজন্য কীটের আচরণ-ছাঁদ বদ্ধপ্রায়, মানুষের আচরণ অসংখ্য-প্রকার। যে বালক বুদ্ধিমান তাহার সহজ-প্রবৃত্তি এবং প্রক্ষোভ-জাতীয় আচরণ বহু প্রকারে অনুষঙ্গিত হইবে; তাহার শিক্ষার ক্ষেত্র বিস্তৃত হওয়ার বহু সম্ভাবনা। অল্পবুদ্ধি বালকের ক্ষেত্রে ইহার বিপরীত ঘটিবে।

আচরণবাদ ও অন্তর্দর্শন

উল্লিখিত চেষ্টিতবাদের সকল আলোচনা জীবের আচরণ বা চেষ্টিতকে কেন্দ্র করিয়া। সকল আচরণের উৎস যে মন, তাহা চেষ্টিতবাদের কাছে নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু আচরণে যাহার প্রকাশ, সেই মনকে বাদ দিয়া বিজ্ঞানকে প্রতিষ্ঠিত করিতে গেলে জ্ঞান সীমাবদ্ধ ও অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। অতএব অন্তর্দর্শনের বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তগুলিও গ্রহণ করিতে হইবে। আচরণবাদ ও অন্তর্দর্শন পরস্পর সম্পূরক, একটিকে বাদ দিয়া অপরটিকে পূর্ণ মূল্য দেওয়া চলে না।

মনের স্তর

অন্তর্দর্শনে যে মনের দ্বারা বিচার করি তাহা চেতনা-যুক্ত, যে মনকে বিচার বিশ্লেষণ করি তাহাও চেতনা-যুক্ত। রাম যখন নিজের মনকে দর্শন করিতেছে তখন তাহার মনের যে-অংশ দেখিতেছে তাহা সচেতন, যে অংশকে দেখিতেছে তাহাও সচেতন। রাম যখন শ্যামের মনকে বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা করিতেছে তখন রাম ও শ্যাম উভয়ের মনই সচেতন। শ্যাম যদি কোনো কারণে অজ্ঞান হইয়া পড়ে অথবা রাম নিজেই যদি অজ্ঞান হইয়া যায়, তাহা হইলে কেহই নির্জ্ঞান মনের অবস্থা বিশ্লেষণ করিতে পারিবে না। মন দিয়া প্রত্যক্ষভাবে দেখার পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া আমরা অচেতন মনের অবস্থা কী তাহা জানিতে পারি না, তবে আমরা সাধারণ উপায়েই বুঝিতে পারি যে সচেতন ও অচেতন মনের মধ্যে গুণগত পার্থক্য আছে। দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে আমাদের বিশ্বাস যে, কাহারও মন দীর্ঘসময় অচেতনভাবে থাকিতে পারে না, অচেতন মন সাময়িক মানসিক অবস্থা মাত্র এবং মন যখন অচেতন হয় তখন সমগ্রভাবেই চেতনাহীন হইয়া পড়ে— মনের এক অংশ চেতনাযুক্ত অপর অংশ চেতনাহীন— এরূপ কখনও হইতে পারে না। কিন্তু বর্তমানে মনোবিজ্ঞান আমাদের এই সাধারণ বিশ্বাসের মূলে আঘাত করিয়াছে। বর্তমান কালে বিষয়গত (objective) ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এই সিদ্ধান্তে আসা গিয়াছে যে, আমাদের মন একই কালে সচেতন ও অচেতন, একই মনের এক অংশ সংজ্ঞাত (conscious) অপর অংশ নির্জ্ঞাত (unconscious)। কেহ যখন অজ্ঞান হইয়া যায় তাহার মন সমগ্রভাবে চেতনা হারায়, আংশিকভাবে নহে। কিন্তু সজ্ঞান, সাধারণ, সুস্থ অবস্থায় মনের

এক অংশ চেতন, অপর অংশ অচেতন, সমগ্রভাবে মন কখনও চেতন হয় না— ইহাই বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত।

মনের বিভিন্ন স্তরের অস্তিত্ব স্বীকৃত হওয়ায় কতকগুলি বিষয়ের ব্যাখ্যা মিলিতেছে। আমরা দৈনন্দিন জীবনে নিরন্তর এরূপ আচরণ করিতেছি যাহার মূলে আমাদের কোনো সচেতন চেষ্টা থাকে না। কত কাজ অন্যমনস্ক ভাবে করিয়া ফেলি, অথচ সচেতন থাকিলে সে কাজ হয়তো করিতাম না। কত কাজ অভ্যাসের বশে হইয়া যায়, তাহার জন্য ভাবনা-চিন্তা দরকার হয় না। অতএব বহু আচরণের মূলে কোনো চিন্তা থাকে না, সচেতন মনের কাজ বলিয়া তাহারা বিবেচিত হইতে পারে না। কিন্তু, তথাপি যে-কোনো আচরণে মনের প্রকাশ থাকিবে, ইহা স্বীকৃত প্রকল্প। ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, আমাদের অনেক আচরণ সচেতন মনের প্রকাশ নহে, মনের অচেতন স্তরের প্রকাশ। বহু মানসিক ব্যাধির মূল মনের অচেতন স্তরে নিহিত আছে বলিয়া জানা গিয়াছে। অচেতন স্তরের পরিচয় লাভ করিতে হইলে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ কৌশল অবলম্বন করিতে হয়। অন্তর্দর্শনের দ্বারা নিজেই নিজের অচেতন স্তরের রহস্য উদ্ঘাটন কেহই করিতে পারে না।

সংজ্ঞান ও নির্জ্ঞান— এই দুইটি স্তরই প্রধান। কিন্তু আরও একটি স্তরের অস্তিত্ব স্বীকার্য, ইহাকে অন্তর্জ্ঞান (sub-conscious) বলা হয়। ইহা যেন সংজ্ঞাত ও নির্জ্ঞাত স্তরের মধ্যবর্তী। এই মধ্যবর্তী স্তরের বিষয় সচেতন স্তরে আনিতে সাধারণ চেষ্টাই সফল হয়, বিশেষ কোনো কৌশলাদি অবলম্বন করিতে হয় না। ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ কাহাকেও চেনা-চেনা বোধ হইল, কিন্তু তাহার সম্যক্ পরিচয় মনে পড়িল না। কিয়ৎক্ষণ মনে করিবার চেষ্টা চলিল, অবশেষে হঠাৎ বিস্মৃত পরিচয় স্মরণে আসিল। এরূপ অভিজ্ঞতা আমাদের জীবনে প্রায়ই ঘটে ; আমরা

বলিয়া থাকি, 'পেটে আসিতেছে, মুখে আসিতেছে না।' বিস্মৃত বিষয়টি সচেতন স্তরে নাই, কোথাও তলাইয়া গিয়াছিল। অথচ নিজের চেষ্টাতেই উহা সচেতন স্তরে আনয়ন করা গেল। এইরূপ তলাইয়া যাওয়া ও সহজে সচেতন স্তরে উত্থিত হওয়া অন্তর্জ্ঞান বা পূর্বচেতন (preconscious) স্তরের ইঙ্গিত করিতেছে।

অচেতনের সক্রিয়তা

অন্তর্দর্শন হইতে ও সাধারণ অভিজ্ঞতা হইতে আমরা জানি যে মন সর্বদা সক্রিয়, এবং মনের সচেতন স্তরই কেবলমাত্র সক্রিয় হইতে পারে ইহাই আমাদের সাধারণ ধারণা। কিন্তু মনোবিশ্লেষণ বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রমাণ করিতেছে যে নিরূজ্ঞান নিষ্ক্রিয় নহে, পরন্তু নিরূজ্ঞানই মনের প্রধান ক্রিয়াকেন্দ্র। ভাবিয়া-চিন্তিয়া সচেতনভাবে আমরা যে কার্য করি তাহার প্রত্যেকটি নানাভাবে অচেতন স্তরের দ্বারা প্রভাবান্বিত; এমন-কি, বহু ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রিতও বলা চলে। পদ্মফুলের মূল পঙ্কেই নিহিত; সেইরূপ বহু আচরণের মূল নিরূজ্ঞানে; সেই আচরণগুলি নির্জ্ঞান-জাত ধরা যাইতে পারে। এমনও দেখা যায় যে বিশেষ শিক্ষিত এবং সংযত ব্যক্তিও হাস্যালাপের সময় অশোভন বিষয়ের অবতারণা করেন; যে-সকল কথা অশোভন বলিয়া তিনি বুঝিতে পারেন সেই-সকল রসালাপ নিজেই ব্যবহার করিয়া বসেন। ইহার কারণ এই যে তাঁহার নিরূজ্ঞাত স্তর অলক্ষ্যে প্রভাব বিস্তার করিয়া তাঁহার হাস্যালাপকে নিম্নস্তরে আনিয়া ফেলিতেছে। যে বালক পড়াশুনা এড়াইতে চাহে সে প্রায়ই তাহার বই খাতা হারাইয়া ফেলে; সে যে ইচ্ছা করিয়া সরাইয়া রাখিয়া মিথ্যা করিয়া বলে 'হারাইয়া গিয়াছে' তাহা নহে। তাহার আচরণ নিরূজ্ঞানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, সে নিজে কিভাবে ইহার কারণ নির্ণয়

করিবে। কোনো বালিকা তাহার মাকে অত্যন্ত ভালোবাসিত, তাহার মাতৃভক্তি 'সঙ্গিনী-মহলে গল্পের মতো ছিল। একদিন কী কারণে অকস্মাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া নিজের মাকে আঘাত করিল। পরক্ষণেই মায়ের বিস্ময় ও সঙ্গিনীদের বিদ্রূপ তাহাকে জানাইয়া দিল সে কী করিয়াছে। তাহার পর আরম্ভ হইল অনুতাপ। অবশেষে মাকে আঘাত করার স্মৃতি তাহার নিকট অসহ্য হইয়া উঠিল। মনের বেদনা যখন অসহ্য তীব্র হইয়া উঠে তখন মানুষ আত্মহত্যা করে; না হয় পাগল হইয়া, অজ্ঞান হইয়া, বা এমনিই বেদনার কারণ ভুলিয়া যায়— মনের সচেতন স্তর হইতে সেই স্মৃতি অপসারিত করিয়া আত্মরক্ষা করে। বালিকাও বিস্ময়জনক-ভাবে মাকে আঘাত করার ঘটনাটি সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়া আত্মরক্ষা করিল। এই ধরণের ভুলিয়া যাওয়া মনের প্রতিরোধী কৌশলের (defence mechanism) উদাহরণ। বালিকার বেদনাদায়ক স্মৃতিটি সচেতন স্তর হইতে অবদমিত (repressed) হইয়া অচেতনে তলাইয়া গেল। সচেতনের কোনো ইচ্ছা বা স্মৃতি এইরূপে কেহ যদি মনেরই বল প্রয়োগ করিয়া সচেতন স্তর হইতে নির্জ্ঞাত স্তরে প্রেরণ করেন এবং নির্জ্ঞানে তলাইয়া দেন, তাহা হইলে জবর্দস্তিমূলক মানসিক ক্রিয়াকে অবদমন বলা হয়। বালিকা অবদমনের দ্বারা অনুতাপের দংশন হইতে রক্ষা পাইল বটে, কিন্তু তাহার হাতটি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া পড়িল। দেহচিকিৎসায় ইহার কারণ ধরা পড়িল না, মনোবিশ্লেষণে জানা গেল, সচেতন স্তরের অনুতাপ ও প্রায়শ্চিত্তের গূঢ় ইচ্ছা এই পক্ষাঘাতের কারণ। সুতরাং বালিকা অবদমন দ্বারা সম্পূর্ণ মুক্তি তো পায় নাই, অবদমিত গূঢ়ৈষা (complex) নির্জ্ঞাত স্তর হইতে তাহাকে শাস্তি দিতেছে।

নির্জ্ঞানের ক্রিয়া কখনো প্রত্যক্ষ, কখনো পরোক্ষ। অন্যমনস্কভাবে

কোনো কিছু আচরণ করা বা অকস্মাৎ অদ্ভুতভাবে কোনো বিষয় ভুলিয়া যাওয়া, এগুলি নিরূজ্ঞানের প্রত্যক্ষ সক্রিয়তার দৃষ্টান্ত। কিন্তু উক্ত বালিকার হাতে পক্ষাঘাত ঘটাইয়া নিরূজ্ঞাত স্তরের গূঢ়ৈষা পরোক্ষভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। বালিকার পক্ষাঘাত প্রায়শ্চিত্ত করিবার অবদমিত ইচ্ছারই প্রতীক (symbol)। গূঢ়ৈষা সোজাসুজি সংজ্ঞানকে প্রভাবান্বিত বা নিয়ন্ত্রিত না করিয়া, এক্ষেত্রে পরোক্ষ উপায়ে প্রতীক অবলম্বন করিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সুনিপুণ মনশ্চিকিৎসক এই-সকল প্রতীক পাঠ করিতে পারেন এবং রোগীকে নিরূজ্ঞাত স্তরের গূঢ়ৈষার ক্রিয়া উপলব্ধি করাইয়া দিতে পারেন। রোগী এইরূপে রোগমুক্ত হয়।

নিরূজ্ঞানের পরোক্ষ ক্রিয়া বা প্রতীকের দ্বারা আত্মপ্রকাশ বিরল নহে। বর্তমানে জানা গিয়াছে, অধিকাংশ মুদ্রাদোষ, অস্বাভাবিক আচরণ, অদ্ভুত অ-সাধারণ অভ্যাস, নানাবিধ রোগ, এগুলির মূলে কোনো না কোনো গূঢ়ৈষা বর্তমান; তোৎলামি, বাম হাতে কাজ করার অভ্যাস, বদ্ধ বা খোলা স্থান দেখিলে চরম ভয় পাওয়া, মূর্ছা, শিশুদের হঠাৎ বিছানা ভিজাইয়া ফেলার অভ্যাস, গৃহে অগ্নিসংযোগ করিয়া আনন্দলাভ, অহেতু চুরি করার বাতিক, অকারণে ঝগড়া করা, শুচিবাই, অতিরিক্ত বানান ভুল, রান্নার কাজে জিনিসপত্র ফেলা বা ভাঙা, প্রভৃতি বহুবিধ আচরণ কোনো না কোনো প্রবল গূঢ়ৈষারই প্রতীক। এই-সকল আচরণ বিনা কারণে ঘটে না, মনোবিশ্লেষণ করিলে ইহাদের মূল জানা যায় এবং স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনা যায়।

স্বপ্ন দেখার ভিতরেও গূঢ়ৈষার পরোক্ষ সক্রিয়তা প্রমাণিত হয়। নানা প্রতীক অবলম্বন করিয়া নানা গূঢ়ৈষা স্বপ্নের ভিতর দিয়া আত্মতৃপ্তি লাভ করে। স্বপ্নই মনশ্চিকিৎসার রাজপথ, স্বপ্ন বিশ্লেষণ করিয়াই প্রধানতঃ রোগের কারণ নির্ণীত হয়।

আমরা কখনো কখনো জাগিয়া থাকিয়াই স্বপ্ন দেখি— কখনো দেখি অদ্ভুত বক্তা হইয়াছি, কখনো দেখি বিখ্যাত খেলোয়াড় হইয়াছি, কখনো দেখি যুদ্ধে নিহত হইয়াছি এবং সকলে আসিয়া মৃতদেহের উপর পুষ্পবৃষ্টি করিতেছে। কম-বেশি অধিকাংশ বয়স্ক ব্যক্তিই দিবাস্বপ্ন ভোগ করেন। তবে শৈশবে দিবাস্বপ্ন অতি স্বাভাবিক, শৈশব দিবাস্বপ্নেরই জীবন বলা চলে। শিশুরা কত চরিত্রের অভিনয় করে— কখনো বাবা, কখনো দাদু, কখনো শিক্ষকমহাশয়। তাহারা কত গাড়ি, জাহাজ বা মেঘে সওয়ার হইয়া কত দেশ-বিদেশ ঘুরিয়া আসে তাহার অন্ত নাই। কবিগুরুর 'শিশু' বইটির 'বীরপুরুষ' কবিতাটি শিশুর দিবাস্বপ্ন লইয়াই রচিত।

মনোবিশ্লেষণে সকল গূঢ়ৈষাই কামজ এবং প্রায় সকলগুলি শৈশবে স্থষ্টি বলিয়া ধরা হয়; কিন্তু সকল মনোবিদ্‌ ইহা স্বীকার করেন না। তবে অধিকাংশ গূঢ়ৈষাই যে কামজ তাহা নিশ্চিত এবং বহু রোগের কারণ যে শৈশবে স্থষ্ট গূঢ়ৈষা, ইহাও সত্য। যেদিক দিয়াই দেখা যাউক সকল গূঢ়ৈষাই যে কম বেশি সক্রিয়, নির্জ্ঞান যে সক্রিয় তাহা সকল মনোবাদীরাই স্বীকার করেন।

সিগ্‌মণ্ড ফ্রয়েডকে (Sigmund Freud) মনোবিশ্লেষণ পদ্ধতির পিতা বলা যায়। মনের নির্জ্ঞাত স্তরের সক্রিয়তা ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা লইয়া ফ্রয়েডের গবেষণা মনোবিদ্যায় ও মনশ্চিকিৎসায় যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে।

মনের অখণ্ডতা

মনের বিভিন্ন স্তরের অস্তিত্ব স্বীকার করিলে যে মনের অখণ্ডতা অস্বীকার করা হইল, তাহা নহে। মনকে সর্বদাই অখণ্ডরূপে দেখিতে হইবে অথচ স্তরকে স্বীকার করিতে হইবে। একটি উপমা লওয়া যাক।

প্রকাণ্ড একটি হল-ঘর, তাহার সম্মুখভাগে এক কোণে একটি দীপ জ্বলিতেছে, সামান্য অংশ আলোকিত হইয়া আছে। হলের অপর প্রান্তে অন্ধকার জমাটবাঁধা এবং মাঝামাঝি স্থানে কিছু আলো কিছু অন্ধকার। হলের আলোকিত অংশের সহিত সচেতন মনের তুলনা করা যায়; অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রান্ত অচেতন বা নির্জ্ঞাত স্তর এবং আলো-আঁধারে মিশানো মধ্যবর্তী স্থানকে পূর্বচেতন স্তর বা কাহারও কাহারও ভাষায় অন্তর্জ্ঞান বলা যায়। হল-ঘরের কোনো স্থানে যেমন খড়ির দাগ টানিয়া বলা যায় না কোন্ স্থানে আলো শেষ হইয়াছে, কোথায় অন্ধকার কতখানি, সেইরূপ মনের বেলাতে বিভিন্ন স্তরের সীমারেখা টানা যায় না, অথচ আলো ও অন্ধকারের ন্যায় সংজ্ঞান ও নির্জ্ঞানের গুণগত প্রভেদ বুঝিতে পারা যায়।

পূর্বে মনোবিদ্‌রা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে মনের অখণ্ডতা অস্বীকার করিয়া বসিতেন। তাঁহারা মনকে স্মৃতি, বোধ, বিচার প্রভৃতির শক্তির গুচ্ছ বলিয়া ভাবিতেন, যেন মনের ভিতর বিবিধ শক্তি পরস্পর অসম্বদ্ধ, আঁটিবাঁধা অবস্থায় রহিয়াছে। যখনই কোনো ক্রিয়া ঐরূপ শক্তি-সমূহের কোনোটির দ্বারা ব্যাখ্যা করা যাইত না, তখনই ক্রিয়ার সহিত মিলাইয়া একটি নূতন শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করা হইত। সুতরাং শক্তির (faculty) সংখ্যা দিন-দিন বাড়িতে থাকিত। তাঁহারা ভাবিতেন যে কোনো শক্তির এককভাবে অনুশীলন দ্বারা সেই শক্তির উৎকর্ষ সাধন করা যায় এবং শক্তিসমূহের ভিতর কোনো সাধারণ যোগসূত্র নাই।—স্মৃতিশক্তিকে প্রখর করিতে হইলে কোনো দিক না ভাবিয়া নিয়মিত আবৃত্তি করিতে হইবে, বিচার-শক্তির উপর বা অন্য কোনোরূপ মানসিক অবস্থার উপর নির্ভর করিতে হইবে না। বর্তমানে এই-সকল অনুমান ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হইয়াছে। আমরা জানি গদ্য অপেক্ষা ছন্দোবদ্ধ কবিতা

মনে রাখা সহজ, অর্থহীন বিষয় অপেক্ষা অর্থপূর্ণ বিষয় সহজে মনে থাকে, যাহার বিষয়-বস্তু মনের ধাঁচের সহিত যত মিলে, তাহা তত স্বাভাবিক ভাবে মনে থাকিয়া যায়, বিচার-বুদ্ধির অবকাশ থাকিলে স্মরণ সহজ হয়। অতএব মনের অবস্থাকে বাদ দিয়া অনুশীলন সার্থক হয় না, অন্যান্য শক্তির সহিত সম্বন্ধও অস্বীকার্য নহে।

মন অখণ্ড, বিবিধ শক্তির যোগফল নহে— বরং বিবিধ শক্তির যৌগিক (compound) অবস্থা বলা যাইতে পারে। সূর্যের আলো তে-শিরা কাঁচের ভিতর দিয়া গেলেই কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন রঙে বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে। এই রঙিন আলোগুলির নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য আছে, তাহাদের বৈশিষ্ট্য লইয়া গবেষণার ভিন্ন ভিন্ন শাখা থাকিতে পারে, ভিন্ন ভিন্ন সূত্র পাওয়া যাইতে পারে। ইহাদেরই যৌগিক মিলনে সূর্যের সাদা আলোর সৃষ্টি; তথাপি সূর্যালোকে ইহাদের রঙিন অস্তিত্ব কোথায়? উপমা অসম্পূর্ণ হইলেও বিভিন্ন রঙিন আলোকের সহিত বিভিন্ন শক্তির তুলনা চলে। ভিন্ন ভিন্ন শক্তির সূত্রাবলী আবিষ্কার করা যাইবে, তথাপি ইহাদের যৌগিক অবস্থাই মন; মনে ইহাদের অস্তিত্ব আছে, অথচ পৃথক পৃথক অস্তিত্ব নাই।

এই প্রসঙ্গে "গেস্টাল্ট" (Gestalt) মনোবিদ্যার উল্লেখ করা যাইতে পারে। গেস্টাল্টবাদের মূল কথা— কোনো-কিছু সমগ্রভাবে বোঝা আর খণ্ড খণ্ড করিয়া বোঝা এক নহে। আমরা যখন কোনো-কিছু প্রত্যক্ষভাবে জানিতে চাহি তখন বিষয়টিকে সমগ্রভাবে জানি; বিষয়টির অংশগুলিকে পৃথক পৃথক ভাবে জানিলে বিষয়টিকেই জানা হইল, এমন নহে। আমরা ঐক্যতান শ্রবণকালে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রগুলির স্বর পৃথক পৃথক ভাবে শুনি না, আমরা সমগ্রভাবে ঐক্যতান শুনি, কারণ— সমস্বর-বাদ্য ইহার অংশ-স্বরগুলির সমষ্টি অপেক্ষা অতিরিক্ত কিছু। কোনো-

ত্রিভুজকে ত্রিভুজরূপে চিনিতে গেলে আমরা কখনো ভুজগুলির একটি একটি করিয়া বুঝি না; আমরা তিনটি রেখাকেই ত্রিভুজের কৌণিক সম্বন্ধে স্থাপিত করিয়া সমগ্র ত্রিভুজাকৃতিটিকে দেখি ও বুঝি। ত্রিভুজেব কৌণিক সম্বন্ধ বাদ দিলে ত্রিভুজকে চিনিতে পারা যাইবে না। গেস্টাল্টবাদে এই সামগ্র্য-বোধ মানসিক প্রচয়ের (development) ভিত্তি। ইহা ছাড়া গেস্টাল্টবাদে পরিজ্ঞানকে (insight) শিক্ষার উপায় বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। পরিজ্ঞান সম্বন্ধে গেস্টাল্টবাদী কোলের (W. Kohler) শিম্পাঞ্জী প্রভৃতি বহু জন্তুর উপর পরীক্ষা করিয়াছেন।

গেস্টাল্টবাদের মূল তত্ত্বে আভিপ্রায়িকতার স্বীকার রহিয়া গিয়াছে। সুতরাং নিম্নে আলোচিত 'প্রৈতি'র সহিত ইহার সম্বন্ধ আছে।

প্রৈতিশক্তি (Horme) ও ধৃতিশক্তি (Mneme)

মন অখণ্ড ও সদা সক্রিয়, ইহা স্মরণে রাখিয়া মনকে দুই মূল শক্তিতে বিশ্লেষণ করা যায়। জীব বাঁচিতে চায় এবং আপন ক্ষমতা অনুযায়ী বাঁচিবার চেষ্টা করে। গাছ জন্ম হইতেই আপন বৈশিষ্ট্য অনুসারে মাটিতে শিকড় চালাইয়া, আলোয় বাতাসে ডাল-পালা পাতা মেলিয়া আপনাকে গঠন করিতে থাকে, ফুল ফুটায়, ফল ফলায়। কীট পতঙ্গ সাধ্যমতো নড়া-চড়া করিয়া, লড়াই করিয়া আপন আপন জন্মগত সংস্কার দ্বারা চালিত হইয়া বাসা নির্মাণ করিয়া বাঁচিতে থাকে। মানুষের চলা দরকার, বলা দরকার। বীরত্ব চাই, স্নেহ-ভালোবাসা চাই; ছবি, গান, কাব্য, বিজ্ঞান— বহু দিক জড়াইয়া তবে মানুষের বাঁচা। কেবলমাত্র মৃত্যু হইতে আত্মরক্ষার নাম বাঁচা নহে, বাঁচার ব্যাপক অর্থও আছে। উন্নত জীবের জীবন-ধারণ কেবল জীবন-রক্ষা নহে, জীবনে বিচিত্র সৃজনেচ্ছাও সমভাবে

সত্য। রক্ষণের ও সৃজনের মিলিত ইচ্ছাকে জীবন-ধারণেচ্ছা বলা যায়। নিম্নতম জীব হইতে শ্রেষ্ঠ জীবের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে প্রতি মুহূর্তের আচরণে ও বহির্জগতের সহিত উপযোজনে এই জীবন-ধারণেচ্ছাই প্রকাশ পাইতেছে। এই মূল ইচ্ছাই জীবকে অ-জীব হইতে পৃথক করিতেছে। ইচ্ছা করিবার ও আচরণ করিবার শক্তিকে আমরা প্রৈতি শক্তি বলিব।

কোনো কোনো মনোবিদ্ বলেন যে জীবন-ধারণেচ্ছার সহিত মরিবার গূঢ় ইচ্ছাও বর্তমান। মরিবার গূঢ় ইচ্ছা আমাদের সংজ্ঞাত স্তরে থাকে না। তজ্জন্য আমরা যে শুধু বাঁচিতেই চাই না, মরিতেও চাই, তাহা টের পাই না; অথচ নির্জ্ঞাত স্তর হইতে এই মৃত্যু-গূঢ়ৈষা আমাদিগের আচরণকে প্রভাবান্বিত করিতেছে। আমাদের মনে রাখিতে হইবে দুইটি বিপরীত বিষয়ের যুগপৎ অস্তিত্ব সম্ভব; বেদনা হইতে অব্যাহতি লাভ করাই আমাদের স্বভাব, অথচ যে উপন্যাস আমাদের হৃদয়কে বেদনাতুর করিয়া তুলে তাহাই বারে বারে পাঠ করি। বহু ক্ষেত্রে মনো-বিশ্লেষণে ধরা পড়িয়াছে যে, যে ব্যক্তি বা বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ আছে তাহা হইতে যুগপৎ বিকর্ষণও আছে, যাহাকে শ্রদ্ধা করি, অজ্ঞাত-সারে তাহার প্রতি ক্রোধপোষণও করি। মনের ভিতর এইরূপ বৈপরীত্যের মিলনকে উভয়বলতা (ambivalence) বলে।

কেবলমাত্র সংজ্ঞানের সক্রিয়তাকে প্রৈতিশক্তি বলে, তাহা নহে। নির্জ্ঞানের সক্রিয়তাও প্রৈতিশক্তির অন্তর্গত। কোনো-কিছু বর্তমান রহিয়াছে, এইটুকু জানিতে পারা (cognition), তৎসম্পর্কে কোনোরূপ ভাবানুভূতি সঞ্চারিত হওয়া (affect) এবং ইচ্ছা প্রয়োগ করা (conation), এগুলি সচেতন প্রৈতির লক্ষণ। অবদমন, গূঢ়ৈষা সৃষ্টি, নির্জ্ঞাত স্তরের সক্রিয়তা, এইগুলিকে প্রৈতিশক্তির অচেতন প্রকাশ বলা

যায়। এইজন্য জীবন-ধারণেচ্ছাও যেমন প্রৈতিশক্তি মৃত্যুর গূঢ়ৈষাও তেমনি প্রৈতিশক্তির অন্তর্গত।

প্রৈতিশক্তির সহিত ধৃতিশক্তি যদি না থাকিত, তাহা হইলে প্রৈতি ব্যর্থ হইত। প্রৈতির প্রকাশকে যদি অর্জন বলি, ধৃতির প্রকাশকে সঞ্চয়ের সহিত তুলনা করা উচিত। সর্বদা সক্রিয় থাকিয়া বৃক্ষের বীজ-প্রাণ মাটি, আলো, বাতাসের সংস্পর্শে আত্মগঠন করিতে থাকে। তাহার প্রতিমুহূর্তের নির্মাণ পরমুহূর্তে যদি নিঃশেষ হইয়া যাইত, কোনো না কোনো ভাবে তাহা যদি সঞ্চিত না থাকিত, তাহা হইলে বৃক্ষ বাড়িতে পারিত কি? বাঁচিতে পারিত কি? আজিকার অভিজ্ঞার দ্বারা আমাদের পরবর্তী আচরণ প্রভাবান্বিত বা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, পূর্ববর্তী শিক্ষাকে ভিত্তি করিয়া নূতন শিক্ষা গৃহীত হইতেছে, নতুবা আমাদের অগ্রগতি অসম্ভব হইত, অস্তিত্ব অবাস্তব হইত। পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা বা শিক্ষা মনে থাকিয়া যাইতেছে, প্রতি মুহূর্তের সক্রিয়তার ফল মনে ধরা থাকিতেছে। মনের এই ধারণ-শক্তিকে ধৃতিশক্তি বলে।

ধৃতিশক্তির সহজ প্রমাণ স্মৃতি। আমরা যখনই অতীতকে স্মরণ করি, তখনই প্রমাণিত হয় যে অতীত কোনোভাবে মনে ধরা রহিয়াছে, মনের ধৃতিবলে অতীত বর্তমান হইয়া রহিয়াছে। অথচ অতীতের যে-সকল অংশ স্মরণ করিতে পারি না, তাহারাও তো দেহ-মনে ধৃত আছে, নহিলে স্মৃতি হইতে অবদমিত গূঢ়ৈষা সমূহ সক্রিয় থাকে কেন। প্রৈতিশক্তির যেমন সচেতন ও অচেতন দুই স্তরেই প্রকাশ, তেমনি ধৃতিশক্তিরও প্রমাণ দুই স্তরেই। নির্জ্ঞাত স্তরে ব্যক্তিগত জীবনের গূঢ়ৈষা-সমূহ ধৃত রহিয়াছে এবং বংশানুক্রমে বাহিত জীবের শ্রেণীগত আচরণ-ছাঁদ ও গঠনাদি দেহ-মনে ধৃত রহিয়াছে। মানব-শিশু মানবের আকৃতি লইয়াই জন্মে, হস্তিনী-গর্ভে শুণ্ডবিশিষ্ট হস্তিশাবক জন্মলাভ করে।

মানব-শিশু তাহার হাঁটিবার প্রতিবর্তী ক্রিয়াসমূহ প্রস্তুত হইলেই দুই পায়ে ভর দিয়া হাঁটিতে আরম্ভ করে; হস্তি-শাবক তাহার হস্তি-শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য অনুসারে সহজেই চার-পায়ে হাঁটে। মানব-শিশু ও হস্তি-শিশু যেন তাহাদের মাতৃগর্ভে আরম্ভক্ষণ হইতেই জানিয়া রাখিয়াছে কে কোন্ শ্রেণীর দেহ গ্রহণ করিবে, কোন্ শ্রেণীর আচরণ-ছাঁদ বিকাশোন্মুখ করিয়া রাখিবে, কী ভাবে প্রতিবর্তী ক্রিয়ার প্রস্তুতি চলিবে। বলা বাহুল্য যে, কোনো জীবই জ্ঞাতসারে তাহার শ্রেণীগত গুণাবলী ব্যক্তিগত জীবনে বহন করে না। কিন্তু বংশানুক্রমে শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য যে ব্যক্তিগত জীবনে বাহিত হইতেছে, ইহা তো স্বতঃপ্রমাণ। যেন কোনো অলক্ষ্য, অজ্ঞাত স্মৃতি ইহার মূলে রহিয়াছে। ইহা ধৃতি-শক্তির নির্জ্ঞাত স্তরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতেছে।

ঐপ্রেতি ও ধৃতির সম্বন্ধ কী, একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে বুঝা যাইতে পারে। শিশু আগুন দেখিয়া প্রথমবার আগুন ধরিতে গেল এবং হাত পুড়াইল। দ্বিতীয়বার আগুন দেখিয়া সে আর ধরিতে গেল না, দূর হইতে বিস্ময় প্রকাশ করিতে লাগিল। তৃতীয় বার আগুন দেখিলেও বিস্ময় প্রকাশ করিল না, উদাসীন রহিল। আগুনের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া, ধরিতে যাওয়া প্রভৃতি সক্রিয়তাকে আমরা ঐপ্রেতি বলিয়াছি। শিশুর আগুন ধরার মূলে রহিয়াছে তাহার স্বভাব, অর্থাৎ ধৃতি। অতএব এ ক্ষেত্রে দেখা গেল ঐপ্রেতিকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে ধৃতি, শিশুর সক্রিয়তাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে শিশুর স্বভাব। দ্বিতীয় বার কিন্তু শিশুর স্বভাবের পরিবর্তন ঘটিয়াছে, এই পরিবর্তন ধৃতিশক্তির দ্বারা দেহ-মনে ধরা রহিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে ঐপ্রেতি প্রকাশিত হইয়াছে, আগুন ধরায় নহে, বিস্ময় প্রকাশে। তৃতীয় বার স্বভাব পুনরায় পরিবর্তিত হইল এবং ঐপ্রেতিও উদাসীনতারূপে প্রকাশ পাইল। দেখা যাইতেছে ধৃতির দ্বারা ঐপ্রেতি

পরিচালিত হইতেছে ও প্রৈতির দ্বারা ধৃতির ক্ষেত্র পরিবর্ধিত হইতেছে ; উভয়শক্তিই জীবের ভিত্তিমূলক ও পরস্পরের সম্পূরক।

অভিজ্ঞতা (Experience)

অন্তর্দর্শনের দ্বারা আমরা মনের সচেতন ক্রিয়াকে দেখি, প্রৈতিশক্তির সচেতন রূপকে উপলব্ধি করিতে পারি। দেখা, শোনা, বলা, স্পর্শ, ঘ্রাণ, চিন্তা প্রভৃতি সচেতন ক্রিয়ার দ্বারা আমরা উদ্দীপকে সাড়া দিই, পরিবেশের সহিত সচেতন প্রৈতির মিলন ঘটাই। প্রতি মুহূর্তে উদ্দীপকে সাড়া দিয়া, পরিবেশের সহিত প্রৈতির মিলন ঘটাইয়া আমরা প্রতি মুহূর্তেই অভিজ্ঞা লাভ করিতেছি। অতএব দেখা, শোনা, বলা প্রভৃতির দ্বারা জীবনের প্রতি মুহূর্তে অভিজ্ঞা লাভ হইতেছে। প্রতিক্ষণের অভিজ্ঞা যে আমরা সর্বক্ষেত্রে টের পাই, তাহা নহে।— কানের কাছে ঢং ঢং করিয়া ঘড়ি বাজিয়া গেল, অন্যমনস্ক থাকার জন্য মনে হইতেছে ঘণ্টা শুনি নাই ; তথাপি ঘড়ির শব্দ আমার কান গ্রহণ নিশ্চয়ই করিয়াছে এবং প্রতিষঙ্গি (corresponding) অভিজ্ঞা নিশ্চয়ই ঘটিয়াছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে টের না পাইলেও জীবনের প্রতিমুহূর্তে জীবের অভিজ্ঞা ঘটিতেছে। অসংখ্য জলবিন্দু ঢেউয়ের আকারে সারিবদ্ধ হইয়া নদীর এক-একটি ঢেউ সৃষ্টি করে, সেইরূপ বহু অভিজ্ঞা সুসংগঠিত হইয়া আমাদের এক একরূপ অভিজ্ঞতা জন্মায়। দূর হইতে কামানের মুখে এক ঝলক আলো দেখিলাম, দুম করিয়া প্রচণ্ড শব্দ শুনিলাম, কামান ছোঁড়া সম্বন্ধে একরূপ অভিজ্ঞতা জন্মিল। কিন্তু যে কয়মুহূর্ত আলো দেখিলাম ও শব্দ শুনিলাম সেই কয়মুহূর্তের দেখা ও শোনা জাতীয় বিভিন্ন অভিজ্ঞার সমষ্টিই ঐ অভিজ্ঞতা। আমরা বহু অভিজ্ঞার সুসংগঠিত,

একত্রীভূত অবস্থাকে সাধারণভাবে অভিজ্ঞতা বলিয়া বর্ণনা করিতে পারি।

অভিজ্ঞার বিশ্লেষণ করিলে প্রতি ক্ষেত্রেই আমরা প্রৈতিশক্তি ও পরিবেশকে দেখিতে পাইব, কারণ প্রৈতিশক্তি ও পরিবেশের উদ্দীপক ও সাড়ার যৌগিক ফলের নামই অভিজ্ঞা। জড়জগতে এমন কোনো কিছুই নাই যাহার সহিত অভিজ্ঞার যৌগিক প্রকৃতির নির্ভুল ও সম্পূর্ণ তুলনা চলে।

রাসায়নিক পরিবর্তনের কোনো কোনো ক্ষেত্রে তৃতীয় কোনো পদার্থের উপস্থিতি প্রয়োজন হয়, নহিলে যৌগিক পরিবর্তন সাধন করা যায় না। এইরূপ তৃতীয় পদার্থের নাম অনুঘটক (catalytic agent)। প্রৈতি ও পরিবেশের যৌগিক ফল, অর্থাৎ অভিজ্ঞা, লাভ করিতে হইলেও ঐরূপ অনুঘটকের ন্যায় বিশেষ মানসিক অবস্থার প্রয়োজন, নহিলে উদ্দীপকের সাড়া ঘটিত না, কোনো অভিজ্ঞা লাভ করা যাইত না। উদ্দীপক ও সাড়ার মধ্যে যে মানসিক অবস্থা অনুঘটকের কাজ করে, তাহাকে মনোবাদীরা প্রক্ষোভ নাম দিয়াছেন। ক্লান্ত পথিক চলিতে চলিতে সহসা সুমিষ্ট সংগীত শুনিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল, কান পাতিয়া সংগীত শুনিতে লাগিল। এই দৃষ্টান্তে পথিকের সকল ক্লান্তি ভুলিয়া কান পাতিয়া গান শুনার পশ্চাতে বিশেষ অবস্থা উদ্দীপিত রহিয়াছে, উপযুক্ত ভাবে প্রক্ষোভ উদ্দীপিত হইয়াছে, নহিলে উদ্দীপকের সাড়া ঘটিত না। সকল শ্রেণীর জীবের সকল প্রকার অভিজ্ঞার ক্ষেত্রে এইরূপ অনুঘটক মানসিক অবস্থা বর্তমান। কীট-পতঙ্গের সাড়ার পশ্চাতেও এই প্রক্ষোভ জাতীয় মানসিক অবস্থা আছে বলিয়া মনোবাদীরা বিশ্বাস করেন, তবে অস্পষ্ট বোধের ক্ষেত্রে এই অনুঘটক মানসিক অবস্থার নাম দেওয়া হইয়াছে 'সংবেদন' (sensation)।

আমরা যখন কোনো ঘটনা স্মরণ করি তখন সেই অতীত ঘটনাটি যে আবার ঘটিতে থাকে তাহা নহে, সেই ঘটনাটি মনের মধ্যে যে ছাপ রাখিয়া গিয়াছে, সেইগুলি যেন জীবন্ত হইয়া উঠে, সেইগুলিকে যেন স্মৃতির আলোকে দেখি। প্রতি মুহূর্তের অভিজ্ঞা এইরূপে নিজ ছাপ রাখিয়া যাইতেছে ; ধৃতিশক্তির দ্বারা এই-সকল ছাপকে ধরিয়া রাখার নামই অভিজ্ঞা বা অভিজ্ঞতা লাভ। আমরা প্রতিমুহূর্তের অভিজ্ঞার ছাপকে অভিজ্ঞা চিহ্ন (engram) বলিব।

জীবনের অভিজ্ঞা-চিহ্ন সকল যে এক-একটি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে মনে আটকাইয়া থাকে তাহা নহে। অসংখ্য অভিজ্ঞা-চিহ্ন এক-একটি কেন্দ্র অবলম্বন করিয়া এক-একটি দল হিসাবে, এক-একটি পরিবার হিসাবে থাকে। যাহার কামান ছোঁড়ার অভিজ্ঞতা হইয়াছে, পুনর্বার কোথাও কামান দেখিলে তাহার মনে পড়িবে কামানের নল, আগুনের ঝলক, ধূম, শব্দ। এই যে আগুন, ধূম, শব্দ যুগপৎ মনে পড়িয়া গেল, ইহা হইতে বুঝা যায় যে আগুন, ধূম, শব্দ প্রভৃতির সকল অভিজ্ঞা-চিহ্ন একটি দল পাকাইয়া, জট বাঁধিয়া মনে ধৃত আছে ; এমন ভাবে ধৃত আছে যে কামানের স্মৃতিকে জাগ্রত করিলে আগুন, ধূম প্রভৃতি সম্বন্ধযুক্ত সকল স্মৃতিই জাগ্রত হইয়া পড়ে। অভিজ্ঞা-চিহ্নের এইরূপ দলকে অভিজ্ঞা চিহ্ন-জট (engram complex) বলা হয়। এইরূপ কোনো জট সৃষ্টি করিতে হইলে অসংখ্য অভিজ্ঞা-চিহ্নের ভিতর এক ধরণের বাছা-বাছি, শ্রেণীবিভাগ, নির্বাচন দরকার ; কোন্ কোন্ অভিজ্ঞা-চিহ্ন কোন্ কোন্ কেন্দ্রকে অবলম্বন করিয়া জট বাঁধিবে তাহা আমাদের অজ্ঞাত-সারেই নির্বাচিত (selected) হইতেছে এবং নির্বাচিত অভিজ্ঞা-চিহ্ন সমূহের ভিতর দলগত বন্ধন স্থাপিত হইতেছে— এই বন্ধন স্থাপনের নাম আমরা অনুষঙ্গ দিয়াছি।

স্বভাব

জন্ম হইতেই প্রতি জীবের আচরণ-ছাঁদ প্রস্তুত থাকে, তদনুসারে জীব আচরণ করে, জন্মগত আচরণ-ছাঁদগুলিকে সমগ্রভাবে আমরা জীবের জন্মগত প্রাথমিক স্বভাব (primary disposition) বলিতে পারি। প্রাথমিক স্বভাবকে মূলধন করিয়া জীব জীবন আরম্ভ করে, আচরণ করে। কিন্তু প্রাথমিক স্বভাব অপরিবর্তিত থাকে না। অভিজ্ঞতার দ্বারা বিচিত্র অভিজ্ঞা-চিহ্নের জট-সৃষ্টির দ্বারা জীবের স্বভাব পুনঃ পুনঃ পরিবর্তিত হইতেছে। অভিজ্ঞা-চিহ্নসমূহ নিজেদের মধ্যে নির্বাচন ও অনুষঙ্গ দ্বারা জট সৃষ্টি করিয়াই ক্ষান্ত নহে, এই-সকল জটকেও স্বভাবের সহিত সম্বদ্ধ করিতেছে, স্বভাব এই-সকল জটকে নিজের অঙ্গীভূত করিয়া ফেলিতেছে। যতবারই নূতন নূতন জটকে স্বভাব নিজের অঙ্গীভূত করিতেছে, ততবারই স্বভাব নিজেই সমগ্রভাবে পরিবর্তিত হইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে জীবের আচরণ-ছাঁদও বদলাইয়া যাইতেছে। হয়তো প্রাথমিক বা পূর্ববর্তী স্বভাব-অনুসারে শিশু আগুন ধরিতে গিয়াছিল, কিন্তু হাত পুড়িয়া যাওয়ার অভিজ্ঞতার দ্বারা তাহার স্বভাবই পরিবর্তিত হইয়াছে। সে এখন আর আগুন ধরিবে না। শিশু যে পুড়িয়া যাওয়া অভিজ্ঞতা স্মরণ করিয়া যুক্তি-বিচার করিয়া এখন আচরণ করিতেছে, তাহা নহে। তাহার সমগ্র পরিবর্তিত স্বভাব (secondary disposition) এখন আগুন সম্পর্কে তাহার আচরণ-ছাঁদ বদলাইয়া দিয়াছে।

অনুষঙ্গ

অভিজ্ঞা-চিহ্নসমূহ নানাভাবে অনুষঙ্গিত হইয়া বিভিন্ন জট সৃষ্ট হইতেছে, আবার নানা জট পরস্পর অনুষঙ্গিত হইয়া বৃহত্তর জটে পরিণত হইতেছে। কাহারো কাহারো স্নান করিলেই ক্ষুধা পায়। এক্ষেত্রে বুঝিতে হইবে যে স্নানের সহিত ক্ষুধার, অর্থাৎ স্নানের অভিজ্ঞা-চিহ্নের জটের সহিত ক্ষুধার জটের অনুষঙ্গ স্থাপিত হইয়াছে এবং স্নান ও ক্ষুধার জটসমূহ পরস্পর অনুষঙ্গিত হইয়া বৃহত্তর জটে পরিণত হইয়াছে।

অভিজ্ঞা-চিহ্ন, জট প্রভৃতি মানসিক ব্যাখ্যার দিকে না চাহিয়াও আচরণবাদে আচরণ লক্ষ্য করিয়া অনুষঙ্গ সম্বন্ধে কতকগুলি মূল্যবান সূত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। দেখা গিয়াছে ছোটো বয়সে অনুষঙ্গ স্থাপন সহজ, বড়ো বয়সে অপেক্ষাকৃত কঠিন। তজ্জন্য ছোটো বয়সেই বাঞ্ছিত শিক্ষার গোড়া-পত্তন করিতে হয়। অনুষঙ্গ একবার স্থাপিত হইলেই যে চিরজীবন টিকিয়া থাকিবে তাহা নহে। অনুশীলনের বা বারবার আচরণের অভাবে ক্রমশ অনুষঙ্গ দুর্বল হইয়া যাইবে, হয়তো আদৌ থাকিবে না। আবার, অনুশীলনের দ্বারা অনুষঙ্গ দৃঢ় করা যায়। ছোটো বয়সে ছাত্র ড্রিল শিক্ষা করিয়াছে বলিয়া বড়ো বয়স পর্যন্ত সে অভ্যাস টিকিয়া থাকিবে এমন কোনো কথা নাই। মাঝে মাঝে ড্রিল করাইয়া ড্রিলের আদেশের সহিত ড্রিল-আচরণের অনুষঙ্গকে দৃঢ় রাখিতে হয়।

কখনো কখনো কৌশল অবলম্বন করিয়া, ইচ্ছা করিয়া অনুষঙ্গ দুর্বল করা যায়, এমন-কি অনুষঙ্গ ভঙ্গ করিয়া দেওয়া যায় এবং নূতন অনুষঙ্গ স্থাপন করাও যায়। কোনো কোনো ছাত্রকে গৃহে কিছু লিখিয়া আনিতে বলিলে সে অপরের দেখিয়া নকল করিয়া আনে। ইহা একরূপ অভ্যাসে দাঁড়াইয়া যায়, শিক্ষকের নির্দেশের সহিত নকল করা, ছল-ছুতা

বাহির করা প্রভৃতি অবাঞ্ছিত আচরণের অনুষঙ্গ স্থাপন হইয়া যায়। কিন্তু শিক্ষক সুকৌশলে এই অনুষঙ্গ ভঙ্গ করিতে পারেন, বাঞ্ছিত অনুষঙ্গ গঠিত করিতে পারেন ; তখন ছাত্র ছল-ছুতা খুঁজিবে না, আনন্দের সহিত তাঁহার নির্দেশ পালন করিবে। ছাত্রর অজ্ঞাতসারেই শিক্ষকের নির্দেশের সহিত ছল-ছুতার অনুষঙ্গ ভঙ্গ হইয়া চেষ্টার সহিত নূতন অনুষঙ্গ স্থাপিত হইয়া যাইবে।

জীব যখন কোনো আচরণ স্বাভাবিকভাবে বারবার করিতে চাহে, তখন বুঝিতে হইবে সেই আচরণ প্রীতিকর ; যখন করিতে চাহে না, তখন বুঝিতে হইবে উহা অপ্রীতিকর, বেদনাদায়ক। প্রীতি বা সুখের মাধ্যমে অনুষঙ্গ স্থাপন সহজ হয়, সহজে দৃঢ় হয়। আনন্দদায়ক শিক্ষা-ব্যবস্থা এইজন্য সর্বাপেক্ষা ফলপ্রসূ, কারণ আনন্দের মাধ্যমে নানাবিধ অনুষঙ্গ স্থাপন, অর্থাৎ শিক্ষা, সহজ ও পাকা হয়। বেদনাদায়ক বা অপ্রীতিকর শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষা-প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়, কারণ বেদনার মাধ্যমে অনুষঙ্গ স্থাপন কঠিন। ছাত্রকে প্রার্থিত কাজে উৎসাহিত করিতে হয়, অন্যায় আচরণের জন্য ভর্ৎসনা করা হয়। সুখ্যাতি, উৎসাহ প্রীতিকর ; সুতরাং ইহার দ্বারা প্রার্থিত কাজের সহিত ছাত্রের অনুষঙ্গ স্থাপন দৃঢ় হইবে। ভর্ৎসনার বেদনা ছাত্রর অন্যায় আচরণের সহিত অনুষঙ্গ দুর্বল করিবে, অবশেষে ভঙ্গ করিবে— ইহাই আশা করা হয়।

শাস্তিদান সম্পর্কে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়। ছাত্রকে কখনো বলিতে নাই, 'তোমার শাস্তি, দশপাতা লিখিয়া আনিবে অথবা ফুলগাছে পাঁচ বাল্‌তি জল দিবে।' হাতের লেখা করা বা ফুলগাছে জল দেওয়া সৎ অভ্যাস, ছাত্রদের ইহা অবশ্যকর্তব্য। এই-সকল কার্য শাস্তি হিসাবে গৃহীত হইলে শাস্তির বেদনার সহিত এই-সকল কার্যের অনুষঙ্গ স্থাপিত হইয়া যাইবে, তখন ছাত্র স্বাভাবিকভাবেই এই কর্তব্য

এড়াইতে চাহিবে। শাস্তিদানের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় ছাত্রকে তাহার ত্রুটি সম্বন্ধে সচেতন করিয়া দিয়া বলা 'তোমার শাস্তি তুমিই বাছিয়া লও।' এরূপ হইলে শাস্তির ক্লেশের সহিত ছাত্র অতি স্বাভাবিকভাবে নিজের ত্রুটিকে অনুষঙ্গিত করিবে, ক্রমশ ত্রুটিমুক্ত হইবে। "শাস্তি পরের নিকট হইতে অপরাধের প্রতিফল, প্রায়শ্চিত্ত নিজের দ্বারা অপরাধের সংশোধন" (রবীন্দ্রনাথ)। এই উক্তির মূলে মনস্তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক অনুষঙ্গ-সূত্র রহিয়াছে দেখা যাইতেছে।

কোনো কোনো অবস্থায় অনুষঙ্গ স্থাপন কঠিন হয় দেখা যায়। যখন কেহ ক্লান্ত থাকে তখন নূতন অনুষঙ্গ স্থাপন দুঃসাধ্য। ধীমান বালককেও কয়েক ঘণ্টা অধ্যাপনার পর অঙ্ক শিখাইতে গেলে অঙ্ক সে শিখিবে না, অঙ্কর সহিত তাহার অনুষঙ্গ স্থাপন ভালো হইবে না, কারণ ক্লান্ত অবস্থায় মানসিক পরিশ্রম বেদনাদায়ক। যখন কেহ কোনো আচরণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে তখন তাহাকে সেই কাজ করিতে না দিলে সে বিরক্ত হয়, তখন অন্য কাজ করাইলে সে ক্লেশ পায়। যে সময় বালক অঙ্ক করিতে চাহে, তখন অঙ্ক না কষাইয়া সংগীত অভ্যাস করিতে বলিলে সংগীতের সহিত অনুষঙ্গ ভালো হইবে না।

আরাম ও বেদনার তীব্রতার উপর অনুষঙ্গ নির্ভর করে। আরাম যত বেশি, সেই আচরণ তত সহজে অনুষঙ্গিত হইবে; বেদনা যত তীব্র অনুষঙ্গ তত কঠিন হইবে, অনুষঙ্গ ভঙ্গ তত সহজ হইবে। বলা বাহুল্য, জীবের ব্যক্তিগত স্বভাবের উপর এই তীব্রতাবোধ নির্ভর করে।

আমাদের অজ্ঞাতসারে অনুষঙ্গ-ক্রিয়া অবিরাম চলিতেছে। অচেতন-স্তরের এই অনুষঙ্গ-ক্রিয়ার আর-এক পরিচয় জানা গিয়াছে। কখনো কখনো আমরা কোনো বিষয় মনে করিতে চেষ্টা করিয়াও সফল হই না, অথচ সেই বিষয়টি পরে কোনো এক সময়ে হঠাৎ মনে পড়িয়া যায়,

ইহার কারণ, আমরা যখন হতাশ হইয়া মনে করিবার চেষ্টা ছাড়িয়া দিই তখন সচেতন চেষ্টা শেষ হইল বটে কিন্তু অচেতন স্তরে চেষ্টার রেশ লাগিয়া রহিল। অভিজ্ঞা-চিহ্নের যে জটের অনুষঙ্গ শিথিল হইয়া গিয়াছিল বলিয়া স্মরণে আসিতেছিল না, সেই জটের অভিজ্ঞা-চিহ্নসমূহ পুনরায় সুসংহত (consolidated) হইতে থাকিল এবং যে মুহূর্তে সুসংহতি সম্পূর্ণ হইল, সেই মুহূর্তেই সচেতনস্তরে আসিল, বিষয়টি হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল।

শিক্ষাক্ষেত্রে সুসংহতির ব্যাপারটি প্রয়োজনীয়। শিক্ষাকালে মাঝে মাঝে সুসংহতির জন্য কিছু কিছু সময় দেওয়া উচিত। প্রত্যহ কোনো কবিতা মুখস্থ না করিয়া দু-একদিন পর পর মুখস্থ করা ভালো। যে অঙ্ক ছাত্র পারিতেছে না, তৎক্ষণাৎ তাহাকে বুঝাইয়া না দিয়া একদিন সময় দেওয়া ভালো, হয়তো দেখা যাইবে ঐ একদিনে ছাত্রটি নিজেই অঙ্ক কষিয়া ফেলিবে। কখনো কখনো দেখা যায়, শিক্ষার্থীর শিক্ষা-স্রোত অগ্রসর হইতে হইতে হঠাৎ যেন থামিয়া যায়, আর যেন কোনো শিক্ষা হইতেছে না। কিছুদিন এইরূপ স্থিতির পর আবার শিক্ষার গতি দেখা যায়। এইরূপ সাময়িক শিক্ষা-স্থিতি (plateau of learning) অস্বাভাবিক কিছু নহে, কারণ ইহা শিক্ষিত বিষয়গুলির সুসংহতির জন্য ঘটিতে পারে, সংহতি সম্পূর্ণ হইলে আবার শিক্ষা-গতি দেখা দিবে।

আচরণবাদের মতে সরল আচরণ-ছাঁদ ভিত্তি করিয়া সরল অভ্যাস গঠিত হয়, ইহার নাম শিক্ষা। সরল অভ্যাসকে ভিত্তি করিয়া ক্রমশ জটিলতর অভ্যাস গঠিত হইতে থাকে, ইহাই শিক্ষার বিস্তার। অতএব নূতন কিছু শিখিতে গেলে, জটিলতর অভ্যাস লাভ করিতে গেলে পূর্ব-গঠিত অভ্যাসগুলি সুসংহত থাকার প্রয়োজন। নহিলে নূতন শিক্ষা সম্ভব হইতেই চাহিবে না, শিক্ষা-স্থিতি দেখা দিবে। পূর্ব-গঠিত অভ্যাসগুলি

সুসংহত হইলে নূতন অভ্যাসটির দ্রুত উন্নতি দেখা যাইবে।

কাহারো মতে শিক্ষাকালে সাময়িক বিরক্তি বা আনন্দের অভাবই শিক্ষা-স্থিতির কারণ। শিক্ষা-স্থিতির ব্যাখ্যা বিভিন্ন হইলেও সকলেই একমত যে শিক্ষা-স্থিতি কালেও উন্নতির জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতে হইবে, নতুবা শিক্ষা-স্থিতি পার হইয়া শিক্ষা-গতি সম্ভব হইবে না। কারণ সচেতন চেষ্টার দ্বারাই অচেতনের সুসংহতি ক্রিয়া শেষ পর্যন্ত সম্পন্ন হয়।

সহজ-প্রবৃত্তি (Instinct)

বাতাস বহিলে নদীর জলে ঢেউ উঠে, বাতাসের সংস্পর্শে নদীর সমগ্র জলরাশি একই সঙ্গে উঁচু হইয়া উঠে না, অসংখ্য তরঙ্গ তুলিয়া নদী সাড়া দেয়। সেইরূপ পরিবেশের দ্বারা সমগ্র প্রৈতিশক্তি অখণ্ডভাবে উদ্দীপিত হয় না, তরঙ্গ-তুল্য নানাবিধ সহজ-প্রবৃত্তির দ্বারা উপযোজন সাধিত হয়। তরঙ্গ যেমন নদীর অংশ, তেমনি বোধন, খাদ্যান্বেষণ, যূথচরণ, যৌন-প্রবৃত্তি প্রভৃতি 'সহজ' বলিয়া বর্ণিত প্রবৃত্তি প্রৈতিশক্তিরই উপযোজনরূপ। গর্ভাধান মুহূর্ত হইতেই নির্দিষ্ট ভবিষ্যতের দিকে দেহবীজ বিকাশিত হইতে থাকে, দেহবিন্দু ক্রমশ চোখ, কান, নাক প্রভৃতি বহু অংশে বিশেষিত হইতে থাকে, সম্পূর্ণ হইতে থাকে। প্রৈতিও উক্ত প্রাণ-সঞ্চার মুহূর্ত হইতে বিচিত্র সহজ-প্রবৃত্তিতে বিশেষিত হইতে থাকে এবং ক্রমশ সহজ-প্রবৃত্তিসমূহ সম্পূর্ণভাবে বিকাশিত হইতে থাকে।

আচরণবাদে সহজ-প্রবৃত্তিকে জন্মগত আচরণ-ছাঁদ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে; প্রথমে ইহারা অব্যক্ত থাকে, ক্রমশ উপযুক্ত পরিবেশের সংস্পর্শে ব্যক্ত হইতে থাকে। মনোবাদীরা ইহাকে বংশগত অভিজ্ঞা-চিহ্নের জট বলিয়া বিশ্বাস করেন। তাঁহারা বলেন কোনো সুদূর অতীতে

সহজ-প্রবৃত্তিরূপ জট কোনো শ্রেণীর জীবের ক্ষেত্রে সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহার পর সেই জীব-শ্রেণী বংশ-পরম্পরায় সেই-সকল জট সহজ-প্রবৃত্তিরূপে প্রাথমিক স্বভাবরূপে বহিয়া আসিতেছে ; জীব-শ্রেণী ধৃতি-শক্তির দ্বারা সেই সুদূর অতীতের জটগুলিকে শ্রেণীগতভাবে ধরিয়া রাখিয়াছে। বলা বাহুল্য, পরিবেশ চিরকাল একই থাকে না, সেজন্য সহজ-প্রবৃত্তিসমূহ একই ভাবে নিশ্চয়ই নাই। জীবের ক্রমবিকাশের সহিত সহজ-প্রবৃত্তির বৈচিত্র্যও নানাভাবে পরিবর্তিত হইবার ক্ষমতা বাড়িতেছে।

সহজ-প্রবৃত্তির প্রকৃতি ও সংখ্যা লইয়া নানা মত আছে। কেহ কেহ ইহাদের দৈহিক ব্যাখ্যাই যথেষ্ট মনে করেন, কাহারো মতে ইহাদের দৈহিক ব্যাখ্যা অসম্ভব। কাহারো ধারণা সহজ-প্রবৃত্তির সংখ্যা চৌদ্দ, অপরে কমাইয়া বা বাড়াইয়া সহজ-প্রবৃত্তির তালিকা দিয়া থাকেন। পলায়ন (instinct of flight), যোধন (combat), বিকর্ষণ (repulsion), সন্তান-রক্ষণ (parental instinct), আবেদন (instinct of appeal), মৈথুন (instinct of mating), কৌতূহল (curiosity), আত্মনমন (submission), আত্মসংস্থাপন (self-assertion), যূথ-চরণ (gregarious instinct), খাদ্যান্বেষণ (foodseeking), অধিকরণ (acquisition), সৃজন (construction) ও হাস্য (laughter) ইহাই বিখ্যাত চৌদ্দটি সহজ-প্রবৃত্তির তালিকা। এই বিষয়ে খ্যাতি-সম্পন্ন গবেষকের মতে প্রতি সহজ-প্রবৃত্তির নির্দিষ্ট প্রক্ষোভ আছে, যখনই কোনো সহজ-প্রবৃত্তি উদ্দীপিত হইয়াছে বলি, তখনই বুঝিতে হইবে যে, সহচারী প্রক্ষোভও উদ্দীপিত হইয়াছে, নহিলে জীব আচরণশীল হইত না।' এই মতানুসারে চৌদ্দটি সহজ-প্রবৃত্তির প্রক্ষোভ যথাক্রমে ভীতি (fear), ক্রোধ (anger), ঘৃণা (disgust), বাৎসল্য (tender

emotion), বেদনা (distress), কাম (lust), বিস্ময় (wonder), নতি ভাব (negative self-feeling), অহং ভাব (positive self-feeling), নিঃসঙ্গ ভাব (feeling of loneliness), লোভ (gusto), অধিকারী ভাব (feeling of ownership), স্রষ্টা ভাব (feeling of creativeness), আমোদ (amusement)। অন্তর্দর্শনমূলক পন্থায় সহজ-প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভ লইয়া গবেষণার শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করিতে পারেন বিখ্যাত মনোবিদ্ ম্যাক্‌ডুগাল (W. Mcdougall)। তাঁহার গবেষণা বহুস্থানে সমালোচিত হইলেও সাধারণভাবে অন্তর্দর্শন-বাদে গৃহীত হইয়াছে।

কোনো কোনো মনোবিদ্ ক্ষুধা তৃষ্ণা ও কামের বৈশিষ্ট্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। ক্ষুধা তৃষ্ণা ও কাম সহজ হইলেও ইহারা যেন আপনা আপনিই উদ্দীপিত হয়। অন্যান্য সহজ-প্রবৃত্তি বা প্রক্ষোভকে উদ্দীপিত করিতে হইলে পরিবেশের প্রয়োজন। ক্ষুধা তৃষ্ণা ও কামের উদ্দীপক দেহাভ্যন্তরেই নিহিত। অবশ্য ইহারা যে বহির্জগতের দ্বারা উদ্দীপিত হয় না, এমন নয়; তবে ইহাদের উদ্দীপনের জন্য বহির্জগতের উপর যেন ইহারা নির্ভরশীল নহে। দ্বিতীয়ত ইহারা সকল সহজ-প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভের মধ্যে প্রবলতম।

এক হিসাবে আত্ম-সংস্থাপন (self-assertion) সাধারণ সহজ-প্রবৃত্তি নহে, ইহাই মূল সহজ-প্রবৃত্তি, অনেকটা জীবনেরই নামান্তর। বিভিন্ন ধারায় জল বহিতেছে; যদি এই বিভিন্ন ধারার সহিত সাধারণ সহজ-প্রবৃত্তির তুলনা করা যায় তাহা হইলে সমগ্র প্রবহমান জলরাশির সহিত আত্মসংস্থাপনের উপমা চলে। বিভিন্ন সহজ-প্রবৃত্তির দ্বারা এই মূল প্রবৃত্তি চরিতার্থ হইতেছে। ইহার সহচারী প্রক্ষোভ অহং ভাবকে মূল প্রক্ষোভ বলা চলে।

প্রক্ষোভ লইয়াও অনেক মত আছে। কেহ কেহ সকল সহজ-প্রবৃত্তিরই প্রক্ষোভ নির্দিষ্ট আছে এ কথা স্বীকার করেন না। কাহারো মতে ক্রোধকে প্রক্ষোভ বলা চলিবে, অথচ বৈজ্ঞানিকের সাধনার মূলে যে মহাবিস্ময় রহিয়াছে তাহাকে প্রক্ষোভ বলা চলিবে না। অবশ্য, ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে ক্রোধ ও বিস্ময়ের মধ্যে বস্তুগত পার্থক্য নাই, কেবলমাত্র তীব্রতার পরিমাণ-গত পার্থক্য আছে। অতএব সকল আচরণের মূলে প্রক্ষোভজাতীয় কিছু আছে, ইহা আমরা ধরিয়া লইতে পারি।

সহজ-প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভ জীবনের কাঁচামাল স্বরূপ, এইগুলিকে লইয়াই জীবন গঠিত করিতে হইবে। এইগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া, পরিচালিত করিয়া ইহাদের উদ্‌গতি (sublimation) সাধন করা শিক্ষার আসল সমস্যা। মনে রাখিতে হইবে ইহাদিগকে দাবাইয়া রাখা উচিত নহে; দাবাইয়া রাখিলে আপাতদৃষ্টিতে কার্যসিদ্ধি হয় বটে কিন্তু ক্ষতি কম হয় না। শক্তির অপচয় যে ঘটিবে তাহা নিঃসন্দেহ, কখনো কখনো অবদমন ব্যাধিরূপে প্রকাশ পায়। যুযুৎসুর ন্যায় সু-কৌশল ব্যবহার করিতে হয়। যুযুৎসুতে যেমন অপরের শক্তির গতি পরিবর্তন করিয়া অপরের শক্তির দ্বারাই তাহাকে পরাস্ত করিতে হয়, সেইরূপ বাঞ্ছিত পথে মোড় ঘুরাইয়া দিয়া সহজ-প্রবৃত্তির উন্নতি সাধন করিতে হয়। প্রক্ষোভ সম্বন্ধেও ঐ এক কথা। যে ক্রোধ নিন্দনীয় সেই ক্রোধকেই প্রশংসনীয় জেদে পরিণত করা যায়। যে বালক বইএর পাতা কাঁচি দিয়া কাটিয়া ফুল বানাইতেছে, তাহাকে শিল্পকার্যের সুযোগ দিয়া তাহার সৃজন-প্রবৃত্তিকে সার্থক করা চলে।

সহজ-প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভের উন্নতি যুগপৎ হওয়া স্বাভাবিক। চিত্রাঙ্কন, সংগীত, শিল্প, অভিনয়, সেবা প্রভৃতির দ্বারা বিবিধ সহজ-প্রবৃত্তি

ও প্রক্ষোভের উদ্‌গতি যুগপৎ হওয়া সম্ভব। বাগান করিয়া ফুল ফুটাইয়া ঘর সাজাইয়া সুন্দর রুচিকে দৈনন্দিন জীবনে দৃঢ় করা যাইতে পারে। এই-সকল কার্যে সৃজন-প্রবৃত্তি চরিতার্থ হইবে; বাগানের মালিকত্বে অধিকারী ভাব তৃপ্ত হইতে পারে, ফুলের শ্রেষ্ঠত্ববোধে যোধন-প্রবৃত্তি সার্থক হইবার সম্ভাবনা আছে এবং সব মিলাইয়া একটি সুরুচি গঠিত হইতে পারিবে।

ক্রীড়া-প্রবণতা (Play-tendency)

সহজ-প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভ ব্যতীত অপর কতকগুলি প্রবণতা দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নশ্রেণীর জীবের ক্ষেত্রে এই সাধারণ প্রবণতাসমূহ আছে কি নাই— বুঝা কঠিন, কিন্তু উন্নত জীবের প্রবণতা স্বতঃপ্রমাণ। ক্রীড়া-প্রবণতা সর্বপ্রথমেই উল্লেখযোগ্য।

উন্নত জীবের শিশুর নিকট খেলাই একমাত্র সজ্ঞাত আচরণ, তাহার কাছে কাজ বলিয়া কিছু নাই। খেলাই কাজ, কাজই খেলা। মানব-শিশুর আচরণ লক্ষ্য করিলেই ইহা বুঝা যাইবে। কিন্তু মানব-শিশু এমন পুণ্য করিয়া আসে নাই যে, সে চিরদিন খেলার জীবন যাপন করিতে পাইবে। বেশিদিন যাইতে না যাইতে সে সমাজের সংঘর্ষে, প্রথমে অস্পষ্টভাবে ক্রমশ বিশদভাবে বুঝিতে শিখিবে কাজ ও খেলার মধ্যে পার্থক্য আছে। প্রয়োজন-অপ্রয়োজন, বাঞ্ছিত-অবাঞ্ছিতর বালাই আছে। অবশেষে কাজ ও খেলা সম্পূর্ণ পৃথক শ্রেণীর আচরণ বলিয়া উপলব্ধি হয়। তখন কর্মজীবন ও ক্রীড়ার বিষঙ্গ (dissociation) ঘটে। শৈশবে ক্রীড়ার দ্বারা দেহ-মনের সম্পূর্ণতা লাভ হইতে থাকে; পরে কর্মজীবনের ক্লেশ হইতে সাময়িক মুক্তি লাভ হয় ক্রীড়ার দ্বারা। মানুষ তাহার সভ্যতার মাপকাঠি যেরূপ করিয়া ফেলিয়াছে, তদনুসারে তাহার সহজ-প্রবৃত্তি ও

প্রক্ষোভ উদ্‌গত হয় নাই। ফলে কর্মজীবনে নানাভাবে সহজ-প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভকে নানা দিক দিয়া দাবাইয়া রাখা হইতেছে। কিন্তু দাবাইয়া রাখার বেদনা কম নহে। ক্রীড়ার ভিতর সেই বেদনা হইতে মুক্তি মিলিতে পারে; মারামারি করা সভ্যতা-বিরুদ্ধ, অতএব যোধন-প্রবৃত্তিকে ক্রীড়া-ক্ষেত্রে জয়-পরাজয়ের দ্বারা তৃপ্ত করিতে হইবে। যে দিক দিয়াই দেখা যাক শৈশবেই হউক অথবা ভবিষ্যতেই হউক, ক্রীড়ার মনস্তাত্ত্বিক প্রয়োজন আছে এবং ক্রীড়া-প্রবণতা অতি স্বাভাবিক ও সহজাত ব্যাপার।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় জীবন ধারণ করিতে ও পুষ্টির জন্য যতখানি শক্তির প্রয়োজন, উন্নত জীবের শক্তি তদপেক্ষা অনেক বেশি থাকে এবং এই অ-ব্যয়িত অতিরিক্ত শক্তি ক্রীড়ার দ্বারা স্বাভাবিকভাবে ব্যবহৃত হয়। উদ্‌বৃত্ত শক্তিই ক্রীড়ার মূল তত্ত্ব। কিন্তু আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতা উদ্‌বৃত্ত শক্তির তত্ত্বকে অস্বীকার করে। যখন কেহ কাজ করিতে করিতে একেবারে ক্লান্ত হইয়া পড়ে, যখন সকল শক্তি নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে মনে হয়, অন্তত যখন উদ্‌বৃত্ত শক্তির কোনো সম্ভাবনাই নাই, তখনো মনোমত খেলার সুযোগ পাইলেই সে ব্যক্তি খেলিতে ছুটে। কাজের শক্তি নাই, অথচ ক্রীড়ার শক্তি আছে। অতএব ক্রীড়ার শক্তিকে 'উদ্‌বৃত্ত' বলা যায় না।

কেহ কেহ অনুমান করেন শিশু ক্রীড়ার দ্বারা অজ্ঞাতসারে নিজেকে ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য প্রস্তুত করিয়া লয়। বিড়ালছানা তাহার মায়ের লেজ লইয়া লাফালাফি করিয়া ভবিষ্যতের আত্মরক্ষা, শিকার-ধরা প্রভৃতির মহলা দিতে থাকে।

ক্রীড়ায় প্রস্তুতি-তত্ত্বর সহিত অনেকে একমত নহেন। তাঁহারা মনে করেন ক্রীড়ার ভিতর দিয়া শিশু তাহার সুদূর অতীতের পূর্ব-পুরুষদের

বিভিন্ন জীবনধারণ-প্রণালী অনুকরণ করিতেছে, অর্থাৎ ক্রীড়ায় জীবের ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ের আবৃত্তি হয় মাত্র। লুকোচুরি খেলিয়া মানব-শিশু অতীতের অরণ্য-জীবনের অনুকরণ করে ; বালু দিয়া পাহাড়, গুহা নির্মাণ করিয়া অতীত গুহা-বাসের আবৃত্তি করে।

অতীতাবৃত্তিও সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য তত্ত্ব নহে। অনেকে ক্রীড়াকে মনের বিরেচন (catharsis) কৌশল বলিয়া বিবেচনা করেন। আমাদের বাস্তব-জীবনে বহু আশা, আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা দমন করিয়া চলিতে হয়। এই-সকল পুঞ্জীভূত আশা, ইচ্ছা প্রভৃতি ক্রীড়ার মধ্যে বিরেচন লাভ করে, পুঞ্জীভূত বেদনা হইতে মন অন্তত কিছুক্ষণ শান্তি পায়, সাময়িক তৃপ্তি পাওয়া যায়।

ক্রীড়ার বিরেচন তত্ত্বের দ্বারা ক্রীড়ার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা মেলে না। তবু ইহার ভিতর একাধিক তত্ত্বের সমন্বয় দেখা যাইতে পারে। যে-সকল সহজ-প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভ দাবাইয়া রাখা হয়, যে-সকল আশা ও ইচ্ছা বাস্তবে অপূর্ণ থাকে, তৎসমুদায় ক্রীড়ার দ্বারা বিরেচিত হয়। ক্রীড়া এইরূপে সমাজ-জীবনের সহিত মনের মিল সাধনে সহায়তা করে ; এই দিক দিয়া ক্রীড়াকে সমাজ-জীবনের জন্য প্রস্তুতি বলা চলে। অপর দিকে, যে-সকল সহজ-প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভ ক্রীড়ার ভিতর প্রকাশিত হইতেছে, তাহা তো এক জীবনের সৃষ্ট নহে ; তাহা সুদূর অতীত হইতে বংশ-পরম্পরায় বাহিত অভিজ্ঞা-চিহ্নের জট। অতএব ক্রীড়ার দ্বারা অতীতাবৃত্তিই তো ঘটিতেছে। এই ভাবে দেখিলে বিরেচন তত্ত্বে প্রস্তুতি ও অতীতাবৃত্তির মিলন পাওয়া যায়।

শিশুদের প্রায়ই কখনো দাদামহাশয়, কখনো 'কানাই মাস্টার', কখনো গাড়ি-চালক হইয়া খেলা করিতে দেখা যায়। খেলিতে খেলিতে তাহারা নিজেদের কাছে সত্য সত্য দাদামহাশয়, কানাই মাস্টার বা গাড়িচালক

হইয়া পড়ে, বাস্তবের সহিত বিষঙ্গ ঘটে, তাহাদের কল্পনার খেলাই বাস্তবে পরিণত হয়। নিদ্রাকালে স্বপ্ন অবলম্বন করিয়া যেমন অতৃপ্ত গূঢ়ৈষা তৃপ্তি লাভ করে, শিশুদের খেলার দিবা-স্বপ্নেও সেইরূপ অতৃপ্ত শিশু-সুলভ সহজ-প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভ বিরেচিত হয়। শুধু খেলার ভিতর দিয়াই নহে, গল্প, কবিতা, নাটক প্রভৃতির দ্বারাও বিরেচন ঘটে। শিশুরা রাক্ষস-বধের গল্প খুব ভালোবাসে। বাস্তব-জীবনে শিশু বারে বারে অভিভাবকের নিকট হইতে বাধা পায়, পলে পলে অভিভাবকের নিকট পরাজিত হয়, তাহার বহু সহজ-প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভ চাপা দিয়া রাখিতে হয়। কিন্তু মনের বাসনা রাম-রাবণের যুদ্ধে রাবণ-বধে কিছুটা তৃপ্তি-লাভ করে। শিশু অজ্ঞাতসারেই অভিভাবককে রাবণের সহিত একাত্মী-ভূত (identified) করিয়া ফেলে এবং নিজে বিজয়ী রাম হইয়া বাস্তবের অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া উপভোগ করে। বাস্তবের অভিভাবক ও শিশুর সম্বন্ধটি রাম-রাবণের বৈরিতায় অভিক্ষিপ্ত (projected) হয়, যাহা চাপা ছিল তাহা মুক্তি পায়।

সমাজ-জীবনের দিক দিয়া সকল সহজ-প্রবৃত্তি বা প্রক্ষোভের অসংযত প্রকাশ অবাঞ্ছিত, অথচ প্রক্ষোভাদি বলপূর্বক দাবাইয়া রাখিলে দেহ-মনের স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত হয়। এই দ্বন্দ্বের সমাধান করিতে হইলে প্রক্ষোভাদির উদ্‌গতি বা বিরেচন প্রয়োজন। তজ্জন্য শিশুর সকল কর্তব্যই ক্রীড়া-গুণসম্পন্ন যাহাতে হয়, সে চেষ্টা করা উচিত। শিল্প, সাহিত্য, সংগীত, অভিনয়, সেবা, আত্মনিয়ন্ত্রণমূলক সভা-সমিতি প্রভৃতি সহজেই ক্রীড়া-জাতীয় বলিয়া শিশুরা গ্রহণ করে এবং এইগুলি প্রক্ষো-ভাদির উদ্‌গতি-সাধন ও বিরেচনের সুযোগ দান করে।

অনুক্রিয়া (Mimesis)

আমরা জানি যে আমরা প্রায়ই অপরের আচরণ অনুকরণ করিয়া থাকি, অপরের চিন্তা অনুসরণ করি, অপরের ভাবে প্রভাবিত হই। কখনো বিচার করিয়া অনুকরণ করি, কখনো বিনা বিচারে করিয়া থাকি; কখনো সচেতনভাবে অপরের কার্য, ভাব বা চিন্তাকে গ্রহণ করি, কখনো সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারেই অনুকরণ করিয়া বসি। সচেতন অনুসরণকে অনুকরণ বলা হয়। সংজ্ঞাত ও নির্জ্ঞাত অনুসরণকে এক কথায় অনুক্রিয়া (Mimesis) বলা যায়।

শৈশব আচরণে সহজ-প্রবৃত্তির প্রাধান্য বেশি, তজ্জন্য শৈশবে অনুক্রিয়া অত্যন্ত স্পষ্ট। খেলিতে খেলিতে কোনো শিশু যদি হঠাৎ শুইয়া পড়ে তাহা হইলে উপস্থিত সকল শিশুরই কম-বেশি শুইয়া পড়িতে ইচ্ছা করিবে। এই শিশু-সুলভ অনুক্রিয়ায় কোনো যুক্তির বালাই নাই, চেষ্টার স্থানও অল্প। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সহিত যুক্তি আসিয়া জোটে, চেষ্টা প্রাধান্য পায়।

সকল অনুক্রিয়ায় আত্মনমন প্রচ্ছন্ন আছে। আত্মনমন যদি একটি সহজ প্রবৃত্তি হয়, তাহা হইলে অনুক্রিয়ায় আত্মনমন চরিতার্থ হইতেছে বলা যায়। অনুকরণে আত্মনমন আছে, যখন ইহা মনে পড়ে তখনই হয়তো আমরা অনুকরণ ত্যাগ করিতে চাহি। তথাপি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অনুক্রিয়ার শত শত প্রমাণ পাওয়া যায়। চলায়, বলায়, আহারে, পোশাকে, বহু দিক দিয়া অনুক্রিয়া স্বতঃপ্রমাণ। সমাজে যে 'ফ্যাশন' চালু হয়, তাহার মূলে রুচির পরিবর্তন নহে, অনুক্রিয়াই তাহার জন্য প্রধানত দায়ী। ভিড়ের মধ্যে একজন ভয় পাইলে অপর সকলে অকারণেই কম-বেশি ভয় পাইবে একজন পলাইলে অপর সকলেই

পলাইবার তাগিদ বোধ করিবে। সফলকাম বক্তা যে যুক্তির দ্বারা শ্রোতৃবর্গের চিন্তাধারা নিয়ন্ত্রিত করেন তাহা নহে; তিনি বাক্যবর্ষণে ও হাবভাবে এমন পরিবেশের সৃষ্টি করেন যে শ্রোতারা অজ্ঞাতসারে তাঁহারই চিন্তাকে আপনার বলিয়া গ্রহণ করিয়া বসে, ইহা অনুক্রিয়ারই দৃষ্টান্ত, যুক্তির নহে। ক্ষুদ্র গৃহকোণে বসিয়া সম্পাদকগণ সংবাদপত্রের যে প্রবন্ধ লিখিতেছেন, তাহাই অভ্রান্ত সত্য বলিয়া বিভিন্ন দল গ্রহণ করিতেছে এবং মারামারি করিতেছে। এই মারামারির মূলে চিন্তা নাই, আছে অনুক্রিয়া।

কাজের ভাবের বা চিন্তার অনুক্রিয়ার ভিতর পারস্পরিক সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। কোনো ব্যক্তির বা জাতির আচরণ নকল করিতে গিয়া আমরা তাহার চিন্তাধারাও অনুকরণ করিয়া বসি। সাহিত্যের ভাষার মাধ্যমে একের দ্বারা অন্যের ভাব ও চিন্তার অনুকরণ অবশেষে আচরণের সাদৃশ্যে পরিণতি লাভ করে। মনীষীরা বলেন বিশ্ব-শান্তির জন্য বিভিন্ন জাতির ভিতর সাংস্কৃতিক যোগ দরকার। সাংস্কৃতিক যোগাযোগে সুবুদ্ধির উন্মেষ যতখানি হইবে অজ্ঞাতসারে অনুক্রিয়া চলিতে থাকায় সুফল তদপেক্ষা বেশি দেখা যাইবে। অপরের ভাব ও চিন্তাকে উপলব্ধি করিতে গিয়া জাতিসমূহ অজ্ঞাতসারে নিজেদের মধ্যে সাদৃশ্য আনয়ন করিয়া ফেলিবেন। এই একান্ত বাঞ্ছিত জাতিসাম্যের মূলে নব জ্ঞান নহে, অনুক্রিয়াই প্রধান।

পথে-ঘাটে সাময়িক ভিড় জনসমাবেশ মাত্র, কোনো জাতি বা রাষ্ট্রও জনসমাবেশ। ভিড়ের মধ্যে কোনো মত বেশ স্পষ্টভাবে, জোরের সহিত ব্যক্ত হইলে সেই মতই অপর সকলের দ্বারা নানা মাত্রায় সমর্থিত হইয়া যায়; রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও কোনো উদ্দেশ্য, কোনো আদর্শ স্পষ্ট, দ্বিধাহীন হওয়া চাই, নহিলে রাষ্ট্রের শক্তি থাকিবে না। ভিড় ক্ষণস্থায়ী, রাষ্ট্র স্থায়ী। ভিড় দুর্বল, রাষ্ট্র শক্তিযুক্ত। সকল জনসমাবেশই

দুর্বল হইয়া যায় যদি তাহাদের উদ্দেশ্য স্পষ্ট ও জোরালো ভাবে ব্যক্ত না হয়, কারণ জনসমাবেশের আচরণ যুক্তি অপেক্ষা অনুক্রিয়া-দ্বারা সংঘটিত হয়। উদ্দেশ্য বা আদর্শ যত স্পষ্ট হইবে, অনুক্রিয়া তত সহজ হইবে, সমাবেশের শক্তি তত বৃদ্ধি পাইবে। দৃঢ় নেতার প্রয়োজন এই-খানে। গৃহীত আদর্শকে স্পষ্টভাবে, সতেজে সাধারণের নিকট উপস্থিত করাই তাঁহার নেতৃত্ব। ইহা যে কেবল রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেই সত্য তাহা নহে, রাষ্ট্র ও সাময়িক ভিড়ের মাঝে যে নানা প্রকার সমিতি সংঘ আছে তাহাদের ক্ষেত্রেও অনুক্রিয়া প্রধান।

শিক্ষা-নিকেতনে শিক্ষকই নেতা। তিনি অনুক্রিয়ার ক্ষেত্র প্রস্তুত করিবেন, পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ করিবেন, সৎ অনুক্রিয়াকে উৎসাহিত করিবেন। সর্বোপরি স্পষ্টভাবে আদর্শকে ছাত্রসমাজে ব্যক্ত করিবেন, স্পষ্টভাবে আদর্শ-অনুসারে আচরণ করিবেন। ছাত্রসমাজ আপনা-আপনিই আদর্শকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া থাকিবে।

মানসিক প্রচয় (Mental Development)

জন্মগত আচরণ-ছাঁদকে মূলধন করিয়া উপযোজন আরম্ভ হয়, আত্ম-সংস্থাপন শুরু হয়। কিন্তু উন্নত জীব অনতিবিলম্বেই মূল আচরণ-ছাঁদকে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত করিয়া বিচিত্রভাবে আচরণশীল হয়। এই নূতন নূতন আচরণ দ্বারা উপযোজনের পথ অধিক হয়, আত্মসংস্থাপন বিভিন্ন ধারায় চলিতে থাকে। তথাপি সম-অবস্থায় যেরূপ আচরণ করায় উপযোজন সম্ভব হয়, তাহা যদি প্রতিবারই ভাবিয়া-চিন্তিয়া, মনে করিয়া, চেষ্টা করিয়া করিতে হয় তাহা হইলে উপযোজনের ক্ষেত্র বিস্তৃত হইতে পারিত না। তজ্জন্য নূতন নূতন আচরণের অভ্যাস-গঠন দরকার।

অভ্যস্ত আচরণে চেষ্টার প্রয়োজন নাই, চিন্তার কিছু নাই, অভ্যাস স্বয়ংক্রিয় ব্যাপার। আজ যাহা চেষ্টা করিয়া করিতেছি, দিনকতক পরে তাহা যদি অভ্যাসে পরিণত হয় তাহা হইলে আমরা ঐ চেষ্টা-শক্তিকে নূতন ক্ষেত্রে নূতন আচরণ শিক্ষায় ব্যবহৃত করিতে পারিব। অতএব যত বিচিত্র সদভ্যাস গঠিত হইবে, আমাদের চেষ্টার দ্বারা তত অধিক উপায়ে উপযোজন সাধন করিতে পারিব।

অভ্যাস-গঠন করিতে হইলে প্রথমেই উপযুক্ত পরিবেশের সৃষ্টি করিতে হইবে এবং উপযুক্তভাবে প্রক্ষোভ উদ্দীপিত করিয়া বেশ ঝোঁকের মাথায় অভ্যাস আরম্ভ করিতে হইবে। নূতন অভ্যাসের ক্ষেত্রে অনুশীলন নিয়মিত হওয়া চাই, কোনোমতে যেন শৈথিল্য না ঘটে। বরং বিনাকারণেও সুযোগ পাইলেই অভ্যাস ঝালাইয়া লইতে হইবে। প্রথমে সরল সহজ-সাধ্য বিষয়ে অভ্যাস-গঠন আরম্ভ করিতে হইবে, তাহার পর জটিল ও কঠিন অভ্যাস গঠন সম্ভব হইবে।

অভ্যস্ত আচরণের মূলে নিজ্ঞাত স্তরের গুচ্ছ বা জট বর্তমান। আমাদের বয়োবৃদ্ধির সহিত যে-সকল রস (sentiment) সৃষ্ট হইতে থাকে, তাহাদেরও মূলে এই জট রহিয়াছে। বৃহত্তর সুসংগঠিত জট লইয়াই রস। কোনো ব্যক্তি, বস্তু, পদার্থ বা যাহা হউক কিছু অথবা ইহাদের ভাবকে কেন্দ্র করিয়া এই বৃহত্তর জট, এই রস সৃষ্ট হয়। রসের বাস্তব-কেন্দ্র যেমন তাহার নিজের রস উদ্দীপিত করিতে পারে, তেমনি বাস্তব-কেন্দ্রটির ভাবও রসকে উদ্দীপিত করিতে পারে। ভাবের দ্বারা উদ্দীপিত হওয়া রসের বৈশিষ্ট্য। যাহাকে ভালোবাসি, তাহাকে দেখিলেই যে আনন্দ পাই, শুধু তাহা নহে; প্রীতি-পাত্রের চিন্তা বা ভাবও (idea) আনন্দ দান করে।

রস আমাদের স্বভাবের অঙ্গীভূত অংশ, মোটামুটিভাবে স্থায়ী অংশ

বলা চলে। ইহা বিভিন্ন প্রক্ষোভ ও অভ্যাসের দ্বারা প্রকাশিত হয়। যে ব্যক্তিকে কেন্দ্র করিয়া প্রীতি-রস সৃষ্ট হইয়াছে, তাহার চিন্তা আনন্দ দেয়, তাহার বিরুদ্ধে কেহ কিছু বলিলে রাগ হয়, হয়তো রাগ করিয়া চেঁচাই, ঘুষি তুলি, তাহার অমঙ্গল চিন্তায় ভীত হই। এই দৃষ্টান্তে প্রীতি-রস যদি কেবলমাত্র একটি প্রক্ষোভে (আনন্দে) প্রকাশিত হইত তাহা হইলে রসের সরল অবস্থা বলা যাইত কিন্তু যে ক্ষেত্রে রস একাধিক প্রক্ষোভে (ক্রোধে, ভয়ে) প্রকাশিত হইতেছে, সেখানে রস জটিল হইয়াছে। অপর দিকে রসের তিনটি স্তর আছে ধরা যায়। কোনো বিশেষ বৈজ্ঞানিককে শ্রদ্ধা করিতে করিতে সকল বৈজ্ঞানিকের প্রতি শ্রদ্ধা আসিয়া যাইতে পারে এবং অবশেষে সকল ব্যক্তিকে অতিক্রম করিয়া বিজ্ঞানকে শ্রদ্ধা করার অভ্যাস আসিযা যাইতে পারে। এইরূপে রস বিশেষ হইতে শ্রেণীতে, শ্রেণী হইতে গুণে কেন্দ্রীভূত হইতে পারে, উন্নীত হইতে পারে।

মনের বিভিন্ন রস পরস্পর বিচ্ছিন্ন বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু তাহারা একটি প্রধান রসকে কেন্দ্র করিয়া সু-সংগঠিত হইয়া থাকে। 'আমি' 'আমার' প্রভৃতি অহংভাবকে কেন্দ্র করিযা অহংরস সৃষ্ট হয়; এই অহংরসই সুসংগঠিত রসসমূহের রস-কেন্দ্র। অহংরসের প্রাধান্যের উপর চরিত্রের দৃঢ়তা নির্ভর করিতেছে। অহংরসের প্রাধান্যে সুসংগঠিত রসসমূহ দৃঢ় চরিত্রর সৃষ্টি করে। কিন্তু দৃঢ় চরিত্র ও উন্নত চরিত্র এক না হইতে পারে। পশু-প্রকৃতি ব্যক্তিও দৃঢ়চরিত্র হইতে পারে। অধিকাংশ রসের ভাবকেন্দ্রগুলি যদি সমাজের বিচারে উচ্চস্তরের হয় তাহা হইলে চরিত্র উন্নত বলিব। ইহা ব্যতীত বাস্তব 'আমি' এবং মনের গোপন কোণের 'আদর্শ আমি' এ দুইএর পার্থক্য আছে। 'আদর্শ আমি' ভাবকে কেন্দ্র করিয়া যে প্রীতি-রস সৃষ্ট হয় তাহাকে আদর্শ বলা চলে।

স্বাদর্শকে বাস্তব চরিত্রে অহংরসের অন্তর্গত করিবার শক্তি বাহির হইতে আসে না, বাস্তব চরিত্রের দৃঢ়তার উপরই সে শক্তি নির্ভর করে।

মনোযোজন (Attention)

সহজ-প্রবৃত্তি ও রসের সহিত মনোযোজনের সম্বন্ধ অতি নিকট। পূর্বে ধারণা ছিল মনোযোজন এক বিশেষ ক্ষমতা, যে এই শক্তির যতখানি পাইয়াছে তাহার পক্ষে সকল সময় সকল বিষয়ে ততখানি মনোযোগ করা সম্ভব হইয়াছে। এখন দেখা যাইতেছে তাহা নহে, ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য-অনুসারে প্রাথমিক বা পরিবর্তিত স্বভাব-অনুসারে মনোযোজনের ক্ষেত্র নির্বাচিত হয়, মনোযোগ কম বা বেশি হয়। মানসিক অবস্থার উপর ইহা নির্ভর করে। যে-সকল বিষয় সহজ-প্রবৃত্তি বা প্রক্ষোভ ও রস উদ্দীপিত করিতে পারে তাহাই মনোযোগের স্বাভাবিক ক্ষেত্র। এই-সকল ক্ষেত্রে চেষ্টার দরকার নাই, ইচ্ছা-শক্তি প্রয়োগের দরকার নাই, মনোযোজন সহজেই হইবে। ইহাকে অনৈচ্ছিক (involuntary) বলা চলে। অন্যান্য বিষয়ে মনোযোজন ঐচ্ছিক (voluntary), কারণ চেষ্টা ও ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ দরকার। ঐচ্ছিক মনোযোজন ক্লান্তিজনক, অনৈচ্ছিক মনোযোজনে ক্লান্তি অত্যন্ত কম। বহু ঐচ্ছিক মনোযোগের বিষয় অনৈচ্ছিক মনোযোগের বিষয়ের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া পড়িলে অনৈচ্ছিকের ন্যায় সহজ মনোযোজন সম্ভব হয়— পরীক্ষার পাঠ ঐচ্ছিক, কারণ সাধারণত যথেষ্ট চেষ্টা ও ইচ্ছাশক্তির প্রয়োজন দেখা যায়। কিন্তু পরীক্ষায় ভালো ফল করাই যদি আত্মসংস্থাপন প্রবৃত্তি চরিতার্থ হইবার বিশেষ পথ হয়, তাহা হইলে পরীক্ষায় মনোযোজন অতি সহজ হইবে, অনৈচ্ছিক হইয়া যাইবে।

ঝোঁক বলিতে আমরা সাধারণত যাহা বুঝি তাহা স্বভাবের অংশ।

যে দিকে ঝোঁক সেই দিকে মন অনৈচ্ছিকভাবেই যোজিত হইবে, যেন ঝোঁকের সক্রিয়তার নাম মনোযোজন। তবে কোনো বিষয়ে ঝোঁক আছে বলিয়াই সেই বিষয়ে মন নিরবচ্ছিন্নভাবে যোজিত থাকিবে, তাহা নহে। নিরবচ্ছিন্নভাবে একই কেন্দ্রে মনোযোগ করা সাধারণভাবে পাঁচ-ছয় সেকেণ্ড মাত্র সম্ভব হয়। ইহা অপেক্ষা অধিক কাল একই কেন্দ্রে মনকে যাঁহারা যোজিত করিয়া রাখিতে পারেন, তাঁহাদের পক্ষে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করা সহজ। সাধারণত মন পাঁচ-ছয় সেকেণ্ড একটি বিষয়ে কেন্দ্রীভূত থাকিয়া সাময়িকভাবে অন্য কোনো বিষয়ে চলিয়া যায় এবং দ্বিতীয় বা তৃতীয় বা চতুর্থ বিষয়কে স্পর্শমাত্র করিয়া আসল প্রথম মনোযোগের বিষয়ে ফিরিয়া আসে এবং আবার কিছুক্ষণ কেন্দ্রীভূত হইয়া থাকে। মনোযোগকর্তা ভাবেন তিনি বুঝি সমস্ত ক্ষণ ধরিয়াই একটি বিষয়ে মনোযোগ করিয়াছেন, তাঁহার মন যে ইতিমধ্যে অন্য বিষয় স্পর্শ করিয়া আসিয়াছে তাহা সাধারণত খেয়াল থাকে না।

স্মৃতি (Memory)

ধৃতিশক্তির প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্মৃতি। স্মৃতিকে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় অনুষঙ্গ (association), ধারণ (retention) ও স্মরণ (recall), এই তিনটি রহিয়াছে। প্রতি ক্ষণের অভিজ্ঞা-চিহ্নসকল নানা ভাবে অনুষঙ্গিত হইতেছে, বারবার একই জাতীয় আচরণ দ্বারা, আবৃত্তির দ্বারা এই অনুষঙ্গ দৃঢ় হইতেছে। অভিজ্ঞা-চিহ্নসমূহ অনুষঙ্গিত হইয়াই সঙ্গে সঙ্গে নিঃশেষ হইয়া যাইতেছে, তাহা নহে; তাহারা জটভাবে থাকিয়া যাইতেছে, মন তাহাদিগকে ধারণ করিতেছে। তাহার পর ইচ্ছানুসারে সচেতন স্তরে জটগুলিকে আনয়ন করিতেছে, জটগুলিকে স্মরণ করিতেছে। স্মৃত জটগুলিই আবার অভিজ্ঞাত হইতেছে। এইরূপ অতীতকে বর্তমানের

চিন্তা, ইচ্ছা ও কার্যের জন্য ব্যবহার করা সম্ভব হয়।

স্মৃতির দুইটি পরিচয় বলা চলে— অব্যবহিত ও দূর। কেহ দু-একবার কোনো দীর্ঘ কবিতা শুনিয়াই তখন-তখনই নির্ভুল ভাবে বলিয়া দিতে পারেন, অথচ কিছুকাল পরে তাঁহার আর মনে থাকে না। এক্ষেত্রে অব্যবহিত স্মৃতি প্রখর কিন্তু ধারণ-শক্তি কম। কাহারও দু-একবারে কিছু হয় না, বহুবার শুনিলে তবে মনে থাকে কিন্তু একবার মনে গাঁথা হইলে সুদীর্ঘকাল তিনি ভুলিবেন না। ইঁহার ধারণশক্তি আছে, দূর স্মৃতি প্রখর কিন্তু অব্যবহিত স্মৃতি দুর্বল। শৈশবে অব্যবহিত স্মৃতি সাধারণত দুর্বল থাকে, বয়সের সহিত ক্রমশ বাড়ে, যৌবনারম্ভে দুই-এক বৎসর দ্রুত বৃদ্ধি দেখা যায়, তাহার পরই কমিতে থাকে। ধারণশক্তি শৈশবেই প্রখর থাকে, যৌবনারম্ভের পূর্ব হইতেই কমিতে থাকে। তজ্জন্য যাহা সুদীর্ঘকাল মনে রাখিতে হইবে তাহা শৈশবেই শিক্ষণীয়।

অনুশীলন দ্বারা স্মৃতির ধারণশক্তি উন্নত করা যায় না। অব্যবহিত স্মৃতি চেষ্টার ফলে উন্নত হয় না, তবে কেহ কেহ উন্নতি সম্ভব মনে করেন। অনুশীলন দ্বারা স্মৃতি-শক্তির বৃদ্ধি হউক আর নাই হউক, উপযুক্ত পরিবেশের দ্বারা স্মৃতির কার্যকে দ্রুত ও স্থায়ী করা সম্ভব। মন যখন অ-ক্লান্ত, সতেজ থাকে তখন স্মৃতির কার্য দ্রুত ও স্থায়ী হয়, ক্লান্ত মনে বিপরীত ফল দেখা যায়। স্মৃতির কার্যে যুক্তির অবকাশ থাকিলে শিক্ষণীয় বিষয়টি বেশ বুঝিয়া লইতে পারিলে এবং বিষয়টির বিভিন্ন অংশগুলির ভিতর পরস্পর স্বাভাবিক যোগ আছে বুঝিতে পারিলে স্মৃতির কার্য আরও সহজ ও স্থায়ী হইবে। অর্থহীন বিষয় অপেক্ষা মনোমত এবং অর্থপূর্ণ বিষয় মুখস্থ করা সহজ। যে বিষয়ে শিক্ষার্থীর ঝোঁক আছে সেই দিকে মনোযোজন সহজ এবং সেই দিকে স্মৃতির কার্যও ভালো হইবে। যে বিষয়টি মনে আনন্দদায়ক সেই বিষয়ে মন আপনা-আপনি বারে

বারে যোজিত হইতে থাকে, ফলে বিষয়টি মনে সহজেই ধৃত থাকে। কোনো বিষয়, কোনো ভাব মনে অত্যন্ত বেদনা দিতে থাকিলে মনের বেদনা অসহ্য হইয়া পড়িলে সে বিষয়, সে ভাব স্মৃতিতে থাকিতে পারে না। মন নিজেই উহাকে সচেতন স্তর হইতে স্মৃতি হইতে এমন করিয়া অচেতন স্তরে অবদমন করে যে তাহা চেষ্টা করিলেও স্মরণ করা যায় না। অবদমন-জনিত বিস্মরণ ব্যতীত অধিক কাল অনুশীলনের অভাবে বিস্মৃতি ঘটে।

বুদ্ধি (Intelligence)

মনোবিদ্যায় 'বুদ্ধি' বলিতে কী বুঝিতে হইবে এই লইয়া অনেক তর্ক আছে। কেহ বলেন বুদ্ধি স্নায়ুতন্ত্রের ধর্ম ব্যতীত আর-কিছু নহে। কাহারো মতে বুদ্ধি শিক্ষাসামর্থ্যের নামান্তর মাত্র। বিখ্যাত আচরণবাদী থর্নডাইক (E. L. Thorndike) বুদ্ধিকে কতকগুলি সামর্থ্যের সমষ্টি বলিয়া মনে করেন। তাঁহার মতে জন্মগত 'সাধারণ' সামর্থ্য বলিয়া কোনো মূল শিক্ষাসামর্থ্য নাই। কিন্তু বহু বৎসর ধরিয়া গবেষণার পর স্পিয়ারম্যান (C. E. Spearman) একটি সাধারণ মানসিক সামর্থ্যর (general mental ability) অস্তিত্ব ঘোষণা করিয়াছেন। এই জন্মগত সাধারণ শিক্ষাসামর্থ্যটির তিনি নাম দিয়াছেন 'জি' ('G')। এই সাধারণ সামর্থ্য 'জি'র দ্বারা আমরা কোনো কিছু সম্বন্ধে সজ্ঞান (aware) থাকিতে পারি, বিষয়টির গুণাগুণ বোধ করি এবং নিজেদের সজ্ঞানতা সম্পর্কেও সচেতন থাকি।— একটি ঘণ্টা বাজিল, আমরা 'জি'র দ্বারা টের পাইলাম যে ঘণ্টা বাজিতেছে এবং আমরা যে ঘণ্টা বাজা টের পাইতেছি ইহাও বুঝিতেছি। ঘণ্টাধ্বনি মিষ্ট লাগিল, ঘণ্টার মিষ্টত্বগুণ বুঝিতেছি এবং আমরা যে ঘণ্টাধ্বনির মিষ্টত্ব বুঝিতেছি সে দিকেও

সজ্ঞান রহিয়াছি। এইরূপ সজ্ঞানতা ও বুঝিতে পারা 'জি'র পরিচায়ক। দ্বিতীয়ত আমরা 'জি'র দ্বারাই একাধিক বিষয়ের ভিতর ইহা ছোটো উহা বড়ো, এইটি সিধা ঐটি বাঁকা প্রভৃতি নানারূপ সম্বন্ধ ধরিতে পারি। তৃতীয়ত আমাদের জ্ঞান বা অভিজ্ঞতাকে নানা সম্বন্ধে যুক্ত করিয়া নূতনজ্ঞান লাভ করিতে পারি। ফুটন্ত জলের কেতলির ঢাকুনি উঠানামা করিবার মূলে বাষ্প রহিয়াছে; ঢাকুনি ও বাষ্পের মধ্যে যে বাষ্প-চাপের সম্বন্ধ রহিয়াছে তাহা 'জি'র দ্বারা বোঝা সম্ভব হয় এবং এই বাষ্প-চাপের সম্বন্ধ লইয়া নূতনক্ষেত্রে বাষ্পকে যুক্ত করিয়া এন্‌জিন আবিষ্কার 'জি'রই প্রমাণ।

আমরা এই জন্মগত সাধারণ সামর্থ্য 'জি'কেই বুদ্ধি বলিব। স্পিয়রম্যান যে কেবল 'জি'র কথাই বলিয়াছেন তাহা নহে। শিক্ষার বা আচরণের এক-এক দিকে এক-একটি বিশেষ সামর্থ্য থাকিতে পারে; অর্থাৎ মোট মানসিক শক্তিকে দুইভাগ করিয়াছেন। প্রথম ভাগ 'জি', অপর ভাগে বহু বিশেষ সামর্থ্য (specific ability)। আমরা বিশেষ সামর্থ্যকে 'বুদ্ধি' বলিয়া ধরিব না।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যেমন দৈহিক শক্তি বাড়িতে থাকে কিন্তু সাধারণত যৌবন পর্যন্ত বাড়িয়া আর বাড়ে না, সেইরূপ 'জি'ও সাধারণত ১৫।১৬ বৎসর বয়স পর্যন্ত বাড়ে, তাহার পর আর বাড়ে না। অসাধারণ বুদ্ধি-ক্ষেত্রে 'জি' ১৯।২০ বৎসর পর্যন্ত বৃদ্ধির সময় পাইতে পারে।

এখন শিক্ষার প্রগতি বা আচরণের বৈচিত্র্যের সহিত 'জি'র কী সম্বন্ধ তাহা দেখা যাইতে পারে।

জন্মমাত্রই জীবের সকল সামর্থ্য (ability) ব্যক্ত হয় না, ক্রমশ উপযোজনের প্রয়োজনে অব্যক্ত শক্তি ব্যক্ত হইতে থাকে। জীবের জন্মগত আচরণ-ছাঁদ ক্রমশ বিকশিত হয়, জটিল হয়, জীবের আচরণে

বৈচিত্র্য ঘটে। কিন্তু সামর্থ্যের সীমা নির্দিষ্ট আছে, পুরাপুরি উপযুক্ত পরিবেশেও কোনো দিকের সামর্থ্য অসীম নয়, ইহাই মনোবিদের নিশ্চিত ধারণা এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। তথাপি আচরণের বৈচিত্র্য-সাধন, শিক্ষার প্রসার, বিভিন্ন দিকে সামর্থ্যের প্রকাশ জীবের বুদ্ধির উপর নির্ভর করে, বুদ্ধি যেন ইহাদের সীমা টানিয়া দেয়।

জীবের সকল শিক্ষায় বুদ্ধির প্রয়োজন ও প্রভাব দেখিয়া মনোবিদ্‌রা প্রথম ভাবিয়াছিলেন যে বুদ্ধিই একমাত্র মূল সামর্থ্য, মনোরাজ্যে বুদ্ধিরই রাজত্ব। যাহার যত বুদ্ধি তত শিখিতে পারিবে এবং যে দিকে ইচ্ছা করিবে সেই দিকেই শিখিতে পারিবে। যাহার বুদ্ধি যত কম তাহার সকল দিকেই শিক্ষার প্রসার কম হইবে।

কিন্তু অনতিবিলম্বে দেখা গেল, যে গণিতে খুব ভালো, তাহার ভাষাজ্ঞান অত্যন্ত কম থাকিতে পারে। সংগীতজ্ঞ হইতে হইলে বুদ্ধির খুব প্রয়োজন বোধ হয় না, অপর পক্ষে গণিত-বিশারদ্ সংগীতে অসমর্থ হইতে পারেন। অতএব অনুমান করা হইল, সামর্থ্যের কয়েকটি দল আছে, শ্রেণী-বিভাগ আছে। ইহারা সকলেই মনোরাজ্যে প্রধান। পূর্বে অনুমিত বুদ্ধির মতো একচ্ছত্রাধিপতি কোনো সামর্থ্য-শ্রেণীই নহে। মনকে এইরূপে সংগীত-সামর্থ্য, চিত্র-সামর্থ্য, গণিত-সামর্থ্য প্রভৃতিতে ভাগ করা হইল। প্রত্যেক শ্রেণীর সামর্থ্য অপর সামর্থ্য হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, পরস্পর পরস্পরের প্রতি কোনোরূপেই প্রভাব বিস্তার করে না।

অপর মনোবিদ্‌রা মনে মাত্র কয়েকটি সামর্থ্য-শ্রেণী আছে, ইহা বিশ্বাস করিলেন না। তাঁহারা মানুষের বহুবিধ আচরণের ও শিক্ষার দিক আছে বুঝিয়া প্রতি দিকে এক-একটি সামর্থ্যের অস্তিত্ব আছে কল্পনা করিলেন। মনের এই অসংখ্য সামর্থ্যগুলি পরস্পরের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত বলিয়া অনুমান করা হইল।

বর্তমানে অগ্রগামী গবেষকদের মতে বুদ্ধি একচ্ছত্রাধিপতি মনোরাজ না হইলেও বুদ্ধির প্রভাব জীবের সকল প্রকার আচরণে, সকল শিক্ষায় লক্ষিত হয়। অতএব যে যত বুদ্ধিমান, তাহার পক্ষে সকল দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্মগত সুবিধা তত বেশি। কিন্তু প্রখর বুদ্ধি থাকিলেও সব দিকে সমান শিক্ষা সম্ভব নহে; যে দিকে বিশেষ সামর্থ্য (specific ability) আছে, সেই দিকেই অগ্রগতি বেশি হইবে। কারণ, বুদ্ধির সহিত জীবের বিশেষ বিশেষ সামর্থ্যও কমবেশি বর্তমান। অতএব বহু প্রকার বিশেষ সামর্থ্য আছে এবং এই-সকল সামর্থ্যের উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছে বুদ্ধি। মন এই বুদ্ধি ও বিশেষ সামর্থ্য সমুদায়ের সমন্বয়। প্রতি বিশেষ সামর্থ্য যে বুদ্ধির উপর সমভাবে নির্ভরশীল তাহা নহে, বিমান-পরিচালনার বিশেষ সামর্থ্য বুদ্ধির উপর যতটা নির্ভর করে, সংগীত-শিক্ষার সামর্থ্য ততটা নহে।

বুদ্ধি ও বিশেষ সামর্থ্য মাপিবার কৌশল আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই-সকল কৌশল গবেষকদের সাধনার ফলে ক্রমশ সম্পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে, মাপন নির্ভুল হইবার আশা আছে। কেবল যে বুদ্ধি-মাপন চলিতেছে তাহা নহে, স্বভাব ঝোঁক চরিত্রের দৃঢ়তা মাপা হইতেছে।

বংশগতি (Heredity) ও পরিবেশ (Environment)

জন্মগত বুদ্ধি, বিশেষ সামর্থ্য, আচরণ-ছাঁদ প্রভৃতি লইয়া জীব পরিবেশের সহিত উপযোজন শুরু করে। পরিবেশের দ্বারা জীবের অব্যক্ত শক্তি ব্যক্ত হয়। জীবনের বিকাশে বংশগতি ও পরিবেশ উভয়েরই প্রয়োজন, একের অবর্তমানে অপরটি ব্যর্থ। কিন্তু জীবন-বিকাশে বংশগতির মূল্য বেশি, না, পরিবেশের প্রাধান্য বেশি এই লইয়া বহুদিন হইতে তর্ক চলিয়া আসিতেছে, এখনও মীমাংসা হয় নাই। কেহ বলেন বংশগতিই সব,

পরিবেশের প্রভাব অতি সামান্য। কেহ বলেন পরিবেশই সব, বংশগতি কল্পনার দ্বারা অতিরঞ্জিত।

এইরূপ মতবিরোধের মূলে যে দৃষ্টিভঙ্গী রহিয়াছে তাহা যান্ত্রিকতার দোষে দুষ্ট। বংশগতি ও পরিবেশ, উভয়কে জীব নিজের স্বাতন্ত্র্য অনু-সারে ব্যবহার করিয়া আপনার জীবন বিকশিত করে, কেবলমাত্র বংশগতির দ্বারা ও পরিবেশের দ্বারা জীবের জীবত্ব নিয়ন্ত্রিত ও পরি-চালিত হয় না।

তথাপি জীবকে স্বাতন্ত্র্যপরায়ণ-রূপে বিবেচনা করিলেও বংশগতি বা পরিবেশের মূল্য অস্বীকার্য নহে। জন্মগত সামর্থ্য প্রভৃতির বিকাশ যথাসাধ্য সম্পূর্ণ করিতে হইলে পরিবেশের উপর নজর দিতে হইবে, পরিবেশকে যথোপযুক্ত করিতে হইবে। বিশেষ করিয়া শিশুর ক্ষেত্রে ইহা অত্যন্ত সত্য। শিশুর জীবনে উপযুক্ত পরিবেশের প্রয়োজন এত বেশি যে তৎসম্পর্কে অত্যুক্তি করা যায় না। শিশুর কাঁচা অভিজ্ঞতাকে ও শিক্ষামুখী সামর্থ্যকে পরিবেশ যত সহজে গড়িয়া তুলিতে পারে, পাকা ও দৃঢ় অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বয়স্ক ব্যক্তিকে তাহা পারে না। ইহা ছাড়া, পরিবেশ-নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত বাহির হইতে আমরা কিছু করিতেও পারি না। আমরা জন্মগত সামর্থ্যকে বাড়াইতে বা কমাইতে পারি না, কেবলমাত্র তাহার বিকাশকে পরিবেশ দ্বারা সহজ করিতে পারি বা ব্যাহত করিতে পারি। এইজন্য পরিবেশকে উপযুক্ত করিবার জন্য মনের প্রকৃতি জানা দরকার, মনোবিদ্যা সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা দরকার। বর্তমান জগতে কেবলমাত্র আনন্দের জন্যই যে মনোবিদ্যার চর্চা চলিতেছে তাহা নহে, দৈনন্দিন জীবনে মনোবিদ্যার ব্যবহার ক্রমশই বাড়িতেছে।

বাংলার উচ্চশিক্ষা

[illegible]



বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা

প্রকাশ ১৩৬০ ফাল্গুন

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ। সংখ্যা ১০৪

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী। ৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা
মুদ্রাকর শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য
শৈলেন প্রেস। ৪ সিমলা স্ট্রীট। কলিকাতা
৩.১

সূচীপত্র

মলাট-চিত্র। হিন্দু কলেজ। আনুমানিক ১৮৪৭ সালে অঙ্কিত চিত্র হইতে

ভূমিকা

উচ্চশিক্ষা বলিতে আমরা এখানে ইংরেজি শিক্ষাই বুঝিব।

বাংলাদেশে ব্রিটিশের অধিকার স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালিরা নানা ভাবে ইংরেজের সংস্পর্শে আসিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু নিয়মমত ইংরেজি শিক্ষার জন্য তাঁহারা ১৮১৬ সনের পূর্বে সচেষ্ট হন নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকেই কিন্তু বিলাতে সার্ চার্লস গ্রাণ্ট ইহার সপক্ষে আন্দোলন শুরু করিয়া দিয়াছিলেন। এদেশে কোম্পানির কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি ১৭৯০ সনে বিলাতে যান এবং সেখানে দুইটি বিষয়ে আন্দোলন উপস্থিত করেন। প্রথমটি হইল ভারতবর্ষে খ্রীস্টান পাদ্রীদের অবাধ প্রবেশাধিকার, আর দ্বিতীয়টি—ভারতবাসীদের মধ্যে "আলো ও জ্ঞান" ("light and knowledge") বিকীরণের জন্য ইংরেজির মাধ্যমে শিক্ষার বহুল প্রচলন। ১৭৯৩ সনে কোম্পানির নূতন সনন্দ আইনের ভিতরে যাহাতে এই বিষয় দুইটি সন্নিবিষ্ট হয় সেইজন্য ইহার পূর্ব বৎসর, ১৭৯২ সনে, তিনি নেতৃস্থানীয় ইংরেজ ও পার্লামেণ্ট-সদস্যদের অবগতির জন্য একখানি পুস্তিকা প্রচারিত করিয়াছিলেন। তাঁহার এই কার্যে প্রধান সমর্থক ছিলেন সার্ উইল্‌বারফোর্স। এই প্রস্তাব লইয়া পার্লামেণ্টে বিতর্ক উপস্থিত হইলে তখন কোনো কোনো সদস্য বলিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষে ইংরেজি স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে একদিন যুক্তরাষ্ট্রের মত ইহা হাতছাড়া হইয়া যাইবে। কর্তৃপক্ষ উভয় প্রস্তাবেরই বিরোধী থাকায় তখন কার্যকরী ভাবে সনন্দ আইনে স্থান লাভ করে নাই। তবে এই আন্দোলনে কিন্তু ছেদ পড়ে নাই। গ্রাণ্ট ১৭৯৭ সনে পুনরায় তাঁহার পুস্তিকাখানির মর্ম কোম্পানির ডিরেক্টর-সভার নিকট পেশ করেন।

ওদিকে এদেশে ও বিলাতে ইংরেজদের মধ্যে আর-এক শ্রেণীর লোক দেখা দিলেন, যাঁহারা প্রাচ্যবিদ্যা তথা সংস্কৃত আরবি ফারসির বিশেষ পক্ষপাতী।

কোম্পানির আমলের প্রথম দিকে কর্তৃপক্ষ নিজ প্রয়োজনে কলিকাতা মাদ্রাসা (১৭৮১), বারানসীতে সংস্কৃত কলেজ (১৭৯২) এবং কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ (১৮০০) স্থাপন করেন। নানা কারণে প্রাচ্য বিদ্যার সুষ্ঠু কেন্দ্ররূপে এগুলি গড়িয়া উঠিবার অবকাশ পায় নাই। সরকারী ঔদাসীন্য হেতু এসব বিদ্যার অনুশীলন ও উৎকর্ষ সাধনে বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে। কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি এইসকল সাহিত্যের অনুশীলনে আত্মনিয়োগ করেন বটে, কিন্তু ইহাদের সংরক্ষণ ও উন্নতির পক্ষে উহা মোটেই যথেষ্ট ছিল না। প্রাচ্যবিদ্যায় সুপণ্ডিত হেনরী টমাস কোলব্রুক সরকারী কার্য হইতে অবসর লইয়া বিলাত যান ও সেখানে কর্তৃপক্ষীয় ব্যক্তিদের মধ্যে স্থানলাভ করেন। এখানে বড়লাট লর্ড মিণ্টোও প্রাচ্যবিদ্যার বিশেষ সমর্থক ছিলেন। তিনি ১৮১১ সনের ৬ই মার্চ একটি সরকারী 'মিনিটে' প্রাচ্যবিদ্যার সংরক্ষণে ইংরেজ জাতির যে একটি বিশেষ দায়িত্ব আছে তাহার উল্লেখ করিয়া বিশদ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিলেন।

১৮১৩ সনে সনন্দ আইন নূতন করিয়া বিধিবদ্ধ হইবার কথা। ইহার পূর্বেই কোলব্রুক মন্ত্রীসভায় স্থান পাইয়াছেন, মিণ্টোর মিনিটও তখন তাঁহাদের হস্তগত। ১৭৯২ সন হইতে আরব্ধ আন্দোলন এই সময়ে নূতন আকারে দেখা দিল। তাই কর্তৃপক্ষ ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার এবং প্রাচ্যবিদ্যা সংরক্ষণ ও অনুশীলন এই দুই মতবাদের কতকটা সামঞ্জস্য বিধান করিয়া ১৮১৩ সনের সনন্দ আইনে একটি ধারা[১] জুড়িয়া দিলেন। ইহাতেও কিন্তু প্রাচ্যবিদ্যার অনুশীলনের দিকেই কর্তৃপক্ষের অধিকতর ঝোঁক বুঝা গেল। এদেশের শিক্ষাও যে একটি সরকারী দায় এই সময় হইতে আইন দ্বারা তাহাও স্বীকৃত হইল।

---

১ ধারাটি এখানে হুবহু উদ্ধৃত হইল :

"It shall be lawful for the Governor-General in Council to direct that out of any surplus which mav remain of the rents,

সনন্দোক্ত ধারাটির দুই অংশ। প্রথম অংশে বলা হয় যে, সাহিত্যের পুনঃ-প্রচার ও পণ্ডিতদের উৎসাহদান এবং এদেশবাসীদের মধ্যে বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রবর্তন ও উন্নতিসাধন কল্পে বৎসরে উদ্বৃত্ত রাজস্ব হইতে অন্যূন এক লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে হইবে। দ্বিতীয় অংশ হইতে জানা যায় যে, এই উদ্দেশ্যে বাংলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে যেসব বিদ্যালয় বা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইবে সেগুলি সপরিষদ বড়লাট কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইবে। তবে এই-সকল প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপক বা কর্মী নিয়োগের ভার সেই সেই অঞ্চলের কর্তৃপক্ষের উপরই ন্যস্ত থাকিবে। ১৮১৪ সনের ৩রা জুন ডিরেক্টর-সভা উক্ত ধারার ব্যাখ্যামূলক একটি নির্দেশপত্র বড়লাট হেস্টিংসকে (লর্ড

---

revenues, and profits arising from the said territorial acquisitions, after defraying the expenses of the military, civil and commercial establishments and paying the interest of the debt, in manner hereinafter provided, a sum of not less than one lac of rupees in each year shall be set apart and applied to the revival and improvement of literature and the encouragement of the learned natives of India, and for the introduction and promotion of a knowledge of the sciences among the inhabitants of the British territories in India ; and that any schools, public lectures, or other institutions, for the purposes aforesaid, which shall be founded at the presidencies of Fort William, Fort St. George, or Bombay, or in any other part of the British territories in India, in virtue of this Act shall be governed by such regulations as may from time to time be made by the said Governor-General in Council ; subject nevertheless to such powers as are herein vested in the said board of Commissioners for the affairs of India, respecting colleges and seminaries : Provided always, that all appointments to offices in such schools, lectureships and other institutions, shall be made by or under the authority of the governments within which the same shall be situated."

ময়রা) পাঠান। ইহাতে প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার উদ্দেশ্য এবং বিভিন্ন বিভাগে অর্থব্যয়ের আশু প্রয়োজনীয়তার বিষয়ের উল্লেখ থাকে। লর্ড হেস্টিংস এই নির্দেশপত্র মানিয়া লইলেও, জনশিক্ষার প্রসারকল্পে গবর্নমেণ্টের ইতি-কর্তব্য সম্বন্ধে ১৯১৫ সনের ২রা অক্টোবর তারিখের একটি মিনিটে বিশদভাবে আলোচনা করেন। কিন্তু কি প্রাচ্যবিদ্যা ও জনশিক্ষা কোনো বিভাগের কর্মে সরকারকে পরবর্তী দশ বৎসরকাল তেমন আগ্রহ প্রকাশ করিতে দেখি না।

উচ্চশিক্ষার আয়োজন

কিন্তু এই সময়ের (১৮১৫-২৩) মধ্যে উচ্চশিক্ষা তথা ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তনের জন্য বেসরকারী আয়োজন শুরু হইল। ইংরেজ, ফিরিঙ্গী ও বাঙালির কলিকাতায় কয়েকটি পাঠশালা বা স্কুল স্থাপন করেন। কিন্তু ইহাদের প্রায় সবই নিতান্তই কাজ-চালানো গোছের ছিল। কতকগুলি ইংরেজি শব্দ মুখস্থ করার পর এখানকার শিক্ষা সমাপ্ত হইত। এরূপ অল্পশিক্ষায় পরস্পরের ভিতরে ভাবের আদান-প্রদান সম্ভবপর ছিল না, পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা বা আহরণ তো দূরের কথা। কলিকাতায় ও উপকণ্ঠে উন্নত ধরনের পাঠশালা স্থাপন করিয়া তাহাতে বাংলার মাধ্যমে শিক্ষাদানের আয়োজন করেন খ্রীস্টান পাদ্রীরা। মাতৃভাষার মাধ্যমে জনচিত্তে খ্রীস্টতত্ত্ব সহজে বদ্ধমূল হইতে পারে— এই ধারণার বশবর্তী হইয়াই যে তাঁহারা এরূপ পাঠশালা প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী হন তাহার প্রমাণ আছে। আবার, তাঁহারা ইংরেজি স্কুল প্রতিষ্ঠায় যে প্রথম প্রথম উৎসুক হন নাই, তাহার মূলে হয়তো রাজনৈতিক কারণও ছিল।

যাহা হউক, ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণের চেষ্টা কি খ্রীস্টান পাদ্রী কি ইংরেজ সরকার কাহারো দ্বারা প্রথমে হয় নাই।

ইহার মূলে বাঙালি প্রধানদের এবং সুবিজ্ঞ সংস্কৃতবিদ্ পণ্ডিতগণের যথেষ্ট প্রেরণা রহিয়াছে। আজ এ কথা কাহারো অবিদিত নাই যে, সমগ্র ভারতবর্ষে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা দ্বারাই সর্বপ্রথম এইরূপ ইংরেজি শিক্ষার গোড়াপত্তন হয়। ডেভিড হেয়ার হিন্দু কলেজের পরিকল্পনা রচনা করিয়া হিন্দু প্রধানদের হাতে দেন। এইরূপ একটি বিদ্যালয়ের অভাব তাঁহারা কিছুদিন যাবৎ অনুভব করিতেছিলেন। উক্ত পরিকল্পনার মধ্যে ইহার স্পষ্ট রূপ লক্ষ্য করিয়া বিদ্যালয়স্থাপনে তাঁহারা উদ্যোগী হইলেন। এইরূপ একটি সাধু প্রস্তাব যাহাতে আশু কার্যে পরিণত হয় সেজন্য দেওয়ান বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সার্ এড্ওয়ার্ড হাইড ঈস্টকে ধরিলেন। ঈস্ট সাহেবের আমন্ত্রণে ১৮১৬ সনের ১৪ই মে বহু মান্যগণ্য হিন্দু ও সুবিখ্যাত পণ্ডিত সভায় সমবেত হইয়া উক্ত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করিলেন। সভায় রামমোহন রায়ের কথা উঠিল বটে, কিন্তু একজন প্রতিষ্ঠাপন্ন ব্রাহ্মণ এই বলিয়া ভীষণ আপত্তি জানাইলেন যে, তিনি হিন্দুধর্মের বিরোধী সুতরাং তাঁহাকে বাদ দিয়াই তাঁহাদিগকে এ কার্যে অগ্রসর হইতে হইবে।

হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার কথা যে প্রথম হইতেই রামমোহন জানিতেন এবং ইহার প্রতিষ্ঠায় তাঁহার সার্থক সমর্থন ছিল ইহারও যথেষ্ট প্রমাণ আছে। কলেজের সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট থাকিলে হিন্দু প্রধানগণের আপত্তিহেতু ইহার প্রতিষ্ঠায়ই বিঘ্ন ঘটিতে পারে, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া তিনি ইহা হইতে সরিয়া দাঁড়াইলেন। বস্তুতঃ ইংরেজি শিক্ষার জন্য একটি উন্নত ধরনের বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠার কথা তৎকর্তৃক আহূত একটি বৈঠকে ডেভিড হেয়ার ১৮১৫ সনে সর্বপ্রথম উত্থাপন করিয়াছিলেন রামমোহনের ব্রহ্মসভা তথা বেদান্ত বিদ্যালয় স্থাপন প্রস্তাবের সংশোধনী রূপে।

একই স্থলে দ্বিতীয় সভা হয় পরবর্তী ২১শে মে। প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের নাম স্থির হইল 'হিন্দু কলেজ'। এই অধিবেশনে বিদ্যালয় সম্পর্কে যাবতীয় ব্যবস্থা করিবার জন্য দশ জন ইউরোপীয় এবং কুড়ি জন হিন্দু সদস্য লইয়া একটি কমিটি গঠিত হইল। ইউরোপীয় সদস্য ছিলেন সার্ এড্ওয়ার্ড হাইড ঈস্ট, জন

হার্বার্ট হেরিংটন, ডব্লিউ. সি. ব্লাকিয়ার, জে. এইচ. টেলর, হোরেস হেম্যান উইলসন, এন্. ওয়ালিচ, উইলিয়ম ব্রাইস, ডি. হিমিং, টমাস রোবাক, ফ্রান্সিস্ আর্ভিন। হিন্দু সদস্যগণের নাম : পণ্ডিত চতুর্ভুজ ন্যায়রত্ন, সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রঘুমণি বিদ্যাভূষণ, তারাপ্রসাদ ন্যায়ভূষণ, গোপীমোহন ঠাকুর, হরিমোহন ঠাকুর, গোপীমোহন দেব,[১] জয়কৃষ্ণ সিংহ, রামতনু মল্লিক, অভয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামদুলাল দে (সরকার), রাজা রামচাঁদ, রামগোপাল মল্লিক, বৈষ্ণবদাস মল্লিক, চৈতন্যচরণ শেঠ, শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রাধাকান্ত দেব, রামরত্ন মল্লিক, কালীশঙ্কর ঘোষাল। ১১ই জুন কমিটির যে অধিবেশন হয় তাহাতে ইউরোপীয় সদস্যগণ কলেজ প্রতিষ্ঠা-কার্যে প্রত্যক্ষ ভাবে সাহায্য করিতে সমর্থ হইবেন না বলিয়া জ্ঞাপন করিলেন। তবে তাঁহারা আশ্বাস দিলেন যে, ব্যক্তিগত ভাবে যতটা সম্ভব সাহায্য করিতে তাঁহারা বিরত হইবেন না। কলেজের নিয়মকানুন পরবর্তী আগস্ট মাসে স্থিরীকৃত হইল। কলেজ প্রতিষ্ঠাকল্পে কলিকাতার ধনাঢ্য পরিবারগুলি একে একে বিস্তর অর্থ দিবার অঙ্গীকার করিলেন। বর্ধমানের মহারাজা তেজচাঁদ বাহাদুর তের হাজার টাকা দান করিলেন। প্রথম সভা হইবার অল্পকালের মধ্যেই লক্ষাধিক টাকার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেল। বড়লাটের বিশেষ অনুমতি লইয়া ক্যাপ্টেন ফ্রান্সিস আর্ভিনকে কলেজের ইউরোপীয় সম্পাদক পদে নিয়োগ করা হয়। দেশীয় সম্পাদক হইলেন দেওয়ান বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়। কলেজের দুইটি বিভাগ— স্কুল বা পাঠশালা এবং অ্যাকাডেমি বা মহাবিদ্যালয়। তবে স্কুল-বিভাগের কার্যারম্ভ করাই আগে ধার্য হয়।

শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের মধ্যে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য স্বতঃই মুখ্যস্থান লাভ করে। ইংরেজি ছাড়া বাংলা, সংস্কৃত এবং ফারসি ভাষা শিক্ষারও ব্যবস্থা হইল। পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানাদি ইংরেজির মাধ্যমেই শেখানো সাব্যস্ত হয়। এজন্য শিক্ষকগণ নিযুক্ত হইলেন। প্রধানশিক্ষকের পদে বৃত হন চন্দননগর-নিবাসী জেম্স আইজাক ডি'আন্সেল্ম। ১৮১৭ সনের ২০শে জানুয়ারি ৩০৪ নং চিৎপুর রোডে গোরাচাঁদ বসাকের ভবনে কুড়ি জন ছাত্র লইয়া হিন্দু কলেজের

কার্য যথারীতি আরম্ভ হইল। এই দিনটি বাংলা তথা ভারতবর্ষের উচ্চশিক্ষার ইতিহাসে একটি অতীব স্মরণীয় দিবস। এই দিন বহু গণ্যমান্য হিন্দু ও পণ্ডিতবর্গ উপস্থিত থাকিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠায় বিশেষ উৎসাহ প্রদান করেন। হিন্দু কলেজ 'মহাপাঠশালা' 'মহাবিদ্যালয়' এরূপ নামেও ইহার পর কখনো কখনো আখ্যাত হইতে থাকে। এইরূপে সম্পূর্ণ বেসরকারী প্রেরণা ও প্রযত্নে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সুষ্ঠুরূপে ইংরেজি শিক্ষা দানের ব্যবস্থা হইল।

কিন্তু উচ্চশিক্ষার বনিয়াদ পাকা করিতে হইলে যে নিম্নতন শিক্ষাব্যবস্থার সম্যক্ উন্নতি ও প্রসার আবশ্যক সে কথাও তৎকালীন সমাজহিতৈষী ব্যক্তিগণ ভুলিয়া যান নাই। বাংলা ও ইংরেজি পাঠ্য পুস্তক রচনার জন্য ইংরেজ এবং বাঙালিদের লইয়া ১৮১৭ সনের ৪ঠা জুলাই কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটি নামে একটি বেসরকারী সমিতি গঠিত হয়। আবার, ইহা দ্বারা উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সিদ্ধ না হওয়ায় ঐ সময়কার জনশিক্ষার কেন্দ্র পাঠশালাসমূহকে সংস্কার করিবার মানসে বৎসরখানেক পরে ১৮১৮ সনের ১লা সেপ্টেম্বর এই সমিতিরই অনুপ্রাণনায় কলিকাতায় স্কুল সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।[২] এখানে শুধু এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, তৎকাল-প্রচলিত শিক্ষাকেন্দ্রগুলির সংস্কারসাধন করিয়া উচ্চশিক্ষার মূলেই রসদ যোগাইবার ব্যবস্থা হয়। যথোচিত বাংলা শিক্ষার পর স্কুল সোসাইটির আদর্শ বিদ্যালয়গুলিতে ইংরেজি শিখিয়া ছেলেরা হিন্দু কলেজে প্রবেশ লাভ করিত। সোসাইটি কর্তৃক কলেজে প্রেরিত প্রথমে বিশ ও পরে ত্রিশ জন উৎকৃষ্ট ছাত্রের বেতন তাঁহারা বহন করিতেন। অর্থাভাবে সোসাইটির কার্য সঙ্কুচিত হইলে, ১৮৩৪ সন নাগাদ ডেভিড হেয়ারের সাক্ষাৎ-তত্ত্বাবধানে এবং অর্থানুকূল্যে ইহার পটলডাঙ্গা বিদ্যালয় একটি আদর্শ ইংরেজি স্কুলে পরিণত হইয়াছিল। এটি ছিল তখন অবৈতনিক। উচ্চ এবং নিম্ন শিক্ষার যোগসূত্র স্বরূপ হইয়া ছিল এই বিদ্যালয়টি।

হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার আয়োজনের প্রায় সমসময়ে রামমোহন রায় শিমলায় একটি ইংরেজি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাই পরে হেদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণ-পূর্ব

২ এসকল বিষয় বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের 'বাংলার জনশিক্ষা' পুস্তকে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

দিকে নূতন বাড়িতে স্থানান্তরিত হয়। রামমোহন তখন ইহার নাম দেন অ্যাংলো-হিন্দু স্কুল। নাম হইতেই প্রকাশ, এখানেও ইংরেজি নিয়মিত ভাবে শিক্ষা দেওয়া হইত। তবে এখানকার শিক্ষার অনেকটা বৈশিষ্ট্য ছিল। ধর্ম ও নীতি শিক্ষার উপর এখানে বিশেষ জোর দেওয়া হয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা কেহ কেহ পরবর্তী কালে যে বিশেষ ভাবে সাজাত্যবোধে ও হিন্দু-সংস্কৃতি সংরক্ষণে যুগপৎ উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা ঐখানকার বিশেষ শিক্ষারই ফল বলা যায়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই অ্যাংলো-হিন্দু বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। এই বিদ্যালয়ের অনুরূপ ভবানীপুরে জগমোহন বসুও একটি ইংরেজি বিদ্যালয় পরিচালনা করিতেন। এ বিদ্যালয়টি বহু পুরাতন, ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত। তখনকার ইংরেজি বিদ্যালয়ে বাংলা শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিত। এই-সকল বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ বাংলা ভাষাও ভালো করিয়া অধিগত করিতে ত্রুটি করিত না। এই দুইটি বিদ্যালয়ও প্রথমে অবৈতনিক ছিল।

উচ্চশিক্ষার জন্য গত শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে বঙ্গদেশে যেসব প্রচেষ্টা হয় তাহাতে দেশী-বিদেশীরা কখনো সম্মিলিত ভাবে, কখনো একক ভাবে উদ্যুক্ত হইয়াছেন। এই দশকে পাদ্রীদের তরফেও বিশেষ চেষ্টা হয়। শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন ১৮১৮ সনে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার দুই বৎসর পরে বিশপ মিড্‌লটন কর্তৃক কলিকাতায় বিশপস কলেজ স্থাপিত হয়। উভয় কলেজেই ইংরেজির মাধ্যমে সাহিত্য, দর্শন, ধর্মতত্ত্ব শিক্ষা দিবার আয়োজন হইল। তবে একথা ভুলিলে চলিবে না যে, এ দুইটিই ছিল পাদ্রীদের প্রতিষ্ঠান। খ্রীস্টধর্মের বিষয় শিক্ষা দেওয়া এবং ইহা প্রচারের জন্য প্রচারক তৈরি করাই উভয়ের মূল উদ্দেশ্য ছিল। তবে দুইটি কলেজেই দেশীয় যুবকদের গ্রহণ করা হইবে এরূপ নিয়মও ধার্য হয়। বিশপস কলেজে দেশীয়দের মধ্যে শুধু দেশীয় খ্রীস্টানদেরই স্থান হইত। শ্রীরামপুর কলেজে অখ্রীস্টান ভারতবাসীও বরাবর প্রবেশের সুবিধা পাইয়াছে।

গবর্নমেণ্টের শিক্ষা-নীতি

গবর্নমেণ্ট কিন্তু ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারকল্পে এ পর্যন্ত আদৌ অবহিত হন নাই। ১৮১৩ সনে প্রতি বৎসর শিক্ষাখাতে এক লক্ষ টাকা ব্যয়ের যে কথা হয় তদনুসারে পুরাপুরি কার্যও হইল না। সংস্কৃত শিক্ষা প্রসারের জন্য ত্রিহুত ও নবদ্বীপে দুইটি কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব হইয়াছিল ১৮১১ সনে। কিন্তু ১৮২১ সন পর্যন্ত কোথাও কলেজ স্থাপিত হইল না। ইতিমধ্যে সরকারের মতিগতিও বদলাইয়া গিয়াছিল। ১৮২১ সনে ডাঃ হোরেস হেম্যান উইলসনের পরামর্শে সরকার পূর্ব প্রস্তাব বর্জন করিয়া শাসনকেন্দ্র কলিকাতায়ই একটি সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের মনস্থ করিলেন। তাঁহারা এইজন্য প্রতি বৎসর পঁচিশ হইতে ত্রিশ হাজার টাকা ব্যয় করিতেও রাজি হইলেন। কিন্তু পরবর্তী দেড় বৎসরের মধ্যেও ইহা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। মাত্র বেসরকারী প্রচেষ্টায় এযাবৎ জনশিক্ষা ও উচ্চশিক্ষার যেরূপ আয়োজন হইতেছিল, সরকার তাহা নিশ্চয়ই অবগত ছিলেন। ১৮২৩ সনের মে-জুন মাসে হিন্দু কলেজ ও কলিকাতা স্কুল সোসাইটির পক্ষ হইতে তাহাদের নিকট সাহায্যের আবেদনও আসে। সরকার শেষোক্ত সোসাইটিকে পরবর্তী জুন মাস হইতেই প্রতি মাসে পাঁচ শত টাকা সাহায্য মঞ্জুর করিলেন। হিন্দু কলেজে সাহায্য দান তখনকার মত স্থগিত থাকে। চুঁচুড়া অঞ্চলে পাদ্রী রবার্ট মে স্বাধীন ভাবে বহু পাঠশালা স্থাপন করিয়াছিলেন। ১৮২৩ সন হইতে সরকার এসবেরও পরিচালনা-ভার গ্রহণ করেন।

এইরূপ আংশিক সাহায্যদানেই সরকারের দায়িত্ব পর্যবসিত হইতেছিল। কিন্তু ১৮২৩ সনের মাঝামাঝি তাঁহারা এদেশবাসীর শিক্ষার দায়িত্ব আর এড়াইতে পারিলেন না। বাংলার শিক্ষাব্যবস্থার অনুসন্ধান, পরিচালন এবং উন্নতিসাধন সম্পর্কে ১৮২৩ সনের ১৭ই জুলাই সরকার একটি কমিটি স্থাপনের সিদ্ধান্ত করেন। ৩১শে জুলাই কমিটি গঠিত

হইল। ইহার নাম হইল জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন বা শিক্ষা-বিষয়ক সাধারণ সভা। আমরা অতঃপর ইহাকে সংক্ষেপে 'শিক্ষা-সভা' বলিয়া আখ্যাত করিব। এই সভার কার্য শুধু বাংলাদেশে নয়, সমগ্র উত্তর-ভারতে পরিব্যাপ্ত হইল। সভার প্রথম সভাপতি হইলেন সদর দেওয়ানী আদালতের বিচারপতি জন হার্বার্ট হেরিংটন এবং সম্পাদক হইলেন ডাঃ হোরেস হেম্যান উইলসন। প্রস্তাবিত সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার ভারও এই সভার উপর ন্যস্ত হইল। কমিটি গঠিত হইবার পর তাঁহারা একদিকে যেমন শিক্ষা-বিষয়ক অনুসন্ধান-কার্যে ব্যাপৃত হইলেন, অন্যদিকে তেমনি আশু সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠায়ও মনঃসংযোগ করিলেন। ১৮২৪ সনের ২২শে ফেব্রুয়ারী কলিকাতা গোলদীঘির উত্তর-পার্শ্বে সংস্কৃত কলেজের ভিত্তি-প্রস্তর মহাসমারোহে প্রোথিত হইল। ইতিমধ্যে ১লা জানুয়ারি হইতে বৌবাজারের একটি ভাড়াটিয়া বাড়িতে কলেজের কার্যও আরম্ভ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আর-একটি বিষয়ও এখানে বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিতে হয়। আমরা দেখিয়াছি, বাংলাদেশের বিদগ্ধ সমাজ ইংরেজি শিক্ষার পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছেন। এমনকি প্রখ্যাতনামা সংস্কৃত পণ্ডিতগণও হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করিতে দ্বিধা করেন নাই। বাঙালির মনোভাব যখন ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য তথা পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণ এবং অনুশীলনের অনুকূল, তখন পুরনো ধাঁচে একটি সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা দ্বারা দেশবাসীর জ্ঞান-স্পৃহা পরিতৃপ্ত হইতে পারে না—রাজা রামমোহন রায় এই মর্মে ১৮২৩ সনের ১১ই ডিসেম্বর বড়লাট লর্ড আমহার্স্টকে একখানি দীর্ঘ পত্র লেখেন। এখানে এই কথাও আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার মূলে বিলাতের ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বাসনা ছিল সংস্কৃতের মাধ্যমে ক্রমশঃ এদেশেও পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের— যাহাকে তাঁহারা বলিতেন "useful knowledge" বা নিত্য-প্রয়োজনীয় বিদ্যা— প্রসার-সাধন। তবে আপাততঃ সংস্কৃত শিক্ষার জন্যই ইহা

প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, সরকার এই রকমের একটা ভাব সাধারণের মধ্যে জাহির করেন। পরে জানা গিয়াছে যে, রামমোহন যে আশঙ্কা করিয়াছিলেন, সরকারের বিবেচনায় তাহা ভিত্তিহীন বলিয়া ধার্য হয়, কারণ তাঁহাদেরও ঐরূপই ইচ্ছা! তবে একটি কথা এখানে আমাদের ভালো করিয়া মনে রাখা দরকার। সরকার সংস্কৃতের মাধ্যমেই ক্রমশঃ পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়া দেন। রামমোহনের পত্রে শিক্ষার বাহনের বিষয় স্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও তাঁহার বক্তব্য বিষয়বস্তু হইতে ইহা বুঝা খুবই সহজ যে, ইংরেজি ভাষা শিক্ষার উপরই তিনি বিশেষ করিয়া জোর দিয়াছিলেন যাহাতে ঐ ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্ত্য রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, ব্যবচ্ছেদ-বিদ্যা প্রভৃতি আমরা দ্রুত আয়ত্ত করিতে পারি।

ইংরেজি শিক্ষার প্রতি এতদিন সরকার অমনোযোগী থাকিলেও, প্রতিষ্ঠার পর হইতেই শিক্ষা-সভা ইহার বিষয় চিন্তা করিতে আরম্ভ করেন। হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ-সভা আয়-হ্রাস হেতু ইহার পরিচালনে বিশেষ অসুবিধার মধ্যে পতিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের আবেদনের ফলে সংস্কৃত কলেজের নূতন গৃহ প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহাতে হিন্দু কলেজেরও স্থান হইবে সরকার এরূপ ব্যবস্থা করিলেন। এ বিষয়ে ডাঃ উইলসনের সহায়তা স্মরণীয়। হিন্দু কলেজও ১৮২৪ সন হইতে বৌবাজারের সংস্কৃত কলেজের সন্নিকট একটি ভাড়াটিয়া বাড়িতে উঠিয়া আসে। এই সময় হইতে ইহাকে সরকার বাড়ি-ভাড়া বাবদ প্রতিমাসে দুই শত আশি টাকা দিতে সম্মত হন। শিক্ষা-সভার সভাপতি জে. এইচ. হেরিংটন হিন্দু কলেজের সঙ্গে কখনো সাক্ষাৎভাবে, কখনো বা পরোক্ষভাবে আগাগোড়া যুক্ত ছিলেন। তিনি ১৮২১ সনে বিলাত গমন করেন। সেখানকার ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটিকে[৩] বলিয়া বিজ্ঞানশিক্ষার উপযোগী বিস্তর যন্ত্রপাতি বিনামূল্যে এবং বিনা ভাড়ায় কলিকাতাস্থ হিন্দু কলেজের জন্য আনাইবার ব্যবস্থা করিলেন। যন্ত্রপাতি ছিল—মেকানিক্স, হাইড্রোস্টাটিক্স, নিউম্যাটিক্স, অপ্‌টিক্স,

৩ ব্রিটিশ-অধিকৃত ভারতবর্ষের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে নানাভাবে সাহায্য করিবার জন্য এই সোসাইটি ১৮২১ সনের ২৬শে মে লণ্ডনে প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিদ্যুৎ, জ্যোতিষ এবং রসায়ন সম্পর্কিত। ১৮২৩ সনের জুলাই মাসে এগুলি কলিকাতায় আসিয়া পৌছিল। কিন্তু হিন্দু কলেজের তখন আর্থিক অবস্থা এমন ছিল না যে, একক ভাবে এসব সংরক্ষণ এবং শিক্ষাদানের জন্য যোগ্য শিক্ষক বা অধ্যাপক নিয়োগ করেন। যাঁহার উদ্যোগে এসকল কলিকাতায় আনা হইয়াছে সেই হেরিংটন সাহেব তখন সদ্যগঠিত শিক্ষা-সভার সভাপতি। কাজেই যন্ত্রপাতি সংরক্ষণ ও অধ্যাপক নিয়োগ সম্পর্কে তাঁহার পরামর্শমত সরকার পক্ষে ব্যবস্থা হইতে অধিক বিলম্ব হইল না। স্থির হইল যে, প্রস্তাবিত বিদ্যালয়-ভবনের একটি প্রকোষ্ঠে এসকল আলাদা করিয়া রাখা হইবে এবং সংস্কৃত ও হিন্দু কলেজের উচ্চশ্রেণীর ছাত্রেরা ঐসব হইতে শিক্ষা লাভ করিবে। এইজন্য ১৮২৪ সন হইতেই কলিকাতা টাঁকশালের ফোরম্যান ডি. রস বাৎসরিক পাঁচ শত পাউণ্ড বেতনে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ইংরেজি-জানা ছেলেরাই ইহা শিখিতে সমর্থ হইবে, কারণ ইংরেজির মাধ্যমে এসকল শিক্ষা দেওয়া হইবে স্থির হইল। এতদিন হিন্দু কলেজে বিজ্ঞানের প্রথম পাঠই শিখানো হইতেছিল। এইসব যন্ত্রপাতি আসার দরুন বাংলাদেশে আধুনিক বিজ্ঞান-শিক্ষা উচ্চশিক্ষা বা ইংরেজি শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত হইতে চলিল।

বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার একটিমাত্র কেন্দ্র হিন্দু কলেজের পরিচালনায় ১৮২৪-২৫ সনের মধ্যে কতকটা পরিবর্তন ঘটে। এযাবৎ হিন্দুগণই অধ্যক্ষ-সভার সদস্য ছিলেন। প্রতিষ্ঠার আয়োজনাদির সময় হইতেই হিন্দু কলেজের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে যুক্ত থাকিলেও ডেভিড হেয়ার বরাবর অন্তরালেই থাকিতেন। ১৮১৯ সনে তিনি কলিকাতা স্কুল সোসাইটি কর্তৃক হিন্দু কলেজে প্রেরিত ছাত্রদের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন। ১৮২৫ সনে প্রথম কলেজের অধ্যক্ষ-সভার সদস্যরূপে তিনি আসন গ্রহণ করেন। সরকার ১৮২৪ সন হইতে কলেজ পরিচালনায় আংশিক আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণ করিলে তাঁহাদের পক্ষে শিক্ষা-সভার সম্পাদক ডাঃ উইলসনকে কলেজের 'ভিজিটর' নিযুক্ত করা হয়। তিনি গবর্নমেণ্টের পক্ষে কলেজ-পরিচালনায় সাহায্য করিতেন। অধ্যক্ষ-সভা তাঁহাকে

সহকারী সভাপতি নির্বাচন করিয়া লইলেন। গবর্নমেণ্টের অভিপ্রায় 'ভিজিটর' কর্তৃক অধ্যক্ষ-সভায় বিজ্ঞাপিত হইত। অধ্যক্ষ-সভা উহা মানিয়া লইবেন এরূপ প্রতিশ্রুতিও দিয়াছিলেন। তবে সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলা হয় যে, হিন্দু সমাজের মনোভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই সকল কার্য নিষ্পন্ন করিতে হইবে, সেদিকে সরকার যেন লক্ষ্য রাখেন। উইলসন-প্রবর্তিত নূতন নিয়মাবলীর দরুন হিন্দু কলেজের শিক্ষার বিশেষ সংস্কার সাধিত হইল। কলেজের অধ্যাপনা-কাল, অধ্যয়ন-রীতি, ইংরেজি সাহিত্য ইতিহাস ও বিজ্ঞান চর্চার নিয়মাদি স্থিরীকৃত হইয়া পঠন-পাঠনেরও বিশেষ উন্নতি হয়। এই সময়ে কলেজে যেসব ছাত্র ভর্তি হইয়া অধ্যয়নে রত হইয়াছিলেন তাঁহারাই পরবর্তী দশ বৎসরের মধ্যে শুধু বিদ্যায় উৎকর্ষ লাভ করেন নাই, অধীত বিদ্যা বয়ঃকনিষ্ঠদের মধ্যে পরিবেশন করিয়া সমাজে এক বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

হিন্দু কলেজকে কেন্দ্র করিয়া বঙ্গদেশ তথা উত্তর-ভারতে ইংরেজি শিক্ষা যে ভাবে প্রসারলাভ করে সে সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে এই সময়ে উচ্চ-শিক্ষার প্রতি সরকারী মনোভাব কিরূপ ছিল তাহাই উল্লেখ করিব। আমরা দেখিয়াছি, সংস্কৃত সাহিত্য অনুশীলনের জন্য সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলেও বিলাতের এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বাসনা ছিল সংস্কৃতের মাধ্যমে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথাও প্রচার করা। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা কলিকাতা মাদ্রাসার সংস্কারসাধনে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। বিলাতস্থ ডিরেক্টর-সভা এদেশে ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনে যে কথঞ্চিৎ ইচ্ছুক না ছিলেন এমন নহে, কিন্তু স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তখনই সরাসরি ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারে অগ্রণী হইতে এই ভাবিয়া নিরস্ত হইয়াছিলেন যে, ইহা দেশবাসীর মনে অসন্তোষের উদ্রেক করিতে পারে। তবে এদেশবাসীরা যে তখনই ইংরেজি শিখিয়া পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণে উদ্গ্রীব হইয়াছিলেন, রাজা রামমোহন রায়ের পত্র এবং হিন্দু কলেজের মত একাধিক ইংরেজি বিদ্যালয়ের আবির্ভাব তাহাই সূচিত করে। যাহা হউক, সরকার শিক্ষা-সভার মারফতে হিন্দু কলেজকে আর্থিক সাহায্যদানে ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা পরোক্ষভাবেও স্বীকার করিয়া লইলেন। ইহার

পরে ১৮২৭ সনের ১লা মে হইতে তাঁহারা কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে ইংরেজি শ্রেণী খুলেন। ইহার দুই বৎসর পরে (১৮২৯) কলিকাতা মাদ্রাসায়ও ইংরেজি পাঠ আরম্ভ হইল। এ সময় আগ্রার সরকারী ওরিয়েণ্টাল কলেজে ইংরেজি শিখাইবার ব্যবস্থা হয়। দিল্লী ও বারানসী জেলায় ইংরেজি স্কুল প্রতিষ্ঠায়ও তাঁহারা অবহিত হইলেন। শিক্ষা-সভা ১৮২৯ সনে কলিকাতা স্কুল সোসাইটির হস্তে এক হাজার টাকা অর্পণ করেন, যাহাতে ইহার অধীন ইংরেজি বিদ্যালয়গুলির অর্থাভাব ঘুচিয়া যায় এবং তাহারা ভালো করিয়া ছেলেদের ইংরেজি শিখাইতে পারে।

শিক্ষা-সভা কিন্তু তাঁহাদের মূল উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়াই কার্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। সংস্কৃতের মাধ্যমে বাঙালি ছেলেদের আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দিতে হইলে ইংরেজি ভাষায় লিখিত এ বিষয়ক গ্রন্থাদি সংস্কৃতে অনুবাদ হওয়া আবশ্যক। তাঁহারা ইংরেজি ও সংস্কৃত সাহিত্যে ব্যুৎপন্ন ব্যক্তি-গণকে অঙ্ক, বীজগণিত, জ্যামিতি হইতে শুরু করিয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা ইংরেজি পুস্তকই সংস্কৃতে অনুবাদ করাইয়া প্রকাশিত করিতে তৎপর হইলেন। প্রাচীন পুথির সঙ্গে মিলাইয়া সংস্কৃত জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তকাদিও এই সময় কিছু কিছু মুদ্রিত হইতেছিল। এহেতু সাক্ষাৎ ভাবে সংস্কৃত সাহিত্যাদির গ্রন্থও সংরক্ষিত হইবার সুযোগ ঘটিল। সংস্কৃতের বেলায় যেমন, কলিকাতা মাদ্রাসাকে কেন্দ্র করিয়া আরবিতেও তেমনি পূর্বানুরূপ গ্রন্থসমূহ অনুবাদিত হইয়া প্রকাশিত হইতে থাকে। এই অনুবাদ ও মুদ্রণকার্যে সরকার-প্রদত্ত লক্ষ টাকার একটি মোটা অংশ প্রতি বৎসর ব্যয়িত হইত। কিন্তু এইসকল পুস্তকের প্রায় সবটাই অবিক্রিত থাকিয়া যাইত।

অথচ ইংরেজি শিক্ষার ঐহিক প্রয়োজনীয়তার বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিয়া সাধারণেও ক্রমে এদিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছিল। শিক্ষা-সভার প্রতিষ্ঠা হইতেই সদস্যগণের মধ্যে কয়েকজন বরাবর প্রাচীন ভাষাগুলির মাধ্যমে শিক্ষাদানের সার্থকতা সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন। এইসকল ভাষায় অনুবাদ-পুস্তক প্রকাশও তাঁহারা নিরর্থক বলিয়া মনে করিতেন। ক্রমে ইংরেজি শিক্ষার প্রাবল্য ঘটিলে

তাঁহাদের মতামত স্পষ্টতর হইয়া উঠিল। প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মাঝেমাঝে প্রতিবাদ জানাইতে তাঁহারা ক্ষান্ত হন নাই। শিক্ষা-সভার বাৎসরিক রিপোর্ট বা কার্যবিবরণে ইংরেজি শিক্ষার কথা অল্পাধিক আলোচিত হইতে লাগিল ইংরেজি শিক্ষার সুদূরপ্রসারী ফলাফলের বিষয়ও তাঁহারা ইহাতে উল্লেখ করিতে পশ্চাৎপদ হইতেন না। ক্রমে ইংরেজি ভাষাকে শিক্ষার বাহন করা হইবে, না, প্রাচ্য ভাষাগুলি সরকারী বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার বাহন থাকিয়া যাইবে ইহা লইয়া সভার সদস্যগণের মধ্যে আলোচনা চলিতে লাগিল। হিন্দু কলেজ তথা বেসরকারী ইংরেজি বিদ্যালয়গুলিতে প্রদত্ত শিক্ষার উৎকর্ষ হেতু এইরূপ আলোচনা ক্রমশঃ তীব্রতর হইয়া উঠিল।

ইংরেজি শিক্ষার প্রসার ও শিক্ষা-সভার মন্তব্য

এখানে উচ্চশিক্ষার প্রধান ও অ-প্রধান প্রতিষ্ঠানগুলির বিষয় বলা আবশ্যক। হিন্দু কলেজের কথাই এখানে বিশেষ করিয়া বলিতেছি। ১৮২৪ সনে কতকটা সরকারী সাহায্য পাওয়া যায় বটে, কিন্তু ১৮২৫ সনে হিন্দু কলেজের কোষাধ্যক্ষ জোসেফ ব্যারেটো কোম্পানি ফেল হওয়ায় ইহার মূলধন প্রায় উবিয়া যায়। কাজেই সরকারের সাহায্যের উপরই কলেজ-কর্তৃপক্ষকে অধিকতর নির্ভর করিতে হয়। এই বৎসরেই কিন্তু রাজা বৈদ্যনাথ রায় পঞ্চাশ হাজার এবং রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাল ও রাজা হরিনাথ রায় প্রত্যেকে কুড়ি হাজার টাকা হিন্দু কলেজে দান করেন। এই অর্থ দ্বারা কলেজের উৎকৃষ্ট ছাত্রদের বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা হইল। কলেজের পাঠ সমাপনান্তে উচ্চতর বিদ্যা-বিষয়ে গবেষণার জন্যও কয়েকটি বৃত্তি স্থাপিত হয়। সংস্কৃত কলেজ ১৮২৬ সনের ১লা মে গোলদীঘির নূতন বাড়িতে উঠিয়া আসে। সঙ্গে সঙ্গে আগেকার নির্ধারণ মত ইহার পূর্ব এবং পশ্চিম অংশে হিন্দু কলেজও সিনিয়র এবং জুনিয়র বিভাগ লইয়া চলিয়া আসিল। কলেজের কার্য-পরিচালনায় সরকারী প্রতিনিধি স্বরূপ ডাঃ উইলসনের যোগদানের বিষয় বলিয়াছি।

১৮২৬ সন হইতে সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারী মেজর এ. প্রাইস্‌ও হিন্দু কলেজের অন্যতম অধ্যক্ষ হইলেন।

শিক্ষক এবং ছাত্র উভয় দিক দিয়াই এই সময়ে কলেজে মণিকাঞ্চন-যোগ হইল। অষ্টাদশবর্ষীয় যুবক হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও হিন্দু কলেজের চতুর্থ শিক্ষকের পদে ১৮২৬ সনের মে মাসে নিযুক্ত হইয়া আসিলেন। তিনি এই অল্প বয়সেই কবি ও সাংবাদিক রূপে কলিকাতা সমাজে পরিচিত হইয়াছিলেন। তিনি কলেজে চতুর্থ শ্রেণীর ছেলেদের ইংরেজি সাহিত্য ও ইতিহাস পড়াইতেন। তাঁহার অধ্যাপনার খ্যাতি ছাত্রমহলে ছড়াইয়া পড়িতে বিলম্ব হইল না। উচ্চতর শ্রেণীর ছাত্রেরাও আসিয়া তাঁহার অধ্যাপনা শুনিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। এই সময়ে কলেজে অধ্যয়নরত ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন—কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, প্যারীচাঁদ মিত্র, রাধানাথ শিকদার এবং এইরূপ আরও অনেকে। ইঁহারা প্রায় প্রত্যেকেই পরবর্তী জীবনে সাহিত্য, শিক্ষা, রাজনীতি, সমাজসংস্কার ও সমাজসেবা, ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা, সংবাদপত্র সম্পাদন, বিজ্ঞান-চর্চা, সংঘগঠন, অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে আত্মনিয়োগ করিয়া বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের এই জ্ঞানার্জন-স্পৃহা ও স্বদেশহিতৈষণার মূলে যে ডিরোজিওর প্রেরণা ছিল তাহাও প্রায় প্রত্যেকে পরবর্তীকালে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। এই সময়কার ছাত্রদের মধ্যে নীতিবোধ প্রখর হইয়া উঠিয়াছিল। তখনকার প্রচলিত রীতিনীতির বিরুদ্ধে হিন্দু কলেজের ছেলেরা লড়িতে শুরু করিয়া দিলে সমাজে তাহাদের ভীষণ দুর্নাম হয় বটে, কিন্তু এই কথাটি সেই সময় প্রবাদবাক্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল যে, [হিন্দু] কলেজের ছেলেরা কখনও মিথ্যা কথা বলিতে পারে না। সর্বোপরি ইংরেজি সাহিত্যে ছেলেদের ব্যুৎপত্তি দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত হইলেন।

হিন্দু কলেজের উৎকৃষ্ট ছাত্রসমূহ আসিত প্রধানতঃ কলিকাতা স্কুল সোসাইটি কর্তৃক পরিচালিত পটলডাঙ্গা ইংরেজি স্কুল হইতে। এ সময় কলিকাতা স্কুল

সোসাইটি কর্তৃক হিন্দু কলেজে প্রেরিত ত্রিশ জন ছাত্রের মধ্যে অধিকাংশই এই পটলডাঙ্গা স্কুলে ইংরেজির প্রথম পাঠ সুষ্ঠুভাবে শিখিয়া লইয়াছিল। সোসাইটির পঞ্চম বার্ষিক রিপোর্ট (১৮২৯) হইতে জানা যায়, এইসব ছাত্র সভা-সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়া নিজেদের রচিত প্রবন্ধাদি সেখানে পাঠ করিতেছে; ইংরেজি পুস্তক হইতে বাংলায় অনুবাদ-কার্যেও তাহারা রত; ইহাদের কেহ কেহ *Elements of General History*, *Wonders of the World* এবং *Grammar of History* পুস্তকগুলি অনুবাদ করিতে শুরু করিয়া দিয়াছে। পটলডাঙ্গা স্কুলটি এই সকল কারণে হিন্দু কলেজের 'প্রিপেরটরী স্কুল' বা 'প্রস্তুতি বিদ্যালয়' বলিয়া আখ্যাত হইয়াছিল।

পটলডাঙ্গা স্কুলের পরই রামমোহন রায়ের অ্যাংলো-হিন্দু স্কুল এবং ভবানীপুরের জগমোহন বসুর ইউনিয়ন স্কুলের নাম উল্লেখযোগ্য। ইংরেজি শিক্ষায় এই দুইটি বিদ্যালয়ও বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে। অ্যাংলো-হিন্দু স্কুলের সুখ্যাতি তখন চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এখানকার ছাত্রেরা নীতিধর্ম শিক্ষার সঙ্গে সাজাত্যবোধেও উদ্বুদ্ধ হয়। ১৮৩২ সনে এখানকার ছেলেরাই অগ্রণী হইয়া বাংলাভাষার মাধ্যমে নানা বিষয় চর্চার জন্য একটি সভা প্রতিষ্ঠা করে। বিদ্যালয়টি রামমোহনের পরিচালনাধীনে বরাবর অবৈতনিক ছিল। জগমোহন বসুর ইউনিয়ন স্কুলে ইংরেজি পঠন-পাঠন এতখানি উৎকর্ষলাভ করিয়াছিল যে, শিক্ষা-সভা কলিকাতা স্কুল সোসাইটি মারফত ১৮২৯ সনে ইহাকে অর্থসাহায্য করিতেও অগ্রণী হন।

এই বৎসরই ১লা মার্চ তারিখে কলিকাতায় গৌরমোহন আঢ্য ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী প্রতিষ্ঠা করেন ঐ একই উদ্দেশ্যে। এখানেও ইংরেজি সাহিত্য এবং গণিত বিজ্ঞানাদি ইংরেজির মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইয়াছিল। ইউনিয়ন স্কুল প্রথমে অবৈতনিক হইলেও, এই সময়ে নব-প্রতিষ্ঠিত ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীর মত বৈতনিক হয়। হিন্দু কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছেলেরা প্রতিবেশী অল্পবয়স্ক ছাত্রদের ইংরেজি শিখাইবার জন্য নিজ নিজ পল্লীতে অবৈতনিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করিতে আরম্ভ করিলেন।

ডিরোজিও তখন নব্যদলের নেতা। হিন্দু কলেজ, পটলডাঙ্গা স্কুল এবং অ্যাংলো-হিন্দু স্কুলের ছাত্রেরা কখনো বিচ্ছিন্ন ভাবে, কখনো-বা অন্যদের সহযোগে যেসব সভা-সমিতি গঠন করিয়াছিল, ডিরোজিও তৎসমুদয়ের নেতৃত্ব করিতেন কাহারও সভাপতি এবং কাহারও উপদেষ্টা সভ্যরূপে। ১৮৩০ সনের ডিসেম্বরের পূর্বেই সাহিত্য ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে এইরূপ অন্ততঃ সাতটি আলোচনা-সভা কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রত্যেকটির সভ্যসংখ্যা ছিল সতর হইতে পঞ্চাশ। ডিরোজিওর নব্য ও উদার শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়া ঐ সময়কার যুব-ছাত্রগণ, বিশেষতঃ কলেজের ছাত্রেরা কতকটা উচ্ছৃঙ্খল ও বিপ্লবী হইয়া পড়ে। কলেজের অধ্যক্ষ-সভা ইহার জন্য ডিরোজিওকেই দায়ী করিয়া কলেজের কার্য হইতে অবসর লইতে তাঁহাকে বাধ্য করান (২৫শে মার্চ ১৮৩১)। কিন্তু ইংরেজি শিক্ষার যে রেওয়াজ দেশমধ্যে তখন ব্যাপ্তিলাভ করিয়াছিল তাহা বন্ধ হইবার নয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বাংলা শিক্ষার প্রতিও সমাজ-নেতারা বিভিন্ন সোসাইটির মাধ্যমে সবিশেষ মনোযোগী হইয়াছিলেন। স্কুল সোসাইটির স্কুলসমূহের ও হিন্দু কলেজের এই নিয়ম ছিল যে, বাঙালী ছেলেরা আট বৎসরের পূর্বে কেহ ইংরেজি শিখিতে পারিবে না। এই বয়সে ছেলেদের একান্তভাবে বাংলা শিক্ষায়ই নিবিষ্ট থাকিতে হইত। আবার, আট বৎসরের পরও যদি দেখা যাইত তাহাদের বাংলা শিক্ষা আশানুরূপ হয় নাই তাহা হইলে উহাও ইংরেজির সঙ্গেসঙ্গে শিখাইয়া লইবার ব্যবস্থা ছিল। এইরূপ ব্যবস্থার ফলে শিক্ষার ভিত্তি পাকা হওয়ায় ইংরেজি শিক্ষায় তাহারা দ্রুত উন্নতি করিতে পারিত।

যাহা হউক, ইংরেজি শিক্ষার এতাদৃশ উন্নতি দেখিয়া শিক্ষা-সভা নীরব থাকিতে পারেন নাই। তবে তাঁহারাও যে ইহার জন্য আংশিক প্রয়াস পাইতেছিলেন, ১৮৩১ সনের শিক্ষা-সভার বার্ষিক রিপোর্টে তাহার উল্লেখ আমরা দেখিতে পাই। উপরন্তু ১৮২৪ সনের ১৮ই মার্চ প্রেরিত ডিরেক্টর-সভার ডেস্‌প্যাচে এদেশে যে "useful knowledge" তথা নিত্য প্রয়োজনীয় পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা-বিষয়ক মূলনীতি ধার্য হইয়াছিল,

শিক্ষা-সভা তাহার প্রতি তখন সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। ইংরেজি শিক্ষার প্রসারে হিন্দু কলেজের কৃতিত্ব যে অন্য সকল প্রতিষ্ঠানের চেয়ে বেশি তাহাও তাঁহারা স্বীকার না করিয়া পারেন নাই। হিন্দু কলেজ সম্পর্কে তাঁহারা ১৮৩২ সনে লিখিলেন—

"Of the various seminaries described in the report, we consider the Hindu College to be at once the most thriving, and the most influential in disseminating our language, literature and sciences to the natives." —*The Asiatic Journal* for Dec. 1832, p. 165.

সরকার শিক্ষা-সভা মারফত ইংরেজি শিক্ষা সম্বন্ধে যাহা করিয়াছেন তাহা ছাড়াও, হিন্দু কলেজের শিক্ষা এককভাবে সমাজের উপর যে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিয়াছে ও তাহাতে যে সুফল ফলিয়াছে, শিক্ষা-সভা সে বিষয়েও বিশদ আলোচনা করিয়াছেন।[8] ইংরেজি শিক্ষার সার্থকতা দেখিয়া এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা এই মর্মে লিখিলেন—বাংলা তথা দেশ-ভাষা শিক্ষার স্কুলসমূহ পরিচালনার ব্যয়ভার বহন করা সরকারের পক্ষে যুক্তিযুক্ত নয়, তাই তাঁহারা ইতিমধ্যেই ইহার ব্যয়-সঙ্কোচ করিয়াছেন! পরবর্তীকালে বাংলা শিক্ষার প্রতি যে বিশেষ অনাদর প্রদর্শিত হয় এখানেই তাহার সূচনা।

---

[8] "In addition to the measures adopted for the diffusion of English in the provinces, and which are yet only in their infancy, the encouragement of the Vidyalaya, or Hindu College of Calcutta, has always been one of the chief objects of the Committee's attention. The consequence has surpassed expectation—a command of the English language, and a familiarity with its literature and science, have been acquired to an extent rarely equalled by any schools in Europe. A taste for English has been widely disseminated, and independent schools, conducted by young men reared in the Vidyalaya, are springing up in every direction. The moral effect has been equally remarkable, and an impatience of the restrictions of Hinduism, and a disregard of its ceremonies, are openly avowed by many young

শিক্ষার অবস্থা ও শিক্ষার বাহন নির্ধারণ

শিক্ষা-সভার বিবরণে ইংরেজি শিক্ষার সুদূরপ্রসারী ফল সম্বন্ধে এতটুকুও অতিরঞ্জন করা হয় নাই। হিন্দু কলেজের ছাত্রগণ অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া নিঃসম্বল ব্যক্তিদেরও ইংরেজি শিক্ষালাভে সহায়তা করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন। কলিকাতা স্কুল সোসাইটির পটলডাঙ্গা স্কুলের প্রথম তিন জন শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন হিন্দু কলেজের প্রখ্যাত ছাত্র—তারাচাঁদ চক্রবর্তী, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও রসিককৃষ্ণ মল্লিক (১৮৩০)। রামতনু লাহিড়ী ১৮৩৪ সনের মার্চ হইতে হিন্দু কলেজের জুনিয়র বিভাগে শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। এতদিন বাংলা পাঠশালা স্থাপনের দিকেই খ্রীস্টান পাদ্রীদের বেশি ঝোঁক ছিল। ১৮৩০ সনের ১৩ই জুলাই বিখ্যাত পাদ্রী আলেকজাণ্ডার ডাফ রামমোহন রায়ের সহায়তায় তাঁহারই ভাড়া-করা ব্রাহ্মসমাজ গৃহের একটি প্রকোষ্ঠে ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। তখন তাঁহাকে পাদ্রী-বন্ধুরা আদৌ সাহায্য করেন নাই। রামমোহনের বিলাত গমনের পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধাপ্রসাদ রায় কিছুদিন এই বিদ্যালয়টির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই স্কুলটি অল্প পরেই জেনারেল এসেম্ব্লীজ ইন্‌স্টিটিউশন নামে আখ্যাত হইতে থাকে।

রামমোহনের সহযোগী কালীনাথ মুন্সী (রায় চৌধুরী) নিজ টাকীতে ইংরেজি স্কুল প্রতিষ্ঠায় (১৪ই জুলাই ১৮৩২) ডাফের সাহায্য লইয়াছিলেন। কিন্তু এই ডাফই তৃতীয় দশকের মাঝামাঝি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পাদ্রীদের হাতে হাত মিলাইয়া হিন্দু কলেজ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে প্রদত্ত ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ গ্রহণপূর্বক নব্য শিক্ষিতদের মধ্যে খ্রীস্টতত্ত্ব প্রচারে বিশেষ উদ্যোগী

---

men of respectable birth and talents, and entertained by many more, who outwardly conform to the practices of their countrymen. Another generation will probably witness a very material alteration in the notions and feelings of the educated classes of the Hindu Community of Calcutta." —*The Asiatic Journal* for Dec. 1832. p. 165.

হইয়াছিলেন। অনেকটা তাঁহারই প্রভাবে হিন্দু কলেজের প্রখ্যাত ছাত্র কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করিলেন (১৮৩২)। এসকল কারণে হিন্দু সমাজে তখন ঘোরতর আন্দোলনও উপস্থিত হইয়াছিল। এতৎসত্ত্বেও ইংরেজি শিক্ষার গতি কিন্তু ব্যাহত হয় নাই, বরং উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছিল। প্রাচীনপন্থী নব্যপন্থী সকলেই ইহার আবশ্যকতা অনুভব করিতেছিলেন।

কিন্তু তাই বলিয়া সংস্কৃত ও বাংলা শিক্ষারও তখন অপহ্নব ঘটে নাই। শিক্ষা-সভার মধ্যে সংস্কৃতের প্রতিপক্ষীয় দলের প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়িতে থাকিলেও তাঁহারা তখনও প্রাচ্য-বিদ্যার অনুশীলনকে কোনোরূপে বাধা না দিয়া পূর্বনীতি অনুসরণ করিতেছিলেন। এদেশে কোনো কোনো বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, যেমন গৌড়ীয় সমাজ, হিন্দু শাস্ত্রালোচনায় ও শাস্ত্রগ্রন্থ প্রকাশে পূর্বেই উদ্যোগী হন। ব্যক্তিগত ভাবেও অনেকেই সংস্কৃত সাহিত্য, ব্যাকরণ, দর্শন, স্মৃতিগ্রন্থ মুদ্রণে তৎপর হইলেন। ১৮২৪-১৮৩৪, এই দশ বৎসরে এরূপ বহু পুস্তক সম্পাদিত হইয়া টীকা সমেত প্রকাশিত হইল। হিন্দু কলেজের প্রাক্তন ছাত্র তারাচাঁদ চক্রবর্তী ও সুপণ্ডিত বিশ্বনাথ তর্কভূষণ (ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পিতা) ইংরেজি অনুবাদ সহ খণ্ডে খণ্ডে মনুসংহিতা প্রকাশিত করিতে আরম্ভ করেন (১৮৩২)। তারাচাঁদ-কৃত ইংরেজি অনুবাদ তখন সুধীসমাজে প্রশংসা লাভ করে।

কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটি ও কলিকাতা স্কুল সোসাইটি বাংলা শিক্ষার উন্নতিকল্পে বেসরকারী ভাবে পূর্ববর্তী পনের বৎসরের (১৮১৮-১৮৩৩) মধ্যে যেরূপ কার্য করে এমনটি পরবর্তী যুগেও কচিৎ দেখা গিয়াছে। স্কুল-বুক সোসাইটির আনুকূল্যে ইউরোপীয় ও এদেশীয় গ্রন্থকারগণকর্তৃক সাহিত্য, ব্যাকরণ, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, জ্যোতিষ, বিজ্ঞান পর্যন্ত বিবিধ বিষয়ক পাঠ্য পুস্তক রচিত ও প্রকাশিত হয়। কলিকাতা স্কুল সোসাইটির বিদ্যালয়সমূহে এবং হিন্দু কলেজেও এসকল পড়ানো হইত। ইংরেজি, বাংলা, ফারসি— তিন ভাষায় এসব লিখিত হয়।

তৎকালীন দেশী-বিদেশী গণ্যমান্য মনীষীদের চেষ্টায় বেসরকারী ভাবে যে শিক্ষা-সৌধ গড়িয়া উঠিতেছিল তাহার ভিত্তিস্বরূপ আমাদের মাতৃভাষা বাংলা শিক্ষারই আয়োজন করা হইয়াছিল। তাই দেখিতে পাই, হিন্দু কলেজের প্রসিদ্ধ ইংরেজিনবীশ রসিককৃষ্ণ মল্লিক বাংলা সংবাদপত্র সম্পাদনায় লিপ্ত, অন্যতম ইংরেজিনবীশ প্যারীচাঁদ মিত্র বাংলা-সাহিত্যের নূতন ধারা প্রবর্তনে অগ্রণী। এসময়কার আরো বহু যুবক যেমন ইংরেজি তেমনি বাংলা-সাহিত্য চর্চায় সমান কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এইরূপে দেখা যায়, সংস্কৃত, বাংলা, ইংরেজি তিনটি ভাষার অনুশীলনেই বঙ্গসন্তানগণ তৎপর হইয়াছিলেন। তবে উচ্চশিক্ষা তথা ইংরেজির দিকেই যে নানাকারণে তাঁহারা অধিকতর মনোযোগী হন তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

এই রকম অবস্থার মধ্যেই সরকারী শিক্ষা-নীতি লইয়া শিক্ষা-সভার সদস্যদের মধ্যে বিতর্ক পাকিয়া উঠিল। এই সভায় ইংরেজিপন্থী ও প্রাচ্যভাবাপন্থী দুই দলের লোকই ছিলেন। কিন্তু ১৮৩৪ সন নাগাদ তাঁহাদের সংখ্যা প্রায় সমান সমান হইয়া দাঁড়ায়। তাঁহাদের বিতর্ক সংবাদপত্রের স্তম্ভেও আত্মপ্রকাশ করিল। একটি বিতর্কের বিষয় মাত্র এখানে উল্লেখ করিব। ১৮৩৪ সনে হিন্দু কলেজের ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক ডক্টর টাইট্‌লারের সঙ্গে কলেজের প্রাক্তন ছাত্র কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের তীব্র বাদানুবাদ হয় 'ক্যালকাটা কুরিয়র' সংবাদপত্রে। টাইট্‌লার প্রাচ্যের প্রাচীন ভাষাসমূহকে বাহন রাখার পক্ষপাতী, আর কৃষ্ণমোহন ইংরেজির সমর্থক। তবে কৃষ্ণমোহন বিতর্কশেষে ইহাও স্বীকার করিয়াছিলেন যে, শিক্ষার বাহন হইবার দাবি বাংলাদেশে স্বাভাবিকভাবে বাংলা ভাষারই, আর সেদিন সুদূরে নয় যখন বাংলার মাধ্যমেই শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা চালু হইবে। তখন শিক্ষা-সভার সমুদয় সদস্যই ইংরেজ। তাঁহারা কিন্তু দল-নির্বিশেষে কেহই বাংলাভাষার বাহন হইবার কথা আদৌ ভাবেন নাই।

যাহা হউক, শিক্ষার বাহন লইয়া যখন এইরূপ বিতর্ক জটিল আকার ধারণ করে তাহারই মধ্যে ১৮৩৪ সনের এপ্রিল মাসে পার্লামেণ্ট-সদস্য উদার দার্শনিক জেরেমি বেন্থামের শিষ্য টমাস বেবিংটন মেকলে (পরে লর্ড মেকলে)

বড়লাট-পরিষদের আইনসচিব হইয়া আসেন। নূতন সনন্দ আইন (১৮৩৩) বিধিবদ্ধ হইবার প্রাক্কালে পার্লামেণ্টে, ভারতবাসীদের নব্যশিক্ষা দান করিয়া গণতন্ত্রনীতিতে সুপ্রতিষ্ঠ করিবার পক্ষে তিনি মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। এক সময় রাজা রামমোহন রায়ও এদেশবাসীদের ইংরেজি শিক্ষা দান করিয়া বেসরকারী ইংরেজ এবং উচ্চশ্রেণীর ভারতবাসীদের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনপূর্বক ভারতে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার কথা বলিয়াছিলেন। মেকলের ঐ উক্তির মধ্যেও তাহারই কতকটা প্রতিধ্বনি আমরা পাই।

মেকলে শিক্ষা-সভার সভাপতি নিযুক্ত হইলেন। তিনি শিক্ষা-সভায় দুই দলের তীব্র বিরোধ দেখিয়া বড়লাট লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের নিকট ১৮৩৫ এর ২রা ফেব্রুয়ারী একটি মিনিট বা মন্তব্যলিপি পেশ করেন। এই মন্তব্য-লিপিতে ভারতবাসীর প্রাচীন শাস্ত্র তথা শিক্ষাদীক্ষার প্রতি যথেষ্ট কটূক্তিও রহিয়াছে, আর ইহাতে ভারতীয় সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার অজ্ঞতাই প্রকাশ পাইয়াছিল। তবে তিনি যে বরাবর উদারমতাবলম্বীই ছিলেন, তৎকর্তৃক রচিত এবং তাঁহারই আগ্রহাতিশয়ে প্রবর্তিত কোনো কোনো আইন দ্বারা তাহা বুঝা যায়। ইহার ফলে ভারতবাসীরা উপকৃতও হইয়াছিল। তিনি উক্ত মন্তব্য-লিপিতে ভারতবাসীদের শিক্ষার বাহনস্বরূপ ইংরেজি ভাষা গ্রহণের অনুকূলে নানারূপ যুক্তি উপস্থিত করিলেন। সপরিষদ বড়লাট বেণ্টিঙ্ক মেকলের যুক্তি দ্বারা প্রভাবিত হইয়া ১৮৩৫, ৭ই মার্চ একটি প্রস্তাবের[৫] আকারে শিক্ষা-নীতি বিষয়ে যে ঘোষণা করেন তাহার মূল কথাই হইল এদেশে ইংরেজিকে শিক্ষার বাহন করা।

৫ প্রস্তাবটি এখানে হুবহু উদ্ধৃত হইল—

"First.—His Lordship in Council is of opinion that the great object of the British Government ought to be the promotion of European literature and science among the natives of India; and that all the funds appropriated for the purpose of education would be best employed on English education alone.

"Second.—But it is not the intention of His Lordship in

এই সিদ্ধান্তের ভিতরে সংস্কৃত শিক্ষার সংকোচের কথাও সুস্পষ্ট বলা হইল। ইহাতে ইংরেজি শিক্ষার সমর্থক প্রাচীনপন্থী হিন্দুরাও (যেমন রাজা রাধাকান্ত দেব) বিশেষ দুঃখিত হন।

আট হাজার মুসলমানের স্বাক্ষরিত এক আবেদনে এই আশঙ্কা প্রকাশ করা হইয়াছিল যে, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে এদেশবাসীদের খ্রীস্টান করাই ছিল এরূপ

Council to abolish any College or School of native learning, while the native population shall appear to be inclined to avail themselves of the advantages which it affords and His Lordship in Council directs that all the existing professors and students at all institutions under the supirntendence of the Committee shall continue to receive their stipends. But His Lordship in Council decidedly objects to the practice which has hitherto prevailed of supporting the students during the period of their education. He conceives that the only effect of such a system can be to give artificial encouragement to branches of learning which, in the natural course of things, would be superseded by more useful studies ; and he directs that no stipend shall be given to any student that may hereafter enter at any of these institutions ; and that when any professor of Oriental learning shall vacate his situation, the Committee shall report to the Government the number and state of the class in order that the Government may be able to decide upon the expediency of appointing a successor.

"Third.—It has come to the knowledge of the Governor-General in Council that a large sum has been expended by the Committee on the printing of Oriental works ; His Lordship in Council directs that no portion of the funds shall hereafter be so employed.

"Fourth.—His Lordship in Council directs that all the funds which these reforms will leave at the disposal of the Committee be henceforth employed in imparting to the native population a knowledge of English literture and science through the medium

শিক্ষা-নীতি অবলম্বনের উদ্দেশ্য। ইহার ফলে, শিক্ষা-ব্যাপারে ধর্মবিষয়ে নিরপেক্ষতা অবলম্বিত হইবে সরকার এইরূপ ঘোষণা করিলেন। তবে ইংরেজি শিক্ষার মারফতে ভারতবাসীদের যে সম্পূর্ণ পাশ্চাত্ত্য তথা খ্রীস্টানভাবাপন্ন করিয়া তোলা এই নীতি-প্রবর্তকদের কাহারো কাহারো অভিপ্রায় ছিল তাহা পিতা পাদ্রী জ্যাকেরি মেকলের নিকট লিখিত বেবিংটন মেকলের পত্রাংশ[৬] (১২ অক্টোবর ১৮৩৬) পাঠে বেশ উপলব্ধি হয়।

পত্রে মেকলে এই মর্মে লেখেন যে, পরবর্তী ত্রিশ বৎসরের মধ্যে এদেশে একজনও মূর্তিপূজক থাকিবে না, ইংরেজি শিক্ষা লাভ করিয়া স্বাভাবিক ভাবেই বাঙালীরা খ্রীস্টানভাবাপন্ন হইয়া উঠিবে, ধর্মপ্রচারের কোনো আবশ্যকই হইবে না।

---

of the English language ; and His Lordship in Council requests the Committee to submit to Government, with all expedition, a plan for the accomplishment of this purpose." —*Selections from Educational Records, Part I (1781-1839).* By H. Sharp, pp. 130-1.

৬ "Our English schools are flourishing wonderfully. He finds it difficult,—indeed, in some places impossible,—to provide instruction for all who want it. At the single town of Hooghly fourteen hundred boys are learning English. The effect of this education on the Hindoos is prodigious. No Hindoo, who has received an English education, ever remains sincerely attached to his religion. Some continue to profess it as a matter of policy ; but many profess themselves pure Deists, and some embrace Christianity. It is my firm belief that, if our plans of education are followed up, there will not be a single idolator among the respectable classes in Bengal thirty years hence And this will be effected without any efforts to proselytize ; without the smallest interference with religious liberty ; merely by the natural operation of knowledge and reflection. I heartily rejoice in the prospect." *Life and Letters of Lord Macaulay, Vol. I.* By George Otto Trevelyan, p. 464.

ইহাদের ধর্মে কোনোরূপ আঘাত না করিয়া বা ক্রিয়াকলাপে বিন্দুমাত্র প্রতিবন্ধকতা না জন্মাইয়াই এইরূপটি সম্ভব হইবে! পত্রখানিতে ইংরেজিকে শিক্ষার বাহন করার মূলগত অভিপ্রায় যেমন পরিষ্কার ফুটিয়া উঠিয়াছে এমনটি আর কিছুতে হয় নাই। মেকলে প্রকাশ্যে একথা বলিতেও ক্ষান্ত হন নাই যে, ইংরেজি শিক্ষা দ্বারা এমন এক শ্রেণীর লোক সৃষ্টি করিতে হইবে যাহারা হইবে রক্তে এবং বর্ণে ভারতীয়; কিন্তু রুচিতে, মতবাদে, নীতিবিষয়ে এবং ভাব-ধারণায় সম্পূর্ণ ইংরেজ ("a class of persons Indian in blood and colour, but English in tastes, in opinions, in morals and in intellect")।

শিক্ষার বাহন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াই কর্তৃপক্ষ ক্ষান্ত রহিলেন না। ইংরেজি শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলির পুনর্গঠনে, নূতন শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠায় এবং জনসাধারণকে এইরূপ শিক্ষালয় স্থাপনে উৎসাহদানেও সবিশেষ তৎপর হইলেন। ইংরেজি শিক্ষার পীঠস্থান হিন্দু কলেজ ইতিপূর্বেই বেশি করিয়া সরকারী আওতার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিল। ১৮৩৫ সনের জুলাই মাস হইতে শিক্ষা-কমিটি প্রত্যক্ষভাবে ইহার নিয়ন্ত্রণে হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করেন। এই সনের ১৬ই জুলাই সরকার কলেজ সম্পর্কে একটি নূতন নিয়ম করিয়া দিলেন। তাহাতে 'ভিজিটর' বা ব্যক্তিবিশেষের উপর কলেজের পর্যবেক্ষণ-ভার দেওয়ার পরিবর্তে শিক্ষা-সভার ছয় জন সদস্য লইয়া গঠিত একটি স্থায়ী সাব্‌কমিটির উপর এই ভার অর্পিত হয়। কলেজটি তদবধি প্রকারান্তরে সরকারী প্রতিষ্ঠানেই পরিণত হইল। উইলিয়ম এডামও তাঁহার বিখ্যাত 'এডুকেশন রিপোর্টে' সরকারী প্রতিষ্ঠান বলিয়া ইহার কোনো বিবরণ দেন নাই। কলেজের সংস্কার সাধিত হইল। বিখ্যাত কবি, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক, বিকলাঙ্গহেতু সৈন্যবিভাগ হইতে অবসরপ্রাপ্ত ডেভিড লেস্টার রিচার্ডসন ১৮৩৫ সনের আগস্ট মাস হইতে ডক্টর টাইট্‌লারের স্থলে ইংরেজি সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ডিরোজিওর ন্যায় তাঁহার শিক্ষাগুণেও একদল বাঙালী যুবকের জ্ঞানার্জনস্পৃহা এবং দেশহিতৈষণা একান্ত ভাবে বর্ধিত হইল। তাঁহার ছাত্রদের মধ্যে মধুসূদন দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ

বসু, ভোলানাথ চন্দ্র প্রমুখ কবি ও মনস্বীদের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সনের নবেম্বর মাস হইতে সংস্কৃত কলেজের ইংরেজি শ্রেণী তুলিয়া দেওয়া হয়। হিন্দু কলেজই ইংরেজি শিক্ষার উপরে অধিকতর জোর দিতে লাগিল।

১৮৩৫ সন হইতে সরকার পক্ষে এবং বেসরকারী ভাবে স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠার ধুম পড়িয়া গেল। এই বৎসরই সরকার ঢাকায় ইংরেজি স্কুল স্থাপন করেন (জুলাই ১৮৩৫)। এই বিদ্যালয়টি ১৮৪১ সনের ২০শে নবেম্বর কলেজে উন্নীত হয়। কোথাও সরকারী কর্মচারীদের, কোথাও-বা বেসরকারী ব্যক্তিদের চেষ্টা-যত্নে মেদিনীপুর (সেপ্টেম্বর, ১৮৩৫), বরিশাল (১৮৩৫), রামপুর বোয়ালিয়া (২৭ জুন, ১৮৩৬), গৌহাটী (১৮৩৫), ব্যারাকপুর (৬ই মার্চ, ১৮৩৭), চট্টগ্রাম (জানুয়ারি, ১৮৩৭), বারাসত (১৮৩৯) প্রভৃতি শাসন-কেন্দ্রে ইংরেজি বিদ্যালয় খোলা হইল। কলিকাতার রোমান কাথলিক জেসুট সম্প্রদায় কর্তৃক ১৮৩৫, ১ জুন সেণ্ট জেভিয়াস স্কুল স্থাপিত হয়। যেসব বিদ্যালয়ে ইংরেজি শিক্ষা ইতিপূর্বেই আরম্ভ হইয়াছিল তাহার কার্য আরও ব্যাপকতর হইল। চুঁচুড়ার বাংলা স্কুলগুলি এত দিন সরকারের চক্ষুশূল হইয়া ছিল। মহম্মদ মহসীনের দান হইতে হুগলীতে ১৮৩৬ সনের ১লা আগস্ট মহম্মদ মহসীন কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহারা এসকলের দায় হইতে নিজেদের মুক্ত করিলেন। কলেজের জন্য ছাত্র প্রস্তুতকল্পে একটি ব্রাঞ্চ স্কুল বা শাখা বিদ্যালয়ও স্থাপিত হইল। এই কলেজের অপর একটি শাখা বিদ্যালয় স্থাপিত হয় হুগলী হইতে ষোল মাইল দূরে সীতাপুরে।

এ তো গেল সাধারণ শিক্ষার কথা। ১৮৩৫ সনে সরকার কলিকাতায় মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করিলেন। এখানকার ছাত্রদের ইংরেজির মাধ্যমে শারীরবিদ্যা, ব্যবচ্ছেদবিদ্যা, ভেষজবিদ্যা, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা প্রতিটি বিষয় অধ্যয়ন করিতে হইত। এ কারণেও ইংরেজি শিক্ষা দ্রুত প্রসারের সুযোগ লাভ করিল।

এখানে তৎকালে অনুসৃত শিক্ষা-নীতি সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ আলোচনা করা

আবশ্যক। সরকার ইংরেজিকে শিক্ষার বাহন ধার্য করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা দেশভাষা তথা বাংলা শিক্ষা সম্বন্ধে কোনো উচ্চবাচ্য করেন নাই। অথচ, প্রধানতঃ দেশ-চলিত বেসরকারী শিক্ষাব্যবস্থা বিষয়ে অনুসন্ধান ও মতামত প্রদানের জন্যই বড়লাট বেন্টিঙ্ক ১৮৩৫ সনের প্রথমে উইলিয়ম অ্যাডামকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। শিক্ষা-সভা ১৮৩৬ সনে নিজেদের ত্রুটির বিষয় লক্ষ্য করিয়াই সম্ভবতঃ বাংলাভাষা শিক্ষার কথা, এবং একদিন যে ইহার মাধ্যমেই শিক্ষাদান সম্ভব হইবে এই বিষয় উল্লেখ করিয়া এক প্রস্তাব গ্রহণ করেন। অ্যাডাম ১৮৩৮ সনে তাঁহার শেষ রিপোর্ট সরকারে পেশ করিলেন। দেশীয় পাঠশালাকে কেন্দ্র করিয়া একটি জাতীয় শিক্ষা-পদ্ধতি অনুসরণের প্রস্তাব এই রিপোর্টে ছিল। কিন্তু তখনকার কর্তৃপক্ষ—কি বিলাতের ডিরেক্টর-সভা, কি স্থানীয় সরকার, কি শিক্ষা-সভা, সকলেই— ইংরেজির পক্ষপাতী হইয়া পড়েন। অ্যাডামের প্রস্তাব পরীক্ষামূলক ভাবে অংশতঃ গ্রহণেও শিক্ষা-সভা অসম্মত হন। উপরওয়ালার নির্দেশে শিক্ষা-সভা ইংরেজি শিক্ষাবিস্তারে মনঃসংযোগ করিলেন এবং স্থানে স্থানে জিলা স্কুল প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী হইলেন।

কিন্তু জনমত তখন সুসংহত না হইলেও, সংস্কৃত তথা প্রাচ্যবিদ্যা এবং বাংলা শিক্ষার প্রতি অনাদর সম্পর্কে দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে কতকটা ক্ষোভ যে না প্রকাশ পাইতেছিল তাহা নয়। শিক্ষাসম্বন্ধে স্থানীয় ও বিলাতের কর্তৃপক্ষের অভিপ্রায় এবং ভারতবাসীর মতামতের একটা সামঞ্জস্যের চেষ্টা করিয়া বড়লাট লর্ড অকল্যাণ্ড ১৮৩৯ সনের ২৪শে নবেম্বর একখানি দীর্ঘ মিনিট বা মন্তব্যলিপি রচনা করেন। ইহাতে তিনি প্রাচ্যবিদ্যা শিক্ষাকল্পে যে ব্যবস্থা তখন পর্যন্ত প্রবর্তিত ছিল তাহা পুরাপুরি বহাল থাকিবে বলিয়া আশ্বাস দিলেন। বাংলাভাষা উন্নত হইলে, অর্থাৎ ইহাতে বিভিন্ন বিষয়ে উপযুক্ত পাঠ্য পুস্তক রচনা সম্ভব হইলে তখন ইহাকে শিক্ষার বাহন করা সম্পর্কে বিবেচনা করা চলিবে— এ মর্মের কথাও ইহাতে লিখিত ছিল। কিন্তু ইংরেজি শিক্ষার প্রসার সম্বন্ধে এদেশবাসীর আগ্রহ এবং সরকারী শিক্ষা-নীতির আনুকূল্যের বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়া বড়লাট অকল্যাণ্ড

এই মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, ইংরেজিকেই শিক্ষার বাহন হিসাবে রাখা যুক্তিসঙ্গত।[৭]

এই সময়ে বোম্বাই প্রদেশে স্থানীয় ভাষার মাধ্যমেই শিক্ষাদান চলিতেছিল। বাংলা ও বোম্বাই প্রদেশের বিষয় উল্লেখ করিয়া অকল্যাণ্ড লেখেন, পরীক্ষামূলক ভাবে দুইটি স্বতন্ত্র ব্যবস্থাই দুই প্রদেশে আপাততঃ চলিবে।[৮]

বেন্টিঙ্কের ইংরেজিকে শিক্ষার বাহন করিবার সিদ্ধান্ত এবং লর্ড অকল্যাণ্ডের উপরোক্ত শিক্ষাবিষয়ক মন্তব্য পরবর্তী শতাব্দীকাল বঙ্গের শিক্ষা-ব্যবস্থাকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। বাংলা শিক্ষার পরিবর্তে সমাজের উচ্চস্তরের লোকদিগকে ইংরেজির মাধ্যমে শিক্ষাদান-ব্যবস্থাকে ঐ সময়েই **'filtration theory'** নামে আখ্যাত করা হয়। ইহার সহজ অর্থ হইল, উচ্চস্তরের লোকেরা ইংরেজির মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞান তাহাদের মাতৃভাষার মারফত সাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া দিবে।

---

৭ নিম্নের উক্তিতে লর্ড অকল্যাণ্ডের দৃঢ় মত প্রকাশ পাইতেছে—

"I would then make it my principal aim to communicate through the means of the English language, a complete education in European Literature. Philosophy and Science to the greatest number of students who may be found ready to accept it at our hands, and for whose instructions our funds will admit of our providing."—*Selections from Educational Records*, Part *I*. By H. Sharp, p. 157.

৮ "We may, indeed, be said to have two great experiments in progress, one in Bengal, and the other in the Bombay provinces, the Provincial education being in the former conducted chiefly through the English, in the latter almost, if not quite exclusively, through the vernacular languages. It will be most interesting that both experiments should be closely watched and thoroughly developed." *Ibid.*, p. 163.

১৮৩৭ সনে শিক্ষা-সভা শুধু বঙ্গ-প্রদেশের স্কুল ও কলেজের জন্য উচ্চশিক্ষা খাতে কিরূপ ব্যয় করিয়াছিলেন তাহার একটি হিসাব এখানে দেওয়া হইল। প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের ছাত্রসংখ্যাও ইহা হইতে জানা যাইতেছে। বলা বাহুল্য, শিক্ষা-সভা এসময়েও সমগ্র উত্তর-ভারতের শিক্ষার উপর কর্তৃত্ব করিতেন।

প্রতিষ্ঠান	ছাত্রসংখ্যা। ১৮৩৭	বার্ষিক ব্যয় (টাকা)
হিন্দু কলেজ	৪৫০	৪,০৫৯
মহম্মদ মহসীন কলেজ (ইংরেজি বিভাগ),		
হুগলী	৭৫০	৩,০০০
হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুল	২২৭	২২৫
মাদ্রাসা ইং স্কুল	১৫২	৬৫০
ঢাকা স্কুল	৩১৪	৫৩৬
গৌহাটী স্কুল	১৫৪	২৭৯
চট্টগ্রাম স্কুল	৮০	১৫০
মেদিনীপুর স্কুল	৭৯	৩০৫
নিজামৎ কলেজ, ইং বিঃ	১০৯	৫০০
বোয়ালিয়া (রাজসাহী) স্কুল	৮০	১৭৭
কুমিল্লা স্কুল	৮৮	৩০০

ইহার পরেও জিলা শহরগুলিতে ক্রমশঃ ইংরেজি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে। যশোহর ও দিনাজপুরে বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। বরিশালের স্কুলটি প্রোবেশনারি স্কুল নামে শিক্ষা-সভা কর্তৃক আখ্যাত হইত। এইজন্য বোধ হয় উক্ত তালিকায় ইহা স্থান পায় নাই।

শিক্ষা-সভার মারফত সরকার শিক্ষা-খাতে সর্বসাকুল্যে বৎসরে সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। তন্মধ্যে প্রাচ্যবিদ্যার জন্য ব্যয়িত হয় দেড় লক্ষ টাকা। উচ্চ বা ইংরেজি শিক্ষার জন্য ব্যয় হয় চার লক্ষ টাকা। বাংলা শিক্ষার জন্য তাঁহারা আলাদা কিছুই খরচ করেন নাই।

সরকারী শিক্ষা-নীতির মৌলিক পরিবর্তন—বেসরকারী স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা

১৮৪১-৪২ সনে বাংলাদেশে শিক্ষা-ব্যাপারে কতকগুলি মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয়। এতদিন সরকারের পক্ষে শিক্ষা-নিয়ন্ত্রণ করিতেন শিক্ষা-সভা বা জেনারেল কমিটি অব্ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন। শিক্ষাবিষয়ে সরকার যে অধিকতর মনোযোগী হইয়াছিলেন, বিশেষতঃ ইংরেজি শিক্ষা সম্পর্কে, তাহা বলাই বাহুল্য। শিক্ষা-সভা সমগ্র উত্তর-ভারতের শিক্ষাকার্য তত্ত্বাবধান করিতেন। শিক্ষার প্রসারলাভের সঙ্গেসঙ্গে একটিমাত্র সভার পক্ষে ইহা নিয়ন্ত্রণ বা পরিচালনা করা অতিশয় কঠিন হইয়া পড়িল। গবর্নমেণ্ট এবিষয় সম্যক্ বিবেচনা করিয়া ১৮৪২ সনের প্রারম্ভ হইতে বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যা-আসাম, যাহাকে তখন বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী বা বঙ্গ-প্রদেশ বলা হইত, বাদে সমগ্র উত্তর-ভারতের শিক্ষাকার্য পরিচালনার ভার একটি স্বতন্ত্র শিক্ষা-সভার উপর অর্পণ করিলেন। বঙ্গ-প্রদেশের শিক্ষা-সভার নূতন নামকরণ হইল 'Council of Education' বা 'শিক্ষা-সমাজ'। শিক্ষা-সমাজকে সরকারের অধিকতর কর্তৃত্বের মধ্যে আনা হইল। পরবর্তীকালে শিক্ষা যে একটি সরকারী বিভাগে পরিণত হয় ইহাই তাহার পূর্বাভাস। শিক্ষা-সমাজের অন্তর্গত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহ নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন স্থলে একটি করিয়া 'লোক্যাল কমিটি' বা স্থানীয় সভাও সরকারী নির্দেশে গঠিত হইল। এইসকল কমিটি শিক্ষা-সমাজেরই অধীন থাকিয়া কার্য করিবেন স্থির হয়।

গবর্নমেণ্টের নির্দেশে এসময় হইতে ইংরেজি শিক্ষার প্রধানতম কেন্দ্র হিন্দু কলেজকেও সরকারের প্রত্যক্ষ কর্তৃত্বাধীনে আনয়ন করা হয়। ১৮৪১ সনের ২০শে অক্টোবর ভারত-সরকারের আদেশে শিক্ষা-সমাজের অধীন কলেজ-পরিচালনার্থ নূতন করিয়া একটি সাব্‌কমিটি গঠিত হইল। এই সাব্-কমিটি শিক্ষা-সমাজের সভাপতি বাদে আরও দুই জন সভ্য এবং কলেজের অধ্যক্ষ-

সভার অধ্যক্ষগণকে লইয়া গঠিত হইল। সাব্‌কমিটি অন্যান্য সরকারী প্রতিষ্ঠানের লোক্যাল কমিটির মত শিক্ষা-সমাজেরই অধীন থাকিবে স্থির হইল। কলেজের গচ্ছিত তহবিল সম্পূর্ণ আলাদা রাখিয়া তাহার সুদ হইতে উৎকৃষ্ট ছাত্রদের জন্য কয়েকটি বৃত্তি স্থাপনের ব্যবস্থা হইল এই সময় হইতে। ঢাকা স্কুলও ১৮৪১, ২০শে নবেম্বর কলেজে পরিণত হয়। ইহা একটি পুরাপুরি সরকারী প্রতিষ্ঠান হইলে এদেশবাসীরাও ইহার উন্নতিকল্পে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে রামলোচন ঘোষের নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়। ঢাকা স্কুল প্রতিষ্ঠার (১৫ জুলাই, ১৮৩৫) অব্যবহিত পরেই তিনি ইহার জন্য এক হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন। ঢাকা স্কুলটি কলেজে পরিণত হইলে, ১৮৪২ সনে তিনি ইহাকে আরও এক হাজার টাকা এই শর্তে দান করেন যে, ইহার বার্ষিক সুদ চল্লিশ টাকা দ্বারা কলেজের উৎকৃষ্ট ছাত্রগণকে প্রতি বৎসর আট টাকার পাঁচটি পুরস্কার দেওয়া হইবে। কর্তৃপক্ষ এই দান সানন্দে গ্রহণ করেন।

সরকার নিজস্ব জিলা স্কুল এবং কলেজগুলির জন্য ১৮৪১ সন হইতে জুনিয়র ও সিনিয়র বৃত্তির ব্যবস্থা করিলেন। প্রতিটি জুনিয়র বৃত্তির পরিমাণ মাসে আট টাকা এবং প্রত্যেক সিনিয়র বৃত্তির পরিমাণ প্রথম দুই বৎসরের জন্য মাসে ত্রিশ টাকা এবং পরবর্তী চারি বৎসরের জন্য মাসে চল্লিশ টাকা। জুনিয়র বৃত্তি অন্যূন চারি বৎসর কাল পাওয়া যাইবে স্থির হয়। তবে ইহাও ধার্য হয় যে, জুনিয়র বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রগণ এই সময়মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে সিনিয়র বৃত্তির অধিকারী হইতে পারিবে। এক-একটি সরকারী কলেজের জন্য ছয়টি জুনিয়র ও আটটি সিনিয়র বৃত্তি নির্দিষ্ট হইল। প্রত্যেক জিলা স্কুলের জন্য একটি জুনিয়র বৃত্তি নির্দিষ্ট হয়। ১৮৪১ সনে হিন্দু কলেজ হইতে সিনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় সর্বপ্রথম স্থান অধিকার করিয়া প্যারীচরণ সরকার চল্লিশ টাকা বৃত্তি লাভ করেন। জুনিয়র বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রদের মধ্যে সর্বপ্রথম হন জগদীশনাথ রায়।

১৮৪৩ সনে কলিকাতায় দুইটি নূতন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু উভয়ই

ছিল বেসরকারী। এখানে একটি কথা আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে। আমরা বর্তমানে যে অর্থে 'কলেজ' কথাটি প্রয়োগ করি, পূর্বকালে এই অর্থে উহা প্রযুক্ত হইত না। তখনকার দিনে কলেজে নিম্ন মধ্য ও উচ্চ সবরকম শিক্ষা দেওয়ারই ব্যবস্থা থাকিত। তবে এখানে আমরা ইহার উচ্চ ও মধ্য বিভাগের বিষয়ই ধরিয়া লইতেছি। আলেকজাণ্ডার ডাফ-প্রতিষ্ঠিত জেনারেল এসেম্বলীজ ইনস্টিটিউশন বা কলেজের বিষয় আমরা আগে উল্লেখ করিয়াছি। ১৮৩৭ সনে ইহা হেদুয়া পুষ্করিণীর পূর্ব পার্শ্বে বর্তমান বাটীতে উঠিয়া আসে। মূল প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মতদ্বৈধ উপস্থিত হইলে ডাফ ১৮৪৩ সনে ফ্রি চার্চ ইনস্টিটিউশন নামে একটি নূতন কলেজ প্রতিষ্ঠা করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর হইতে এই প্রতিষ্ঠানটি ডাফ কলেজ নামে পরিচিত হয়। এখানে বলা আবশ্যক যে, ইংরেজি শিক্ষা প্রদানের সঙ্গেসঙ্গে এ কলেজে খ্রীস্টতত্ত্ব শিক্ষা দিবারও বিশেষ আয়োজন ছিল।

১৮৪৩ সনের ১লা মার্চ দ্বিতীয় বেসরকারী কলেজ স্থাপিত হইল 'শীল্স কলেজ' নামে। কলিকাতার ধনীশ্রেষ্ঠ মতিলাল শীল এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। বিদ্যালয়টি তিনি প্রায় অবৈতনিক করিয়াছিলেন। ছাত্রদের প্রতি মাসে পুস্তক ক্রয় বাবদ মাত্র এক টাকা করিয়া দিতে হইত। কলিকাতাস্থ সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের রোম্যান ক্যাথলিক জেস্যুট পাদ্রীগণের উপর ইহার পরিচালনার ভার অর্পিত হইয়াছিল। এই কলেজের পাদ্রী অধ্যাপকগণ বিনাবেতনে এখানকার ছাত্রদের অধ্যাপনা করিতেন। ১৮৪৪ সনে মতিলালের সঙ্গে জেস্যুট পাদ্রীদের মতানৈক্য উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাদের সম্পর্ক ত্যাগ করেন। তদবধি তিনি কলেজ পরিচালনার ভার দিলেন পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর। কৃষ্ণমোহন প্রোটেস্টাণ্ট দলভুক্ত ছিলেন। এই ব্যাপার লইয়া সংবাদপত্রে নানারূপ আলোচনা হইল, কিন্তু রোম্যান ক্যাথলিক হউন বা প্রোটেস্টাণ্টই হউন, তাঁহাদের উপর বরাবর শিক্ষাভার দেওয়ায় মতিলালের উদার মনোভাবেরই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

হিন্দু কলেজের শিক্ষারও কতকটা বিস্তৃতি-লাভ ঘটে এই বৎসরে।

১৮৩১-৩২ সন হইতে কিছুদিনের জন্য এখানে ব্যবহার-শাস্ত্র ও অর্থ-নীতি পড়াইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। পরে তাহা উঠিয়া যায়। ১৮৪৩ সন হইতে পুনরায় ইহার অধ্যাপনা শুরু হইল। এই সময় হইতে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন এবং স্থপতিবিদ্যা (Civil Engineering) অধ্যাপনারও নূতন করিয়া ব্যবস্থা হয়। ডেভিড হেয়ারের মৃত্যুর (১লা জুন, ১৮৪২) পর তাঁহার পটলডাঙ্গা বা হিন্দু কলেজ ব্রাঞ্চ স্কুল পুরাপুরি সরকারী তত্ত্বাবধানে আসিল। এই বিদ্যালয়টি পরে কেবলমাত্র কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুল নামে অভিহিত হয়। এটিও ছিল ইংরেজি শিক্ষার একটি উৎকৃষ্ট প্রতিষ্ঠান। ১৮৪২ সনের অক্টোবর মাস হইতে সংস্কৃত কলেজেও ইংরেজি শ্রেণীর পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইল।

এদেশে ইংরেজি শিক্ষা-বিস্তারের একটি উদ্দেশ্য ছিল— অল্প ব্যয়ে শাসন-সৌকর্যার্থে দেশীয় শাসকশ্রেণী সৃষ্টি করা। বড়লাট বেন্টিঙ্ক হিন্দু কলেজে শিক্ষিত যুবকদের শাসন-বিভাগের দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করিতে আরম্ভ করেন। তদবধি ইংরেজি শিক্ষার দিকে ভারতবাসীদের ঝোঁক অধিকতর বাড়িয়া গিয়াছিল নিঃসন্দেহ। মতিলাল শীল স্থাপিত কলেজ একটি সম্পূর্ণ বেসরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান হইলেও ইহার উদ্দেশ্য-পত্রে এইরূপ লেখা হইয়াছিল—

"The object of this foundation is to provide for the education of the Hindoos, so as to fit them to occupy post of trust and emolument in their own country."

ইংরেজি শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য যে সরকারী বিভাগসমূহে শিক্ষিত ভারত-বাসীদের নিয়োগ—ইহা সর্বত্র জানাজানি হইয়াছিল। সরকার কার্যত ইহা অনুসরণ করিলেও প্রকাশ্যভাবে তাঁহাদের নীতি এতদিন ঘোষণা করেন নাই। ১৮৪৪ সনের ১০ই অক্টোবর বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ এই উদ্দেশ্য সম্বলিত একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। ইহার প্রথম ও প্রধান অংশ এই—

"The Governor-General having taken into his consideration the existing state of education in Bengal and being of opinion that it is highly desirable to afford it every reasonable

encouragement by holding out to those who have taken advantage of the opportunity of instruction afforded to them, a fair prospect of employment in the public service, and thereby not only to reward individual merit, but to enable the State to profit as largely and as early as possible by the result of the measures adopted of late years for the instruction of the people as well by the Government as by private individuals and societies, has resolved that in every possible case a preference shall be given in the selection of candidates for public employment to those who have distinguished themselves therein by a more than ordinary degree of merit and attainment."

ইংরেজি শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিমাত্রেই সরকারী কার্যের উপযুক্ত বিবেচিত হইবে এবং গুণানুসারে তাহারা উচ্চ ও দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত হইবে—সরকার পক্ষে এইরূপ ঘোষণা উচ্চশিক্ষার প্রসারে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। বিভিন্ন স্থানে নূতন নূতন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিল, প্রায় প্রত্যেকটি বিদ্যালয়েই ইংরেজি শিক্ষার সূচনা হইল। শিক্ষার বাহন ইংরেজি হইবার পর হইতে এ দেশের জনশিক্ষা তথা বাংলা শিক্ষার বিশেষ অনাদর হইতেছিল। বড়লাট হার্ডিঞ্জ উপরি-উক্ত সিদ্ধান্তের শেষাংশে এই মর্মে বলেন যে, নিম্নতম কাজগুলিতেও নিরক্ষর ব্যক্তিদের নিয়োগ না করিয়া দেশীয় ভাষায় লিখন-পঠনক্ষম ব্যক্তিদেরই নিয়োগ করিতে হইবে। তিনি বঙ্গপ্রদেশে এক শত একটি আদর্শ বাংলা পাঠশালা প্রতিষ্ঠার আদেশ দিয়া দেশীয় শিক্ষার প্রতি কতকটা অনুরাগও দেখাইলেন। বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত এই আদর্শ বিদ্যালয়গুলি 'বঙ্গবিদ্যালয়' নামে আখ্যাত হয়।

১৮৪৫ সন নাগাদ সরকারী অর্থে শিক্ষা-সমাজ কর্তৃক ছয়টি কলেজ এবং আঠারটি ইংরেজি স্কুল পরিচালিত হইতেছিল। ইহাদের ছাত্র-সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২,১১৭ ও ২,৪৩৪। এই সময় গবর্নমেণ্ট নিজ দায়িত্বে বঙ্গবিদ্যালয়ও নানা স্থানে প্রতিষ্ঠা করিতে থাকেন। উচ্চশিক্ষা এতদিনে বেশ সাফল্য

মণ্ডিত হয়। হিন্দু কলেজ, হুগলী কলেজ ও ঢাকা কলেজে সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, অঙ্কশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে ইংরেজির মাধ্যমে উচ্চতম শিক্ষা দেওয়া হইতেছিল। ব্যবহার-শাস্ত্র, রাষ্ট্র-বিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, ইঞ্জিনিয়ারিং— হিন্দু কলেজে ক্রমে ক্রমে এসকল বিদ্যা শিক্ষার আয়োজন হইল। ওদিকে মেডিক্যাল কলেজেও চিকিৎসাশাস্ত্রের অন্তর্গত শারীরবিদ্যা, ব্যবচ্ছেদবিদ্যা, ভেষজবিদ্যা প্রভৃতির সঙ্গেসঙ্গে রসায়ন, উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব ও পদার্থ-বিদ্যা শিক্ষাদানের উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা ছিল। ছাত্রগণ উচ্চতম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিবিধ বিষয়ে অধিকতর ব্যুৎপত্তিলাভের জন্য হিন্দু কলেজে সরকারী ও বেসরকারী বৃত্তি লাভ করিয়া দুই-তিন বৎসর আলোচনা ও গবেষণা করিবারও সুযোগ পাইত। উচ্চশিক্ষার এতাদৃশ ব্যাপ্তি ও উন্নতি দেখিয়া শিক্ষা-সমাজ কলিকাতায় লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন (১৮৪৫)। কিন্তু বিলাতের কর্তৃপক্ষ এ প্রস্তাবে সম্মতি না দেওয়ায় ইহা তখনকার মত স্থগিত থাকে।

উচ্চশিক্ষা, খ্রীস্টানী-বিরোধী আন্দোলন ও সরকার

পর বৎসর, ১৮৪৬ সন হইতে উচ্চশিক্ষা সম্পর্কে কতকগুলি নূতন প্রচেষ্টার সূচনা দেখিতে পাই। ইহার আয়োজন কিন্তু পূর্ব বৎসর হইতে শুরু হয়। চব্বিশ পরগণার জেলা শহর বারাসতে ১৮৪৬ সনের প্রারম্ভে একটি সরকারী ইংরেজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। এখানে স্থানীয় লোকের চেষ্টাযত্নে ১৮৩৯ সনে একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। উক্ত সরকারী বিদ্যালয় স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেট ট্রেভরের আগ্রহাতিশয়েই সরকার স্থাপন করেন। তিনি ইতিপূর্বে ১৮৩৯ জুলাই মাসে প্রতিষ্ঠিত স্থানীয় অবৈতনিক বিদ্যালয়ের একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ১৮৫০ সনে অবৈতনিক বিদ্যালয়টি বিনাবেতনে ষাট জন ছাত্র গ্রহণের সর্তে

সরকারী বিদ্যালয়ের সঙ্গে মিলিত হইয়া যায়। ১৮৪৬ সনের ১লা জানুয়ারি কৃষ্ণনগরেও একটি কলেজ সিনিয়র ও জুনিয়র বিভাগ সহ সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহারও আয়োজন কিন্তু পূর্ব বৎসর হইতেই চলিতেছিল।

তদানীন্তন বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ ১৮৪৫ সনের ১লা অক্টোবর এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেন যে, শীঘ্রই কৃষ্ণনগরে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই সংবাদ শ্রবণে স্থানীয় অধিবাসীরা— জমিদার, ব্যবসায়ী, সরকারী কর্মচারী এবং নব্যশিক্ষিত যুবকগণ— পরবর্তী ১৮ই নবেম্বর একটি জনসভার অনুষ্ঠান করেন। সভায় তের হাজার টাকার প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়। তাঁহারা এই টাকা তুলিয়া সরকারের হাতে দিয়া দেন। এ বিষয়ে যাঁহারা অগ্রণী হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কৃষ্ণনগরের প্রধান সদর আমীন (আধুনিক কালের সব্ জজ) রামলোচন ঘোষের নাম বিশেষ স্মরণীয়। ঢাকা স্কুল ও কলেজ সম্পর্কে তাঁহার কথা আমরা জানিয়াছি। রামলোচন দীর্ঘকাল কৃষ্ণনগর 'লোক্যাল কমিটি' বা শিক্ষা-সমাজের অধীন স্থানীয় শিক্ষা-সভার সদস্য থাকিয়া কলেজ পরিচালনায় সহায়তা করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণনগর কলেজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গেসঙ্গে ইহার অধ্যক্ষ হইয়া আসেন হিন্দু কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন রিচার্ডসন। সুবিখ্যাত রামতনু লাহিড়ীও ১৮৪৬ মার্চ মাসে হিন্দু কলেজ হইতে এই কলেজের জুনিয়র বিভাগের শিক্ষক হইয়া আসিলেন। প্রতিষ্ঠার অল্পদিনের মধ্যেই কৃষ্ণনগর কলেজ একটি প্রথম শ্রেণীর আদর্শ বিদ্যালয়ে পরিণত হইল। ১৮৪৯ সন হইতে কৃষ্ণনগর কলেজ অন্যান্য সরকারী কলেজের সমমর্যাদা লাভ করে। এই বৎসরে সিনিয়র পরীক্ষায় উমেশচন্দ্র দত্ত অন্যান্য কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে একই প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিয়া বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন।

এই সময়, ১৮৪৬ সনের ৫ই মার্চ কলিকাতার বেসরকারী গণ্যমান্য হিন্দুগণ মিলিত হইয়া 'হিন্দু চেরিটেব্ল ইন্স্টিটিউশন' বা হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয় নামে আর-একটি উচ্চ শিক্ষায়তন স্থাপন করিলেন। ইহাকে বিদ্যালয়-মাত্র বলিলে ভুল করা হইবে। ইহা একটি আন্দোলনের প্রতীক।

আর ইহার শাখাও কলিকাতার বাহিরে নানা স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সেযুগে ইংরেজি শিক্ষা প্রসারের সঙ্গেসঙ্গে খ্রীস্টান মিশনরীরা ভারতবাসীদের খ্রীস্টান করিবার জন্য চাঙ্গা হইয়া উঠে। মধুসূদন দত্ত, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর (কিঞ্চিৎ পরে) প্রমুখ মেধাবী ছাত্রগণ পর পর খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করায় সাধারণের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। ডাফের নেতৃত্বে পাদ্রীগণ দেশীয় পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহায়তায় মফস্বলে গিয়াও এদেশীয়দের খ্রীস্টান করিতে আরম্ভ করেন। ইংরেজি শিখিলেই খ্রীস্টান হইবে এই ধারণাও তখন সাধারণের মনে বদ্ধমূল হইতে থাকে। এই ধারণা বদ্ধমূল হওয়ার আর একটি কারণও ছিল। পাদ্রীরা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিতে বিনাবেতনে পড়াইবার ছলে বাইবেল পড়াইতেন এবং ছাত্রদিগকে খ্রীস্টধর্ম গ্রহণে প্ররোচিত করিতেন। ইহারই প্রতিষেধকরূপে হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয় নামক অবৈতনিক ইংরেজি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইল। ইহাতে হিন্দু সমাজের রক্ষণশীল প্রগতিবাদী সকল লোকেরাই অগ্রণী হইয়াছিলেন। রক্ষণশীল রাধাকান্ত দেবের সহায়ে প্রগতিপন্থী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর খ্রীস্টানী প্রতিরোধের জন্য যে আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন তাহারই একটি প্রধান ফল এই হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয়।

দেবেন্দ্রনাথ রাজা রামমোহন রায়ের অনুবর্তী হইয়া ইতিপূর্বেই ব্রাহ্মসমাজ পুনর্গঠন করিয়াছিলেন এবং একেশ্বরবাদের প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই আদর্শে তিনি তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠা করেন (অক্টোবর ১৮৩৯)। হিন্দু ধর্মের সার বেদান্তের আদর্শের ভিত্তিতে তিনি এই সভার অধীন তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা ১৮৪০ সনে স্থাপন করিলেন। এখানে বাংলা সংস্কৃত ও ইংরেজি শিক্ষা দেওয়া হইত। পল্লীবাসীর মধ্যে নূতন আদর্শে শিক্ষাপ্রসারের জন্য ১৮৪৩ সনের ৩০শে এপ্রিল হুগলী জেলার অন্তর্গত বংশবাটী গ্রামে এই পাঠশালাটি স্থানান্তরিত হয়।[১]

---

১ শিক্ষা-সমাজ ১৮৪৫-৪৬ সনের বার্ষিক রিপোর্টে (পৃ: ৭৭) বিদ্যালয়টি সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন:

তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা ছাত্রদের খ্রীস্টান হওয়ার বিরুদ্ধে বিশেষ কার্য করিয়াছিল। কিন্তু এমন-একটি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের অভাব তখন অনুভূত হইতেছিল যেখানে খ্রীস্টানীর আবহাওয়া হইতে দূরে থাকিয়া ছাত্রগণ বিনাবেতনে বিদ্যা অর্জন করিতে পারে। এই মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয়। ইহার অধ্যক্ষ-সভার সভাপতি ছিলেন রাজা রাধাকান্ত দেব এবং সম্পাদক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বয়ং। সুপ্রসিদ্ধ রামকমল সেনের জ্যেষ্ঠপুত্র হরিমোহন সেন ইহার অন্যতর সম্পাদক-পদে বৃত হইয়াছিলেন। হিন্দু কলেজের প্রখ্যাত ছাত্র ভূদেব মুখোপাধ্যায় ইহার প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরে, তাঁহারই সতীর্থ রাজনারায়ণ বসু ইহার পরিদর্শকের পদ গ্রহণ করেন। হিন্দু সমাজের রক্ষণশীল প্রগতিপন্থী সকল শ্রেণীর গণ্যমান্য ব্যক্তিরাই বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ-সভায় স্থান পাইয়াছিলেন। হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয়ের আদর্শে কলিকাতার অনতিদূরে পানিহাটীতেও শীঘ্রই একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা এবং হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয় দুইয়েরই মূল অনুপ্রেরক ও উদ্যোক্তা ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৮৪৮ সনের প্রারম্ভে কলিকাতাস্থ ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ায় দেবেন্দ্রনাথ একেবারে নিঃস্ব হইয়া পড়েন। ফলে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা উঠিয়া গেল। হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয়ের অবস্থাও শোচনীয় হইয়া পড়িল। তবে দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখ সমাজ-নেতারা যে আন্দোলন উপস্থিত করেন তাহাতে খ্রীস্টধর্ম প্রচারকগণ অনেকটা নিস্তেজ

"Native education in the district [Hooghly]. There is an English school at Bansberia, an ancient seat of Hindoo learning, supported by Baboos Debendronath Tagore and Ramaprasaud Roy, the sons of distinguished fathers.

"It is established for the diffusion of Vedantic principles, but is conducted by an ex-student of this [Hooghly] College, who is himself not of that persuasion"

হইয়া পড়িলেন। ইংরেজি শিক্ষা যে খ্রীস্টান না হইয়াও লাভ করা যায় সাধারণের নিকট তাহাও বিশেষ করিয়া বোধগম্য হইতে লাগিল।

খ্রীস্টানীর স্রোত কিন্তু হিন্দু কলেজকেও স্পর্শ করিল। কিছুকাল যাবৎ কলেজ পরিচালনায় সরকারী অর্থ নিয়োজিত হইয়া আসিতেছিল, সুতরাং শিক্ষা-সমাজ ইহার নিয়ন্ত্রণে স্বীয় প্রভাব পুরাপুরি নিয়োজিত করিতে থাকেন। হিন্দু কলেজের মূল নিয়মে হিন্দু ব্যতীত কাহাকেও ভর্তি করা নিষিদ্ধ ছিল। ১৮৪৭-৪৮ সন নাগাদ এখানকার কোনো কোনো হিন্দু ছাত্র ও শিক্ষক খ্রীস্টান হওয়ায় হিন্দু-সমাজে আন্দোলন উপস্থিত হয়। কলেজের অধ্যক্ষ-সভার হিন্দু অধ্যক্ষগণও স্বভাবতই এইরূপ খ্রীস্টানীর বিরুদ্ধে ঘোর প্রতিবাদ করিলেন। শিক্ষা-সমাজ শেষ পর্যন্ত জনমত অগ্রাহ্য করিতে না পারিলেও প্রথম হইতেই হিন্দু অধ্যক্ষগণের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়াই চলেন। আর নিজ সমর্থনে এমন যুক্তিও প্রদর্শন করিলেন যাহাতে বুঝা গেল—হিন্দু কলেজকে নিছক হিন্দুদের প্রতিষ্ঠান বলিয়া স্বীকার করিতে কর্তৃপক্ষ আর রাজী নহেন। জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন শিক্ষা-সমাজের সভাপতির পদাধিকার-বলে ১৮৪৯ সন হইতে এই মতবাদ প্রচার করিতে লাগিলেন। বেথুন ও রাধাকান্ত দেবের মধ্যে এই বিষয়ে বাদানুবাদ চরমে উঠে এবং শেষ পর্যন্ত, ১৮৫০ সনের জুন মাসে প্রায় চৌত্রিশ বৎসর হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ থাকার পর রাধাকান্ত দেব এই পদ ত্যাগ করিলেন।

তবে বেথুনের সভাপতিত্ব-কালে বঙ্গদেশের উচ্চশিক্ষা যে একটি নূতন পথে অনুসৃত হইবে তাহারো আভাস পাওয়া গেল। বেথুন স্ত্রীশিক্ষার প্রধান উৎসাহদাতা এবং বেথুন বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা রূপে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। শিক্ষা-সমাজের সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তিনি ইংরেজি শিক্ষাকে একটি উদার অথচ দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করিতে উদ্যোগী হইলেন। বাংলা ভাষার প্রতি কর্তৃপক্ষের অনমুরাগ সুবিদিত। হার্ডিঞ্জের নির্দেশে এক শত একটি আদর্শ বাংলা পাঠশালা স্থাপিত হইলেও ১৮৪৮ সনের মধ্যেই এগুলির অবস্থা অত্যন্ত

শোচনীয় হইয়া পড়ে। রাজনারায়ণ বসু এই সনের ১লা জুন অনুষ্ঠিত বাৎসরিক হেয়ার-স্মৃতিসভায় বক্তৃতা কালে এই বিদ্যালয়গুলির প্রতি কর্তৃপক্ষের অনাদরের কথা উল্লেখ করিয়া ইহাকে তাঁহাদের সপত্নীপুত্র আখ্যা দিয়াছিলেন! বেথুন ১৮৪৮-৪৯ সন হইতে কলিকাতায় ও মফস্বলে ছাত্রদের পুরস্কার-বিতরণী সভায় যেসব প্রকাশ্য বক্তৃতা দেন তাহার প্রত্যেকটিতেই ছাত্রদের মাতৃভাষা বাংলা চর্চার প্রয়োজনীয়তার প্রতি তিনি বিশেষভাবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

বেথুন অবশ্য ইংরেজির মাধ্যমেই শিক্ষাদানের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। কারণ মেকলের মত তাঁহারও ধারণা ছিল পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণ-পূর্বক ভারতবাসীরা নিজেদের সুসংস্কৃত করিয়া তাঁহাদেরই অনুরূপ হইয়া উঠিবে! তখন ছাত্রগণ ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে যেসব পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং ভাবধারা আহরণ করিতেছিলেন, বাংলা ভাষায় তাহা স্বদেশবাসীদের পরিবেশন করাও যে তাঁহাদের দায়, একথার উল্লেখ করিতে বেথুন কখনো ভুলিয়া যান নাই। তিনি নিজে হইতে উৎকৃষ্ট বাংলা রচনার জন্য বিভিন্ন কলেজের ছাত্রদের পুরস্কার দানের ব্যবস্থা করিলেন। 'ক্যাপ্‌টিভ লেডী' পুস্তক প্রাপ্ত হইয়া ইহার রচয়িতা মাইকেল মধুসূদন দত্তকে বাংলা ভাষায় মৌলিক গ্রন্থাদি প্রণয়নে স্বীয় প্রতিভা নিয়োজিত করিতে তিনি উপদেশ দিয়াছিলেন। এই সময় হইতে বাংলা চর্চার দিকে ইংরেজি শিক্ষিতদের কমবেশি নজর পড়িতে লাগিল। ইংরেজি বিদ্যালয়ে বাংলাশিক্ষারও সূচনা হইল। বাংলা রচনা সিনিয়র পরীক্ষার প্রতিযোগীদের একটি অবশ্য পরীক্ষণীয় বিষয় ছিল। এই সময় হইতে রচনার উৎকর্ষের দিকে ছাত্রেরা অধিকতর মনোযোগী হইয়া উঠিলেন।

উচ্চশিক্ষার নূতন পর্ব

এই সময়কার বেসরকারী শিক্ষা-প্রচেষ্টার কথাও এখানে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিব। ওরিয়েণ্টাল সেমিনারি প্রতিষ্ঠাবধি সগৌরবে গৌড়জনকে ইংরেজি শিক্ষা দান করিয়া আসিতেছিল। ইহার অধীন পাঠশালায় বাংলা পঠন-পাঠনেরও ব্যবস্থা ছিল। এই বিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠাতা গৌরমোহন আঢ্য ১৮৪৬ ৩রা মার্চ ইহলোক ত্যাগ করিলে তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর হরেকৃষ্ণ আঢ্যের উপর ইহার পরিচালনার ভার অর্শে। হরেকৃষ্ণের সময়ও ইহার উন্নতিতে কোনোরূপ ব্যাঘাত হয় নাই। ডি. এল্. রিচার্ডসন প্রমুখ বিখ্যাত ব্যক্তিগণ এখানে ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই সেমিনারিরই অন্যতম শিক্ষক গুরুচরণ দত্ত ১৮৫১, ৭ই আগস্ট ডেভিড হেয়ার অ্যাকাডেমি নামে একটি ইংরেজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে পেরেণ্টাল অ্যাকাডেমির ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ উইলিয়ম কার্কপেট্রিক অধ্যক্ষ হইয়া আসেন। তাঁহার শিক্ষাদানে ছাত্রগণ শেক্সপীয়র মিল্টন পর্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া ইংরেজি সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি অর্জন করিতে লাগিল। এখানে ছাত্রদের দ্বারা 'মার্চেণ্ট অব্ ভেনিস' সুন্দর ভাবে অভিনীত হইয়াছিল। কলিকাতায় শীল্‌স কলেজের কথাও পূর্বে যথাস্থানে বর্ণিত হইয়াছে। এই বিদ্যালয়টি এসময় ছাত্রদের বিনাবেতনে ইংরেজি শিক্ষা দানে আত্মনিয়োগ করিতেছিল। খ্রীস্টানীর প্রাবল্য কমিয়া আসিলে সমাজ-নেতৃবর্গের অনাদর হেতু হিন্দু-হিতার্থী বিদ্যালয়ের অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হইয়া পড়ে। তথাপি এদেশবাসীদের মধ্যে জাতীয়তার ভিত্তিতে এখানকার উচ্চশিক্ষা-দান সর্বদা স্মরণ করা কর্তব্য। এই প্রসঙ্গে পেরেণ্টাল অ্যাকাডেমিক ইন্‌স্টিটিউশন বা সংক্ষেপে পেরেণ্টাল অ্যাকাডেমির নামও উল্লেখযোগ্য। এই প্রতিষ্ঠানটি প্রধানত অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ছেলেদের জন্য ১৮২৩ সনের ১লা মার্চ জে. ডব্লিউ. রিকেটস্ কর্তৃক স্থাপিত হয়। ১৮৪৯-৫০ সন নাগাদ বহু বাঙালী সন্তানও এখানে অধ্যয়নে রত ছিল।

১৮৪৮-৪৯ সনে পাদ্রী জেম্‌স লঙের অধ্যক্ষতায় চার্চ মিশনরী সোসাইটি কর্তৃক সেণ্ট পল্‌স স্কুল স্থাপিত হইলে তাহাও এদেশীয়দের ইংরেজি শিক্ষা লাভে বিশেষ সহায়তা করে। মুসলমানগণও পঞ্চম দশকের মাঝামাঝি ইংরেজি শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হইয়া এই স্কুল দুইটিতে বেশি করিয়া ভর্তি হয়।

উচ্চশিক্ষার প্রসারের প্রতি শিক্ষা-সমাজের আগ্রহ উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছিল। বেথুনের প্রেরণায় ইহার কর্মকে প্রসারিত করিবার চেষ্টা হয় বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে। তিনি বাঙালী ছেলেদের মাতৃ-ভাষা বাংলা চর্চার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়াছি। ১৮৫২, ১৯শে এপ্রিল হার্ডিঞ্জ-প্রতিষ্ঠিত বঙ্গবিদ্যালয়সমূহের পরিচালনার ভার সরকার শিক্ষা-সমাজের উপর অর্পণ করিলেন এই বিশ্বাসে যে, ইহার দ্বারা এগুলির যথোচিত উন্নতি হইতে পারিবে। কিন্তু বেথুন তখন পরলোকগত ; আর শিক্ষা-সমাজের অধিকাংশ সদস্য ইংরেজি শিক্ষার প্রতি অত্যধিক আগ্রহশীল। একারণ নূতন পরিচালনায়ও এই বিদ্যালয়গুলির বিশেষ কোনো উন্নতি হইতে পারিল না। বলা বাহুল্য, এগুলির অবস্থা আগে হইতেই খারাপ হইয়া পড়িতেছিল। শিক্ষা-সমাজ বাংলাদেশের সর্বত্রই শিক্ষা-ব্যবস্থা তথা স্কুল-কলেজ নিয়ন্ত্রণ করিলেও কলিকাতার হিন্দু কলেজ সম্পর্কেই ইহার নজর ছিল বেশি, আর ইহার নিয়ন্ত্রণে অধিকতর তৎপর হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইহার কারণও ছিল। কেন্দ্রস্থলের একটি প্রথমশ্রেণীর উচ্চতম শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়াই শিক্ষা-বিষয়ক নীতি-পদ্ধতি প্রবর্তন করা সহজ ও সমীচীন। তখনও হিন্দু কলেজের পরিচালক-সভায় হিন্দু-প্রধানেরা সদস্য ছিলেন। হিন্দু কলেজ তখন সরকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে, শিক্ষা-সমাজ নিজ ইচ্ছামতই সকল কাজ করিয়া যাইতে চাহিলেন, কিন্তু তখন জনমতও ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছিল। উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া নব্য হিন্দু-সমাজ পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার সঙ্গে ক্রমে পরিচিত হয়, আর পশ্চিমের দেশসমূহের ন্যায় জনমতের যে একটা শক্তি আছে তাহা এদেশে অল্পবিস্তর অনুভূত হইতে থাকে। হিন্দু কলেজে ব্যবহার-শাস্ত্র অধ্যয়নের ফলেও

আইনের প্রয়োগ সম্বন্ধে নব্যশিক্ষিতেরা সচেতন হইয়া উঠেন। শিক্ষা-সমাজ হিন্দু কলেজ পরিচালনা ব্যাপারে কখনো কখনো এসকল বিষয় ভুলিয়া গিয়া জনমত উপেক্ষা করিয়া চলিতেন।

একারণ হিন্দু কলেজ লইয়া শিক্ষা-সমাজ এবং হিন্দু সাধারণের মধ্যে ১৮৫৩ সনের প্রারম্ভে পুনরায় একটি আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। হীরাবুলবুল নামক এক গণিকার পুত্রকে হিন্দু কলেজে ভর্তি করায় এই আন্দোলনের সূচনা। হিন্দু সমাজের পক্ষে ইহার নাম কাটিয়া দেওয়ার দাবি উত্থিত হইল। কিন্তু শিক্ষা-সমাজ ইহাকে কলেজ হইতে ছাড়াইয়া না দিয়া আপন জিদ বজায় রাখেন। ইহা হইতে একটি সুফল ফলিল। হিন্দু-নেতৃবর্গ ব্যক্তিগত বিবাদ-বিসম্বাদ ভুলিয়া পুনরায় একতাবদ্ধ হইলেন এবং শিক্ষা-সমাজের অবিমৃষ্যকারিতার উপযুক্ত জবাব-স্বরূপ ১৮৫৩ সনের ২রা মে হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ নামে কলিকাতায় একটি উচ্চতম-শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিলেন। হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় যেমন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর অগ্রণী হইয়াছিলেন এবারে সেইরূপ উদ্যোগী হইলেন ওয়েলিংটনস্থ দত্ত-পরিবারের বিখ্যাত রাজেন্দ্র দত্ত মহাশয়। প্রথম হইতেই সুবিজ্ঞ অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকদের দ্বারা অধ্যাপনা-কার্য আরম্ভ হয়। হিন্দু কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ ডি. এল্. রিচার্ডসন অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হইলেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, তিনি ১৮৪৯ সনে শিক্ষা-সমাজ তথা বেথুন সাহেবের নির্দেশে হিন্দু কলেজ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন এবং ওরিয়েন্টাল সেমিনারি ও অন্যান্য দেশীয় প্রতিষ্ঠানে কিছুকাল ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপনা-কার্যে লিপ্ত থাকেন। কলেজে বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন পরবর্তী কালের সুবিখ্যাত নাট্যকার পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন বা 'নাটুকে রামনারাণ'। হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজের সূচনাতেই গুরুচরণ দত্তের ডেভিড-হেয়ার অ্যাকাডেমি ও মতিলাল শীলের শীল্‌স ফ্রি কলেজ আসিয়া ইহার সঙ্গে যুক্ত হইল এবং ইহার কার্যকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিল। এইরূপ সার্থক প্রতিবাদে শিক্ষা-সমাজেরও চোখ খুলিল। তাঁহারা অগত্যা হিন্দু কলেজ হইতে হীরাবুলবুলের পুত্রকে

সরাইয়া দিলেন। ইহার পরে ক্রমশঃ সরকারী শিক্ষা-নীতির রদ-বদল হওয়ায় হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজেরও সুদিন চলিয়া যায়। কিন্তু সে অন্য কাহিনী।

এই সময়কার সরকারী শিক্ষা-নীতি ও শিক্ষা-সমাজের কার্যকলাপ সম্বন্ধে এখন কিছু বলিব। উচ্চশিক্ষা ব্যাপকতর করা সরকারের উদ্দেশ্য; কাজেই শিক্ষা-সমাজের নিয়ন্ত্রণাধীন নিম্নলিখিত জেলা শহরগুলিতে ১৮৫৩, অক্টোবরে প্রদত্ত বাংলা-সরকারের আদেশবলে সরকারী জেলা স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইল—

স্কুল	প্রতিষ্ঠা-কাল	
বহরমপুর কলেজ	১ নবেম্বর	১৮৫৩
বালেশ্বর স্কুল	”	”
পুরী স্কুল	”	”
আরা স্কুল	”	”
বগুড়া স্কুল	”	”
নোয়াখালি স্কুল	”	”
ময়মনসিংহ স্কুল	৫ নবেম্বর	”
পূর্ণিয়া স্কুল	২ ডিসেম্বর	”
বরিশাল স্কুল	১৬ ডিসেম্বর	”
সারণ স্কুল	১ মে	১৮৫৪

ফরিদপুর ইংরেজি বিদ্যালয় স্থানীয় লোকেরা নিজ দায়িত্বে ১৮৩০ সনের জানুয়ারি মাসে স্থাপন করিয়াছিলেন। সরকার ১৮৫৩, নবেম্বর মাসে ইহার ভারও স্বহস্তে লইলেন।

হিন্দু কলেজ লইয়া যেমন ১৮৫৩ সনের প্রারম্ভেই শিক্ষা-সমাজ দেশীয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে বাদ-বিসম্বাদে লিপ্ত হন তেমনি কলিকাতা মাদ্রাসা লইয়াও এই সনেই তাঁহারা বিষম ফাঁপরে পড়িলেন। মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ডক্টর স্প্রেঙ্গার কতকগুলি নূতন নিয়ম প্রবর্তন করিলে ছাত্রদের মধ্যে বিক্ষোভ উপস্থিত হয়। তাহারা অধ্যক্ষের আদেশ লঙ্ঘন করিয়া স্বমতে

চলিতে লাগিল। শিক্ষা-সমাজের পক্ষে সেক্রেটারি এফ্. জে. মৌএট এবিষয়ে অনুসন্ধান করিতে গিয়া ১৮৫৩, ৪ঠা আগস্ট বাংলা-সরকারের নিকট যে রিপোর্ট পেশ করেন তাহাতে সকল বাদ-বিসম্বাদের স্থায়ী মীমাংসার উদ্দেশ্যে মুসলমান বা হিন্দু কোনো সম্প্রদায়ের জন্যই কোনো বিশেষ প্রতিষ্ঠান না রাখিয়া একটি সাধারণগম্য সরকারী কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব করিলেন। হিন্দু কলেজ তখন সরকারী কলেজেই পরিণত হইয়াছে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ছাত্র এখানে ভর্তি হইবার অধিকার পাইলে আলাদা কলেজ প্রতিষ্ঠার আর আবশ্যক থাকে না। এই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হইয়া শিক্ষা-সমাজ হিন্দু কলেজের দেশীয় অধ্যক্ষদের সঙ্গে ১৮৫৩, ২৭শে নবেম্বর এক সভায় সম্মিলিত হইলেন। এই সভা হইতে হিন্দু কলেজ পরিচালনা ও পুনর্গঠনাদি সম্বন্ধে যেসব আলোচনার সূত্রপাত হয় তাহারই পরিণতি হয় প্রেসিডেন্সী কলেজ ও হিন্দু স্কুল দুইটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান গঠনের মধ্যে। ১৮৫৪ সনের ১লা ফেব্রুয়ারি কলেজের সেক্রেটারী রসময় দত্ত অধ্যক্ষ জেম্স সি সাট্‌ক্লিফের হস্তে সমস্ত ভার দিয়া অবসর গ্রহণ করিলেন। অধ্যক্ষগণও নিজ নিজ পদ ত্যাগ করিয়া নূতন ব্যবস্থানুযায়ী কার্য অনুসৃত হইবার সুযোগ করিয়া দিলেন। তবে তাঁহাদের ইচ্ছানুসারে কলেজের গচ্ছিত তহবিল হইতে উৎকৃষ্ট ছাত্রদের কয়েকটি বৃত্তি দেওয়া হইবে স্থির হইল। ১৮৫৪ সনের ১৫ই জুন কোম্পানির ডিরেক্টর-সভার অনুমোদন সাপক্ষে স্বতন্ত্র ভাবে প্রেসিডেন্সী কলেজের কার্য আরম্ভ হইল। প্রথম বারেই এক শত এক জন ছাত্রের মধ্যে দুই জন মুসলমান ছাত্র ভর্তি হইল। প্রেসিডেন্সী কলেজের দ্বার তখন সকল শ্রেণীর ও সম্প্রদায়ের নিকটেই উন্মুক্ত হইয়া একটি পুরাপুরি সাধারণগম্য প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। ডিরেক্টর-সভার নিকট হইতে এই ব্যবস্থার অনুমোদন পত্র ১৮৫৪, ১৩ই ডিসেম্বর আসিয়া পৌঁছিল। ১৮৫৫ সনের ১৫ই জুন হইতে প্রেসিডেন্সী কলেজের দ্বার প্রকাশ্যভাবে উন্মোচিত হইল। হিন্দু স্কুল হিন্দু কলেজের স্মৃতি বহন করিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে ডিরেক্টর-সভা ১৮৫৪, ১৯শে জুলাই তারিখে ভারতবর্ষের

শিক্ষা সম্পর্কে একটি সারগর্ভ ডেস্‌প্যাচ বা বিধানপত্র এদেশে পাঠান। ভারতবর্ষের ইংরেজাধিকৃত প্রদেশসমূহে, বিশেষতঃ কলিকাতা বোম্বাই ও মাদ্রাজে শিক্ষা যেরূপ দ্রুত অগ্রসর হইতেছিল তাহাতে ইহাকে সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া আরও ব্যাপকতর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইতেছিল। ইহারই ফল উক্ত ডেস্‌প্যাচ। এরূপ প্রকাশ, বিখ্যাত ইংরেজ দার্শনিক জন স্টুয়ার্ট মিল ডিরেক্টর-সভার পক্ষে একশতটি অনুচ্ছেদ-সম্বলিত এই সুদীর্ঘ বিধানপত্রখানি রচনা করিয়াছিলেন। ইহাতে শিক্ষাবিষয়ক বহু গুরুত্বপূর্ণ নিদেশ রহিয়াছে ; পরবর্তী শিক্ষা-ব্যবস্থা এইসকল নির্দেশ অনুযায়ীই নির্ধারিত হয়। একারণ এখানিকে 'Charter of Indian Education' বা ভারতবর্ষের শিক্ষা-সনদ বলা হইয়া থাকে। ইহাতে উচ্চশিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা ও প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে যেমন আলোচনা আছে, তেমনি আলোচনা রহিয়াছে প্রাচ্য ভাষা—সংস্কৃত-আরবি-ফারসি, ইংরেজি ভাষা এবং দেশভাষাসমূহের শিক্ষা ও উন্নতি সম্পর্কে। কলিকাতা, বোম্বাই এবং মাদ্রাজে সত্বর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার নির্দেশও ইহাতে দেওয়া হয়। বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষা-সমাজ বা শিক্ষা-সভা তুলিয়া দিয়া শিক্ষাকে সরকারী বিভাগসমূহের মধ্যে একটির মর্যাদা দানের এবং ইহার ভার প্রত্যেকটি প্রদেশে নবনিযুক্ত এক একজন ডিরেক্টর অব্ পাবলিক ইন্‌স্ট্রাক্‌শন বা আধুনিক পরিভাষায় শিক্ষা-অধিকর্তার উপর অর্পণের কথা থাকে।

বাংলাদেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা ১৮২৩ সনের জুলাই মাস হইতে সরকার-নিযুক্ত শিক্ষা-সভা (জেনারেল কমিটি অব্ পাব্‌লিক ইন্‌স্ট্রাক্‌শন) এবং ১৮৪২ সন হইতে শিক্ষা-সমাজ (কৌন্সিল অব্ এডুকেশন) পরিচালনা করিয়া আসিতেছিলেন। ডিরেক্টর-সভা প্রেরিত ডেস্‌প্যাচের নির্দেশ অনুসারে স্থানীয় সরকারের আদেশে ১৮৫৫ সনের ২৭শে জানুয়ারি শিক্ষা-সমাজ নূতন শিক্ষা-অধিকর্তা উইলিয়ম গর্ডন ইয়ঙের উপর শিক্ষা-পরিচালনার ভার দিয়া চিরতরে অন্তহিত হইলেন। শিক্ষা-সমাজের শেষ রিপোর্ট হইতে বিদায়ী কথাগুলি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি—

"The increased importance given to the work of Education by the despatch of August 1854, having involved the remodelling of existing arrangements, the Council cheerfully resigned their duties to the charge of the new department of Public Instruction; and, in presenting this their last report, desire to express their thanks to Government for the courteous attention and support which has uniformly been accorded to their views and recommendations."

ইহার পর সরকার উচ্চশিক্ষা তথা ইংরেজি শিক্ষা সম্বন্ধেও নানারূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন। পূর্বে উচ্চশিক্ষা এবং প্রাথমিক শিক্ষা—শিক্ষার মধ্যে এইরূপ দুইটি সীমারেখা মাত্র টানা হইত। 'সেকেণ্ডারি এডুকেশন' বা মাধ্যমিক শিক্ষা উচ্চশিক্ষারই অন্তর্ভুক্ত ছিল। এখন শিক্ষা-বিভাগ পুনর্গঠিত হওয়ায় উচ্চতম শিক্ষা (কলেজে প্রদত্ত), মাধ্যমিক শিক্ষা (উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে প্রদত্ত) এবং প্রাথমিক শিক্ষা (বাংলা পাঠশালায় প্রদত্ত) এইরূপ ত্রিধারায় আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা বিভক্ত হইয়া পড়িল। শিক্ষা-অধিকর্তা সকল বিভাগের উপর কর্তৃত্ব করিলেও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্গেসঙ্গে প্রধানত মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ন্ত্রণেই স্বীয় শক্তি প্রয়োগ করিতে থাকেন। অবশ্য সরকারী প্রতিষ্ঠানমাত্রেই তাঁহার নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় প্রধানতঃ কলেজি শিক্ষাকেই নিয়ন্ত্রিত করিবে, যদিও প্রবেশিকা হইতে উচ্চতম পরীক্ষাও ইহার নির্দেশে চলিবে, ডেস্‌প্যাচে ইহাও লিপিবদ্ধ হইয়াছিল।

উপরি-উক্ত ডেস্‌প্যাচ প্রেরণের অব্যবহিত পরেই ডিরেক্টর-সভা হিন্দু কলেজ সম্পর্কিত নূতন ব্যবস্থার যে অনুমোদন-পত্র লেখেন তাহাতে ভাবী বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্কেও কতকগুলি কার্যকরী নির্দেশের উল্লেখ ছিল। তাঁহাদের মতে বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় কার্য পরিচালনার কেন্দ্র হইবে প্রেসিডেন্সী কলেজ। এই কলেজে ইঞ্জিনিয়ারিং, ব্যবহার-শাস্ত্র, বিজ্ঞানাদি শিক্ষা-বিষয়ে ব্যবস্থা থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত স্বতন্ত্র কোনো

বিভাগ প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাদি পরিচালনার ব্যবস্থা এই কলেজে হইতে পারিবে; কিন্তু পরীক্ষা গ্রহণ এবং উপাধিদানের অধিকার থাকিবে একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়েরই। এই বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো অনুমোদিত ও অন্তর্ভুক্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানেরই কোনোরূপ অধিকার থাকিবে না স্থির হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ স্যাট্‌ক্লিফই ইহার প্রথম রেজিস্ট্রার হইয়াছিলেন। ভারত-সরকার বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকল্পে কলিকাতার সরকারী-বেসরকারী শিক্ষা-বিদ্‌ ও পদস্থ ব্যক্তিদের লইয়া ১৮৫৬ সনে একটি কমিটী গঠন করেন। কমিটীতে বাঙালিদের মধ্যে ছিলেন প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ, রমাপ্রসাদ রায় ও পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। কমিটীর রিপোর্টকে ভিত্তি করিয়া ১৮৫৭, ২৪শে জানুয়ারি তারিখে বিধিবদ্ধ আইন অনুযায়ী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল।

উচ্চশিক্ষার ফলাফল

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার (১৮৫৭) পূর্ব পর্যন্ত বঙ্গদেশে উচ্চ-শিক্ষার কথা এখানে সংক্ষেপে বিবৃত হইল। ইংরেজিকে শিক্ষার বাহন করিবার কথা ১৭৯২ ও ১৭৯৭ সনে সার চার্লস গ্রাণ্ট উত্থাপন করিলেও ১৮৩৫ সনের পূর্বে সরকার কর্তৃক তাহা গ্রাহ্য হয় নাই। এই দীর্ঘ চল্লিশ বৎসরের মধ্যে ব্রিটিশের রাজ্যবিস্তার এবং শাসন-প্রণালীর সঙ্গেসঙ্গে শিক্ষা-নীতিরও রদবদল হয়। প্রাচ্যবিদ্যা-চর্চায় অর্থদান, জনশিক্ষায় সহানুভূতি প্রদর্শন, প্রাচ্যভাষা সংস্কৃত ও আরবিকে শিক্ষার বাহন নির্ধারণ—সমুদয়ই শাসন-প্রণালীর অঙ্গ বলিয়া ধরিয়া লইলে শাসকজাতির মনোভাব বুঝিতে বিলম্ব হইবে না। এদেশে ইংরেজ যতই সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল ততই পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান এদেশীয়দের মধ্যে প্রথমে প্রাচ্য ভাষার

মারফত এবং পরে শাসকজাতির ভাষা ইংরেজির মাধ্যমে পরিবেশন করা আবশ্যক বিবেচিত হইল। দেশশাসনে এদেশবাসীর সহযোগিতা ও সহানুভূতি প্রয়োজন এবং তাহা সম্ভব হইবে যদি ইহাদিগকে পাশ্চাত্ত্য-ভাবাপন্ন করা যায়—এই ধারণার বশবর্তী হইয়াই কর্তৃপক্ষ ইংরেজি শিক্ষার দিকে ঝুঁকিয়া পড়েন। অবশ্য গত শতাব্দীর তৃতীয় দশক নাগাদ একদল অনভিজ্ঞ যুবক সিবিলিয়ান এমন ভাব দেখাইতে থাকেন যে, এদেশীয় ভাষা সাহিত্যে শুধু আজগুবি কথাই রহিয়াছে, উচ্চ চিন্তা বা ভাব ইহার মধ্যে আদৌ নাই, বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে হইলে এগুলি বর্জন করিয়া ইংরেজিরই আশ্রয় লইতে হইবে!

তবে ভারতবাসী তথা বাঙালিরা যে উচ্চশিক্ষার জন্য লালায়িত হইয়া উঠিতেছিল, সে কিসের জন্য? ১৮১৬ খ্রীস্টাব্দে যখন ইংরেজি শিক্ষার উদ্দেশ্যে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার আয়োজন হয়, তখন সরকারী চাকুরিতে খুব কম বাঙালিই নিয়োজিত হইতেন। সরকারী কোনো কোনো বিভাগে এদেশীয়দের নিয়োগ একেবারে নিষিদ্ধ ছিল। ইংরেজি শিখিয়া উচ্চ রাজকার্যে নিয়োজিত হইবেন—একমাত্র এ ধারণার বশবর্তী হইয়াই যে তাঁহারা তখন ইংরেজি শিক্ষায় প্রয়াসী হইয়াছিলেন, একথা জোর করিয়া বলা যায় না। আইন-আদালতেও তখন ফারসি ভাষার চল। তবে ব্যবসাক্ষেত্রে ও অন্যান্য রাজকার্যে ইংরেজের সংস্পর্শে বাঙালিদের প্রতিনিয়ত আসিতে হইত। উচ্চমনা ইংরেজেরও তখন অভাব ছিল না। তাঁহাদের মারফত ইংরেজি সাহিত্যের উৎকর্ষ এবং ইংরেজ চরিত্রের সদ্‌গুণাবলী উপলব্ধি করিয়াও ইহার দিকে বাঙালি-প্রধানেরা আকৃষ্ট হইয়া থাকিবেন। ইংরেজের সঙ্গে বিদ্যা-বুদ্ধিতে সমান তালে চলিতে হইলে ইংরেজি ভাষা ও পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান আয়ত্ত করা দরকার একথাও হয়তো তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন। বিশেষত রাজা রামমোহন রায়ের ইংরেজ-সংস্পর্শ এবং তাঁহার অ্যাংলো-হিন্দু স্কুলের ইংরেজি-শিক্ষাদান-প্রণালী ইহাই সূচিত করে।

তখন বাঙালিরা ইংরেজি শিক্ষার দিকে ঝুঁকিতে আরম্ভ করেন বটে, কিন্তু

দেশভাষা কি দেশীয় শিক্ষাপ্রণালীর উন্নতি করিতেও তাঁহারা ভুলিয়া যান নাই। দেশীয় পাঠশালাসমূহ সুসংস্কৃত করিয়া কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত বাংলা সাহিত্য, গণিত, ভূগোল, ইতিহাস ও বিজ্ঞানের পুস্তক সেখানে প্রবর্তন করিবার ব্যবস্থা হয়। আরও নিয়ম ছিল যে, আট বৎসর বয়সের পূর্বে কাহাকেও ইংরেজি শিখিতে দেওয়া হইবে না। এ হেতু আট বৎসর বয়স পর্যন্ত শুধু বাংলা পুস্তক পাঠ করায় শিক্ষার বুনিয়াদ অনেকটা পাকা হইয়া যাইত। ১৮৩৫ সনের পূর্বে হিন্দু কলেজে ও অন্যত্র যেসব যুবক ইংরেজি শিক্ষা লাভ করিয়াছিল তাহারা প্রায় প্রত্যেকেই মাতৃভাষা বাংলাতেও দক্ষ হইয়া উঠিত। তখন মাতৃভাষাকে ভিত্তি করিয়া শিক্ষাসৌধ স্বাভাবিক ভাবে গড়িয়া উঠিবার অবকাশ পাইয়াছিল। ছাত্রদের ইংরেজি শিক্ষাও এহেতু বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে। ১৮৩৫ সনে শিক্ষার বাহন ইংরেজি ধার্য হওয়ায় এবং বাংলা-শিক্ষার প্রতি সরকার বিশেষ অনাদর প্রদর্শন করায় পরবর্তী কুড়ি বৎসরের ইংরেজি শিক্ষা তেমন পাকা বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। শাসন-নীতির পরিবর্তন হেতু বেসরকারীভাবে বাংলা-শিক্ষার যে প্রচেষ্টা চলিয়াছিল, তাহাতে সাফল্যলাভের বিশেষ কোনোই আশা ছিল না। ১৮৩৫ সনের পূর্ব ও পরবর্তী কালের ইংরেজি শিক্ষিতদের উৎকর্ষের তারতম্য সম্বন্ধে সংবাদপত্রের উক্তি এখানে উদ্ধৃত করিব। কাশীপ্রসাদ ঘোষ-সম্পাদিত 'হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সা'র ৯ জানুয়ারি ১৮৫৪ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে'র একটি উক্তির অনুবাদ এইরূপ দিয়াছেন—

"When the Hindu College was under native management it was in a flourishing state; and such clever students as the Rev. K. M. Banerjea, Babu Russick Krishna Mullick, Ramgopal Ghose, Tarachand Chuckerbutty, Horro Chunder Ghose, Kasipersaud Ghose, Gunganarain Sen, Obinas Chunder Ganguly and others came out of this Institution....But the students that now come out after passing the prescribed examination, cannot be compared with the names given above.

The reason of this is, that the Hindu College being entirely under the control of the Council of Education, the routine of studies has been much altered and not for the better."

১৮৫৬, ২৮শে মে সংখ্যার 'সংবাদ প্রভাকর' হইতে ইহার পরিপূরক হিসাবে আর একটি উদ্ধৃতি দিতেছি—

"বাবু রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রেবরেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি ব্যক্তিগণ টৌনহালে এক এক সভায় দণ্ডায়মান হইয়া স্বদেশের উপকারার্থ এক এক দিবস ইংরেজিতে এমত বক্তৃতা করিয়াছেন যে তৎশ্রবণে বড় বড় সাহেবেরা সন্তুষ্ট হইয়া সাধুবাদ করিয়াছেন, শ্রীযুত বাবু তারাচাঁদ চক্রবর্তী, শ্রীযুত বাবু চন্দ্রশেখর দেব, শ্রীযুত বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীযুত বাবু গঙ্গাচরণ সেন প্রভৃতি যেরকম ইংরেজি লিখিতে পারেন সেইরূপ সুলেখক এইক্ষণে প্রায় কেহই হইতে পারেন না…।"

এরূপ অবস্থার যেসকল কারণ নির্ণীত হইয়াছে তাহার মধ্যে বাংলা-শিক্ষার অনাদর একটি, নিঃসন্দেহ। ১৮৩৫-৫৫, এই বিশ বৎসরের মধ্যে হিন্দু কলেজ, হুগলী কলেজ, কৃষ্ণনগর কলেজ ও ঢাকা কলেজ হইতে বহু উৎকৃষ্ট ছাত্র উচ্চতম বৃত্তি লইয়া উত্তীর্ণ হইয়াছেন। কিন্তু পূর্বে যেমন বলিয়াছি, সরকারী শাসন-নীতির রদবদল হওয়ায় তাঁহারা প্রায় প্রত্যেকে কোনো-না-কোনো সরকারী বিভাগের কর্মে রত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইংরেজি শিক্ষিতদের উচ্চতন চাকুরী দেওয়া হইবে—এই সরকারী নীতি যুবকদের অন্যবিধ শিক্ষার চেয়ে ইংরেজি শিক্ষার দিকেই বেশি করিয়া প্রলুব্ধ করিয়াছিল। পূর্বে যেমন সরকারী কর্মচারীরা নিজ কার্য ব্যতিরেকেও জনসাধারণের হিতকর কর্মে নিজেদের নিয়োজিত করিতে পারিতেন, শাসন-ব্যবস্থা সুদৃঢ় হইবার সঙ্গেসঙ্গে তাহা আর তেমন সম্ভব হইল না। ঐরূপভাবে সাধারণের সহিত সংযোগ রক্ষাও ক্রমে তাঁহাদের পক্ষে কঠিন হইয়া পড়িল। পরবর্তী-কালে যে ইংরেজি শিক্ষিতেরা, বিশেষত সরকারী চাকুরিয়াবা একটি স্বতন্ত্র শ্রেণীতে পরিণত হইয়া আত্মকেন্দ্রিক হইয়া পড়ে তাহার সূচনা এই সময়েই দেখিতে পাই।

১৮৫৪ সনের ডেস্‌প্যাচের নির্দেশ অনুযায়ী দেশমধ্যে বাংলাশিক্ষা প্রসারের দায়িত্ব সরকার পুনরায় গ্রহণ করেন বটে, এবং পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রমুখ প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিগণ উপযুক্ত গ্রন্থকার ও সহকর্মীর সহযোগিতায় তাহাতে অনেকটা কৃতকার্যও হন নিঃসন্দেহ; কিন্তু যে উচ্চশিক্ষা দেশমধ্যে সরকারী স্বার্থের খাতিরে ও উৎসাহে একবার দৃঢ়মূল হইয়া পড়িয়াছিল তাহা উত্তরোত্তর শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে এবং জাতির দৃষ্টিকেও আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। কিন্তু উচ্চশিক্ষা তথা ইংরেজি শিক্ষা লাভে আমাদের যে বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল তাহাও অস্বীকার করিলে চলিবে না। ইংরেজের সঙ্গে সমান তালে টক্কর দিতে আরম্ভ করায় তাহারা বাঙালিদের উপর দ্বেষ-বিদ্বেষে এতই জর্জরিত হইয়া উঠে যে, ভিন্ন ভাবে ভাবুক বাঙালি জাতিকে সিপাহী যুদ্ধের (১৮৫৭-৫৮) প্রশ্রয়দাতা বলিয়াও দাবাইয়া রাখিতে ইংরেজ পক্ষে চেষ্টা হইয়াছিল। আবার ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে এক-জাতীয়তাবোধ সৃষ্টির সহায়ক হইয়াছে এই ইংরেজি শিক্ষা বিশেষ ভাবে। উচ্চশিক্ষা যে আমাদের নিরবচ্ছিন্ন হিতকর বা অহিতকর হয় নাই তাহা বলাই বাহুল্য।

স্বীকৃতি

পুস্তক-রচনায় বিভিন্ন প্রামাণিক গ্রন্থ ও রিপোর্টের সাহায্য লইয়াছি। *Selections from Educational Records*, Parts I and II-এ ১৭৮১ হইতে ১৮৫৯ সন পর্যন্ত সরকারী শিক্ষা-নীতি বিষয়ক বহু তথ্য লিপিবদ্ধ আছে। শিক্ষা-সভা ও শিক্ষা-সমাজের বার্ষিক রিপোর্টগুলি উচ্চশিক্ষার ধারাবাহিক ইতিহাস রচনার পক্ষে অপরিহার্য। অ্যাডামের এডুকেশন রিপোর্ট (১৮৩৫, '৩৬ ও '৩৮) এবং সেযুগের সংবাদপত্র শিক্ষাবিষয়ক সংবাদের আকর-স্বরূপ। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুখ্যত 'সমাচার দর্পণ' হইতে সংকলিত 'সংবাদ-পত্রে সেকালের কথা' ১ম ও ২য় খণ্ডেও (১৮১৮-৪০, ৩য় সং) এ সম্বন্ধে অনেক তথ্য মিলিবে। 'বেঙ্গল হরকরা', 'ইংলিশম্যান', 'ফ্রেণ্ড অফ্ ইণ্ডিয়া', 'সংবাদ প্রভাকর', 'সম্বাদ ভাস্কর', 'এশিয়াটিক জর্নাল', 'ক্যালকাটা রিভিয়ু' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকাদিতে বিস্তর তথ্য লিপিবদ্ধ আছে। হিন্দু কলেজ অধ্যক্ষ-সভার হস্তলিখিত 'প্রোসিডিংস' বা কার্য-বিবরণ (১৮১৬-৫০) ব্যবহার করিবার সৌভাগ্যও আমার হইয়াছে। চার্লস লাসিংটনের *History, Design, and Present State of the Religious, Benevolent and Charitable Institutions founded by the British in Calcutta and its Vicinity* (1824) নামক তথ্যবহুল পুস্তকে সেযুগের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে। *The Agra and Calcutta Gazetteer* (1841)-এ সমসাময়িক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। চার্লস ই. ট্রেভেলিয়ান-কৃত *On the Education of the People of India* (1838) এবং জে. কার প্রণীত *Review of Public Instruction in the Bengal Presidency from 1835 to 1851*, Parts I & II (1852) পুস্তক দুইখানিতে তৎকালীন শিক্ষা-ব্যবস্থার একটি তথ্যমূলক সুন্দর ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়। বিগত পঁচিশ বৎসরের মধ্যে প্রেসিডেন্সী কলেজ, হুগলী কলেজ, কৃষ্ণনগর কলেজ,

ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী, বেথুন কলেজ প্রভৃতির শতবার্ষিকী ইতিহাস-গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। এই সকল হইতেও ইংরেজি শিক্ষা-বিস্তারের কথা জানা যায়। শ্রীযুত জিতেন্দ্রমোহন সেন-কৃত *History of Elementary Education in India* (2nd. ed 1941) পুস্তকে প্রধানত প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা থাকিলেও গোড়ার দিকের ইংরেজি শিক্ষার কথাও ইহাতে আছে। এইসকল রিপোর্ট; পত্র-পত্রিকা এবং পুস্তকাদি বর্তমান পুস্তক রচনায় বিশেষ উপকরণ জোগাইয়াছে। যাঁহারা আমাকে দুষ্প্রাপ্য পুস্তকাদি দিয়া সহায়তা করিয়াছেন তাঁহাদের, এবং বিশেষভাবে আচার্য শ্রীযদুনাথ সরকার মহাশয়ের নাম কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি।

নির্দেশিকা